

বিদ'আত ও প্রচলিত কুসংস্কার



সংকলনে – সাজ্জাদ সালাদীন

সম্পাদনায় – শাইখ রবিউল ইসলাম

বিদ'আত ও প্রচলিত কুসংস্কার

সংকলনে - সাজ্জাদ সালাদীন

সম্পাদনায় - শাইখ রবিউল ইসলাম

প্রকাশনায়

কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর আলোকে রচিত তথ্য সমৃদ্ধ

কিতাব প্রকাশে সচেষ্টিত ব্যতিক্রমধর্মী



ওয়াহীদিয়া ইসলামিয়া লাইব্রেরী

রাণীবাজার, মাদরাসা মার্কেটের সামনে, রাজশাহী। ০১৭৩০৯৩৪৩২৫, ০১৯২২৫৮৯৪৫

সাজ্জাদ সালাদীন

ইসলামিক স্টাডিজ, [এম, এ]

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, বাংলাদেশ।

তথ্যসূত্র ও বিন্যাস**যায়নুল আবেদীন বিন নুমান**

সহকারী শিক্ষক, মাদরাসা ইশাআতুল ইসলাম আস-সালাফিয়াহ,

রাণীবাজার, রাজশাহী।

দাওরায়ে হাদীস (মুমতায়), বি.এ.অনার্স, ইসলামিক স্টাডিজ,

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রকাশনায়

কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর আলোকে রচিত তথ্য সমৃদ্ধ

কিতাব প্রকাশে সচেষ্ট ব্যতিক্রমধর্মী

ওয়াহীদিয়া ইসলামিয়া লাইব্রেরী

রাণীবাজার, (মাদরাসা মার্কেটের সামনে), রাজশাহী।

০১৭৩০-৯৩৪৩২৫, ০১৯২২-৫৮৯৬৪৫

ওয়েব: <http://wahidiyalibrary.blogspot.com>ইমেইল: wahidiyalibrary@gmail.com**গ্রন্থস্বত্ব**

লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রকাশকাল

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারী ২০১৭ ঈসাব্দী।

শুভেচ্ছা মূল্য - ৫৫০/= মাত্র



মুদ্রণ : দি বেঙ্গল প্রেস, রাণীবাজার, রাজশাহী। ☎ ০৭২১-৭৭৭৭৪৬১২

প্রারম্ভিকা

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ
 أَنْفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ
 يُضِلِّهِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ،
 وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

সকল প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলার জন্য, যিনি পরিপূর্ণ দ্বীন হিসাবে আমাদেরকে ইসলাম দান করেছেন, যে দ্বীনে মানুষের পক্ষ থেকে কোন সংযোজন বা বিয়োজনের প্রয়োজন হয় না। সালাত ও সালাম তাঁরই রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি, যিনি আল্লাহর দ্বীনের রিসালাতের দায়িত্ব পূর্ণাঙ্গভাবে আদায় করেছেন, কোথাও কোন কার্পণ্য করেননি। দ্বীন হিসাবে যা কিছু এসেছে তিনি তা উম্মতের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন ও নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করে গেছেন। তাঁর সাহাবায়ে কিরামের প্রতি আল্লাহর রাহমাত বর্ষিত হোক, যারা ছিলেন উম্মতে মুহাম্মাদীর আদর্শ ও আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহ পালনে সকলের চেয়ে অগ্রগামী। বিশ্বনবী মুহাম্মদ (ﷺ) যে আদর্শ পৃথিবীর মানুষের কাছে পেশ করেছেন তাই হচ্ছে সুন্নাহ। অন্যদিকে বিদ'আত শব্দটি আরবী হলেও সারা পৃথিবীর মুসলমানদের কাছে এটি একটি অতীব পরিচিত পরিভাষা। অর্থ ও প্রয়োগগত দিক থেকে এটি সুন্নাহের রিপরীত হিসেবে ব্যবহৃত হয়। অপ্রিয় হলে ও সত্য যে কালের পরিক্রমায় মুসলমানদের কথা-বার্তা ও আক্বীদা বিশ্বাসে প্রবেশ করেছে অসংখ্য বিদ'আত যা আজ গোটা মুসলিম মিল্লাতকে মহামারির ন্যায় করেছে বিপর্যস্ত। তাই আজ সুন্নাহ থেকে বিদ'আতকে আলাদা করা এবং বিদআতের সর্বনাশা ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে সমগ্র মুসলিম মিল্লাতকে অবহিত করণ একান্ত প্রয়োজন বলে মনে করি। আলোচ্য গ্রন্থটি তারই একটি ক্ষুদ্র প্রয়াস। মহান আল্লাহ

তা'আলা বলেন-আর এটি তো আমার সোজা পথ। সুতরাং তোমরা তার অনুসরণ কর এবং অন্যান্য পথ অনুসরণ করো না, তাহলে তা তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে। এ গুলো তিনি তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে তোমরা তাকওয়া অবলম্বন কর। শুধু তাই নয় আল্লাহ সুবহানাহ ওয়া তা'আলা পবিত্র কুরআনে আরও বলেছেন, “আজ তোমাদের জন্য দ্বীন কে পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের উপর আমার নিয়ামত সম্পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্য দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম ইসলামকে” [সূরা মায়দা, আয়াত নং - ৩]। উক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা রাসূল (ﷺ) কে জানিয়ে দেন, তিনি রাসূল (ﷺ) - এর মৃত্যুর পূর্বেই দ্বীন কে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা তার দ্বীন কে পূর্ণতা দান করার পর দ্বীনের মধ্যে কোন কিছু বাড়ানোর কোন অবকাশ নাই। অথচ আজকাল আমাদের দেশে দ্বীন ও শরীয়তের মধ্যে যে সকল বিদ'আত ও কুসংস্কার প্রবেশ করেছে এবং একাকার হয়ে আছে তা দূর করার লক্ষ্যেই আমার এ গ্রন্থটি লেখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। অতএব, আল্লাহ আমাদেরকে সকল প্রকার বিদ'আত ও কুসংস্কার মুক্ত সমাজ গড়ে উঠুক সেই প্রত্যাশা ও দোয়া কামনা করছি। আল্লাহ সুবহানাহ ওয়া তা'আলা আমাদের সেই দোয়া কুবল কুরন, আমীন। তাছাড়া যদি কেউ দ্বীনের মধ্যে কোন কিছু বাড়ান বা কমান তার অর্থ হল আল্লাহ দ্বীন কে পূর্ণতা দান করেননি। দ্বীন কে অসম্পূর্ণ ছেড়ে দিয়েছেন এবং অবশিষ্ট কাজের জন্য কোন মাখলুককে দায়িত্ব বা অধিকার দিয়েছেন? অথচ আজকাল মাযহাবপন্থীরা কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ বিরোধী যাল ও যঈফ হাদীসের উপর আমল করে এবং প্রচলিত বানোয়াট বিদ'আতী ও কুসংস্কারযুক্ত রসম অনুসরণ করা থেকে যেন বিরত থাকে এবং আমার লিখিত গ্রন্থটি পড়ে যেন সকল মুসলিম উম্মাহ এবং নামধারী মুসলিম উম্মাহরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করার প্রয়াস পায়। আল্লাহ আমাদের সবাইকে সঠিক পথে চলার তৌফিক দান করুন এবং এই অধর্মের লেখনীর প্রচেষ্টাকে কবুল করুন, আমীন। অধিকন্তু এই গ্রন্থটি প্রণয়নে যেসব গ্রন্থের সহায়তা নিয়েছি তা ফুটনোট আকারে গ্রন্থটিতে সংযোজন করেছি। তাছাড়া যেসব দ্বীনি ভাই ও বোন

এই গ্রন্থটি প্রণয়নে উৎসাহ ও বিভিন্ন সময়ে যেসব তত্ত্ব ও তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করেছেন হে আল্লাহ আপনি তাঁদেরকে যাযাকাল্লাহ খায়ের দান করুন, আমীন। এছাড়া পল্লবী, মিরপুর দারুস সুন্নাহ মাদরাসার সিনিয়র শিক্ষক শাইখ রবিউল ইসলাম বইটি সম্পাদনায়, শাইখ যয়নুল আবেদীন এবং নাজমুল ইসলাম আমার জুনিয়র বন্ধু যে ইসলামিক স্টাডিজ অধ্যয়নরত - আমাকে নানাবিধ তত্ত্ব ও তথ্য দিয়ে সার্বীক সহযোগিতা করেছেন যার দরুন সে সহ তাঁদের সবার কাছে আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। সর্বশেষে আমি মানুষ। ভুল হওয়া অস্বাভাবিক নয়। এ প্রসঙ্গে রাসূল (ﷺ) এর একটি হাদীস না উল্লেখ করলেই নয়। তিনি বলেছেনঃ

« كُلُّ ابْنِ آدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ »

‘প্রতিটি মানুষই ভুলকারী আর ভুলকারীদের মধ্যে তারাই উত্তম যারা তাওবাকারী।’ [তিরমিযী - ২৪২৩; আবদুর রাযযাক, মুসান্নাফ - ৩৫৩৫৭]। যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি নির্ভুলভাবে গ্রন্থটি প্রণয়নে। তারপরেও চোখের অগোচরে কিছু ভুলত্রুটি থেকে যাওয়া বিচিত্র কিছু নয়। সুতরাং, সম্মানিত পাঠক ও পাঠিকা বৃন্দ - আপনাদের চোখে ভুল ধরা পড়লে আমাদেরকে অবহিত করবেন ইনশাআল্লাহ পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করার চেষ্টা করব ইনশা আল্লাহ। অতএব, এই হাদীসের আলোকে পাঠকবৃন্দকে বলব যে, ছোটখাট ভুলগুলো আপনারা ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন সেই প্রত্যাশা করি।

সবশেষে সঠিক ইসলাম রক্ষার জন্য ও মুসলিম সমাজের কল্যানের জন্য আমার এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা। হে আল্লাহ আপনি এই অধমের ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে কবুল করুন এবং দ্বীনি খেদমতে আরও বেশি বেশি খেদমত করতে পারি তাঁর তৌফিক দান করুন, আমীন।

ধন্যবাদান্তে,

সাজ্জাদ সালাদীন

সূচীপত্র

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা নং
অধ্যায় - এক - বিদ'আত পরিচিতি	
প্রথম পরিচ্ছেদ - বিদ'আতের সংজ্ঞা	
বিদ'আত শব্দের বিশ্লেষণ	
বিদ'আতের আভিধানিক অর্থ	
বিদ'আতের পারিভাষিক অর্থ	
শরীয়াতের পরিভাষায় বিদ'আতের সংজ্ঞা	
কুরআন ও হাদীসে বিদ'আত শব্দের উল্লেখ	
আকায়েদ ও ফিকাহর দৃষ্টিতে বিদ'আত	
বিদ'আত সম্পর্কে প্রখ্যাত আলেমদের সংজ্ঞা	
বিদ'আত সম্পর্কে সাহাবায়ে কেরামদের অভিমত	
বিদ'আত সম্পর্কে তাবেরী ও তাবেরীগণের অভিমত	
বিদ'আত সম্পর্কে সালফে সালেহীনদের অভিমত	
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ - বিদ'আতের বৈশিষ্ট্য	
তৃতীয় পরিচ্ছেদ - বিদ'আত নির্ধারণে মানুষ সাধারণতঃ তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত	
চতুর্থ পরিচ্ছেদ - বিদ'আতের উপাদানসমূহ	
অধ্যায় - দুই - সুন্নাহ ও বিদ'আত পরিচিতি এবং প্রকারভেদ	
প্রথম পরিচ্ছেদ - সুন্নাহ পরিচিতি	
আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য	
সুন্নাহ একটি নিয়ামত	
শর্তযুক্ত নিয়ামত	

সুন্নাতের স্তর - সুন্নাত	
সুন্নাত ও বিদ'আতের অনুসারীর অবস্থান - সুন্নাতের অনুসারীর মর্যাদা	
সুন্নাতের অনুসারীদের বৈশিষ্ট্য - সুন্নাতের অনুসারীদের কতিপয় বৈশিষ্ট্য রয়েছে	
বিদ'আতের অনুসারীদের অবস্থান	
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ - সুন্নাত ও বিদ'আতের পার্থক্য	
তৃতীয় পরিচ্ছেদ - বিদ'আত হারাম	
চতুর্থ পরিচ্ছেদ - বিদ'আতের মৌলিক নীতিমালা	
পঞ্চম পরিচ্ছেদ - বিদ'আতের প্রকারভেদের অপব্যাখ্যা	
ইবাদতের ক্ষেত্রে কোনো বিদ'আত ই অনুমোদিত নয়	
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ - দ্বীনের ভিতর বিদ'আতে হাসানাহ বলে কিছু আছে কি?	
অধ্যায় - তিন - বিদ'আত প্রচলন, প্রকাশ, ধরন ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক আলোচনা	
প্রথম পরিচ্ছেদ - বিদ'আতের ধরন	
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ - বিদ'আত প্রচলন, বিদ'আত প্রকাশের অঞ্চল সমূহ, বিদ'আত অগ্রহণযোগ্য হওয়ার কারন এবং বিদ'আত উৎপত্তির কতিপয় কারণ	
বিদ'আতের প্রচলন	
বিদ'আত প্রকাশের অঞ্চল সমূহ	
বিদ'আত অগ্রহণযোগ্য হওয়ার কারন	
বিদ'আত উৎপত্তির কতিপয় কারণ	
তৃতীয় পরিচ্ছেদ - বিদ'আতের অপকারিতা	
চতুর্থ পরিচ্ছেদ - দ্বীনের মধ্যে বিদ'আতের বিধান	

পঞ্চম পরিচ্ছেদ - আমল কবুল হওয়ার শর্ত	
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ -- সুন্নাত আঁকড়ে ধরা এবং বিদ'আত থেকে সতর্ক থাকা ওয়াজিব	
অধ্যায় - চার - বিদ'আতের ব্যাপারে মুসলিম মিল্লাতের অবস্থান ও আলেমগণের প্রতিবাদ পদ্ধতি	
প্রথম পরিচ্ছেদ - বিদ'আতীদের ব্যাপারে মুসলিম মিল্লাতের আলেমদের অবস্থান	
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ - বিদ'আতীদের প্রতিবাদে আলেমগণের পদ্ধতি	
তৃতীয় পরিচ্ছেদ - যে ব্যক্তি কোন খতীবকে বিভ্রান্তির দিকে অথবা বিদ'আতের দিকে আহ্বান করতে শুনে তখন তার করণীয় কি	
অধ্যায় - পাঁচ - আমাদের দেশে উল্লেখযোগ্য বিদ'আত প্রসঙ্গে প্রাসঙ্গিক আলোচনা	
প্রথম পরিচ্ছেদ - শবে মেরাজের রাত্রি উদযাপন করা	
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ - মাহে শাবান ও শবে বরাত করণীয় ও বর্জনীয়	
শাবান মাসে রোজা রাখার বিধান	
হাদীসের দৃষ্টিতে শবে বরাত	
ফিকহের দৃষ্টিতে শবে বরাত	
শবে বরাত নামাযের প্রথম প্রচলন	
শবে বরাত নামাযের পদ্ধতি	
শবে বরাত নামাযের হুকুম	
ভ্রান্ত ধারণা ও সংশয় নিরসন	
শবে বরাতে কুরআন নাযিল হয়েছে বলে ধারণা	
শবে বরাতের রাতে আল্লাহ দুনিয়ার আকাশে নেমে আসার ধারণা	

মৃত ব্যক্তির রুহ দুনিয়াতে আগমনের বিশ্বাস	
হালুওয়া রুটির রহস্য	
এ রাতে কবর যিয়ারতের পিছনে যুক্তি ও তা খন্ডন	
মধ্যরাত্রির পরদিন কি রোযা রাখা যাবে	
নিসফে শাবানের নামায সম্পর্কে বিন বায (রহঃ) এর একটি ফতোয়া	
শবে বরাতের রোযা	
শবে বরাতের প্রচলন	
এখন প্রশ্ন আসে আমল করতে হলে কিভাবে করা যাবে?	
শাবানের মধ্যরজনীর ফযীলত সম্পর্কিত হাদীসসমূহের	
শাবানের মধ্যরজনীর সম্পর্কিত হাদীসসমূহ পর্যালোচনার সারকথা	
সৌভাগ্য রজনী ধর্ম বিকৃতির শামিল	
শবে বরাত সম্পর্কে মুসলিম উম্মাহর অবস্থান	
শবে বরাত সম্পর্কে একটি বিভ্রান্তির নিরসন	
সন্দেহজনক নফল 'আমল থেকে দূরে থাকা উত্তম	
তৃতীয় পরিচ্ছেদ - শারী'য়াতের দৃষ্টিতে 'ঈদে মীলাদুন্নবী বা মীলাদ মাহফিল	
ঈদে মীলাদুন্নবী'র শাব্দিক বিশ্লেষণ	
হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মদিন	
মীলাদুন্নবী বা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের	
জন্মদিবস পালন বা উদযাপন	
ঈদে মীলাদুন্নবীর প্রাথমিক উদযাপন - যুগ ও প্রবর্তক পরিচিতি	
ঈদে মীলাদুন্নবী ও মীলাদ আবিষ্কারের কাহিনী	
বাদশাহ্ চরিত্রের বর্ণনা দিতে গিয়ে কয়েকজন প্রখ্যাত আলেমদের উক্তি	

প্রচলিত মীলাদ - মাহফিল সম্পর্কে উলামায়ে কেরামের উক্তি	
প্রচলিত মীলাদ পন্থীদের দলীল-প্রমাণ ও তার খন্ডন	
সারকথা - মীলাদ মাহফিল করা বৈধ নয়	
চতুর্থ পরিচ্ছেদ - কিয়াম - নব আবিষ্কৃত বিদ'আত	
কিয়াম কাকে বলে	
কিয়াম প্রচলনের ইতিহাস	
সমাজ-সামাজিকতায় কিয়ামের হুকুম	
পঞ্চম পরিচ্ছেদ - কিয়াম সম্পর্কে বিদ'আতীদের বক্তব্য ও তার খন্ডন	
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ - বিয়ে সংক্রান্ত প্রচলিত কিছু বিদ'আত	
বিবাহে প্রচলিত কু-প্রথার তালিকা	
শরীয়তে বিবাহ বলতে কী বুঝায়	
অভিভাবক হওয়ার শর্ত	
বিবাহের তাৎপর্য	
নারীদের জন্য বিবাহ বাধ্যতামূলক কি না	
বিয়ের প্রস্তাব এবং তার নিয়ম	
ইসলামের তালাক বিধান	
তালাকের সহীহ পদ্ধতি	
হিন্মা বিয়ে ইসলাম বিরোধী ও নারীর প্রতি বৈষম্য তথা নব আবিষ্কৃত বিদ'আত	
সপ্তম পরিচ্ছেদ - নামাযের শুরুতে মুখে নিয়ত পাঠ করা	
নিয়তের গুরুত্ব	
মুখে উচ্চারণকৃত নিয়তের ক্ষতিকারক দিক সমূহ	
অষ্টম পরিচ্ছেদ - কতিপয় বিদ'আতী সালাত প্রসঙ্গে এবং জুম'আর দিনের বিদ'আত প্রসঙ্গে প্রাসঙ্গিক আলোচনা	

মা-বাপের জন্য নামায	
ঈদের রাতের নামায	
কাযা উমরী (উমরী কাযা)	
স্বালাতুল আওয়াবীন	
এহতিয়াতী যোহর	
স্বালাতুল হিফয	
মৃতের জন্য ঈসালে সওয়াবের নামায	
মনগড়া প্রাত্যহিক নামায ও তার খেয়ালী সওয়াব	
মনগড়া মাসিক নামায ও তার খেয়ালী সওয়াব	
মহররম মাসের খেয়ালী নামায	
সফর মাসের খেয়ালী নামায	
রবিউল আওয়াল মাসের খেয়ালী নামায	
রবিউস-সানী মাসের বিদ'আতী নামায	
জুমাদাল আওয়াল মাসের খেয়ালী নামায	
জুমাদাস সানী মাসের খেয়ালী নামায	
রজব মাসের খেয়ালী নামায	
শওয়াল মাসের খেয়ালী নামায	
যুলকাদাহ্ মাসের খেয়ালী নামায	
যুলহজ্জ মাসের খেয়ালী নামায	
জুমআর দিনের বিদ'আত প্রসঙ্গে প্রাসঙ্গিক আলোচনা	
জুম'আর সালাতের জন্য দুই আযান দেওয়া	
প্রচলিত জুমআর খুতবা এবং মাতৃভাষায় জুমআর খুতবা প্রসঙ্গে প্রাসঙ্গিক আলোচনা	
মাতৃভাষায় খুতবা দান না করার যুক্তি	
জুমআর সালাতে বিদ'আত ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক আলোচনা	

জুম'আর ফরজের আগে ও পরে কত রাকআত সালাত আদায় করব?	
জুম'আর সালাত পড়া অবস্থায় যদি কোন মুজাদির ওয়ু ছুটে যায় তখন তার করনীয়	
ঈদ ও জুম'আ একই দিনে হলে জুম'আ পড়ার হুকুম	
মহিলাদের জুম'আয় শরীক হওয়া	
নবম পরিচ্ছেদ - ফরয নামাযের আগে - পরে দলবদ্ধভাবে জিকির করা	
দশম পরিচ্ছেদ - ফরয সালাতের পরে সম্মিলিত মুনাজাতঃ একটি প্রচলিত বিদ'আত	
যে সকল স্থানে সহীহ হাদীস দ্বারা হাত তুলে দোয়া করার বিধান রয়েছে	
বৃষ্টি প্রার্থনার জন্য	
বৃষ্টি বন্ধের জন্য	
চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণের সময়	
উম্মাতের জন্য রাসূল (সাঃ) এর দোয়া	
কবর জিয়ারতের সময়	
কারো জন্য ক্ষমা চাওয়ার লক্ষ্যে হাত তুলে দোয়া	
হজ্জে পাথর নিক্ষেপের সময়	
যুদ্ধক্ষেত্রে	
কোন গোত্রের জন্য দু'আ করা	
সাফা মারওয়া সাযী করার সময়	
কুনুতে নাযেলার সময়	
হাত তুলে দু'আ করার অন্যান্য সহীহ হাদীস সমূহ	
হাত তুলে দু'আর প্রমাণে পেশকৃত যঈফ হাদীস সমূহ	

ফরয সালাতের পরে সম্মিলিতভাবে হাত তুলে দু'আ করা সম্বন্ধে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ আলেমদের অভিমত	
এগার তম পরিচ্ছেদ - পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের পর মুনাযাত	
সালাত শেষে যে সকল দু'আ ও জিকির হাদীস দ্বারা প্রমাণিত	
বার তম পরিচ্ছেদ - শাহাদাত আঙ্গুলে চুম্বন করা ও চোখে মাসাহ করা	
তের তম পরিচ্ছেদ - মৃত ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন বিদ'আত	
মৃত্যুর পরে সমাজে প্রচলিত আরও কতিপয় বিদ'আত সমূহ	
চৌদ্দ তম পরিচ্ছেদ - জানাযা নামাজ শেষে সম্মিলিতভাবে দু'আ-মুনাযাত	
মুক্তাদীদের কাতার কটা হবে?	
মুসল্লী সংখ্যা কত হওয়া উচিত?	
জানাযার নামাজ (صلاة الجنازة) পড়ার সহীহ নিয়ম	
আত্মহত্যাকারী, বেনামাযী ও ফাসেকের জানাযা	
গায়েবী জানাযা	
মসজিদে জানাযার নামায চলে কিনা?	
জানাযার ইমাম কে হওয়া উচিত?	
জানাযার নামাজের সময়ের করণীয়	
জানাযা নামাজ শেষে মুনাযাত	
পনের তম পরিচ্ছেদ - কবরে ফুল এবং ডাল পুঁতে দেওয়া	
শরীয়ত সম্মত নয় বরং বিদ'আত	
ষোল তম পরিচ্ছেদ - কবর পাকা করা	
সতের তম পরিচ্ছেদ - কবর ওয়ালা মসজিদে সালাত/নামাজ পরার হুকুম কি	
আঠার তম পরিচ্ছেদ - কুলখানি বা চল্লিশা পালন	

উনিশ তম পরিচ্ছেদ - মৃত্যুবার্ষিকী পালন করা	
বিশ তম পরিচ্ছেদ - রুহের মাগফেরাতের উদ্দেশ্যে ফাতিহা পাঠের বিদ'আত	
একুশ তম পরিচ্ছেদ - মৃত ব্যক্তির কাযা বা ছুটে যাওয়া নামাজ সমূহের কাফফারা আদায় করা	
বাইশ তম পরিচ্ছেদ - কবরে মান্নত পেশ, পশু যবেহ এবং খতমে কুরআনে বিদ'আত	
তেইশ তম পরিচ্ছেদ - কবরের কাছে বা মাযারে, পথের ধারে কুরআন পাঠ	
চব্বিশ তম পরিচ্ছেদ - সূফী তরিকা এবং তাদের সাথে অংশগ্রহণ	
পচিশ তম পরিচ্ছেদ - অলী আওলিয়াদের অসীলা গ্রহণ : ইসলামী দৃষ্টিকোণ	
ছাব্বিশ তম পরিচ্ছেদ - অসীলা গ্রহণ কী? এর বৈধতা কতটুকু?	
সাতাশ তম পরিচ্ছেদ - কাল্পনিক কারামত	
আঠাশ তম পরিচ্ছেদ - দুআ-মুনাজাতে নবী রাসূলের অসীলা দেয়া : একটি পর্যালোচনা	
উনত্রিশ তম পরিচ্ছেদ - আল্লাহকে পেতে মাধ্যম গ্রহণ ও বরকত হাসিল	
বরকত হাসিল - আত -তাবাররুফ	
বিভিন্ন শ্রেণীর কল্যাণকর বিষয়	
যা দ্বারা বরকত হাসিল নিষিদ্ধ	
রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কবর যিয়ারতের সহীহ নিয়ম	
নিষিদ্ধ জিনিস থেকে বরকত হাসিলের কারণ	
নিষিদ্ধ পন্থায় বরকত হাসিল প্রতিরোধের উপায়	

ত্রিশ তম পরিচ্ছেদ - পীর ব্যবসা বা পীরের মুরিদ হওয়া সর্ব নিকৃষ্ট বিদ'আত এবং তাসাউফ ও তাসাউফ বিস্তারের কারন এবং বিশদ আলোচনা	
তাসাউফ	
তাসাউফ বিস্তারের কারণ	
তাসাউফের প্রকারসমূহ	
বিভিন্ন ফিরকার সাথে তাসাউফের সম্পর্ক	
উম্মতে মুসলিমার উপর তাসাউফের প্রভাব	
একত্রিশ তম পরিচ্ছেদ - ওরস	
বত্রিশ তম পরিচ্ছেদ - উচ্ছে কঠে বা চিৎকার করে যিকির করা	
তেত্রিশ তম পরিচ্ছেদ - হালকায়ে যিকিরের অনুষ্ঠান করা	
চৌত্রিশ তম পরিচ্ছেদ - রাসূলের তাবলীগ বনাম প্রচলিত তাবলীগ	
ইলায়াসী তাবলীগ বনাম রাসূলের তাবলীগ এর পার্থক্য	
তাবলীগ জামাত এর গ্রন্থ (ফাযায়েল আমল)	
স্বপ্ন কি দলিল?	
স্বপ্নযোগে নবী করীম (সাঃ) কে দেখলেও এবং তার নিকট হতে কোনো নির্দেশ পেলেও তা পালন করার কোনো দায়িত্ব স্বপ্নদ্রষ্টারও নেই, নেই উম্মতের কোনো লোকেরও তথা পীর ফকিরেরও। কারন দ্বীন ইসলাম পরিপূর্ণ - স্বপ্নের ফয়সালা মেনে নেয়া কি যাবে - না কি এটা স্পষ্ট একটা বিদয়াত?	
চিল্লা প্রথা	
বিশ্ব ইজতেমা প্রসঙ্গ	
বিশ্ব বরণ্য আলিমগণের দৃষ্টিতে তাবলীগ জামা'আত ও তার নিসাব	
পয়ত্রিশ তম পরিচ্ছেদ - জন্মদিন পালন করা বিদ'আত	

জন্মদিন পালন এর সূচনা কাদের থেকে সৃষ্ট	
বিভিন্ন ধর্মে জন্মদিন পালনের বিধান প্রসঙ্গে	
ইসলামের ধর্মের দৃষ্টিতে জন্মদিন পালন শরীয়তসম্মত কি না?	
ছত্রিশ তম পরিচ্ছেদ - দুআকে অবহেলা করা ও আনুষ্ঠানিকতাকে উত্তম মনে করা	
সাইত্রিশ তম পরিচ্ছেদ - দানের ক্ষেত্রে সুন্নাত পদ্ধতির চেয়ে প্রচলিত আনুষ্ঠানিকতাকে গুরুত্ব প্রদান	
আটত্রিশ তম পরিচ্ছেদ - কোনো দিন বা মৃত্যু দিনকে নির্ধারণ করা	
উনচল্লিশ তম পরিচ্ছেদ - “স্বাদাক্বাল্লাহুল আযীম” (صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ) পড়া কি শরীয়ত সম্মত?	
চল্লিশ তম পরিচ্ছেদ - তাসবীহ গুনতে তাসবীহ - মালা ব্যবহার করা কি বিদ'আত	
একচল্লিশ তম পরিচ্ছেদ - হজ্জের বিদ'আতসমূহ	
বেআল্লিশ তম পরিচ্ছেদ - বিভিন্ন প্রকার প্রচলিত খতমে বিদ'আত	
খতমে কুরআন	
ঈসালে সওয়াবে সঠিক পদ্ধতি	
অভিজ্ঞতার দোহাই দিয়ে বৈধ করা	
খতমে বুখারী	
খতমে না-রী	
অজুহাত ও তার পর্যালোচনা	
খতমে ইয়াসিন	
‘ইয়াসিন’ খতমের একটি বানোয়াট পদ্ধতি	
প্রয়োজন পূরণে ইয়াসিনের খতম যার পদ্ধতি নিম্নরূপ	
খতমে শিফা	

খতমে তাহলীল	
খতমে তাসমিয়া	
খতমে খাজেগান	
খতমে জালালী	
খতমে দুরুদে মাহি	
সূরা ইখলাস দ্বারা কুরআন খতম	
তেতাল্লিশ তম পরিচ্ছেদ - মুহাররম মাসের সুন্নাহ ও বিদ'আত	
মুহাররম মাসের সুন্নাহী আমল	
আশুরার সিয়ামের ফযীলত	
আশুরার সিয়াম পালনের উদ্দেশ্য	
মুহাররম মাসের বিদ'আত সমূহ	
শাহাদতে হুসাইনের শোক পালনের উদ্দেশ্যে সিয়াম পালন করা	
১০ই মুহাররমকে আনন্দ উৎসবে পরিণত করা	
তা'যিয়া	
১০ই মুহাররমে চোখে সুরমা লাগানো	
১০ই মুহাররমে বিশেষ ফযীলতের আশায় বিশেষ পদ্ধতিতে সালাত আদায় করা	
তাবেঈ ইয়াযীদ বিন মু'আবিয়া-কে 'মালউন' বা অভিশপ্ত বলে গালি দেওয়া	
চৌতাল্লিশ তম পরিচ্ছেদ - পোশাক পরিচ্ছেদের বিদ'আত	
পয়তাল্লিশতম পরিচ্ছেদ - তওহীদি আকীদায় শিরক এর বিদ'আত	
ছেচাল্লিশতম পরিচ্ছেদ - কদমবুসির বিদ'আত	
সাতচাল্লিশতম পরিচ্ছেদ - শরীয়তের উৎস কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ এবং প্রচলিত ইজমা ও কিয়াস নব উদ্ভাবিত বিদ'আত	

শরীয়াহ্ কি	
ইসলামী শরীয়াহ্ এর দলীল ও উৎসসমূহ	
শরীয়াহ্ ও ইজতিহাদ	
শরীয়াহ্ কি উন্নয়ন ও আধুনিকতা বিরোধী?	
কতিপয় সংশয়ের অপনোদন	
অধ্যায় ছয় – প্রচলিত কুসংস্কার	
অধ্যায় সাত – বিদ'আত প্রসঙ্গে ব্রেলভী এর নসিহত, বিদ'আতের ভয়াবহতা ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক আলোচনা	
প্রথম পরিচ্ছেদ – বিদ'আত প্রসঙ্গে সাইয়েদ আহমদ ব্রেলভী (রহঃ) এর নসীহত	
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ – বিদ'আতীর পরিচয়, বিদ'আতী চেনার উপায়, বিদ'আতী কাজের পরিণতি সম্বন্ধে শরীয়তের ফয়সালা কি, বিদ'আতের ভয়াবহতা এবং দ্বীনের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করা	
তৃতীয় পরিচ্ছেদ – বিদ'আত প্রচলনে শয়তানের চক্রান্ত	
চতুর্থ পরিচ্ছেদ – বিদ'আতের নিন্দা, তিরস্কার ও তা থেকে সতর্কতা প্রদর্শন	
পঞ্চম পরিচ্ছেদ – বিদ'আত আবিষ্কারকের তাওবা	
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ – বিদ'আত চেনার ব্যাপারে একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি	
সপ্তম পরিচ্ছেদ – বিদ'আতের ভয়াবহতা	
অষ্টম পরিচ্ছেদ – দ্বীনের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করা	
নবম পরিচ্ছেদ – বিদ'আতের ব্যাপারে সাহাবীগণের অবস্থান	
দশম তম পরিচ্ছেদ – সালাফ ও সালাফিয়াতের অনুসরণ এবং বিদ'আত বর্জন	
এগার তম পরিচ্ছেদ – বিদ'আতের প্রভাবে জাতি কী হারিয়েছে?	

বার তম পরিচ্ছেদ - বিদ'আতের সর্বগ্রাসী ছোবল থেকে মুসলিম উম্মাহকে রক্ষা করতে হবে	
উপসংহার	
পরিশিষ্ট - ১ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী	

এই অধ্যায়ে যা থাকছে

অধ্যায় - এক - বিদ'আত পরিচিতি
প্রথম পরিচ্ছেদ - বিদ'আতের সংজ্ঞা
বিদ'আত শব্দের বিশ্লেষণ
বিদ'আতের আভিধানিক অর্থ
বিদ'আতের পারিভাষিক অর্থ
শরীয়াতের পরিভাষায় বিদ'আতের সংজ্ঞা
কুরআন ও হাদীসে বিদ'আত শব্দের উল্লেখ
আকায়েদ ও ফিকাহর দৃষ্টিতে বিদ'আত
বিদ'আত সম্পর্কে প্রখ্যাত আলেমদের সংজ্ঞা
বিদ'আত সম্পর্কে সাহাবায়ে কেরামদের অভিমত
বিদ'আত সম্পর্কে তাবেরী ও তাবেরীগণের অভিমত
বিদ'আত সম্পর্কে সালাফে সালাহীনদের অভিমত
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ - বিদ'আতের বৈশিষ্ট্য
তৃতীয় পরিচ্ছেদ - বিদ'আত নির্ধারণে মানুষ সাধারণতঃ
তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত
চতুর্থ পরিচ্ছেদ - বিদ'আতের উপাদানসমূহ

প্রথম পরিচ্ছেদ – বিদ'আতের সংজ্ঞা

আধুনিককালে অধিকাংশ লোকের ধারণা যা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম (ﷺ) এর যুগে ছিলনা তা-ই বিদ'আত। আবার অনেকে মনে করেন বর্তমান নিয়মতান্ত্রিক মাদ্রাসা শিক্ষা পদ্ধতি একটি বিদ'আত, মসজিদে কাতার করে নামায পড়া বিদ'আত, বিমানে হজে যাওয়া বিদ'আত, মাইকে আজান দেয়া বিদ'আত ইত্যাদি। এ সকল দিক বিবেচনা করে তারা বিদ'আতকে নিজেদের খেয়াল খুশি মত দুই ভাগ করে কোনটাকে হাসানাহ (ভাল বিদ'আত) আবার কোনটাকে সাইয়েআহ (মন্দ বিদ'আত) বলে চালিয়ে দেন। আসলে বিদ'আত সম্পর্কে সঠিক ধারণা না থাকার কারণে এ বিভ্রান্তি। তাই অধিকাংশ এ বিষয়টিকে এড়িয়ে যাওয়ার জন্য বিদ'আতকে দু'ভাগে ভাগ করার চেষ্টা করেন। যেমনঃ বিদ'আতে হাসানাহ ও বিদ'আতে সাইয়েআহ। সত্যি কথা হল বিদ'আতকে এভাবে ভাগ করাটা হল আরেকটি বিদ'আত এবং তা হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরিপন্থী। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. (رواه أبو

داود والترمذي وابن ماجه والبيهقي في السنن عن العرياض بن سارية

অর্থঃ সকল নব-আবিষ্কৃত (দীনের মধ্যে) বিষয় হতে সাবধান! কেননা প্রত্যেকটি নব-আবিষ্কৃত বিষয় বিদ'আত, আর প্রত্যেকটি বিদ'আত হল পথভ্রষ্টতা। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন সকল প্রকার বিদ'আত ভ্রষ্টতা। এখন যদি বলা হয় কোন কোন বিদ'আত আছে যা হাসানাহ বা উত্তম, তাহলে ব্যাপারটি সম্পূর্ণ হাদীস বিরোধী হয়ে যায়। এ কারনেই ইমাম মালিক (رحمته الله) বলেছেনঃ

১ আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ও বাইহাকী

من ابتدع فى الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمداً صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، فإن الله سبحانه وتعالى يقول (اليوم أكملت لكم دينكم) فما لم يكن يومئذ ديناً فلا يكون اليوم ديناً

অর্থঃ যে ব্যক্তি ইসলামের মধ্যে কোন বিদ'আতের প্রচলন করে আর এটিকে হাসানাহ বা ভাল বলে মনে করে, সে যেন প্রকারান্তরে এ বিশ্বাস পোষণ করে যে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর পয়গাম পৌঁছাতে খিয়ানাত করেছেন। কারণ আল্লাহ তা'আলা নিজেই বলেনঃ

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا سورة المائدة

‘আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্মকে পূর্ণ করে দিলাম’^২।
রাসূল (ﷺ) ও এ বিদ'আত প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বলেছেনঃ

وعن جابر، رضي الله عنه ، كان رسول الله، صلى الله عليه وسلم، إذا خطب أحمرت عيناه، وعلا صوته، واشتد غضبه، حتى كأنه منذر جيش يقول: "صبحكم ومساكم" ويقول: "بعثت أنا والساعة كهاتين" ويقرن بين أصبعيه؛ السبابة والوسطى، ويقول: "أما بعد؛ فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدى محمد، صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة" ثم يقول: "أنا أولى بكل مؤمن من نفسه. من ترك مالاً فلأهله، ومن ترك ديناً أو ضياعاً فإلى وعلى" (رواه مسلم).

وعن العرياض بن سارية، رضي الله عنه ، حديثه السابق في باب المحافظة على السنة
হযরত জাবির (رضي الله عنه) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বক্তৃতা করতেন, তখন তাঁর চোখ দু'টি লাল বর্ণ ধারণ করত, তাঁর কণ্ঠস্বর বুলন্দ হয়ে যেত এবং তাঁর রাগ বৃদ্ধি পেত; (তখন মনে হতো) তিনি যেন কোনো সেনাবাহিনীকে

সতর্ক করে দিচ্ছেন। তিনি বলতেনঃ ‘আল্লাহ তোমাদেরকে সকাল-সন্ধ্যায় (দিবা-রাত্র) ভালো রাখুক।’ তিনি আরো বলতেনঃ ‘আমাকে এবং কিয়ামতকে এই দুই আঙ্গুলের ন্যায় পাঠানো হয়েছে।’ একথা বলেই তিনি তাঁর মধ্যমা ও তর্জনী একত্র করতেন এবং বলতেনঃ অতপর সবচেয়ে ভালো বাণী হচ্ছে আল্লাহর কিতাব। আর সবচেয়ে ভালো নিয়ম হলো মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিয়ম। আর সবচেয়ে নিকৃষ্ট কাজ হলো (দ্বীনের ব্যাপারে) বিদ’আত --- নতুন কিছু সৃষ্টি করা। আর প্রতিটি বিদ’আত (নতুন সৃষ্টিই) হলো ভ্রষ্টতা। এরপর তিনি বলতেনঃ ‘আমি প্রতিটি মুমিনের জন্য তার নিজের চাইতেও উত্তম।’ যে ব্যক্তি পিছনে কোন সম্পদ রেখে যায়, তা তার পরিবারবর্গের জন্য। আর যে ব্যক্তি কোন ঋণ কিংবা রেখে যায় অসহায় সন্তান, তার দায়িত্ব আমারই ওপর বর্তায়^৩। সুতরাং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে যা ধর্ম রূপে গণ্য ছিল না আজও তা ধর্ম বলে গণ্য হতে পারে না। তাই বিদ’আতে হাসানাহ বলে কোন কিছু নেই।

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা বলেছেন আমরা তাই বলব; সকল প্রকার বিদ’আত গোমরাহী ও ভ্রষ্টতা। বিদ’আতে হাসানায় বিশ্বাসীরা যা কিছু সুন্নাতে হাসানাহ হিসাবে দেখাতে চান সেগুলো হয়ত শাব্দিক অর্থে বিদ’আত, শরয়ী অর্থে নয় অথবা সেগুলো সুন্নাতে হাসানাহ। যে সম্পর্কে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ

من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فله وزرها ووزر من رواه مسلم عن جرير). عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء (بن عبد الله رضي الله عنهما

অর্থঃ যে ইসলামে কোন ভাল পদ্ধতি প্রচলন করল সে তার সওয়াব পাবে এবং সে পদ্ধতি অনুযায়ী যারা কাজ করবে তাদের সওয়াবও সে পাবে, তাতে তাদের সওয়াবে কোন কমতি হবে না। আর যে ব্যক্তি ইসলামে কোন খারাপ পদ্ধতি প্রবর্তন করবে সে তার পাপ বহন করবে এবং যারা সে পদ্ধতি অনুসরণ করবে তাদের পাপও সে বহন করবে, তাতে তাদের পাপের কোন কমতি হবে না^৪। এখানে একটা প্রশ্ন হতে পারে যে, শবে বরাত উদযাপন, মীলাদ মাহফিল, মীলাদুন্নবী প্রভৃতি আচার - অনুষ্ঠানকে কি সুন্নাতে হাসানাহ হিসাবে গণ্য করা যায় না? মাইকে আজান দেয়া, মাদ্রাসার পদ্ধতি প্রচলন, আরবী ব্যাকরণ শিক্ষা ইত্যাদি কাজগুলো যদি সুন্নাতে হাসানাহ হিসাবে ধরা হয় তাহলে শবে বরাত, মীলাদ, তাবলীগ জামাত ইত্যাদিকে কেন সুন্নাতে হাসানাহ হিসাবে গ্রহণ করা যাবে না? পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে, বিদ'আত হবে ধর্মীয় ক্ষেত্রে। যদি নতুন কাজটি ধর্মের অংশ মনে করে অথবা সওয়াব লাভের আশায় করা হয়, তাহলে তা বিদ'আত হওয়ার প্রশ্ন আসে। আর যদি কাজটি ধর্মীয় হিসাবে নয় বরং একটা পদ্ধতি হিসাবে করা হয় তাহলে তা বিদ'আত হওয়ার প্রশ্ন আসে না। যেমন ধরুন মাইকে আজান দেয়া। কেউ মনে করেনা যে, মাইকে আজান দিলে সওয়াব বেশী হয় অথবা মাইক ছাড়া আজান দিলে সওয়াব হবে না। তাই সালাত ও আজানের ক্ষেত্রে মাইক ব্যবহারকে বিদ'আত বলা যায় না। কিন্তু এখানে উদ্দেশ্য হল এর দ্বারা উম্মত উপকৃত হবে কিন্তু নিজে মাইক ব্যবহারের কারণে সরাসরি কোনো উপকার পাচ্ছে না। এদিক থেকে চিন্তা করে দেখলে ঐ কাজটা করলে সওয়াবও হতে পারে, কেননা তিনি কাউকে ডাকছেন যে অন্যকাজে ব্যস্ত আছে এবং এই মাইক ব্যবহারের ফলে ঐ কর্মরত ব্যক্তি

সালাহ আদায় করতে পারছে। মূলত ডাকা উদ্দেশ্য। তাই এটা বিদ'আত নয় বরং সুন্নাতে হাসানা। তাই বলতে হয় বিদ'আত ও সুন্নাতে হাসানার মধ্যে পার্থক্য এখানেই যে, কোন কোন নতুন কাজ ধর্মীয় ও সওয়াব লাভের নিয়াত হিসাবে করা হয় আবার কোন কোন নতুন কাজ দ্বীনি কাজ ও সওয়াবের নিয়াতে করা হয় না বরং সংশ্লিষ্ট কাজটি সহজে সম্পাদন করার জন্য একটা নতুন পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়। যেমন আমরা যদি ইতিপূর্বে উল্লিখিত হাদীসটির প্রেক্ষাপটের দিকে তাকাই তাহলে দেখতে পাই যে, একবার মুদার গোত্রের কতিপয় অনাহারী ও অভাবগ্রস্থ লোক আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এলো। তিনি সালাত আদায়ের পর তাদের জন্য উপস্থিত লোকজনের কাছে সাহায্য চাইলেন। সকলে এতে ব্যাপকভাবে সাড়া দিলেন। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কিরামের আগ্রহ ও খাদ্য সামগ্রী দান করার পদ্ধতি দেখে উল্লিখিত কথাগুলো বললেন। অভাবগ্রস্থদের সাহায্যের জন্য যে পদ্ধতি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে ওটাকে সুন্নাতে হাসানাহ বলা হয়েছে। বলা যেতে পারে, সকল পদ্ধতি যদি হাসানাহ হয় তাহলে সুন্নাতে সাইয়েয়াহ বলতে কি বুঝাবে? উত্তরে বলব, মনে করুন কোন দেশের শাসক বা জনগণ প্রচলন করে দিল যে এখন থেকে স্থানীয় ভাষায় আজান দেয়া হবে, আরবী ভাষায় দেয়া চলবে না। এ অনুযায়ী 'আমল করা শুরু হল। এটাকে আপনি কি বলবেন? বিদ'আত বলতে পারবেন না, কারণ যারা এ কাজটা করল তারা সকলে জানে অনারবী ভাষায় আজান দেয়া ধর্মের নির্দেশ নয় এবং এতে সওয়াবও নেই। তাই আপনি এ কাজটাকে সুন্নাতে সাইয়েয়াহ হিসাবে অভিহিত করবেন। এর প্রচলনকারী পাপের শাস্তি প্রাপ্ত হবে, আর যারা 'আমল করবে তারাও। আবার অনেক উলামায়ে কিরাম বিদ'আতকে অন্যভাবে দু ভাগে ভাগ করে থাকেন। তারা বলেন বিদ'আত দু প্রকার। একটা

হল বিদ'আত ফিদ্বীন (البدعة في الدين) বা ধর্মের ভিতর বিদ'আত। অন্যটা হল বিদ'আত লিদ্বীন (البدعة للدين) অর্থাৎ ধর্মের জন্য বিদ'আত। প্রথমটি প্রত্যাখ্যাত আর অন্যটি গ্রহণযোগ্য। আমার মতে এ ধরনের ভাগ নিশ্চয়োজন বরং তা বিভ্রান্তি- সৃষ্টিতে সহায়ক। কারণঃ

প্রথমতঃ আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন সকল বিদ'আত পথভ্রষ্টতা বা গোমরাহী। এতে উভয় প্রকার বিদ'আত শামিল।

দ্বিতীয়তঃ অনেকে বিদ'আত ফিদ্বীন করে বলবেন, আমি যা করেছি তা হল বিদ'আত লিদ্বীন। যেমনঃ কেহ মীলাদ পড়লেন। অতঃপর যারা এর প্রতিবাদ করলেন তাদের সাথে তর্কে লিপ্ত হয়ে অনেক দূর যেয়ে বললেন, মীলাদ পড়া হল বিদ'আত লিদ্বীন। এর দ্বারা মানুষকে ইসলামের পথে ডাকা যায়। আসলে যা বিদ'আত লিদ্বীন বা দ্বীনের স্বার্থে বিদ'আত তা শরীয়তের পরিভাষায় বিদ'আতের মধ্যে গণ্য করা যায় না। সেগুলোকে সুন্নাতে হাসানাহ হিসাবে গণ্য করাটাই হাদীসে রাসূল দ্বারা সমর্থিত।

সম্মানিত পাঠক ও পাঠিকাবৃন্দ! বিদ'আত সম্পর্কে এ কথাগুলো এখানে এ জন্য আলোচনা করলাম যাতে আলোচ্য বিষয়ের উপর কোন প্রশ্ন বা বিভ্রান্তি-র সৃষ্টি হলে তার সমাধান যেন পাঠকবৃন্দ সহজে অনুধাবন করতে পারেন। বিদ'আতের কুফল এমন অনেকের সাক্ষাত পাবেন যারা ইসলামী চেতনায় সমৃদ্ধ। তাই কেউ কেউ বলেন যে, বিদ'আতের বিরোধিতায় এত বাড়াবাড়ির কি দরকার? কেহ একটু মীলাদ পড়লে, কুলখানি বা চল্লিশা-চেহলাম পালন কিংবা এ জাতীয় কিছু করলে দ্বীন ইসলামের কি এমন ক্ষতি হয়ে যায়? উদাহরন হিসাবে বলা যায় যে, আমি একদিন এক মসজিদের ইমাম সাহেবের বক্তব্য শুনছিলাম। তিনি বলছিলেন শবে মিরাজ উপলক্ষে এ রাতে কোন বিশেষ সালাত, ইবাদাত-বন্দেগী বা সিয়াম নেই।

যদি শবে মিরাজ উপলক্ষ্যে কোন 'আমল করা হয় তা বিদ'আত হিসাবেই গণ্য হবে। তার এ বক্তব্য শেষ হতে না হতেই কয়েকজন শিক্ষিত শ্রেণীর মুসল্লী বলে উঠলেন, হুজুর এ কি বলেন! রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুহাব্বতে এ রাতে কিছু করলে বিদ'আত হবে কেন? প্রশ্নকারী লোকগুলো যে বিভ্রান্ত বা বিদ'আতপন্থী তা' নয়। তাদের খারাপ কোন উদ্দেশ্য নেই। তারা যা করার ইচ্ছা করেছেন, সেটার ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে তাদের ধারণা নেই। অবশ্যই রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুহাব্বত ঈমানের অঙ্গ। আর সব ধরনের মুহাব্বতেই আবেগ থাকে। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুহাব্বতেও থাকবে। সেই আবেগ যেন মুহাব্বতের নীতিমালা লংঘন না করে। সেই আবেগভরা মুহাব্বত যেন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদর্শ ও সুন্নাহর বিরুদ্ধে ব্যবহৃত না হয়।

বিদ'আতের সংজ্ঞাঃ

শাব্দিক অর্থে বিদ'আত (بِدْعَة):

বিদ'আত (بِدْعَة) এর শাব্দিক অর্থ হলো অভূতপূর্ব ও নতুন কোন বিষয়। অর্থাৎ বিদ'আত শব্দের শাব্দিক অর্থ নব উদ্ভাবন। এ শব্দটি শাব্দিক অর্থে সাধারণত কর্তার পূর্ণতা ও সৃষ্টিশীল বৈশিষ্ট্যের ইঙ্গিতবহ। (بِدْعَة) শব্দের অর্থ হলো অভিনব ও নজীরবিহীন। এ শব্দটি যখন মহান আল্লাহর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় তখন তার অর্থ হলো মহান আল্লাহ বিশ্বকে কোন পূর্ববর্তী নজীর ছাড়াই কারো সাহায্য ব্যতীত ও কোন প্রাথমিক উপাদান ভিন্নই সৃষ্টি করেছেন অর্থাৎ তিনি সৃষ্টির ক্ষেত্রে কোন নমুনারই অনুসরণ করেন নি। (অভিধান গ্রন্থসমূহ দ্রষ্টব্য - আল আইন, মুফরাদাত লি রাগিব ইসফাহানী, লি

সানুল আরাব প্রভৃতি, 'بدع' ধাতু)। বিদ'আত শব্দের মূল ধাতু হলো 'بدع' এর অর্থ কোন উপমা ছাড়াই নতুন কিছু সৃষ্টি করা^৫। যেমন কুরআনে এসেছে: **بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ** - অর্থঃ আসমান ও যমীন সৃষ্টিকারী^৬। মূলতঃ শাব্দিক অর্থে বিদ'আত (البدع) থেকে উদ্ভূত। তাছাড়া 'আরবী "বিদ'উন" ধাতু থেকে "বিদ'আহ" বা "বিদ'আতুন" শব্দটি গৃহীত। "বিদ'উন" অর্থ হলো - অপূর্ব আবিষ্কার বা পূর্ববর্তী কোন নমুনা অনুসরণ ব্যতীত নব-আবিষ্কার বা নব-উদ্ভাবন। সুতরাং, এখানেও বিদ'আতের আভিধানিক অর্থ প্রযোজ্য। অতএব, উপরোক্ত আলোচনা থেকে বলা যায় যে, "বিদ'উন" থেকে উদগত "বিদ'আত" শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো - অপূর্ব আবিষ্কৃত বিষয়, পূর্ববর্তী কোন নমুনা অনুসরণ ব্যতীত নতুন আবিষ্কৃত বিষয় কিংবা প্রথম আবিষ্কৃত বিষয়। প্রচলন আছে: **ابتدع فلان بدعة** অর্থাৎ এমন পদ্ধতি শুরু করেছে যা ইতিপূর্বে কেউ করেনি।

বিদ'আত শব্দের বিশ্লেষণ -

(১) বাদিউন (بديع) শব্দের অর্থ সৃষ্টি করাঃ এমন কিছু সৃষ্টি করা যার কোন অস্তিত্ব বা নজির আগে ছিল না। আমাদের এই বিশ্বজগতের কোন অস্তিত্ব ছিল না, মহান আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করেন সেহেতু আল্লাহ তা'আলার এক সিফাতি নাম হলোঃ বাদিউল আলম।

(২) বাদউন (بديع) শব্দের অর্থ আবিষ্কার করাঃ কোন বস্তু আমাদের অজ্ঞাত ছিল তা আবিষ্কার করা হয়েছে। আমেরিকা মহাদেশ কলম্বাস

৫ আল-ইতিসাম - শাভেবী (রঃ) : ১/৪৯

৬ সূরা আনআম, আয়াত - ১০১

তা আবিষ্কার করেছেন, ভূ-গর্ভতে খনিজ পদার্থ বের করাকে বাদউন বলা হয়।

(৩) বিদ'উন (بدیع) শব্দের অর্থ উদ্ভাবন করাঃ মহান আল্লাহর সৃষ্ট বস্তুর সাহায্যে নতুন কিছু আবিষ্কার করা, মহান আল্লাহর দেয়া বিভিন্ন খনিজ পদার্থ যেমনঃ লৌহ, স্বর্ণ, রৌপ্য, পেট্রোল, ডিজেল, কাঠ, বাঁশ, মাটি, পানি, পাথর ইত্যাদির সাহায্যে বৈজ্ঞানিক কারিগর, প্রস্তুতকারীগণ বিভিন্ন প্রকার বস্তু তৈরী করেছেন। যেমনঃ বিদ্যুৎ, রেডিও, টেলিভিশন, কম্পিউটার, ফ্রিজ, টেলিফোন, এরোপ্লেন ইত্যাদি তৈরী করাকে বলা হয় বিদউন। ধর্ম নির্বিশেষে সব মানুষগণ এগুলো ব্যবহার করে থাকেন। এতে দ্বীন ইসলামে পাপ বা সাওয়াবের কিছু নেই। এ ক্ষেত্রে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলা পবিত্র কুরআনে সয়ং সূরা আস-সাফফাতের ৯৬নং আয়াতে উল্লেখ করেছেনঃ

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ

‘অথচ আল্লাহই তোমাদেরকে এবং তোমরা যা কর তা সৃষ্টি করেছেন’?৭

(৪) বিদ'আতুন (بدعة) শব্দের অর্থঃ দ্বীনের ক্ষেত্রে ইসলামে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যত কিছু আমাদের দিয়েছেন তাতেই ইসলাম সয়ংসম্পূর্ণ। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর ইন্তেকালের পর দ্বীন ইসলামের নামে সাওয়াবের আশায়ে যে কোন নতুন প্রথা, রসম-রেওয়াজ প্রচলন করার নামই হলো বিদ'আতুন' বা বিদ'আত'। শরয়ী পরিভাষায় বিদ'আত বলা হয় -

ما أحدث في الدين على خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من عقيدة وعمل.

৭ সূরা আস-সাফফাত, আয়াত নং - ৯৬

৮ ইন্জিনিয়ার শামসুদ্দীন আহমাদ - ফিকহে ইসলাম বনাম দ্বীন ইসলাম, পৃষ্ঠা নং - ৮৩

'দ্বীনের মধ্যে রাসূল (ﷺ) ও সাহাবা কর্তৃক প্রবর্তিত আক্দিদা ও আমল পরিপন্থী নতুন আক্দিদা ও আমলের প্রচলন ঘটানো।' অধিকন্তু বলা যায় যে, মহান আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা'য়ালা'র ঘোষণায় দ্বীন ইসলাম ১৪০০ বৎসর আগেই সম্পূর্ণ। কারন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন যেঃ আমি এই কিতাবে কোন কিছু উল্লেখ করতে বাদ দেই নি।^৯ আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা'য়ালা আরও বলেছেন যে, "রাসূল (ﷺ) তোমাদের জন্যে যা এনেছেন বিনাশর্তে গ্রহণ কর, আর তা থেকে বিরত থেকে থাক যা তিনি নিষেধ করেছেন"^{১০}।

উপরোক্ত পবিত্র কুরআনের আয়াতটি সহীহ হাদীসেও এসেছে।

নিম্নে হাদীসটি উপস্থাপন করা হলোঃ-

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا»

সুনানু ইবনে মাজাহ :: হাদীস ১ [রাসুলুল্লাহ (ﷺ) - এর সুন্নতের বিবরণ অধ্যায়]^{১১}। আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আমি তোমাদেরকে যা আদেশ দেই, তোমরা তা গ্রহণ করো এবং যে বিষয়ে তোমাদেরকে নিষেধ করি তা থেকে বিরত থাকো^{১২}। বিদআত (البدع) শব্দটি হাদীস গ্রন্থসমূহে সাধারণত শরীয়ত ও সুন্নাতের বিপরীতে ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ এমন কিছু করা যা

৯ সূরা আনআম, আয়াত নং - ৩৮

১০ সূরা হাশর, আয়াত নং - ৭

১১ সুনানু ইবনে মাজাহ - হাদীস ১ [রাসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর সুন্নতের বিবরণ অধ্যায়]

১২ তাখরীজ কুতুবুত তিসআহ: বুখারী ৭২৮৮, মুসলিম ১৩৩৭, তিরমিযী ২৬৭৯, আহমাদ ৭৩২০, ৭৪৪৯, ৮৪৫০, ৯২২৯, ৯৪৮৮, ৯৫৭৭, ২৭২৫৮, ৯৮৯০, ২৭৩১২, ১০২২৯, ইবনু মাজাহ ২। তাহকীক আলবানী: সহীহ। তাখরীজ আলবানী: ইরওয়াউল গালীল ১৫৫, ৩১৪; সহীহাহ ৮৫০।

ইসলামী শরীয়ত ও মহানবী (ﷺ) - এর সুন্নাতের পরিপন্থী বলে গণ্য। হযরত আলী (রাঃ) বলেছেনঃ

إِنَّمَا النَّاسُ رَجُلَانِ مَتَّبِعِ شَرْعَهُ وَمُبْتَدِعِ بَدْعَهُ

অর্থাৎ ‘মানুষ দু’ ধরনের হয় যেমনঃ শরীয়তের অনুসারী নতুবা ধর্মের মধ্যে নতুন কিছু উদ্ভাবক’^{১৩}। অন্যত্র তিনি মহানবীর নবুওয়াত সম্পর্কে বলেছেনঃ

إِظْهَرِ بِهِ الشَّرَائِعَ الْمَجْعُولَةَ وَقَمْعِ بِهِ الْبَدْعَ الْمَدْخُولَةَ

‘মহান আল্লাহ মহানবীর মাধ্যমে মানব জাতিকে তাদের অজানা ও ভুলে যাওয়া শরীয়তের সাথে পরিচিত করিয়েছেন (অজানা বিধান সমূহকে তাদের সামনে প্রকাশ করেছেন) এবং পূর্ববর্তী শরীয়ত সমূহের মধ্যে যে বিদআত ও নব উদ্ভাবিত বিষয়সমূহ সংযোজিত হয়েছিল তা হতে পরিশুদ্ধ করেছেন।’^{১৪} অন্যত্র হযরত আলী (রাঃ) বলেছেনঃ

مَا أَحْدَثْتُ بَدْعًا إِلَّا تَرَكَ بِهَا سَنَةً

এমন কোন বিদআতই (নব উদ্ভাবিত বিষয়ই) শরীয়তে প্রবেশ করে নি যার দ্বারা কোন না কোন সুন্নাত উপেক্ষিত ও পদদলিত না হয়েছে’^{১৫}। উদাহরন হিসাবে বলা যায় যে, সারা রাত জেগে নিদ্রা পরিহার করে কিয়ামুল লাইল এর মাধ্যমে এবং ভঙ্গ না করে সারা বছর সাওম রাখার মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা এবং অনুরূপভাবে স্ত্রী, পরিবার ও সংসার ত্যাগ করে বৈরাগ্যবাদের ব্রত গ্রহণ করা। সহীহ বুখারীতে আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) এর

১৩ নাহজুল বালাগা, খুতবা নং ১৭৬

১৪ প্রাগুক্ত, খুতবা নং ১৬১

১৫ প্রাগুক্ত, খুতবা নং ১৪৫

হাদীসে যারা সারা বছর সাওম রাখার ও বিবাহ করে সংসার ধর্ম পালন না করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছিল তাদের উদ্দেশ্যে রাসূল (ﷺ) বলেছিলেনঃ “আমি তোমাদের মধ্যে আল্লাহর প্রতি সবচেয়ে বেশী ভয় পোষণ করি এবং তাকওয়া অবলম্বনকারী। কিন্তু আমি সওম পালন করি ও ভাঙ্গি, সালাত আদায় করি ও নিদ্রা যাপন করি এবং নারীদের বিবাহ করি। যে আমার এ সুন্নাত থেকে বিরাগভাজন হয়, যে আমার দলভুক্ত নয়।”

বিদআতের আভিধানিক অর্থঃ

বিদআত (البدعة) শব্দটি باب فتح এর মাসদার, অভিধানে এর কয়েকটি অর্থ পাওয়া যায়। যেমন-

- (১) নতুন সৃষ্টি।
- (২) অভিনব কোনো কিছু তৈরী করা।
- (৩) দৃষ্টান্ত বিহীন সৃষ্টি।
- (৪) ধর্মে নতুন কিছু আবিষ্কার করা ইত্যাদি।

A Dictionary of Modern written Arabic এ বিদআত সম্পর্কে বলা হয়েছে Newness/Novelty (নতুনত্ব/অভিনবত্ব)। এ দৃষ্টিকোন থেকে আল্লাহ হুছেন بدیع কারণ তিনি অস্তিত্বহীন থেকে সৃষ্টি করেন, তাই তাকে بدیع বলা হয়। আল-মুনজিদ ফিল-লুগাতি ওয়াল আ'লাম এ বলা হয়েছে-

هـى كل ما احدث على غير مثال سبق

“প্রত্যেক নতুন উদ্ভাবিত জিনিস যার কোন পূর্ব দৃষ্টান্ত নেই”।

الشيء المخترع على غير مثال سابق ومنه قوله تعالى (قل ما كنت بدعا من الرسل)
(وجاء على هذا المعنى قول عمر رضي الله عنه (نعمت البدعة

অর্থঃ পূর্বের দৃষ্টান্ত ব্যতীত নতুন সৃষ্ট কোন বিষয় বা বস্তু। যেমনঃ উমার (রাঃ) তারাবীহর জামআত কায়েম করে বলেছিলেন “এটা উত্তম বিদ’আত।” এখানেও বিদ’আতের আভিধানিক অর্থ প্রযোজ্য। অধিকন্তু আরও বলা যায় যে, সাধারণ ভাবে সুন্নতের বিপীরত বিষয়কে বিদাত বলে।

আর শার’ঈ ভাবে বিদ’আত হলো “আল্লাহর নৈকট্য হাসিলের উদ্দেশ্যে ধর্ম এর নামে নতুন কোন প্রথা বা ইবাদতের প্রচলন করা যা শরীয়াতের কোন সহীহ দলীল-প্রমানের উপর ভিত্তিশীল নয়।”^{১৬}

الشَّيْءُ الْمُخْتَرَعُ عَلَى غَيْرِ مِثَالٍ سَابِقٍ

অর্থাৎ পূর্ববর্তী কোন নমুনা ছাড়াই নতুন আবিষ্কৃত বিষয়^{১৭}।

আর শরীয়তের পরিভাষায় বলা যায় যে -

مَا أُحْدِثَ فِي دِينِ اللَّهِ وَلَيْسَ لَهُ أَصْلٌ عَامٌّ وَلَا خَاصٌّ يَدُلُّ عَلَيْهِ

অর্থাৎ আল্লাহ্ দ্বীনের মধ্যে নতুন করে যার প্রচলন করা হয়েছে এবং এর পক্ষে শরীয়তের কোন ব্যাপক ও সাধারণ কিংবা খাস ও সুনির্দিষ্ট দলীল নেই।^{১৮}

উপরোক্ত সংজ্ঞাটিতে তিনটি বিষয় লক্ষণীয় যা নিম্নে উপস্থাপন করা হলোঃ-

১. নতুন ভাবে প্রচলন অর্থাৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কিরামের যুগে এর কোন প্রচলন ছিল না এবং এর কোন নমুনাও ছিল না।

^{১৬} আল ইতিসাম ১/১০ পৃষ্ঠা

^{১৭} আন-নিহায়াহ্, পৃষ্ঠা: ৬৯, কাওয়ায়েদ মা’রিফাতিল বিদআ’হ, পৃষ্ঠা নং - ১৭

^{১৮} কাওয়ায়েদ মা’রিফাতিল বিদআ’হ, পৃষ্ঠা নং - ২৪

২. এ নব প্রচলিত বিষয়টিকে দ্বীনের মধ্যে সংযোজন করা এবং ধারণা করা যে, এটি দ্বীনের অংশ।

৩. নব প্রচলিত এ বিষয়টি শরীয়তের কোন 'আম বা খাস দলীল ছাড়াই চালু ও উদ্ভাবন করা।

সংজ্ঞার এ তিনটি বিষয়ের একত্রিত রূপ হল বিদ'আত যা থেকে বিরত থাকার কঠোর নির্দেশ শরীয়তে এসেছে। কঠোর নিষেধাজ্ঞার এ বিষয়টি হাদীসে বারবার উচ্চারিত হয়েছে।

বিদ'আতের পারিভাষিক অর্থঃ

বিদ'আত শব্দের শাব্দিক অর্থ নব উদ্ভাবন। প্রখ্যাত ভাষাবিদ ইবনু মানযুর লিখেনঃ “বিদ'আত অর্থ - নতুন সৃষ্ট এবং দীনের পূর্ণতার পর যা উদ্ভাবন করা হয়েছে”।^{১৯} দ্বিতীয় অর্থটি মূলতঃ পারিভাষিক। ইবনু ফারিস^{২০}- বিদ'আতের অর্থ লিখেনঃ পূর্ব নমুনা ব্যতিরেকে কোনো কিছু সৃষ্টি করা, শুরু করা বা প্রচলন করা।^{২১} লিসানুল আরব অভিধান থেকে আমরা শাব্দিক অর্থের সাথে সাথে বিদআতের পারিভাষিক অর্থ জানতে পেরেছি। আরেকটু স্পষ্ট হওয়ার জন্য ফিকহী পরিভাষায় বিদ'আতের যে সংজ্ঞা দেওয়া হয় তা উল্লেখ করা হলঃ

"البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية". (الاعتصام، الباب الأول في تعريف البدع وبيان معناها... 1-26)

১৯ ইবনু মানযুর, লিসানুল আরব, মাদ্দাহ 'ع' ৮/৬।

২০ আরবী ভাষা ও সাহিত্যের ইমাম আবুল হুসাইন আহমদ ইবনু ফারিস ইবন যাকারিয়া আল-কাযবীনি আর-রাযি, ৩২৯-৩৯৫ হিজরী, ৯৪১-১০০৪ ঈসাব্দী।

২১ ইবনু ফারিস, মু'জামু মাক্বায়িসিল লুগাহ, মাদ্দাহ 'ع' ১/২০৭, লিসানুল আরব, প্রাগুক্ত।

“বিদ’আত হচ্ছে, দীনের মধ্যে আবিষ্কৃত পদ্ধতি, যা শরয়ী পদ্ধতির সামঞ্জস্য, এই পদ্ধতির উপর চলার সেই উদ্দেশ্য যা শরয়ী পদ্ধতির উপর চলার উদ্দেশ্য।”^{২২} কেউ কেউ বলেনঃ “দীনের মধ্যে আবিষ্কৃত পদ্ধতি যা শরয়ী পদ্ধতির সামঞ্জস্য, এই পদ্ধতির উপর চলার উদ্দেশ্য হলোঃ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা’আলার ইবাদতের মধ্যে বৃদ্ধি করা।”^{২৩}

শরীয়াতের পরিভাষায় বিদ’আতের সংজ্ঞা

১। ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় বিদ’আতের সংজ্ঞা নিম্নরূপ আলোচনা করা হলোঃ-

ما أحدث في دين الله وليس له أصل عام ولا خاص يدل عليه

‘যা কিছু আল্লাহর দ্বীনে নতুন সৃষ্টি করা হয় অথচ এর সমর্থনে কোন ব্যাপক বা বিশেষ দলীল প্রমাণ নেই। অর্থাৎ নব সৃষ্ট বিষয়টি অবশ্যই ধর্মীয় ব্যাপারে হতে হবে। যদি ধর্মীয় ব্যাপার ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে নব-আবিষ্কৃত কিছু দেখা যায় তা শরীয়তের পরিভাষায় বিদ’আত বলে গণ্য হবে না, যদিও শাব্দিক অর্থে তা বিদ’আত।

২। এ প্রসঙ্গে আবুল হাসান আলী নদভী (রহঃ) তাঁর ‘শরিক ও বিদ’আত’ কিতাবে বিদ’আতের পরিচ্ছন্ন সংজ্ঞা উল্লেখ করেছেন - তা হল - যে বিশ্বাস বা কাজ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত করেননি কিংবা পালন করার নির্দেশ দেননি সেই ধরনের বিশ্বাস বা কাজকে দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত করা, এর

^{২২} আবু ইসহাক ইবরাহিম ইবনু মুসা আশ-শাতিবী আল-মালিকী, প্রথম অনুচ্ছেদ, ১/২৬।

^{২৩} প্রাগুক্ত।

অঙ্গ বলে সাব্যস্ত করা, সওয়াব বা আল্লাহর নৈকট্য লাভের উপায় মনে করে এই ধরনের কাজ করার নাম বিদ'আত।

৩। ফিকাহ্ শাস্ত্রবিদ এবং মুহাদ্দিসগণ বিভিন্নভাবে বিদ'আতকে সংজ্ঞায়িত করেছেন। যেমনঃ শাইখুল ইছলাম ইবনু তাইমিয়াহ (রহঃ) বলেছেন- ধর্মের মধ্যে বিদ'আত হলো এমন কোন বিষয়, যেটি আল্লাহ সুবহানাছ ওয়াতা'আলা ও তাঁর রাসূল (সাঃ) প্রবর্তন করেননি। অর্থাৎ যে বিষয়ে ফার্ষ-ওয়াজিব সূচক কিংবা মুছতাহাব সূচক কোন নির্দেশ প্রদান করেননি^{২৪}। তিনি আরো বলেছেন- কুরআন, সুন্নাহ ও সালাফে সালিহীনের (রহঃ) ঐকমত্যের বিরোধী প্রতিটি 'আক্বীদাহ-বিশ্বাস ও 'ইবাদাহ হলো বিদ'আত। যেমন- খারিজী, রাফিযী, ক্বাদরিয়াহ, জাহ্মিয়াহ প্রভৃতি সম্প্রদায়ের কথা-বার্তা ও আক্বীদাহ-বিশ্বাস হলো বিদ'আহ। মাসজিদে তবলা ও গান-বাজনার মাধ্যমে 'ইবাদাত করা, দাড়ী শেইভ বা মুন্ডানোর মাধ্যমে, গাজা বা নেশা জাতীয় দ্রব্য পানের মাধ্যমে আল্লাহর 'ইবাদাত বা নৈকট্য কামনা করা ইত্যাদি কর্মকান্ড, যেগুলো ক্বোরআন-ছুন্নাহর বিরোধীতাকারী বিভিন্ন দল ও সম্প্রদায়ের লোকেরা করে থাকে- এ সবই হলো বিদ'আত^{২৫}।

৪। 'আল্লামা শাত্বিবী রাহিমাহুল্লাহ বিদ'আতের সংজ্ঞায় বলেছেন- "বিদ'আত হলো- দ্বীনের মধ্যে নব-উদ্ভাবিত এমন কোন পথ যেটি বাহ্যিকভাবে শারী'য়াত প্রবর্তিত পথের মতো বা শারী'য়াত প্রবর্তিত

^{২৪} ফাতাওয়া ইবনু তাইমিয়াহ- ৪/১০৭-১০৮

^{২৫} ফাতাওয়া ইবনু তাইমিয়াহ- ১৮/৩৪৬

বিষয় সদৃশ মনে হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেটি শারী'য়াতের সম্পূর্ণ বিরোধী অথচ সেই পথ অনুসরণের দ্বারা আল্লাহর অধিক নৈকট্য লাভের ইচ্ছা পোষণ করা হয়”। ‘আল্লামা শাহিবী রাহিমাহুল্লাহ প্রদত্ত সংজ্ঞার ব্যাখ্যাঃ- উক্ত সংজ্ঞায় বর্ণিত “দ্বীনের মধ্যে” বাক্যটি দ্বারা একথাই বোঝানো হয়েছে যে, জাগতিক অর্থাৎ দুনইয়াওয়ী বিষয়ে নব-আবিষ্কৃত বা উদ্ভাবিত কোন পন্থা বা বিষয় বিদ'আতের পর্যায়ে পড়ে না এবং সেটাকে বিদ'আত বলা যাবে না। যেমন নতুন নতুন শহর-বন্দর, কল-কারখানা ও শিল্প গড়ে তোলা, নতুন প্রযুক্তি ও মেশিনারীজ আবিষ্কার বা উদ্ভাবন করা। এসবকে বিদ'আত বলা যাবে না। কেননা এগুলো দ্বীনী কোন বিষয় নয় কিংবা দ্বীনে ইছলামের মধ্যে নব আবিষ্কৃত বা প্রবর্তিত কোন বিষয় নয় বরং এগুলো হলো নিছক জাগতিক তথা দুনইয়াওয়ী বিষয়।

বিদ'আতের উপরোক্ত সংজ্ঞায় বর্ণিত “নব-উদ্ভাবিত” বাক্যটি দ্বারা একথাই বুঝানো হয়েছে যে, দ্বীনের মধ্যে নব-উদ্ভাবিত, আবিষ্কৃত কিংবা প্রবর্তিত এমন কোন পন্থা বা বিষয়; শারী'য়াতে ইছলামিয়াহ্তে যার কোন ভিত্তি অথবা পূর্ব উদাহরণ কিংবা সদৃশ নেই, দ্বীনে ইছলামে এরূপ নতুন বা প্রথম আবিষ্কৃত প্রতিটি বিষয় ও পন্থা হলো- বিদ'আত। আর যেসব বিষয়ের সুস্পষ্ট ভিত্তি শারী'য়াতে রয়েছে, যেগুলো দ্বীনে ইছলামের মধ্যে প্রথম বা নব-আবিষ্কৃত নয় বরং ইছলামে যেসব বিষয়ের সদৃশ ও পূর্ব উদাহরণ রয়েছে, সেসব বিষয় বিদ'আতের পর্যায়ভুক্ত নয় এবং ওগুলোকে বিদ'আত বলা যাবে না। যেমন- সার্বফ, নাহ্‌উ, শব্দার্থ বা ভাষাজ্ঞান, উসূলে ফিকহ,

উসূলে দ্বীন ইত্যাদি জ্ঞান-বিজ্ঞান যেগুলোর দ্বারা ইসলামী শারী'য়াতের খিদমাত করা হয় সেসব বিষয় বিদ'আতের পর্যায়ভুক্ত নয়। এসব বিষয়কে বিদ'আত বলা যাবে না। কেননা ইসলামী শারী'য়াতে এসব বিষয়ের সুস্পষ্ট ভিত্তি ও দলীল রয়েছে।

এ পর্যায়ে কেউ যদি প্রশ্ন করেন যে, যদিও এসব জ্ঞানের ভিত্তি শারী'য়াতে রয়েছে তবে এসব বিষয়ে কিতাব সংকলন করা- এটা তো বিদ'আত। কেননা এভাবে কিতাব সংকলনের পক্ষে তো শারী'য়াতে কোন দালীল নেই। তাহলে এর উত্তর কি হবে?

হ্যাঁ, এর উত্তরে আমরা বলব- আপনি (প্রশ্নকারী) যেভাবে বলেছেন তাতে তো এসব বিষয় এমনকি ক্বোরআনে কারীম একত্রকরণ ও সংকলন করাও জঘন্য কাজ তথা বিদ'আত সাব্যস্ত হয়ে যায়। অথচ এরূপ দাবি (“ক্বোরআনে কারীম সংকলন বা একত্রকরণ করা, নাহ্‌উ, সারফ্‌, উসূলে হাদীস, উসূলে ফিক্‌হ্‌ ইত্যাদি; ক্বোরআন ও সুন্নাহ পঠন-পাঠন ও সঠিকভাবে বুঝার জন্য সহায়ক ও প্রয়োজনীয় বিষয়াদী গ্রন্থনা ও সংকলন করা বিদ'আত” বলে দাবি করা) যে সম্পূর্ণ অবাস্তব, ভিত্তিহীন ও বাতিল দাবি, এ বিষয়ে মুছলিম উম্মাহ্‌র মধ্যে কোন দ্বিমত নেই বরং এতদ্বিষয়ে সকলেরই ইজমা' বা ঐকমত্য রয়েছে।

সুতরাং অন্য কোন দালীল যদি নাও থাকে তবুও কেবলমাত্র উম্মাতের ইজমা' এর ভিত্তিতে ক্বোরআন, সুন্নাহ এবং এগুলো সঠিকভাবে জানা ও বুঝার জন্য প্রকৃত অর্থে সহায়ক যেসব জ্ঞান-বিজ্ঞান রয়েছে সেগুলো সংকলন ও গ্রন্থনা শুধু জাইয-ই নয় বরং তা

অতি প্রয়োজনীও বটে। মাঝে মধ্যে বিক্ষিপ্তভাবে যে বা যারা এসব জ্ঞান-বিজ্ঞানের গ্রন্থনা ও সংকলনকে বিদ'আত বলেছেন, মূলতঃ সুনাত ও বিদ'আত সম্পর্কে তাদের সঠিক জ্ঞান না থাকার কারণে তারা এরূপ বলেছেন। তাদের কথা মোটেও ধর্তব্য নয়। তবে অনেকেই রূপক অর্থে এটাকে বিদ'আত বলেছেন। যেমন রামাযানে জামা'আতবদ্ধ হয়ে তারাওয়ীহের সালাত আদায়কে 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) বিদ'আত বলেছিলেন। অথচ প্রকৃত অর্থে এটি আদৌ বিদ'আত ছিলনা। কেননা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) নিজেই সাহাবায়ে কিরামকে (রাঃ) নিয়ে মাছজিদে জামা'আতবদ্ধ হয়ে তারাওয়ীহের সালাত আদায় করেছেন। 'উমার (রাঃ) রূপক অর্থে এটাকে বিদ'আত বলেছেন।

উপরে প্রদত্ত বিদ'আতের সংজ্ঞায় বর্ণিত – “যেটি বাহ্যিকভাবে শারী'য়াত প্রবর্তিত পথ বা বিষয় সদৃশ মনে হয়” বাক্যটি দ্বারা এ কথাই বুঝানো হয়েছে যে, বাহ্যিকভাবে শারী'য়াত প্রবর্তিত বিষয়াদির সাথে কোন সাদৃশ্য বা সামঞ্জস্য নেই এমন সব বিষয় বিদ'আতের পর্যায়ভুক্ত নয় এবং সেগুলোকে বিদ'আত বলা যাবে না।

যেমন- প্রাণীর ছবি ব্যতীত রং-বেরংয়ের চাটাই বা জায়নামাযের উপর সালাত আদায় করা, রামাযানে পরিমিত পরিমাণে বিভিন্ন রকম হালাল ইফতারী আয়োজন করা, সাদাক্বাহ বা অর্থসম্পদের যাকাত আদায়ে নতুন নোট ব্যবহার করা, বিমানে চড়ে হাজ্জের সফর করা ইত্যাদি। এ বিষয়গুলো যদিও দ্বীনের মধ্যে অর্থাৎ দ্বীনী বিষয়ে

নব-আবিষ্কৃত, তবে শারী'য়াত প্রবর্তিত তথা দ্বীনী কোন বিষয়ের সাথে এসবের বাহ্যিক কোন সাদৃশ্যতা বা মিল না থাকায় এগুলোকে বিদ'আত বলা যাবে না বরং এগুলো নিছক স্বাভাবিক রীতি-প্রথা ও বৈষয়িক কর্মকাণ্ড বলে বিবেচিত হবে।

আর বাস্তবে শারী'য়াত পরিপন্থি হওয়া সত্ত্বেও যদি কোন বিষয় বাহ্যিকভাবে দ্বীনী; শারী'য়াত সম্মত কোন বিষয়ের অনুরূপ বা তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে থাকে অর্থাৎ, কোন বিষয় প্রকৃত অর্থে দ্বীনী; শারী'য়াত সম্মত নয় তবে বাহ্যিকভাবে সেটি দ্বীনী; শারী'য়াত সম্মত কোন বিষয়ের মতো বলে মনে হয়, দ্বীনের মধ্যে প্রবর্তিত কিংবা আবিষ্কৃত এরকম বিষয়ও বিদ'আত বলে গণ্য হবে।

যেমন- কেবল দাঁড়িয়ে থেকে রোযা পালনের মানত করা, সব কিছু বাদ দিয়ে নির্বিঘ্নে 'ইবাদাত পালনের জন্য নপংসুক হয়ে যাওয়া, শারী'য়াত সম্মত কোন কারণ ছাড়াই বিশেষ কোন খাবার বা পোষাক বেছে নেয়া এবং অন্য সব হালাল খাবার বা পোষাক বর্জন করা, সম্মিলিতভাবে উচ্চস্বরে দু'আ-দুরূদ বা যিক্র-আযকার করা, শারী'য়াতে যেসব দিন, তারিখ বা সময়ের জন্য বিশেষ কোন 'ইবাদাত নির্ধারণ করে দেয়া হয়নি, এমন কোন দিন, তারিখ বা সময়ের জন্য বিশেষ কতক 'ইবাদাত নির্দিষ্ট করে নেয়া। যেমন- বৃহস্পতি বা শুক্রবার রাতকে যিক্র-আযকার ও সালাতের জন্য, ১৫ই শা'বানকে রোযা পালনের জন্য এবং ১৪ই শা'বান দিবাগত রাতকে বিশেষ কিছু 'ইবাদাত ও সালাতের জন্যে নির্ধারণ বা নির্দিষ্ট করে নেয়া, এসবই হলো- বিদ'আত। কেননা এগুলো হলো দ্বীনে

ইছলামের মধ্যে শারী'য়াত পরিপন্থি এমন কিছু কাজ, যেগুলোকে বাহ্যিকভাবে দ্বীনী তথা শারী'য়াত প্রবর্তিত বিষয়াদির সদৃশ বা অনুরূপ বিষয় ও কর্ম বলে মনে হয়। বিদ'আত অবিকারকারী একথা ভালো করে জানে যে, দ্বীনের মধ্যে নতুন কিছু প্রবর্তন বা চালু করতে হলে অবশ্যই সেটাকে ধর্মীয় আঙ্গিকে উপস্থাপন করতে হবে নতুবা মানুষ সেটাকে গ্রহণ করবে না।

দ্বীনী বিষয়ে শারী'য়াতসম্মত বা শারী'য়াত প্রবর্তিত বিষয়ের অনুরূপ বলে মনে হয় না- এমন কোন পথ মানুষ অনুসরণ করতে চায় না। আর তাই বিদ'আত অবিকারকারী ধর্মের মধ্যে যখন নতুন কিছু চালু করতে চায় তখন সেটাকে সে ধর্মের আদলে ও সাজে উপস্থাপন করে থাকে কিংবা এমন কোন বিষয়ের আশ্রয় নেয়, যে বিষয়টি বাহ্যত দ্বীনী বা ধর্মীয় বিষয় বলে মনে হয়। যাতে সাধারণ মানুষ এটাকে দ্বীনী কাজ মনে করে সহজেই গ্রহণ করে। প্রয়োজনে সে নেক্কার-দ্বীনদার, পরহেযগার লোকদের মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ বা সুপরিচিত মর্যাদাসম্পন্ন কারো অনুসরণের দোহাই দিয়ে নিজের আবিস্কৃত বিদ'আতকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়।

দেখুন! জাহিলিয়াত যুগের 'আরবগণ মিল্লাতে ইবরাহীম-কে [ইবরাহীম (আঃ) এর অনুসৃত দ্বীনকে] পরিবর্তন করে নতুন যেসব পথ প্রবর্তন বা বিষয় আবিস্কার করেছিল, সেগুলোকে মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্য কিরূপ ধর্মীয় খোঁড়া ব্যাখ্যা ও যুক্তি দাঁড় করিয়েছিল। তারা তাদের আবিস্কৃত শিরকী পন্থার পক্ষে তথা মূর্তি ও দেব-দেবীর পূজা করার পক্ষে বলেছিল:-

مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ.

অর্থাৎ- আমরা তাদের ‘ইবাদাত কেবল এজন্যই করি, যেন তারা আমাদেরকে আল্লাহ্র নিকটবর্তী করে দেয়’^{১৬}। দুনিয়াতে সর্বপ্রথম শিরকের আবির্ভাব বা উৎপত্তি কিভাবে হলো সে ইতিহাস পাঠ করলে জানা যায় যে, মানুষের ফিত্বরাতি অর্থাৎ স্বভাবজাত ধর্ম; ইসলামকে বাদ দিয়ে তাদেরকে শিরক চর্চায় নিয়োজিত করার জন্যে অভিশপ্ত ইবলীস শিরকের বিষয়টিকে ধর্মীয় আঙ্গিকে মানুষের কাছে উপস্থাপন করেছিল। তাদেরকে ক্বাওমে নূহ্ এর পাঁচজন নেক্কার-পরহেযগার লোকের নাম দিয়ে বলেছিল যে, তোমরা এদের মূর্তি বা ছবি সামনে নিয়ে আল্লাহ্র ‘ইবাদাত করতে থাকো, এতে করে আল্লাহ্র ‘ইবাদাতের প্রতি তোমাদের মনোযোগ বৃদ্ধি পাবে। আর এভাবেই পর্যায়ক্রমে ইবলীস; শাইত্বান তাদেরকে উক্ত পাঁচজন নেক্কার লোকের ছবি বা মূর্তির ‘ইবাদাতে তথা শিরকে নিপতিত করেছিল।

জাহিলিয়াহ যুগের মাক্কাবাসীগণ ‘আরাফাহ-তে অবস্থানকে বর্জন করেছিল এই যুক্তি বলে যে, হারাম শরীফের (মাক্কাহ মুকাররমাহ-র) বাহিরে গিয়ে অবস্থান করা হলে হারাম শরীফের প্রতি অসম্মান প্রদর্শিত হবে। উলঙ্গ হয়ে বায়তুল্লাহ্র ত্বাওয়াফ করার পিছনে তারা যুক্তি দাঁড় করিয়েছিল যে, আমরা যে পোষাক বা কাপড় পরিধান করে আল্লাহ্র নাফরমানী বা গুনাহের কাজ করেছি, সেই কাপড় গায়ে দিয়ে কোন অবস্থাতেই আমরা আল্লাহ্র ঘর ত্বাওয়াফ করতে

^{১৬} সূরা আয্ যুমার- ৩

পারি না। এভাবে তারা তাদের নব-আবিষ্কৃত বিভিন্ন বিষয়াদী অর্থাৎ বিদ'আতকে বৈধ করার জন্য বাহ্যিকভাবে এমন অনেক ব্যাখ্যা ও যুক্তি প্রদর্শন করে, যেগুলো দৃশ্যতঃ ধর্মীয় ও শারী'য়াত সম্মত বলে মনে হয়। যদিও প্রকৃত অর্থে সেগুলো আদৌ ধর্মীয় বা শারী'য়াত সম্মত কোন ব্যাখ্যা বা যুক্তি নয়।

সুতরাং কাফির-মুশরিকরা যেখানে নিজেদের নতুন আবিষ্কৃত তথা বিদ'আতী পন্থা বা বিষয়াদিকে বৈধতা দেয়ার জন্য সেটাকে ধর্মীয় আঙ্গিকে উপস্থাপন করে থাকে, সেখানে মুসলমান বলে দাবিদার লোকেরা নিজেদের বিদ'আতকে বৈধতা দানের জন্যে সেটাকে ধর্মীয় আঙ্গিকে; শারী'য়াত প্রবর্তিত পথ, পন্থা বা বিষয়াদির সাথে বাহ্যিক সাদৃশ্য ও সামঞ্জস্যপূর্ণ করে পেশ করবে, এটা তো খুবই স্বাভাবিক। আর একারণেই বিদ'আতের সংজ্ঞায় - “বাহ্যিকভাবে শারী'য়াত প্রবর্তিত বা শারী'য়াত সম্মত বিষয় সদৃশ মনে হয়” কথাটি সংযোজন করতে হয়েছে।

বিদ'আতের সংজ্ঞায় বর্ণিত “যে পথ অবলম্বনের দ্বারা আল্লাহর অধিক নৈকট্য লাভের ইচ্ছা পোষণ করা হয়” মূলত এই বাক্যটির মাধ্যমে বিদ'আতের পরিপূর্ণ অর্থ ও সঠিক চিত্র প্রকাশ পেয়েছে। কেননা এটা (বেশি ছাওয়াব বা আল্লাহর অধিক নৈকট্য অর্জন) হলো বিদ'আত প্রবর্তনের অন্যতম উদ্দেশ্য।

বিদ'আত চর্চাকারী যখন দেখে যে, ক্বোরআনে কারীমে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলা ইরশাদ করেছেন:-

مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ.

অর্থাৎ - আমি মানুষ ও জিন জাতিকে সৃষ্টি করেছি একমাত্র আমার 'ইবাদাতের জন্য'^{২৭}। তখন সে বেশি বেশি 'ইবাদাত করার প্রতি উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত হয়। কারণ সে মনে করে যে, মানুষ যেন বেশি বেশি আল্লাহর 'ইবাদত-বন্দেগী করে, এটাই হলো উক্ত আয়াতের উদ্দেশ্য। সে আয়াতের অর্থটাকেই কেবল দেখে।

'ইবাদাতের জন্যে শারী'য়াতে যেসব নিয়ম-নীতি ও সীমারেখা দেওয়া হয়েছে, বিদ'আত আবিষ্কার বা চর্চাকারী সেগুলোর প্রতি দৃষ্টিপাত করে না কিংবা সেগুলোকে যথেষ্ট মনে করে না। বরং সে (বিদ'আত আবিষ্কারকারী) মনে করে যে, যেহেতু আয়াতে সাধারণভাবে শুধু 'ইবাদাতের কথা বলা হয়েছে সুতরাং স্থান-কাল ও অবস্থা বিবেচনায় 'ইবাদাতের কিছু নিয়ম-নীতি নিজের পক্ষ হতে নির্ধারণ করে নেয়া আবশ্যিক।

বিদ'আত আবিষ্কার বা চর্চাকারী কখনো নিজেকে প্রকাশ করার বা লৌকিকতার চরম আগ্রহ ও মানসিকতার দরুন কিংবা জাগতিক অন্য কোন লোভ-লালসার দরুন বিদ'আত আবিষ্কার বা চর্চা করে থাকে। আবার কখনো সে মনে করে যে, একই পদ্ধতিতে একই 'ইবাদাত বারবার করতে করতে মানুষের মধ্যে ঐ 'ইবাদাতের প্রতি এক ধরনের অনীহা ও বিরক্তি ভাব চলে আসে। এমতাবস্থায় তাদের সামনে যদি 'ইবাদাতের নতুন কোন পন্থা বা পথ তুলে ধরা হয় তাহলে তারা তাতে আগ্রহ ও উদ্দীপনা বোধ করবে। কেননা একথা স্বীকৃত যে, প্রত্যেক নতুনই (বিষয়/বস্তু) সুস্বাদু।

^{২৭} সূরা আয্ যারিয়াত- ৫৬

মোটকথা, নতুনের মধ্যে স্বাদ থাকে। প্রতিটি নতুন বিষয়-বস্তুর প্রতি মানুষের আগ্রহ-উদ্দীপনা প্রবল থাকে এবং একই কাজ দীর্ঘ দিন কিংবা বারংবার করতে থাকলে এর প্রতি মানুষের বিরক্তি ভাব চলে আসে। এসব ভ্রষ্ট চিন্তা-ভাবনা থেকেই বিদ'আতের উৎপত্তি ও বিকাশ ঘটে থাকে। যাই হোক, বিদ'আতের উপরোক্ত সংজ্ঞা দ্বারা জানা যায় যে, দ্বীনের মধ্যে নব-আবিষ্কৃত যেসব পথ, পন্থা বা বিষয়াদী, যেগুলো দ্বীনী বিষয়াদির অনুরূপ বলে মনে হয়, কিন্তু এতদসত্ত্বেও এগুলো দ্বারা যদি 'ইবাদাত অর্থাৎ আল্লাহর নৈকট্য অর্জন উদ্দেশ্য না হয়ে থাকে তাহলে তা বিদ'আতের পর্যায়ভুক্ত বলে গণ্য হবেনা এবং এরূপ কোন বিষয়কে বিদ'আত বলা যাবে না। বরং এ ধরনের বিষয় জাগতিক স্বাভাবিক কাজ-কর্ম ও রীতি-নীতি সংশ্লিষ্ট বিষয় বলে গণ্য হবে। যেমন- সাবান দিয়ে হাত ধোয়া, বছরের একটি নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট পরিমাণে সম্পদের ট্যাক্স বা ভ্যাট দেয়া ইত্যাদি বিষয় বিদ'আতের অন্তর্ভুক্ত নয়।

বিদ'আতের উপরোক্ত সংজ্ঞাটি তারাই দিয়ে থাকেন- যারা যে সকল কাজের দ্বারা 'ইবাদাত উদ্দেশ্য হয়না এরূপ নিছক জাগতিক বিষয়াদিকে বিদ'আতের পর্যায়ভুক্ত বলে গণ্য করেন না। পক্ষান্তরে যারা মনে করেন যে, 'ইবাদাতে যেমন বিদ'আত হতে পারে তেমনি স্বাভাবিক জাগতিক বিষয়াদী, রীতি-প্রথা বা কাজ-কর্মেও বিদ'আত হতে পারে, তারা বিদ'আতের সংজ্ঞায় বলে থাকেন যে, “বিদ'আত হলো:- দ্বীনে ইচ্ছামের মধ্যে শারী'য়াত প্রবর্তিত বা শারী'য়াত সম্মত পথ বা বিষয়ের (দ্বীনী বিষয়ের) অনুরূপ নতুন আবিষ্কৃত বা উদ্ভাবিত

এমন কোন পথ বা বিষয়, যে পথ বা বিষয় অনুসরণের দ্বারা উদ্দেশ্য তা-ই হয়ে থাকে যা শারী'য়াত প্রবর্তিত পথ অনুসরণের দ্বারা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে"। অন্য কথায়, যে পথ সেই উদ্দেশ্যে অনুসরণ করা হয়ে থাকে, যে উদ্দেশ্যে শারী'য়াত প্রবর্তিত পথ অনুসরণ করা হয়। বাহ্যিকভাবে প্রথমোক্ত সংজ্ঞা ও দ্বিতীয় সংজ্ঞার মধ্যে পার্থক্য এতটুকু যে, প্রথমোক্ত সংজ্ঞায় বলা হয়েছে- “যে পথ অনুসরণের দ্বারা বেশি বেশি আল্লাহ্র 'ইবাদাত বা আল্লাহ্র অধিক নৈকট্য লাভের ইচ্ছা পোষণ করা হয়”। আর দ্বিতীয় সংজ্ঞাটিতে বলা হয়েছে- “যে পথ অনুসরণের দ্বারা উদ্দেশ্যে তা-ই হয়ে থাকে, যা শারী'য়াত প্রবর্তিত পথ অনুসরণের দ্বারা উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে”। অর্থাৎ শারী'য়াত প্রবর্তিত পথ যে উদ্দেশ্যে অনুসরণ করা হয়, দ্বীনী কোন বিষয় নয় তবে দ্বীনী বিষয়ের সদৃশ ইচ্ছালামে নব-আবিষ্কৃত বানোয়াট কোন পথ বা বিষয় যদি সেই একই উদ্দেশ্যে অনুসরণ করা হয়, তাহলে এই নব-আবিষ্কৃত পথ বা বিষয়টি 'ইবাদাত সংশ্লিষ্ট হোক কিংবা স্বাভাবিক জাগতিক কোন বিষয় সংশ্লিষ্ট হোক, সর্বাবস্থায় সেটি বিদ'আত বলে গণ্য হবে।

বিদ'আতের এই দ্বিতীয় সংজ্ঞাটি যারা দিয়েছেন তাদের কথা হলো:- মানুষের ইহ-পরকালের কল্যাণের জন্যই শারী'য়াত প্রবর্তন করা হয়েছে এবং শারী'য়াত প্রবর্তিত পথ অনুসরণের উদ্দেশ্যও হলো দুন্ইয়া ও আখিরাতে পরিপূর্ণ কল্যাণ লাভ করা। বিদ'আত চর্চাকারীও এই উদ্দেশ্যেই বিদ'আত চর্চা করে থাকে। যখন সে দ্বীনের মধ্যে দ্বীন সদৃশ নব-আবিষ্কৃত বা উদ্ভাবিত 'ইবাদাতমূলক

কোন কাজ (যদিও ঐ কাজটি প্রকৃত অর্থে কোন 'ইবাদাত নয়) করে থাকে, তখন এর দ্বারা তার উদ্দেশ্য হয়ে থাকে আখিরাতে পরিপূর্ণ কল্যাণ, মর্যাদা ও প্রতিদান লাভ করা। আর যখন সে দুইনের মধ্যে শারী'য়াত সদৃশ স্বাভাবিক জাগতিক বিষয়াদী ও রীতি-প্রথা বিষয়ক কোন কাজ-কর্ম করে থাকে, তাহলে এর দ্বারা তার উদ্দেশ্য হয়ে থাকে জাগতিক পরিপূর্ণ কল্যাণ, মর্যাদা ও প্রতিদান লাভ করা।

সুতরাং একথা স্পষ্ট যে, শারী'য়াত প্রবর্তনের মূলে যে উদ্দেশ্য রয়েছে, বিদ'আতকারী সেই উদ্দেশ্যে যেভাবে 'ইবাদাতের মধ্যে নতুন পথ বা বিদ'আত চর্চা বা অনুশীলন করে থাকে, তেমনি ঐ একই উদ্দেশ্যে জাগতিক স্বাভাবিক কাজ-কর্ম ও রীতি-প্রথার মধ্যেও নতুন পথ তথা বিদ'আত অনুশীলন করে থাকে। দু'টি ক্ষেত্রেই ('ইবাদাত এবং 'আদাত তথা স্বাভাবিক জাগতিক কাজ-কর্ম ও রীতি-প্রথায়) বিদ'আত প্রবর্তনের উদ্দেশ্য এক ও অভিন্ন। তাই বিদ'আতের এই শেষোক্ত সংজ্ঞা প্রদানকারীদের কথা হলো- শুধু 'ইবাদাতের ক্ষেত্রে নতুন প্রথা প্রবর্তনকে বিদ'আত বলা হবে, অথচ একই উদ্দেশ্যে অন্য ক্ষেত্রে ('আদাত বা স্বাভাবিক জাগতিক কাজে-কর্মে) নতুন প্রথা প্রবর্তনকে বিদ'আত বলা যাবে না, এটা হতে পারে না। বরং যে উদ্দেশ্যে ইছলামী শারী'য়াত প্রবর্তিত হয়েছে অর্থাৎ দুনিয়া ও আখিরাতে পরিপূর্ণ কল্যাণ লাভ, সেই উদ্দেশ্যে 'ইবাদাতের মধ্যে নতুন প্রথা প্রবর্তন যেভাবে বিদ'আত বলে গণ্য হবে, তেমনি ঐ একই উদ্দেশ্যে 'আদাতের মধ্যে তথা স্বাভাবিক জাগতিক বা বৈষয়িক কাজ-কর্মে নতুন প্রথা প্রবর্তন বিদ'আত বলে গণ্য হবে।

বিদ'আতের উপরোক্ত সংজ্ঞা দু'টিকে বাহ্যিকভাবে পরস্পর বিরোধী বলে মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে এগুলোর মধ্যে কোন বিরোধ নেই। অর্থ ও উদ্দেশ্যের দিক থেকে দু'টি সংজ্ঞাই এক ও অভিন্ন। কেননা পর্যালোচনা করলে উভয় সংজ্ঞা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, দ্বীনী বিষয়ে শারী'য়াতসম্মত বিষয়ের অনুরূপ জাগতিক স্বাভাবিক কাজ-কর্ম, রীতি-নীতি কিংবা আচার-অচরণমূলক নতুন কোন কাজ বা প্রথা প্রবর্তনের দ্বারা যদি আল্লাহর সুবহানাছ ওয়াতা'আলার নৈকট্য লাভ করা উদ্দেশ্য না হয়, কিংবা এগুলো যদি 'ইবাদাত হিসাবে পালিত না হয় বরং নিছক জাগতিক ও স্বাভাবিক বিষয় ও রীতি-প্রথা হিসেবে পালিত হয়ে থাকে, তাহলে শারী'য়াতের পরিভাষায় তা বিদ'আত হিসেবে গণ্য হবে না, বরং নিছক স্বাভাবিক জাগতিক বিষয়ে নতুন আবিষ্কৃত কোন কর্ম বা পথ হিসাবে গণ্য হবে। এ বিষয়ে কারো কোন দ্বিমত নেই। অপরদিকে দ্বীনী বিষয়ে দ্বীন সদৃশ নতুন কোন রীতি-নীতি কিংবা স্বাভাবিক জাগতিক কোন বিষয় বা কাজ-কর্ম প্রবর্তনের দ্বারা যদি আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য কামনা করা হয় কিংবা তা 'ইবাদাত হিসেবে অথবা শারী'য়াত প্রবর্তিত বিষয় হিসেবে দেখা হয়, তাহলে উভয় সংজ্ঞা মতেই সেটি বিদ'আত বলে গণ্য হবে। তাইতো দেখা যায় যে, পাপকাজ সমূহের মধ্যে এমন অনেক পাপ রয়েছে যেগুলো বিদ'আত। পক্ষান্তরে এমন অনেক পাপ কাজ রয়েছে যেগুলো কাবীরাহ গুনাহ হওয়া সত্ত্বেও তা দ্বীনের মধ্যে না হওয়ার কারণে অথবা শারী'য়াত সদৃশ না হওয়ার কারণে কিংবা আল্লাহর 'ইবাদাত বা নৈকট্য অর্জন কিংবা ইহ-

পরকালের কল্যাণ লাভের উদ্দেশ্যে সম্পাদিত না হওয়ার কারণে সেগুলোকে বিদ'আত বলা যায় না।

উপরোক্ত বিষয়ে আবু সা'আদা হাম্মাদ বিল্লাহ (حفظه الله) এর কথা হলোঃ- মূলতঃ বিদ'আতের উপরোক্ত সংজ্ঞা দু'টির মধ্যে পরস্পর তেমন কোন বিরোধ নেই। কেননা প্রথমোক্ত সংজ্ঞায় বলা হয়েছে-

طَرِيقَةٌ فِي الدِّينِ مُحْتَرَعَةٌ، تُضَاهِي الشَّرْعِيَّةَ يُقْصَدُ بِالسُّلُوكِ عَلَيْهَا الْمُبَالَغَةُ فِي التَّعَبُّدِ لِلَّهِ سُبْحَانَهُ.

অর্থাৎ- দ্বীনের মধ্যে শারী'য়াত সদৃশ নব - আবিষ্কৃত পথ অনুসরণের দ্বারা আল্লাহ সুবাহানাছ ওয়াতা'আলার অধিক 'ইবাদাত করা বা তাঁর অধিক নৈকট্য অর্জন করা উদ্দেশ্য হবে। আর দ্বিতীয় সংজ্ঞাটিতে বলা হয়েছে-

طَرِيقَةٌ فِي الدِّينِ مُحْتَرَعَةٌ، تُضَاهِي الشَّرْعِيَّةَ، يُقْصَدُ بِالسُّلُوكِ عَلَيْهَا مَا يُقْصَدُ بِالطَّرِيقَةِ الشَّرْعِيَّةِ.

অর্থাৎ- দ্বীনের মধ্যে শারী'য়াত সদৃশ নব-আবিষ্কৃত যে পথ বা বিষয় অনুসরণের দ্বারা তা-ই উদ্দেশ্য হবে, যা কিছু শারী'য়াত প্রবর্তিত পথ বা বিষয় অনুসরণের দ্বারা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে^{২৮}। এ দু'টি কথা শাব্দিকভাবে ভিন্ন ভিন্ন হলেও পরিভাষাগত অর্থ ও উদ্দেশ্যের দিক থেকে এক ও অভিন্ন। কেননা -

প্রথমতঃ এ বিষয়ে কারো কোন দ্বিমত নেই যে, আল্লাহ (سبحانه وتعالى) সন্তুষ্টি ও তাঁর নৈকট্য অর্জন হলো বান্দাহর ইহ-পরকালীন সবচেয়ে

^{২৮} আল ই'তিসাম- লিল ইমাম আবী ইছহাক আশ্শাফ্বীবী।

বড় সফলতা ও কল্যাণ। অপরদিকে ইসলামী শরীয়ত প্রবর্তন এবং এর অনুসরণের উদ্দেশ্যও হচ্ছে তা-ই।

সুতরাং এই অর্থে প্রথমোক্ত সংজ্ঞার সাথে দ্বিতীয় সংজ্ঞার কোন বিরোধ বা পার্থক্য নেই।

দ্বিতীয়তঃ এ বিষয়ে সকলেই একমত যে, ইসলামী শারী'য়াত প্রবর্তন এবং অনুসরণের দ্বারা যদিও পরকালীন কল্যাণই হলো মূল ও মুখ্য, তথাপি এর দ্বারা একইসাথে দুনিয়া-আখিরাতের কল্যাণ উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। বান্দাহ যাতে একই সাথে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ লাভ করতে পারে, এটাই হলো ইসলামী শারী'য়াত প্রবর্তন এবং তা অনুসরণের উদ্দেশ্য। যেমন 'আল্লামা আবু ইসহাক আশ্শাতিবী (رحمه الله) তাঁর আল ই'তিসাম গ্রন্থে শারী'য়াত প্রবর্তনের কারণ সম্পর্কে বলেছেন:-

إِنَّ وَضْعَ الشَّرَائِعِ إِنَّمَا هُوَ لِمَصَالِحِ الْعِبَادِ فِي الْعَاجِلِ وَالْآجِلِ مَعًا

অর্থ- শারী'য়াত প্রবর্তন করে দেয়া হয়েছে বান্দাহগণের একই সাথে ইহ-পরকালীন কল্যাণের নিমিত্ত।

মূলতঃ এ কারনেই বিদ'আতের দ্বিতীয় সংজ্ঞায় যা বলা হয়েছে, তার অর্থ দাঁড়ায়ঃ- “একই সাথে দুইয়া-আখিরাতের কল্যাণ অর্জনের নিমিত্ত কেউ যদি দুইনের মধ্যে শারী'য়াত সদৃশ নতুন কোন পথ বা পন্থা প্রবর্তন, আবিষ্কার বা অনুসরণ করে (সে পথ বা বিষয়টি 'ইবাদাহ সংক্রান্ত হোক বা জাগতিক কোন কাজ-কর্ম বা স্বাভাবিক রীতি-নীতি সংক্রান্ত হোক) সর্বাবস্থায় সেটি বিদ'আত বলে গণ্য হবে। এই অর্থ হতে একথাও পরিষ্কার যে, 'আদাতমূলক অর্থাৎ

স্বাভাবিক জাগতিক বিষয়াদির ক্ষেত্রে নব-আবিষ্কৃত বা প্রবর্তিত কোন পথ অনুসরণের দ্বারা যদি আখিরাতে কল্যাণ উদ্দেশ্য না হয় বরং শুধু মাত্র দুন্‌ইয়াওয়া বা জাগতিক কল্যাণ অর্জন করা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তাহলে সেটি বিদআত বলে গণ্য হবে না। কেননা মানুষের শুধুমাত্র জাগতিক কল্যাণ সাধন শারীয়াতে উদ্দেশ্য নয়, বরং একই সাথে উভয় জগতের কল্যাণ সাধনই হলো শারীয়াত প্রবর্তনের উদ্দেশ্য এবং তন্মধ্যে পরকালীন কল্যাণটাই হলো প্রধান বা মুখ্য বিষয়। বিদআতের প্রথমোক্ত সংজ্ঞা দ্বারা মূলত: এ কথাটিই বুঝানো হয়েছে।

তাছাড়া দ্বীনের মধ্যে শারীয়াত সদৃশ ইবাদাতমূলক নতুন কোন প্রথা প্রবর্তন বা অনুসরণ করা বিদআত, এ ব্যাপারে সকলেই একমত। কেননা ইবাদাত মূলক কাজের দ্বারা সাধারণত আল্লাহ (سبحانه وتعالى) নৈকট্য কিংবা পরকালীন কল্যাণ ও সফলতাই যে কামনা করা হয় এ বিষয়ে কারো কোন দ্বিমত নেই। আল্লাহ (سبحانه وتعالى) ই সর্ব-বিষয়ে সর্বাধিক জ্ঞাত]।

সুতরাং, উপরোক্ত আলোচনার সারাংশে বলা যায় যে, শরয়ী পদ্ধতি বলতে ইবাদতের সুন্নাত পদ্ধতি বুঝানো হয়েছে। কেননা সুন্নাত পদ্ধতি বা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইবাদত জাতীয় যে বিষয়ে তিনি যে পদ্ধতি উম্মতকে দেখিয়ে দিয়ে গেছেন তাই শরয়ী পদ্ধতি। এর বাইরে কোনো শরয়ী পদ্ধতি নেই। এই অর্থেই আহলুসুন্নাহ শব্দের বিপরীতে আহলুল বিদআহ শব্দটি উলামায়ে কেরাম প্রয়োগ করে থাকেন বলে আমরা ইতোপূর্বে দেখে এসেছি।

সুতরাং, বিভিন্ন হাদীসে বিদ'আত বা নব উদ্ভাবিত বিষয় বুঝাতে 'মুহদাসাত' শব্দটিও ব্যবহার করা হয়েছে, যা একটু পরেই আমরা দেখতে পাব ইনশাআল্লাহ। বিদ'আত বা মুহদাসাতের শরয়ী সংজ্ঞা থেকে আমরা বুঝতে পারলাম যে, শরীয়তের পরিভাষায় বিদ'আত শুধুমাত্র ইবাদত কেন্দ্রিক বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত হবে। যে কোনো নব অবিস্কৃত জিনিসের উপর শাস্তি অর্থে বিদআতের প্রয়োগ করা গেলেও শরয়ী অর্থে তার উপর বিদ'আত শব্দ প্রয়োগ হবে না এবং তা বিদ'আত ও মুহদাসাত সংক্রান্ত হাদীসের আওতাধীন হবে না। যেমন ধরুন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উটে সওয়ার হয়ে সফর করেছেন, যানবাহনের আবিষ্কার আজ আপনাকে বিমান আরোহন করাচ্ছে, আপনি বিমান আরোহন করে সফর করছেন। বিমান নব আবিষ্কার।

উটের পরিবর্তে আপনি বিমান আরোহন করছেন। এটাকে শরয়ী বিদ'আত বলা যাবে না। কেননা উট বিমান কোনোটি ইবাদত নয়। এটি একটি বাহন মাত্র। তবে বাহনে সওয়ার হতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে দো'আ পড়তেন, তিনি সফরের যে দো'আ পড়তেন তা ইবাদত। এই দো'আর মধ্যে কোনো সংযোজন বা বিয়োজন করার সুযোগ নেই। সুতরাং, যুক্তির আলোকে এখানে কোনো পরিবর্তন ঘটানো যাবে না। যেমন, উট একটি সাধারণ জন্তু, সে মাটিতে চলে, নবীজী উটে উঠতে এই দো'আ পড়তেন। আমি আজ আকাশে চড়ছি, এই নেয়ামত অনেক বড়।

অতএব, দো'আকে একটু বৃদ্ধি করতে হবে। অথবা নবীজী স্বাভাবিকভাবে দো'আ পড়তেন, কেননা নেয়ামতটি স্বাভাবিক ছিল, কিন্তু আমার নেয়ামতটি অসাধারণ, তাই বিমানে উঠেই সেজদায় পড়ে এই দো'আ করতে হবে অথবা সেজদায় পড়ে দো'আটি পড়লে সওয়াব বেশি হবে, এ জাতীয় চিন্তাধারা সবই ভ্রান্ত। কেননা দো'আ একটি ইবাদত। আর ইবাদতের ক্ষেত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পদ্ধতির বাইরে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই আর গেলেই তা বিদ'আত বলে গণ্য হবে। মোটকথা বিদ'আতের সম্পর্ক ইবাদতের বিষয় ও তার পদ্ধতির সাথে। বস্তুর সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই।

জনৈক ব্যক্তি একবার এক বিদ'আত বিরোধী আলেমকে গিয়ে বললেনঃ আপনারা সবকিছুই শুধু বিদ'আত বিদ'আত করেন, তবে আপনি চশমা পরেছেন কেন? আল্লাহর রাসূল কি জীবনে কখনো চশমা পরেছেন? চশমা তো নবীজীর সময়ে ছিল না, তাহলে এটা কি বিদ'আত নয়?

আলেম বললেনঃ ভাই, তাহলে তো আপনি নিজেই বিদ'আত। আপনিও তো নবীজীর সময়ে ছিলেন না। বিদ'আত না বোঝার কারণেই মাঝে মাঝে এমন কৌতুকের সৃষ্টি হয়। চশমা কোনো ইবাদত নয়।

তাই এর সাথে বিদ'আতের কোনো সম্পর্ক নেই। যেমন লোকটি নিজে কোনো ইবাদত নয়, তাই সে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময় না থাকা আবার এখন থাকা বিদ'আতের বিষয়

নয়। যে ইবাদত বা তার পদ্ধতি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক প্রমাণিত নয় একমাত্র তার আবিষ্কার শরয়ী পরিভাষায় বিদ'আত বলে গণ্য হবে।

কুরআন ও হাদীসে 'বিদ'আত' শব্দের উল্লেখ

কুরআন মজীদে 'বিদয়াত' শব্দটি তিনটি ক্ষেত্রে তিনভাবে উল্লেখিত হয়েছে।

একঃ আল্লাহ সম্পর্কে এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে দুটি আয়াতে।

একটি আয়াতঃ

بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ [১:১১৭]

আসমান জমিনের সম্পূর্ণ নবোদ্ভাবনকারী, নতুন সৃষ্টিকারী। তিনি যখন কোনো কাজের ফায়সালা করেন, তখন তাকে শুধু বলেনঃ হও। অমনি তা হয়ে যায়। (সূরা আল বাকারাহঃ আয়াত নং - ১১৭)

অপর আয়াতটি

بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ أَأَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُن لَّهُ صَاحِبَةٌ ۚ وَخَلَقَ

كُلَّ شَيْءٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ [১:১০১]

তিনি তো আসমান জমিনের নব সৃষ্টিকারী। তাঁর সন্তান হবে কোথেকে, কেমন করে হবে তাঁর স্ত্রী? তিনি-ই তো সব জিনিস সৃষ্টি করেছেন। আর তিনি সর্ব বিষয়েই অবহিত। (সূরা আল আনআমঃ আয়াত নং - ১০১)।

এ দুটো আয়াতেই আল্লাহ তা'আলাকে 'আসমান জমিনের বদীউন'- 'পূর্ব দৃষ্টান্ত, পূর্ব উপাদান ও পূর্ব প্রস্তুতি ছাড়াই সৃষ্টিকার' বলা হয়েছে।

দ্বিতীয়, রাসূলে করীম (সাঃ) এর জবানীতে তাঁর নিজের সম্পর্কে বলা একটি আয়াতে এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে এভাবেঃ

قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ ۖ

বলো হে নবী! আমি কোনো অভিনব প্রেরিত ও নতুন কথার প্রচারক রাসূল হয়ে আসিনি। আমি নিজেই জানিনে আমার সাথে কিরূপ ব্যবহার করা হবে, তোমাদের সাথে কি করা হবে, তাও আমার অজ্ঞাত। (সূরা আল আহকাফঃ আয়াত নং - ৯)

আর তৃতীয়, এই শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে বনী ইসরাঈলের এক অংশের লোকদের বিশেষ ধরনের আমলের কথা বলতে গিয়ে।

আয়াতটি এইঃ

وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ

এবং অত্যধিক ভয়ের কারণে গৃহীত কৃচ্ছসাধনা ও বৈরাগ্যনীতি তারা নিজেরাই রচনা করে নিয়েছে। আমরা তাদের উপর এই নীতি লিখে ফরজ করে দিইনি। বরং আল্লাহর সন্তুষ্টি সন্ধানকেই তাদের জন্য লিপিবদ্ধ করে দিয়েছিলাম। (সূরা আল হাদীদঃ আয়াত নং - ২৭)

এখানে ‘রাহবানিয়াত’ কে বিদয়াত বলা হয়েছে, যা আল্লাহ তা’আলা ব্যবস্থা করে দেননি, লোকেরা নিজেদের তরফ থেকে রচনা করে নিয়েছে। এখানে যে ‘বিদয়াত’ এর কথা বলা হয়েছে, সুন্নাহ এর বিপরীত শব্দ হিসেবে, এ গ্রন্থে তা-ই আমাদের আলোচ্য বিষয়। এ আয়াত হতে যে কথাটি স্পষ্ট হয়ে উঠে তা হলোঃ আল্লাহ বান্দাদের জন্য যে বিধি ও বিধান দেননি-বান্দারা নিজেদের ইচ্ছামতো যা

রচনা করে নিয়েছে, তা-ই ‘বিদয়াত’। পক্ষান্তরে আল্লাহ যা কিছু লিখে দিয়েছেন, বিধিবদ্ধ করে দিয়েছেন, যা করতে আদেশ করেছেন, তা করা ‘বিদয়াত’ নয়। এখান হতেই ‘বিদয়াত’ সংক্রান্ত মূল সংজ্ঞা ও ভাবধারার স্পষ্ট আভাস পাওয়া গেল।

সূরা ‘আল কাহাফ’ এর এক আয়াতে ‘বিদয়াত’ শব্দের এই অর্থের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে সম্পূর্ণ ভিন্ন ভাষায়। আয়াতটি এইঃ

[قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ۝ ١٠٣: ١٨]

الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ۝ ١٠٤: ١٨]

বলো হে নবী! আমলের দিক দিয়ে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের কথা কি তোমাদের বলবো? তারা হচ্ছে এমন লোক যাদের যাবতীয় চেষ্টা সাধনাই দুনিয়ার জীবনে বিভ্রান্ত হয়ে গেছে। আর তারাই মনে মনে ধারণা করে যে তারা খুবই ভালো কাজ করেছে। (সূরা আল কাহাফঃ আয়াত নং - ১০২ ও ১০৩)।

অর্থাৎ যাবতীয় কাজ কর্ম ভুলের ভিত্তিতে সম্পাদিত হওয়া সত্ত্বেও যারা নিজেদের কাজকে খুবই ভালো, খুবই ন্যায্যসঙ্গত, খুবই সওয়াবের কাজ বলে মনে করে, তারাই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত লোক। বিদয়াতপন্থীরাও ঠিক এমনি। তারা যেসব কাজ করে, আসলে তা আল্লাহর দেয়া নীতির ভিত্তিতে নয়। তা সত্ত্বেও এই হচ্ছে বিদয়াতের সঠিক পরিচয়। সূরা আল-কাহাফের উপরোক্ত আয়াতের তাফসীরে আল্লামা ইবনে কাসীর লিখেছেনঃ এ আয়াত সাধারণভাবে এমন সব লোকের বেলায়ই প্রযোজ্য, যারা আল্লাহর ইবাদত করে আল্লাহর পছন্দনীয় পন্থার বিপরীত পন্থা ও পদ্ধতিতে।

তারা যদিও মনে করছে যে, তারা ঠিক কাজই করেছে এবং আশা করছে যে, তাদের আমল আল্লাহর নিকট স্বীকৃত ও গৃহীত হবে। অথচ প্রকৃতপক্ষে তারা ভুল নীতির অনুসারী এবং এ পর্যায়ে তাদের আমল আল্লাহর নিকট প্রত্যাখ্যাত।

অর্থাৎ ইবাদত-বন্দেগীর কাজ-যা করলে সওয়াব হবে এবং যা না করলে গুনাহ হবে বলে মনে করা হবে-এমন সব কাজই হতে হবে আল্লাহর সন্তোষমূলক পস্থা ও পদ্ধতিতে। এই হচ্ছে সুন্নাত। আর তার বিপরীত রীতি ও নিয়মে হলে তা হবে সুস্পষ্ট বিদয়াত। কেননা তা সুন্নাত বিরোধী। ইমাম কুরতবী তাই বিদয়াত বলেছেন এমন সব জিনিসকে যাঃ যা আল্লাহর কিতাব বা রাসূলের সুন্নাত অথবা সাহাবাদের আমলের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ ও তার অনুরূপ নয়।

এ সম্পর্কে অধিক সুস্পষ্ট কথা বিবৃত হয়েছে নিম্নোক্ত আয়াতটিতে। আয়াতটি এইঃ

وَمَنْ يُشَاقِقِ

الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ

وَنُصَلِّهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا [১১০:৬]

যে ব্যক্তি সঠিক হেদায়াতের পথ স্পষ্ট উজ্জ্বল হয়ে উঠার পরও রাসূলে করীমের বিরুদ্ধাচরণ করবে এবং মুমিন সমাজের সুন্নতী আদর্শকে বাদ দিয়ে অন্য কোনো পথ ও আদর্শের অনুসরণ করবে, আমরা তাদের সে পথেই চলতে দিবো। আর কিয়ামতের দিন তাদের পৌছে দিবো জাহান্নামে। বস্তুত জাহান্নাম অত্যন্ত খারাপ জায়গা। (সূরা আন নিসাঃ আয়াত নং - ১১৫)

এ আয়াতটি সুন্নাতের কুরআনী দলীল সমূহের অন্যতম। যে হেদায়াতের সুস্পষ্ট প্রতিভাত হয়ে উঠার কথা এখানে বলা হয়েছে মূলত তা-ই ‘সুন্নাত’। এ সুন্নাতই হেদায়াতের একমাত্র রাজপথ। কেননা আল্লাহর কালাম ও আল্লাহর অস্পষ্ট ওহী (ওহীয়ে খফী) অনুযায়ীই তাঁর কথা ও কাজের মাধ্যমে সুন্নাতের এ আদর্শকেই তিনি উদ্ভাসিত করে তুলেছিলেন। রাসূলের তৈরি সমাজের মুমিনগণ এই পথ অনুসরণ করেই চলতেন। এখন যদি কউ রাসূলের প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করে, রাসূলের আদর্শ অনুসরণ করে চলতে প্রস্তুত না হয়, আর এ জন্যে মুমিন সমাজের অনুসৃত আদর্শকে বাদ দিয়ে অপর কোনো আদর্শকে অনুসরণ করে চলে, তবে তার পরিণাম জাহান্নাম ছাড়া আর কিছু নয়। অতএব রাসূলের ‘সুন্নাত’কে অনুসরণ করে চলাই কল্যাণ ও মুক্তিলাভের একমাত্র উপায়।

হাদীসে নবী করীমের ভাষায় ‘সুন্নাত’ কেই বলা হয়েছে ‘আল-আমর’। হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর বর্ণিত একটি হাদীসে বলা হয়েছে, নবী-করীম (স) ঘোষণা করেছেনঃ যে লোক আমার এই জিনিসে এমন কোনো জিনিস নতুন শামিল বা উদ্ভাবন করবে, যা মূলত এই জিনিসের অন্তর্ভুক্ত নয়, তা-ই প্রত্যাখ্যত হবে।

এই হাদীসে ‘আমর’ (অমর) বলে বুঝিয়েছেন মূল দ্বীন ইসলামকে, যা নবী করীম (স) দুনিয়ায় উপস্থাপিত করেছেন। কেননাঃ এই দ্বীন-ইসলামই তাঁর কর্মনীতি এবং তাঁর মান-মর্যাদা ও অবস্থার সাথে পূর্ণ সম্পৃক্ত। আল্লামা কাজী ইয়াজ এ হাদীসের অর্থ বলেছেন এ ভাষায়ঃ যে লোক ইসলামে এমন কোনো মত বা রায় প্রবেশ

করাবে-ইসলামী বলে চালিয়ে দেবে, যার অনুকূলে কুরআন ও হাদীসে কোনো স্পষ্ট প্রকাশ্য বা প্রচ্ছন্ন কিংবা প্রকাশযোগ্য কোনো সনদ বর্তমান নেই, তাই প্রত্যাহারযোগ্য। আর এ জিনিসেরই অপর নাম ‘বিদয়াত’।

উপরোক্ত হাদীসে রাসূলে করীম (সাঃ) ‘আমার এই ব্যাপারে’ বলে ইসলামকেই বুঝিয়েছেন। এতে প্রমাণিত হলো যে, রাসূলের দৃষ্টিতে এ দ্বীন এক পরিপূর্ণ পূর্ণাঙ্গ ও পূর্ণ পরিমত দ্বীন এবং তা সর্বজন পরিচিত, ব্যাপক প্রচারিত ও অনুভবযোগ্য মাত্রায় সর্বদিকে প্রকাশিত। এ দ্বীন বা দ্বীনের কোনো মৌলিক খুঁটিনাটি দিকও কোনো দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তির নিকট অজ্ঞাত, অপরিচিত বা লুকায়িত নেই। এখন কেউ যদি এতে দ্বীন বহির্ভূত কোনো বিষয় বৃদ্ধি করতে চায়, কোনো অ-দ্বীনি ব্যাপার বা কাজকে ‘দ্বীনি’ বলে চালিয়ে দিতে চায়, তাহলে সেতো গোটা দ্বীনকেই বিনষ্ট করে দিবে। কেননা সে তো মূল দ্বীনকেই আদৌ চিনতে বা বুঝতে পারেনি। এ জন্য বিদয়াতের পরিচয় দান করতে গিয়ে আল্লামা কান্দেলভী লিখেছেনঃ বিদয়াত বলতে বোঝায় এমন জিনিস, যা দ্বীনের ক্ষেত্রে অভিনব, শরীয়তে যার কোনো ভিত্তি নেই, মৌলিক সমর্থন নেই। শরীয়তের পরিভাষায় তারই নাম হচ্ছে বিদয়াত।

‘বিদয়াত’ এর এ সংজ্ঞা হতে স্পষ্ট জানা গেল যে, ব্যবহারিক জীবনের কাজে কর্মে ও বৈষয়িক জীবন যাপনের নিত্য নতুন উপায় উদ্ভাবন এবং নবাবিস্কৃত যন্ত্রপাতি নির্মাণের সঙ্গে শরীয়তী বিদয়াতের কোনো সম্পর্ক নেই। কেননা তার কোনোটিই ইবাদত হিসেবে ও

আল্লাহর কাছে সওয়াব পাওয়ার আশায় করা হয়না। অবশ্য এ পর্যায়েও শর্ত এই যে, তার কোনোটিই শরীয়তের মূল আদর্শের বিপরীত হতে পারবেনা। অনুরূপভাবে যেসব ইবাদত নবী করীম (স) কিংবা সাহাবায়ে কিরাম (রা) হতে কথার কিংবা কাজের বিবরণ এর মাধ্যমে সুস্পষ্টভাবে ও ইশারা ইঙ্গিতে প্রমাণিত, তাও বিদয়াত নয়। এই সঙ্গে এ কথাও জানা গেল যে, নবী করীম (স) এর জমানায় যে কাজ করার প্রয়োজন হয়নি; কিন্তু পরবর্তীকালে কোনো দ্বিনি কাজের জন্য দ্বিনি লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যেই তা করার প্রয়োজন দেখা দিবে, তা করাও বিদয়াত পর্যায়ে গণ্য হতে পারেনা। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, প্রচলিত নিয়মে মাদ্রাসা শিক্ষা ও প্রচারমূলক সংস্থা ও দ্বিনি প্রচার বিভাগ কয়েম করা, কুরআন হাদীস বুঝাবার জন্যে আরবী ব্যাকরণ রচনা বা ইসলাম বিরোধীদের জবাব দেবার জন্যে যুক্তিবিজ্ঞান ও দর্শন রচনা, জিহাদের জন্যে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র, যন্ত্রপাতি ও আধুনিক যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষাদান, দ্রুতগামী ও সুবিধাজনক যানবাহন ব্যবহার এসব জিনিস এক হিসেবে ইবাদতও বটে যদিও এগুলো রাসূলে করীম(স) এবং সাহাবায়ে কিরামের যুগে বর্তমান রূপে প্রচলিত হয়নি। তা সত্ত্বেও এগুলোকে বিদয়াত বলা যাবেনা। কেননা এসবের এভাবে ব্যবস্থা করার কোনো প্রয়োজন সেকালে দেখা দেয়নি। কিন্তু পরবর্তীকালে এর প্রয়োজন দেখা দিয়েছে বলেই তা করা হয়েছে এবং তা দ্বিনের জন্যই জরুরী। আর সত্য কথা এই যে, এসবই সেকালে ছিল সেকালের উপযোগী ও প্রয়োজনীয় রূপে ও ধরনে। তাই আজ এর কোনোটিই ‘বিদয়াত’ নয়।

এসব সম্পর্কে এ কথাও বলা চলে যে, এগুলো মূলত কোনো ইবাদত নয়। এগুলো করলে সওয়াব হয়, সে নিয়তেও তা কটু করেনা। এগুলো হলো ইবাদতের উপায়, মাধ্যম বা ইবাদতের পূর্বশর্ত। তার মানে এগুলো এমন নয়, যাকে বলা যায় ‘দ্বীনের মধ্যে নতুন জিনিসের উদ্ভাবন।’ এবং এগুলো হচ্ছে – ‘দ্বীনি পালন ও কার্যকরকরণের উদ্দেশ্যে নবোদ্ভাবিত জিনিস।’ আল কুরআন ও হাদীসের নিষিদ্ধ হলো দ্বীনের ভিতর দ্বীনরূপে নতুন জিনিস উদ্ভাবন করা। দ্বীনের বাস্তবায়নের জন্য নতুন জিনিস উদ্ভাবনতো নিষিদ্ধ নয় আদৌ। কাজেই এ জিনিসকে না বিদয়াত বলা যাবে, না তা অবশ্যই অপরিহার্য বলে বিবেচিত হবে। কুরআনের আয়াত - যারা নিজেদের দ্বীনের মূলকে নানাভাণ্ডে ভাগ করে নানা দিকে যাওয়ার পথ বের করেছে এবং নানা দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে, তাদের সাথে আপনার-হে নবী - কোনোই সম্পর্ক নেই।

এ আয়াতের তাফসীরে আল্লামা খাজেন লিখেছেন, হযরত আবু হুরায়রার বর্ণনা অনুযায়ী এখানে বলা হয়েছে, এ উম্মতে মুসলিমার গোমরাহ লোকদের কথা। আর অপর এক হাদীস অনুযায়ী নবী করীম (স) বলেছেন, এ আয়াতে মুসলিম উম্মতের বিদয়াতপন্থী, সংশয়বাদী ও পথভ্রষ্ট লোকদের কথাই বলা হয়েছে।

এ আলোচনার ফলে প্রমাণিত হয় যে, নবী করীম (স) যে দ্বীন আল্লাহর নিকট হতে লাভ করেছেন, যা তিনি নিজে বাস্তব জীবনে অনুসরণ করে চলেছেন এবং যা তিনি জনগণের সামনে উপস্থাপিত করেছেন ও অনুসরণ করে চলতে বলেছেন, এক কথায় একটি

পরিভাষা হিসেবে তা-ই হচ্ছে সুন্নাহ। আর তার বিপরীত যা কিছু-আকীদা, বিশ্বাস, আমল ও চরিত্র তা যে কোনো ক্ষেত্রেই হোক তা-ই হলো ‘বিদয়াত’। এ দৃষ্টিতে ‘সুন্নাহ’ ও ‘বিদয়াত’ দুটি পরস্পর বিপরীত, পরস্পর বিরোধী মতাদর্শ, সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী চিন্তা-বিশ্বাস, জীবনধারা ও জীবন ব্যবস্থা। এ দুটো সরলরেখার মতো পরস্পর বিপরীতদিকে ধাবিত। যা সুন্নাহ তা বিদয়াত নয়; যা বিদয়াত তা সুন্নাহ নয়। অনুরূপভাবে সুন্নাহ কখনো বিদয়াত হতে পারেনা এবং বিদয়াত কোনোরূপেই এবং কারো কথাতেই সুন্নাহরূপে গৃহীত হতে পারেনা^{২৯}।

আকায়েদ ও ফিকাহর দৃষ্টিতে বিদআত

আকায়েদ ও ফিকাহর কিতাবাদিতেও ‘বিদয়াত’ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। কেননা বিদয়াত ইসলামে এক বড় গর্হিত কাজ এবং সর্বপর্যায়ে তা বর্জন করে চলাই মুমিনের কর্তব্য। সাধারণভাবে মুসলমানদের এ মহা অন্যায় থেকে বাঁচবার জন্যেই এসব কিতাবে বিদয়াত সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। আমরা এখানে কয়েকটি কিতাবের ভাষ্য উল্লেখ করছি।

‘কাশফ বজদুভী’ কিতাবে বলা হয়েছেঃ “বিদয়াত হচ্ছে দ্বীন এ নতুন উদ্ভাবিত জিনিস, যা সাহাবায়ে কিরাম ও তাবেরীন আমলে আসেন”।

‘শরহে মাক্কাসিদ’ গ্রন্থে বলা হয়েছেঃ ঘৃণিত বিদয়াত বলতে বোঝায় এমন জিনিস, যা দ্বীনের মধ্যে নতুন উদ্ভাবন করা হয়েছে, অথচ তা

^{২৯} সুন্নাহ ও বিদয়াত – মাওলানা আব্দুর রহীম (রহঃ), পৃষ্ঠা নং – ২৫, খায়রুল প্রকাশনী, ঢাকা

সাহাবায়ে ও তাবেরীনে এর জমানায় ছিলনা। আর না শরীয়তের কোন দলীলই তার সমর্থনে রয়েছে।

আল্লামা শিহাবউদ্দীন আফেন্দী লিখিত 'মাজালিসুল আবরার' গ্রন্থে বলা হয়েছেঃ জেনে রেখো, বিদ'আত শব্দের দুটো অর্থ। একটি আভিধানিক আর তা হচ্ছে, যে কোনো নতুন জিনিস, তা ইবাদতের জিনিস হোক, কি অভ্যাসগত কোনো ব্যাপার। দ্বিতীয় হচ্ছে শরীয়তী পারিভাষিক অর্থ। এ দৃষ্টিতে বিদ'আত হচ্ছে সাহাবাদের পরে দ্বীন ইসলামের কোনো জিনিস বাড়িয়ে দেয়া কিংবা হ্রাস করা যে সম্পর্কে নবী করীম (সাঃ) এর তরফ থেকে কথা কিংবা কাজের দিক দিয়ে স্পষ্ট কিংবা অস্পষ্ট কোনো অনুমতিই পাওয়া যায়না^{৩০}।

বিদ'আত সম্পর্কে প্রখ্যাত আলেমদের সংজ্ঞা

নিম্নে বিদ'আত সম্পর্কে প্রখ্যাত আলেমদের দেয়া কয়েকটি উল্লেখ যোগ্য সংজ্ঞা উপস্থাপন করছিঃ

১। ইমাম নববী (رحمه الله) বলেন-

البدعة كل شيء عمل غير مثال سبق وفي الشرع احداث مالم يكن في عهد رسول الله صـ

বিদ'আত বলা হয় এমন কার্যকলাপকে যার কোন পূর্ব দৃষ্টান্ত নেই। আর শরীয়তের পরিভাষায় বিদ'আত বলা হয় এমন সব বিষয়কে যা রাসুল (ﷺ) এর যমানায় ছিল না। বিদ'আত সম্বন্ধে ইমাম নববী (রহঃ) আরও বক্তব্য প্রদান করেছেন। যেমনঃ ইমাম নববী (رحمه الله)

^{৩০} সুন্নাত ও বিদ'আত - মাওলানা আব্দুর রহীম (রহঃ), পৃষ্ঠা নং - ৩৯, খায়রুন প্রকাশনী, ঢাকা

আয়েশা (রাঃ) এর হাদীসের উপর একটি মূল্যবান কথা বলেছেন।
তিনি বলেন, রাসূল (ﷺ) এর বানীঃ

مَنْ أَحَدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ

অর্থঃ যে ব্যক্তি আমাদের পক্ষ থেকে স্বীকৃত নয় এমন কোন
আমলের প্রচলন করল তা প্রত্যাখ্যাত। দ্বিতীয় বর্ণনায় এসেছেঃ

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

অর্থঃ যে ব্যক্তি আমাদের পক্ষ থেকে স্বীকৃত নয় এমন কোন আমল
করল তা প্রত্যাখ্যাত হব।” হাদীসদ্বয়ে উল্লেখিত শব্দ সম্বন্ধে
আরবগণ الرد শব্দটা এখানে مردود তথা প্রত্যাখ্যাত যার প্রকৃত অর্থ
হচ্ছেঃ যে আমল রাসূল (ﷺ) এর পক্ষ থেকে অনুমোদিত নয় তা
বাতিল, প্রত্যাখ্যাত ও অগ্রহণযোগ্য। এ হাদীসটি ইসলামের
গুরুত্বপূর্ণ একটি উসূল বা মূলনীতি। এর মাধ্যমে সকল প্রকারের
বিদআত নব আবিষ্কৃত ও বানোয়াট বিষয়াবলীর মূলোৎপাটন করা
হয়েছে। তবে আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা দু’টির প্রথমটিতে مَنْ أَحَدَثَ ও
مَنْ عَمِلَ শব্দ এসেছে। এ হাদীসদ্বয়ের মাধ্যমে সকল প্রকার
বিদআতকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যেমনঃ কেউ পূর্ব প্রবর্তিত
বিদআত অনুযায়ী আমল করল কিন্তু সে নিজে এর প্রবর্তক নয়,
তাহলে তাকে দ্বিতীয় হাদীসের আওতাভুক্ত বলা হবে।

মোট কথা সকল প্রকার বিদআত চাই সেটা আমল করা হোক বা
প্রবর্তন করা হোক সবই পথভ্রষ্টতার শামিল ও প্রত্যাখ্যাত”।

২। মুফতি সাইয়্যদ মুহাম্মদ আমীমুল ইহসান (রহঃ) বলেন-

هي الامر المحدث الذي لم يكن عليه الصحابة والتابعون ولم يكن مما
اقتضاه الدليل الشرعي

“এমন নব উদ্ভাবিত বিষয় যা সাহাবা ও তাবিঈনের যুগে ছিল না
এবং যার উদ্ভাবন শরয়ী কোন দলিলের সাথে সম্পৃক্ত নয়।

৩। প্রখ্যাত হাদীসবিদ ইমাম খাত্তাবী বলেন -

وكل شيء احدث على غير اصل من اصول الدين وعلى غير عياره وقياسه واما ما
كان مبنيا على قواعد الاصول ومردود اليها فليس ببدعة ولا ضلالة

“যে মত বা নীতি দ্বীনের মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত নয় এবং কোন
দৃষ্টান্ত ও ক্রিয়াস সমর্থিত নয় এ রকম যাই নতুন আবিষ্কৃত হবে
তাই বিদআত।”

বিদআত সম্পর্কে সাহাবায়ে কেরামদের অভিমত

বিদআত সম্পর্কে সাহাবায়ে কেরামদের যে সকল অভিমত সমূহ
রয়েছে তা নিম্নরূপ আলোচনা করে উপস্থাপন করা হলোঃ-

১। ইবনে সা’দ (রহঃ) আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন,
তিনি বলেনঃ উপস্থিত জনতা! নিশ্চয়ই আমি সুন্নাতের অনুসারী
বিদআতপন্থী নই। যদি আমি ভাল কাজ করি তাহলে আমাকে
সাহায্য করবে, আর যদি ভুল করি তাহলে সংশোধন করে দিবে^{৩২}।

২। ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) বলেন, তোমরা তর্কবীদদের থেকে
দূরে থাক। কেননা তারা সুন্নাতের দুশমন এবং হাদীস অনুযায়ী

আমলে অক্ষম। তারা মনগড়া মতামত বা রায় দিয়ে নিজেরাও গোমরাহ হয় অন্যকেও গোমরাহ করে^{৩৩}।

৩। মুহাম্মদ ইবন কাছীর (রহঃ) সুফিয়ান (রাঃ) থেকে বর্ণিত।
তিনি বলেনঃ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَسْأَلُهُ عَنِ الْقَدْرِ، ح وَحَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُؤَدِّي، قَالَ حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ ذَلِيلٍ، قَالَ سَمِعْتُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ، يُحَدِّثُنَا عَنِ الْقَضَرِ، ح وَحَدَّثَنَا هَذَا بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ قَبِيصَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ، عَنْ أَبِي الصَّلْتِ، - وَهَذَا لَفْظُ حَدِيثِ ابْنِ كَثِيرٍ وَمَعْنَاهُمْ - قَالَ كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَسْأَلُهُ عَنِ الْقَدْرِ فَكَتَبَ أَمَّا بَعْدُ أُوصِيكَ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالْإِقْتِصَادِ فِي أَمْرِهِ وَاتَّبَاعِ سُنَّةِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَرْكِ مَا أَحَدَثَ الْمُحَدِّثُونَ بَعْدَ مَا جَرَتْ بِهِ سُنَّتُهُ وَكُفُّوا مُؤَنَّتَهُ فَعَلَيْكَ بِلُزُومِ السُّنَّةِ فَإِنَّهَا لَكَ بِإِذْنِ اللَّهِ عِصْمَةٌ ثُمَّ أَعْلَمَ أَنَّهُ لَمْ يَتَّبِعْ النَّاسَ بِدَعَاةٍ إِلَّا قَدْ مَضَى قَبْلَهَا مَا هُوَ دَلِيلٌ عَلَيْهَا أَوْ عِبْرَةٌ فِيهَا فَإِنَّ السُّنَّةَ إِنَّمَا سَنَّهَا مَنْ قَدْ عَلِمَ مَا فِي خِلَافِهَا وَلَمْ يَقُلْ ابْنُ كَثِيرٍ مَنْ قَدْ عَلِمَ . مِنَ الْخَطَا وَالزَّلَلِ وَالْحُمَقِ وَالتَّعَمُّقِ فَارْضَ لِنَفْسِكَ مَا رَضِيَ بِهِ الْقَوْمُ لِأَنْفُسِهِمْ فَإِنَّهُمْ عَلَى عِلْمٍ وَقَفُوا وَبَيَّصَرٍ نَافِذٍ كَفُّوا وَلَهُمْ عَلَى كَشْفِ الْأُمُورِ كَانُوا أَقْوَى وَبِفَضْلِ مَا كَانُوا فِيهِ أَوْلَى فَإِنْ كَانَ الْهُدَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ لَقَدْ سَبَقْتُمُوهُمْ إِلَيْهِ وَلَيْتُمْ قُلْتُمْ إِنَّمَا حَدَثَ بَعْدَهُمْ . مَا أَحَدَثَهُ إِلَّا مَنْ اتَّبَعَ غَيْرَ سَبِيلِهِمْ وَرَغِبَ بِنَفْسِهِ عَنْهُمْ فَإِنَّهُمْ هُمُ السَّابِقُونَ فَقَدْ تَكَلَّمُوا فِيهِ بِمَا يَكْفِي وَوَصَفُوا مِنْهُ مَا يَشْفِي فَمَا دُونَهُمْ مِنْ مَقْصَرٍ وَمَا فَوْقَهُمْ مِنْ مَحْسَرٍ وَقَدْ قَصَرَ قَوْمٌ دُونَهُمْ فَجَفَوْا وَطَمَحَ عَنْهُمْ أَقْوَامٌ فَعَلَوْا وَإِنَّهُمْ بَيْنَ ذَلِكَ لَعَلَى هُدًى مُسْتَقِيمٍ كَتَبْتُ تَسْأَلُ عَنِ الْإِقْرَارِ بِالْقَدْرِ فَعَلَى الْحَقِيرِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَعْتُ مَا أَعْلَمُ مَا أَحَدَثَ النَّاسُ مِنْ مُحَدَّثَةٍ وَلَا ابْتَدَعُوا مِنْ بَدْعَةٍ هِيَ أَثْبَتُ أَثَرًا وَلَا أَثْبَتُ أَمْرًا مِنَ الْإِقْرَارِ بِالْقَدْرِ لَقَدْ كَانَ ذِكْرُهُ فِي

الْجَاهِلِيَّةِ الْجَهْلَاءُ يَتَكَلَّمُونَ بِهِ فِي كَلَامِهِمْ وَفِي شَعْرِهِمْ يُعَزُّونَ بِهِ أَنْفُسَهُمْ عَلَى مَا فَاتَهُمْ
 ثُمَّ لَمْ يَزِدْهُ الْإِسْلَامُ بَعْدَ إِلَّا شِدَّةً وَلَقَدْ ذَكَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَيْرِ
 حَدِيثٍ وَلَا حَدِيثَيْنِ وَقَدْ سَمِعَهُ مِنْهُ الْمُسْلِمُونَ فَتَكَلَّمُوا بِهِ فِي حَيَاتِهِ وَبَعْدَ وَفَاتِهِ يَقِينًا
 وَتَسْلِيمًا لِرَبِّهِمْ وَتَضَعِيفًا لَأَنْفُسِهِمْ أَنْ يَكُونَ شَيْءٌ لَمْ يُحِظْ بِهِ عِلْمُهُ وَلَمْ يُخَصَّصْ كِتَابُهُ
 وَلَمْ يَمِضْ فِيهِ قَدَرُهُ وَإِنَّهُ مَعَ ذَلِكَ لَفِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ مِنْهُ افْتَبَسُوهُ وَمِنْهُ تَعَلَّمُوهُ وَلَئِنْ
 قُلْتُمْ لَمْ أَنْزَلِ اللَّهُ آيَةً كَذَا وَلَمْ قَالَ كَذَا . لَقَدْ قَرَأُوا مِنْهُ مَا قَرَأْتُمْ وَعَلِمُوا مِنْ تَأْوِيلِهِ مَا
 جَهِلْتُمْ وَقَالُوا بَعْدَ ذَلِكَ كُلِّهِ بِكِتَابٍ وَقَدَرٍ وَكُتِبَتِ الشَّقَاوَةُ وَمَا يُقَدَّرُ يَكُنْ وَمَا شَاءَ
 اللَّهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ وَلَا تَمْلِكُ لَأَنْفُسِنَا ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ثُمَّ رَغَبُوا بَعْدَ ذَلِكَ
 وَرَهَبُوا

এক ব্যক্তি উমার ইবন আবদুল আযীয (রঃ) - এর নিকট পত্রযোগে
 তাকদীর সম্পর্কে জানতে চান। আবুস সালত (রঃ) থেকে বর্ণিত।
 তিনি বলেনঃ এক ব্যক্তি তাকদীর সম্পর্কে জানার জন্য উমার ইবন
 আবদুল আযীয (রঃ) - কে পত্র লেখেন। এর জবাবে তিনি লেখেনঃ
 আমি তোমাকে ওসীয়ত করছি - আল্লাহকে ভয় করার জন্য এবং
 তাঁর হুকুম মেনে চলার জন্য এবং তাঁর নবীর সুন্নাতের অনুসরণ
 করার জন্য। আর বিদ'আতীগণ যা উদ্ভাবন করেছে, তা পরিহার
 করার জন্য আমি তোমাকে ওসীয়ত করছি। বিদ'আতীরা এসব কথা
 তখন উদ্ভাবন করেছে, যখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) - এর সুন্নাত প্রতিষ্ঠিত
 হয়েছে। বিদ'আত সৃষ্টির পর তারা বিভ্রান্ত হয়েছে। তোমার উচিত,
 সুন্নাতকে দুঢ়ভাবে ধারণ করা। কেননা, সুন্নাতের উপর আমল
 করলে তুমি আল্লাহর হুকুমে গুমরাহী থেকে বেঁচে যাবে। জেনে রাখ!
 লোকেরা এমন কোন বিদ'আত সৃষ্টি করিনি, যা বাতিল হওয়ার জন্য
 দলীল বর্ণিত হয়নি এবং তা দেখাতে শিক্ষা হয়নি। আর সুন্নাতকে

তিনি জারী করেছেন, যিনি জানতেন, এর বিরোধিতা করলে কিরূপ গুনাহ, ত্রুটি-বিচ্যুতি ও আহমকী হবে। কাজেই তুমি সে তরীকার অনুসরণ কর, যে তরীকা অনুসরণ করেছিল পূর্ববর্তীগণ। কেননা, তাঁরা দীনের ইলম সম্পর্কে গভীর জ্ঞানী ছিলেন। আর যে কাজ করতে তাঁরা নিষেধ করেছেন, তা জেনে-শুনেই করেছেন। তারা দীনের অর্থ বুঝার ক্ষেত্রে আমাদের চাইতে অনেক ক্ষমতার অধিকারী ছিল। আর তাদের মাঝে যে যোগ্যতা ছিল, তা ছিল উন্নতমানের। তোমরা যে তরীকার উপর প্রতিষ্ঠিত আছ, যদি তা-ই হিদায়াত হয়, তবে তোমরা অগ্রগামী হয়ে যাবে। আর যদি তোমরা বল, যারা দীনের মধ্যে নতুন কথা সৃষ্টি করেছে; তবে আমরা বলবোঃ আগের লোকেরাই উত্তম ছিল এবং তারা এদের চাইতে অগ্রগামী ছিল। যতটুকু বর্ণনা করার, তা তাঁরা করেছেন। আর যতটুকু বলা দরকার, তা সবই করেছেন; এর উপরেও কিছু বলার নেই এবং নীচেও কিছু বলার নেই। কিছু লোক তাদের থেকে কম বর্ণনা করেছে, তারা ক্ষতি করেছে; আর কিছু লোক তাদের চাইতে বেশী বর্ণনা করেছেন। পূর্ববর্তী আলিমগণ মধ্যপন্থী ছিলেন এবং তাঁরা সোজা-সরল রাস্তার অনুসরণকারী ছিলেন। তুমি পত্রে তাকদীর সম্পর্কে জানতে চেয়েছ। আল্লাহ্ এর হুকুমে তুমি এ প্রশ্ন সম্পর্কে তাদের চাইতে অধিক জ্ঞানী। আমি মনে করি, যত বিদ'আতী সৃষ্টি হয়েছে এবং তারা যা নতুন উদ্ভাবন করেছে, এর মধ্যে তাকদীরের বর্ণনা খুবই স্পষ্ট এবং মজবুত। জাহিলী যুগের লোকেরা তাদের কথাবার্তায় তাকদীরের কথা বলতো এবং তাদের কবিতায় ---

তাকদীর থেকে মসীবত দূর করে দিত। অবশেষে ইসলাম এ ধারণাকে আরো শক্ত করেছে।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এক বা দুই হাদীসে নয়, বরং অনেক হাদীসে তাকদীরের কথা বর্ণনা করেছেন। মুসলমানের তাঁর থেকে এসব শুনেছেন এবং অন্যের কাছে বর্ণনাও করেছেন - তাঁর জীবদ্দশায় এবং মৃত্যুর পরও; এর উপর বিশ্বাস রেখে এবং মেনে নিয়ে। অরি নিজের দুর্বলতা সম্পর্কে জেনে যে এমন কিছুই নেই, যা আল্লাহ জানেন না এবং তাঁর কিতাবে লেখা নেই, অথবা এ ব্যাপারে আল্লাহ-ফায়সালা বাস্তবায়িত হয়নি। উল্লেখ্য যে, তাকদীরের বর্ণনা আল্লাহ মজবুত কিতাবে রয়েছে, তা থেকে পূর্ববর্তীগণ তাকদীরের মাসআলা-মাসায়েল শিখেছে। যদি তুমি বলঃ কেন আল্লাহ এ আয়াত নাযিল করেন, আর কেন এমন বলেন (যা বাহ্যতঃ তাকদীরের বিপরীত)? এর জবাব হলোঃ আগের যুগের লোকেরা এ আয়াত পড়েছিল এবং তারা এর ব্যাখ্যা সম্পর্কে সম্যক অবহিত ছিল, যা তোমরা জান না। তারা আল্লাহ কিতাব ও তাকদীর সম্পর্কে বলতোঃ তা-ই হবে, যা আল্লাহ চান; আর তা হবে না, যা তিনি চান না। আর আমরা আমাদের উপকার ও অপকারের পূর্ণ ক্ষমতা রাখি না। এ বিশ্বাসের উপর পূর্ববর্তীগণ উত্তম কাজ করতেন এবং খারাপ কাজ করতে ভয় পেতেন^{৩৪}।

৪। বিদ'আত সম্পর্কে মা আয়েশা (রাঃ) এর অভিমতঃ নাবী কারীম [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর প্রিয়তমা আয়েশা [রাদিয়াল্লাহু

৩৪ সুনান আবু দাউদ :: কিতাব আস-সুন্নাহ অধ্যায় ৪২, হাদীস ৪৬১২

আনহা] থেকে বর্ণিত যে, নিশ্চয় আল্লাহর রাসূল [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেছেনঃ

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ زُرٌّ".

صحيح مسلم, رقم الحديث 18- (1718), وصحيح البخاري, رقم الحديث (2697), واللفظ لمسلم

অর্থ: “যে ব্যক্তি ইসলাম ধর্মের কর্ম হিসেবে এমন কোনো কর্ম সম্পাদন করবে, যে কর্মের বিষয়ে আমাদের প্রকৃত ইসলাম ধর্মের কোনো উপদেশ নেই। তাহলে সেই কর্মটি পরিত্যাজ্য বলেই বিবেচিত হবে”^{৩৫}।

বিদআত সম্পর্কে তাবেয়ী ও তাবে তাবেয়ীগণের অভিমত

বিদআত সম্পর্কে তাবেয়ী ও তাবে তাবেয়ীগণের যে সকল অভিমত সমূহ রয়েছে তা নিম্নরূপ আলোচনা করে উপস্থাপন করা হলোঃ-

১। হাসান বসরী (রহঃ) বলেন, আমল ব্যতীত কোন কথা সহীহ হবে না, নিয়ত ব্যতীত কোন কথা ও আমল সহীহ হবে না এবং সুন্নাতের অনুসরণ ব্যতীত কোন নিয়ত, আমল ও কথা সহীহ হবে না^{৩৬}

২। ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) বলেন, তর্কবিদদের ব্যাপারে আমরা ফায়সালা হলো খেজুরের ডাল দ্বারা তাদের প্রহার কর, উটের উপর আরোহন করাও, প্রতিটি গোত্রের মধ্যে প্রদক্ষিণ করার কালে একথা

^{৩৫} সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৮-(১৭১৮) এবং সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৬৯৭, তবে হাদীসের শব্দগুলি সহীহ মুসলিম থেকে নেওয়া হয়েছে।

^{৩৬} শরহে উসুলে ইতিকাদে সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ : ১/৬৩ নং ১৮

বলতে থাকে যে, এরা কুরআন ও সুন্নাতে ছেড়ে তর্কশাস্ত্র গ্রহণ করেছে। তাই এটাই তার উপযুক্ত বদলা^{৭৭}।

৩। ইমাম মালেক (রহঃ) বলেন, যে ইসলামে উত্তম মনে করে কোন বিদ'আত প্রচলন করলে যে যেন এ ধারণা পোষন করল যে, মুহাম্মাদ (সাঃ) তাঁর রিসালতের দায়িত্বে খিয়ানত করেছেন। পক্ষান্তরে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ.

অর্থঃ আজ তোমাদের জন্য তোমাদের ধীন পূর্ণাঙ্গ করলাম^{৭৮}।
অতএব, এ যুগান্তকারী ঘোষণা কালে যে আমল ধীন হিসাবে স্বীকৃত ছিল না, তা আজও ধীন হতে পারে না^{৭৯}।

৪। ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহঃ) বলেন, সুন্নাতের উসুল হলো, রাসূলের (সাঃ) সাহাবীগণ যা করেছেন তা গ্রহণ করা, তাদের অনুকরণ করা ও বিদ'আত পরিত্যাগ করা। কেননা সকল বিদ'আতই ভ্রষ্টতা। তাই ঝগড়া বিবাদ পরিহার করা, প্রবৃত্তির অনুসারীদের সংস্পর্শ থেকে দূরে থাকা, লৌকিকতা পরিহার করা এবং ধীনের ব্যাপারে বাকবিতণ্ডায় না জড়ানো উচিত^{৮০}।

বিদ'আত সম্পর্কে সালফে সালেহীনদের অভিমত

বিদ'আত সম্পর্কে সালফে সালেহীনদের যে সকল অভিমত সমূহ রয়েছে তা নিম্নরূপ আলোচনা করে উপস্থাপন করা হলোঃ-

৩৭ আল হিলইয়াহ লেখক আবু নাসিম : ৯/১১৬

৩৮ সূরা মায়দা, আয়াত নং - ৩

৩৯ আল ইতিসাম, লেখক শাতেবী (রহঃ) : ১/৬৫

৪০ শরহে উসূলে ইতিকাদে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জমাআহ : ১/১৭৬

সালফে সালেহীনের উক্তি হতে কতিপয় নব আবিষ্কৃত বিষয়কে উত্তম বলা হয়েছে। এর দ্বারা আভিধানিক বিদ'আত বুঝানো হয়েছে, শরীয়তে নিষিদ্ধ বিদ'আত বুঝানো হয় নি। যেমনঃ

(ক) উমর (রাঃ) এর যুগে যখন রামাজান মাসে লোকজন মসজিদে একজন ইমামের পিছনে তারাবীহর সালাত পড়ার জন্য একত্রিত হলো তখন তিনি বের হলেন এবং লোকজনকে এ অবস্থায় দেখে বললেন, এটা কতই না উৎকৃষ্ট বিদ'আত^{৪১}। উমর (রাঃ) এর এ কথার উদ্দেশ্য হচ্ছে এর মধ্যে এ ধরনের কাজ আর কখনো সংঘটিত হয় নি অথচ এটা শরীয়তের অন্তর্ভুক্ত।

(খ) রাসূল (ﷺ) রামাজান মাসে কিয়ামুল-লাইলের জন্য উৎসাহ প্রদান করেছেন। তাঁর জীবদ্দশয়া লোকজন মসজিদে এসে কেউ জামআতে, কেউ একা কিয়ামুল লাইল তথা নফল সালাত আদায় করতেন। রাসূল (ﷺ) ও সাহাবীদের নিয়ে মাঝে মাঝে জামআতের সালাত আদায় করতেন। তিনি ভবিষ্যত উম্মতের অক্ষমতার বিষয় ও পরে তা ফরয করে দেয়ার আশংকায় তা আদায় করতে নিষেধ করেছিলেন। যেমনঃ ইয়াহইয়া ইবন বুকায়র (রঃ) আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي
عُرْوَةُ، أَنَّ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
خَرَجَ لَيْلَةً مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ، فَصَلَّى فِي الْمَسْجِدِ، وَصَلَّى رِجَالٌ بِصَلَاتِهِ، فَأَصْبَحَ
النَّاسُ فَتَحَدَّثُوا، فَاجْتَمَعَ أَكْثَرُ مِنْهُمْ، فَصَلُّوا مَعَهُ، فَأَصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَّثُوا،

فَكَثُرَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَصَلَّى، فَصَلَّوْا بِصَلَاتِهِ، فَلَمَّا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الرَّابِعَةُ عَجَزَ الْمَسْجِدُ عَنْ أَهْلِهِ، حَتَّى
خَرَجَ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ، فَلَمَّا قَضَى الْفَجْرَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، فَتَشَهَّدَ ثُمَّ قَالَ " أَمَّا
بَعْدُ، فَإِنَّهُ لَمْ يَخَفْ عَلَى مَكَائِكُمْ، وَلَكِنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْتَرَضَ عَلَيْكُمْ فَتَعْجِزُوا
عَنْهَا ". فَتَوَقَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন এক রাতের
মধ্যভাগে বের হন, অতঃপর মসজিদে সালাত আদায় করেন। কতক
লোক তার সাথে সালাত আদায় করল। মানুষেরা এ ঘটনা বলাবলি
করতে লাগল, ফলে তার চেয়ে অধিক লোক জমা হল।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বিতীয় রাতে তাদের নিকট
গেলেন, তারা তার সাথে সালাত আদায় করল। মানুষেরা এ ঘটনা
বলাবলি করতে লাগল। তৃতীয় রাতে আরো অধিক লোক মসজিদে
জড়ো হল। তিনি তাদের নিকট বের হলেন, তারা তার সাথে সালাত
আদায় করল। যখন চতুর্থ রাত হল, লোকের সমাগমে মসজিদ
সংকীর্ণ হয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের
নিকট বের হলেন না। উপস্থিত কেউ কেউ বলতে ছিল: আস-
সালাত, রাসূলুল্লাহ তাদের নিকট বের হলেন না, একেবারে ফজর
সালাতের জন্য বের হলেন। যখন ফযর শেষ করলেন মানুষের
দিকে মুখ করলেন, অতঃপর খুৎবা পড়ে বললেনঃ

«أما بعد، فإنه لم يخف عليَّ شأنكم، ولكنني خشيت أن تُفرض عليكم صلاة
الليل فتعجزوا عنها»

“অতঃপর, তোমাদের অবস্থা আমার নিকট গোপন ছিল না, কিন্তু আমি আশঙ্কা করেছি তোমাদের ওপর রাতের সালাত ফরয করে দেয়া হবে, তখন তোমরা তা আদায় করতে সক্ষম হবে না”। এটা ছিল রমযানের ঘটনা”।^{৪২}

সুতরাং, উপরোক্ত হাদীসটি স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, ঐ সমস্ত রাতে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর জামাতের সাথে সালাত আদায়ের ধারাবাহিকতার কারনে তারা বীহ্ এর সালাত জামা’আত এর সাথে আদায় করা শরীয়তসম্মত কাজ। পক্ষান্তরে এই হাদীসে তার জামা’আত পরিত্যাগ করাটা জামা’আত করা নিষিদ্ধ হওয়া বুঝাচ্ছে না।

কেননা, তিনি তাঁর ভাষায় এর কারন বর্ণনা দিয়েছেন যে, “আমি ভয় করেছিলাম তোমাদের উপর ফরয হয়ে যাওয়ার” এবং এতে কোন সন্দেহ নেই যে, আল্লাহ্ এর শরীয়ত পরিপূর্ণ করার পর তাঁর তিরোধানের দ্বারা ফরজ হওয়ার ভয় উঠে গেছে। আর এরই মাধ্যমে জামা’আত ত্যাগ করার ওজর দূর হয়ে যাবে এবং পূর্ববর্তী হুকুমটি তথা জামা’আত শরীয়ত সম্মত হওয়ার কাজটি পুনরায় ফিরে আসবে। এ কারনেই হযরত উমর (রাঃ) এটা জীবিত করেছেন। জমহুর উলামা তথা অধিকাংশ আলেমের মত এ বিধানের উপরই রয়েছে^{৪৩}।

৪২ বুখারী: (৯২৪), মুসলিম: (৭৬১)

৪৩ সালাতুত তারা বীহ্ - আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ), অনুবাদ - আহসানুল্লাহ বিন সানাউল্লাহ, তাওহীদ পাবলিকেশন্স, পৃষ্ঠা নং - ২০

(গ) অনুরূপ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর উম্মতদেরকে খোলাফায়ে রাশেদার সুন্নাহের অনুসরণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। আর কিয়ামুল লাইল খোলাফায়ে রাশেদার সুন্নাহ^{৪৪}। অতএব, হাদীস শাস্ত্র, প্রখ্যাত আলেম, সাহাবীদের অভিমত, সালাফে সালাহীনদের সংজ্ঞা ও ফিকাহবিদদের বর্ণিত সংজ্ঞাসমূহ হতে এ সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, বিদআত পারিভাষিক অর্থে ধর্মে কুরআন ও সুন্নাহর দলিল ব্যতিরেকে কোন নতুন বিধান সংযোজন বা বিয়োজন।

সুতরাং, আক্বীদা ও আমলের সে সব আবিষ্কৃত পন্থা ও পদ্ধতিকে বিদআত বলা হয় যা রাসূল (সাঃ), সাহাবা, তাবিঈন ও তাবি তাবিযীনের যামানার পর সওয়াব ও আল্লাহ সন্তুষ্টি হাসিলের উদ্দেশ্যে করা হয়ে থাকে। অথচ এর কোন প্রমাণ তাদের কথায় বা কাজে স্পষ্টরূপে বা ইঙ্গিতে পাওয়া যায় না এবং শরীয়তে এর কোন ভিত্তি নেই।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ – বিদআতের বৈশিষ্ট্য

উপরোক্ত সংজ্ঞাগুলো এবং উপদানসমূহের আলোকে বিদআতের ৪টি বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। নিম্নে সেসব বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা করা হলোঃ

১। বিদআতকে বিদআত হিসেবে চেনার জন্য সুনির্দিষ্ট কোন দলীল পাওয়া যায় না তবে তা নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে মূলনীতিগত আম ও সাধারণ দলীল পাওয়া যায়।

৪৪ জামেউল উলুম ওয়াল হিকাম : ২/ ১২৯

২। বিদ'আত সবসময়ই শরীয়তের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও মাকাসিদ এর বিপরীত ও বিরোধী অবস্থানে থাকে আর এ বিষয়টিই বিদ'আত নিকৃষ্ট ও বাতিল হওয়ার সবচেয়ে বড় প্রমাণ। এ জন্যই হাদীসে বিদ'আত কে ভ্রষ্টতা বলে অভিহিত করা হয়েছে।

৩। অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিদ'আত এমন সব কার্যাবলী সম্পাদনের মাধ্যমে হয়ে থাকে যা রাসূল (সাঃ) ও সাহাবাদের যুগে প্রচলিত ছিল না। ইমাম ইবনুল জাওয়ী (রহঃ) বলেন,

الْبِدْعَةُ عِبَارَةٌ عَنْ فِعْلٍ لَمْ يَكُنْ فَايْتَدَعِ

বিদ'আত বলতে বুঝায় এমন কাজকে যা ছিল না, অতঃপর তা উদ্ভাবন করা হয়েছে^{৪৫}।

৪। বিদ'আতের সাথে শরীয়তের কোন কোন ইবাদতের কিছু মিল থাকে। দুটো ব্যাপারে এ মিলগুলো লক্ষ্য করা যায়ঃ-

প্রথমতঃ দলীলের দিক থেকে এভাবে মিল রয়েছে যে, কোন একটি আম দলীল কিংবা সংশয় অথবা ধারনার ভিত্তিতে বিদ'আত টি প্রচলিত হয় এবং খাস ও দলীলকে পাশ কাটিয়ে এ আম দলীল কিংবা সংশয় অথবা ধারনাটিকে বিদআতের সহীহ ও সঠিক দলীল বলে মনে করা হয়। দ্বিতীয়তঃ শরীয়ত প্রণীত ইবাদতের রূপরেখা ও পদ্ধতির সাথে বিদআতের মিল তৈরী করা হয় সংখ্যা, আকার-আকৃতি, সময় বা স্থানের দিক থেকে কিংবা হুকুমের দিক থেকে। এ মিলগুলোর কারণে অনেকে একে বিদ'আত মনে না করে ইবাদত বলে গণ্য করে থাকেন। উপরোক্ত বৈশিষ্ট্য ও সংজ্ঞাগুলোর আলোকে বিদ'আত সম্বন্ধে

৪৫ তালবীসু ইবলীস, পৃষ্ঠা নং ১৬

আরও বিস্তারিতভাবে বলা যায় যে, যে সকল বিশ্বাস ও কাজকে দ্বীনের অংশ মনে করে অথবা সওয়াব হবে ধারণা করে আমল করা হয় তা বিদ'আত। হাদীসে এসেছেঃ আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد

আমাদের এ দ্বীনে যে এমন কিছু আবিষ্কার করল, যা তার অন্তর্ভুক্ত নয়, তা পরিত্যক্ত।^{৪৬}

এ হাদীস দ্বারা স্পষ্ট হল যে, নতুন আবিষ্কৃত বিষয়টি যদি ধর্মের অন্তর্ভুক্ত বলে ধরে নেয়া হয় তাহলে তা বিদ'আত ও প্রত্যাখ্যাত। হাদীসে আরো এসেছেঃ যে ব্যক্তি এমন কাজ করল যার প্রতি আমাদের (ইসলামের) নির্দেশ নেই তা প্রত্যাখ্যাত।^{৪৭}

এ হাদীসে, যার প্রতি আমাদের নির্দেশ নেই বাক্যটি দ্বারা এ কথা বুঝানো হয়েছে যে, বিষয়টি ধর্মীয় হতে হবে। ধর্মীয় বিষয় হিসাবে কোন নতুন আমল করলেই বিদ'আত হবে।

কুরআন মজীদে বিদ'আত শব্দের উল্লেখ

কুরআন মজীদে বিদ'আত শব্দটি তিনটি স্থানে তিন ভাবে উল্লেখিত হয়েছেঃ- একঃ আল্লাহ সম্পর্কে এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে দুটো আয়াতে। যেমন-

بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ. البقرة

৪৬ সহীহুল বুখারী: ২৫১২, মুসলিম: ৩২৪৮

৪৭ সহীহুল মুসলিম

আসমান ও জমিনের নতুন উদ্ভাবন কারী নতুন সৃষ্টিকারী, তিনি যখন কোনো কাজের ফয়সালা করেন তখন শুধু তাকে বলেনঃ হও, অমনি তা হয়ে যায়।

بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَتَى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ
الْأَنْعَامِ. شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

তিনি তো আসমান যমীনের নব সৃষ্টিকারী। তার সন্তান হবে কোথেকে, কেমন করে হবে তার স্ত্রী? তিনিই তো সব সৃষ্টি করেছেন। এ দুটো আয়াতে আল্লাহ্ তাআলাকে আসমান যমিনের বদীউন তথা পূর্ব দৃষ্টান্ত, পূর্ব উপাদান ও পূর্ব প্রস্তুতি ছাড়াই সৃষ্টিকারী বলা হয়েছে।

দুইঃ অন্য আয়াতে রাসুল (সাঃ) সম্পর্ক এভাবে বলা হয়েছে।

قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ. الْإِحْقَافُ

আপনি বলুন আমি এমন কোন রাসুল নই যার কোন পূর্ব দৃষ্টান্ত নেই। আমি জানিনা আমার ও তোমাদের সাথে কি ব্যবহার করা হবে।

তিনঃ বনি ইসরাঈলের কতিপয় লোকদের বিশেষ আমল সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন-

وَرَهَبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ. الْحَدِيدُ

আর বৈরাগ্যবাদ সেতো তারা নিজেরাই উদ্ভাবন করেছে। আমি এটি তাদের উপর লিখে ফরয করে দেইনি।

উপরোক্ত আয়াত সমূহ থেকে একথা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, **بدعة** শব্দের অর্থ হচ্ছে নাই থেকে সৃষ্টিকরা। নিরস্তির থেকে অস্তিত্ব দেয়া, নব্য উদ্ভাবন ইত্যাদি।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ – বিদ'আত নির্ধারণে মানুষ সাধারণতঃ

তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত

এক : দলীল পাওয়া যায় না এমন প্রতিটি বিষয়কে এক শ্রেণীর মানুষ বিদ'আত হিসেবে চিহ্নিত করেছে এবং এক্ষেত্রে তারা বিশেষ বাছ-বিচার না করেই সব কিছুকে (এমন কি মুআমালার বিষয়কেও) বিদ'আত বলে অভিহিত করেছে। এদের কাছে বিদ'আতের সীমানা বহুদূর বিস্তৃত।

দুই : যারা দ্বীনের মধ্যে নব উদ্ভাবিত সকল বিষয়কে বিদ'আত বলতে রাজী নয়; বরং বড় বড় নতুন কয়েকটিকে বিদ'আত বলে বাকী সবকিছু শরীয়তভুক্ত বলে তারা মনে করে। এদের কাছে বিদআতের সীমানা খুবই ক্ষুদ্র।

তিন : যারা যাচাই-বাছাই করে শুধুমাত্র প্রকৃত বিদ'আত কেই বিদ্বাত বলে অভিহিত করে থাকেন। এরা মধ্যম পন্থাবলম্বী এবং হকপন্থী^{৪৮}।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ – বিদ'আতের উপাদানসমূহ

বিদআতের তিনটি মৌলিক উপাদান রয়েছেঃ

^{৪৮} বিদ'আত পরিচিতির মূলনীতি, ড. মোহাম্মদ মানজুরে ইলাহী, সম্পাদনা : ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া, ইসলাম হাউসের সৌজন্যে, পৃষ্ঠা নং – ১২

১। যদি কেউ কোন বিধান বা আদেশকে ধর্মের উপর আরোপ করে অথবা কোন ধর্মীয় বিধিকে ধর্ম বহির্ভূত বলে ঘোষণা করে তা বিদ'আত হবে। যেমন যদি কেউ *الصلوة خيرٌ من النوم* কে আজানের অংশ বলে ঘোষণা করে অথবা মুতা বিবাহ যা রাসূলের যুগে বৈধ ঘোষিত ছিল তা অবৈধ বলে ঘোষণা করে। মহান আল্লাহ মুশরিকদের এ জন্য তিরস্কার করেছেন যে, তারা তাঁর প্রতি মিথ্যা আরোপ করত।

قُلِ اللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ

বলুন, আল্লাহ কি তোমাদের অনুমতি দিয়েছেন নাকি তোমরা আল্লাহর উপর অন্যায় মিথ্যারোপ করে থাক।^{১৯}

অন্যত্র তিনি বলেছেন,

فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُمُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا

তাদের জন্য দুর্ভোগ যারা নিজ হাতে গ্রন্থ লিখে, অতঃপর বলে, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। যাতে করে এর বিনিময়ে সামান্য অর্থ গ্রহণ করতে পারে।^{২০}

২। বিদ'আত তখনই নিন্দনীয় ও হারাম হবে যখন তার প্রণয়নকারী তার নষ্ট ও বিকৃত বিশ্বাস অথবা শরীয়তে অবৈধ ঘোষিত কোন কর্ম সমাজে প্রচার করবে। কেবল এরূপ বিশ্বাস পোষণ বা গোপনে এরূপ কর্ম সম্পাদন কোন বিষয় বিদ'আত হওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়। মুসলিম নিজ সূত্রে মহানবী (সাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন,

من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من يتبع لا ينقص ذلك من
آثامهم شيئاً

যে কেউ বিচ্যুতির দিকে আহ্বান করবে, তার গুনাহ ঐ সকল ব্যক্তির গুনাহের সমান যারা ঐ কাজে তাকে অনুসরণ করবে অবশ্য ঐ গুনাহের অনুসরণকারীদের পাপ হতে এতে কিছুই কম করা হবে না। এই হাদীসটিতে বিদআতের প্রতি আহ্বানের উল্লেখ রয়েছে যা তা প্রচারের দিকটির প্রতি ইশারা করছে।

৩। দ্বীনের মধ্যে উদ্ভাবিত বিষয়টি বিদ'আত হতে হলে এর কোরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক কোন দলিল থাকা চলবে না।

বিদআতের পারিভাষিক যে সংজ্ঞা আমরা উল্লেখ করেছি তা হতে স্পষ্ট বোঝা যায় কোন বিষয় বিদ'আত হওয়ার এটি অন্যতম শর্ত। তাই দুটি বিষয় বিদআতের অন্তর্ভুক্ত নয়ঃ

ক) নব উদ্ভাবিত বিষয়টি অভিনব হলেও তার জন্য শরীয়তে বিশেষ দলিল বিদ্যমান রয়েছে, যদিও তা রাসূলের জীবদ্দশায় না ঘটে থাকে। যেমন রাসূলের জীবদ্দশায় মদীনায় কখনোই ভূমিকম্প হয় নি। তাই সালাতুল আয়াত যা ভীতিকর যে কোন কারণে পড়া হয় এক্ষেত্রে পড়া হয় নি, কিন্তু পরবর্তীতে কুফায় একবার ভূমিকম্প হলে ইবনে আব্বাস ভূমিকম্পের জন্য আয়াতের নামায পড়েন।

খ) এমন সকল বিষয় যা ইসলামের সর্বজনীন নীতির অধীন। ঐ সর্বজনীন বিধানই ইসলামী শরীয়তের রক্ষক ও নিশ্চয়তা দানকারী ঐ অর্থে যে, শরীয়তে বিদ্যমান সর্বজনীন দলিলসমূহই নতুন উদ্ভাবিত বিশেষ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়। এটিই ইসলামী বিধানের

গতিশীলতার টিকে থাকার রহস্য। এ কারণেই শরীয়তে উদ্ভূত নতুন কোন বিষয়কে এ নীতির ভিত্তিতে ধর্মীয় বলে ঘোষণা করা হলে যদি তার জন্য বিশেষ কোন বিধান শরীয়তে (কুরআন ও সুন্নাহতে) পাওয়া না যায়, কিন্তু তা ঐ সর্বজনীন দলিলসমূহের আওতায় পড়ে, তবে তা বিদ'আত বলে গণ্য হবে না। যেমন আল কোরআনের এ আয়াতটিঃ

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ

"তোমাদের শত্রুদের জন্য তোমাদের সাধ্যমত সরঞ্জাম প্রস্তুত রাখ।" ইসলামের প্রাথমিক যুগে অবতীর্ণ হলেও যেহেতু এর আহ্বান সর্বজনীন ও সাধ্যমত সরঞ্জাম প্রস্তুত রাখার বিষয়টি বর্তমানে তৎকালীন সময়ের হতে ভিন্নরূপ।

তাই এখন কোন মুসলিম দেশের উচিত হবে শত্রুদের সম্বন্ধে রাখতে আধুনিক যুদ্ধ সরঞ্জাম - যেমন - ট্যাংক, যুদ্ধ বিমান, নৌবহর ও অন্যান্য যুদ্ধাস্ত্র প্রস্তুত রাখা।

সহীহুল বুখারীতে রাসূল (সাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন: তোমাদের মধ্যে সে-ই উত্তম যে নিজে কোরআন শিক্ষা লাভ করে এবং অন্যকে তা শিক্ষাদান করে। এখন যদি কেউ আধুনিক পদ্ধতিতে কোরআন শিক্ষা করে তবে তা ঐ নির্দেশের বহির্ভূত বলে গণ্য হবে না। কারণ তা এই সর্বজনীন নির্দেশের অন্তর্গত।

অধ্যায় - দুই - সুন্নাহ ও বিদ'আত পরিচিতি এবং প্রকারভেদ
প্রথম পরিচ্ছেদ - সুন্নাহ পরিচিতি
আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য
সুন্নাহ একটি নিয়ামত
শর্তযুক্ত নিয়ামত
সুন্নাহের স্তর - সুন্নাহ
সুন্নাহ ও বিদ'আতের অনুসারীর অবস্থান - সুন্নাহের অনুসারীর মর্যাদা
সুন্নাহের অনুসারীদের বৈশিষ্ট্য - সুন্নাহের অনুসারীদের কতিপয় বৈশিষ্ট্য রয়েছে
বিদ'আতের অনুসারীদের অবস্থান
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ - সুন্নাহ ও বিদ'আতের পার্থক্য
তৃতীয় পরিচ্ছেদ - বিদ'আত হারাম
চতুর্থ পরিচ্ছেদ - বিদ'আতের মৌলিক নীতিমালা
পঞ্চম পরিচ্ছেদ - বিদ'আতের প্রকারভেদের অপব্যাখ্যা
ইবাদতের ক্ষেত্রে কোনো বিদ'আত ই অনুমোদিত নয়
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ - দ্বীনের ভিতর বিদ'আতে হাসানাহ বলে কিছু আছে কি?

প্রথম পরিচ্ছেদ - সুন্নাহ পরিচিতি

সুন্নাহের কিছু অনুসারী আছে যারা জামাতবদ্ধ সুদৃঢ় আকীদা-বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত। যাদেরকে 'আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ' বলা হয়।

এখানে তিনটি বিষয় রয়েছেঃ ১. আকীদা, ২. আহলুস সুন্নাহ ও ৩. আল-জামাআহ। নিম্নে প্রত্যেকটির পরিচয় দেয়া হলোঃ

প্রথম : 'আকীদা' এর শাব্দিক অর্থ বন্ধন, বাঁধন, দৃঢ়ভাবে বাঁধা।

পারিভাষিক অর্থ

আকীদা এমন সুদৃঢ় ও সঠিক ঈমানকে বলে, যার মধ্যে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। সুতরাং যদি তার সে সুদৃঢ় বিশ্বাস বিশুদ্ধ ও সঠিক হয়, তাহলে আকীদাও বিশুদ্ধ এবং সঠিক হবে। যেমন, আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহের আকীদা। আর যদি তা ভ্রান্ত হয়, তাহলে আকীদাও ভ্রান্ত এবং বাতিল বলে গণ্য হবে। যেমন, বিভিন্ন ভ্রান্ত আকীদাপন্থী পথভ্রষ্ট সম্প্রদায়ের আকীদা ও বিশ্বাস।^{৪৯}

দ্বিতীয় : 'আহলুস সুন্নাহ' এর অর্থ

'সুন্নাহ' এর শাব্দিক অর্থ - পথ বা জীবনাদর্শ, তা উৎকৃষ্ট হোক বা নিকৃষ্ট। ইসলামী আকীদাপন্থীদের পরিভাষায় সুন্নাহ অর্থ - রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তাঁর সাহাবীগণ যে জীবনাদর্শ অনুযায়ী জীবন যাপন করেছেন সে জীবনাদর্শকে সুন্নাহ বলা হয়। এটা এমন এক আদর্শ, যা অনুসরণ করা ওয়াজিব। এ সুন্নাহের অনুসারীদের প্রশংসা করা হয়েছে। পক্ষান্তরে এর বিরোধীদের নিন্দা

৪৯ মাবাহিসু আকীদাতি আহলিসুসুন্নাহ ওয়াল জামাআহ - ড: নাসের আল-আকল : ৯-১০পৃ:

করা হয়েছে। এজন্যই বলা হয় অমুক ব্যক্তি আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের অনুসারী। অর্থাৎ সে সুদৃঢ় ও প্রশংসিত আদর্শের অনুসারী।^{৫০}

হাফেয ইবনে রজব (রহ.) বলেন, সুন্নাত হলো প্রচলিত পদ্ধতি, যা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও খোলাফায়ে রাশেদীনের বিশ্বাস, আমল ও বক্তব্যসমূহ অন্তর্ভুক্ত করে। এটাই হলো প্রকৃত সুন্নাত।^{৫১} শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.) বলেন, সুন্নাত হল ঐ সকল আমল যা পালনে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অনুগত হওয়ার ব্যাপারে শরীয়তের দলিল রয়েছে। চাই তা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজে পালন করেছেন বা তাঁর অনুমোদনে সে যুগে পালন করা হয়েছে অথবা চাহিদা না থাকায় কিংবা অসুবিধার কারণে সে যুগে পালিত হয়নি। এ সবই সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত।^{৫২} এখানে সুন্নাতের অর্থ হল - বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ সকল ক্ষেত্রে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর হাদীস, মুহাজির ও আনসার সাহাবীগণের আদর্শের অনুসরণ করা।

তৃতীয়: 'জামাআহ' এর শাব্দিক অর্থ- দল, গোষ্ঠী, সম্প্রদায় ইত্যাদি। ইবনে ফারেস (রহ.) বলেন, জীম (ج), মীম (م) ও আইন (ع) হরফ দ্বারা গঠিত শব্দ কোন বস্তু একত্রিত করা বুঝায়। ইসলামী আকীদার পরিভাষায় - জামাআত হল, উম্মতে মুহাম্মাদীর নেককার

৫০ মাবাহিসু আকীদাতি আহলিসুসুন্নাহ ওয়াল জামাআহ - ড: নাসের আল-আকল : ১৩পৃ:

৫১ জামিউল উলুম ওয়াল হিকাম : ১/১২০

৫২ মাজমুয়ায়ে ফতোয়ায়ে ইবনে তাইমিয়া : ২১/৩১৭

ব্যক্তিবর্গ। যেমন, সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ী, তাবে-তাবেয়ী এবং কিয়ামত পর্যন্ত আগত নিষ্ঠার সাথে তাদের অনুসারীগণ, যারা কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাতে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উপর ঐকমত্য পোষণকারী^{৫৩}। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, জামাআত ঐ বিষয়কে বলে, যা সত্যের অনুকূল হয়, যদিও তাতে তুমি একা হও। নুয়াইম ইবনে হাম্মাদ (রহ.) বলেন, যখন জামাআত ভেঙ্গে যাবে তখন তোমার জন্য আবশ্যিক হল, ভেঙ্গে যাওয়ার পূর্বে জামাআত যে উদ্দেশ্য ও আর্দশের উপর ছিল সে আর্দশের উপর অটল থাকা, যদিও তুমি একা হও। কেননা সে সময় তুমি একাই জামাআত হিসেবে গণ্য হবে^{৫৪}।

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য

১. আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ - যারা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তাঁর সাহাবায়ে কেরামের আর্দশের অনুসারী এবং সুন্নাতকে সুদৃঢ়ভাবে ধারণকারী।

যথা- তাবেয়ী, তাবে তাবেয়ী ও হেদায়াতপ্রাপ্ত ইমামগণ। তারা সুন্নাতের অনুসরণে সুদৃঢ় ও সর্বদা সকল প্রকার বিদ'আত থেকে দূরে থাকে। এরাই কিয়ামত পর্যন্ত সাহায্যপ্রাপ্ত জামাআত^{৫৫}। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সুন্নাতের সাথে সম্পর্ক থাকার কারণে এবং বাহ্যিক, আন্তরিক, ও মৌখিক কার্যাবলীতে সুন্নাতকে সম্মিলিতভাবে আঁকড়ে ধরার কারণে এ নামে তাদের নামকরণ করা

৫৩ শরহু আকীদাতি আত-তহাবী : ৬৮পৃ:

৫৪ ইগাসাতিল লাক্ফহান, ইবনে তাইমিয়া : ১/৭০

৫৫ মাবাহিসু আকীদাতি আহলিসুন্নাহ ওয়াল জামাআহ - ড: নাসের আল-আকল : ১৩-১৪পৃ:

হয়েছে^{৫৬}। এ প্রসঙ্গে আওফ বিন মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ

افترقت اليهود على احدى وسبعين فرقة فواحدة في الجنة وسبعون في النار
وافترقت النصارى على ثنتين وسبعين فرقة فاحدى وسبعون في النار واحدة في
الجنة والذي نفس محمد بيده لتفترقن امتي على ثلاث وسبعين فرقة واحدة في
(الجنة وثنتان وسبعون في النار قيل يا رسول الله من هم قال الجماعة). (ترمذي
অর্থঃ ইহুদীরা একাত্তর দলে বিভক্ত হয়েছে, তন্মধ্যে একদল জান্নাতী
এবং সত্তর দল জাহান্নামী। খ্রীষ্টানরা বাহাত্তর দলে বিভক্ত হয়েছে,
তন্মধ্যে একাত্তর দল জাহান্নামী ও একদল জান্নাতী। ঐ সত্ত্বর শপথ!
যার হাতে মুহাম্মাদের জীবন, নিশ্চয়ই আমার উম্মত তেহাত্তর দলে
বিভক্ত হবে, তাদের একদল জান্নাতী এবং বাহাত্তর দল জাহান্নামী।
জিজ্ঞেস করা হল, হে আল্লাহর রাসূল! তারা কারা? তিনি বললেন,
তারা হল (সুন্নাতের অনুসারী) দল^{৫৭}।

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, সাহাবীগণ বললেন, হে
আল্লাহর রাসূল! তারা কারা? উত্তরে তিনি বললেন,

مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي

অর্থ : যারা আমি এবং আমার সাহাবায়ে কেরামের অনুসারী^{৫৮}।

**২. মুক্তিপ্রাপ্ত দল - জাহান্নাম থেকে মুক্তি প্রাপ্ত দল হল, আহলুস
সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ।** কেননা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া
সাল্লাম) উম্মতের বিভক্ত দলসমূহের আলোচনার প্রাক্কালে তাদেরকে

^{৫৬} ফাতহু রব্বিল বারিয়াতি বি তাখলীসিল হাম্বুবিয়াতি - ইবনে উসাইমিন : ১০পৃ:

^{৫৭} ইবনে মাজা : ২/৩২১

^{৫৮} তিরমিযী : ২৬৪১

পৃথকভাবে উল্লেখ করেছেন। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ

كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً

অর্থঃ তারা সকলেই জাহান্নামী হবে একটি দল ব্যতীত^{৫৯}।

৩. সাহায্য প্রাপ্ত দল - 'আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ' আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে সর্বদা সাহায্য প্রাপ্ত একটি দল। মুআবিয়া (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত হাদীসে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ

لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي قَائِمَةٌ بِأَمْرِ اللَّهِ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ أَوْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ عَلَى النَّاسِ. (متفق عليه)

অর্থঃ আমার উম্মতের একটি দল সর্বদা আল্লাহর নির্দেশের উপর অটল থাকবে। বিরোধীদের বিরোধিতা ও অপমানকারীদের অপমান তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহর ফয়সালা (কিয়ামত) আসার পূর্ব পর্যন্ত তারা সর্বদা মানুষের উপর বিজয়ী থাকবে^{৬০}। মুগীরা ইবনে শুবা (রাঃ) থেকে অন্য রেওয়াযাতে এ ধরনের হাদীস বর্ণিত হয়েছে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ

لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَذَلِكَ. (مسلم)

সর্বদা আমার উম্মতের একটি জামাআত সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে আল্লাহর ফয়সালা (কিয়ামত) আসার পূর্ব পর্যন্ত

^{৫৯} উসূলু আহলিস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ - সালেহ ইবনে ফাওয়ান : ১১ পৃ

^{৬০} বুখারী : ৩৬৪১ ও মুসলিম : ১০৩৭

অপমানকারীদের অপমান তাদের কোন ক্ষতি করবে না^{৬১}।' জাবের (রা:) থেকেও মুসলিমের অন্য রেওয়াযাতে এ ধরনের হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

৪. কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাতের অনুসারী - তারা কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাতে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে সুদৃঢ়ভাবে ধারণকারী হবে। যে আদর্শের উপর আনসার ও মুহাজির সাহাবায়ে কেরামগণ ছিলেন, তারাও সে আদর্শের অনুসারী হবে। এ জন্যই রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, তারা আমি এবং আমার সাহাবায়ে কেরামের আদর্শের অনুসারী হবে।

৫. সৎ নেতৃবর্গ - যারা সত্যের পথপ্রদর্শক এবং সে অনুযায়ী আমলকারী। আইয়ুব সখতিয়ানী (রহঃ) বলেন, 'ঐ যুবক সৌভাগ্যবান, যাকে আল্লাহ তা'আলা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের কোন একজন দ্বীনদার আলিমের সাহচর্য লাভের তাওফিক দিয়েছেন^{৬২}।' ফুযাইল ইবনে আয়ায (রহঃ) বলেন, আল্লাহ তা'আলার এমন কিছু বান্দা আছে, যাদের মাধ্যমে আল্লাহ অনেক দেশকে জীবন্ত করেছেন তথা হেদায়াত দান করেছেন, তারাই আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ^{৬৩}।

৬. বিদ'আত থেকে বাঁধাদানকারী - যারা বিদ'আত পন্থীদের সকল প্রকার বিদ'আত ও কুসংস্কার থেকে নিরুৎসাহিত করে এবং সুন্নাতের অনুসরণ করতে উৎসাহিত করে, তারাই আহলুস সুন্নাহ

৬১ মুসলিম : ১৯২০

৬২ শরহে উসূলে ইতিকাদে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ : ১/৬৬

৬৩ শরহে উসূলে ইতিকাদে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ : ১/৭২

ওয়াল জামাআহ ও সর্বোত্তম মানুষ। আবু বকর ইবনে আইয়াশকে জিজ্ঞেস করা হল, সুন্নী কারা? উত্তরে তিনি বললেন, যাদের সামনে প্রবৃত্তি নিয়ে আলোচনা করা হলে তারা সেদিকে মনোযোগ দেয় না^{৬৪}।

ইবনে তাইমিয়া (রহ.) বলেন, আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ হচ্ছে সর্বোত্তম উম্মত, তারা সহজ, সরল ও সঠিক পথের অনুসারী^{৬৫}।

৭. সৌভাগ্যবান দল - যারা এ উম্মতের মধ্যে শত প্রতিকূলতার পরও সত্যের ধারক-বাহক হিসেবে পরিচিত। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ

(بَدَأَ الْإِسْلَامُ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ غَرِيبًا فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ). (مسلم)

অর্থঃ ইসলাম অচেনা ক্ষুদ্র পরিসরে আত্মপ্রকাশ করেছে এবং অতিসত্তর তা পূর্বাবস্থায় ফিরে যাবে। সুতরাং সুসংবাদ অচেনাদলের জন্য^{৬৬}। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) বর্ণনা করেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে জিজ্ঞেস করা হল, গুরাবা তথা অচেনা দূর্বল দল কারা? তিনি বললেন, ঐ সকল লোক, যারা আল্লাহর জন্য পরিবার পরিজন ও স্বজাতি থেকে দূরে রয়েছে^{৬৭}। আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আ'স (রাঃ) থেকে ইমাম আহমদ (রহ.) অন্যত্র বর্ণনা করেছেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে জিজ্ঞেস করা হল, হে আল্লাহর

৬৪ শরহে উসূলে ইতিকাদে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ : ১/৭২

৬৫ ফতোয়া ইবনে তাইমিয়া : ৩/৩৬৮

৬৬ মুসলিম : ১৪৫

৬৭ নেহায়া লেখক ইবনে আসীর : ৫/৪১

রাসূল! অচেনা ক্ষুদ্র দল কারা? তিনি বললেন, অধিকাংশ পাপীদের মধ্যে কিছু সংকর্ম পরায়ণ লোক^{৬৮}। অন্য সূত্রে বর্ণিত এক হাদীসে রয়েছে, যখন মানুষ বিশৃংখল হয়ে পড়ে, তখন তারা সংশোধন করে দেয় এবং নিজেরা সঠিক পথে চলে^{৬৯}। সুতরাং আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ হল, বিদ'আত পন্থী ও প্রবৃত্তির অনুসারী দলসমূহের বিপরীত একটি সঠিক দল।

৮. জ্ঞানের ধারক - বাহক - আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ অহীলক্ক জ্ঞানের অনুসারী এবং তারা উক্ত জ্ঞানের ধারক-বাহক। তারা সীমালংঘনকারীদের সীমালংঘন, ভ্রান্তপন্থীদের ভ্রান্তমত এবং মূর্খদের অপব্যখ্যা থেকে দূরে থাকে।

এ জন্যই ইবনে সিরীন (রহ.) বলেন, তারা হাদীসের সনদ সম্পর্কে প্রশ্ন করে না। যখন সনদে কোন সমস্যা সৃষ্টি হয় তখন তারা বলে, আমাদের কাছে হাদীস বর্ণনাকারীদের পরিচয় দাও। অতঃপর আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের অনুসারীগণ বর্ণনাকারীদের জ্ঞানের গভীরতার প্রতি লক্ষ্য করে তাদের হাদীস গ্রহণ করেন। পক্ষান্তরে বিদ'আত পন্থীদের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করে তাদের হাদীস গ্রহণ করেন না^{৭০}।

৯. আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের কোন একজনের ইত্তেকাল সকলকে ব্যাধিত করে - আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ এমন সব বৈশিষ্ট্যের অধিকারী যা কুরআন ও হাদীসের সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গির

৬৮ মুসনাদে ইমাম আহমদ : ২/১৭৭

৬৯ আহমদ : ৪/১৭৩

৭০ মুকাদ্দামায়ে মুসলিম : ১/১৫

অনুকূল। তারা খাঁটি মুমিনদের নিকট প্রিয় মানুষ ও দ্বীনের সঠিক রাহবার। আইউব সাখতিয়ানী (রহ.) বলেন, আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের কোন এক ব্যক্তির মৃত্যুর খবর শুনলে মনে হয় যেন আমি আমার একটি অঙ্গ হারিয়ে ফেলেছি^{৭১}। তিনি আরো বলেন, যারা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের মৃত্যু কামনা করে, তারা নিজেদের মুখের ফুৎকারে আল্লাহর নূর তথা দ্বীনের আলো নিভিয়ে ফেলতে চায়। অথচ আল্লাহ স্বীয় নূর তথা দ্বীনের আলো পূর্ণাঙ্গ করবেন, যদিও তা কাফিরদের অপছন্দ হয়^{৭২}।

সুন্নাত একটি নিয়ামত

নিয়ামত দু' প্রকারঃ

১. সাধারণ নিয়ামত ও ২. শর্তযুক্ত নিয়ামত

সাধারণ নিয়ামত

যা স্থায়ী সৌভাগ্যের সাথে সংশ্লিষ্ট। সে নিয়ামত হল ইসলাম ও সুন্নাতে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)। কেননা ইসলাম ও সুন্নাহ আল্লাহ প্রদত্ত সবচেয়ে বড় নিয়ামত।

ইহকালীন ও পরকালীন সৌভাগ্য তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর নির্ভরশীল- (ক) ইসলাম (খ) সুন্নাহ ও (গ) দুনিয়া ও আখেরাতে সুস্থতা। ইসলাম ও সুন্নাত এমন এক নিয়ামত যার মাধ্যমে আমরা আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করতে পারি। আল্লাহ তা'আলা আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন যেন আমরা তাঁর নিকট সালাতের মাধ্যমে প্রার্থনা

৭১ মুকাদ্দামায়ে মুসলিম : ১/১৫

৭২ শরহে উসূলে ইতিকাদে আহ্‌লিস্ সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ : ১/৬৮

করি এবং এ পথের অনুসারীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করি, যাদের তিনি সর্বোত্তম বন্ধুর তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেছেন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ
(৬৯): وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءَ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. (النساء)

অর্থঃ যারা আল্লাহ ও রাসূলের অনুগত্য করে তারা ঐ ব্যক্তিদের সঙ্গী হবেন, যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন। তারা হলেন- নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও সৎকর্মশীলগণ এবং এরাই সর্বোত্তম সঙ্গী^{৭৩}।

কুরআনে বর্ণিত এ চার প্রকারের লোকই সাধারণ নিয়ামতের অধিকারী। যাদের উদ্দেশ্য করে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا
আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন পূর্ণাঙ্গ করলাম। তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামত সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীন হিসেবে মনোনীত করলাম^{৭৪}।

উপরোক্ত আয়াতে দ্বীন ইসলাম নামক নিয়ামতকে পূর্ণাঙ্গ ও পরিপূর্ণ করে দেয়ার ঘোষণা রয়েছে।

এ প্রসঙ্গে ওমর ইবনে আব্দুল আযীয (রহ.) এর বক্তব্য উল্লেখ্য। তিনি বলেন, নিশ্চয়ই ঈমানের নির্ধারিত সীমা (ফরজ, সুন্নাত ও আইন কানুন) রয়েছে। যে তা পরিপূর্ণ করল সে ঈমান পরিপূর্ণ করল^{৭৫}। দ্বীন হল আল্লাহ প্রদত্ত শরীয়ত, যা তাঁর আদেশ-নিষেধ ও

৭৩ নিসা : ৬৯

৭৪ মায়দা : ৩

৭৫ বুখারী - কিতাবুল ঈমান : ১/৯

ভালবাসার সমন্বয়কে বুঝায়। যে নিয়ামত দ্বারা মুমিনদের বিশেষিত করা হয়েছে, তা হল ইসলাম ও সুন্নাতের নিয়ামত। এটা এমন নিয়ামত যা অর্জিত হলে প্রকৃত সন্তুষ্ট ও খুশি হওয়া উচিত। আর আল্লাহর নিয়ামতের উপর খুশি হলে আল্লাহ খুশি হন। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন:

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

আপনি বলে দিন, আল্লাহর অনুগ্রহ ও রহমতের উপর সকলেরই আনন্দিত হওয়া উচিত। এটা ঐ সম্পদ হতে বহুগুণ উত্তম যা তারা সংগ্ৰহ করছে^{৭৬}।

সালফে সালাহীনের মতে, আল্লাহর রহমত ও অনুগ্রহ হল, ইসলাম ও সুন্নাহ। উভয়ের মাধ্যমে প্রশান্তি লাভ করার নামই হল অন্তরের সজীবতা। যখনই মানুষের মাঝে উভয়টা সুদৃঢ় হবে, তখনই হৃদয় অত্যধিক আনন্দিত হবে এবং সুন্নাতের সংস্পর্শে ধন্য হবে^{৭৭}।

শর্তযুক্ত নিয়ামত

যেমন- শারীরিক সুস্থতা, সম্মান বৃদ্ধি পাওয়া, অধিক সন্তান হওয়া ও পূণ্যবতী স্ত্রী লাভ করা ইত্যাদি। আর এ জাতীয় নিয়ামত পাপী, পূণ্যবান, মুমিন, কাফির সকলেই পেয়ে থাকে। যখন এ কথা বলা হয় যে, কাফিরকে আল্লাহ তাআলা এ নিয়ামত দান করেছেন, তখন তা সত্য বলে গণ্য হবে। আর শর্তযুক্ত নিয়ামত কাফির ও পাপীকে আস্তে আস্তে দেয়া হয়^{৭৮}।

৭৬ ইউনুস : ৫৮

৭৭ ইজতিমাউল জুযুশিল ইসলামিয়াহ আলা গাজওয়াল মুআত্তালা ওয়াল জাহমিয়া- ইবনে কাইয়িম (র): ২/৩৩-৩৬

৭৮ ইজতিমাউল জুযুশিল ইসলামিয়াহ আলা গাজওয়াল মুআত্তালা ওয়াল জাহমিয়া - ইবনে কাইয়িম (র): ২/৩৬

সুন্নাতের স্তর - সুন্নাত

আল্লাহ তা'আলার সুরক্ষিত বেষ্টনী এবং তা প্রবেশকারীর জন্য নিরাপদ স্থান। এর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এতে প্রবেশকারী গন্তব্যে পৌঁছে যাবে। সুন্নাত প্রাত্যহিক জীবনে আমলের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা পায়। সুন্নাত অনুযায়ী আমলের ক্ষেত্রে দুর্বলতার কারণে সুন্নাতের নূর হ্রাস পায়। মুনাফিক ও বিদ'আত পন্থীদের সুন্নাতের নূরও দূর হয়ে যায়। তাইতো কিয়ামতের দিন সুন্নাতের অনুসারীদের চেহারা উজ্জ্বল হবে। পক্ষান্তরে কাফির ও বিদ'আত পন্থীদের চেহারা কৃষ্ণবর্ণ ও মলিন হবে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ

يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وَ(آل عمران)

অর্থঃ সেদিন কিছু চেহারা শ্বেতবর্ণ উজ্জ্বল আর কিছু চেহারা কৃষ্ণবর্ণ মলিন হবে^{৭৯}। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, সুন্নাতের অনুসারীদের চেহারা শ্বেতবর্ণ ও উজ্জ্বল হবে। পক্ষান্তরে বিদ'আত পন্থী ও মুসলিমদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টিকারীদের চেহারা কৃষ্ণবর্ণ বা মলিন হবে^{৮০}।

সুন্নাত হলো জীবন ও নূর যা বান্দার সৌভাগ্য, হেদায়াত ও বিজয় নিয়ে আসে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ

أَوْ مَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ

অর্থ : এমন ব্যক্তি যে ছিল প্রাণহীন। অতঃপর তাকে আমি জীবন দান করি এবং তার জন্য এমন আলোর (ব্যবস্থা) করে দেই যার

৭৯ আলে-ইমরান : ১০৬

৮০ ইজতিমাউল জুযুশিল ইসলামিয়াহ আলা গাজওয়াল মুআত্তালা ওয়াল জাহমিয়া- ইবনে কাইয়িম (র): ২/৩৯

সাহায্যে সে মানুষের মাঝে চলা-ফেরা করতে থাকে। সে কি এমন লোকের মতো হতে পারে যে (ডুবে) আছে অন্ধকার পুঞ্জের মধ্যে? তা হতে বের হওয়ার পথ পাচ্ছে না। এরূপেই কাফিরদের জন্য তাদের কার্যকলাপ মনোরম বানিয়ে দেয়া হয়েছে^{৮১}।

সুন্নাত ও বিদ'আতের অনুসারীর অবস্থান - সুন্নাতের অনুসারীর মর্যাদা

প্রকৃত সুন্নাতের অনুসারী ব্যক্তি সজিব, সতেজ ও আলোকিত হৃদয়ের অধিকারী হয় যা আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনের বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ করেছেন। এটা ঈমানদারদের একটি গুণ বা বৈশিষ্ট্য। কেননা সজিব ও আলোকিত হৃদয়ের অধিকারী ব্যক্তি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে জ্ঞান, বুদ্ধি ও হেদায়াত প্রাপ্ত। তারা তাওহীদে বিশ্বাসী ও রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর প্রকৃত অনুসারী হওয়ার তাওফিক লাভ করে থাকে। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহ্ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করে বলতেন, আল্লাহ্ যেন তাঁর অন্তরে, কানে, চোখে, জিহ্বায়, উপরে-নিচে, ডানে-বামে, সামনে-পিছনে নূর বা আলো দান করেন। তাঁর ব্যক্তি সত্ত্বাকেও যেন নূরের দ্বারা আলোকিত করেন। তাঁর গোস্ত, হাঁড় ও রক্তের মধ্যেও যেন নূর দান করেন। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এভাবে তাঁর নিজ সত্ত্বা, সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ অনুভূতি এবং ষষ্ঠ দিকের জন্য আল্লাহ্র নিকট নূর প্রার্থনা করেছেন। প্রত্যেক মুমিনের ভিতর-বাহির, কথা-কাজ ইত্যাদি সবই সমুজ্জ্বল। আর এ

আলো মুমিন ব্যক্তির জন্য কিয়ামতের দিন তার ঈমানী শক্তির দৃঢ়তা ও দুর্বলতার উপর ভিত্তি করে প্রকাশিত হবে। এ আলো তার সামনে পিছনে চলতে থাকবে। সেদিন কারো কারো নূরের জ্যোতি হবে সূর্যের জ্যোতির ন্যায়, আবার কারো চন্দ্রের জ্যোতির ন্যায়, আবার কারো কারো জ্যোতি হবে লম্বা খেজুর গাছের ন্যায়, কারো জ্যোতি হবে দণ্ডায়মান মানুষের ন্যায়, এমনকি মুমিনদের কাউকে তার পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলের মাথায় নূর দেয়া হবে। তা একবার জ্বলবে আবার নিভে যাবে। মোট কথা দুনিয়াতে যে যতটুকু ঈমানের শক্তিতে বলিয়ান ছিল কিয়ামতের দিন তাকে ততটুকু ঈমানের জ্যোতি দেয়া হবে^{৮২}।

সুন্নাতের অনুসারীদের বৈশিষ্ট্য - সুন্নাতের অনুসারীদের কতিপয় বৈশিষ্ট্য রয়েছে

১. কুরআন ও হাদীস এমন ভাবে আঁকড়ে ধরা যেমন ভাবে মাড়ির দাঁত দিয়ে কোন কিছু আঁকড়ে ধরা হয় যা সহজে ছুটে না।
২. দ্বীনের মৌলিক বিধানাবলী ও তার শাখা-প্রশাখার ব্যাপারে কুরআন ও হাদীস অনুসরণ করা।
৩. সুন্নাতের অনুসারীদের ভালবাসা ও বিদআতের অনুসারীদের ঘৃণা করা।
৪. সুন্নাতের অনুসারীরা সংখ্যায় কম হলেও নিজেকে একাকী না ভাবা। কেননা সততা মুমিনের হারানো সম্পদ। সে সত্যকে গ্রহণ করে যদিও মানুষ তার বিরোধিতা করে।

৮২ ইজতিমাউল জুযুশিল ইসলামিয়াহ আলা গাজওয়াল মুআত্তালা ওয়াল জাহমিয়া - ইবনে কাইয়িম (র): ২/৩৮

৫. কুরআন ও হাদীসের আদর্শ বাস্তবায়নের নিমিত্তে কথা ও কাজে সত্যাশ্রয়ী হওয়া।

৬. রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কেই একমাত্র আদর্শের মাপকাঠি হিসেবে মেনে নেয়া। কারণ তার চরিত্রই হচ্ছে আল-কুরআনের প্রতিচ্ছবি^{৮৩}।

বিদ'আতের অনুসারীদের অবস্থান

বিদআতের অনুসারীরা মৃত ও অন্ধকারাচ্ছন্ন হৃদয়ের অধিকারী। আল্লাহ তা'আলা অবিশ্বাসীকে মৃত ও অন্ধকারে নিমজ্জিত ব্যক্তি হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। মৃত ও অন্ধকার হৃদয় সম্পন্ন ব্যক্তি আল্লাহ ও দ্বীনের পরিচয় সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞ। আল্লাহ তা'আলা তাদের অবস্থা বর্ণনায় বলেন : এরা জীবিত নয় বরং মৃত এবং এরা অন্ধকারে এমনভাবে নিমজ্জিত যা থেকে বের হতে পারবে না। বিদ'আতের অন্ধকার তাদের গোটা জীবনকে আচ্ছন্ন করে রাখার কারণে তাদের অন্তর হক বা সত্যকে বাতিল হিসেবে আর বাতিলকে হক হিসেবে গণ্য করে। তাদের যাবতীয় কথা, কাজ এমনকি তাদের গোটা জীবনটাই অন্ধকারাচ্ছন্ন।

পরিশেষে তাদের কবরও হবে অন্ধকারময়। যখন কিয়ামতের দিন পুলসিরাত পার হওয়ার জন্য মানুষের মাঝে নূর বন্টন করা হবে, তখনও তাদের অন্ধকারের মধ্যেই রাখা হবে। এ নূর তারা পাবে না। তাদের আবাসস্থল হবে জাহান্নাম। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদের মধ্য থেকে যার কল্যাণ কামনা করেন, তাকে অন্ধকার

৮৩ আকীদাতুস সালাফ ও আসহাবুল হাদীস- ইমাম আবু উসমান ইসমাইল ইবনে আব্দুর রহমান : ২৬৪পৃ:

থেকে আলোর পথ দেখান। আর যার কল্যাণ কামনা করেন না।
তাকে অন্ধকারের মধ্যেই রেখে দেন^{৮৪}।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ - সুন্নাত ও বিদ'আতের পার্থক্য

অন্ধকার না বুঝলে যেমন আলো বুঝা যায় না, ঠান্ডা না বুঝলে গরম বুঝে আসেনা, মুর্থতা না বুঝলে শিক্ষা বুঝে আসেনা, তেমনি সুন্নাত না বুঝলে বিদ'আত বুঝা যায় না। কারণ বলা হয়ে থাকে-

تعرف الاشياء باضدادها

বিদ'আত (السنة) আরবী শব্দ। - এর অভিধানিক অর্থঃ

الطريقة محمودة كانت او مذمومة

পন্থা-পদ্ধতি, রীতি, নিয়ম, পথ, স্বভাব ইত্যাদি চাই তা ভাল হোক কিংবা মন্দ হউক তাই বিদ'আত।

কুরআন-হাদীসে সুন্নাত (سنة) শব্দটির ব্যবহারঃ কুরআন এবং হাদীসে এ শব্দটির অধিক ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। কুরআন কারীমে সুন্নাত শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে প্রকৃতি, রীতি ও নিয়ম অর্থে। কুরআনে সুন্নাত শব্দটি ১৩ বার ব্যবহার করা হয়েছে। সুন্নাতুল্লাহ বা আল্লাহর সুন্নাত বলতে বুঝায় যে, আল্লাহর তৈরী বা প্রাকৃতি নিয়মকে বুঝানো হয়েছে। এছাড়া সুন্নাতুল আওয়ালীন বা পূর্ববর্তী জামানার মানুষদের সুন্নাত বলতে বুঝানো হয়েছে যে, নবী রাসূলদের অস্বীকার করায় তাদের অভ্যাস, কর্ম ও স্বভাব এবং

৮৪ ইজতিমাউল জুযুশিল ইসলামিয়াহ আলা গাজওয়াল মুআত্তালা ওয়াল জাহমিয়া - ইবনে কাইয়িম (র): ২/৩৮-৪১

আল্লাহর অমোঘ শাস্তির বিধান যা তাদেরকে ধ্বংস করেছে^{৮৫}।

যেমনঃ কুরআন মজীদে এর ব্যবহারঃ

اسْتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ ۚ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ ۚ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا
سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ ۚ فَلَنْ نَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ۚ وَلَنْ نَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا

“যমীনে উদ্ধত আচরণ ও কূটচক্রান্তের কারণে। কিন্তু কূটচক্রান্ত কেবল তার ধারককেই পরিবেষ্টন করবে। তবে কি তারা পূর্ববর্তীদের (উপর আল্লাহর) বিধানের অপেক্ষা করছে? কিন্তু তুমি আল্লাহর বিধানের কখনই কোন পরিবর্তন পাবে না এবং তুমি আল্লাহর বিধানের কখনই কোন ব্যতিক্রমও দেখতে পাবে না^{৮৬}।”
বস্তুতঃ সুন্নাত শব্দগতভাবে নিয়ম বা পদ্ধতি অর্থে ব্যবহৃত হয়। এর বহুবচন হলো সুন্নান। সুন্নাত শব্দটি পবিত্র কোরআনে আল্লাহর জন্য যেমন ব্যবহৃত হয়েছে তেমনি পূর্ববর্তী জাতিসমূহের ক্ষেত্রেও এসেছে, যেমনঃ

سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ نَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا

আল্লাহর নীতি পূর্ব হতেই এরূপ (যে, সত্য মিথ্যার উপর বিজয়ী হবে) এবং আল্লাহর নীতিতে কোন পরিবর্তন নেই^{৮৭}। অন্যত্র বলেছেন : فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ - (তাদের জন্যও) পূর্ববর্তীদের পথ (পূর্ববর্তীদের জন্য আল্লাহর অনুসৃত রীতি) নির্ধারিত হয়ে গেছে^{৮৮}।

৮৫ এহইয়াউস সুন্নান (সুন্নাতের পুনরুজ্জীবন ও বিদ'আতের বিসর্জন - ড: খন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর স্যার, পৃষ্ঠা নং - ৩০)

৮৬ সূরা ফাতির, আয়াত নং - ৪৪

৮৭ সূরা ফাৎহ : ২৩

৮৮ সূরা আনফাল : ৩৮।

সুন্নাতুল্লাহ বা আল্লাহর নীতি বলতে তাঁর গৃহীত প্রজ্ঞাময় রীতি ও পদ্ধতি বোঝানো হয়েছে। আল্লাহর চিরাচরিত নীতি বা রীতি এটাই যে, সময়ের পরিক্রমায় তিনি জাতির পর জাতিকে সৃষ্টি করেন, তাদের উদ্দেশে নবী, ধর্মগ্রন্থ ও শরীয়ত (বিধিবিধান) প্রেরণ করেন, তাদের আল্লাহর আনুগত্যের পথ দেখান এবং এভাবে তাদের পরীক্ষা করেন যাতে করে তারা স্বাধীনভাবে নিজেই নিজের পথকে বেছে নিয়ে ঈমান ও সৎকর্মের পথে অগ্রসর হয়ে কাজক্ষিত লক্ষ্যে (আল্লাহর সন্তুষ্টি) পৌঁছতে পারে। কিন্তু পূর্ববর্তী অধিকাংশ জাতির অনুসৃত রীতি এটা ছিল যে, তারা আল্লাহর প্রেরিত নবীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে অন্যায় ও সীমা লঙ্ঘনের পথ গ্রহণ করত। এভাবে নিজেদের আল্লাহর জন্য একটি নীতির উপযুক্ত করত আর তা হলো আল্লাহর শাস্তির উপযোগী হওয়া। তারা আল্লাহর প্রেরিত নবীদের মিথ্যা প্রতিপন্ন করার কারণে আল্লাহর নির্ধারিত আজাবে পরিণত হয়ে ধ্বংস হতো। যেমন আল্লাহ বলেছেনঃ

وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَكَسَبُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا

"হেদায়েত আসার পর এ প্রতীক্ষাই শুধু মানুষকে বিশ্বাস স্থাপন করতে এবং তাদের পালনকর্তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে বিরত রাখে যে, কখন আসবে তাদের কাছে পূর্ববর্তীদের জন্য (আল্লাহর) অনুসৃত রীতি অথবা কখন আসবে তাদের কাছে সরাসরি

আজাব^{৮৯}। মহানবী (সা.) ও আহলে বাইতের ইমামগণের হাদীসে সুন্নাত শব্দটি দুটি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছেঃ

ক) কোরআন ব্যতীত যা কিছু মহানবী (সা.) আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষের উন্নত জীবনের জন্য এনেছেন। এ অর্থে সুন্নাত একটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। ধর্মীয় সকল বিধান-ইবাদত ও লেনদেনসহ যাবতীয় বিধান (ফরজ, মুস্তাহাব, হারাম, মাকরুহ, মুবাহ, চুক্তিসমূহ বৈধ বা অবৈধ হওয়া প্রভৃতি)-এর অন্তর্ভুক্ত।

খ) হাদীসসমূহে সুন্নাত শব্দটি শুধু পছন্দনীয় ও মুস্তাহাব কর্মের ব্যাপারেও ব্যবহৃত হয়েছে। যদি সুন্নাত শব্দটি কিতাব শব্দের পাশাপাশি আসে তার অর্থ হলো প্রথমটি। যেমন ইমাম সাদিক (আ.) হতে বর্ণিত হয়েছেঃ

ما من شيء إلا وفيه كتاب أو سنة

এমন কোন বিষয় নেই যার বিধান কিতাব অথবা সুন্নাতে বর্ণিত হয় নি^{৯০}। হাদীসসমূহে সুন্নাত শব্দটি দ্বিতীয় অর্থেও ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন হাদীসে এসেছে-

السواك هو من السنة ومطهرة للفم

মিসওয়াক একটি সুন্নাত। তা মুখবিবরকে পরিচ্ছন্ন রাখে^{৯১}। অন্যত্র হাদীসে এসেছে-

من السنة أن تُصَلِّيَ على محمد وأهل بيته في كلِّ جمعة ألف مرة

৮৯ সূরা কাহ্ফ : ৫৫

৯০ উসুলে কাফী, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৭৬, কিতাবু ফাজলুল ইলম, বাবুর রাদ ইলাল কিতাব ওয়াস সুন্নাহ, হাদীস নং ৪।

*যেসব রেওয়াজেতে সুন্নাত ও বিদআত শব্দ পাশাপাশি এসেছে তাতেও সুন্নাত এ প্রথম অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে।

৯১ ওয়াসায়িলুশ শিয়া, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৪

এটি সুন্নাত বলে গণ্য যে, প্রতি শুক্রবারে তোমরা এক হাজার বার রাসূল (সা.) ও তাঁর আহলে বাইতের উপর দরুদ পড়বে^{৯২}।

ফিকাহবিদদের পরিভাষায় সুন্নাত হলো মহানবী (সা.) ও পবিত্র ইমামগণের বাণী (কাওল), কর্ম (ফেল) এবং নীরব সমর্থনের (তাকরীর) বিষয়সমূহ। সকল মুসলমানই মহানবীর নিষ্পাপত্বে বিশ্বাস করে। তাই তাঁর বাণী, কর্ম ও নীরব সমর্থনের সকল বিষয়ই সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত। যেহেতু শিয়ারা রাসূলের আহলে বাইতের পবিত্র ইমামগণকেও নিষ্পাপ বলে বিশ্বাস করে সেহেতু তাঁদের বাণী (قول), কর্ম (فعل) এবং নীরব সমর্থনের (تقرير) বিষয়সমূহও সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত মনে করে। কোন বিষয় সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত কিনা তার জন্য দু'টি পথ রয়েছে:-

(১) মুতওয়াতির (বহুল বর্ণিত) হওয়া ও

(২) গাইরি মুতওয়াতির (অপেক্ষাকৃত কম বর্ণিত এবং একক সূত্রে বর্ণিত হাদীসসমূহ)।

মুতওয়াতির সূত্রে বর্ণিত হাদীস হতে মানুষ নিশ্চিত বিশ্বাস লাভ করে যে, তা রাসূল ও ইমামগণ হতে প্রকৃতই বর্ণিত হয়েছে। তাই এরূপ হাদীসের বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

গাইরি মুতওয়াতির হাদীসসমূহ দু'ভাগে ভাগ করা যায়। কখনো কখনো তার সঙ্গে এমন কিছু সমর্থক ইঙ্গিত থাকে যা মানুষকে হাদীসটি ইমাম হতে বর্ণিত হওয়াকেই প্রতিষ্ঠিত করে। এইরূপ সহায়ক উপাদান বিদ্যমান থাকলে সেরূপ হাদীসও নির্ভরযোগ্য ও

৯২ ওয়াসায়িলুশ শিয়া, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৪৭

পালনীয় বলে গণ্য। কিন্তু যদি কোন হাদীসের সঙ্গে সমর্থনকারী ইঙ্গিত না থাকে ও হাদীসটি ইমাম হতে বর্ণিত হওয়ার জন্য পর্যাপ্ত প্রমাণ না থাকে তবে তা নিশ্চিত বর্ণিত বলা যায় না, বরং তা সম্ভাব্য বর্ণিত বলে গণ্য এবং এক্ষেত্রে যদি বর্ণনাকারী ন্যায়পরায়ণ (আদেল অর্থাৎ শিয়া ইমামী নির্ভরযোগ্য রাবী) ও বিশ্বস্ত হয় তবেই শুধু তা গ্রহণযোগ্য হবে। সর্বোপরি এ কথা বলা যায় যে, সুন্নাত শব্দটি তিনটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমনঃ

১। নবীর হাদীস

২। নবীর আমল এবং

৩। নবীর তরীকা।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বুঝা যায় যে, রাসুল (সাঃ) কর্তৃক অনুসৃত মতে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক সকল কর্মনীতিই হলো সুন্নাত। আর এ নীতিতে কোন প্রকার পরিবর্তন পরিবর্ধন ও বিকৃতি সাইনেরই অপর নাম হলো বিদ'আত। এ প্রসঙ্গে আব্বাসী শাওকানী (রহঃ) বলেন -

وتطلق في الشرع على مقابلة السنة

সুন্নত ও বিদ'আতের পার্থক্যের কিছু উদাহরণঃ যেমন-

এক - পাঁচ ওয়াক্ত নামাজে আযান - এক্রামত আছে, কিন্তু খুতবা নাই। পক্ষান্তরে জুমআর নামাজে খুতবা আছে।

দুই - ঈদের নামাজ ও জানাযার নামাজে আযান এক্রামত নেই। এখন যদি কেউ নিজের মনগড়া ইচ্ছায় একথা বলে যে, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ এবং ঈদ ও জানাযার নামাজ একই তাই এখানে আযান -

একামত দিতে হবে এবং জুমআর নামাজ ছাড়াও যে নামাজ গুলো আছে তাতে খুতবা দিতে হবে, এ ধারণা পোষণকারীর নামাজ না হওয়ায় কারণ হলো তার নামাজ নবীর দেখানো সুন্নাত তথা ত্বরীকা অনুযায়ী হয় নাই। তাই এটা বিদ'আত হবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ - বিদ'আত হারাম

ধর্মের মধ্যে নতুন কিছু সংযোজন বা বিয়োজন এ অর্থে বিদ'আত হারাম কর্ম বলে বিবেচিত। কারণ শরীয়তের বিধান প্রণয়নের দায়িত্ব এককভাবে শুধুই আল্লাহর এবং তাঁর ইচ্ছা ও অনুমতি ব্যতীত শরীয়তের বিষয়ে হস্তক্ষেপের অধিকার কারো নেই। পবিত্র কোরআন ধর্মীয় পুরোহিতদের অন্ধ অনুসরণের কারণে ইহুদী ও খ্রিষ্টানদের তীব্র সমালোচনা করেছে এবং তাদের নিরঙ্কুশ কর্মবিধায়ক নির্ধারণ করার কারণে ভর্ৎসনা করে বলেছে,

اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ

তারা আল্লাহর পরিবর্তে তাদের ধর্মযাজক ও সংসার বিরাগী পুরোহিতদের নিজেদের পালনকর্তা বলে গ্রহণ করেছে^{৯৩}। যদিও ইহুদী আলেমরা তাঁদের অনুসারীদের নিজেদের উপাসনার দিকে আহ্বান করতেন না কিংবা তাঁদের অনুসারীরাও তাঁদের উপাসনা করত না, কিন্তু তাঁরা আল্লাহর হালাল করা বস্তুকে হারাম এবং হারাম করা বস্তুকে হালাল বলে ঘোষণা করতেন। জনসাধারণ তা জানা সত্ত্বেও তাঁদের আনুগত্য করত ও তাঁদের কথা শুনত। এ কারণেই এ আনুগত্যকে আল্লাহ তাদেরকে প্রতিপালক গণ্যকারী

বলেছেন যা প্রকৃতপক্ষে একরূপ উপাসনার নামান্তর^{৯৪}। খ্রিষ্টানদের ব্যাপারে আল্লাহ বলেছেন,

وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ

আর বৈরাগ্য, তারা নিজেরাই উদ্ভাবন করেছিল যা আল্লাহ তাদের জন্য নির্ধারণ করেন নি^{৯৫}।

সহীহ হাদীসসমূহেও কঠোরভাবে বিদ'আত কে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। মহানবী (সাঃ) বলেছেন,

كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة سبيلها في النار

প্রতিটি বিদ'আত ই স্পষ্ট বিচ্যুতি এবং প্রতিটি বিচ্যুতির পরিণতিই জাহান্নাম।

মোট কথা - ধর্মের কাজ নবীর তরীকা অনুযায়ী করলে নবীর সুনাত হবে আর ধর্মের কাজ নিজের ইচ্ছামত করলে বিদ্বাত হবে। এখানে উল্লেখ্য যে, ধর্মের কাজ ছাড়া যতকাজ আছে তা মনগড়া করলে বিদ'আত হবে না।

যেমন মাইক তৈরী, যন্ত্রপাতি, মেশিনারী দ্রব্য, রকেট, বিমান, টেলিভিশন, রেডিও, মোবাইল, গাড়ি, কম্পিউটার, ব্লিডিং ইত্যাদি আবিষ্কার বিদ'আত নয় কারণ এ গুলো ধর্মের কাজের জন্য তৈরি করা হয় নাই। এসব বিষয়ে অত্র গ্রন্থে প্রথমদিকে আরও বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। আল্লাহ আমাদেরকে সঠিক পথের হেদায়ত দান করুন, আমীন।

৯৪ উসূলে কাফী, ৪র্থ খণ্ড, কিতাবুল ঈমান ওয়াল কুফর, শিরক অধ্যায়: তাফসীরে তাবারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮০

৯৫ সূরা হাদীদ : ২৭

চতুর্থ পরিচ্ছেদ - বিদ'আতের মৌলিক নীতিমালা

বিদআতের তিনটি মৌলিক নীতিমালা রয়েছে। সেগুলো হল : ১. এমন আমলের মাধ্যমে আল্লাহর নিকট সাওয়াবের আশা করা যা শরীয়ত সিদ্ধ নয়। কেননা শরীয়তের স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম হল- এমন আমল দ্বারা আল্লাহর নিকট সাওয়াবের আশা করতে হবে যা কুরআনে আল্লাহ নিজে কিংবা সহীহ হাদীসে তাঁর রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুমোদন করেছেন। তাহলেই কাজটি ইবাদাত বলে গণ্য হবে। পক্ষান্তরে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে আমল অনুমোদন করেন নি সে আমলের মাধ্যমে আল্লাহর ইবাদাত করা হবে বিদ'আত।

২. দ্বীনের অনুমোদিত ব্যবস্থা ও পদ্ধতির বাইরে অন্য ব্যবস্থার অনুসরণ ও স্বীকৃতি প্রদান। ইসলামে একথা স্বতঃসিদ্ধ যে, শরীয়তের বেঁধে দেয়া পদ্ধতি ও বিধানের মধ্যে থাকা ওয়াজিব। যে ব্যক্তি ইসলামী শরীয়ত ব্যতীত অন্য বিধান ও পদ্ধতি অনুসরণ করল ও তার প্রতি আনুগত্যের স্বীকৃতি প্রদান করল সে বিদআতে লিপ্ত হল।

৩. যে সকল কর্মকাণ্ড সরাসরি বিদ'আত না হলেও বিদআতের দিকে পরিচালিত করে এবং পরিশেষে মানুষকে বিদআতে লিপ্ত করে, সেগুলোর হুকুম বিদআতেরই অনুরূপ। জেনে রাখা ভাল যে, সুন্নাত-এর অর্থ বুঝতে ভুল হলে বিদ'আত চিহ্নিত করতেও ভুল হবে।

এদিকে ইঙ্গিত করে ইমাম ইবনু তাইমিয়া (রহ.) বলেন, সবচেয়ে

গুরুত্বপূর্ণ হল সুন্নাতকে বিদ'আত থেকে পৃথক করা; কেননা সুন্নাত হচ্ছে ঐ বিষয়, শরীয়ত প্রণেতা যার নির্দেশ প্রদান করেছেন। আর বিদ'আত হচ্ছে ঐ বিষয় যা শরীয়ত প্রণেতা দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত বলে অনুমোদন করেন নি।

এ বিষয়ে মানুষ মৌলিক ও অমৌলিক অনেক ক্ষেত্রে প্রচুর বিভ্রান্তির বেড়াজালে নিমজ্জিত হয়েছে। কেননা, প্রত্যেক দলই ধারণা করে যে, তাদের অনুসৃত পন্থাই হল সুন্নাত এবং তাদের বিরোধীদের পথ হল বিদ'আত ^{৯৬}।

বিদ'আতের উপরোল্লিখিত তিনটি প্রধান মৌলিক নীতিমালার আলোকে বিদ'আত কে চিহ্নিত করার জন্য আরো বেশ কিছু সাধারণ নীতিমালা শরীয়ত বিশেষজ্ঞ আলেমগণ নির্ধারণ করে দিয়েছেন, যদ্বারা একজন সাধারণ মানুষ সহজেই কুরআন ও বিশুদ্ধ হাদীসের ভিত্তিতে বিদআতের পরিচয় লাভ করতে পারে ও সমাজে প্রচলিত বিদ'আত সমূহকে চিহ্নিত করতে পারে। কেননা প্রত্যেক ব্যক্তির উপর ওয়াজিব হল শরীয়তের দৃষ্টিতে যা বিদ'আত তা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জেনে নেয়া ও তা থেকে পুরোপুরি বেঁচে থাকা। নীচে উদাহরণ স্বরূপ কিছু দৃষ্টান্তসহ আমরা অতীব গুরুত্বপূর্ণ কতিপয় নীতিমালা উল্লেখ করছি।

প্রথম নীতি : অত্যধিক দুর্বল, মিথ্যা ও জাল হাদীসের ভিত্তিতে যে সকল ইবাদাত করা হয়, তা শরীয়তে বিদ'আত বলে বিবেচিত। এটি বিদ'আত চিহ্নিত করার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি নীতি।

কেননা ইবাদাত হচ্ছে পুরোপুরি অহী নির্ভর। শরীয়তের কোন বিধান কিংবা কোন ইবাদাত শরীয়তের গ্রহণযোগ্য সহীহ দলীল ছাড়া সাব্যস্ত হয় না। জাল বা মিথ্যা হাদীস মূলতঃ হাদীস নয়। অতএব এ ধরনের হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত হওয়া কোন বিধান বা ইবাদাত শরীয়তের অংশ হওয়া সম্ভব নয় বিধায় সে অনুযায়ী আমল বিদ'আত হিসেবে সাব্যস্ত হয়ে থাকে। অত্যধিক দুর্বল হাদীসের ব্যাপারে জমহুর মুহাদ্দিসগণের মত হল এর দ্বারাও শরীয়তের কোন বিধান সাব্যস্ত হবে না।

উদাহরণ : রজব মাসের প্রথম জুমুআর রাতে অথবা ২৭শে রজব যে বিশেষ শবে মিরাজের সালাত আদায় করা হয় তা বিদ'আত হিসেবে গণ্য। অনুরূপভাবে নিসফে শাবান বা শবেবরাতের রাতে যে ১০০ রাকাত সালাত বিশেষ পদ্ধতিতে আদায় করা হয় যাকে সালাতুর রাগায়েব বলেও অভিহিত করা হয়, তাও বিদ'আত হিসেবে গণ্য। কেননা এর ফযীলত সম্পর্কিত হাদীসটি জাল^{৯৭}।

দ্বিতীয় নীতি : যে সকল ইবাদাত শুধুমাত্র মনগড়া মতামত ও খেয়াল-খুশীর উপর ভিত্তি করে প্রণীত হয় সে সকল ইবাদাত বিদ'আত হিসেবে গণ্য। যেমন কোন এক আলিম বা আবেদ ব্যক্তির কথা কিংবা কোন দেশের প্রথা অথবা স্বপ্ন কিংবা কাহিনী যদি হয় কোন আমল বা ইবাদাতের দলীল তাহলে তা হবে বিদ'আত। দ্বীনের প্রকৃত নীতি হল- আল কুরআন ও সুন্নাহর মাধ্যমেই শুধু আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষের কাছে জ্ঞান আসে।

৯৭ তানযীহুশ শারীয়াহ আল মরফুআহ ২/৮৯-৯৪, আল-ইবদুল পৃঃ ৫৮

সুতরাং শরীয়তের হালাল-হারাম এবং ইবাদাত ও আমল নির্ধারিত হবে এ দুটি দলীলের ভিত্তিতে। এ দুটি দলীল ছাড়া অন্য পন্থায় স্থিরীকৃত আমল ও ইবাদাত তাই বিদ'আত বলে গণ্য হবে। এ জন্যই বিদ'আত পন্থীগণ তাদের বিদ'আতগুলোর ক্ষেত্রে শরয়ী দলীলের অপব্যাখ্যা করে সংশয় সৃষ্টি করে। এ প্রসঙ্গে ইমাম শাতেবী (রহ.) বলেন, সুন্নাতী তরীকার মধ্যে আছে এবং সুন্নাতের অনুসারী বলে দাবীদার যে সকল ব্যক্তি সুন্নাতের বাইরে অবস্থান করছে, তারা নিজ নিজ মাসআলাগুলোতে সুন্নাহ্ দ্বারা দলীল পেশের ভান করেন^{৯৮}।

উদাহরণ : ১। কাশ্ফ, অন্তর্দৃষ্টি তথা মুরাকাবা-মুশাহদা, স্বপ্ন ও কারামাতের উপর ভিত্তি করে শরীয়তের হালাল হারাম নির্ধারণ করা কিংবা কোন বিশেষ আমল বা ইবাদাতের প্রচলন করা^{৯৯}।

২। শুধুমাত্র আল্লাহ কিংবা হু-হু অথবা ইল্লাল্লাহ এর যিকর উপরোক্ত নীতির আলোকে ইবাদাত বলে গণ্য হবে না। কেননা কুরআন কিংবা হাদীসের কোথাও এরকম যিকর অনুমোদিত হয় নি^{১০০}।

৩। মৃত অথবা অনুপস্থিত সৎব্যক্তিবর্গকে আহ্বান করা, তাদের কাছে প্রার্থনা করা ও সাহায্য চাওয়া, অনুরূপভাবে ফেরেশতা ও নবী-রসূলগণের কাছে দুআ করাও এ নীতির আলোকে বিদ'আত বলে সাব্যস্ত হবে। শেষোক্ত এ বিদ'আত টি মূলতঃ শেষ পর্যন্ত বড় শির্কে পরিণত হয়।

৯৮ আল ই'তিসাম ১/২২০

৯৯ আল-ইতিসাম ১/২১২, ২/১৮১

১০০ মাজমু' আল ফাতাওয়া ১০/৩৬৯

তৃতীয় নীতি : কোন বাধা-বিপত্তির কারণে নয় বরং এমনিতেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াল্লাম যে সকল আমল ও ইবাদাত থেকে বিরত থেকেছিলেন, পরবর্তীতে তার উম্মাতের কেউ যদি সে আমল করে, তবে তা শরীয়তে বিদ'আত হিসেবে গণ্য হবে। কেননা তা যদি শরীয়তসম্মত হত তাহলে তা করার প্রয়োজন বিদ্যমান ছিল। অথচ কোন বাধাবিপত্তি ছাড়াই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াল্লাম সে আমল বা ইবাদাত ত্যাগ করেছেন। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, আমলটি শরীয়তসম্মত নয়। অতএব সে আমল করা যেহেতু আর কারো জন্য জায়েয নেই, তাই তা করা হবে বিদ'আত।

উদাহরণঃ ১। পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ও জুমা ছাড়া অন্যান্য সালাতের জন্য আযান দেয়া। উপরোক্ত নীতির আলোকে বিদ'আত বলে গণ্য হবে।

২। সালাত শুরু করার সময় মুখে নিয়তের বাক্য পড়া। যেহেতু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াল্লাম ও সাহাবীগণ এরূপ করা থেকে বিরত থেকেছিলেন এবং নিয়ত করেছিলেন শুধু অন্তর দিয়ে, তাই নিয়তের সময় মুখে বাক্য পড়া বিদ'আত বলে গণ্য হবে।

৩। বিপদ-আপদ ও ঝড়-তুফান আসলে ঘরে আযান দেয়াও উপরোক্ত নীতির আলোকে বিদ'আত বলে গণ্য হবে। কেননা বিপদ-আপদে কী পাঠ করা উচিত বা কী আমল করা উচিত তা হাদীসে সুন্দরভাবে বর্ণিত আছে।

৪। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্মোৎসব পালনের জন্য কিংবা আল্লাহর কাছে সাওয়াব ও বরকত লাভের প্রত্যাশায় অথবা যে কোন কাজে আল্লাহর সাহায্য লাভের উদ্দেশে মিলাদ পড়া উপরোক্ত নীতির আলোকে বিদ'আত বলে গণ্য হবে।

চতুর্থ নীতি : সালাফে সালাহীন তথা সাহাবায়ে কেরাম, ও তাবেয়ীন যদি কোন বাধা না থাকা সত্ত্বেও কোন ইবাদাতের কাজ করা কিংবা বর্ণনা করা অথবা লিপিবদ্ধ করা থেকে বিরত থেকে থাকেন, তাহলে এমন পরিস্থিতিতে তাদের বিরত থাকার কারণে প্রমাণিত হয় যে, কাজটি তাদের দৃষ্টিতে শরীয়তসিদ্ধ নয়। কারণ তা যদি শরীয়তসিদ্ধ হত তাহলে তাদের জন্য তা করার প্রয়োজন বিদ্যমান ছিল। তা সত্ত্বেও যেহেতু তারা কোন বাঁধাবিপত্তি ছাড়াই উক্ত আমল ত্যাগ করেছেন, তাই পরবর্তী যুগে কেউ এসে সে আমল বা ইবাদাত প্রচলিত করলে তা হবে বিদ'আত। হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, যে সকল ইবাদাত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাহাবাগণ করেন নি তোমরা সে সকল ইবাদাত কর না^{১০১}।

মালিক ইবনে আনাস (রহ.) বলেন, এই উম্মাতের প্রথম প্রজন্ম যে আমল দ্বারা সংশোধিত হয়েছিল একমাত্র সে আমল দ্বারাই উম্মাতের শেষ প্রজন্ম সংশোধিত হতে পারে^{১০২}। ইমাম ইবনু তাইমিয়া (রহ.) কিছু বিদ'আতের প্রতিবাদ করতে গিয়ে বলেন, এ কথা জানা যে, যদি এ কাজটি শরীয়তসম্মত ও মুস্তাহাব হত যদ্বারা আল্লাহ

১০১ সহীহ বুখারী

১০২ ইকতিযা আস-সিরাত আল মুস্তাকীম ২/৭১৮

সাওয়াব দিয়ে থাকেন, তাহলে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াস্লাম এ ব্যাপারে সবচেয়ে বেশী অবহিত থাকতেন এবং অবশ্যই তাঁর সাহাবীদেরকে তা জানাতেন, আর তাঁর সাহাবীরাও সে বিষয়ে অন্যদের চেয়েও বেশী অবহিত থাকতেন এবং পরবর্তী লোকদের চেয়েও এ আমলে বেশী আগ্রহী হতেন। কিন্তু যখন তারা এ প্রকার আমলের দিকে কোন ভ্রক্ষেপই করলেন না তাতে বোঝা গেল যে, তা নব উদ্ভাবিত এমন বিদ'আত যাকে তারা ইবাদাত, নৈকট্য ও আনুগত্য হিসেবে বিবেচনা করতেন না। অতএব এখন যারা একে ইবাদাত, নৈকট্য, সাওয়াবের কাজ ও আনুগত্য হিসাবে প্রদর্শন করছে তারা সাহাবাদের পথ ভিন্ন অন্য পথ অনুসরণ করছেন এবং দুইনের মধ্যে এমন কিছু প্রচলন করছেন যার অনুমতি আল্লাহ প্রদান করেন নি^{১০৭}। তিনি আরো বলেন, আর যে ধরনের ইবাদাত পালন থেকে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াস্লাম বিরত থেকেছেন অথচ তা যদি শরীয়াতসম্মত হত তাহলে তিনি নিজে তা অবশ্যই পালন করতেন, অথবা অনুমতি প্রদান করতেন এবং তাঁর পরে খলিফাগণ ও সাহাবীগণ তা পালন করতেন। অতএব এ কথা নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করা ওয়াজিব যে এ কাজটি বিদ'আত ও ভ্রষ্টতা^{১০৮}। এর দ্বারা বুঝা গেল যে, যে সকল ইবাদাত পালন করা থেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াস্লাম নিজে এবং তাঁর পরে উম্মাতের প্রথম প্রজন্মের আলিমগণ বিরত থেকে ছিলেন নিঃসন্দেহে

১০৭ ইকতিয়া আস সীরাত আল-মুত্তাকীম ২/৭৯৮

১০৮ মাযমু' আল ফাতাওয়া- ২৬/১৭২

সেগুলো বিদ'আত ও ভ্রষ্টতা। পরবর্তী যুগে কিংবা আমাদের যুগে এসে এগুলোকে ইবাদাত হিসেবে গণ্য করার কোন শরয়ী ভিত্তি নেই।

উদাহরণ : ১। ইসলামের বিশেষ বিশেষ দিবসসমূহ ও ঐতিহাসিক উপলক্ষগুলোকে ঈদ উৎসবের মত উদযাপন করা। কেননা ইসলামী শরীয়াতই ঈদ উৎসব নির্ধারণ ও অনুমোদন করে। শরীয়াতের বাইরে অন্য কোন উপলক্ষকে ঈদ উৎসবে পরিণত করার ইখতিয়ার কোন ব্যক্তি বা দলের নেই। এ ধরনের উপলক্ষের মধ্যে একটি রয়েছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াস্লাম এর জন্ম উৎসব উদযাপন। সাহাবীগণ ও পূর্ববর্তী আলিমগণ হতে এটি পালন করাতো দূরের কথা বরং অনুমোদন দানের কোন বর্ণনাও পাওয়া যায় না।

ইমাম ইবনু তাইমিয়া (রহ.) বলেন, এ কাজটি পূর্ববর্তী সালাফগণ করেন নি অথচ এ কাজ জায়য থাকলে সওয়াব লাভের উদ্দেশ্যে তা পালন করার কার্যকারণ বিদ্যমান ছিল এবং পালন করতে বিশেষ কোন বাধাও ছিল না। যদি এটা শুধু কল্যাণের কাজই হতো তাহলে আমাদের চেয়ে তারাই এ কাজটি বেশী করতেন। কেননা তারা আমাদের চেয়েও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াস্লাম-কে বেশী সম্মান ও মহব্বত করতেন এবং কল্যাণের কাজে তারা ছিলেন বেশী আগ্রহী।

২। ইতোপূর্বে বর্ণিত সালাত-আর রাগায়েব বা শবে মিরাজের সালাত উল্লেখিত চতুর্থ নীতির আলোকেও বিদ'আত সাব্যস্ত হয়ে

থাকে। ইমাম ইযযুদ্বীন ইবনু আব্দুস সালাম (রহ.) এ প্রকার সালাত এর বৈধতা অস্বীকার করে বলেন, এ প্রকার সালাত যে বিদ'আত তার একটি প্রমাণ হলো দ্বীনের প্রথম সারির উলামা ও মুসলিমদের ইমাম তথা সাহাবায়ে কিরাম, তাবেয়ীন, তাবে তাবেয়ীন ও শরীয়াহ বিষয়ে গ্রন্থ প্রণয়নকারী বড় বড় আলিমগণ মানুষকে ফরয ও সুন্নাত বিষয়ে জ্ঞান দানের প্রবল আগ্রহ পোষণ করা সত্ত্বেও তাদের কারো কাছ থেকে এ সালাত সম্পর্কে কোন বর্ণনা পাওয়া যায় নি এবং কেউ তাঁর নিজ গ্রন্থে এ সম্পর্কে কিছু লিপিবদ্ধও করেন নি ও কোন বৈঠকে এ বিষয়ে কোন আলোকপাতও করেন নি।

বাস্তবে এটা অসম্ভব যে, এ সালাত আদায় শরীয়তে সুন্নাত হিসেবে বিবেচিত হবে অথচ দ্বীনের প্রথম সারির আলিমগণ ও মুমিনদের যারা আদর্শ, বিষয়টি তাদের সকলের কাছে থেকে যাবে সম্পূর্ণ অজানা^{১০৫}।

পঞ্চম নীতি : যে সকল ইবাদাত শরীয়াতের মূলনীতিসমূহ এবং মাকাসিদ তথা উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের বিপরীত সে সবই হবে বিদ'আত।

উদাহরণ : ১. দুই ঈদের সালাতের জন্য আযান দেয়া। কেননা নফল সালাতের জন্য আযান দেয়া শরীয়ত সম্মত নয়। আযান শুধু ফরয সালাতের সাথেই খাস।

২. জানাযার সালাতের জন্য আযান দেয়া। কেননা জানাযার সালাতে আযানের কোন বর্ণনা নেই তদুপরি এতে সবার অংশগ্রহণ করার বাধ্যবাধকতাও নেই।

^{১০৫} আত তারগীব আন সলাতির রাগাইব আল মাওদুয়া, পৃঃ ৫-৯

৩. ফরয সালাতের আযানের আগে মাইকে দরুদ পাঠ। কেননা আযানের উদ্দেশ্য লোকদেরকে জামাআতে সালাত আদায়ের প্রতি আহ্বান করা, মাইকে দরুদ পাঠের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই।

ষষ্ঠ নীতি : প্রথা ও মুআমালাত বিষয়ক কোনো কাজের মাধ্যমে যদি শরীয়তের সুস্পষ্ট নির্দেশনা ছাড়াই আল্লাহর কাছে সাওয়াব লাভের আশা করা হয় তাহলে তা হবে বিদ'আত।

উদাহরণ : পশমী কাপড়, চট, ছেঁড়া ও তালি এবং ময়লাযুক্ত কাপড় কিংবা নির্দিষ্ট রঙের পোষাক পরিধান করাকে ইবাদাত ও আল্লাহর প্রিয় পাত্র হওয়ার পস্থা মনে করা। একই ভাবে সার্বক্ষণিক চুপ থাকাকে কিংবা রুটি ও গোশত্ ভক্ষণ ও পানি পান থেকে বিরত থাকাকে অথবা ছায়াযুক্ত স্থান ত্যাগ করে সূর্যের আলোয় দাঁড়িয়ে কাজ করাকে আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের পস্থা হিসাবে নির্ধারণ করা।

উল্লেখিত কাজসমূহ কেউ যদি এমনিতেই করে তবে তা নাজায়য নয়, কিন্তু এ সকল আদাত কিংবা মোয়ামালাতের কাজগুলোকে যদি কেউ ইবাদাতের রূপ প্রদান করে কিংবা সাওয়াব লাভের উপায় মনে করে তবে তখনই তা হবে বিদ'আত।

কেননা এগুলো ইবাদাত ও সাওয়াব লাভের পস্থা হওয়ার কোন দলীল শরীয়তে নেই।

সপ্তম নীতি : আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সকল কাজ নিষেধ করে দিয়েছেন সেগুলোর মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য ও সাওয়াব লাভের আশা করা হলে সেগুলো হবে বিদ'আত।

উদাহরণ : ১। গান-বাদ্য ও কাওয়ালী বলা ও শোনা অথবা নাচের মাধ্যমে যিকর করে আল্লাহর কাছে সাওয়াবের আশা করা।

২। কাফির, মুশরিক ও বিজাতীয়দের অনুকরণের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য ও সাওয়াব লাভের আশা করা।

অষ্টম নীতি : যে সকল ইবাদাত শরীয়তে নির্ধারিত সময়, স্থান ও পদ্ধতির সাথে প্রণয়ন করা হয়েছে সেগুলোকে সে নির্ধারিত সময়, স্থান ও পদ্ধতি থেকে পরিবর্তন করা বিদ'আত বলে গণ্য হবে।

উদাহরণ : ১। নির্ধারিত সময় পরিবর্তনের উদাহরণ- যেমন জিলহাজ্জ মাসের এক তারিখে কুরবানী করা। কেননা, কুরবানীর শরয়ী সময় হল ১০ জিলহাজ্জ ও তৎপরবর্তী আইয়ামে তাশরীকের দিনগুলো।

২। নির্ধারিত স্থান পরিবর্তনের উদাহরণ- যেমন মসজিদ ছাড়া অন্য কোথাও ইতিকাফ করা। কেননা, শরীয়ত কর্তৃক ইতিকাকফের নির্ধারিত স্থান হচ্ছে মসজিদ।

৩। নির্ধারিত শ্রেণী পরিবর্তনের উদাহরণ- যেমন গৃহ পালিত পশুর পরিবর্তে ঘোড়া দিয়ে কুরবানী করা।

৪। নির্ধারিত সংখ্যা পরিবর্তনের উদাহরণ- যেমন পাঁচ ওয়াক্তের অতিরিক্ত ৬ষ্ঠ আরো এক ওয়াক্ত সালাত প্রচলন করা। কিংবা চার রাকআত সালাতকে দুই রাকআত, কিংবা দুই রাকআতের সালাতকে চার রাকআতে পরিণত করা।

৫। নির্ধারিত পদ্ধতি পরিবর্তনের উদাহরণ : অযু করার শরয়ী পদ্ধতির বিপরীতে যেমন দুপা ধোয়ার মাধ্যমে অযু শুরু করা এবং

তারপর দুহাত ধৌত করা এবং মাথা মাসেহ করে মুখমন্ডল ধৌত করা। অনুরূপভাবে সালাতের মধ্যে আগে সিজদাহ ও পরে রুকু করা।

নবম নীতি : আম তথা ব্যাপক অর্থবোধক দলিল দ্বারা শরীয়তে যে সকল ইবাদাতকে উন্মুক্ত রাখা হয়েছে সেগুলোকে কোন নির্দিষ্ট সময় কিংবা নির্দিষ্ট স্থান অথবা অন্য কিছু সাথে এমনভাবে সীমাবদ্ধ করা বিদ'আত বলে গণ্য হবে যদ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, উক্ত ইবাদাতের এ সীমাবদ্ধ করণ প্রক্রিয়া শরীয়তসম্মত, অথচ পূর্বোক্ত আম দলীলের মধ্যে এ সীমাবদ্ধ করণের উপর কোন প্রমাণ ও দিক নির্দেশনা পাওয়া যায় না। এ নীতির মোদ্বাকথা হচ্ছে কোন উন্মুক্ত ইবাদাতকে শরীয়াতের সহীহ দলীল ছাড়া কোন স্থান, কাল বা সংখ্যা দ্বারা সীমাবদ্ধ করা বিদ'আত হিসেবে বিবেচিত।

উদাহরণ : ১। যে দিনগুলোতে শরীয়াত রোযা বা সাওম রাখার বিষয়টি সাধারণভাবে উন্মুক্ত রেখেছে যেমন মঙ্গল বার, বুধবার কিংবা মাসের ৭, ৮ ও ৯ ইত্যাদি তারিখসমূহ, সে দিনগুলোর কোন এক বা একাধিক দিন বা বারকে বিশেষ ফযীলাত আছে বলে সাওম পালনের জন্য যদি কেউ খাস ও সীমাবদ্ধ করে অথচ খাস করার কোন দলীল শরীয়তে নেই, যেমন ফাতিহা-ই-ইয়াযদাহমের দিন সাওম পালন করা, তাহলে শরীয়াতের দৃষ্টিতে তা হবে বিদ'আত , কেননা দলীল ছাড়া শরীয়াতের কোন হুকুমকে খাস ও সীমাবদ্ধ করা জায়েয নেই।

২। ফযীলাতপূর্ণ দিনগুলোতে শরীয়াত যে সকল ইবাদাতকে উন্মুক্ত রেখেছে সেগুলোকে কোন সংখ্যা, পদ্ধতি বা বিশেষ ইবাদাতের সাথে খাস করা বিদ'আত হিসাবে গণ্য হবে। যেমন প্রতি শুক্রবার নির্দিষ্ট করে চল্লিশ রাকআত নফল সালাত পড়া, প্রতি বৃহস্পতিবার নির্দিষ্ট পরিমাণ সদাকা করা, অনুরূপভাবে কোন নির্দিষ্ট রাতকে নির্দিষ্ট সালাত ও কুরআন খতম বা অন্য কোন ইবাদাতের জন্য খাস করা। দশম নীতি : শরীয়াতে যে পরিমাণ অনুমোদন দেয়া হয়েছে ইবাদাত করতে গিয়ে সে ক্ষেত্রে তার চেয়েও বেশী আমল করার মাধ্যমে বাড়াবাড়ি করা এবং কঠোরতা আরোপ করা বিদ'আত বলে বিবেচিত।

উদাহরণ : ১। সারা রাত জেগে নিদ্রা পরিহার করে কিয়ামুল লাইল এর মাধ্যমে এবং ভঙ্গ না করে সারা বছর সাওম রাখার মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করা এবং অনুরূপভাবে স্ত্রী, পরিবার ও সংসার ত্যাগ করে বৈরাগ্যবাদের ব্রত গ্রহণ করা।

সহীহ বুখারীতে আনাস ইবনে মালেক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর হাদীসে যারা সারা বছর সাওম রাখার ও বিবাহ করে সংসার ধর্ম পালন না করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছিল তাদের উদ্দেশ্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন :

«أَمَّا وَاللَّهِ إِنِّي لَأُحْشَاكُمُ لِلَّهِ وَأَتَّقَاكُمْ لَهُ لِكَيْتِي أَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنِّي سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي» رواه البخاري.

আমি তোমাদের মধ্যে আল্লাহর প্রতি সবচেয়ে বেশী ভয় পোষণ করি এবং তাকওয়া অবলম্বনকারী। কিন্তু আমি সওম পালন করি ও

ভাঙ্গি, সালাত আদায় করি ও নিদ্রা যাপন করি এবং নারীদের বিবাহ করি। যে আমার এ সুন্নাহ থেকে বিরাগভাজন হয়, যে আমার দলভুক্ত নয়^{১০৬}।

২। হাজ্জের সময় জামরায় বড় বড় পাথর দিয়ে রমী করা, এ কারণে যে, এগুলো ছোট পাথরের চেয়ে পিলারে জোরে আঘাত হানবে এবং এটা এ উদ্দেশ্যে যে, শয়তান এতে বেশী ব্যথা পাবে। এটা বিদ'আত এজন্য যে, শরীয়তের নির্দেশ হল ছোট পাথর নিক্ষেপ করা এবং এর কারণ হিসেবে হাদীসে বলা হয়েছে যে, আল্লাহর যিকর ও স্মরণকে কায়েম করা।^{১০৭}

উল্লেখ্য যে, পাথর নিক্ষেপের স্তম্ভটি শয়তান বা শয়তানের প্রতিভূ নয়। হাদীসের ভাষায় এটি জামরাহ। তাই সকল ক্ষেত্রে নিরাপদ হল হাদীস অনুযায়ী আমল করা ও আকীদা পোষণ করা।

৩। যে পোষাক পরিধান করা শরীয়তে মুবাহ ও জায়েয, যেমন পশমী কিংবা মোটা কাপড় পরিধান করা তাকে ফযীলাতপূর্ণ অথবা হারাম মনে করা বিদ'আত, কেননা এটা শরীয়তের দৃষ্টিতে বাড়াবাড়ি।

একাদশ নীতি : যে সকল আকীদাহ, মতামত ও বক্তব্য আল-কুরআন ও সুন্নাহের বিপরীত কিংবা এ উম্মাহের সালাফে সালাহীনের ইজমা বিরোধী সেগুলো শরীয়তের দৃষ্টিতে বিদ'আত।

১০৬ সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫০৬৩

১০৭ সুন্নাহ আবি দাউদ, হাদীস নং ১৬১২ ও সুন্নাহ আ-তিরমিযী, হাদীস নং ৮২৬, তিরমিযী বলেছেন, এটি হাসান ও সহীহ হাদীস।

এই নীতির আলোকে নিম্নোক্ত দুটি বিষয় শরীয়াতের দৃষ্টিতে বিদ'আত ও প্রত্যাখ্যাত বলে গণ্য হবে।

প্রথম বিষয়ঃ নিজস্ব আকল ও বিবেকপ্রসূত মতামতকে অমোঘ ও নিশ্চিত নীতিরূপে নির্ধারণ করা এবং কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্যকে এ নীতির সাথে মিলিয়ে যদি দেখা যায় যে, সে বক্তব্য উক্ত মতামতের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ তাহলে তা গ্রহণ করা এবং যদি দেখা যায় যে, কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্য উক্ত মতামত বিরোধী তাহলে সে বক্তব্য প্রত্যাখ্যান করা। অর্থাৎ কুরআন ও সুন্নাহর উপরে নিজের আকল ও বিবেককে অগ্রাধিকার দেয়া। শরীয়াতের দৃষ্টিতে এ বিষয়টি অত্যন্ত গর্হিত কাজ। এ ব্যাপারে ইমাম ইবনু তাইমিয়া (রহ.) বলেন : বিবেকের মতামত অথবা কিয়াস দ্বারা আল কুরআনের বিরোধিতা করাকে সালাফে সালাহীনের কেউই বৈধ মনে করতেন না। এ বিদ'আতটি তখনই প্রচলিত হয় যখন জাহমিয়া, মুতাযিলা ও তাদের অনুরূপ কতিপয় এমন ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটে যারা বিবেকপ্রসূত রায়ের উপর ধর্মীয় মূলনীতি নির্ধারণ করেছিলেন এবং সেই রায়ের দিকে কুরআনের বক্তব্যকে পরিচালিত করেছিলেন এবং বলেছিলেন, যখন বিবেক ও শরীয়ার মধ্যে বিরোধিতা দেখা দিবে তখন হয় শরীয়াতের সঠিক মর্ম বোধগম্য নয় বলে আল্লাহর কাছে সমর্পণ করা হবে অথবা বিবেকের রায় অনুযায়ী তাবীল ও ব্যাখ্যা করা হবে। এরা হলো সে সব লোক যারা কোন দলীল ছাড়াই আল্লাহর আয়াতের ব্যাপারে তর্ক করে থাকে^{১০৮}। ইবনু আবিল ইয়

আল-হানাফী (রহ.) বলেন বরং বিদ'আত কারীদের প্রত্যেক দলই নিজেদের বিদ'আত ও যাকে তারা বিবেকপ্রসূত যুক্তি বলে ধারণা করে তার সাথে কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্যকে মিলিয়ে দেখে। কুরআন সুন্নাহর সে বক্তব্য যদি তাদের বিদ'আত ও যুক্তির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয় তাহলে তারা বলে, এটি মুহকাম ও দৃঢ়বক্তব্য। অতঃপর তারা তা দলীল রূপে গ্রহণ করে। আর যদি তা তাদের বিদ'আত ও যুক্তির বিপরীত হয় তাহলে তারা বলে, এটি মুতাশাবিহাত ও আবোধগম্য, অতঃপর তারা তা প্রত্যাখ্যান করে অথবা মূল অর্থ থেকে পরিবর্তন করে^{১০৯}

দ্বিতীয় বিষয়ঃ কোন জ্ঞান ও ইলম ছাড়াই দ্বীনী বিষয়ে ফাতওয়া দেয়া। ইমাম শাতিবী (রহ.) বলেন, যারা অনিশ্চিত কোন বক্তব্যকে অন্ধভাবে মেনে নেয়ার উপর নির্ভর করে অথবা গ্রহণযোগ্য কোন কারণ ছাড়াই কোন বিষয়কে প্রাধান্য দেয়, তারা প্রকৃত পক্ষে দ্বীনের রজ্জু ছিন্ন করে শরীয়াত বহির্ভূত কাজের সাথে জড়িত থাকে। আল্লাহ তাঁর অনুগ্রহে এ থেকে আমাদেরকে নিরাপদ রাখুন। ফাতওয়ার এ পদ্ধতি আল্লাহ তাআলার দ্বীনের মধ্যে নতুন উদ্ভাবিত বিদ'আতেরই অন্তর্ভুক্ত, তেমনিভাবে আকল বা বিবেককে দ্বীনের সর্বক্ষেত্রে Dominator হিসেবে স্থির করা নবউদ্ভাবিত বিদ'আত^{১১০}।

দ্বাদশ নীতি : যে সকল আকীদা কুরআন ও সুন্নাহর আসে নি এবং

১০৯ শরহুল আকীদা আত তাহাভিয়া পৃঃ ১৯৯৯

১১০ আল-ইতিসাম ২/১৭৯

সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীনের কাছ থেকেও বর্ণিত হয় নি, সেগুলো বিদ'আতী আকীদা হিসেবে শরীয়তে গণ্য।

উদাহরণ : ১. সুফী তরীকাসমূহের সে সব আকীদা ও বিষয়সমূহ যা কুরআন ও সুন্নাহ আসে নি এবং সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীনের কাছ থেকেও বর্ণিত হয় নি। ইমাম শাতিবী (রহ.) বলেন, তন্মধ্যে রয়েছে এমন সব অলৌকিক বিষয় যা শ্রবণকালে মুরিদদের উপর শিরোধার্য করে দেয়া হয়। আর মুরীদের কর্তব্য হল যা থেকে সে বিমুক্ত হয়েছে পুনরায় পীরের পক্ষ থেকে তা করার অনুমতি ও ইঙ্গিত না পেলে তা না করা এভাবে আরো অনেক বিষয় যা তারা আবিষ্কার করেছে, সালাফদের প্রথম যুগে যার কোন উদাহরণ খুঁজে পাওয়া যায় না^{১১১}।

২. আল্লাহর যাতী গুণাবলীর ক্ষেত্রে **الجهة** বা দিক-নির্ধারণ **الجسم** বা শরীর ইত্যাদি সার্বিকভাবে সাব্যস্ত করা কিংবা পুরোপুরি অস্বীকার করা বিদ'আত হিসেবে গণ্য। কেননা কুরআন, হাদীস ও সাহাবায়ে কিরামের বক্তব্যের কোথাও এগুলোকে সরাসরি সাব্যস্ত কিংবা অস্বীকার কোনটাই করা হয় নি। এ সম্পর্কে ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ (রহ.) বলেন, সালাফের কেউই আল্লাহর ব্যাপারে **الجسم** বা শরীর সাব্যস্ত করা কিংবা অস্বীকার করার বিষয়টি সম্পর্কে কোন বক্তব্য প্রদান করেন নি। একইভাবে আল্লাহর সম্পর্কে^{১১২} **الجواهر** বা মৌলিক

১১১ আল-ইতিসাম ১/২৬১

১১২ তবে দিক নির্ধারণ না করলেও **جهة العلو** বা উপরের দিক আল্লাহর জন্য নির্ধারিত। এটা কুরআন ও হাদীসের হাজার হাজার ভাষ্য দ্বারা প্রমাণিত। গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য **جهة** শব্দটি ব্যবহার না করা। উপরের দিক প্রতিটি মুসলিমই সাব্যস্ত করে থাকেন। [সম্পাদক]

বস্তু এবং التحيز বা অবস্থান গ্রহণ অথবা অনুরূপ কোন বক্তব্যও তারা দেন নি। কেননা এগুলো হলো অস্পষ্ট শব্দ, যদ্বারা কোন হক প্রতিষ্ঠিত হয় না এবং বাতিলও প্রমাণিত হয় না। বরং এগুলো হচ্ছে সে সকল বিদআতী কালাম ও কথা যা সালাফ ও ইমামগণ প্রত্যাখ্যান করেছেন”^{১১৩}।

আল্লাহর সিফাত সম্পর্কিত মুজমাল ও অস্পষ্ট শব্দমালার সাথে সালাফে সালাহীনের অনুসৃত ব্যবহারিক নীতিমালা কী ছিল সে সম্পর্কে ইমাম ইবনু আবিল ইয় আল-হানাফী (রহ.) বলেন, যে সকল শব্দ (আল্লাহর ব্যাপারে) সাব্যস্ত করা কিংবা তার থেকে অস্বীকার করার ব্যাপারে নস তথা কুরআন-হাদীসের স্পষ্ট বক্তব্য এসেছে তা প্রবলভাবে মেনে নেয়া উচিত।

অতএব আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সকল শব্দ ও অর্থ সাব্যস্ত করেছেন আমরা সেগুলো সাব্যস্ত করব এবং তাদের বক্তব্যে যে সব শব্দ ও অর্থকে অস্বীকার করা হয়েছে আমরাও সেগুলোকে অস্বীকার করবো।

আর যে সব শব্দ অস্বীকার করা কিংবা সাব্যস্ত করার ব্যাপারে কিছুই আসে নি (আল্লাহর ব্যাপারে) সে সব শব্দের ব্যবহার করা যাবে না। অবশ্য যদি বক্তার নিয়তের প্রতি লক্ষ্য করলে বুঝা যায় যে অর্থ শুদ্ধ, তাহলে তা গ্রহণ করা হবে। তবে সে বক্তব্য কুরআন-হাদীসের শব্দ দিয়েই ব্যক্ত করা বাঞ্ছনীয়, মুজমাল ও অস্পষ্ট শব্দ দিয়ে নয়..। ত্রয়োদশ নীতিঃ দ্বীনী ব্যাপারে অহেতুক তর্ক, ঝগড়া-বিবাদ ও

বাড়াবাড়িপূর্ণ প্রশ্ন বিদ'আত হিসেবে গণ্য। এ নীতির মধ্যে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো শামিলঃ

১. মুতাশাবিহাত বা মানুষের বোধগম্য নয় এমন বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন করা। ইমাম মালেক (রহ.) - কে এক ব্যক্তি আরশের উপর আল্লাহর استواء বা উঠার প্রকৃতি-ধরণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন কিরূপ উঠা তা বোধগম্য নয়, তবে استواء বা উঠা একটি জানা ও জ্ঞাত বিষয়, এর প্রতি ঈমান রাখা ওয়াজিব এবং প্রশ্ন করা বিদ'আত^{১১৪}। ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ (রহ.) বলেন, কেননা এ প্রশ্নটি ছিল এমন বিষয় সম্পর্কে যা মানুষের জ্ঞাত নয় এবং এর জবাব দেয়াও সম্ভব নয়^{১১৫}। তিনি অন্যত্র বলেন, استواء বা আরশের উপর উঠা সম্পর্কে ইমাম মালেকের এ জবাব আল্লাহর সকল গুণাবলী সম্পর্কে ব্যাখ্যা হিসেবে পুরাপুরি যথেষ্ট^{১১৬}।

২। দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত নয় এমন কিছু নিয়ে গোঁড়ামি করা এবং গোঁড়ামির কারণে মুসলিমদের মধ্যে অনৈক্য ও বিভেদ সৃষ্টি করা বিদ'আত বলে গণ্য।

৩। মুসলিমদের কাউকে উপযুক্ত দলীল ছাড়া কাফির ও বিদ্বাতী বলে অপবাদ দেয়া।

চতুর্দশ নীতিঃ দ্বীনের স্থায়ী ও প্রমাণিত অবস্থান ও শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত সীমারেখাকে পরিবর্তন করা বিদ'আত।

১১৪ আস-সুন্নাহ ৩/৪৪১, ফাতহুল বারী ১৩/৪০৬-৪০৭

১১৫ মাজমু' আল-ফাতাওয়া ৩/২৫

১১৬ মাজমু' আল- ফাতাওয়া ৪/৪

উদাহরণ : ১। চুরি ও ব্যভিচারের শাস্তি পরিবর্তন করে আর্থিক জরিমানা দন্ড প্রদান করা বিদ'আত।

২। যিহারের কাফ্ফারার ক্ষেত্রে শরীয়াতের নির্ধারিত সীমারেখা পাল্টে আর্থিক জরিমানা করা বিদ'আত।

পঞ্চদশ নীতিঃ অমুসলিমদের সাথে খাস যে সকল প্রথা ও ইবাদাত রয়েছে মুসলিমদের মধ্যে সেগুলোর অনুসরণ বিদ'আত বলে গণ্য।

উদাহরণ : কাফিরদের উৎসব ও পর্ব অনুষ্ঠানের অনুকরণে উৎসব ও পর্ব পালন করা।

ইমাম যাহাবী (রহ.) বলেন, জন্ম উৎসব, নববর্ষ উৎসব পালনের মাধ্যমে অমুসলিমদের অনুকরণ নিকৃষ্ট বিদ'আত।

বিদ'আতের সংজ্ঞা প্রদানের পাশাপাশি বিদ'আতের মৌলিক ও সাধারণ কিছু নীতিমালা আমরা এখানে আলোচনা করলাম। আশা করি সকলেই এগুলো ভালভাবে জেনে নেবেন এবং উপলব্ধি করার চেষ্টা করবেন।

পরবর্তী করণীয় হল এ মূলনীতিগুলোর আলোকে আমাদের নিজেদের মধ্যে কিংবা আমাদের লোকালয়ে কোন বিদ'আত রয়েছে কিনা তা যাচাই করা, আর যদি এখানে কোন বিদ'আত থেকে থাকে তাহলে আমাদের উচিত সেগুলো চিহ্নিত করা ও দেশবাসীকে তা অবহিত করা এবং নিজেরা সেগুলো ত্যাগ করা ও অন্যদেরকেও তা ত্যাগ করতে উদ্বুদ্ধ করা, যাতে রিসালাতের দায়িত্ব পালনে মুসলিম হিসেবে আমরা সকলেই কম-বেশী অবদান রাখতে পারি। আল্লাহ আমাদের সকলকে তাওফীক দান করুন। আমীন!!

পঞ্চম পরিচ্ছেদ – বিদ'আতের প্রকারভেদের অপব্যাখ্যা

বিদ'আত প্রথমতঃ দুপ্রকারঃ-

(১) পার্থিব বিষয়ে বিদ'আত

(২) দ্বীনের ক্ষেত্রে বিদ'আত।

পার্থিব বিষয়ে বিদ'আতের অপর নাম নতুন আবিষ্কৃত বিষয়। এ প্রকার বিদ'আত বৈধ। কেননা দুনিয়ার সাথে সম্পর্কশীল সকল বিষয়ের ব্যাপারে মূলনীতি হল তা বৈধ। তবে শর্ত হল তাতে শরঈ কোন নিষেধ না থাকা। দ্বীনের ক্ষেত্রে বিদ'আত তথা নতুন কিছু উদ্ভাবন করা হারাম। কারণ দ্বীনের ব্যাপারে মূলনীতি হল তা অহীর উপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ দ্বীনের সমস্ত বিধান কুরআন ও সুন্নাহ থেকে গ্রহণ করতে হবে। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ

অর্থঃ যে ব্যক্তি আমাদের দ্বীনের মধ্যে নতুন বিষয় তৈরী করবে যা তার অন-ভুক্ত নয়, তা প্রত্যাখ্যাত হবে। তিনি আরও বলেন,

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

অর্থঃ যে ব্যক্তি এমন কোন আমল করবে, যে বিষয়ে আমাদের অনুমোদন নেই, তা আমলকারীর উপর প্রত্যাখ্যাত হবে।

দ্বীনের ব্যাপারে বিদ'আতের প্রকারভেদঃ দ্বীনের মধ্যে বিদ'আত দুপ্রকার। যেমনঃ (১) বিশ্বাসের ক্ষেত্রে বিদ'আত এবং (২) আমলের ক্ষেত্রে বিদ'আত।

১) বিশ্বাসের ভিতরে বিদ'আত। যেমন যাহ্মীয়া, মুতাযেলা, রাফেযী এবং অন্যান্য সকল বাতিল ফিকরার আকীদা সমূহ।

২) আমলের ক্ষেত্রে বিদ'আত। যেমন আল্লাহ আদেশ দেন নি, এমন বিষয়ের মাধ্যমে আল্লাহর ইবাদত করা। এটা আবার কয়েক প্রকার হয়ে থাকে। যেমনঃ-

(১) নতুন কোন ইবাদত আবিষ্কার করা,

(২) শরীয়ত সম্মত ইবাদতের মধ্যে বৃদ্ধি করা,

(৩) শরীয়ত সম্মত ইবাদত বিদ'আতী নিয়মে পালন করা এবং

(৪) শরীয়ত সম্মত ইবাদতকে সময়ের সাথে সংশ্লিষ্ট করা, যা শরীয়তে নির্ধারিত নয়।

প্রথম প্রকারঃ এমন নতুন ইবাদত আবিষ্কার করা, ইসলামী শরীয়তের মাঝে যার কোন ভিত্তি নেই। যেমন নতুন কোন নামায, রোজা এবং ঈদে মীলাদুন্নবী ও অন্যান্য নামে বিভিন্ন ঈদের প্রচলন করা।

দ্বিতীয় প্রকারঃ শরীয়ত সম্মত ইবাদতের মধ্যে কিছু বৃদ্ধি করা অথবা হ্রাস করা। যেমন কোন ব্যক্তি আছর কিংবা যোহরের নামায এক রাকাত বাড়িয়ে অথবা কমিয়ে আদায় করল।

তৃতীয় প্রকারঃ শরীয়ত সম্মত ইবাদাত বিদ'আতী নিয়মে পালন করা। যেমন হাদীসে বর্ণিত জিকিরের বাক্যগুলি দলবদ্ধভাবে সংগীতাকারে। উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করা। কিংবা ইবাদত পালনে নফসের উপর এমন কষ্ট দেয়া, যা রাসূল (সাঃ) এর সুন্নাতের বিরোধী।

চতুর্থ প্রকারঃ শরীয়ত সম্মত ইবাদতকে এমন সময়ের সাথে নির্দিষ্ট করে আদায় করা, যা শরীয়ত নির্ধারণ করেনি। যেমন শাবান মাসের ১৫ তারিখ দিনের বেলা রোজা রাখা এবং রাতে নির্দিষ্ট নামায আদায় করা।

মূলতঃ রোজা ও নামায শরীয়ত সম্মত ইবাদত। কিন্তু এটিকে নির্দিষ্ট সময়ের সাথে খাস করার কোন দলীল নেই। রোজা নির্দিষ্ট মাস এবং নামায নির্দিষ্ট সময়ের সাথে সংশ্লিষ্ট। প্রতিটি ইবাদত তার নির্ধারিত সময়ে আদায় করতে হবে। কিন্তু শাবান মাসের ১৫ তারিখে দিনের বেলা রোজা রাখা এবং সারা রাত নফল নামায আদায় করা নিশ্চিতভাবে বিদ'আত। কারণ এ সম্পর্কে কোন সহীহ দলীল নেই। তাছাড়া আমাদের দেশের কিছু কিছু আলেম বিদ'আতকে হাসানা এবং সাইয়েআ এ দুভাগে ভাগ করে থাকে। বিদ'আতকে এভাবে ভাগ করা সম্পূর্ণ ভুল এবং রাসূল (সাঃ) এর হাদীসের সম্পূর্ণ বিপরীত।

রাসূল (সাঃ) বলেছেন, প্রতিটি বিদ'আতই গোমরাহী বা ভ্রষ্টতা। আর এই শ্রেণীর আলেমগণ বলে থাকে, প্রত্যেক বিদ'আত গোমরাহী নয়। বরং এমন কিছু বিদ'আত রয়েছে যা হাসানা বা উত্তম বিদ'আত। হাফেয ইবনে রজব (রহঃ) এ প্রসঙ্গে বলেন, প্রত্যেক বিদ'আতই গোমরাহী - এটি একটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু পরিপূর্ণ বাক্য। এখানে প্রতিটি বিদ'আত কেই গোমরাহী বলে সাব্যস্ত- করা হয়েছে। রাসূল (সাঃ) বিদ'আতের কোন প্রকারকেই হাসানা বলেন নি। এই হাদীসটি দ্বীনের অন্যতম মূলনীতির অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহর রাসূলের বাণী, “যে

ব্যক্তি আমাদের দ্বীনের মধ্যে নতুন কিছু আবিষ্কার করল, যা আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়, তা প্রত্যাখ্যাত। অতএব যে ব্যক্তি কোন নতুন বিধান রচনা করে দ্বীনের মাঝে প্রবেশ করিয়ে দিবে, তা গোমরাহী বলে বিবেচিত হবে। তা থেকে দ্বীন সম্পূর্ণ মুক্ত। চাই সে বিষয়টি বিশ্বাসগত বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত হোক অথবা প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য আমলগত বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত হোক। বস্তুতঃ এ কারনেই বিদ'আত সম্বন্ধে সয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ

أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ وَشَرُّ الْأُمُورِ
(مُحَدَّثَاتُهَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ)۔ (أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ)

অতঃপর, সর্বাধিক সত্য কথা হল আল্লাহর কিতাব; আর সব জীবনাদর্শের চেয়ে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনাদর্শই সর্বোৎকৃষ্ট; আর দ্বীনের মাঝে বিদ'আত তথা নতুন কিছু উদ্ভাবন করা সর্বাপেক্ষা মন্দকাজ; আর প্রত্যেক বিদ'আত ই পথভ্রষ্টতা। এই হাদীসটি মাসাবীহ (المصابيح) গ্রন্থের বিশুদ্ধ হাদীসসমূহের অন্তর্ভুক্ত যা জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন। ইরবাদ ইবন সারিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত অপর এক হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ

من يعيش منكم بعدي فسيروا اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء
الراشدين المهديين وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فان كل
محدثه بدعة وان كل بدعة ضلالة »۔ (أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ)

আমার মৃত্যুর পরে তোমাদের মধ্য থেকে যে বেঁচে থাকবে, অচিরেই সে বহু মতবিরোধ দেখতে পাবে; সুতরাং তোমাদের উপর আবশ্যকীয় কর্তব্য হল, তোমরা আমার পরে আমার সুন্নাহ ও খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাহকে মজবুতভাবে আঁকড়িয়ে ধরবে ও দাঁত দ্বারা কামড়ে থাকবে; আর দীনের মাঝে বিদ'আত তথা নতুন কিছু উদ্ভাবন করা থেকে বেঁচে থাকবে; কারণ, দীনের মাঝে নতুন কিছু উদ্ভাবন করাই হল বিদ'আত আর প্রত্যেক বিদ'আত ই পথভ্রষ্টতা।” এই হাদীস দুটিতে উল্লেখিত বিদ'আত দ্বারা উদ্দেশ্য হল মন্দ বিদ'আত (البدعة السيئة), যার পক্ষে কুরআন ও সুন্নাহর মধ্যে কোন দলিল-প্রমাণ এবং স্পষ্ট বা অস্পষ্ট কোন সনদ, বক্তব্য অথবা উদ্ভাবিত কিছু নেই। এর দ্বারা মন্দ বিদ'আত (البدعة السيئة) ছাড়া অন্যান্য নতুন করে চালু হওয়া বিষয় রয়েছে এবং যেগুলোর পক্ষে দলিল-প্রমাণ ও স্পষ্ট বা অস্পষ্ট সনদ রয়েছে সে সব বিষয় উদ্দেশ্য নয়; সুতরাং তা ভ্রষ্টতা বা বিভ্রান্তিকর নয়, বরং তা কখনও কখনও তা বৈধ, যেমন আটার জন্য চালুনি ব্যবহার করা, সর্বদা উন্নতমানের আটা বা ময়দা ভক্ষণ করা। আবার কখনও কখনও তা মুস্তাহাব, যেমন মসজিদের মিনার বানানো ও বইপত্র রচনা করা। আবার কখনও কখনও তা ওয়াজিব, যেমন নাস্তিক ও বিভ্রান্ত দলসমূহ কর্তৃক সৃষ্ট সন্দেহ-সংশয়ের যথাযথ জওয়াব দেওয়ার জন্য দলিল-প্রমাণ গ্রহণ করা। কারণ, বিদ'আত শব্দটির দুটি অর্থ রয়েছেঃ একটি হল: সাধারণ ভাষাগত বা আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে, আর তখন তা সব ধরনের নতুন প্রবর্তিত বিয়ককেই অন্তর্ভুক্ত করে, চাই

তা স্বভাবগত হউক, অথবা ইবাদতের ক্ষেত্রে হউক। আর অপর অর্থটি হল: বিশেষভাবে শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে, আর তা হল সাহাবীগণের পরবর্তী সময়ে শরীয়ত প্রবর্তক (আল্লাহ) এর পক্ষ থেকে কথা, কাজ, স্পষ্ট ঘোষণা কিংবা ইশারা-ইঙ্গিত- ইত্যাদি যে কোনোভাবে কোনো প্রকার অনুমোদন ব্যতীত দীনের মধ্যে কম বা বেশি করা। এ বর্ণনা থেকে স্পষ্ট হলো যে, উপরোক্ত হাদীস দুটির মধ্যে আলোচিত বিদআত যদিও ব্যাপকভাবে সকল প্রকার নতুন প্রবর্তিত বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে, কিন্তু তার এই ব্যাপকতা আভিধানিক অর্থের দৃষ্টিকোণ থেকে নয়, বরং তার এ ব্যাপকতা হল বিশেষভাবে শরীয়তের পারিভাষিক অর্থের দৃষ্টিকোণ থেকে।

সুতরাং তা মৌলিকভাবে মানুষের স্বভাবগত ও অভ্যাসগত বিষয়গুলোকে মোটেই অন্তর্ভুক্ত করবে না; বরং তার ব্যাপকতা আকিদা-বিশ্বাস ও ইবাদতের ধরন ও প্রকৃতির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। কারণ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দুনিয়াবী বিষয়ে শিক্ষা দেওয়ার জন্য প্রেরণ করা হয়নি, বরং তাঁকে শুধু দীনের বিষয়গুলো শিক্ষাদানের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে; আর এ কথার প্রমাণ বহন করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণীঃ

أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ، إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ دِينِكُمْ فَخُذُوا بِهِ « أخرجہ مسلم

তোমাদের দুনিয়ার বিষয়ে তোমরাই ভাল জান; তাই যখন আমি তোমাদেরকে তোমাদের দীনের কোনো বিষয়ে নির্দেশ দেব, তখন তোমরা তা অবশ্যই গ্রহণ করবে। অতঃপর আকিদা-বিশ্বাসের ক্ষেত্রে

কিছু কিছু বিদ'আত কুফরী, আবার কিছু কিছু কুফরী নয়, কিন্তু তা প্রত্যেকটি কবীরা গুনাহের চেয়েও মারাত্মক ধরনের গুনাহ, এমনকি হত্যা ও যিনা-ব্যভিচারের চেয়েও মারাত্মক; আর এই ধরনের বিদআতের উপরে কুফরী ছাড়া অন্য কোনো গুনাহ নেই। আর ইবাদতের ক্ষেত্রে বিদ'আত যদিও কুফরীর চেয়ে নিম্ন পর্যায়ে, কিন্তু তা কাজে পরিণত করাটা শরীয়তের অবাধ্যতা ও ভ্রষ্টতা, বিশেষ করে তা যখন সুন্নাতে মুয়াক্কাদাকে আঘাত করবে। আর অভ্যাস-প্রথাজনিত বিষয়ের ক্ষেত্রে যেসব বিদ'আত, তা (শরীয়তের) অবাধ্যতা ও ভ্রষ্টতার পর্যায়ে পড়ে না, তবে তা পরিত্যাগ করাটা উত্তম!

যখন এটা প্রতিষ্ঠিত হলো, তখন বুঝা গেল যে, মিনারায় আযান দেওয়া সালাতের সময় জানিয়ে দেওয়ার জন্য সহায়তা করে, বইপত্র রচনা করা শিক্ষাদান ও প্রচার কাজের সহায়ক, নাস্তিক ও বিভ্রান্ত দলসমূহ কর্তৃক সৃষ্ট সন্দেহ-সংশয়ের যথাযথ জওয়াব দেওয়া, অন্যায় কাজে বাধা প্রদান করা ও দ্বীন কে রক্ষা করার জন্য দলিল-প্রমাণসহ গ্রন্থ রচনা করা ইত্যাদি প্রতিটি বিষয়ই অনুমোদিত, বরং তা নির্দেশিত; কারণ, মন্দ বিদ'আত (البدعة السيئة) ভিন্ন যেসব (আভিধানিক) বিদ'আত রয়েছে, (ইসলামের) প্রথম প্রজন্মের লোকজনের যদিও তার প্রয়োজন হয়নি, কিন্তু পরবর্তী প্রজন্মের লোকজনের জন্য তার প্রয়োজন দেখা দেয় এবং তারা কোনো প্রকার বিরোধ ছাড়াই ইজমা তথা ঐক্যমতের ভিত্তিতে তাকে উত্তম বলে বিবেচনা করেছেন।

ইবাদতের ক্ষেত্রে কোনো বিদ'আত ই অনুমোদিত নয়

তবে ব্যাপক অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে যে, মন্দ ও নিন্দিত বিদআতের অস্তিত্ব তো দূরের কথা, যে সব বিদ'আতকে আভিধানিকভাবে বিদ'আত বলা হয় সে জাতীয় বিদ'আতের অস্তিত্বও নির্ভেজাল শারীরিক ইবাদত যেমন- সাওম, সালাত, কুরআন তিলাওয়াত এবং এ ধরনের কোনো ইবাদত ও তার বৈশিষ্ট্যের মধ্যে পাওয়া যায় না, বরং এগুলোর মধ্যে যদি কোনো বিদ'আত হয় তবে তা মন্দ ও নিন্দিত বিদ'আতই হয়। কেননা, ইসলামের প্রথম যুগে এ কাজ সংঘটিত না হওয়ার কয়েকটি সম্ভাবনা ধরে নেওয়া যায়;

- তার প্রয়োজন না থাকা
- অথবা তার ব্যাপারে বাধা বিদ্যমান থাকা,
- অথবা তার দিকে মনোযোগ না দেওয়া
- অথবা তার ব্যাপারে অলসতা করা,
- অথবা অপছন্দনীয় ও শরীয়ত সম্মত না হওয়া।

তন্মধ্যে নির্ভেজাল শারীরিক ইবাদতের ক্ষেত্রে প্রথম দুটি কারণ যথাযথ নয়; কারণ ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার নৈকট্য হাসিল করার প্রয়োজনীয়তা কখনও শেষ হয়ে যায় না; আর ইসলাম বিজয় ও তার অনুসারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার পর কোনো নিষেধকারী তা থেকে নিষেধ করতে সাহস করতে পারে না। অনুরূপভাবে তার প্রতি মনোযোগ না দেওয়া অথবা সে ব্যাপারে অলসতা করার কথাটিও যথাযথভাবে সমর্থনযোগ্য নয়, কেননা নবী

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সকল সাহাবীর ব্যাপারে এই ধরনের ধারণা পোষণ করা বৈধ নয়; সুতরাং প্রমাণ হয়ে গেল যে, উপরোক্ত সম্ভাবনাসমূহের মধ্যে কেবল সর্বশেষ সম্ভাবনা অর্থাৎ ঐ সময়ে এ ধরনের কাজের অস্তিত্ব বিদ্যমান এই জন্যই ছিল না যে, তা হল বিদ'আত, যা অপছন্দনীয় ও শরীয়ত নিষিদ্ধ। বিদ'আতের প্রকারভেদ সম্বন্ধে কয়েকজন প্রখ্যাত আলেমদের আলোচনা নিম্নে উপস্থাপন করা হলোঃ

হযরত আল্লামা ইবনে হাজার হাইতামী মক্কী শাফেয়ী রহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত-৯৭৩ হিজরী) বর্ণনা করেন,

قال العزین عبد السلام رحمه الله تعالى - البدعة فعل ما لم

يعهد في

عهد النبي صلى الله عليه وسلم - وتنقسم الى خمسة احكام

يعنى

الوجوب والندب والخ وطريق معرفة ذلك - ان تعرض البدعة

على قواعد

الشرع - فاي حكم دخلت فيه، فهي منه - فمن البدع

الواجبة تعلم النحو

الذى يفهم به القران والسنة ومن البدع المحرمة مذهب

نحو القدرية

ومن البدع المندوبة احداث نحو المدارس والاجتماع لصلوة

التراويح ومن

البدع المباحة المصافحة بعد الصلوة ومن البدع المكروهة

زخرفة

- المساجد والمصاحف اى بغير الذهب والا فهى محرمة

وفى الحديث

كل بدعة ضلالة وكل ضلالة فى النار- وهو محمول على

المحرمة لا

- غير

অর্থাৎ, হযরত আল্লামা ইজ্জ বিন আব্দুস সালাম রহমাতুল্লাহি আলাইহি ইরশাদ করেন, বিদ'আত এমন একটি কাজ যার প্রচলন হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যুগে ছিল না। এবং এটা (বিদ'আত) কে পাঁচটি বিধানে বিভক্ত করা হয়েছে।

অর্থাৎ ওয়াজিব-মুস্তাহাব এবং অন্যান্য। এটা জানার উপায় এই যে, বিদ'আত (নতুন উদ্ভাবন) কে ইসলামী শরীয়তের মূলনীতিতে পেশ করা হবে। ফলে ঐ বিদ'আত (নতুন উদ্ভাবন) যেই বিধানে পড়বে তবে তা উহার অন্তর্ভুক্ত হবে।

১। ওয়াজিব বিদ'আতঃ এর মধ্যে (অন্যতম) রয়েছে ইলমে নাহ্ শিক্ষা করা। যার মাধ্যমে কুরআন মাজীদ ও নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদীস শরীফকে বুঝা যায়।

২। হারাম বিদ'আতঃ এর মধ্যে রয়েছে ক্বদরিয়্যাহ এবং অন্যান্য সম্প্রদায় (বাতিল ফিক্কা) সমূহ।

৩। মুস্তাহাব বিদ'আতঃ এর মধ্যে রয়েছে মাদ্রাসা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করা এবং তারাবীহ নামাজের জন্য একত্রিত হওয়া।

৪। মুবাহ (বৈধ) বিদ'আতঃ এর মধ্যে রয়েছে নামাজের পর মুসাফাহা (করমর্দন) করা।

৫। মাকরুহ বিদ'আতঃ এর মধ্যে রয়েছে মসজিদ এবং পবিত্র কুরআন মাজিদের সৌন্দর্যকরণ অর্থাৎ স্বর্ণ ব্যতিরেকে অন্যান্য বস্তু দ্বারা (মসজিদ এবং কুরআন মাজিদের) সৌন্দর্যকরণ।

(অন্যদিকে) স্বর্ণ দ্বারা এহেন সৌন্দর্যকরণ করাও হারাম (এগুলো হল বিদ'আতের পাঁচটি প্রকার)। আর হাদীসের মধ্যে রয়েছে যে, প্রত্যেক বিদ'আত হল গোমরাহী (ভ্রষ্টতা) এবং প্রত্যেক গোমরাহী-ই জাহান্নামে যাওয়ার মাধ্যম।

তাহলে এই হাদীস শুধুমাত্র হারাম বিদ'আতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য (অর্থাৎ এই হাদীসে শুধুমাত্র হারাম বিদ'আতের কথা উল্লেখ হয়েছে, নতুবা অসংখ্য নব্য সৃষ্টি দ্বীনের জন্য আবশ্যকীয়)^{২৭}। ইমাম নববীও লিখেছেন যে, বিদ'আত পাঁচ প্রকার,

البدعة خمسة اقسام - واجبة ومندوبة ومحرمة ومكروهة

ومباحة - فمن

الواجبة نظم ادلة المتكلمين للرد على الملاحدة والمبتدعين

وشبه ذلك

ومن المندوبة تصنيف كتب العلم وبناء المدارس والربط

وغير ذلك ومن

المباح التبسط في الوان الاطعمة وغير ذلك والحرام

- والمكروه ظاهران

অর্থাৎ, বিদ'আতের প্রকার হল পাঁচটি, যথাঃ ১। ওয়াজিব, ২। মুস্তাহাব, ৩। হারাম, ৪। মাকরুহ, ৫। মুবাহ। সুতরাং, ওয়াজিব বিদ'আত সমূহের মধ্যে - কথিত মাযহাবী, বিদ'আতী ও তাদের

^{২৭} ফতোয়ায়ে হাদীসিয়াহ, পৃষ্ঠা - ১০৯, দারুল ফিকর, বৈরুত, লেবানন

সমমনা বাতিল ফির্কাসমূহের খন্ডনে উলামায়ে মুতাকাল্লিমীন (আক্বায়েদের ইমামগণ) দের প্রমাণাদি বিন্যস্ত করা অন্যতম। আর মুস্তাহাব বিদ'আতের মধ্যে হল ইলমী কিতাব প্রণয়ন, মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা এবং মুসাফিরখানা তৈরী করা।

জায়েজ (বৈধ) বিদ'আতের মধ্যে অন্যতম হল উন্নতমানের হরেক রকমের খানা-পিনা (যেমন- পোলাউ, কাচি ইত্যাদি)। আর মাকরুহ এবং হারাম বিদ'আত তো স্পষ্ট (দৃশ্যমান)^{১১৮}।

ইমাম নববী উল্লিখিত হাদীসের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেন, وفي الحديث تخصيص قوله صلى الله عليه وسلم - (كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة) وان المراد به المحدثات الباطلة والبدع المذمومة অর্থাৎ, উপরোল্লিখিত হাদীস - এ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ফরমানে মুবারক

كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة

(প্রত্যেক নতুন বস্তুই বিদ'আত এবং প্রত্যেক বিদ'আত গোমরাহী) এর ব্যাখ্যা হল যে, অত্র হাদীসের মধ্যে বিদ'আত থেকে উদ্দেশ্য নব্য ভ্রান্ত বিষয়াদি এবং মন্দ বিদ'আত^{১১৯}। ইমাম নববী রহমাতুল্লাহি আলাইহি আরও লিখেছেন,

فيه الحث على الابتداء بالخيرات وسن السنن الحسنات والتحذير من
- اختراع الا باطل المستقبحات

^{১১৮} শরহে নববী আলা মুসলিম, খন্ড - ১, পৃষ্ঠা-৩২৭

^{১১৯} শরহে নববী আলা মুসলিম, খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৩২৭

অর্থাৎ, উপরোল্লিখিত হাদীসে ভাল কাজের সূচনা এবং উত্তম রীতি-
রেওয়াজ চালু করার প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে এবং ভ্রান্ত ও
অনিষ্ট রীতি-রেওয়াজ চালু করার ব্যাপারে ভীতি প্রদর্শন করা
হয়েছে^{২০}। হযরত মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী রহমাতুল্লাহি আলাইহি
(ওফাত ১০১৪ হিজরী) নবীজীর হাদীসঃ

وأيكم
ومحدثات الأمور

এর নিচে লিখেন,

ای احذروا عن الأمور التي احدثت على خلاف اصل من
اصول الدين
- واتقوا احدثها

অর্থাৎ, ঐসকল বিষয় হতে বেঁচে থাকো যা দ্বীনের উসূলের মধ্য
থেকে কোন একটি উসূল এর সাথে সাংঘর্ষিক হয়ে গিয়েছে এবং
এমন বিষয়ের উদ্ভাবন হতে বেঁচে থাকো। মোদ্বাকথা হল এই যে,
(ধর্মের মধ্যে) কোন নতুন বিষয় যখন ইসলামী শরীয়তের উসূলের
সাথে সাংঘর্ষিক হয় তবে ঐ বিদ'আত (নতুন উদ্ভাবন) টি নিষিদ্ধ
এবং বিদ'আতে সাইয়ে'আহ্। আর যদি তা (ইসলামী) শরীয়তের
উসূল এর মোতাবেক হয়, তবে তা স্পষ্টত বৈধ।

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়টি আরও বিস্তারিত ভাবে
বলা যায় যে, বর্তমানে নামধারী মুসলিম সমাজের বিদ'আত সম্বন্ধে
প্রচলিত ধারণা হলো - বিদ'আত দু প্রকার, যথাঃ

^{২০} শরহে নববী আলা মুসলিম, খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৩২৭

(১) বিদ'আতে হাসানাহ এবং

(২) বিদ'আতে সাযিয়াহ্

কেউ কেউ বিদ'আতে সাযিয়াহ্কে *بدعة مستقبحة* বা ঘৃণ্য বিদ'আত নাম দিয়েছেন। আর এই বিদ'আত কে *سيئة* ও *حسنة* ঐ দুটি ভাগে ভাগ করার কারণে বহু সংখ্যক বিদ'আত ভালো বিদ'আত এর নাম নিয়ে অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে ইসলামী আকীদা ও আমলের বিশাল ব্যবস্থাপনায় অনুপ্রবেশ করেছে। ফলে তাওহীদ বাদীরা আজ বিদ'আত সমূহ অবলিলাক্রমে করে যাচ্ছে। যা প্রকৃতপক্ষে তাওহীদ ও সুন্নাহ বিরোধী। এখানে উল্লেখ্য যে, যদিও আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী *عمدة القارى* এর মধ্যে বিদ'আতকে দু'প্রকার বলেছেন। তিনি বলেছেনঃ

ثم البدعة على نوعين : بدعة حسنة وبدعة مستقبحة

কিন্তু তা গ্রহণযোগ্য নয়। বিদ'আতকে দু'ভাগে ভাগ করা একেবারেই অমূলক ও অযৌক্তিক। কারণ রাসুল (সাঃ) এর যুগে বিদ'আতের মধ্যে হাসানা বা ভালো দিক পাওয়া যায়নি। আর রাসুলের যুগেও নয় এবং রাসুল (সাঃ) এর বানীর মাধ্যমেও বিদ'আত কে এভাবে দু'ভাগ করা হয়নি। তবে এ ভাগ সর্বপ্রথম ইয্য ইবন আব্দুস সালাম উল্লেখ করেন, অতঃপর তার শিষ্য ক্বারারি তার অনুরসণ করে তা উল্লেখ করেছেন।

বিদ'আতের এ ভাগ করার নীতির প্রতি সন্তোষ প্রকাশ করায় শাতেবী (রহ.) ক্বারারির প্রতিবাদ করে বলেন: “বিদ'আতের এ

ধরণের ভাগ-বন্টন স্বরচিত, এর পক্ষে শরী‘আতের কোনো দলীল নেই, বরং এ বন্টন স্ব-যুক্তির বিচারেই বাতিল ও প্রত্যাখ্যাত। কারণ, বিদ‘আতের বাস্তবতা হচ্ছে, শরী‘আতে যার কোনো দলীল নেই, না সরাসরি কুরআন-না হাদীস, না তার থেকে নিঃসৃত কোনো নীতি। যদি শরী‘আতের এমন দলীল থাকে, যার দ্বারা ওয়াজিব অথবা মানদুব অথবা ইবাহাত প্রমাণিত হয়, তাহলে সেটা আর বিদ‘আত থাকে না; বরং অন্যান্য আদিষ্ট আমলের অন্তর্ভুক্ত অথবা তার মধ্যে উত্তম আমল হিসেবে গণ্য হয়। অতএব, এগুলোকে (ওয়াজিব, ইস্তেহাব, ইবাহাত, হারাম ও মাকরুহ) বিদ‘আত গণ্য করা এবং এগুলোর সপক্ষে ওয়াজিব অথবা মানদুব অথবা ইবাহাতের দলীল বিদ্যমান থাকার দাবি করা, মূলত দুই বিপরীত বস্তুকে একত্র করার শামিল।

হ্যাঁ, এ বন্টনের অন্তর্ভুক্ত ‘মাকরুহ’ ও ‘হারাম’ বিদ‘আত হিসেবে সমর্থন যোগ্য, অন্য বিবেচনায় নয়, অর্থাৎ বন্টন হিসেবে বিদ‘আত বিবেচ্য নয়। কারণ নিষেধাজ্ঞার ওপর অথবা মাকরুহ হওয়ার ওপর যদি কোনো দলীল থাকে, তখন সেটা বিদ‘আত নয়; বরং তা পাপের অন্তর্ভুক্ত, যেমন হত্যা, চুরি, মদপান ইত্যাদি। অতএব, কোনো বিদ‘আতের ক্ষেত্রেই এ বন্টন কল্পনা করা যায় না, শুধু মাকরুহ ও হারাম ব্যতীত, যেমন বিদ‘আতের আলোচনায় বলা হয়।

ক্বারারি বিদ‘আত প্রত্যাখ্যানের ব্যাপারে সাথীদের যে ঐক্য বর্ণনা করেছেন তা ঠিক; কিন্তু তিনি যে বিদ‘আতের শ্রেণি বিভাগ বর্ণনা করেছেন তা সঠিক নয়, তদুপরি আরো আগ বাড়িয়ে তিনি যে এর ওপর ঐকমত্যের দাবী করেছেন তা আশ্চর্যের বিষয়! মতবিরোধ সত্ত্বেও এবং ঐক্য ভঙ্গের কারণ জানা থাকার পরও তিনি কিভাবে ঐক্য দাবি করলেন! হয়তো, বরং নিশ্চিত এ ব্যাপারে তিনি তার উস্তাদের অনুসরণ করেছেন কোনো চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই।

অতঃপর তিনি [শাতেবী (রহ.)] এ বণ্টনের ব্যাপারে ইয্য ইবন আব্দুস সালামের কারণ বর্ণনা করেন। তিনি মূলত ‘মাসালেহে মুরসালাহ’-কে বিদ‘আত নামকরণ করেছেন। অতঃপর তিনি বলেন: কিন্তু ক্বারারি কর্তৃক তার শাইখ এবং অন্যান্য মানুষের উদ্দেশ্যের বিপরীতে বিদ‘আতের এ ভাগ-বণ্টন বর্ণনা করার কোনো ওয়রই গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ তিনি এ ভাগ-বণ্টনের মাধ্যমে সবার (তার শাইখ ও অন্যান্য মানুষের) ইজমা ও ঐক্যের খেলাফ করেছেন, তাই এ বণ্টন ইজমা ও উম্মতের ঐক্যমত্যের খেলাফ”। (আল-ই‘তিসাম: পৃষ্ঠা নং ১৫২-১৫৩) পাঠকবর্গকে আমি তার কিতাব দেখার অনুরোধ করছি, কারণ তিনি পরিপূর্ণ রূপে ও সুন্দরভাবে এর প্রতিবাদ করেছেন। ইয ইবন আব্দুস সালাম তার বিদ‘আতের বণ্টন অনুসারে বলেন: ওয়াজিব বিদ‘আতের অনেক উদাহরণ রয়েছে।

এক. আল্লাহর কালাম ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস বুঝার জন্য ইলম নাহু বা আরবি ব্যাকরণ শাস্ত্র নিয়ে মশগুল হওয়া। শরী‘আত হিফাযত করার জন্য এ ইলম অর্জন করা ওয়াজিব। কারণ, এ ইলম ব্যতীত শরী‘আত হিফাযত করা সম্ভব নয়, আর যা ব্যতীত ওয়াজিব আদায় করা সম্ভব নয়, তা অর্জন করাও ওয়াজিব।

দুই. কুরআন ও হাদীসের অপরিচিত শব্দ মুখস্থ করা।

তিন. উসূলে ফিকাহ লিপিবদ্ধ করা।

চার. সহীহ ও দুর্বল হাদীস পার্থক্য করার জন্য ‘জরহ ও তা‘দিল শাস্ত্র’ শিক্ষা করা। শরী‘আতের নীতিমালা দ্বারা প্রমাণিত যে, শরী‘আত সংরক্ষণ করা ফরয, যেহেতু এসব ইলম ব্যতীত শরী‘আত সংরক্ষণ করা সম্ভব নয়, তাই এসব ইলম অর্জন করাও ফরয”।

(কাওয়েদুল আহকাম ফি মাসালেহেল আনাম: ২/১৭৩)

ইমাম শাতেবী এরও প্রতিবাদ করেছেন, তিনি বলেন: “আর ইয়দ্দিনের কথা: ‘যা ব্যতীত ওয়াজিব আদায় হয় না, তা অর্জন করাও ওয়াজিব’। এসব ব্যাপারে পূর্বসূরিদের আমল থাকা জরুরী নয়, আর না নির্দিষ্টভাবে শরী‘আতের কোনো দলীল এর পক্ষে থাকা জরুরি। কারণ, এগুলো ‘মাসালেহে মুরসালাহ’-এর অন্তর্ভুক্ত, বিদ‘আতের নয়।” (আল-ই‘তিসাম, পৃষ্ঠা নং ১৫৭-১৫৮)

এ প্রতিবাদের সারসংক্ষেপ: এসব ইলমকে শরী‘আতের নিন্দনীয় বিদ‘আত হিসেবে গণ্য করা ঠিক নয়। কারণ, শরী‘আতের সাধারণ বিধান ও তার সাধারণ নীতি এসব ইলমের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে এবং এর গুরুত্বের সাক্ষ্য দেয়। অর্থাৎ শরী‘আতের যেসব দলীল দীন ও সুন্নত হিফাযত করার নির্দেশ দেয় এবং শরী‘আতের জ্ঞান ও কুরআন-হাদীস যথাযথ মানুষের নিকট পৌঁছানোর তাগিদ প্রদান করে, তা এ জাতীয় ইলম অর্জনের প্রতিও উদ্বুদ্ধ করে।

আবার এও বলা যায়: এসব ইলম আভিধানিক অর্থে বিদ‘আত, শরয়ী বিদ‘আত নয়, শরয়ী সকল বিদ‘আতই নিন্দনীয়। আর আভিধানিক বিদ‘আতের কতক ভালো আর কতক মন্দ। ইবন হাজার আসকালানী (রহ.) বলেছেন: শরী‘আতের দৃষ্টিতে সকল বিদ‘আত নিন্দনীয়; কিন্তু আভিধানিক অর্থে নিন্দনীয় নয়। কারণ, আভিধানিক অর্থে পূর্বের নমুনা ব্যতীত যে কোন আবিষ্কারই বিদ‘আত, কি ভালো কি মন্দ। (ফাতহুল বারি: ১৩/২৫৩)। তিনি আরও বলেন: “البدع শব্দ بدعة এর বহুবচন, পূর্বের নমুনাহীন প্রত্যেক আবিষ্কারই বিদ‘আত, আভিধানিক অর্থে ভালো-মন্দ সব আবিষ্কার এর অন্তর্ভুক্ত, তবে শর‘ঈ পরিভাষায় শুধু মন্দকেই বিদ‘আত বলা হয়, যদি শরী‘আত অনুমোদিত কোনো বিষয়ে কখনো

বিদ'আত ব্যবহার হয়, তাহলে সেটা তার আভিধানিক অর্থে”।

(ফাতহুল বারি: ১৩/৩৪০)

ফাতহুল বারির (৭২৭৭) নং হাদীসের টিকায় রয়েছে, শাইখ আব্দুর রহমান আল-বাররাক বলেছেন: “এ বণ্টন হচ্ছে আভিধানিক অর্থে, কিন্তু শর'ঈ অর্থে সকল বিদ'আত গোমরাহী, যে রূপ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ

«وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة»

“আর সবচেয়ে খারাপ বস্তু হচ্ছে বিদ'আত, আর প্রত্যেক বিদ'আত গোমরাহী”। (সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৪৪১)

বিদ'আত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এমন ব্যাপক সাধারণ মন্তব্য থাকা সত্ত্বেও বিদ'আতকে ভাগ করে ওয়াজিব অথবা মুস্তাহাব অথবা মুবাহ বলা দুরন্ত নয় বরং শরী'আতে প্রত্যেক বিদ'আতই হারাম অথবা মাকরুহ। এ মাকরুহ বিদ'আতের উদাহরণ যেমন ফজর ও আসরের সময়ে নির্দিষ্টভাবে মুসাফাহ করা, যদিও অনেকে বলে এটা মুবাহ তথা বৈধ বিদ'আত। এছাড়াও মুসলিম সমাজে বিদ'আতের এ ভাগ চালু হয়। হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আব্দুল কারী বর্ণিত হযরত ওমরের তারাবীহ এর সালাত সংক্রান্ত হাদীসের উক্তি **نعم البدعة هذه** এটা একটা উত্তম বিদ'আত নামক বাক্য থেকে। উত্তম বিদ'আত বলার পর আপনা আপনি বুঝা যায় যে, এর বিপরীতে আরেকটি বিদ'আত আছে যা

অবশ্যই খারাপ ও নিন্দনীয় হবে। হযরত ওমর (রাঃ) এর হাদীসের জবাব-

(১) হযরত ওমর (রাঃ) এর উক্তি দিয়ে বিদ'আত কে ভাগ করলে রাসুলের হাদীস كل بدعة ضلالة “সব বিদ'আত ই গোমরাহী অর্থহীন হয়ে যায়”।

(২) হযরত ওমর কর্তৃক তারাবীহের সালাত জামায়াত সহকারে পড়ানো এটা নতুন নয় বরং এর ভিত্তি পূর্বে পাওয়া যায়। কারণ রাসুল (সাঃ) এর যামানায় স্বয়ং রাসুল (সাঃ) নিজে দুই তিন রাত ইমাম হয়ে নামাজ পড়িয়েছেন। এ প্রসঙ্গে হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ

عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم * أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى في المسجد فصلى بصلاته ناس ثم صلى من القابلة فكثر الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة فلم يخرج إليهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فلما أصبح قال قد رأيت الذي صنعتكم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن يفرض عليكم وذلك في رمضان. بخارى ومسلم

উপরোক্ত হাদীস থেকে একথা প্রতীয়মান হয় যে, জামাআতের সাথে তারাবীহের নামাজ পড়ানোর কাজ প্রথমে নিজে রাসুল (সাঃ) করেছেন। আর তা পর পর তিন রাত্রি পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। তাহলে হযরত ওমর জামায়াতের সাথে তারাবীহ পড়াকে বিদ'আত বললেন কেন? এর জবাব হলো হযরত ওমর এখানে শাদ্দিক ও আভিধানিক দৃষ্টিকোন থেকে বিদ'আত বলেছেন পারিভাষিক দৃষ্টিকোন থেকে নয়। কারণ রাসুল (সাঃ) ২-৪ দিন পড়ার পর বন্ধ

হয়ে যায়। হযরত আবু বকর এর খিলাফত কালেও তা আর জামায়াতের সাথে চালু করা হয়নি। এ হিসাবে হযরত ওমরের একে বিদ'আত বলা ভুল হয়নি এবং তাতে করে এটা বিদ'আত ও হয়ে যায়নি। মুহাদ্দিসীনে কেরামের মতে হযরত ওমরের *نعمه البدعة هذه* এর তাৎপর্যঃ

نعم الامر البديع الذي ثبت عن رسول الله ص وترك في زمان ابي بكر
(نيل الاوطار) ..لاشتغال الناس فيما حصل بعد وفات الرسول ص

জামাআতের সাথে তারাবীহ পড়া এক অতি উত্তম ব্যবস্থা। যা রাসুলে করীম (সাঃ) থেকে শুরু হয়েছিল এবং পরে হযরত আবু বকর এর সময়ে লোকদের নানা জটিলতার মশগুল হয়ে থাকার কারনে পরিত্যক্ত হয়ে গিয়েছিল।

এ প্রসঙ্গে মোল্লা আলী ক্বারী হযরত ওমর ফারুকের কথার ব্যাখ্যায় বলেনঃ

انما سماها بدعة لاعتبار صورتها فان هذا الاجتماع محدث بعده عليه الصلاة
والسلام

উমর ফারুক (রাঃ) এ কাজকে বিদ'আত বলেছেন বাহ্যিক দিক লক্ষ্য করে। কেননা নবী কারীম (সাঃ) এর পর এই প্রথম বার নতুন ভাবে জামায়াতে সাথে তারাবীহের নামাজ চালু হয়েছিল। তারাবীহ্ এর সালাত জামাতে আদায় করার অনুমোদন প্রসঙ্গে হযরত উমর (রাঃ) এর হাদীসটি উল্লেখ যোগ্য। যেমনঃ আব্দুর রাহমান ইবন 'আবদ আল-ক্বারী (রঃ) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন,

وَعَنِ ابْنِ شَهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِيِّ، أَنَّهُ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - لَيْلَةً فِي رَمَضَانَ، إِلَى الْمَسْجِدِ، فَإِذَا النَّاسُ أَوْزَاعٌ مُتَفَرِّقُونَ يُصَلِّي الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ، وَيُصَلِّي الرَّجُلُ فَيُصَلِّي بِصَلَاتِهِ الرَّهْطُ فَقَالَ عُمَرُ إِنِّي أَرَى لَوْ جَمَعْتُ هَؤُلَاءِ عَلَى قَارِيٍّ وَاحِدٍ لَكَانَ أَمْثَلًا. ثُمَّ عَزَمَ فَجَمَعَهُمْ عَلَى أَبِي بِنِ كَعْبٍ، ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُ لَيْلَةً أُخْرَى، وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ قَارِيهِمْ، قَالَ عُمَرُ نِعَمَ الْبِدْعَةُ هَذِهِ، وَالَّتِي يَنَامُونَ عَنْهَا أَفْضَلُ مِنَ الَّتِي يَقُومُونَ. يُرِيدُ آخِرَ اللَّيْلِ، وَكَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ أَوَّلَهُ

আমি রমযানের এক রাতে উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) - এর সঙ্গে মসজিদে নববীতে গিয়ে দেখতে পাই যে, লোকেরা বিক্ষিপ্ত জামায়াতে বিভক্ত। কেউ একাকী সালাত আদায় করছে আবার কোন ব্যক্তি সালাত আদায় করছে এবং তার ইকতেদা করে একদল লোক সালাত আদায় করছে। উমর (রাঃ) বললেন, আমি মনে করি যে, এই লোকদের যদি আমি একজন ক্বারীর (ইমামের) পিছনে একত্রিত করে দিই, তবে তা উত্তম হবে। এরপর তিনি উবাই ইবন কাব (রাঃ)-এর পিছনে সকলকে একত্রিত করে দিলেন। পরে আর এক রাতে আমি তাঁর [উমর (রাঃ)] সঙ্গে বের হই। তখন লোকেরা তাদের ইমামের সাথে সালাত আদায় করছিল। উমর (রাঃ) বললেন, কত না সুন্দর এই নতুন ব্যবস্থা! তোমরা রাতের যে অংশে ঘুমিয়ে থাক তা রাতের ঐ অংশ অপেক্ষা উত্তম যে অংশে তোমরা সালাত আদায় কর, এর দ্বারা তিনি শেষ রাত বুসিয়েছেন, কেননা তখন রাতের প্রথমভাগে লোকেরা সালাত আদায় করত^{১২১}।

১২১ রাতের স্বলাত (তারাযীহ) অধ্যায় :: সহীহ বুখারী :: খন্ড ৩ :: অধ্যায় ৩২ :: হাদীস ২২৭

সুতরাং, উপরোক্ত হাদীসটির মাধ্যমে বলা যায় যে, হযরত উমর (রাঃ) তারাবীহ্ সালাত জামাতবদ্ধ করার জন্য লোকদেরকে একত্রিত করেছেন তবে কখনই তিনি তারাবীহ্ এর রাকাত সংখ্যার কথা উল্লেখ করেন নাই। যদি তাই হয়ে থাকে তাহলে কথিত হানাফীরা কেন একজন জালাতী সাহাবীর বিরুদ্ধে মিথ্যাচার করছেন? তাই এসব মিথ্যাচার থেকে দূরে থাকা অবশ্যই উচিত।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ - দ্বীনের ভিতর বিদ'আতে হাসানাহ বলে কিছু আছে কি?

উপরোক্ত আলোচনা থেকে নিশ্চয়ই পরিষ্কার হয়েছে যে দ্বীনের ভিতর সকল বিদ'আতই হারাম। যারা বিদ'আতকে হাসানাহ ও সাইয়েয়াহ বলে বিভক্ত করে, তারা ভুল করে থাকেন এবং রাসূল (সাঃ) - এর বানী **فَانْ كُلُّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ** নিশ্চয়ই প্রত্যেক বিদ'আত গোমরাহ্ এর বিরোধিতাকারী। কেননা, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বিদ'আত প্রসঙ্গে রায় দিতে গিয়ে বলেছেন প্রত্যেক বিদ'আতই গোমরাহী আর তথাকথিত মাযহাবপন্থীরা বলছে, না প্রত্যেক বিদ'আত গোমরাহী নয় বরং কিছু বিদ'আত আছে হাসানাহ (ভাল)।

আল্লামা হফেয ইবনে রজব (রহঃ) বলেনঃ নবী আকরাম (সাঃ) - এর বাণী **كُلُّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ** (প্রত্যেক বিদ'আত গোমরাহী) একটি **جوامع الكلم** তথা ব্যাপক অর্থ বোধক বাক্য। কোন কিছুই তার বহির্ভূত নয়। সকল প্রকারই তার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। এটি দ্বীনের

একটি বিশেষ মূলনীতি। এটি রাসূলের নিম্নোক্ত বাণীর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ বক্তব্য। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বলেনঃ

من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد

যে ব্যক্তি আমাদের এ দ্বীনে নতুন কিছু উদ্ভাবন করবে যা তার অন্তর্ভুক্ত নয়, সেটি পরিত্যাজ্য হবে। আরও বিস্তারিতভাবে বলা যায় যে, বিদ'আতে হাসানাহ (ভাল বিদ'আত) বলে কোন বিদ'আত নেই বরং প্রত্যেক বিদ'আত ই সাইয়িয়াহ (মন্দ)। মহানবী (সাঃ) বলেছেন, প্রত্যেক বিদ'আত ই ভ্রষ্টতা। (আবু দাউদ, তিরমিযী)। আর হাদীসে যে ভাল রীতি চালু করার কথা বলা হয়েছে, তা নতুন কোন রীতি নয় বরং যে রীতি শরীয়ত সম্মত কিন্তু কোন জায়গায় তা চালু ছিল না। কোন ব্যক্তি তা চালু করলে তাঁর ঐ সওয়াব হয়। পূর্ণ হাদীসটি পড়লে আপনি নিজেই বুঝতে পারবেন, কোন শ্রেণীর রীতির কথা বলা হয়েছে। জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, একদা আমরা দিনের প্রথম ভাগে রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর নিকটে ছিলাম। অতঃপর তাঁর নিকট কিছু লোক এল, যাঁদের দেহ বিবস্ত্র ছিল, পশমের ডোরা কাটা চাদর (মাথা প্রবেশের মত জায়গা মাঝে কেটে) পরে ছিল অথবা আব্বা (আংরাখা) পরে ছিল, তরবারী তাঁরা নিজেদের গর্দানে ঝুলিয়ে রেখেছিল। তাঁদের অধিকাংশ মুযার গোত্রের (লোক) ছিল; বরং তাঁরা সকলেই মুযার গোত্রের ছিল। তাঁদের দারিদ্রতা দেখে রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর চেহারা পরিবর্তন হয়ে গেল। সুতরাং তিনি (বাড়ীর ভেতরে) প্রবেশ করলেন এবং পুনরায় বের হলেন। তারপর তিনি বেলালকে (আযান দেওয়ার) আদেশ

করলেন। ফলে তিনি আযান দিলেন এবং ইকামত দিলেন। অতঃপর তিনি নামায পরে লোকেদেরকে (সম্বোধন করে) ভাষণ দিলেন। তিনি বললেন, হে মানব সম্প্রদায়! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর, যিনি তোমাদের এক ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন ও তা হতে তাঁর সঙ্গিনী সৃষ্টি করেছেন, যিনি তাঁদের দুজন থেকে বহু নরনারী (পৃথিবীতে) বিস্তার করেছেন। সেই আল্লাহকে ভয় কর, যার নামে তোমরা একে অপরের নিকট যাচঞা কর এবং জ্ঞাতি-বন্ধন ছিন্ন করারকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন^{১২২}।

অতঃপর দ্বিতীয় আয়াত যেটি সূরা হাশর এর শেষে আছে সেটি পাঠ করলেন, যে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, আর প্রত্যেকেই ভেবে দেখুক যে, আগামীকালের (কিয়ামতের) জন্য সে অগ্রিম কি পাঠিয়েছে। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় তোমরা যা কর আল্লাহ সে সম্পর্কে অবহিত^{১২৩}।

অতএব, প্রত্যেক ব্যক্তি যেন নিজ দীনার (স্বর্ণমুদ্রা), দিরহাম (রৌপ্যমুদ্রা), কাপড়, এক সা গম ও এক সা খেজুর থেকে সাদকাহ করে। এমনকি তিনি বললেন, খেজুরের আধা টুকরা হলেও (তা যেন দান করে)। সুতরাং আনসারদের একটি লোক (চাঁদির) একটি থলে নিয়ে এল, লোকটির করতল যেন তা ধারণ করতে পারছিল না বরং তা ধারণ করতে অক্ষমই ছিল। অতঃপর (তা দেখে) লোকেরা

১২২ সূরা নিসা, আয়াত নং - ১

১২৩ সূরা হাশর ১৮ নং আয়াত

পরস্পর দান আনতে আরম্ভ করল। এমনকি খাদ্য সামগ্রী ও কাপড়ের দুটি স্তুপ দেখলাম।

পরিশেষে আমি দেখলাম যে, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর চেহারা যেন সোনার মতো ঝলমল করছে। অতঃপর রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, যে ব্যক্তি ইসলামে ভাল রীতি চালু করবে, সে তাঁর নিজের এবং ঐ সমস্ত লোকের সওয়াব পাবে, যারা তাঁর (মৃত্যুর) পর তাঁর উপর আমল করবে। তাঁদের সওয়াব কিছু পরিমাণও কম করা হবে না। আর যে ব্যক্তি ইসলামে কোন মন্দ রীতির প্রচলন করবে, তাঁর উপর তাঁর নিজের এবং ঐ লোকেদের গোনাহ বর্তাবে, যারা তাঁর (মৃত্যুর) পর তাঁর উপর আমল করবে। তাঁদের গোনাহর কিছু পরিমাণও কম করা হবে না। (সহীহ মুসলিম)।

লক্ষণীয় যে, দান করা একটি ভাল রীতি। কিন্তু অনেকের মধ্যে যে প্রথম শুরু করবে, তাঁর হবে উক্ত সওয়াব। কোন নতুন রীতি আবিষ্কার করা উদ্দেশ্য নয়। হাদীসের শব্দে ঐ রীতিকে সুন্নাহ বলা হয়েছে, যা বিদআতের বিপরীত। সুতরাং বিদআতে হাসনার দলীল তাতে নেই। বলা বাহুল্য, উক্ত হাদীসে নতুন রীতি চালু করার পর্যায়ভুক্ত তিন প্রকার কাজঃ-

(ক) শরীয়ত সম্মত ভাল কাজ। কিন্তু অনেকের মধ্যে সর্বপ্রথম করা।

(খ) কোন সুন্নত কাজ যা উঠে গিয়েছিল বা লোকমাঝে প্রচলিত করা অথবা জানিয়ে তাঁর প্রচলন করা।

(গ) কোন এমন কাজ করা যা কোন শরীয়ত সম্মত ভাল কাজের মাধ্যম। যেমন দ্বীনী মাদ্রাসা নির্মাণ করা, দ্বীনী বই-পত্র ছাপা ইত্যাদি। (ইবনে উসাইমীন)। সুতরাং যে কেউ নতুন কিছু উদ্ভাবন ও প্রবর্তন করবে এবং তাকে দ্বীনের দিকে নিসবত (সম্বন্ধযুক্ত) করবে অথচ দ্বীনে তার কোন মূল ভিত্তি নেই যার দিকে সে ফিরতে পারে, সেটিই গোমরাহী ও ভ্রষ্টতা। দ্বীন এ সকল বস্তু থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। এ ক্ষেত্রে সকল বিষয় যথা আকায়েদ, আমল জাহেরী ও বাতেনী আকওয়াল সব সমান। রাসুল (সাঃ) অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় সকল বিদ'আতকে ভ্রষ্ট বা দালালাত হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। তাই কিছু কিছু বিদ'আতকে হাসানাহ বলার কোন সুযোগ নেই। কেননা রাসুল (সাঃ) বলেছেনঃ

فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمدٍ وشرُّ الأمور محدثاتها
وكلُّ محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.

নিশ্চয় সর্বোত্তম কথা হলো আল্লাহ্ কিতাব আর সর্বোত্তম হিদায়াত হলো মুহাম্মদ এর হিদায়াত। সর্বনিকৃষ্ট বিষয় হলো মনগড়া নব প্রবর্তিত বিষয়। আর প্রত্যেক নব প্রবর্তিত বিষয়ই বিদ'আত এবং প্রত্যেক বিদ'আত ই গুমরাহী। তাই বিদ'আত কে দু ভাগে ভাগ করলে রাসুল (সাঃ) এর এ ঘোষণাকে অগ্রাহ্য করা হয়। এ প্রসঙ্গে শাইখ ইবনে ফাউযান বলেনঃ

من قسم البدعة الى بدعة حسنة وبدعة سيئة فهو غلط مخطئ ومخالف لقوله
عليه الصلاة والسلام فان كل بدعة ضلالة لان الرسول ص حكم على البدع
كلها بانها ضلالة

“যে ব্যক্তি বিদ'আত কে হাসানাহ ও সাইয়্যোআহ বলে বিভক্ত করল সে ভুল করল এবং সকল বিদ'আত ই ভ্রষ্টতা” মর্মে রাসূল (সাঃ) এর বাণীর বিরোধীতা করল। কেননা রাসূল (সাঃ) সকল বিদ'আত কে গুমরাহী বলে আখ্যায়িত করেছেন। সর্বোপরি একথা বলা যায় যে, বিদ'আতকে এভাবে ভাগ করে এর কিছু অংশকে হাসানাহ বলা গুমরাহী বৈ কিছু নয়।

এরূপ বিভক্তকারীদের যুক্তি প্রমাণ ও তার খণ্ডনঃ

সাহাবী ওমর (রাঃ) একবার সালাতে তারাবীহ সম্পর্কে বলেছিলেন: **نعمت البدعة هذه** (কত না সুন্দর বিদ'আত এটি) বিদ'আতকে হাসানাহ ও সাইয়্যোআহ দ্বারা বিভক্তকারীদের নিকট ওমরের এ উক্তিটি ব্যতীত তাদের মতের স্বপক্ষে আর কোন দলিল নেই। তারা আরো বলে যে, এরূপ আরো অনেক নতুন নতুন বিষয়ের প্রবর্তন হয়েছিল কিন্তু সালাফের কেউ সে গুলোকে ঘৃণা ও প্রত্যাখ্যান করেননি, যেমন কোরআনুল কারীমকে এক মাসহাফে একত্রিত করা, (যা রাসূলের যুগে ছিল না) হাদীস লেখা ও সংকলন করা এটিও রাসূল (সাঃ) নিজে করে যাননি। আপত্তি উত্থাপিত বিষয়গুলো বিদ'আত নয় বরং শরীয়তের এগুলোর একটি ভিত্তি আছে। আর ওমর (রাঃ) এর বক্তব্য **نعمت البدعة** তে শরঈ **بدعة** নয়। সুতরাং যে সকল বিষয়ের একটি শরঈ ভিত্তি থাকবে যার দিকে প্রত্যাবর্তন করা যায়, সে গুলো সম্পর্কে যখন **بدعة** বলে মন্তব্য করা হবে তখন শাব্দিক বিদ'আত বুঝতে হবে শরঈ নয়। আর সালাতে তারাবীহ তো রাসূলুল্লাহ (সাঃ) নিজেই সাহাবীদের নিয়ে পড়ে ছিলেন। শেষ

দিকে এসে ফরজ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা করে তিনি তাদের থেকে পিছিয়ে গেছেন। তবে সাহাবারা বিক্ষিপ্ত ভাবে রাসূলের জীবদ্দশায় এবং ওফাতের পর ধারাবাহিক ভাবে পড়েছেন। এক পর্যায়ে এসে ওমর (রাঃ) সকলকে এক ইমামের পিছনে একত্রিত করে দিয়েছেন যেমন তারা রাসূলের পিছনে পড়ে ছিলেন।

অতএব, ইজমায়ে সাহাবা কর্তৃক ওমর, ওসমান ও আলীর যামানা থেকে ২০ রাকআত তারাবীহ সাব্যস্ত বলে যে কথা বাজারে চালু রয়েছে, তার কোন শারঈ ভিত্তি নেই। একথাটি পরবর্তীকালে সৃষ্ট। হাদীসের বর্ণনাকারী ইমাম মালেক নিজে ১১ রাকআত তারাবীহ পড়তেন যা রাসূল (সাঃ) হতে প্রমাণিত^{১১৪}। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) রামায়ান মাসে বিতর সহ ১১ রাকআতের বেশী রাতের সালাত (তারাবীহ) আদায় করেননি^{১১৫}। ওমর (رضي الله عنه) উবাই বিন কাব ও তামীম দারী (رضي الله عنه) - কে রামায়ান মাসে লোকদের নিয়ে ১১ রাকআত (তারাবীহ) সালাত আদায়ের নির্দেশ দিয়েছিলেন^{১১৬}।

সুতরাং, উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযান ব্যতীত কোন নফলে সাহাবীদের একত্র করেন নি। তিনি যেহেতু ফরয হওয়ার আশঙ্কায় ত্যাগ করেছেন, তাই পরবর্তীতে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তা জীবিত করেন। তারাবীহ এর সালাত সুন্নাত হওয়ার ব্যাপারে ফকীহগণ একমত

১১৪ হাশিয়া মুওয়াত্তা পৃঃ ৭১; দ্র: তুহফাতুল আহওয়াযী শরহ তিরমিযী হা/৮০৩-এর ব্যাখ্যা ৩/৫২৬-৩২

১১৫ বুখারী ১/১৫৪ পৃঃ; মুসলিম ১/২৫৪ পৃঃ; আবুদাউদ ১/১৮৯ পৃঃ; নাসাঈ ১/১৯১ পৃঃ; তিরমিযী ১-৯৯ পৃঃ; ইবনু মাজাহ ১/৯৬-৯৭ পৃঃ; মুওয়াত্তা মালেক ১/৭৪ পৃঃ

১১৬ মুওয়াত্তা ১/৭১ পৃঃ; মিশকাত হা/১৩০২, হাদীছ সহীহ; ঐ বঙ্গানুবাদ হা/১২২৮ রামায়ান মাসে রাত্রি জাগরণ অনুচ্ছেদ

পোষণ করেছেন। আর এটি হানাফীগণ [আল কাসানী, বাদায়েউস-সানায়ে ফী তারতীবিশ শারায়ে (বৈরুত: দারুল মারিফাহ) (১/৬২৩)], হামলীগণ [মুয়াফফিক উদ্দিন ইবন কুদামাহ, আল মুগনী (কায়রো, দারুল হিজর, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৪১২ হি.) তাহকীক: আব্দুল্লাহ ইবন আবদুল মুহসিন তুর্কী ও আবদুল ফাত্তাহ মুহাম্মদ আল হালু (২/৬০১)], শাফেয়ীগণ [ড.ওহাবাতুল যুহাইলী, আল ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুল (মিশর: দারুল ফিকর, তৃতীয় সংস্করণ, ১৪০৯ হি.) (২/৬৪,৬৫)], কতিপয় মালেকীর [আবুল ওলীদ মুহম্মদ ইবন আহমদ ইবন মুহম্মদ ইবন আহমদ ইবন রুশদ আল কুরতুবী, আল-আন্দালুসী আশ-শাহীর ইবন আল-হাফীদ, বিদায়াতুল মুজতাহেদ ওয়া নেহায়েতুল মুকতাসিদ (মিশর, দারুস-সালাম, প্রথম সংস্করণ ১৪১৬ হি.) তাহকীক: ড. আব্দুল্লাহ আল-আবাদী (১/৪৭৩)] নিকট সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ। তবে তারাবীহ্ সালাত নারী - পুরুষ নির্বিশেষে সকলের জন্য সুন্নাত। আর এটা প্রকাশ্য দ্বীনের নিদর্শন। যেহেতু এটি সুন্নাত তাই এসব বিষয় নিয়ে আমরা বাড়াবাড়ি না করি সেটাই উত্তম। আল্লাহ (سبحانه وتعالى) আমাদের সকলকে সহীহ হাদীসের উপর আমল করার এবং জাল ও যঈফ হাদীস বর্জন করার তাওফীক দিন। আমীন।

শরীয়তের দৃষ্টিতে বিদ'আত নিন্দনীয় (অপছন্দনীয়) একটি বিষয় এবং তা শরীয়তের বিধান মতে হারামের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং বিদ'আতকে হাসান (পছন্দনীয়) ও কাবিহ (অপছন্দনীয়) এ দু'ভাগে ভাগ করা সঠিক নয়। কিন্তু আহলে সুন্নাতের আলেমদের মতে

বিদ'আত হাসানও কাবিহ এ দুভাগে বিভক্ত^{১২৭}। বিদ'আত কে বৈধ ও অবৈধ অর্থাৎ পছন্দনীয় ও অপছন্দনীয় এরূপ বিভাজনের কোন বৈধতা নেই। কারণ বিদ'আত হলো এমন বিষয় যার কোন শরীয়তগত ভিত্তি নেই অর্থাৎ এমন কোন বিধান সৃষ্টি করা যার উৎস কোরআন ও সুন্নাতে খুঁজে পাওয়া যায় না, তা-ই বিদ'আত। তাই এরূপ বিধান নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট অপছন্দনীয় ও হারাম বলে গণ্য। কোন বিষয় বা কর্মে মোবাহের কর্মগত বিধান (যে ক্ষেত্রে শরীয়ত কোন বিষয়কে সুস্পষ্টভাবে হারাম ঘোষণা করে নি সেক্ষেত্রে ঐ বিষয়টি বৈধ হওয়ার সার্বিক নীতি)।

উসূল শাস্ত্রের পণ্ডিতগণ বলে থাকেন, কোন বিষয় বা কর্মের ক্ষেত্রে মূলনীতি হলো বৈধতার নীতি অর্থাৎ যদি কোন বিষয়ে সুস্পষ্টভাবে নিষেধাজ্ঞা না থাকে তবে সেক্ষেত্রে বৈধতার অথবা স্বাধীনতার সর্বজনীন নীতি কার্যকর হবে যাকে উসূলশাস্ত্রের পরিভাষায় আসালাতুল হিল্লিয়াত (বৈধতার সর্বজনীন নীতি) অথবা আসালাতুল জাওয়ায বলা হয়। স্বাধীনতার সর্বজনীন নীতি (আসালাতুল বারায়াত) হতেও এ বিষয়টি প্রমাণিত হয়। এ নীতি মতে যে বিষয়ে শরীয়তের প্রবর্তক করণীয় ও বর্জনীয় বিষয়কে বর্ণনা করেন নি সে বিষয়টি শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ বলে গণ্য অর্থাৎ সেক্ষেত্রে শরীয়তের অনুসারীদের স্বাধীনতা রয়েছে। মহান আল্লাহ বলেছেনঃ

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا
مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِغَيْرِ اللَّهِ

“আপনি বলে দিন যা কিছু বিধান ওহীর মাধ্যমে আমার কাছে পৌঁছেছে, তন্মধ্যে আমি কোন হারাম খাদ্য পাই না কোন ভক্ষণকারীর জন্য যা সে ভক্ষণ করে; কিন্তু মৃত অথবা প্রবাহিত রক্ত অথবা শুকরের মাংস-এটা অপবিত্র ও অবৈধ-অথবা যবেহ করা জন্তু যা আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে উৎসর্গ করা হয় সে কারনে।”

ড. ইউসুফ কারদাভী বলেছেন, ইসলাম সর্বপ্রথম যে নীতি প্রবর্তন করেছে তা হলো সকল বস্তু ও কল্যাণকর বিষয়ের ক্ষেত্রে বৈধতার সর্বজনীন নীতি এবং যে বিষয়গুলো শরীয়তের প্রবর্তক সুস্পষ্টভাবে হারাম ঘোষণা করেন নি, তার ক্ষেত্রে বাধ্যবাধকতা হতে মুক্তির নীতি^{১২৮}। রাসূল (সাঃ) - এর আহলে বাইতের অনুসৃত নীতিও সুন্নাত বলে গণ্য এবং তা শরীয়তের নীতি নির্ধারক। এমন অনেক বিষয় রয়েছে যেগুলোকে ওয়াহাবীরা এজন্য বিদআত বলে থাকে যে, তারা রাসূলের আহলে বাইতের সুন্নাতকে শরীয়তের জন্য নীতি নির্ধারক ও সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত মনে করে না অথচ সহীহ হাদীসসমূহে তাদের অনুসৃত কর্ম ও নীতিও শরীয়তের নির্ধারক ও সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত ঘোষিত হয়েছে। এখানে আমরা এরূপ কয়েকটি দলিলে প্রতি ইশারা করছি।

১। আয়াতে তাত্বহীর

মহান আল্লাহ বলেছেনঃ

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا
 “নিশ্চয় আল্লাহ চান হে (নবীর) আহলে বাইত! তোমাদের হতে

সকল অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে পূর্ণরূপে পবিত্র করতে^{১২৯}।” সহীহ মুসলিম হযরত আয়েশা (রাঃ) সূত্রে বর্ণনা করেছে যে, একদিন সকালে মহানবী (সাঃ) গৃহ হতে বের হলেন এবং তখন তাঁর কাঁধে সেলাই বিহীন বিশেষ চাদর ছিল। (অতঃপর যখন তিনি বসলেন) তখন হাসান ইবনে আলী এসে ঐ চাদরের ভিতর প্রবেশ করল, তারপর হুসাইন তাতে প্রবেশ করল, তারপর ফাতেমা আসলে তাঁকেও চাদরে আবৃত করলেন, অতঃপর আলী আসলে তাঁকেও তাতে আবৃত করলেন। তাঁরা সকলে প্রবেশ করলে রাসূল এ আয়াতটি পাঠ করলেন,^{১৩০}

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

আয়াতটির লক্ষণীয় বিষয়সমূহঃ

প্রথমত আয়াতটিতে (إِنَّمَا) শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে যা দ্বারা বিধানকে নির্দিষ্ট বিষয়বস্তুর জন্য সীমিত করা হয় এবং এটি সীমিতকরণের একটি শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবে ব্যাকরণশাস্ত্রে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আয়াতটিতে আল্লাহর ইচ্ছা বিশেষ ব্যক্তিবর্গের (আহলে বাইতের) জন্য নির্দিষ্ট ঘোষিত হয়েছে। দ্বিতীয়ত আয়াতটিতে আল্লাহর ইচ্ছা অবশ্যম্ভাবী ইচ্ছার (ইরাদায়ে তাকভীনি) অন্তর্ভুক্ত যার কোন ব্যত্যয় হয় না -

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُنْ

কিছু করার ইচ্ছা করেন তখন বলেন : হও, অতঃপর তা হয়ে যায়। আয়াতটিতে (আয়াতে তাত্বহীরে) আল্লাহর অবশ্যম্ভাবী ইচ্ছার

(ইরাদায়ে তাকভীনী) প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, কেননা তা শরীয়তের বিধানগত ইচ্ছার (ইরাদায়ে তাশরীযী) অন্তর্ভুক্ত হলে যাতে বান্দার স্বাধীনতা রয়েছে সকল বান্দাই তার অন্তর্ভুক্ত হতো ও এরূপ পবিত্রতার আকাজ্জা সবার জন্য প্রযোজ্য হতো। সেক্ষেত্রে আলাদাভাবে আহলে বাইতকে উল্লেখ মূল্যহীন হয়ে পড়ত। অর্থাৎ এ আয়াতে বিশেষ ব্যক্তিদের জন্য আল্লাহর বিশেষ অলঙ্ঘনীয় ইচ্ছার প্রতিফলনের কথা বলা হয়েছে।

তৃতীয়ত আয়াতটিতে যে رَجَس বা অপবিত্রতার কথা বলা হয়েছে তার অর্থ এমন অপবিত্রতা যা বস্তুর প্রতি অন্যদের ঘৃণার উদ্রেক করে। তাই কোরআন رَجَس শব্দটি বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ অর্থাৎ বস্তুগত ও আধ্যাত্মিক উভয় অপবিত্রতার ক্ষেত্রেই ব্যবহার করেছে। যেমনঃ

أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رَجَسٌ

অথবা শুকরের মাংস, নিশ্চয়ই তা অপবিত্র এবং

وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَا ثَوْوَا وَهُمْ كَاْفِرُونَ
এবং যাদের অন্তরে ব্যাধি (সন্দেহ ও কপটতার) রয়েছে তা তাদের অপবিত্রতার উপর অপবিত্রতা বৃদ্ধি করতে থাকে এবং তারা কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে। (সূরা তওবা: ১২৫)। এর বিপরীতে পবিত্রতাও বস্তুগত ও আধ্যাত্মিক উভয় বিষয়ে হতে পারে। আল্লামা তাবাতাবায়ী বলেছেন: রিজস বা অপবিত্রতা হলো এমন আত্মিক অনুভূতি ও প্রভাব যা বিভ্রান্ত ও বিচ্যুত বিশ্বাস এবং নিকৃষ্ট কর্ম হতে উদ্ভূত।

আলোচ্য আয়াতে رجس শব্দটির পূর্বে لا এসেছে যা আলিফ ওয়া লামে জিন্সনামে অভিহিত তা সকল প্রকৃতির অপবিত্রতাকে শামিল করে। তাই আয়াতে আত্মিক অপবিত্রতা অর্থাৎ বিশ্বাসের ক্ষেত্রে বা কর্মের ক্ষেত্রে ভুলের কারণ হতে পারে এমন সকল অপবিত্রতা হতেও মুক্তি ও পবিত্রতার ঘোষণা দেয়া হয়েছে। এবং এরূপ পবিত্রতা কেবল ঐশী নিষ্পাপত্বের (স্রষ্টা প্রদত্ত পবিত্রতার) ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য অর্থাৎ ব্যক্তির মধ্যে এমন আত্মিক অবস্থার সৃষ্টি করা হয়েছে যা তাকে দ্রাস্ত বিশ্বাস ও অসৎ কর্ম হতে নিবৃত রাখে^{১০০}।

যে বিশিষ্ট ব্যক্তি আল্লাহর অলঙ্ঘনীয় ইচ্ছার অধীনে সকল প্রকার ত্রুটি ও পাপ-পঙ্কিলতা হতে মুক্ত ঘোষিত হয়েছেন, নিঃসন্দেহে তাঁরা নিষ্পাপ ও পবিত্র এবং যে কোন পবিত্র ও নিষ্পাপ ব্যক্তির কর্ম ও নীতি আল্লাহর ইচ্ছার অধীনে হওয়ায় সুন্নাত ও সকলের জন্য প্রামাণ্য দলিল হিসেবে গণ্য। তাই আল্লাহর নবীর আহলে বাইতের সদস্যদের অনুসৃত নীতিও সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত ও প্রামাণ্য দলিল বলে গণ্য।

২। হাদীসে সাকালাইন

তিরমিযী তাঁর সহীহ গ্রন্থে হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ আনসারী হতে বর্ণনা করেছেন যে, মহানবী (সাঃ) - কে বিদায় হজ্জের সময় উটের পিঠে বসে বক্তব্য দিতে দেখলাম ও তাঁকে বলতে শুনলামঃ হে লোকসকল! আমি তোমাদের মাঝে দুটি মূল্যবান ও ভারী বস্তু রেখে যাচ্ছি। যদি তোমরা তা আঁকড়ে ধর, তাহলে কখনোই বিভ্রান্ত

হবে নাঃ আল্লাহর কিতাব ও আমার রক্ত সম্পর্কীয় আহলে বাইত^{১৩১}।
হাদীসটি হতে বিভিন্নভাবে মহানবীর আহলে বাইতের নিষ্পাপত্ব
প্রমাণ করা যায়।

হাদীসটিতে কুরআন ও আহলে বাইতকে একত্রে উল্লেখ করে
উভয়কে আঁকড়ে ধরতে বলা হয়েছে। তাই কোরআন সেরূপ সকল
প্রকার ভুল-ত্রুটির উর্ধ্বে, আহলে বাইতও সেরূপ সকল ভুল-ত্রুটির
উর্ধ্বে।

১৩১ সহীহ তিরমিযী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৬২১

অধ্যায় - তিন - বিদ'আত প্রচলন, প্রকাশ, ধরন ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক আলোচনা
প্রথম পরিচ্ছেদ - বিদ'আতের ধরন
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ - বিদ'আত প্রচলন, বিদ'আত প্রকাশের অঞ্চল সমূহ, বিদ'আত অগ্রহণযোগ্য হওয়ার কারণ এবং বিদ'আত উৎপত্তির কতিপয় কারণ
বিদ'আতের প্রচলন
বিদ'আত প্রকাশের অঞ্চল সমূহ
বিদ'আত অগ্রহণযোগ্য হওয়ার কারণ
বিদ'আত উৎপত্তির কতিপয় কারণ
তৃতীয় পরিচ্ছেদ - বিদ'আতের অপকারিতা
চতুর্থ পরিচ্ছেদ - দ্বীনের মধ্যে বিদ'আতের বিধান
পঞ্চম পরিচ্ছেদ - আমল কবুল হওয়ার শর্ত
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ -- সুন্নাহ আঁকড়ে ধরা এবং বিদ'আত থেকে সতর্ক থাকা ওয়াজিব
অধ্যায় - চার - বিদ'আতের ব্যাপারে মুসলিম মিল্লাতের অবস্থান ও আলেমগণের প্রতিবাদ পদ্ধতি
প্রথম পরিচ্ছেদ - বিদ'আতীদের ব্যাপারে মুসলিম মিল্লাতের আলেমদের অবস্থান
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ - বিদ'আতীদের প্রতিবাদে আলেমগণের পদ্ধতি
তৃতীয় পরিচ্ছেদ - যে ব্যক্তি কোন খতীবকে বিভ্রান্তির দিকে অথবা বিদ'আতের দিকে আহ্বান করতে শুনে তখন তার করণীয় কি

অধ্যায় - তিন - বিদ'আত প্রচলন, প্রকাশ, ধরন ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক আলোচনা

প্রথম পরিচ্ছেদ - বিদ'আতের ধরন

পরিচয়গত দিক থেকে বিদ'আতী কাজগুলো প্রধানত তিন ধরনের।

যথাঃ

১. البدعة الحقیقیة বা মৌলিক বিদ'আতঃ এটা এমন বিদ'আত কোরআন সুন্নাহ যার কোন অস্তিত্ব নেই। যেমন:- মৃত ব্যক্তির কাছে কিছু চাওয়া, মৃত ব্যক্তির নামে চল্লিশা করা ইত্যাদি।

২. البدعة الاضافية বা সংযুক্ত বিদ'আতঃ এমন বিদ'আত কোরআন হাদীসে আর ভিত্তি রয়েছে। কিন্তু এগুলো আদায়ের ক্ষেত্রে পস্থা পদ্ধতি, ধরণ পরিমাণ ও সময়কাল ইত্যাদির দিক থেকে শরীয়াত বিবর্জিত। যেমন: ফরজ নামাজের পরে উচ্চস্বরে সামষ্টিক যিকির ও মুনাযাত। কিন্তু মূলত এসব দোআ ও যিকির বিদ'আত নয় তবে উচ্চস্বরে সামষ্টিকভাবে পড়া বিদ'আত।

৩. البدعة التركیة বর্জিত বিদ'আতঃ এটা এমন বিদ'আত যা কুরআন এবং সুন্নাহ বর্ণিত বিধানকে বর্জন করা হয়। যেমনঃ নামাজের গুরুত্ব সময় আরবীতে নিয়্যাত করা।

শরীয়াতের মানদণ্ডে বিদ'আতঃ আল্লাহ্ অনুমোদনহীন মানবীয় প্রবৃত্তি অনুসরণের মাধ্যমে কাল্পনিক কোন প্রথা প্রবর্তন করে তার প্রতি ইবাদাতের মাহাত্ম আরোপকে বিদ'আত নামে আখ্যায়িত করা হয়। আর এটি শিরকতুল্য অপরাধ। এ কারনেই মহানবী (সাঃ) স্বীয়

উম্মতকে বিদ'আতের ব্যাপারে অত্যন্ত জোরালোভাবে সতর্ক করেছেন। তিনি বলেনঃ

اياكم ومحدثات الامور فان كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة
তোমরা নিজেদেরকে দ্বীনের নতুন আবিষ্কৃত বিষয়াদি থেকে দূরে
সরিয়ে রাখবে। কেননা দ্বীনে প্রত্যেক নব উদ্ভাবিত জিনিসই
বিদ'আত এবং সব বিদ'আত ই গোমরাহীর মূল। (সুনানে আহমদ)।
এ হাদীসের শব্দ محدثات الامور এর ব্যাখ্যায় আল্লামা আহমদুল বান্না
তার ফতহে রাব্বানী তে লিখেছেনঃ

وهي ما لم يكن معروفا في كتاب ولا سنة ولا اجماع وهي البدعة
محدثات الامور

বলতে এমন জিনিস ও বিষয়াদিকে বুঝায় যা কুরআন সুন্নাহ এবং
ইজমা কোন দিক দিয়েই শরীয়তে বিধিবদ্ধ নয়। রাসূল (সাঃ)
বলেছেনঃ

من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. (مسلم) #

من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. (بخاري) #

যে ব্যক্তি আমাদের দ্বীনের মধ্যে নতুন কিছু উদ্ভাবন করবে তা
প্রত্যাখান হবে।

اتبعوا ولا تبتدعوا #

তোমরা রাসূলের আদর্শ অনুসরণ কর কোন ক্রমেই বিদ'আত কর
নাচসর্বোপরি একথা বলা যায় যে, বিদ'আত একটি মারাত্মক পাপ।
তাই তা থেকে বেঁচে থাকা একান্ত প্রয়োজন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ - বিদ'আত প্রচলন, বিদ'আত প্রকাশের অঞ্চল সমূহ, বিদ'আত অগ্রহণযোগ্য হওয়ার কারন এবং বিদ'আত উৎপত্তির কতিপয় কারণ

(ক) বিদ'আতের প্রচলন

অতীতে মক্কায় মূর্তিপূজা সত্ত্বেও মক্কাবাসীরা ধারণা করত যে, তারা দ্বীনে ইবরাহীমের উপর দৃঢ়ভাবে কায়েম আছে। কেননা আমরা বিন লুহাই তাদের বুঝিয়েছিল যে, এগুলি ইবরাহীমী দ্বীনের বিকৃতি নয়, বরং বিদআতে হাসানাহ।

অর্থাৎ ভালো কিছু সংযোজন মাত্র। এজন্য সে বেশ কিছু ধর্মীয় রীতি-পদ্ধতি আবিষ্কার ও চালু করেছিল। যেমন-

(১) তারা মূর্তির পাশে বসে তাকে উচ্চকণ্ঠে আহ্বান করত ও তাদের অভাব মোচনের জন্য অনুনয় বিনয় করে প্রার্থনা জানাতো। তারা ধারণা করত যে, এই মূর্তি তাদের আল্লাহর নৈকট্যশীল করবে (যুমার ৩৯/৩) এবং তাদের জন্য আল্লাহর নিকট সুফারিশ করবে (ইউনুস ১০/১৮)।

(২) তারা মূর্তির উদ্দেশ্যে হজ্জ করত, তাওয়াফ করত, তার সামনে প্রণত হত ও সিজদা করত।

(৩) তারা মূর্তির জন্য নযর-নেয়ায নিয়ে আসত। সেখানে মূর্তির নামে কুরবানী করত (মায়দাহ ৫/৬)।

(৪) তারা মূর্তিকে খুশি করার জন্য গবাদি পশু ও তাদের জন্য চরণক্ষেত্র মানত করত। যাদের কেউ ব্যবহার করতে পারত না (আনআম ৬/১৩৮-১৪০)।

(৫) তারা তাদের বিভিন্ন কাজের ভালো-মন্দ ফলাফল ও ভাগ্য নির্ণয়ের জন্য বিভিন্ন প্রকার তীর ব্যবহার করত। যাতে হ্যা, না, ভালো, মন্দ ইত্যাদি লেখা থাকত। হোবল দেবতার খাদেম সেগুলো একটি পাত্রের মধ্যে ফেলে অতঃপর তাতে ঝাকুনি দিয়ে তীরগুলি ঘুরিয়ে ফেলত। অতঃপর যে তীরটা বেরিয়ে আসত, সেটাকেই তারা ভাগ্য মনে করত।

(৬) এতদ্ব্যতীত তারা জোতিষীদের কথার উপর বিশ্বাস স্থাপন করত এবং বিশেষ বিশেষ নক্ষত্রকে মঙ্গল-অমঙ্গলের কারণ মনে করত।

(৭) তারা পাখি উড়িয়ে দিয়ে কাজের শুভাশুভ ও ভাল-মন্দ নির্ধারণ করত।

দ্বীনে ইবরাহীমে উক্ত শিরক ও বিদ'আত সমূহ চালু করার পরেও তাদের অহংকার ছিল এই যে,

(১) আমরা ইবরাহীম (আঃ) -এর দ্বীনে হানীফের খাটি অনুসারী। তারা কা'বা গৃহের সংরক্ষক ও তত্ত্বাবধায়ক।

অতএব তাদের সমকক্ষ আরব ভূখণ্ডে কেউ নেই। তাদের এই বড়ত্ব ও আভিজাত্যের অহংকার এতদূর পৌছে গিয়েছিল যে, তারা যেহেতু হুমস অর্থাৎ সবচাইতে বড় বীর ও বড় ধার্মিক অতএব তাদের পক্ষে হারাম - এর সীমানার বাইরে কোন হালাল এলাকায় যাওয়াটা মর্যাদাকর নয়। তারা যেহেতু ক্বাতীন বা “আহলুল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহর

ঘরের বাসিন্দা সে কারণে হজ্জের মৌসুমে মুযদালিফায় অবস্থান করত, যা ছিল হারাম এলাকার অভ্যন্তরে। হারামের বাইরে হওয়ার কারণে তারা আরাফাতের ময়দানে যেত না বা সেখান থেকে মক্কায় ফিরে আসা অর্থাৎ “তাওয়াফে আফাযাহ” করত না। যা ছিল হজ্জের সবচেয়ে বড় রুকন। তারা মুযদালিফায় অবস্থান করত এবং সেখান থেকে মক্কায় ফিরে আসত। সেজন্য আল্লাহ নির্দেশ দেন, অতঃপর তোমরা ঐ স্থান থেকে ফিরে এসো তাওয়াফের জন্য, যেখান থেকে লোকেরা ফিরে আসে (অর্থাৎ আরাফাত থেকে)। (সূরা বাক্বারাহ ২/১৯৯)।

(২) এতদ্ব্যতীত তারা নিজেরা ধর্মীয় বিধান রচনা করেছিল যে, বহিরাগত হাজীগণ মক্কায় এসে প্রথম তাওয়াফের সময় তাদের পরিবেশিত ধর্মীয় কাপড় পরিধান করবে। সম্ভবতঃ এটা তাদের অর্থনৈতিক স্বার্থদুষ্ট বিদআত ছিল। যদি কেউ (আর্থিক কারণে বা অন্য কারণে) তা সংগ্রহে ব্যর্থ হয়, তবে পুরুষরা সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে এবং মেয়েরা সব কাপড় খুলে রেখে কেবল ছোট্ট একটা কাপড় পরে তাওয়াফ করবে। এতে তাদের দেহ এক প্রকার নগ্নই থাকত। এ প্রেক্ষিতে আল্লাহ আয়াত নাযিল করেন, “হে বনু আদম! প্রতিবার মসজিদে উপস্থিত হবার সময় তোমাদের পোষাক পরিধান কর” (সূরা আরাফ ৭/৩১)।

তাদের কাছ থেকে হুমস কাপড় কিনতে বাধ্য করার জন্য তারা এ বিধানও করেছিল যে, যদি বহিরাগত কেউ উত্তম পোষাকে এসে

ত্বাওয়াফ করে, তাহলে ত্বাওয়াফ শেষে তাদের ঐ পোষাক খুলে রেখে যেতে হবে। যার দ্বারা কেউ উপকৃত হত না।

(৩) তাদের বানানো আরেকটা বিদআতী রীতি ছিল এই যে, তারা এহরাম পরিহিত অবস্থায় স্ব স্ব বাড়ীর সম্মুখ দিক দিয়ে প্রবেশ করবে। কিন্তু বাকী আরবরা সকলে স্ব স্ব বাড়ির পিছন দিকের সরু পথ দিয়ে গৃহে প্রবেশ করবে। সম্মুখ দরজা দিয়ে নয়। এভাবে তারা তাদের ধার্মিকতার ক্ষেত্রে বৈষম্যগত শ্রেষ্ঠত্বের গৌরব সারা আরবের ঘরে ঘরে ছড়িয়ে দিয়েছিল। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, আর পিছনের দিক দিয়ে ঘরে প্রবেশ করার মধ্যে কোন মঙ্গল নেই। বরং মঙ্গল রয়েছে আল্লাহকে ভয় করার মধ্যে। তোমরা ঘরে প্রবেশ কর সম্মুখ দরজা দিয়ে (সূরা বাক্বারা ২/১৮৯)।

উপরোক্ত আলোচনায় তৎকালীন আরবের ও বিশেষ করে মক্কাবাসীদের মধ্যে প্রচলিত শিরক ও বিদ'আত সমূহের একটা চিত্র পাওয়া গেল যা তারা ইবরাহীম (আঃ) - এর একত্ববাদী দ্বীনে হানীফের মধ্যে ধর্মের নামে বিদ'আত চালু করেছিল^{৩২}।

(খ) বিদ'আত প্রকাশের অঞ্চল সমূহ

বিদ'আত প্রকাশের দিক দিয়ে ইসলামী অঞ্চলগুলো কয়েক ভাগে বিভক্ত। শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া (রঃ) বলেন, রাসূল (সাঃ) এর সাহাবাগণ মোট পাঁচটি শহরে বসবাস করতেন। এ সমস্ত দেশ থেকে ঈমানের আলো বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়েছে। শহর পাঁচটি হলঃ মক্কা, মদীনা, বসরা, কুফা ও শাম। এ সমস্ত দেশ থেকে

১৩২ নবীদের কাহিনী, মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

কুরআন, হাদীছ, ফিক্হ ও ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা বিস্তার লাভ করেছিল। পরবর্তীতে মদীনা মুনাওয়ারা ব্যতীত বাকী ৪টি স্থান থেকেই বড় বড় বিদ'আত গুলির প্রকাশ ঘটেছে। কুফা নগরী থেকে বের হয়েছে শিয়া ও মুর্জিয়াদের বিদআতী কথা ও মতবাদ গুলো। অতঃপর তা অন্যান্য অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। বসরা শহর থেকে কাদরীয়া, মুতাজেলাদের বিদ'আত সহ বিভিন্ন ধরনের ভ্রান্ত ইবাদতের আবির্ভাব হয়ে অন্যান্য দেশে বিস্তার লাভ করে। সিরিয়া থেকে বের হয় আহলে বাইত তথা নবী পরিবারের প্রতি ঘৃণা ও তাঁদের সম্মানে কালীমা লেপন কারীদের বিদআতী কথা-বার্তা। জাহ্মীয়াদের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে খোরাসানের সীমান্তবর্তী কোন এক অঞ্চলে। আর এটি হল সর্বনিকৃষ্ট বিদ'আত। যে দেশ রাসূল (সাঃ) এর মদীনা থেকে যত দূরে অবস্থিত, সেখানকার বিদ'আত ও তত ভয়াবহ ও জঘন্য।

উসমান (রাঃ) এর শাহাদাত বরণের পরপরই বের হয়েছে খারেজী সমপ্রদায় ও তাদের বিদআতী মতবাদগুলো। তবে রাসূল (সাঃ) এর শহর মদীনা এ সমস্ত বিদ'আত থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিল। যদিও কোন কোন লোক মদীনাতে অবস্থান করেও গোপনে কিছু কিছু বিদআতী আকীদা পোষণ করত। কিন্তু তারা অপমানিত অবস্থায় মদীনা বাসীদের সাথে বসবাস করত।

মদীনাতে তাদের সামাজিক কোন প্রভাব ও মূল্য ছিলনা। একদল ক্বাদরীয়া মতবাদের লোক মদীনাতে লাঞ্চিত অবস্থায় বসবাস করত। অপর দিকে কুফায় শীয়া ও মুর্জিয়া, বসরায় মুতাজেলা ও বিদআতী

নিয়মে ইবাদতকারীদের দল এবং সিরিয়ায় নাসীবীয়া সমপ্রদায়ের লোকেরা প্রকাশ্যে বিদআতের চর্চা করতে থাকে।

সহীহ বুখারীতে রাসূল (সাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, আখেরী যামানায় দাজ্জালের ফিতনা মদীনাতে প্রবেশ করতে পারবে না। ইমাম মালেক (রঃ) এর সময়কাল পর্যন্ত মদীনাতে ইলম ও ঈমানের শিক্ষা বর্তমান ছিল। সম্মানিত তিন যুগে মদীনাতে বিদআতের নাম-নিশানা ছিলনা। দ্বীনের মৌলিক বিশ্বাসে আঘাতকারী কোন বিদ'আত ও বের হয়নি। যেমনটি বের হয়েছে অন্যান্য শহর থেকে।

(গ) বিদ'আত অগ্রহণযোগ্য হওয়ার কারন

বিদ'আত অগ্রহণযোগ্য হওয়ার যে সকল কারন সমূহ রয়েছে তা নিম্নে উপস্থাপন করে আলোচনা করা হলোঃ-

- (১) এ কথা সত্য যে, মানুষের জ্ঞান ওহীর জ্ঞান ব্যতীত অসম্পূর্ণ। নিশ্চয়ই বিদ'আত ওহীর পরিপন্থী।
- (২) শরীয়ত পূর্ণাঙ্গ রূপে এসেছে, তাতে কম-বেশি করার কোন অবকাশ নেই।
- (৩) বিদ'আতপন্থী শরীয়তের বিরুদ্ধাচারণকারী
- (৪) বিদ'আতপন্থী প্রবৃত্তির অনুসারী। কেননা জ্ঞান-বুদ্ধি যদি শরীয়ত সম্মত না হয় তাহলে তা প্রবৃত্তির অনুসরনেই হয়।
- (৫) বিদ'আতপন্থী নিজেকে শরীয়ত প্রবর্তকের (আল্লাহ তা'আলার) স্থলাভিষিক্ত বানিয়ে নেয়। কেননা শরীয়ত প্রবর্তক তা প্রবর্তন করে

সে অনুযায়ী আমল করা অত্যাবশ্যক করেছেন আর বিদ'আত প্রবর্তক শরীয়তে নতুন কিছু প্রবর্তন করে তাই করতে চাচ্ছে^{১৩৩}।

(গ) বিদ'আত উৎপত্তির কতিপয় কারণ

বিদ'আত ও গোমরাহীতে পতিত হওয়া থেকে বেঁচে থাকার একমাত্র উপায় হচ্ছে পবিত্র কুরআন ও সহীহ সুন্নাহকে সুদৃঢ়ভাবে ধারণ করা। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ.
(سورة الأنعام):

'এবং এ পথই আমার সরল পথ, সুতরাং তোমরা এরই অনুসরণ কর এবং ভিন্ন পথ অনুসরণ কর না। তাহলে সে সব পথ তোমাদেরকে তার পথ হতে বিচ্ছিন্ন করে দেবে।'

حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، قَالَ سَمِعْتُ
مُجَالِدًا، يَذْكُرُ عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ - صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَخَطَّ خَطًّا وَخَطَّ خَطَّيْنِ عَنْ يَمِينِهِ وَخَطَّ خَطَّيْنِ عَنْ يَسَارِهِ
ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ فِي الْخَطِّ الْأَوْسَطِ فَقَالَ " هَذَا سَبِيلُ اللَّهِ ". ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ {وَأَنَّ
هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ}

জাবির ইবনু আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম - এর নিকট উপস্থিত থাকা অবস্থায় তিনি একটি সরল রেখা টানলেন এবং তাঁর ডান দিকে দুটি সরল রেখা টানলেন এবং বাম দিকেও দুটি সরল রেখা টানলেন। অতঃপর তিনি

মধ্যবর্তী রেখার উপর তাঁর হাত রেখে বলেন: এটা আল্লাহর রাস্তা।
অতঃপর তিনি এ আয়াত তিলাওয়াত করেনঃ

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ
(অর্থাৎ- এই হচ্ছে আমার সরল-সঠিক পথ, সুতরাং তোমরা একে
অনুসরণ করো এবং তোমরা অন্যান্য পথ অনুসরণ করো না, নতুবা
তা তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিবে)^{১৩৪} তাখরীজ
কুতুবুত সিভাহ: আহমাদ ১৪৮৫৩ তাহকীক আলবানীঃ সহীহ।
তাখরীজ আলবানীঃ যিলুলুল জালাহ - ১৬^{১৩৫}।

সাহাবী আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)
বিষয়টি পরিষ্কার করেছেন এভাবে, আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ বলেনঃ

خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطاً، ثم قال: هذا سبيل الله ثم خط
على كل يزيد متفرقة-خطوطاً عن يمينه وعن شماله، ثم قال: وهذه سبيل
سبيل منها شيطان يدعو إليه.

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদের (দেখানোর) জন্য একটি রেখা টানলেন বা
দাগ দিলেন অতঃপর বললেন এটি আল্লাহর পথ। এর পর এ
রেখার ডানে বামে আরো অনেকগুলো দাগ দিলেন এর পর বললেনঃ
এগুলো হচ্ছে বিভিন্ন পথ। ইয়াযীদ নামক হাদীসের জনৈক
বর্ণনাকারী বললেন বিচ্ছিন্নকারী (অর্থাৎ এগুলো হচ্ছে বিচ্ছিন্নকারী
বিভিন্ন পথ) এরপর প্রত্যেকটি পথের উপর একটি করে শয়তান
বসে আছে, সে পথের দিকে আহ্বান করে। অতঃপর পড়েছেনঃ

১৩৪ সূরা আনআম ৬ : ১৫৪

১৩৫ সুনানে ইবনে মাজাহ, অধ্যায়ঃ ১/ রাসূল ((সাঃ))র সুন্নাহের অনুসরণ, হাদীস নম্বরঃ ১১

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ .
(১৫৩: (الأنعام)

এটিই আমার সরল পথ। তোমরা এর অনুসরণ কর। এবং ভিন্ন পথ অনুসরণ করো না। তাহলে সে সব পথ তোমাদেরকে তার পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে।^{১৩৬} অতএব যে ব্যক্তি কোরআন ও সুন্নাহ থেকে বিমুখ হবে, এড়িয়ে চলবে, বিভ্রান্তকারী রাস্তা এবং নব আবিষ্কৃত বিদ'আত সমূহ তাকে বিভ্রান্ত করে দেবে। মূলতঃ সমাজে বিদয়াত চালু হওয়ার মূলে চারটি কারণ লক্ষ্য করা যায়ঃ

একঃ ব্যক্তি তার নিজের থেকে বিদ'আত চালু করে সমাজে তা চালিয়ে দেয়। পরে তা সাধারণ ভাবে সমাজে প্রচলিত হয়ে পড়ে।

দুইঃ কোন আলেম বা পীর সাহেব নিজে জানা সত্ত্বেও শরীয়ত বিরোধী একটা কাজ করছেন: কিন্তু তা দেখে সমাজের জাহিল লোকেরা মনে করতে শুরু করে যে, এত বড় আলেম বা পীর সাহেব হয়ে যেহেতু এটা করেছেন, তাই এটা অবশ্যই শরীয়ত সম্মত। নতুবা কি তিনি এটা করতেন? এভাবে এক ব্যক্তির কারণে গোটা সমাজে বিদ'আত চালু হয়ে যায়।

তিনঃ জাহিল লোকেরা শরীয়ত বিরোধী কাজ করতে শুরু করে। কিন্তু সমাজের আলেম ও বড় বড় বুয়ুর্গ ব্যক্তিগন এ ব্যাপারে নিজের ইমানের দায়িত্ব আদায় না করে কোন রূপ প্রতিবাদ না করে মৌনতার পরিচয় দেন। হতে পারে এটা নিজের চাকরি, ব্যবসা, অথবা অন্যান্য দুনিয়াবী স্বার্থের কারণে। তখন সমাজের লোকেরা

মনে করে যেহেতু আলেমগন উক্ত কাজে বাধা দেননি তাই এটা বিদ'আত হবে না।

চারঃ শরীয়ত সম্মত কাজকে শরীয়াত বিরোধী মনে করে বাদ দেয়া। যেমন- কোন কাজ শরীয়ত সম্মত অথচ তা সর্বসাধারণের মাঝে আলেমরা সঠিক ভাবে প্রচার না করার কারণে লোকজনের মনে এ কথা বদ্ধমূল হয় যে, এটা শরীয়াত সম্মত নয়। শরীয়ত সম্মত হলে আলেম সাহেবগণ বাধা দিতেন। যেহেতু বাধা দেন নাই তাই এটা শরীয়তে না থাকাটাই স্বাভাবিক।

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, কুরআন-হাদীসে বিদ'আতের ভয়াবহতা দেখে সাধারণের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে, আমল বিনাশী ভয়াবহ বিদ'আত মুসলিম সমাজে কীভাবে চালু হলো? এ প্রশ্নে ইবনে উসাইমীন (রহঃ) বলেন, আমাদের সমাজে বিদ'আত বিভিন্নভাবে হতে পারে। এর মধ্যে কতিপয় কারন নিম্নে আলোচনা করা হলোঃ-

১. কারণগতভাবেঃ যখন মানুষ আল্লাহর এমন ইবাদত করে, যা এমন কারণের সাথে সংশ্লিষ্ট, যেটা শরীআতের অংশ নয়, তা বিদ্বআত এবং প্রত্যাখ্যাত হবে তার উদ্ভাবনকারীর দিকে। যেমন কিছু লোক রজব মাসের ২৭ তারিখে রাত্রি জাগরণ করে ইবাদত করে এ যুক্তিতে যে, এ রাত্রিতে রাসূল কে মিরাজে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। অতএব তাহাজ্জুদের সালাত একটা ইবাদত। কিন্তু যখন এ কারণের সাথে তা মিলে গেল তখন সেটা বিদ'আত সাব্যস্ত হল। কেননা সে এ ইবাদতের ভিত্তি নির্মাণ করে এক কারণের উপর যা

শরীআত দ্বারা সাব্যস্ত হয়নি। কারণের ক্ষেত্রে ইবাদত শরীআতের অনুকূলে হওয়ার জন্য এ বিবরণটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ। এর মাধ্যমে অনেক বিদ'আত প্রকাশ পাবে, যেগুলো সুন্নাত না হওয়ার সত্ত্বেও সমাজে সুন্নাত বলে গণ্য করা হয়।

২. ধরনগতভাবেঃ ধরনের ক্ষেত্রে ইবাদত শরীআতের অনুকূলে হওয়া আবশ্যিক। যদি মানুষ এমন পদ্ধতিতে আল্লাহর ইবাদত করে, যার ধরন শরীআত সমর্থিত নয়, তাহলে সেটা অগ্রহনযোগ্য। যেমন কোন ব্যক্তি যদি ঘোড়া দিয়ে কুরবানী করে তাহলে তার কুরবানী সিদ্ধ হবে না। কেননা সে ধরনের ক্ষেত্রে শরীআতের বিরোধীতা করছে।

৩. পরিমাণগতভাবেঃ মানুষ যদি ইচ্ছা করে যে তারা ফরয হিসাবে এক ওয়াক্ত সালাত বৃদ্ধি করবে, তাহলে আমরা বলব যে, এটা বিদ'আত, অগ্রহনযোগ্য। কারণ পরিমাণের ক্ষেত্রে এটা শরীআতের বিপরীত। আরো উত্তমভাবে বলা যায়, যদি কোন লোক যোহরের সালাত পাঁচ রাকআত করে তাহলে সকলের ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে তা সিদ্ধ হবে না।

৪. পদ্ধতিগতভাবেঃ যদি কোন লোক ওয়ু করা শুরু করে এবং প্রথমে দুই পা ধৌত করে, অতঃপর মাথা মাসাহ করে, এরপর দুহাত ধৌত করে, তারপর মুখমন্ডল ধৌত করে, তাহলে আমরা বলব, তার ওয়ু বাতিল। কেননা সে পদ্ধতির ক্ষেত্রে কোন শারঈ বিধানের বিপরীত করেছে।

৫. সময় ও কালগতভাবেঃ যদি কোন ব্যক্তি যিলহজ্জ মাসের প্রথম দিনে কুরবানী দেয় তাহলে সময়ের ক্ষেত্রে শারঈ বিধানের বিপরীত হওয়ায় তার কুরবানী গ্রহণীয় হবে না। আমি শুনেছি কিছু লোক জবেহর মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে রমযান মাসে ছাগল জবেহ করে। এ পদ্ধতিতে এ কাজটি বিদ'আত। কারণ কুরবানী ও আক্কেবার পশু জবেহ ছাড়া এমন কিছু নেই যার মধ্যে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা যায়। সুতরাং ঈদুল আযহার জবেহর মত নেকী পাওয়ার বিশ্বাসে রমযান মাসে জবেহ করলে সেটা বিদ'আত বলে গণ্য হবে। তবে গোশত খাওয়ার উদ্দেশ্যে করলে সেটা বৈধ হবে।

৬. স্থানগতভাবেঃ কোন ব্যক্তি যদি মসজিদ ছাড়া অন্য কোথাও ইতিকাফ করে তাহলে তার ইতিকাফ শুদ্ধ হবে না। কারণ মসজিদ সমূহ ছাড়া অন্য কোথাও ইতিকাফ বৈধ নয়। যদি কোন মহিলা বলে, আমি বাড়ীতে মুসল্লায় ইতিকাফ করব, তাহলে স্থানের ক্ষেত্রে শারঈ বিধানের বিপরীত হওয়ায় তার ইতিকাফ শুদ্ধ হবে না। দুটি শর্তে উপস্থিতি নিশ্চিত হওয়া ছাড়া কোন ইবাদত সৎ কর্ম হতে পারে না। প্রথম শর্ত হল- ইখলাস বা নিষ্ঠা। দ্বিতীয় শর্ত হল- আনুগত্য বা অনুসরণ। তবে পূর্বে উল্লিখিত ৬টি বিষয় ব্যতীত অনুসরণ যথার্থ হবে না। আমি এ সকল লোকদের বলব, যাদের বিদআতের মাধ্যমে পরীক্ষায় ফেলা হয়েছে এবং যাদের উদ্দেশ্য কখনও সৎ হতে ও যারা কল্যাণ কামনা করে, যখন আপনারা কল্যাণ কামনা করেন তখন আল্লাহর কসম করে বলছি! সালাফে

সালেহীনের পথের চেয়ে অন্য কোন উত্তম পথের কথা আমাদের জানা নেই^{১৩৭}।

শায়খুল ইসলাম ইবনে তায়মিয়া (রহঃ) বলেন, ইলম ও ইবাদত বিষয়ক সর্ব প্রকার বিদ'আত খুলাফায়ে রাশেদীনের খেলাফতকালের শেষের দিকেই প্রকাশ পায়^{১৩৮}। ওসমান (রাঃ) - এর শাহাদত বরণের পরে যখন মুসলমানদের মধ্যে বিভক্তির সৃষ্টি হল, ঠিক তখনই সর্ব প্রথম হারুরিয়্যাহ বিদ'আত প্রকাশ লাভ করলো। অতঃপর সাহাবয়ে কেরামের শেষ যামানায় কদর অর্থাৎ তাক্বদীর বলে কিছু নেই এই বিশ্বাসের বিদ'আত প্রকাশ লাভ করে। তার পরই ইরজা অর্থাৎ আমল ঈমানের অংশ নয় এই বিশ্বাসের বিদ্বাত তাশায়্যু অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর মৃত্যুর পর আলী (রাঃ) প্রথম খলীফা হওয়ার যোগ্য অধিকারী এই বিশ্বাসের উপর গঠিত হয় বিদ'আত এবং খাওয়ারেজ অর্থাৎ কাবীরা গুনাগার কাফের ও চিরস্থায়ী জাহান্নামী বিশ্বাসের বিদ'আত প্রকাশ লাভ করে। অতঃপর তাবৈঈন শেষ যামানায় ওমর ইবনে আব্দুল আযীয (রহঃ) - এর মৃত্যুর পরে খোরসানে হিশাম ইবনে আব্দুল মালেক (রহঃ) - এর খেলাফতকালে জাহমিয়াহদের উৎপত্তি হয়। আর উল্লিখিত বিদ'আতগুলি দ্বিতীয় শতাব্দি হিজরীতে সৃষ্টি হয়। সে সময় সাহাবায়ে কেরামের অনেকেই জীবিত ছিলেন এবং তাঁরা এ সকল বিদ'আত সাধ্যমত দমন করেছিলেন। অতঃপর ইসলামের সোনালী যুগের পরে

১৩৭ ইবনে উসাইমীন, সাবেক সৌদী সুপ্রিম ফতওয়া বোর্ড প্রধান

১৩৮ মাজমু' ফাতওয়া ১০/৩৫৪ পৃষ্ঠা

এসে মুতাযিলা (যারা নিজেদের জ্ঞান বা বিবেকের মান দণ্ডে শরীতকে মানে) বিদআতের সৃষ্টি হয়। তার পর তাসাউফ বা সূফীবাদ তথা কবর পূজারীদের জন্ম হয়। এভাবে যুগের আর্বতনে বিশ্বব্যাপী রকমারী বিদ'আত এর প্রাদুর্ভাব ঘটে। যাই হোক, সামগ্রিকভাবে বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিদ'আত মুসলিম সমাজে চালু হওয়ার যে কতিপয় কার্যকারণ পাওয়া যায় তা নিম্নে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হলো:-

(১) ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞতাঃ ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞতাই মুসলিম সমাজে বিদ'আত চালু হওয়ার অন্যতম কারণ। ঈমান-আমল হেফযত করতে আবশ্যিক পরিমাণ ইলম শিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর জন্যই ফরজ করা হয়েছে। দ্বীনের যথার্থ জ্ঞানের অনুপস্থিতি মুসলিম সমাজকে যেমন কলুষিত, পশ্চাৎপদ করেছে ঠিক তেমনি ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞতাই বিদ'আত প্রসারে যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করেছে।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেছেনঃ যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তার অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই কর্ণ, চক্ষু, হৃদয় এর প্রত্যেকটির ব্যাপারে জবাবদিহি করতে হবে^{৩৯}। আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছিঃ

إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْتَزِعُ الْعِلْمَ مِنَ النَّاسِ إِنْتِزَاعًا، وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعُلَمَاءَ فَيَرْفَعُ الْعِلْمَ مَعَهُمْ، وَيُبْقِي فِي النَّاسِ رُؤُوسًا جُهَالًا يَفْتُونَ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَيَضِلُّونَ وَيُضِلُّونَ. (متفق عليه)

অর্থঃ আল্লাহ মানুষ থেকে (দ্বীনি) জ্ঞান ছিনিয়ে নেবেন না বরং আলেমগণকে দুনিয়া থেকে উঠিয়ে নিবেন, তাদের সাথে ইল্মও উঠে যাবে। দুনিয়াতে মুর্খ নেতারা বেঁচে থাকবে তারা (কুরআন-হাদীসের) ইল্ম ব্যতীত ফতোয়া দিবে। ফলে নিজেরাও পথভ্রষ্ট হবে, অন্যদেরও পথভ্রষ্ট করবে^{১৪০}।

মূলতঃ রাসূলের যুগ থেকে সময় যত দীর্ঘ হচ্ছে এবং মানুষ রিসালাতের প্রভাব ও নিদর্শন থেকে দূরে সরে চলেছে ততই ইল্ম ও ধর্মীয় জ্ঞান কমে চলেছে এবং মূর্খতা ও অজ্ঞতা বেড়ে চলেছে ও সর্বত্র বিস্তার লাভ করেছে। বরং এ প্রসঙ্গে নবী (সাঃ) নিজেই বলেছেনঃ

من يعيش منكم فسيري اختلافا كثيرا.

'তোমাদের মধ্যে যারা বেঁচে থাকবে অনেক মতানৈক্য দেখতে পাবে।' তিনি আরও বলেনঃ

إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا، فأفتوا بغير علم، فضلوا، وأضلوا.

'আল্লাহ তাআলা ইল্ম বান্দাদের থেকে উপড়ে নেয়ার মত করে উঠিয়ে নিবেন না বরং ওলামাদের মৃত্যুর মাধ্যমে উঠিয়ে নেবেন। এক পর্যায়ে যখন আর কোন আলেম অবশিষ্ট রাখবেন না তখন লোকেরা অজ্ঞ মূর্খদেরকে নিজেদের নেতা হিসাবে গ্রহণ করবে। তারা বিভিন্ন বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে তখন তারা না জেনে ফতওয়া

১৪০ বুখারী : ৭৩০৭ ও মুসলিম : ২৬৭৩

দেবে। ফলে নিজেরাও গোমরাহ হবে এবং অপরদেরকে গোমরাহ করবে^{১৪১}। তাই বিদ'আত কে একমাত্র ইলম ও ওলামারাই প্রতিরোধ করতে পারেন এবং করেও থাকেন। যখন এতদুভয়ের বিলুপ্তি ঘটে, তখন বিদ'আত প্রকাশ ও প্রসারের সুযোগ পেয়ে যায়, আর বিদ'আত পন্থীরা এ বিষয়ে নব উদ্যম খুঁজে পায় এবং কাজ করতে শুরু করে।

(২) প্রবৃত্তির অনুসরণঃ মানুষ যখন কোরআন ও সুন্নাহ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তখন স্বীয় প্রবৃত্তির অনুসরণ করে। অর্থাৎ প্রবৃত্তির অনুসরণ অত্যন্ত ভয়ঙ্কর যা মানুষকে বিদ'আত সৃষ্টিকারী ও আত্মপূজারী বানিয়ে দেয়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেছেনঃ

فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ
۵০ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ . (الفصص:

অতঃপর তারা যদি আপনার ডাকে সাড়া না দেয়, তবে জানবেন, তারা শুধু নিজেদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে। আল্লাহর হেদায়াতের পরিবর্তে যে ব্যক্তি নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, তার চাইতে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে? নিশ্চয় আল্লাহ জালিম সম্প্রদায়কে পথ দেখান না। আল্লাহ তাআলা আরো বলেনঃ

أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَفَلَهُ وَجَعَلَ
ۨ৩ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ . (الجنائية:

আপনি কি তার প্রতি লক্ষ্য করেছেন, যে তার খেয়াল খুশিকে নিজ ইলাহ বানিয়ে নিয়েছে? আল্লাহ জেনে তাকে পথভ্রষ্ট করেছেন, তার

কান ও অন্তরে মোহর এঁটে দিয়েছেন। এবং তার চোখের উপর রেখেছেন পরদা। অতএব আল্লাহর পর কে তাকে পথ প্রদর্শন করবে? তোমরা কি চিন্তা ভাবনা কর না? বিদআত অনুসৃত প্রবৃত্তির বুনন বৈ কিছুই নয়। আল্লাহ তাআলা আরও ইরশাদ করেনঃ

وَلَا تُطِيعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا.

অর্থঃ আপনি তার অনুসরণ করবেন না যার অন্তরকে আমি আমার স্মরণ থেকে অমনোযোগী করে দিয়েছি। সে আপন প্রবৃত্তির অনুসরণ করে ও তার কার্যকলাপ সীমা অতিক্রম করে^{১৪২}। অন্যত্র আল্লাহ তাআলা আরও ইরশাদ করেনঃ

وَأَفْرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَغَلَّبَ جَعَلَهُ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ.

অর্থঃ আপনি কি ঐ ব্যক্তির দিকে লক্ষ্য করেছেন যে প্রবৃত্তিকে নিজের ইলাহ বানিয়ে নিয়েছে। আল্লাহ যথার্থই তাকে বিভ্রান্ত করেছেন, তার কর্ণ ও হৃদয়ে মোহর লাগিয়ে দিয়েছেন এবং তার চোখের উপর রয়েছে আবরণ। অতঃপর আল্লাহ পর কে তাকে পথ নির্দেশ করবে? তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না^{১৪৩}?

প্রবৃত্তির অনুসরণ ও আল্লাহর দীনের ক্ষেত্রে বুদ্ধিকে বিচারক হিসেবে মানা থেকে সতর্ক করা সম্বন্ধে কয়েক গ্রন্থাগারের মন্তব্যঃ (গাযালী) এহইয়াউ উলুমিদ্দীন (إحياء علوم الدين) গ্রন্থে বলেনঃ

১৪২ সূরা কাহাফ : ২৮

১৪৩ সূরা জাছিয়া : ২৩

যেমনিভাবে ঔষধের উপকারিতা উপলব্ধি করতে বিবেক স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়, যদিও পরীক্ষা-নীরিক্ষা করার দ্বারাই সেটা নির্ধারিত হয়, তেমনিভাবে বিবেক আখিরাতে যা উপকার করবে তা জানতে অপারগ, কারণ সেটা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে অর্জন করার সুযোগ নেই। এটা শুধু সম্ভব হবে যদি আমাদের নিকট কিছু সংখ্যক মৃতব্যক্তি ফিরে আসে এবং তারা আমাদেরকে আল্লাহ তাআলার নিকটবর্তী করে এমন আমল ও তাঁর থেকে দূরে সরিয়ে দেয় এমন আমল সম্পর্কে জানিয়ে দেয়; আর এটা আশা করার কোনো সুযোগ নেই।

(২) মাজমাউল বাহরাইন গ্রন্থকার তার ব্যাখ্যাগ্রন্থে বলেন, এক লোক ঈদের দিন ময়দানে ঈদের সালাতের আগে কিছু সালাত আদায় করতে চাইলে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে নিষেধ করেন। তখন লোকটি বলল, হে আমীরুল মুমিনীন, আমি অবশ্যই জানি যে আল্লাহ আমাকে সালাত আদায় করার কারণে আযাব দিবেন না, তখন আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আর আমিও জানি যে, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা যে কোনো কাজেরই সাওয়াব দেন না, যতক্ষণ না তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করবেন বা তিনি তা করার জন্য উৎসাহ প্রদান করবেন। সুতরাং তোমার সালাত বেহুদা কাজ হয়ে যাবে, আর বেহুদা কাজ করা হারাম। তাছাড়া এমনও হতে পারে যে, আল্লাহ তাআলা তাঁর নবীর বিরোধিতার কারণে তোমাকে শাস্তি দিবেন।

(৩) আল - হিদায়া গ্রন্থকার বলেনঃ সুবহে সাদিকের পরে ফযরের দুই রাকাতের চেয়ে অতিরিক্ত নফল সালাত আদায় করা মকরুহ;

কেননা, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সালাতের প্রতি আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও তিনি দুই রাকাতের বেশি আদায় করেননি। সুতরাং লক্ষ্য করুন, কিভাবে ইবাদত অধ্যায়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক কোনো কাজ না করাকে মাকরুহের উপর দলিল হিসেবে তিনি উল্লেখ করলেন^{১৪৪}।

(৩) ব্যক্তি ও মতের পক্ষাবলম্বনঃ সত্যাসত্য যাচাই না করে কোন ব্যক্তি ও ব্যক্তি মতের পক্ষাবলম্বন করা অনেক সময় একজন ব্যক্তিকে সঠিক দলিলের অনুসরণ ও হক গ্রহণের ক্ষেত্রে বাধা প্রদান করে। ব্যক্তি ও দলিলের আনুগত্যের মাঝে সেই পক্ষাবলম্বন বাধা হয়ে দাঁড়ায়। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ
آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. (البقرة: ১৭০)

‘আর যখন তাদেরকে বলা হয় যে, তোমরা সে হুকুমের অনুসরণ কর যা আল্লাহ তাআলা অবতীর্ণ করেছেন, তখন তারা বলে কখনো না বরং আমরা তো সে বিষয়েরই অনুসরণ করব যাতে আমরা আমাদের বাপ-দাদাদের পেয়েছি, যদিও তাদের বাপ-দাদারা কিছুই জানতো না: জানতো না সঠিক পথও।’ বর্তমান যুগেও এ প্রকৃতির অনেক লোক পাওয়া যায়, যারা সুফিবাদে বিশ্বাসী যেমনঃ কবর পূজারি বা প্রচলিত তথাকথিত মাযহাবপন্থীরা। অতএব, আপনি দেখতে পাবেন যে, তারা যে মতাবলম্বী এবং যে ব্যক্তির দর্শন গ্রহণ

১৪৪ শাইখ আহমদ আর-রুমী আল-হানাফী (রহঃ), অনুবাদক: মোঃ আমিনুল ইসলাম, সম্পাদনা: ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া, সূত্র: ইসলাম প্রচার ব্যুরো, রাবওয়াহ, রিয়াদ, সৌদিআরব

করেছে যদি সে মত ও দর্শনের বিপরীত কোরআন ও হাদীসের সঠিক উদ্ধৃতি উপস্থাপন করে তাদের বলা হয়, আপনি যে মত ও দর্শন গ্রহণ করেছেন সেগুলো তো কোরআনের এ আয়াত ও এ সকল হাদীস দ্বারা বাতিল বলে প্রমাণিত হচ্ছে। তাই ইমাম গাযালী (রহঃ) তাঁর আল-আরবাঈন ফী উসূলিদীন (الأربعين في أصول الدين) নামক গ্রন্থে বলেন, তুমি অবশ্যই বেঁচে থাক তোমার বুদ্ধি বা যুক্তির দ্বারা সবকিছু বিচার করা থেকে, আরও বেঁচে থাক প্রত্যেক কল্যাণকর ও উপকারী বস্তুই উত্তম, আর যা কিছু অধিক পরিমাণে হবে, তাই অধিক উপকারী হবে এমন কথা বলা থেকে। কারণ, তোমার বুদ্ধি স্রষ্টার নির্দেশাবলীর রহস্য উদঘাটনে সক্ষম নয়; বরং তা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শক্তিই অনুধাবন করতে পারে; সুতরাং তোমার উপর আবশ্যকীয় কর্তব্য হল অনুসরণ করা; কারণ, বিভিন্ন বিষয়ের বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্যসমূহ তুমি কিয়াসের মাধ্যমে বুঝতে পারবে না; তুমি কি দেখনি, কিভাবে তোমাকে সালাতের উদ্দেশ্যে আহ্বান জানানো হয়েছে অথচ গোটা দিনব্যাপী তা আদায় করা থেকে তোমাকে নিষেধ করা হয়েছে। তোমাকে তা পরিত্যাগ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সুবহে সাদিক ও আসরের পরে এবং সূর্য উদয়, অস্ত ও পশ্চিমাকাশে হেলে যাওয়ার সময়; আর এটার পরিমাণ হচ্ছে দিনের এক তৃতীয়াংশের মত সময়।” সুতরাং উক্ত মত ও পথ ছাড়ুন এবং কোরআন সুন্নাহর অনুসরণ করুন। সঠিক পথে ফিরে আসুন। তখন তারা নিজ মাজহাব মাশায়েখ ও বাপ-দাদার মাধ্যমে দলিল দিয়ে বলে যে,

এতকাল যাবৎ তারা কি ভুল করে এসেছে? যুগ যুগ ধরেই তো এ আমল চলে আসছে। কই কেউ তো ভুল বলেনি? আমাদের পীর-বয়ুর্গরা এত বড় আলেম, তারা কি ভুল করতে পারে? ইত্যাদি যতসব অসার ও বাতিল কথা বলে মাযহাবপন্থীরা হককে এড়িয়ে যায়।

(৪) বিধর্মী কাফেরদের সাদৃশ্যাবলম্বনঃ বিদআত ও কুপ্রথায় পতিত করার ব্যাপারে কাফেরদের সাদৃশ্য অবলম্বন একটি বিরাট কারণ, যেমন আবু ওয়াক্কিদ লায়সী (রাঃ) এর হাদীসে একটি ঘটনা উদ্ধৃত হয়েছে, তিনি বলেনঃ আমরা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর সাথে হোনাইন অভিযুগে যাত্রা করলাম। সে সময় সবে মাত্র কিছুদিন হলো আমরা কুফর ছেড়ে ইসলামে দীক্ষিত হয়েছি, এদিকে 'যাতে আনওয়াত' নামে মুশরিকদের একটি বড়ই বৃক্ষ ছিল, যার চার পাশে তারা অবস্থান করত এবং নিজেদের যুদ্ধাঙ্গুসে গাছে ঝুলিয়ে রাখত। পথিমধ্যে আমরা সে গাছের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলাম, তখন আমরা বললাম ইয়া রাসূলুল্লাহ! তাদের যেমন 'যাতে আনওয়াত' আছে আপনি আমাদের জন্যও একটি 'যাতে আনওয়াত' স্থির করুন। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেনঃ আল্লাহ্ আকবার **إِنهَا السِّنُّ** এটি একটি রীতি, যে সত্তার হাতে আমার জীবন তার শপথ করে বলছি, তোমরা তেমন একটি কথাই কললে যেমনটি বলেছিল, বনী ইসরাইলরা নবী (সাঃ) মুসা (আঃ) কে।

قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ. (الأعراف)

তারা বলতে লাগল, হে মুসা আপনি আমাদের উপাসনার জন্যও তাদের মূর্তির মতই একটি মূর্তি নির্মাণ করে দিন। তিনি বললেন তোমরা নিতান্তই একটি অজ্ঞতা প্রসূত সম্প্রদায়। তোমরা অবশ্যই তোমাদের পূর্বসূরীদের রীতি অনুসরণ করবে। এ হাদীস নবী আকরাম (সাঃ) সুস্পষ্ট করে বর্ণনা করেছেন যে, কাফেরদের সাদৃশ্য অবলম্বনই বনী ইসরাইলকে ইবাদতের জন্য মূর্তি নির্মাণ করে দেয়ার মত কদর্য অনুরোধ করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। আর ঐ একই জিনিস রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কতিপয় সাহাবিকে বরকত হাসিলের জন্য আল্লাহকে বাদ দিয়ে একটি গাছ নির্ধারণ করে দেয়ার জন্য আবেদন করতে উৎসাহ করে তুলছিল। বর্তমান সময়েও এমনটি ঘটে চলেছে যে অধিকাংশ মুসলমান শিরকি ও বিদ'আতী কার্যকলাপের ক্ষেত্রে কাফেরদের অনুসরণ করে চলেছে। যেমন ঈদে মিলাদুন্নবী উদযাপন, নির্দিষ্ট কিছু কাজের জন্য সগুহ বা দিনক্ষণ নির্ধারণ করে নেয়া। বিভিন্ন উপলক্ষ ও স্মরণিকা স্বরূপ বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা। স্মৃতি সৌধ, স্তম্ভ, ভাস্কর্য ইত্যাদি নির্মাণ। কবরের উপর ঘর-গুম্বজ ইত্যাদি নির্মাণ করা।

(৫) অন্ধভক্তি ও আনুগত্যঃ ইসলাম কখনো অন্ধ আনুগত্য সমর্থন করে না। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবুওয়াতের দাবি করার পাশাপাশি দলিল-প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন। প্রশ্নবাণে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জর্জরিত করে ঈমান আনার ঘোষণা দিয়েছেন হযরত যিমাম ইবনে ছা'লাবা (বুখারী)। তবে ঈমান আনার পর কেবল কুরআন-সুন্নাহরই অন্ধভক্তি ও আনুগত্য করা যায়।

বজুর্গ, পীর-মাশায়েখ, অলি-আবদাল অন্ধ আনুগত্য পাওয়ার হকদার নন। সত্যিকারের কোন বজুর্গ ব্যক্তি এমনটি দাবিও করেন নি। তাদের আনুগত্য শর্তসাপেক্ষ। কুরআন-সুন্নাহর অনুগামী আদেশ-উপদেশই পালনীয়। কিন্তু কিছু অজ্ঞ লোক ইসলামের এই শাস্ত্রত বিধানের অনুগত হওয়ার পরিবর্তে অন্ধ আনুগত্যের বহিঃপ্রকাশ ঘটান। আমলের ক্ষেত্রে দলিল-প্রমাণের পরিবর্তে বজুর্গীর দোহাই দেন, অমুক বজুর্গ যদি বিদ'আত করতে পারেন- তবে আমিও করব, অমুক পীর যদি বিদ'আত করে জাহান্নামী হন তবে আমিও জান্নাত চাই না ইত্যাদি চরম ধৃষ্টতাপূর্ণ কথা বলে ফেলেন। যা মুসলিম সমাজে বিদআতের প্রসারে কার্যকর ভূমিকা পালন করছে।

(৬) দীর্ঘদিন সুন্নাত বর্জনের কারণেঃ ইসলামী শরীয়াত অনুমোদিত, কুরআন-সুন্নাত সমর্থিত বা নির্দেশিত কোনো কাজ দীর্ঘদিন সমাজের দিনদার পরহেজগার বুজুর্গ, আলেম উলামা, বুজুর্গ ব্যক্তিগণ আমল করেনি, বা বহুকাল ধরে তার প্রচারো করেনি, লোকেদের সামনে বহুকাল বলা হয়নি। এমতাবস্থায় সাধারণ মানুষের মনে ধারণা হয় যে, এ কাজ নিশ্চয়ই ভাল নয়। যদি ভালোই হতো তবে অবশ্যই তা পরহেজগার, দিনদার, বুজুর্গানে দ্বীন, উলামায়ে কেরাম করতেন। ভাল কাজ হলে উলামা-মাশায়েখগণকি এতদিন বলতেন না? এভাবে একটি শরীয়াত সম্মত কাজকে শেষ পর্যন্ত লোকদের শরীয়াত বীরোধী মনে করতে থাকে। সুন্নাতকেই হারাম, বিদআত ইত্যাদি আখ্যায়িত করে ফেলে। আর করোণীয় কাজকে বর্জনীয় মনে করাও মস্ত বরো বিদ'আত। যেমন- ইসলামী রাজনীতি, সামাজিক বিভিন্ন

কার্যক্রম দীর্ঘদিন উলামায়ে কেরামের মাঝে অনুপস্থিত থাকায় সাধারণের মনে এ ধারণা বদ্ধমূল হয়েছে যে ইসলামে রাজনীতি, সমাজনীতি ইত্যাদি করা হারাম (নাউযুবিল্লাহ)।

(৭) নেতৃস্থানীয় জাহিল লোকদের কর্মতৎপরতাঃ দ্বীন সম্পর্কে জাহিল লোকেরা হয়ত কোন কাজ করতে আরম্ভ করল। আলেম সমাজ তার প্রতিবাদ করলেন না, বাধাও দিলেন না। এ কাজ শরীয়াত বিরোধী, তোমরা মুসলামান হিসাবে এ কাজ কিছুতেই করতে পারো না ইত্যাদি কিছুই বললেন না। ফলে সাধারণত লোকদের মধ্যে এমন ধারণা বদ্ধমূল হতে থাকে যে, নিশ্চয়ই এ কাজ অবৈধ নয়। যদি অবৈধ হতো তবে উলামায়ে কেরাম বাধা দিতেন অমুক মজলিসে এমনি কাজ হয়েছে। ওখানে অমুক বড় বড় আলেম ছিলেন। কেউ বাধা দেননি।

অতএব এ কাজ শরীয়াত সম্মত। অবস্থা শেষ পর্যন্ত এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছে যে, একদিকে জনরোষের ভয় অপর দিকে নিজেও দু'চার বার করে ফেলেছেন- এখন বাধা দিবেন কীভাবে? এমন কিছু সংখ্যক আলেম তাদের পক্ষে দলিল-যুক্তি আবিষ্কার করতে থাকেন। তখন আবার কিছু সংখ্যক আলেম বাধা দিয়েও আর সমাজের জোয়ার ফেরাতে ব্যর্থ হয়ে যান। বিদআতীগণ নিজেদের পক্ষে কিছু কিছু আলেমও পেয়ে যাওয়ায় তারা শরীয়াত বিরোধী কাজটি ত্যাগ করার প্রয়োজনও আর বোধ করেন না। তাদের মনে এমন ধারণা বদ্ধমূল করা হয় যে, আলেমের কথায় কাজ করে যদি কোন গুনাহ হয়, তবে তার দায় ঐ আলেমেই বহন করবেন- যিনি তাকে

বাতলিয়েছেন। সুতরাং তার কোন অস্থিরতার কারণই নেই। এভাবে সমাজ বিদআদ চালু হয়ে যায়।

(৮) আলেম সমাজের কাজ-কর্মঃ কোন আলেম হয়ত অসতর্কতার দরুন বা কোন অবস্থার প্রেক্ষিতে বাধ্য হয়ে শরীয়াত বিরোধী বা সুন্নাহের খেলাফ কোন কাজ করে ফেলেছেন। তিনি নিজেও জানেন যে, তার কাজ সুন্নাহের খেলাফ বা তার কাজের সমর্থনে ইসলামী শরীয়াহের গ্রহণযোগ্য কোন দলিল-প্রমাণ নেই। তিনি হয়তো অনিচ্ছাকৃত ভ্রুটির জন্য তাওবাও করেছেন। কিন্তু তার কাজ দেখে জাহিল বা অতিভক্ত লোকেরা মনে করতে শুরু বিরোধী কোন কাজ করতেই পারেনা। কারণ মস্ত বড় আলেম-বুজুর্গ শরীয়াত বিরোধী কোন করতেই পারেন না।

ইসলামী আইনের উৎস সম্পর্কে জাহিল লোকেরা এভাবে এক ব্যক্তির কারণে গোটা সমাজেই বিদআতের প্রচলন করে ফেলে। সে জন্য বিজ্ঞ জনেরা বলেন- **حسنًا للابرار سيئات للمقربين** - অর্থাৎ - বুজুর্গ ব্যক্তির ভাল কাজ ভক্তের জন্যে মন্দ হয়ে যায়। বাধ্য হয়ে বুজুর্গ ব্যক্তি যা করেছেন তা ছিল বুজুর্গের জন্যে হালাল। আর বুজুর্গকে দেখে বিনা কারণেই যিনি বুজুর্গের অনুসরণ করলেন, তিনি হলেন পাপী।

সংশ্লিষ্ট বুজুর্গ হয়তো জানেন-ই না যে, তাকে নিয়ে এতো কিছু হয়েছে বা হচ্ছে। এ ধরনের কাজ সাধারণত ঐ বুজুর্গের ওফাতের পরই হয়ে থাকে। আবার এক শ্রেণীর আলেম সাধারণত জনগণের মধ্যে এমন একটি ধারণাও প্রচার করেন যে, বুজুর্গ ব্যক্তির ভুল ধরা

বা বলাও পাপ (!) শরীয়াতের সুস্পষ্ট বিধান লঙ্ঘনের পরও বলা হয়- তিনি মাদারজাত অলি (মাতৃগর্ভ হতেই আল্লাহর প্রিয় বান্দা), তার ব্যাপারে শরীয়াতের সব হুকুম প্রযোজ্য নহে (!) বিদ'আতের ব্যাপারে উদারনীতি গ্রহনকারীদের আচারণও বিদ'আত সম্প্রসারণে কার্যকার ভূমিকা পালন করে।

সর্ব মহলে নিজ অবস্থানকে গ্রহণযোগ্য করার মানসিকতা উদারনীতি গ্রহনে প্রাণ সঞ্চর করে। আবার ২/১ বার বিদআতী কাজের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যাওয়ায় এখন ঐ কাজেকে কীভাবেই বা বিদ'আত বলা যায়? উদারপন্থী এসব সম্মানিত উলামা হযরত যদি তাদের যবান মোবারক দিআতের বিরুদ্ধে সোচ্চার করতেন, তবে কুসংস্কারের কড়াল গ্রাস হতে মুসলিম উম্মাহ রক্ষা পেয়ে প্রভূত উন্নতি সাধনে ব্রত হতো।

(৯) ইসলামী চেতনা, ঐতিহ্য ধ্বংস করার হীন উদ্দেশ্যঃ মুসলিম উম্মাহর মধ্যে গড়ে উঠা সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য বিনষ্ট করার অসৎ উদ্দেশ্য ইসলাম বিরোধী শক্তির প্রত্যেক বা পরোক্ষ মদদে বিদআদ সৃষ্টি করে তা সমাজে চালু করা হয়। একতাই শক্তি - একতাই বল। ঐক্যবদ্ধ কোন জাতিকে কোন অবস্থাতেই ধ্বংস করা সম্ভব নয়। এ কথা ঐতিহাসিকভাবে সত্য প্রমাণিত।

মুসলিম সমাজে ইবাদতরূপে নতুন নতুন বিদ'আত সৃষ্টি করা হলে মূর্থ ও স্বার্থপর লোকেরা জান্নাতে যাওয়ার সহজ পথ পেয়ে ইসলামের মূল চেতনা হতে সরে আসবে, আর প্রকৃত দ্বীনদার ব্যক্তির কখনো বিদ'আত গ্রহন করবে না। ফলে তাদের উভয়ের

মধ্যে শুরু হবে সংঘাত। অগ্রগতি দূরের কথা নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্যে একে অন্যের দমনে শুরু নিজেরাই উদ্যোগী হবে না বরং ভিন্নমত পোষনকারী গোষ্ঠকে নিমূল করার জন্যে প্রয়োজনে অমুসলিমদের ডেকে আনবে। সৃষ্টি হবে বিভিন্ন দল-উপদলের। ফলে মুসলিম সমাজ কখনো ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে শান্তির সমাজ কায়েমের সৌভাগ্য লাভ করতে পারবে না। এমনই একটি ভয়ানক পরিস্থিতি সৃষ্টি করার জন্য স্বার্থবাদী, অনভিজ্ঞ কতিপয় নামধারী আলেম, তথাকথিত পীর-মাশয়েখদের দূর হতে ব্যবহার করে ইসলাম বিরোধী শক্তি।

আর এভাবে সমাজে প্রচলিত হতে থাকে অসংখ্য বিদআদী বিদআত। যার বাস্তব নমুনা আমরা আজ গোটা মুসলিম বিশ্বে প্রত্যক্ষ করছি।

(১০) সন্দিহান হওয়া

বিদআত পন্থী সন্দেহের বশবর্তী হয়ে বিদআতে জড়িয়ে পড়ে।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেনঃ

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ
مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ
وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ
(৭: مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ). (আল عمران)

অর্থঃ তিনিই আপনার প্রতি কিতাব নাযিল করেছেন যাতে সুস্পষ্ট ও অক্লান্ত আয়াতসমূহ রয়েছে। ওগুলো কিতাবের মূল আর কিছু আয়াত অস্পষ্ট।

অতএব যাদের অন্তরে বক্রতা রয়েছে তারাই অশান্তি সৃষ্টি ও (ইচ্ছামত) ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের উদ্দেশ্যে অস্পষ্টের অনুসরণ করে। অথচ আল্লাহ ব্যতীত এর অর্থ কেউই জানে না। যারা জ্ঞানী তারা বলে, আমরা এতে বিশ্বাস করি। সবই আমাদের রবের নিকট হতে আগত। জ্ঞানীরা ব্যতীত কেউই উপদেশ গ্রহণ করে না^{১৪৫}।

(১১) যুক্তির উপর নির্ভর করা

যে ব্যক্তি আকল বা যুক্তির উপর নির্ভর করে এবং কুরআন ও সুন্নাহ ছেড়ে দেয় অথবা কোন একটি ছেড়ে দেয়, সে পথভ্রষ্ট হয়ে যায়।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.

অর্থঃ রাসূল তোমাদের জন্য যা কিছু নিয়ে এসেছেন তা গ্রহণ কর এবং যা হতে নিষেধ করেছেন তা হতে বিরত থাক এবং আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ শাস্তি দানে কঠোর^{১৪৬}। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ

(৩৬) : أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. (الأحزاب)

অর্থঃ আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল যদি কোন ব্যাপারে ফায়সালা করেন তখন কোন মুমিন পুরুষ বা নারীর জন্য নিজেদের ব্যাপারে (অন্য কোন) সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিকার থাকবে না। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং তাঁর হুকুমের অবাধ্য হল সে সুস্পষ্ট পথভ্রষ্ট হয়ে গেল^{১৪৭}।

১৪৫ আলে-ইমরানঃ ৭

১৪৬ আল-হাশর : ৭

১৪৭ আহযাব : ৩৬

(১২) অন্ধ অনুকরণ ও গোঁড়ামী

অধিকাংশ বিদ'আত পন্থী তাদের পূর্ব পুরুষ ও পীর-মাশায়েখদের তাকলীদ তথা অন্ধ অনুকরণ এবং নিজ মাজহাবের ব্যাপারে গোঁড়ামী করে থাকে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ

﴿۱۹۰﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. (البقرة)

অর্থঃ যখন তাদের বলা হয়, তোমরা আল্লাহর কিতাবের অনুসরণ কর; তখন তারা বলে, বরং আমরা তারই অনুসরণ করব যার উপর আমাদের পিতৃপুরুষদের পেয়েছি^{১৪৮}। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ

﴿الزخرف﴾ بَلْ قَالُوا لِمَ تَوَجَّدْنَا إِلَىٰ آبَاءٍ عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُّهْتَدُونَ.

অর্থঃ বরং আমরা পূর্বপুরুষদের একটি মতাদর্শের উপর পেয়েছি এবং তাদের পথ ধরেই আমরা হেদায়াত প্রাপ্ত হব^{১৪৯}। বিদ'আত পন্থীদের নিকট তাদের বিদআতী কর্মকান্ড আকর্ষণীয় করে দেয়া হয়। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ

﴿الزخرف﴾ أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ

﴿الفاطر﴾ ۛ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَاتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ.

অর্থঃ কাউকে যদি তার মন্দ কর্ম সুন্দর করে দেখানো হয় তখন সে ওটাকে উত্তম মনে করে। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা গোমরাহ করেন এবং যাকে ইচ্ছা হেদায়াত দান করেন। অতএব আপনি তাদের জন্য আক্ষেপ করে নিজ প্রাণকে ধ্বংস করবেন না। তারা যা করে আল্লাহ্

১৪৮ আল-বাকারা : ১৭০

১৪৯ যুখরুফ : ২২

সে সম্পর্কে সম্মক ভ্রাতা^{১৫০}। বিদ'আত পন্থীর পরিণতি সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ

يَوْمَ تَقْلَبُ وَجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَّا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ. وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ. رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ (৬৬-৬৮) وَالْعَنَهُمُ لَعْنًا كَثِيرًا. (الأحزاب)

অর্থঃ যে দিন তাদের মুখমন্ডল অগ্নিতে উলট পালট করা হবে সে দিন তারা বলবে, হায়! আমরা যদি আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করতাম! তারা আরো বলবে, হে আমাদের রব! আমরা নিজ নেতা ও বড়দের আনুগত্য করেছিলাম এবং তারা আমাদের পথভ্রষ্ট করেছিল। হে আমাদের রব! তাদের দ্বিগুণ শাস্তি প্রদান করুন ও তাদের উপর লানত বর্ষণ করুন^{১৫১}।

(১৩) বিদ'আত পন্থীদের সংশ্রব ও তাদের সাথে উঠা বসা করা

বিদ'আত পন্থীদের সঙ্গ দেয়া ও তাদের সাথে উঠা বসা করার দ্বারাও সমাজে বিদ'আত প্রচার-প্রসার লাভ করে। আল্লাহ তা'আলা বিদ'আতের অনুসারীদের সংশ্রবকে নিন্দনীয় বলে আখ্যায়িত করেছেন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ

وَيَوْمَ يَعْصِي الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ بِالْيَتَنِّي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ: فُلَانًا خَلِيلًا. لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا. (الفرقان ২৭-২৯)

অর্থঃ যালিমরা সে দিন নিজ হস্তদ্বয় দংশন করতে করতে বলবে হায়! আমি যদি রাসূলের সাথে সৎপথ অবলম্বন করতাম। হায়!

১৫০ সূরা ফাতির : ৮

১৫১ সূরা আহযাবঃ ৬৬-৬৮

দুর্ভোগ আমার, আমি যদি অমুককে বন্ধু রূপে গ্রহণ না করতাম। আমার নিকট উপদেশ পৌঁছার পর সে আমাকে বিভ্রান্ত করেছিল। শয়তান তো মানুষের জন্য মহাপ্রতারক^{১৫২}। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ

وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ.
(الأنعام : ৬৮)

অর্থঃ যখন আপনি দেখবেন লোকজন আমার আয়াতসমূহে দোষ-ক্রটি অনুসন্ধান করছে। তখন আপনি তাদের হতে দূরে সরে যাবেন, যতক্ষণ না তারা অন্য কোন প্রসঙ্গে নিমগ্ন হয়। শয়তান যদি এটা আপনাকে ভুলিয়ে দেয় তবে স্মরণ হওয়ার পর আর এ যালিমদের সাথে বসবেন না। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذَا مِثْلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ
(النساء : ১৪০). الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا

অর্থঃ নিশ্চয়ই তিনি তোমাদের নির্দেশ করছেন যে, যখন তোমরা আল্লাহর নিদর্শনসমূহের প্রতি কারো অবিশ্বাস ও উপহাস করার কথা শুনবে, তখন তাদের সাথে বসবে না যে পর্যন্ত না তারা অন্য কথায় লিপ্ত হয়। অন্যথায় তোমরাও তাদের সাদৃশ হয়ে যাবে।

নিশ্চয়ই আল্লাহ মুনাফিক ও কাফিরদের জাহান্নামে একত্রিত করবেন^{১৫৩}। রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ

إِنَّمَا مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالْجَلِيسِ السَّوِّءِ كَمَثَلِ الْمِسْكِ وَنَافِخِ الْكَبِيرِ فَحَامِلُ الْمِسْكِ إِمَّا أَنْ يُخْذِيكَ وَإِمَّا أَنْ تُبْتَاعَ مِنْهُ وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبَةً وَنَافِخُ الْكَبِيرِ إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ رِيحًا خَبِيثَةً. (بخاري ومسلم)

অর্থঃ নিশ্চয়ই সৎসঙ্গ ও অসৎসঙ্গের দৃষ্টান্ত হল মিশ্ক আম্বর বহনকারী ও কামারের ন্যায়। অতঃপর মিশ্ক বহনকারী হয়ত তোমাকে কিছু দেবে অথবা তুমি তার থেকে কিছু কিনবে। আর তা না হলে কমপক্ষে তার থেকে সুঘ্রাণযুক্ত বাতাস পাবে। আর কামার হাপরে ফুৎকারের মাধ্যমে হয়ত তোমার কাপড় জ্বালিয়ে দেবে অথবা তার থেকে তুমি দুর্গন্ধময় বাতাস পাবে^{১৫৪}।

(১৪) আলেমদের নিশ্চুপ থাকা ও সঠিক ইল্ম গোপন করা

এটা লোক সমাজে বিদ'আত ও ফিতনা-ফ্যাসাদ সৃষ্টির অন্যতম কারণ। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُّوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. (البقرة ১৫৯-১৬০)

অর্থঃ আমি যে সকল স্পষ্ট নিদর্শন ও পথ-নির্দেশ অবতীর্ণ করেছি, তা মানুষের নিকট প্রকাশ করার পরও যারা ঐ সকল বিষয় গোপন করে, আল্লাহ তাদের উপর লানত করেন এবং অভিসম্পাতকারীগণও লানত করে থাকেন। কিন্তু তারাই লানত থেকে মুক্ত যারা তাওবা

করেছে, নিজেদের সংশোধন করেছে ও সঠিক বিষয় প্রকাশ করেছে। আমি তাদের তাওবা কবুল করি। আমিই তওবা গ্রহণকারী ও দয়ালু^{১৫৫}। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. (البقرة ১৭৪)

অর্থঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ যা কিতাবে অবতীর্ণ করেছেন তা যারা গোপন করে ও সামান্য মূল্যে বিক্রি করে, তারা স্ব-স্ব উদরে অগ্নি ছাড়া আর কিছুই ভক্ষণ করে না। কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তাদের সাথে কথা বলবেন না, তাদের পবিত্র করবেন না এবং এদের জন্যই রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি^{১৫৬}। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبُئْسَ مَا يَشْتَرُونَ. (آل عمران ১৮৭)

অর্থঃ স্মরণ করুন, যখন আহলে কিতাবদের থেকে আল্লাহ্ অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন যে, তোমরা নিশ্চয়ই এটা মানুষের কাছে প্রকাশ করবে, গোপন করবে না। এরপরও তারা তা অগ্রাহ্য করে স্বল্প মূল্যে বিক্রি করলো। অতএব তারা যা ক্রয় করে তা কতই না নিকৃষ্ট^{১৫৭}। আল্লাহ তা'আলা এ উম্মতের একটি দলের উপর দাওয়াত ইলাল্লাহ, সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করা ওয়াজিব করেছেন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ

১৫৫ বাকারা : ১৫৯-১৬০

১৫৬ বাকারা : ১৭৪

১৫৭ আলে-ইমরান : ১৮৭

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
(১০৪): وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. (আল عمران)

অর্থঃ তোমাদের মধ্যে এরূপ একটি দল থাকা উচিত যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে এবং সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করবে। এরাই সফলকাম^{১৫৮}।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ প্রসঙ্গে তাই বলেছেনঃ

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ
(فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ). (مسلم)

অর্থঃ তোমাদের যে কেউ গর্হিত কাজ হতে দেখে, সে যেন তা হাত দ্বারা বাধা করে। যদি এ শক্তি না থাকে তাহলে যেন মুখ দ্বারা বাধা প্রদান করে, তাও যদি সম্ভব না হয় তাহলে যেন অন্তরে ঘৃণা করে। এটা ঈমানের নিম্নতম স্তর^{১৫৯}।

এ হাদীস দ্বারা একথাই প্রমাণিত হয় যে, প্রত্যেক মুসলিমের উপর নিজের ক্ষমতা ও শক্তি অনুযায়ী সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করা ওয়াজিব।

এছাড়াও আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ

مَا مِنْ نَبِيٍّ بَعَثَهُ اللَّهُ فِي أُمَّةٍ قَبْلِي إِلَّا كَانَ لَهُ مِنْ أُمَّتِهِ حَوَارِيُونَ وَأَصْحَابٌ
يَأْخُذُونَ بِسُنَّتِهِ وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِنَّهَا تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ يَقُولُونَ مَا لَا
يَفْعَلُونَ وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ

১৫৮ আল-ইমরান : ১০৪

১৫৯ মুসলিম : ৪৯

بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنْ
(الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ). (مسلم)

অর্থঃ আমার পূর্বে যত নবী এসেছেন তাদের প্রত্যেকেরই স্বীয় উম্মতের মধ্য থেকে কিছু সাথী এবং ঘনিষ্ঠ লোক ছিল। যারা তাঁর সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরত এবং তাঁর হুকুম মেনে চলত। পরবর্তীতে এমন এক প্রজন্ম এল, যারা যা বলত তা করত না এবং তারা এমন কাজ করত যার নির্দেশ ছিল না। যে ব্যক্তি সর্বশক্তি দিয়ে তাদের প্রতিরোধ করবে সে মুমিন, যে মৌখিকভাবে প্রতিবাদ করবে সে মুমিন এবং যে অন্তরে ঘৃণা করবে সেও মুমিন। এর বাইরে কারো অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণও ঈমান নেই^{১৬০}।

আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ

مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ عَلِمَهُ ثُمَّ كَتَمَهُ أُجِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ (ترمذي, أبو داود وابن ماجه)

অর্থঃ যদি কাউকে এমন বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হয় যা সে জানে অতঃপর সে তা গোপন করে, তাহলে তাকে কিয়ামতের দিন আগুনের লাগাম পরানো হবে^{১৬১}।

সুতরাং, উপরোক্ত আলোচনার সারাংশে বলা যায় যে, এ কথা আমাদের জানা উচিত যে, বিদআতী কাজের ভিত্তি কি? বিভিন্ন বিদআতী কাজ সমাজে চালু হওয়ার পেছনে সাধারণ জনসাধারণ

১৬০ মুসলিম : ৫০

১৬১ তিরমিযী : ২৬৪৯ ও আবু দাউদ : ৩৬৫৮ ইবনে মাজাহ : ২৬৬

কেবল অনুসরণের দোষেরই দোষী। বিদ'আত সমাজে জন্ম দেয়ার ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের তেমন অবদান নেই। কিছু নামধারী আলেম, কতিপয় ভদ্দ পীর সমাজে বিদ'আতের প্রবর্তন করে। এসব বিদ'আত গুলোকে সমাজে চালু করার জন্য প্রথমত কোন কোন আলেমের অসাধারণ ও বিস্ময়কর বজুর্গ ও ফজিলত তুলে ধরা হয়। কোন না কোন ভাবে তার বংশ নিয়ে টেকানো হয় রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে। দেয়া হয় 'আওলাদে রাসূলের (!) খেতাব। আবার কেউ নিয়ে বংশ টেকান মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ) বা অন্য কোন প্রখ্যাত ইমামের সাথে। (নাউয়ুবিল্লাহ)। অতঃপর ঐ বুজুর্গের বুজুর্গীর দোহাই দিয়ে বিদ'আত বাজারজাতকরণে প্রয়াস চালায়। বলা হয় অমুক বড় বুজুর্গ এ কাজ করেছেন, তিনি অনেক বড় বড় আলেম, অলিয়ে কামেল ছিলেন সুতরাং এ কাজ জায়েজ হওয়ার এটাই বড় দলিল (!)। কথিত বুজুর্গের বাহারী টাইটলের আবর্তে অবুঝ শিশুর ন্যায় কিছু লোক ব্যাকুল হয়ে যায়। অতএব, হে মহান রাব্বুল আলামীন আমাদের সবাইকে সমাজে প্রচলিত বিদ'আত হতে হেফাজত করুন এবং কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ অনুযায়ী সঠিক দ্বীন বুঝার তৌফিক দিন, আমীন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ – বিদ'আতের অপকারিতা

অবশ্যই রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুহব্বত ঈমানের অঙ্গ। আর সব ধরনের মুহাব্বতেই আবেগ থাকে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুহব্বতেও থাকবে। কিন্তু সেই

আবেগ যেন মুহব্বতের নীতিমালা লংঘন না করে। সেই আবেগভরা মুহাব্বত যেন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদর্শ ও সুন্নাহর বিরুদ্ধে ব্যবহৃত না হয়। যদি এমনটি হয় তাহলে বুঝতে হবে যে, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুহাব্বতের নামে শয়তান তাকে ধোকায় ফেলেছে। অতএব, আর যে কাজের চাহিদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে বিদ্যমান ছিল কোনো প্রকার প্রতিবন্ধকতার অস্তিত্ব ছাড়াই, অথচ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই কাজটি করেননি, তবে এমন কাজের উদ্ভাবন করা আল্লাহর দ্বীন কে পরিবর্তন করে দেয়, কেননা তাতে যদি কোন কল্যাণ থাকত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা করতেন এবং তার ব্যাপারে উৎসাহিত করতেন, আর যখন তিনি তা করেননি এবং সে ব্যাপারে উৎসাহিত করেননি, তখন বুঝা যায় যে, তাতে কোনো কল্যাণ নেই, বরং তা নিকৃষ্ট ও মন্দ বিদ'আত। তার দৃষ্টান্ত হল দুই ঈদের সালাতের পূর্বে আযান দেওয়া, কেননা, যখন কোনো কোনো সম্রাট তার উদ্ভাবন করে, তখন আলেমগণ তার প্রতিবাদ করেছিলেন এবং তারা তাকে মাকরুহ তথা হারাম বলে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। যদি তার বিদ'আত হওয়াটাই মাকরুহ তথা হারাম হওয়ার দলিল না হত, তাহলে বলা যেতো যে, এটা আল্লাহ ত্বআলার যিকির এবং মানুষকে আল্লাহ ত্বআলার ইবাদতের দিকে আহ্বান করা; সুতরাং তাকে জুমআর আযানের উপর কিয়াস করা যাবে কিংবা এটাও বলা যেতো যে এটাকে (দুই ঈদের সালাতের পূর্বে আযান দেওয়ার বিষয়টিকে) ব্যাপক নির্দেশসমূহের অন্তর্ভুক্ত

করা যায়, যেমন আল্লাহ তাআলার বাণী, আর তোমরা বেশি বেশি আল্লাহকে স্মরণ কর। অনুরূপ আল্লাহ তাআলার অপর ব্যাপক বাণী,
 وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ

“আর তার চেয়ে কার কথা উত্তম, যে আল্লাহর দিকে আহ্বান জানায়..।”^{১৬২} কিন্তু আলেমগণ এটা বলেননি, বরং তারা বলেছেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে কাজ করেছেন তা যেমন সুন্নাত তেমনিভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো কাজের চাহিদা থাকা ও প্রতিবন্ধক না থাকা সত্ত্বেও যদি তা পরিত্যাগ করেন তবে সে কাজ পরিত্যাগ করাটাও সুন্নাত। কারণ, যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমআর সালাতের ক্ষেত্রে আযানের নির্দেশ দিয়েছেন আর তিনি দুই ঈদের সালাতের জন্য নির্দেশ দেননি, তখন দুই ঈদের সালাতের জন্য আযান পরিত্যাগ করাটাই সুন্নাত। আর কারও অধিকার নেই যে, সে তা বৃদ্ধি করবে এবং বলবে- এটা সৎ আমলের বৃদ্ধি, তার বৃদ্ধিতে কোন ক্ষতি হবে না; কারণ তাকে বলা হবে, এভাবে রাসূলদের দ্বীন সমূহ বিকৃত হয়েছে এবং তাঁদের শরীআতসমূহ পরিবর্তন হয়ে গেছে; সুতরাং দীনের মধ্যে যদি বৃদ্ধি করাটা বৈধ হয়, তাহলে ফজরের সালাত চার রাকাত এবং যোহরের সালাত ছয় রাকাত আদায় করা বৈধ হবে, আর বলা হবে- এটা সৎ আমলের বৃদ্ধি, তার বৃদ্ধিতে কোনো ক্ষতি হবে না; কিন্তু কারও জন্য এ কথা বলার অধিকার নেই; কেননা, বিদ’আত প্রবর্তনকারী যে কল্যাণ ও ফযিলতের কথা ব্যক্ত করে, যদি তা নবী

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়ে সাব্যস্ত হত এবং তা সত্ত্বেও তিনি তা না করতেন, তাহলে এই ধরনের কাজ পরিত্যাগ করা সুন্নাত, যা প্রত্যেক ব্যাপক নির্দেশ ও কিয়াসের উপর অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত। অতএব, যে ব্যক্তি তার প্রতি আমল করবে এ বিশ্বাস করে যে, তা দীনের মধ্যে অনুমোদিত নয়, সে ফাসিক অবাধ্য বলে বিবেচিত হবে, বিদ'আত কারী হিসেবে বিবেচিত হবে না; পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তার প্রতি আমল করবে এই বিশ্বাস করে যে, তা দীনের মধ্যে অনুমোদিত বিষয়, সে ফাসিক ও বিদ'আত কারী হিসেবে ধর্তব্য হবে। কারণ, ফিসক বা অবাধ্যতা বিদআতের চেয়েও ব্যাপক; কেননা প্রত্যেক বিদ'আত ই ফিস্ক বা অবাধ্যতা, কিন্তু প্রত্যেক ফিস্ক বা অবাধ্যতাই বিদ'আত নয়। অনুরূপভাবে এটাও বলা হয় যে, বিদ'আত ফিস্ক তথা অবাধ্যতার চেয়ে নিকৃষ্ট; কারণ, যে ব্যক্তি বিদ্বআতপূর্ণ কাজ করে, সে রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে, যদি তার ধারণায় বিদআতের মাধ্যমে সে তাঁকে সম্মান করেছে, কারণ সে মনে করে যে, তার প্রবর্তিত এ বিদ'আত সুন্নাতের চেয়ে উত্তম ও সঠিক হওয়ার অধিক যুক্তিযুক্ত। এভাবে সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধী বলে গণ্য হবে; কারণ শরীআত যা অপছন্দ করেছে এবং যা থেকে নিষেধ করেছে, সে তাকে উত্তম মনে করেছে; আর তা হল দীনের মধ্যে নতুন কিছু প্রবর্তন করা; অথচ আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের জন্য এমন ইবাদত বিধিবদ্ধ করেছেন, যা তাদের জন্য যথেষ্ট, তাদের দ্বীন হিসেবে পরিপূর্ণ এবং তাদের প্রতি তাঁর প্রদত্ত নিয়ামত হিসেবে সম্পূর্ণ, যেমনটি

তিনি তাঁর মর্যাদাপূর্ণ কিতাবের মধ্যে জানিয়ে দিয়েছেন, যেখানে তিনি বলেনঃ আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করলাম এবং তোমাদের উপর আমার নেয়ামত সম্পূর্ণ করলাম^{১৬০}। সুতরাং পরিপূর্ণতার উপর বৃদ্ধি করা এক ধরনের ত্রুটি এবং অতিরিক্ত আঙুলের মতই বেমানান।

আর সুনির্দিষ্ট নীতিমালায় হকপন্থীদের মতে, ইবাদতের ভাল ও মন্দ জানা যাবে কেবল শরীয়তের মাধ্যমে, আকল বা যুক্তির মাধ্যমে নয়; সুতরাং এমন প্রত্যেকটি কাজ, যা করার ব্যাপারে শরীয়তে নির্দেশনা রয়েছে, তা উত্তম কাজ; আর এমন প্রত্যেকটি কাজ, যা করার ব্যাপারে শরীয়তে নিষেধ করা রয়েছে, তা মন্দ কাজ।

অতএব, এ কথা তো মুসলিমদের কাছে দিবালোকের মত স্পষ্ট যে, খৃষ্টানরা বিদআতী কাজ-কর্ম করে ও তাদের নবীর মুহব্বতে বাড়াবাড়ি করে পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে। এ কথা যেমন আল-কুরআনে এসেছে, তেমনি হাদীসেও আলোচনা করা হয়েছে।

আমি অতি সংক্ষেপে এখানে বিদআতের কতিপয় পরিণাম সম্পর্কে আলোচনা করছিঃ

(১) বিদআত মানুষকে পথভ্রষ্ট করেঃ নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা উম্মতের জন্য নিয়ে এসেছেন তা হল হক্ক। এ ছাড়া যা কিছু ধর্মীয় আচার হিসাবে পালিত হবে তা পথভ্রষ্টতা। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেনঃ হক্ক আসার পর বিভ্রান্তি ব্যতীত আর কি

থাকে?’^{১৬৪} রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: সকল ধরনের বিদ’আত পথভ্রষ্টতা^{১৬৫}।

(২) বিদ’আত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্য থেকে মানুষকে বের করে দেয় এবং সুন্নাতের বিলুপ্তি ঘটায়ঃ কেননা বিদ’আত অনুযায়ী কেউ আমল করলে অবশ্যই সে এক বা একাধিক সুন্নাত পরিত্যাগ করে। উলামায়ে কিরাম বলেছেনঃ যখন কোন দল সমাজে একটা বিদআতের প্রচলন করে, তখন সমাজ থেকে কম করে হলেও একটি সুন্নাত বিলুপ্ত হয়ে যায়।” আর এটা অভিজ্ঞতায় প্রমাণিত যে, যখনই কোন বিদ’আত আমলে আনা হয়েছে তখনই সেই স্থান থেকে একটি সুন্নাত চলে গেছে বা গুরুত্বহীন হয়ে পড়েছে। এ প্রসঙ্গে মুজাদ্দিদ আলফেসানীর মাকতুবাতে থেকে উদ্ধৃতি দেয়া যায়। তিনি লিখেছেনঃ এক ব্যক্তি আমাকে প্রশ্ন করল ‘আপনারা বলেছেন: যে কোন বিদ’আত নাকি একটি সুন্নাতকে বিলুপ্ত করে। আচ্ছা, যদি মৃত ব্যক্তিকে কাফনের সাথে একটি পাগড়ী পড়িয়ে দেয়া হয় তাহলে কোন সুন্নাতটি বিলুপ্ত হয়? কি কারণে এটা বিদ’আত বলা হবে? আমি জবাবে লিখলাম: অবশ্যই একটি সুন্নাত বিলুপ্ত হয় যদি মৃতের কাফনে পাগড়ী দেয়া হয়। কারণ পুরুষের কাফনের সুন্নাত হল কাপড়ের সংখ্যা হবে তিন। পাগড়ী পড়ালে এ সংখ্যা আর তিন থাকেনা, সংখ্যা দাড়ায় চার। অতএব, এটি বিদ’আত ব্যতীত আর কিছুই হতে পারে না। উদাহরণ হিসাবে আরো বলা যায়,

^{১৬৪} সূরা ইউনুস, ৩২

^{১৬৫} মুসলিম, ইবনে মাজাহ

এক ব্যক্তি ঋণগ্রস্থ হয়ে পড়ল। ঋণ পরিশোধ করতে পারছে না। এ সমস্যার জন্য এক পীর সাহেবের কাছে গেল। পীর সাহেব তাকে বললেন, তুমি এক খতম কুরআন বখশে দাও অথবা নির্দেশ দিলেন একটা মীলাদ দাও বা খতমে ইউনূসের ব্যবস্থা কর। সে তাই করল। ফলাফল কি দাড়াল? ঋণ পরিশোধে অক্ষম ব্যক্তির জন্য একটি দুআ রয়েছে যা আমল করা সুন্নাত।

বিদ'আত অনুযায়ী 'আমল করার কারণে সে সেই সুন্নাতটি পরিত্যাগ করল। জানার চেষ্টা করলনা যে, এ ক্ষেত্রে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি ব্যবস্থা দিয়ে গেছেন। অন্যদিকে সে মীলাদ, কুরআন খতম ইত্যাদি বিদআতী কাজ করে আরও আর্থিক ঋণভারে জর্জরিত হলো। রামাযানের শেষ দশ দিনের রাতসমূহে রাত জেগে ইবাদাত-বন্দেগী করা একটি গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত, যা কেউ অস্বীকার করতে পারে না। কিন্তু ১৫ শাবানে রাত জাগাকে যেমন গুরুত্ব দেয়া হয় তেমনভাবে এ সুন্নাতী আমলের প্রচলন দেখা যায় না বরং শবে কদরের মূল্যায়ন শবে বরাতকে করা হচ্ছে। ফরয সালাত আদায়ের পর সর্বদা জামাতবদ্ধ হয়ে মুন্সাজাত করা একটি বিদ'আত। এটা আমল করার কারণে ফরয সালাত আদায়ের পর যে সকল যিকর-আযকার সুন্নাত হিসাবে বর্ণিত আছে তা পরিত্যাগ করা হয়। আপনি দেখবেন এভাবে প্রতিটি বিদ'আত একটি সুন্নাতকে অপসারিত করে উহার স্থান দখল করে নিয়েছে।

(৩) বিদ'আত আল্লাহর দ্বীনকে বিকৃত করেঃ এর জ্বলন্ত উদাহরণ আজকের খৃষ্টান ধর্ম। তারা ধর্মের বিদ'আত প্রচলন করতে করতে

এর মূল কাঠামো পরিবর্তন করে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে পথভ্রষ্ট হিসাবে অভিহিত হয়েছে। তাদের বিদ'আত প্রচলনের কথা আল-কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছেঃ আর সন্ধ্যাসবাদ! ইহাতো তারা নিজেরাই আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় প্রচলন করেছিল। আমি তাদের এ বিধান দেইনি।^{১৬৬}

সন্ধ্যাসবাদ তথা বৈরাগ্যবাদের বিদ'আত খৃষ্টানেরা তাদের ধর্মের প্রবর্তন করেছে। তাদের উদ্দেশ্য ভাল ছিল; উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহর সন্তুষ্টি। কিন্তু ভাল উদ্দেশ্য নিয়ে নিজেদের ইচ্ছামত যে কোন কাজ করলেই তা গ্রহণযোগ্য হয় না। এ জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুমোদন প্রয়োজন। এভাবে যারা ধর্মের বিদআতের প্রচলন করে তাদের অনেকেরই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ভাল থাকে। কিন্তু তাতে নাজাত পাওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। ইয়াহুদী ও খৃষ্টানেরা তাদের ধর্মের অন্য জাতির রসম-রেওয়াজ ও বিদ'আত প্রচলন করে ধর্মকে এমন বিকৃত করেছে যে, তাদের নবীগণ যদি আবার পৃথিবীতে ফিরে আসেন তাহলে তাদের রেখে যাওয়া ধর্ম তাঁরা নিজেরাই চিনতে পারবেন না। ঠিক তেমনিভাবে আমাদের মুসলিম সমাজে শিয়া সম্প্রদায় বিদআতের প্রচলন করে দ্বীন ইসলামকে কিভাবে বিকৃত করেছে তা নতুন করে বর্ণনা করার প্রয়োজন নেই।

(৪) বিদ'আত ইসলামের উপর একটি আঘাতঃ যে ইসলামে কোন বিদ'আতের প্রচলন করল সে মূলতঃ অজ্ঞ লোকদের মত এ কথা

স্বীকার করে নিল যে, ইসলাম পরিপূর্ণ জীবন বিধান নয়, তাতে সংযোজনের প্রয়োজন আছে। যদিও সে মুখে এ ধরনের বক্তব্য দেয় না, কিন্তু তার কাজ এ কথার স্বাক্ষর দেয়। অথচ আল্লাহ রাসূলু আলামীন বলেন: আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম^{১৬৭}।

(৫) বিদ'আত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে খিয়ানাতের এক ধরনের অভিযোগঃ যে ব্যক্তি কোন বিদআতের প্রচলন করল বা আমল করল আপনি তাকে জিজ্ঞেস করুন - এ কথা বা কাজটি যে ইসলাম ধর্মের পছন্দের বিষয় এটা কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানতেন? তিনি উত্তরে হ্যাঁ অথবা না বলবেন। যদি না বলেন তাহলে তিনি স্বীকার করে নিলেন যে, ইসলাম সম্পর্কে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কম জানতেন। আর যদি হ্যাঁ বলেন তাহলে তিনি স্বীকার করে নিলেন যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিষয়টি জানতেন, কিন্তু উম্মাতের মধ্যে প্রচার করেননি। এ অবস্থায় তিনি তাবলীগে শিথিলতা করেছেন। (নাউযুবিল্লাহ!)

(৬) বিদ'আত মুসলিম উম্মাহকে বিভক্ত করে ও ঐক্য সংহতিতে আঘাত করেঃ বিদ'আত মুসলিম উম্মাহর মধ্যে শত্রুতা ও বিবাদ-বিচ্ছেদ সৃষ্টি করে তাদের মারামারি হানাহানিতে লিপ্ত করে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় যে, একদল লোক মীলাদ বা মীলাদুন্নবী পালন করল। আরেক দল বিদ'আত হওয়ায় তা বর্জন বা বিরোধিতা

করল। যারা এটা পালন করল তারা প্রচার করতে লাগল যে, অমুক দল আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মদিনে আনন্দিত হওয়া পছন্দ করে না। তাঁর গুণ-গান করা তাদের কাছে ভাল লাগেনা। তাদের অন্তরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুহাব্বত নেই। যাদের অন্তরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুহাব্বত নেই তারা বেঈমান, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দুশমন। আর এ ধরনের প্রচারণায় তারা দুটি দলে বিভক্ত হয়েএকে অপরের দুশমানে পরিণত হয়ে হানাহানিতে লিপ্ত হয়ে পড়ল। এভাবে ইসলামের প্রাথমিক যুগ থেকেই বিদ'আত কে গ্রহণ ও বর্জনের প্রশ্নে মুসলিম উম্মাহ শিয়া ও সুন্নি এবং পরবর্তী কালে আরো শত দলে বিভক্ত হয়ে গেল। কত প্রাণহানির ঘটনা ঘটল, রক্তপাত হল। তাই মুসলিম উম্মাহকে আবার একত্র করতে হলে সকলকে কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর দিকে আহ্বান ও বিদ'আত বর্জনের জন্য অহিংস ও শান্তিপূর্ণপন্থায় পরম ধৈর্যের সাথে আন্দোলন করতে হবে। আন্দোলন করতে হবে সকল মানুষ ও মানবতার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসা প্রদর্শন করে। কারো অনুভূতিতে আঘাত লাগে এমন আচরণ করা যাবে না। এ বিশ্বাস রাখতে হবে যে, যা হক ও সত্য তা-ই শুধু টিকে থাকবে। আর যা বাতিল তা দেরীতে হলেও বিলুপ্ত হবে।

(৭) বিদ'আত আমলকারীর তাওবা করার সুযোগ হয় নাঃ বিদ'আত যিনি প্রচলন করেন বা সেই অনুযায়ী 'আমল করেন তিনি এটাকে এক মহৎ কাজ বলে মনে করেন। তিনি মনে করেন এ কাজে

আল্লাহ তাআলা সন্তুষ্ট হবেন। যেমন আল্লাহ খৃষ্টানদের সম্পর্কে বলেছেন তারা ধর্মের বৈরাগ্যবাদের বিদ'আত চালু করেছিল আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য। যেহেতু বিদআতে লিগু ব্যক্তি বিদ'আত কে পাপের কাজ মনে করেন না, তাই তিনি এ কাজ থেকে তাওবা করার প্রয়োজন মনে করেন না এবং তাওবা করার সুযোগও হয় না। অন্যান্য পাপের বেলায় কমপক্ষে যিনি পাপে লিগু হন তিনি এটাকে অন্যায় মনে করেই করেন। পরবর্তীতে তার অনুশোচনা আসে, এক সময় তাওবা করে আল্লাহ তা'আলার ক্ষমা লাভ করেন। কিন্তু বিদ'আতে লিগু ব্যক্তির এ অবস্থা কখনো হয় না।

(৮) বিদ'আত প্রচলনকারী রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শাফাআত পাবে নাঃ রাহমাতুল্লিল আলামীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর গুনাহগার উম্মাতের শাফায়াতের ব্যাপারে হাশরের ময়দানে খুব আগ্রহী হবেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে অনুমতি লাভ করার পর তিনি বহু গুনাহগার বান্দা-যাদের জন্য শাফাআত করতে আল্লাহ তাআলা অনুমতি দিবেন- তাদের জন্য শাফাআত করবেন। কিন্তু বিদ'আত প্রচলনকারীর জন্য তিনি শাফাআত করবেন না। সাহল ইবনে সা'দ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى السَّحَابِ مَنْ وَرَدَ شَرِبَ وَمَنْ شَرِبَ لَمْ يَظْمَأْ أَبَدًا وَلَيُرَدَّنَّ عَلَيَّ
(أَقْوَامٌ أَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُونِي، ثُمَّ يُحَالُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ). (متفق عليه)

অর্থঃ আমি তোমাদের আগেই হাউজে কাউসারে থাকব। যে পানি পান করতে চাইবে আমি তাকে পান করাব, আর যে পান করবে সে

কখনো পিপাসিত হবে না। আমার সামনে এক জামাতকে আনা হবে তারা আমাকে চিনবে আমিও তাদের চিনব কিন্তু পরস্পরেই তাদের মাঝে ও আমার মাঝে অন্তরায় সৃষ্টি হয়ে যাবে^{১৬৮}।

অন্য রেওয়াজাতে আছে, অতঃপর আমি বলব তারা আমার দলের। বলা হবে আপনি জানেন না, তারা আপনার অবর্তমানে কি বিদ'আত সৃষ্টি করেছে। তখন আমি বলব, দূর হও, দূর হও, যারা আমার পর দ্বীনের মাঝে বিদ'আত সৃষ্টি করেছে^{১৬৯}। আব্দুল্লাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তখন বলবেনঃ

يَا رَبِّ أَصْحَابِي أَصْحَابِي فَيَقَالُ : إِنَّكَ لَا تَذَرِي مَا أَحَدْتُوا بَعْدَكَ. (متفق عليه)

অর্থঃ হে রব! তারা আমার দল, তারা আমার দল! জবাব দেয়া হবে, আপনি জানেন না তারা আপনার পর কি নতুন জিনিস সৃষ্টি করেছে^{১৭০}। আসমা বিনতে আবি বকর (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ

إِنِّي عَلَى الْحَوْضِ حَتَّى أَنْظُرَ مَنْ يَرِدُ عَلَيَّ مِنْكُمْ وَسَيُؤْخَذُ نَاسٌ دُونِي فَأَقُولُ يَا رَبِّ مِنِّي وَمِنْ أُمَّتِي فَيَقَالُ هَلْ شَعَرْتَ مَا عَمِلُوا بَعْدَكَ وَاللَّهِ مَا بَرِحُوا يَرْجِعُونَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ فَكَانَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ أَنْ تَرْجِعَ عَلَى أَعْقَابِنَا أَوْ تُفْتِنَ عَنْ دِينِنَا. (متفق عليه)

অর্থঃ আমি হাউজে কাউসারের পাড়ে দাঁড়িয়ে দেখব তোমাদের থেকে কারা কারা আসছে। কিন্তু একদল লোককে আমার কাছে আসতে দেয়া হচ্ছে না, তখন আমি বলবঃ হে রব! তারা আমার

১৬৮ বুখারী : ৭/২৬৪ ও মুসলিম : ২২৯০

১৬৯ বুখারী : ৬৫৮৩

১৭০ বুখারী : ৬৫৮৫ ও মুসলিম : ২২৯৫

দলের, তারা আমার উম্মত। তখন বলা হবে : আপনি কি জানেন তারা আপনার পর কোন নতুন জিনিস এর উপর আমল করেছে? আল্লাহর কসম! তারা আপনার দ্বীনকে প্রত্যাখ্যান করেছে। এজন্যে ইবনু আবি মুলাইকা রহ. দুআ করতেন, হে আল্লাহ! পূর্বের অবস্থায় ফিরে যাওয়া ও দ্বীনের মাঝে ফিতনা সৃষ্টি করা থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাই^{১৭১}।

(৯) বিদ'আত মুসলিম সমাজে কুরআন ও হাদীসের গুরুত্ব কমিয়ে দেয়ঃ কুরআন ও সুন্নাহ হল মুসলিম উম্মাহ ও ইসলামের রক্ষা কবচ। ইসলাম ধর্মের অস্তিত্বের একমাত্র উপাদান। তাইতো বিদায় হজ্জেও নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ আমি তোমাদের জন্য দুটি জিনিস রেখে যাচ্ছি যতক্ষণ তোমরা তা আঁকড়ে রাখবে ততক্ষণ বিভ্রান্ত হবে না। বিদ'আত অনুযায়ী আমল করলে কুরআন ও সুন্নাহর মর্যাদা মানুষের অন্তর থেকে কমে যায়।^{১৭২} যে কোন নেক আমল কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত হতে হবে এ অনুভূতি মানুষের অন্তর থেকে ধীরে ধীরে লোপ পেতে থাকে। তারা কুরআন ও হাদীসের উদ্ধৃতি বাদ দিয়ে বিভিন্ন ব্যক্তি, পীর-মাশায়েখ ও ইমামদের উদ্ধৃতি দিয়ে থাকে।

(১০) বিদ'আত প্রচলনকারী অহংকারের দোষে দুষ্ট হয়ে পড়ে ও নিজেদের ব্যবসায়িক স্বার্থে দ্বীনকে ব্যবহার ও বিকৃত করতে চেষ্টা করেঃ বিদ'আত প্রচলনকারী তার নিজ দলের একটি আলাদা কাঠামো দাঁড় করিয়ে ব্যবসায়িক বা আর্থিক সুবিধা লাভের জন্য

^{১৭১} বুখারী : ৬৫৯৩ ও মুসলিম : ২২৯৩

এমন কাজের প্রচলন করে থাকে যা সাধারণ মানুষের মধ্যে ধর্মীয় রূপ লাভ করলেও কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা সমর্থিত হয় না। কারণ সেই কাজটা যদি কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা সমর্থিত হয় তাহলে তার দলের আলাদা কোন বৈশিষ্ট্য থাকে না। কেননা কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত আমল সকল মুসলিমের জন্যই প্রযোজ্য। পাঠক ভাই ও বোনেরা! যে ব্যক্তি উপরোক্ত আলোচনা বুঝতে সক্ষম হবেন, আমার মনে হয় সে ব্যক্তি নিজেকে বিদ'আত ও তার ভয়াবহত হতে রক্ষার্থে এখন থেকে যাচাই বাছাই করে পথ চলবেন। যাতে করে অসতর্কতা বশতঃ বিদ'আতের মধ্যে জড়িয়ে না যান। যে আমলই আমরা করি না কেন তা যাচাই বাছাই করেই করা উচিত। কারণ হতে পারে বহু আমল আমার, আপনার জীবনের সাথে জড়িয়ে আছে যেগুলো দুর্বল বা বানোয়াট হাদীসের উপর নির্ভরশীল। রসূল (সাঃ) এর নিম্নোক্ত বাণী কোন ব্যক্তির ভুলে যাওয়া ঠিক হবে নাঃ আমার এ নির্দেশের মাঝে যে ব্যক্তি এমন কিছু নবাবিস্কার করবে যা তার অন্তর্ভুক্ত ছিল না, তা পরিত্যজ্য^{১৭২}। তিনি আরও বলেন : যে ব্যক্তি এমন আমল করল যার উপর আমার কোন নির্দেশ নেই সে আমলটি অগ্রহণযোগ্য^{১৭৩}। অতএব আমরা কার স্বার্থ রক্ষার্থে তথাকথিত হুজুরদের ধোঁকায় পড়ে নবী (সাঃ) হতে সহীহ সনদে বর্ণিত হাদীসগুলো ছেড়ে দিয়ে নিজেদেরকে বিপদগামী করব? আসুন! আমরা রাসূল (সাঃ) এ শাফায়াত প্রাপ্তির প্রত্যাশায়

১৭২ বুখারী হা/২৬৯৭ ; মুসলিম হা/৩২৪২; আবু দাউদ হা/৩৯৯০ ; ইবনু মাজাহ হা/১৪

১৭৩ মুত্তাফাকুন আলাইহি হা/৩২৪৩।

নিজেদেরকে তাঁর সহীহ সুন্নাহমুখী করি। আর অনুধাবন করি নিম্নোক্ত হাদীসটি। কারণ একমাত্র তাঁর সহীহ সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরার বিষয়টি যে কত বড় গুরুত্বপূর্ণ এটি তারই প্রমাণ বহন করছে: রাসূল (সাঃ) বলেছেনঃ সেই সত্তার কসম যার হাতে আমার আত্মা যদি মূসা (আঃ) জীবিত থাকতেন তাহলে আমার অনুসরণ করা ছাড়া তার আর কোন সুযোগ ছিল না^{১৭৪}। সুতরাং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রের সার্বিক কল্যাণ একমাত্র রাসূল (সাঃ) এর আদর্শের মধ্যেই আমাদেরকে খুঁজে নিতে হবে। আসুন! আমরা জাল ও যুগ্মফ হাদীসগুলো জানি এবং তথাকথিত হুজুরদের জাল ও যুগ্মফ হাদীস নির্ভর ফতোয়া ও আক্বীদাহ হতে নিজেদেরকে মুক্ত করি। আল্লাহ আমাদের সবাইকে তাঁর ও তাঁর নবীর যথাযথ অনুসরণ করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ - দ্বীনের মধ্যে বিদ'আতের বিধান

দ্বীনের ব্যাপারে সকল প্রকার বিদ'আত ই হারাম ও গোমরাহী। কেননা রাসূল (সাঃ) বলেছেন,

وَأَيُّكُمْ وَمُحَدَّثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحَدَّثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ

অর্থঃ তোমরা দ্বীনের মাঝে নতুন বিষয় আবিষ্কার করা থেকে বিরত থাকবে, কেননা প্রত্যেক নতুন বিষয়ই বিদ'আত। আর প্রতিটি বিদআতের পরিণাম গোমরাহী বা ভ্রষ্টতা। রাসূল (সাঃ) আরও বলেন,

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ

অর্থঃ যে ব্যক্তি আমাদের দ্বীনের মধ্যে এমন নতুন বিষয় তৈরী করবে, যা তার অন-গত নয়, তা প্রত্যাখ্যাত হবে। তিনি আরও বলেন,

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

অর্থঃ যে ব্যক্তি এমন কোন আমল করবে, যার মধ্যে আমাদের আদেশ নেই, তা আমলকারীর উপর প্রত্যাখ্যাত হবে।

উপরের হাদীসগুলোর মাধ্যমে এটাই প্রমাণিত হয় যে, দ্বীনের মধ্যে প্রতিটি নতুন বিষয়ই বিদ'আত। আর প্রতিটি বিদ'আত ই হারাম ও গোমরাহী। তবে এ হারাম বিদআতের প্রকারভেদ অনুযায়ী বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। বিদআতের কিছু কিছু প্রকার প্রকাশ্য কুফরীরই নামান্তর। যেমন কবরবাসীদের নৈকট্য হানিসলের উদ্দেশ্যে কবরের চতুর্দিকে কাবা ঘরের তাওয়াফের ন্যায় তাওয়াফ করা, কবরের উদ্দেশ্যে পশু যবাই করা, নযর-মান্নত পেশ করা, কবরবাসীর কাছে দুআ করা, তাদের কাছে আশ্রয় চাওয়া ইত্যাদি। এমন কিছু বিদ'আত ও রয়েছে, যা শির্ক না হলেও মানুষকে শির্কের দিকে নিয়ে যায়। যেমন কবরের উপর গম্বুজ তৈরী করা, কবর উঁচু করা, পাকা করা, কবরের উপর লিখা, কবরের কাছে নামায আদায় করা, দুআ করা ইত্যাদি। এমন কিছু বিদ'আত ও আছে, যা শির্ক বা তার মাধ্যমও নয়, তবে সঠিক আকিদার পরিপন্থী ও বহির্ভূত। যেমন খারেজী, ক্বাদরীয়াও মুর্জিয়াদের আকিদাহ সমূহ। তাছাড়া এমন কিছু বিদ'আত রয়েছে, যা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত যেমন বৈরাগী হয়ে সংসার

ত্যাগ করা, সূর্যের উত্তাপে দাড়িয়ে রোজা পালন করা এবং যৌন উত্তেজনা দমন করার জন্য খাসী হয়ে যাওয়া।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ - আমল কবুল হওয়ার শর্ত

কোন আমলই আল্লাহ তাআলার নিকট গ্রহণযোগ্য হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তাতে দু'টি শর্ত পাওয়া না যাবে।

এক. ইখলাসের সাথে ইবাদত করা, অর্থাৎ আমল বা ইবাদত একমাত্র আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য করা। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন :

(إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِغُلَامٍ مِثْلِي مَا تَوَى. (متفق عليه)

অর্থঃ প্রত্যেক কাজ নিয়তের উপর নির্ভরশীল। মানুষ যে নিয়ত করবে তাই পাবে^{১৫}।

দুই. সুন্নাতের অনুসরণ অর্থাৎ ইবাদতে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সুন্নাতের পূর্ণ অনুসরণ। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন :

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ. مسلم

অর্থঃ যে ব্যক্তি আমাদের পক্ষ থেকে স্বীকৃত নয় এমন কোন আমল করল, তা প্রত্যাখ্যাত হবে^{১৬}।

সুতরাং যার ঈমান ও আমল একমাত্র আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য এবং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সুন্নাত মোতাবেক হবে, তার সে আমল আল্লাহ তাআলার নিকট গ্রহণযোগ্য

১৫. বুখারী : ১ ও মুসলিম : ১৯০৭

১৬ মুসলিম : ১৭১৮

হবে। আর যদি এ দু'টি শর্ত বা কোন একটি পাওয়া না যায়, তাহলে তা প্রত্যাখ্যাত হবে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

وَقَدْ مَنَّا إِلَىٰ مَاعْمَلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مُنْتَوَرًا (الفرقان)

অর্থঃ আমি তাদের কর্মগুলোর প্রতি মনোনিবেশ করব, অতঃপর তা বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত করে দেব^{১৭৭}। এ দু'টো বিষয়ই আল্লাহ তা'আলার নিম্নোক্ত বাণীতে সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে।

وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ . النساء

অর্থঃ যে আল্লাহর উদ্দেশ্যে আত্মসমর্পণ করে ও সৎ কর্ম করে, তার অপেক্ষা কার ধর্ম উৎকৃষ্ট^{১৭৮}? আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র ইরশাদ করেনঃ
بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ . (البقرة)

অর্থ : অবশ্য যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য নিজেকে সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করেছে এবং সৎ কর্মশীল হয়েছে, তার জন্য স্বীয় রবের নিকট প্রতিদান রয়েছে এবং তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তিত হবে না^{১৭৯}। উমর (রাঃ) বর্ণিত

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

অর্থঃ "প্রতিটি কাজ নিয়তের উপর নির্ভরশীল" হাদীসটি আন্তরিক আমল বা কার্যাবলীর মানদণ্ড। আর উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত,

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ

১৭৭ ফুরকান : ২৩

১৭৮ ফুরকান : ২৩

১৭৯ সূরা বাকারা : ১১২

অর্থঃ "যে ব্যক্তি আমাদের পক্ষ থেকে স্বীকৃত নয় এমন কোন আমলের প্রচলন করল, তা প্রত্যাখ্যাত হবে"। হাদীসটি বাহ্যিক আমল বা কার্যাবলীর মানদণ্ড।

এ দু'টি হাদীসের মধ্যে দ্বীনের সকল বিষয় তথা মৌলিক ও শাখা-প্রশাখা বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ সকল কথা বা কাজ সম্পর্কে দিক নির্দেশনা রয়েছে।

ইমাম নববী (রহ.) আয়েশা (রাঃ) এর হাদীসের উপর একটি মূল্যবান কথা বলেছেন। তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বাণী :

مَنْ أَخَذَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ

অর্থঃ "যে ব্যক্তি আমাদের পক্ষ থেকে স্বীকৃত নয় এমন কোন আমলের প্রচলন করল, তা প্রত্যাখ্যাত হবে"। দ্বিতীয় বর্ণনায় এসেছে,

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

অর্থঃ "যে ব্যক্তি আমাদের পক্ষ থেকে স্বীকৃত নয় এমন কোন আমল করল, তা প্রত্যাখ্যাত হবে"। হাদীসদ্বয়ে উল্লেখিত শব্দ সম্পর্কে আরবগণ বলেনঃ الرد শব্দটা এখানে مردود তথা প্রত্যাখ্যাত অর্থে।

যার প্রকৃত অর্থ হচ্ছেঃ যে আমল রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পক্ষ থেকে অনুমোদিত নয় তা বাতিল, প্রত্যাখ্যাত ও অগ্রহণযোগ্য। এ হাদীসটি ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ একটি উসূল বা মূলনীতি। এর মাধ্যমে সকল প্রকারের বিদআত, নব আবিষ্কৃত ও বানোয়াট বিষয়াবলীর মূলোৎপাটন করা হয়েছে। তবে আয়েশার

(রাঃ) বর্ণনা দু'টির প্রথমটিতে **من عمل** ও দ্বিতীয়টিতে **من أحدث** শব্দ এসেছে। এ হাদীসদ্বয়ের মাধ্যমে সকল প্রকার বিদ'আত কে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যেমন, কেউ পূর্ব প্রবর্তিত বিদ'আত অনুযায়ী আমল করল কিন্তু সে নিজে এর প্রবর্তক নয়, তাহলে তাকে দ্বিতীয় হাদীসের আওতাভুক্ত বলা হবে। মোট কথা সকল প্রকার বিদ'আত চাই সেটা আমল করা হোক বা প্রবর্তন করা হোক, সবই পথভ্রষ্টতার শামিল ও প্রত্যাখ্যাত^{১৮০}।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ - সুন্নাহ আঁকড়ে ধরা এবং বিদ'আত থেকে সতর্ক থাকা ওয়াজিব

সাপ্তাহিক উর্দু পত্রিকা (ইদারাত) এ প্রকাশিত একটি প্রবন্ধ দেখতে পেলাম যা ভারতের উত্তর প্রদেশের একটি শিল্প এলাকা কানপুর থেকে প্রকাশিত হয়। এর প্রথম পৃষ্ঠার বিষয়বস্তু ছিল: সৌদী আরব ও এর আকীদা আঁকড়ে ধরা এবং বিদ'আত প্রতিরোধের সংগ্রাম করার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলুন। সালাফী আকীদার উপর এ অপবাদ দেওয়া দ্বারা লেখকের উদ্দেশ্য হলো আহলে সুন্নাহের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করা এবং বিদ'আত ও কুসংস্কারের উপর উৎসাহ দেওয়া। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, এটি একটি খারাপ উদ্দেশ্য এবং ভয়ঙ্কর পদক্ষেপ, যার উদ্দেশ্য হলো দ্বীন ইসলামের ক্ষতি করা এবং বিদ'আত ও ভ্রষ্টতা প্রচার করা। তারপর এ লেখাটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের জন্ম দিবস পালনের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে এবং একে কেন্দ্র করেই সৌদী আরবের আকীদা

বাস্তবায়ন সম্পর্কে কথা বলেছে। কাজেই এ বিষয়ে সতর্ক করে দেওয়াটাই ভালো মনে করছি।

সুতরাং আমি বলবঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং অন্য যে কারো জন্ম দিবস পালন করা জায়েয নেই বরং তা নিষেধ করা ওয়াজিব, কারণ তা দ্বীনের মধ্যে একটি নব আবিষ্কৃত বিদ'আত যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো করেননি, তিনি তাঁর নিজের জন্য বা তাঁর পূর্বে মৃত্যুবরণকারী কোনো নবী, তাঁর মেয়েগণ বা স্ত্রীগণ বা তাঁর কোনো আত্মীয়-স্বজন অথবা কোনো সাহাবীর জন্ম দিবস পালন করার নির্দেশ দেননি। এমনকি তাঁর কোনো খালীফায়ে রাশেদ বা সাহাবী রাদিয়াল্লাহু আনহুম অথবা কোনো তাবেঈ এবং স্বর্ণযুগে সুন্নাতে মুহাম্মাদিয়ার কোনো আলেম তা করেননি। অথচ তারাই সুন্নাত সম্পর্কে সকলের চেয়ে বেশী অবগত এবং রাসূলের মহব্বতের ক্ষেত্রে সর্বাত্মক এবং তাদের পরবর্তী লোকদের চেয়ে তাঁর বেশী অনুসরণকারী। যদি তা পালন করা ভালো হতো, তাহলে অবশ্যই তারা আমাদের চেয়ে আগে পালন করতেন।

বিদ'আত কাজগুলোকে মানুষ যদিও সুন্নাত মনে করেই আমল করে থাকে, কিন্তু আসলে তা সুন্নাত নয় বরং সুন্নাতের বিপরীত। যেমনিভাবে শিরক তাওহীদের বিপরীত। বিদ'আত পালন করেও আল্লাহর নৈকট্য এবং সওয়াব আশা করা হয়, যেমনি আশা করা হয় সুন্নাতের অনুসরণের মাধ্যমে। বিদ'আত প্রবণ ব্যক্তিও মনে করেন যে, তিনি রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সুন্নাতই মেনে

চলছেন। মূলতঃ এ কারনেই রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:

(عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ)

“তোমাদের উচিত আমার সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরা এবং আমার সুপথপ্রাপ্ত ন্যায়বান খালীফাদের সুন্নাতকেও। তোমরা তা দৃঢ়ভাবে কামড়ে ধর।”

সুতরাং, উপরোক্ত হাদীসের আলোকে বলা যায় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরার নির্দেশ দিয়েছেন এবং বিদআত সৃষ্টি করা থেকে নিষেধ করেছেন। কারণ ইসলাম একটি পরিপূর্ণ দীন, আল্লাহ তাআলা এবং তার রাসূল যা শরীয়ত হিসাবে দিয়েছেন এবং যা আহলে সুন্নাত ও জামাআত তথা সাহাবা ও তাবেঈগণ গ্রহণ করেছেন তা-ই স্বয়ংসম্পূর্ণ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণ রয়েছে যে, তিনি বলেছেন,

«من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» متفق على صحته

যে ব্যক্তি আমার এ দ্বীনের মধ্যে নতুন কোনো জিনিস আবিষ্কার করবে যা এর অন্তর্ভুক্ত নয় তা প্রত্যাখ্যাত।

অন্য বর্ণনায় এসেছেঃ

«من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد»

যে ব্যক্তি এমন কোনো আমল করবে যা আমার শরীয়ত সমর্থিত নয় তা প্রত্যাখ্যাত। তিনি অন্য হাদীসে আরও বলেনঃ

«عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها
وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل
بدعة ضلالة»

তোমাদের উপর ওয়াজিব হলো: তোমরা আমার সুন্নাতকে আঁকড়ে
ধর এবং আমার পর সুপথ প্রাপ্ত খলীফাদের সুন্নাতকে আঁকড়ে ধর
এবং তা দস্ত দ্বারা দৃঢ়তার সাথে ধারণ কর আর (দ্বীনে) নব রচিত
কর্মসমূহ হতে সাবধান থাক! কেননা প্রতিটি নব রচিত কর্ম হচ্ছে
বিদআত এবং সকল বিদআত হচ্ছে ভ্রষ্টতা এবং তিনি জুমআর
দিন তাঁর খুৎবায় বলেনঃ

«أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه
وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة»

অতঃপর সর্বোত্তম বাণী হলো আল্লাহর কিতাব এবং সর্বোত্তম
হেদায়েত হলো মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর
হেদায়েত আর নিকৃষ্টতর কাজ হলো দ্বীনে নব আবিষ্কৃত কাজ এবং
প্রতিটি বিদআতই ভ্রষ্টতা।

উপরোল্লিখিত হাদীসগুলোতে বিদআত সৃষ্টি করা থেকে সতর্ক করা
হয়েছে যে, তা একটি ভ্রষ্টতা, এবং এর ভয়াবহতা থেকে সকল
উম্মতকে সতর্ক করা হয়েছে এবং এর নিকটবর্তী হওয়া ও এর
উপর আমল করা থেকে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে। এ অর্থে আরো
বহু হাদীস রয়েছে। আল্লাহ তাআলা আরও বলেন,

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ
شَدِيدُ الْعِقَابِ

রাসূল তোমাদের যা দেয় তা গ্রহণ কর, আর যা থেকে সে তোমাদের নিষেধ করে তা থেকে বিরত হও এবং আল্লাহকেই ভয় কর, নিশ্চয় আল্লাহ শাস্তি প্রদানে কঠোর। [সূরা হাশর, ৭]। তিনি আরও বলেনঃ

لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا ۚ قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا ۚ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

অতএব, যারা তাঁর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে তারা এ বিষয়ে সতর্ক হোক যে, তাদেরকে বিপর্যয় স্পর্শ করবে অথবা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তাদেরকে গ্রাস করবে। [সূরা নূর, ৬৩]।

তিনি আরও বলেনঃ

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا
তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জীবনে রয়েছে উত্তম আদর্শ। [সূরা আহযাব/২১]।

তিনি আরও বলেনঃ

وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

আর যারা সর্বপ্রথম হিজরতকারী, আনসার এবং যারা তাদের অনুসরণ করেছে, আল্লাহ সে সকল লোকদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন

এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে। আর তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন সেই জান্নাত যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে নদীসমূহ। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। এটাই হলো মহা কৃতকার্যতা। [সূরা তাওবা/১০০]। তিনি আরও বলেনঃ

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ۚ
আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করলাম,
তোমাদের উপর আমার নেয়ামতকে সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে
দ্বীন হিসাবে তোমাদের জন্য মনোনীত করলাম। [সূরা মায়েরা/৩]

এ সকল আয়াত স্পষ্ট প্রমাণ করে যে, আল্লাহ তাআলা এ উম্মতের জন্য দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন এবং তার নেয়ামতকে তাদের উপর সম্পন্ন করেছেন। তিনি তার নবীকে মৃত্যুদান করেননি যতক্ষণ না তিনি স্পষ্টভাবে উম্মতের নিকট তা পৌঁছিয়েছেন এবং আল্লাহ যা শরীয়ত করেছেন তা তাদের জন্য বর্ণনা করেছেন, চাই তা কথা হোক বা কাজ হোক এবং এও স্পষ্ট বলে দিয়েছেন যে, তাঁর মৃত্যুর পরে যারা নতুন কিছু আবিষ্কার করে দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত করবে তা কথা হোক বা কাজ হোক এ সবই বিদ'আত বলে গণ্য হবে এবং তা এর আবিষ্কারকের উপর ফিরিয়ে দেওয়া হবে যদিও তার উদ্দেশ্য ভালো থাকে। তাছাড়া রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সকল সাহাবী এবং তাদের পরবর্তী সালাফদের নিকট থেকে বিদ'আত থেকে সতর্কতা এবং ভীতি প্রদর্শন সাব্যস্ত রয়েছে। তা কেবল দ্বীনের মধ্যে অতিরিক্ত হওয়ার কারণেই হয়েছে এবং সে শরীয়ত প্রবর্তনের কারণে যার অনুমতি আল্লাহ দেননি

এবং আল্লাহ্‌দ্রোহী ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের সামঞ্জস্য বিধানের কারণে; কারণ তারা তাদের দ্বীনের মধ্যে অতিরিক্ত করেছে এবং যা আল্লাহ বলেননি তা দ্বীনের মধ্যে আবিষ্কার করেছে। আর এতে (এভাবে বিদ'আত চালু করলে) দ্বীনের সংকীর্ণতা এবং অপরিপূর্ণতার অপবাদ আসে অথচ সকলেরই জানা যে, এটি করা হলে মহা ফেৎনার সৃষ্টি করবে এবং অত্যন্ত খারাপ কাজ বলে বিবেচিত হবে, সাথে সাথে তা আল্লাহর সে বাণীর বিরোধী হবে যেখানে তিনি বলেছেন,

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ

আজকের দিনে তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম। অনুরূপভাবে রাসূলের সেই হাদীসগুলোরও বিরোধী হবে যাতে তিনি বিদ'আত থেকে তিনি সতর্ক করেছেন ও বিরত থাকতে বলেছেন। তদ্রূপ, এ সকল জন্মোৎসব ও অন্যান্য উৎসবের আবিষ্কার করায় প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ তাআলা এ উম্মতের জন্য দ্বীনকে পরিপূর্ণ করেননি এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমল করার মত রিসালত তার জাতির জন্য যথাযথভাবে পৌঁছাননি, পরবর্তীতে এ বিদআতের প্রবর্তক লোকগুলো এসে আল্লাহর শরীয়তে এমন কিছু বিধান আবিষ্কার করল যার অনুমতি আল্লাহ দেননি, তারা মনে করেছে তা হয়তো তাদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দিবে। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, এতে মহাবিপদ রয়েছে এবং আল্লাহ ও তার রাসূলের উপর মারাত্মক অভিযোগ উত্থাপন করা হয়েছে। অথচ আল্লাহ তার বান্দার জন্য দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন এবং তার নেয়ামতকে সম্পন্ন

করেছেন। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্পষ্টভাবে পোঁছে দিয়েছেন। এমন কোনো পথ, যা জান্নাতের দিকে নিয়ে যাবে এবং জাহান্নাম থেকে দূরে রাখবে তিনি তা উম্মাতের জন্য স্পষ্ট করে বর্ণনা করতে পিছপা হন নি। যেমন সহীহ মুসলিমে আব্দুল্লাহ ইবন আমর ইবন আস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে এসেছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ

«إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيًّا قَبْلِي إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ يَدُلَّ أُمَّتُهُ عَلَى خَيْرٍ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ، وَيُنْذِرَهُمْ شَرًّا مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ»

আল্লাহ ইতোপূর্বে যে কোনো নবীই প্রেরণ করেছেন তার দায়িত্ব ছিল, তিনি তার উম্মাতের জন্য যা ভালো মনে করেন তার দিক নির্দেশনা দেওয়া এবং তাদের জন্য যা ক্ষতি মনে করেন তা থেকে তাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করা। প্রকাশ থাকে যে, আমাদের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বোত্তম ও সর্বশেষ নবী এবং প্রচার ও নসিহতের দিক দিয়ে পরিপূর্ণ, কাজেই যদি জন্মোৎসব পালন করা আল্লাহর মনোনীত দ্বীনের অংশ হত তাহলে অবশ্যই রাসূল তা তাঁর উম্মাতের জন্য বর্ণনা করতেন অথবা তাঁর সাহাবীগণ তা পালন করতেন। যেহেতু এর কোনোটিই সাব্যস্ত নেই, বিধায় বুঝতে হবে যে, তা ইসলামের অন্তর্ভুক্ত নয়। বরং তা নব আবিষ্কৃত জিনিস যা থেকে রাসূল তাঁর উম্মাতকে সতর্ক করেছেন। যেমন পূর্বে উল্লেখিত হাদীসগুলোতে বর্ণনা করা হয়েছে।

উল্লেখিত প্রমাণপঞ্জির উপর আমল করতে গিয়ে আলেমগণের বড় একটি জামায়াত জন্মোৎসব পালনের প্রকাশ্য অস্বীকৃতি জানিয়েছেন

এবং এ থেকে সতর্ক করে দিয়েছেন। শরীয়তের নীতি হচ্ছেঃ হালাল হারাম এবং মানুষের ঝগড়া বিবাদের ক্ষেত্রে প্রত্যাবর্তনস্থল হলো: আল্লাহর কিতাব এবং রাসূলের সুন্নাহ তথা কুরআন ও হাদীস। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেনঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ
ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

হে যারা ঈমান এনেছ, তোমরা আল্লাহর নির্দেশ পালন কর, নির্দেশ পালন কর রাসূলের এবং তোমাদের মধ্যে যারা ক্ষমতার অধিকারী তাদের। অতঃপর তোমরা যদি কোনো বিষয়ে বিবাদে লিপ্ত হয়ে পড় তাহলে তা আল্লাহ ও তার রাসূলের প্রতি প্রত্যর্পণ কর; যদি তোমরা আল্লাহ ও কিয়ামত দিবসের প্রতি ঈমানদার হয়ে থাক। আর এটাই কল্যাণকর এবং পরিণতির দিকে দিয়ে উত্তম। [সূরা নিসা/৫৯]। তিনি আরও বলেনঃ আর তোমরা যে ব্যাপারে মতভেদ করছ তার ফয়সালা তো আল্লাহর নিকট। [সূরা শূরা/১০]

এখন যদি আমরা এ (জন্মোৎসব পালন) বিষয়টি আল্লাহর কিতাবের দিকে প্রত্যাবর্তন করি তাহলে দেখতে পাব যে, রাসূল যা নিয়ে এসেছেন শুধু সে ব্যাপারে তিনি আমাদেরকে তাঁর অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং তিনি যা করতে নিষেধ করেছেন তা থেকে আমাদেরকে সতর্ক করে দিয়েছেন, সেই সাথে আমাদেরকে বলে দিয়েছেন যে আল্লাহ তাআলা এ উম্মাতের জন্য দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন। আর এ জন্মোৎসব পালন তার অন্তর্ভুক্ত নয় যা রাসূল

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিয়ে এসেছেন, কাজেই তা সে দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত নয় যে দ্বীন আল্লাহ আমাদের জন্য পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন এবং যে দ্বীনের ব্যাপারে রাসূলের অনুসরণের জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। আর যদি এ (জন্মোৎসব পালন) বিষয়টি নিয়ে রাসূলের সুন্নাহের দিকেও প্রত্যাবর্তন করি তাহলে দেখতে পাব যে, তিনি তা কখনো করেননি, তা করার নির্দেশও দেননি এবং তাঁর কোনো সাহাবাও করেননি, বিধায় বুঝতে হবে তা দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত নয় বরং তা নব আবিষ্কৃত বিদ'আত এবং উৎসব পালনের ক্ষেত্রে ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের সাথে অন্ধ অনুসরণের নামান্তর। এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, যাদের সামান্যমাত্র জ্ঞান এবং হক্ক তালাশের ইনসাফ ও আগ্রহ রয়েছে তারা বুঝতে পারবেন, জন্মোৎসব পালন করা ইসলামের কোনো অংশ নয় বরং তা নব আবিষ্কৃত বিদ'আত ; যা পরিত্যাগ করার জন্য এবং তা থেকে সতর্ক থাকার জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ দিয়েছেন। বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় অধিকাংশ লোক তা পালন করার কারণে জ্ঞানীদের জন্য ধোঁকায় পড়া উচিৎ নয়, কেননা অধিকাংশ লোক করলেই তা হক্ক বুঝা যায় না বরং তা জানা যায় কেবল শরঈ দলীলের মাধ্যমেই। যেমন আল্লাহ তাআলা ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের ব্যাপারে বলেছেন এবং তারা বলে ইয়াহুদী ও খৃষ্টান ব্যতীত কেউ জান্নাতে প্রবেশ করবে না, এটা তাদের মনের আকাজ্জা মাত্র। হে নবী, আপনি তাদের বলে দিন, তোমরা যদি সত্যবাদী হয়ে থাক তাহলে তোমাদের প্রমাণ পেশ কর। [সূরা বাকারা/১১১]। তিনি আরও বলেনঃ আর যদি আপনি

পৃথিবীর অধিকাংশ লোকের অনুকরণ করেন তবে তারা আপনাকে আল্লাহর রাস্তা হতে বিপথগামী করে ফেলবে। [সূরা আল-আনআম/১১৬]। তাছাড়া এ সকল উৎসব বিদআত হওয়ার সাথে সাথে অধিকাংশ সময় এবং কোনো কোন এলাকায় কিছু কিছু জঘন্য কাজ হয়ে থাকে যেমন: নারী-পুরুষের একসাথে অবাধে চলাফেরা, গান বাজনা, মদ গাঁজা এবং মাদকদ্রব্য সেবন ইত্যাদি খারাপ কাজ হয়ে থাকে। কখনো কখনো এর চেয়েও মারাত্মক শিকের মত কাজ কর্ম হয়ে থাকে, আর তা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বা অলি আওলিয়ার ব্যাপারে অধিক বাড়াবাড়ির মাধ্যমে বা তাদের নিকট কোনো কিছু চাওয়া অথবা তাদের ক্ষমতাতীত কোনো ব্যাপারে সহযোগিতা চাওয়ার মাধ্যমে এবং এ ধারণা করা যে রাসূল গায়েবী এবং এ রকম আরো অনেক কিছুই জানেন, যে ধারণা করলে মানুষ কাফের হয়ে যায়। অথচ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সহীহ সনদে এসেছে, তিনি বলেছেন,

«إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين»

“তোমরা দ্বীনের মধ্যে অধিক বাড়াবাড়ি করা থেকে বেঁচে থাক, কেননা দ্বীনের মধ্যে অধিক বাড়াবাড়িই তোমাদের পূর্ববর্তী লোকজনকে ধ্বংস করেছে।” তিনি আরও বলেনঃ

إنما أنا عبد فقولوا عبد الله «لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم،

ورسوله» أخرجه البخاري في صحيحه

“তোমরা আমার প্রশংসায় সীমালঙ্ঘন করো না যেমন খৃষ্টানরা ঈসা (আলাইহিস সালাম) এর ব্যাপারে করেছে, বরং আমি কেবল

একজন বান্দা, কাজেই তোমরা বলো যে, আমি আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল।” আরও যে সকল জিনিস অদ্ভুত ও আশ্চর্য্য মনে হয় তা হলো: বহু লোক এ নিয়ে ব্যস্ত থাকে এবং চেষ্টা করে এ সকল বিদআতী অনুষ্ঠানে উপস্থিত হওয়ার জন্য এবং এর বিরোধীদেরকে প্রতিহত করার জন্য। পক্ষান্তরে জুমআ ও জামায়াতে সালাত আদায়ের মত যে সকল জিনিস আল্লাহ তার উপর ওয়াজিব করেছেন তা থেকে বিরত থাকে, এ নিয়ে কোনো কথা বলেনা এবং এটি অন্যায়ও মনে করে না। কোনো সন্দেহ নেই যে, এটি হচ্ছে একবারে দুর্বলতম ঈমান, জ্ঞানের স্বল্পতা এবং অন্তরে পাপ ও অন্যায়ের প্রভাব বিস্তার। আল্লাহর নিকট আমাদের এবং সকল মুসলিমের জন্য সুস্থতা কামনা করি।

এর চেয়েও অধিক আশ্চর্য্যের ব্যাপার হলো: তাদের কিছু লোক ধারণা করে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম জন্মোৎসবে উপস্থিত হন, এ জন্য তারা সালাম দিয়ে তাঁর সম্মানে দাঁড়িয়ে যায়, আর এটি সবচেয়ে ভ্রান্ত ধারণা এবং চরম মুর্খতা। কেননা রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিয়ামতের পূর্বে তাঁর কবর থেকে বের হবেন না, কোনো মানুষের সাথে সম্পর্ক রাখবেন না এবং তাদের কোনো অনুষ্ঠানেও উপস্থিত হবেন না। বরং কিয়ামত পর্যন্ত তিনি তাঁর কবরেই অবস্থান করবেন এবং তাঁর রূহ মোবারক আল্লাহর নিকট সম্মানিত ঘরে ইল্লিয়ানের সর্বোচ্চে রয়েছে। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

﴿ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ﴾

“অতঃপর অবশ্যই তোমারা কিয়ামতের দিন উত্তোলিত হবে”। [সূরা মুমিনুন/১৬] নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ

«أنا أول من ينشق القبر يوم القيامة وأنا أول شافع وأول مشفع»

“আমিই সর্বপ্রথম কিয়ামতের দিন কবর থেকে উঠব এবং আমিই প্রথম সুপারিশকারী আর আমার সুপারিশই সর্বপ্রথম গ্রহণ করা হবে।” এ সকল আয়াত ও হাদীস এবং এ অর্থে আরো যে সকল আয়াত ও হাদীস রয়েছে তা প্রমাণ করে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সকল মৃত ব্যক্তিই কিয়ামতের দিন তারা তাদের কবর থেকে উঠবে আর তাতে সকল মুসলিম আলেমের ঐকমত্য রয়েছে, এর মধ্যে কোনো দ্বিমত নেই।

কাজেই প্রতিটি মুসলিমের উচিত হলো এসব ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা এবং মুর্থ ও জাহেলগণ যে বিদআত ও কুসংস্কার আবিষ্কার করছে যার কোনো প্রমাণপঞ্জি আল্লাহ অবতীর্ণ করেননি তা থেকে বিরত থাকা। তবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর সালাত ও সালাম পাঠ করা নৈকট্য লাভের উত্তম মাধ্যম এবং তা সংকর্মসমূহের অন্তর্ভুক্ত। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا
تَسْلِيمًا ٥٦﴾ [الاحزاب: ৫৬]

“আল্লাহ এবং তাঁর ফেরেস্তামণ্ডলী নবীর উপর সালাত পাঠ করে, কাজেই হে যারা ঈমান এনেছ, তোমরা তার উপর সালাত পাঠকর এবং যথাযথ সালাম দাও।” [সূরা আল-আহযাব/৫৬]। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ

من صلى على واحدة صلى الله عليه بها عشراً

“যে ব্যক্তি আমার উপর একবার সালাত পাঠ করবে আল্লাহ তার উপর দশবার সালাত পাঠ করবেন”। আর তা সকল সময়েই পাঠ করা যাবে, বিশেষ করে ফরয সালাতের শেষ দিকে পড়ার তাকিদ রয়েছে বরং প্রতি সালাতের শেষ তাশাহুদে পড়া বহু আলেমের নিকট ওয়াজিব এবং বিভিন্ন জায়গায় যেমন, আযানের পর, তাঁর নাম উল্লেখ করার পর এবং জুমআর রাত্রি ও জুমআর দিনে তা পাঠ করা মুস্তাহাব। বহু হাদীস তা প্রমাণ করে। এ মাসআলার ব্যাপারে এ সতর্কতাই দিতে চেয়েছি, যাকে আল্লাহ সঠিক বিবেক দিয়েছেন এবং হেদায়েত করেছেন তার জন্য এতটুকুই ইনশাআল্লাহ যথেষ্ট। অতীব দুঃখের বিষয় হলো, এ সকল বিদআতী অনুষ্ঠান পালন করা হয় মুসলিমদের দ্বারাই, তারা তাদের নিজস্ব মতবাদে বিশ্বাসী হয়ে রাসূলের মহব্বতে তা করছে। যারা এরকম বলছে তাদেরকে বলব, আপনি যদি সুন্নী হন এবং রাসূলের পুরোপুরি অনুসরণ করেন তাহলে কি রাসূল তা কখনো করেছেন? বা তাঁর কোনো সাহাবী অথবা কোনো তাবেঈ করেছেন? নাকি তা ইসলামের শত্রু ইয়াহুদী ও খৃষ্টান এবং তাদের মত আরও যারা আছে তাদের অন্ধ অনুকরণ-অনুসরণ?

রাসূলের মহব্বত শুধু তাঁর জন্মোৎসব পালনের মাধ্যমে প্রকাশ হয় না বরং তিনি যে নির্দেশ দিয়েছেন তার অনুসরণ অনুকরণের মাধ্যমে, তাঁর দেওয়া সংবাদ বিশ্বাসের মাধ্যমে, তাঁর নিষেধাবলী থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে এবং তার শিখানো পদ্ধতিতে আল্লাহর

দেওয়া শরঈ বিধানের মাধ্যমে ইবাদত করার দ্বারাই তা প্রকাশ পায়। এমনিভাবে তাঁর নাম উল্লেখ হওয়ার পর, সালাতের মধ্যে এবং প্রত্যেক সময়ে ও সর্বক্ষেত্রে তাঁর উপর দুরুদ পাঠ করা তাঁর মহব্বতের বহিঃপ্রকাশ। কিন্তু এ সকল বিদআতী কাজের নিন্দা করা ওয়াহাবী নয় যেমনটি পত্রিকার লেখক বলেছেন। বরং ওয়াহাবী বলে যাদের বলা হচ্ছে, তাদের আকীদা-বিশ্বাস হলো: আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাতকে পুরোপুরি আঁকড়ে ধরা, তাঁর দিক নির্দেশনার উপর চলা, খোলাফায়ে রাশেদীন এবং তাবেঈদের পথে চলা, সালাফে সালাহীন ও ইমামগণ যে পথে চলেছেন সে পথে চলা, আল্লাহকে জানার ব্যাপারে, তার সিফাত বা গুণাগুণের ক্ষেত্রে ও তার প্রশংসার ক্ষেত্রে কুরআন এবং হাদীস যেভাবে সাব্যস্ত করেছে এবং সাহাবীগণ যেভাবে তা গ্রহণ করেছে সেভাবে সাব্যস্তের ক্ষেত্রে মুফতি ও ফকিহদের পথে চলা। এগুলো যেভাবে এসেছে তারা তা সেভাবেই সাব্যস্ত করে এবং বিশ্বাস করে, কোনো ধরনের পরিবর্তন পরিবর্ধন, রহিতকরণ এবং বিনা উদাহরণে তা সাব্যস্ত করে। তাবেঈ, জ্ঞানী, পরহেযগার, ঈমানদার এবং তাবে তাবেঈসহ এ উম্মাতের সালাফ ও ইমামগণ যার উপর চলেছেন তা-ই তারা আঁকড়ে ধরে আছে। তারা এ বিশ্বাস করে যে, ঈমানের ভিত্তি ও নীতি হচ্ছে আল্লাহ তা‘আলার একত্ববাদ ও মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তার রাসূল হিসাবে সাক্ষ্য দেওয়া, আর এটিই এক আল্লাহর প্রতি ঈমানের মূল ভিত্তি এবং তা ঈমানের শাখার মধ্যে সর্বোত্তম শাখা। তারা এও জানে যে, এ ভিত্তির জন্য

সকল মুসলিমের ঐক্যমতে ঈমান, আমল ও মুখের স্বীকৃতির প্রয়োজন হয়, তা প্রমাণ করে যে এক আল্লাহর ইবাদত করা ও তার সাথে কাউকে অংশিদার না করা এবং তিনি ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত করা থেকে বেঁচে থাকা প্রত্যেকের উপর ওয়াজিব। আর এটিই জ্বীন ও মানব সৃষ্টি, নবী রাসূল প্রেরণ এবং কিতাব অবতীর্ণ করার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। তা এক আল্লাহর জন্য পরিপূর্ণ বশ্যতা ও ভালোবাসার স্বীকৃতি, এমনিভাবে পরিপূর্ণ অনুকরণ ও সম্মানের অন্তর্ভুক্ত। এটি সেই দ্বীন যা ব্যতীত অন্য কোনো দ্বীন আল্লাহ গ্রহণ করবেন না, না পূর্ববর্তীদের নিকট থেকে আর না পরবর্তীদের থেকে। কারণ সকল নবীই ইসলামের উপর থেকে এর দাওয়াত নিয়ে এসেছেন এবং যা আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণের অন্তর্ভুক্ত তার দাওয়াত নিয়ে এসেছেন। কাজেই যে ব্যক্তি তাঁর নিকট আত্মসমর্পণের সাথে সাথে অন্যের নিকটও আত্মসমর্পণ করবে ও তাকে এবং অন্যকে ডাকবে সে মুশরিকদের মধ্যে গণ্য হবে, আর যে ব্যক্তি তার নিকট আত্মসমর্পণ করবে না সে তার ইবাদত থেকে অহংকারী বলে গণ্য হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন, “অবশ্যই আমরা প্রত্যেক জাতির নিকট রাসূল প্রেরণ করেছি এ প্রত্যাদেশ দিয়ে যে তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাগুতকে পরিহার কর। [সূরা নাহল/৩৬]। তাদের আকীদা হলোঃ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল হওয়ার উপর সাক্ষ্য প্রদান করা এবং বিদআত, কুসংস্কার ও রাসূলের আনীত শরীয়তের পরিপন্থী প্রতিটি বিষয় ত্যাগ করা। আর এটাই শাইখ মুহাম্মদ ইবন আব্দুল ওয়াহহাব

রাহিমাহুল্লাহ এর আক্বীদা। এ আক্বীদার দ্বারাই তিনি আল্লাহর দ্বীন পালন করেন এবং এর দিকে তিনি মানুষকে আহ্বান করেন। আর যে ব্যক্তি এ আক্বীদার পরিপন্থী কোনো মাস্আলা মাসায়েল বা মতবাদ তার দিকে সম্পর্কযুক্ত করবে তা হবে ডাহা মিথ্যা, প্রাকশ্য অপবাদ এবং বিনা জ্ঞানে কথা বলা। এ সকল অপবাদীদেরকে আল্লাহ তার অঙ্গিকারানুযায়ী বদলা দিবেন। ইখলাস ও তাওহীদ, আল্লাহর একত্ববাদের সাক্ষ্য দেওয়া এবং আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কারো ইবাদতের বিষয়টি রহিত করে শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য তা পরিপূর্ণভাবে সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে কুরআন, হাদীস ও ইজমা যা প্রমাণ করে তার উপর তিনি তার মূল্যবান প্রতিবেদন, গবেষণা এবং গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থাদি প্রকাশ করেছেন। তার প্রকাশিত গ্রন্থাদি, প্রসিদ্ধ দাওয়াত ও কাজকর্ম এবং তার বড় বড় জ্ঞানী সহচরবৃন্দ ও ছাত্রদের মতামত সম্পর্কে যে ব্যক্তি জানতে পারবে সে বুঝতে পারবে যে এক আল্লাহর ইবাদত করার সাথে সাথে বিদ'আত ও কুসংস্কার রহিতের ক্ষেত্রে তিনি সালাফ তথা উম্মতের উত্তম পূর্বসূরী ও সম্মানিত ইমামদের তরিকায় আছেন। আর এর উপরই সৌদী হুকুমত বা শাসন রয়েছে এবং সৌদী আলেমগণও এর উপরই চলেছেন।

সৌদী হুকুমত ও আলেমগণ যাবতীয় বিদ'আত, কুসংস্কার এবং সকল প্রকার বাড়াবাড়ি, যা থেকে রাসূল নিষেধ করেছেন, তার বিরুদ্ধে জোরালো ভূমিকা রাখছেন। সৌদী মুসলিম জনগণ এবং সরকার প্রতিটি মুসলিমকে যথাযথ সম্মান করে থাকে এবং সে যে

কোনো জায়গার বা যে কোনো দিকেরই হোক না কেন তাদেরকে ভালোবাসা এবং সম্মানের দৃষ্টিতে দেখে। আর যারা বিদ'আত, কুসংস্কার, বিদআতী উৎসব পালনের মত ভ্রান্ত মতবাদ নিয়ে আছে, যার অনুমতি আল্লাহ ও রাসূল দেননি, তাদেরকে তারা ঘৃণা করেন এবং তা করতে নিষেধ করেন, কারণ তা নব আবিষ্কৃত জিনিস, আর প্রতিটি নব আবিষ্কৃত জিনিসই বিদ'আত।

বস্তুত মুসলিমগণকে রাসূলের অনুসরণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে কোনো বিদ'আত সৃষ্টির জন্য নয়, কারণ ইসলাম একটি পরিপূর্ণ দ্বীন, আল্লাহ এবং রাসূল যা শরীয়ত হিসাবে দিয়েছেন এবং সম্মানিত সাহাবী ও তাবৈঈগণ যা গ্রহণ করেছেন এবং যারা তাদের অনুসরণ করেন তা-ই যথেষ্ট।

রাসূলের জন্মোৎসবের বিদআতী অনুষ্ঠান পালন এবং এতে যে সকল বাড়াবাড়ি বা শির্ক ইত্যাদি হয়, তার বাধা প্রদান করা অনৈসলামিক কাজ নয় বা রাসূলের অসম্মান নয়, বরং এটাই রাসূলের অনুসরণ-অনুকরণ এবং তাঁর নির্দেশ বাস্তবায়ন। যেমন তিনি বলেছেন,

«إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين»

“তোমরা দ্বীনের মধ্যে অধিক বাড়াবাড়ি করা থেকে বেঁচে থাক, কেননা দ্বীনের মধ্যে অধিক বাড়াবাড়িই তোমাদের পূর্ববর্তী লোকজনকে ধ্বংস করেছে।” তিনি আরও বলেনঃ

«لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله
ورسوله» أخرجه البخاري في صحيحه

“তোমরা আমার প্রশংসায় সীমালঙ্ঘন করো না যেমন খৃষ্টানগণ ঈসা (আলাইহিস সালাম) এর ব্যাপারে করেছে, বরং আমি কেবল একজন বান্দা, কাজেই তোমরা বল যে আমি আল্লাহর বান্দা ও তার রাসূল।”

উল্লেখিত আলোচনার সারাংশে বলা যায় যে, আল্লাহ আমাদের এবং সকল মুসলিমকে যেন দ্বীন সম্পর্কে বুঝার ও এর উপর দৃঢ় থাকার তাওফীক দান করেন এবং সুন্নাতকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরা ও বিদ'আত থেকে বেচে থাকার উপর অনুগ্রহ করেন। নিশ্চয়ই তিনি অনুগ্রহশীল করুনাময়।

অধ্যায় - চার - বিদ'আতের ব্যাপারে মুসলিম মিল্লাতের অবস্থান ও
আলেমগণের প্রতিবাদ পদ্ধতি

প্রথম পরিচ্ছেদ - বিদ'আতীদের ব্যাপারে মুসলিম মিল্লাতের
আলেমদের অবস্থান

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ - বিদ'আতীদের প্রতিবাদে আলেমগণের পদ্ধতি

তৃতীয় পরিচ্ছেদ - যে ব্যক্তি কোন খতীবকে বিভ্রান্তির দিকে অথবা
বিদআতের দিকে আহ্বান করতে শুনে তখন তার করণীয় কি

অধ্যায় - চার - বিদ'আতের ব্যাপারে মুসলিম মিল্লাতের অবস্থান ও আলেমগণের প্রতিবাদ পদ্ধতি

প্রথম পরিচ্ছেদ - বিদ'আতীদের ব্যাপারে মুসলিম মিল্লাতের আলেমদের অবস্থান

যুগে যুগে আহ্লে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আলেমগণ বিদ'আতীদের বিদ'আতী কার্য-কলাপের সামনে কখনই চুপ থাকেন নি বরং সব সময়ই প্রতিবাদ করতঃ তাদের কর্মকাণ্ডে বাঁধা দিয়ে এসেছেন। পাঠক সমীপে এ সম্পর্কে কতিপয় দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা হলঃ

১) উস্মে দারদা থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আবু দারদা রাগাশ্বিত অবস্থায় একদা আমার ঘরে প্রবেশ করলেন। আমি বললাম, ব্যাপার কি? তিনি বললেন, আল্লাহর শপথ! জামাতে নামায আদায় ব্যতীত মুসলমানদের মধ্যে আমি নবী মুহাম্মাদের (সাঃ) সুন্নাতের কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।

২) আমার বিন ইয়াহয়া হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমার পিতাকে আমার দাদা হতে বর্ণনা করতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমরা একবার ফজরের নামাযের পূর্বে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) এর ঘরের দরজার সামনে বসা ছিলাম। উদ্দেশ্য হল, তিনি যখন বের হবেন, আমরা তার সাথে পায়ে হেঁটে মসজিদের দিকে যাত্রা করব। এমন সময় আমাদের কাছে আবু মূসা আশআরী (রাঃ) আগমন করে বললেন, আবু আব্দুর রাহমান (ইবনে মাসউদের উপনাম) কি বের হয়েছেন? আমরা বললাম, এখনও বের হন নি। তিনিও আমাদের সাথে বসে গেলেন। তিনি যখন বের হলেন, আমরা সকলেই তাঁর

কাছে গেলাম। আবু মূসা আশআরী (রাঃ) বললেন, হে আবু আব্দুর রাহমান! আমি মসজিদে এখনই একটি নতুন বিষয় দেখে আসলাম। আলহামদু লিল্লাহ, এতে খারাপ কিছু দেখিনি। ইবনে মাসউদ (রাঃ) বললেন সেটি কি? আবু মুসা (রাঃ) বললেন, আপনার হায়াত দীর্ঘ হলে আপনিও তা দেখতে পাবেন। আবু মূসা আশআরী (রাঃ) বললেন, আমি দেখলাম, মসজিদে একদল লোক বৃত্তাকারে বসে নামাযের অপেক্ষা করছে। প্রত্যেক দলের মাঝখানে একজন লোক রয়েছে। আর সবার হাতে রয়েছে ছোট ছোট পাথর। মাঝখানের লোকটি বলছে, একশবার আল্লাহ্ আঁকবার পাঠ কর। এতে সবাই একশবার আল্লাহ্ আঁকবার করে। এরপর বলে, একশ বার আল-হাম্দুলিল্লাহ পাঠ কর। এ কথা শুনে সবাই একশবার আল-হাম্দুলিল্লাহ পাঠ করে থাকে। তারপর লোকটি বলে, এবার একশ বার সুবহানাল্লাহ্ পাঠ কর। সবাই একশ বার সুবহানাল্লাহ্ পাঠ করে থাকে। এ কথা শুনে ইবনে মাসউদ (রাঃ) বললেন, তুমি তাদেরকে তাদের পাপের কাজগুলো গণনা করে রাখতে বললে না কেন? আর এটা বললে না কেন যে, তাদের নেকীর কাজগুলো থেকে একটি নেকীও নষ্ট হবে না। কাজেই এগুলো হিসাব করে রাখার কোন দরকার নেই। অতঃপর ইবনে মাসউদ (রাঃ) চলতে থাকলেন। আমরাও তার সাথে চললাম এবং একটি হালাকার (বৈঠকের) কাছে এসে উপস্থিত হলাম। তিনি তাদের কাছে দাড়িয়ে বললেন, একি করছ তোমরা? তারা সকলেই বলল, পাথরের মাধ্যমে গণনা করে আমরা তাকবীর, তাসবীহ্ ইত্যাদি পাঠ করছি। ইবনে মাসউদ (রাঃ)

বললেন, তাহলে তোমরা তোমাদের পাপের কাজগুলোর হিসাব কর। কারণ পাপের কাজগুলো হিসাব করে তা থেকে তাওবা করা দরকার। আমি এ ব্যাপারে জিহ্মাদার হলাম যে তোমাদের ভাল কাজগুলোর একটি ভাল কাজও নষ্ট হবে না। এ কথা বলার কারণ এই যে আল্লাহর কাছে কারও আমল বিনষ্ট হয়না। বরং একটি আমলের বিনিময়ে দশটি ছাওয়াব দেয়া হয় এবং দশ থেকে সাত শত গুণ পযর্ন্ত বাড়িয়ে দেয়া হয়। তারপর তিনি বললেন, হে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উম্মত! অমঙ্গল হোক তোমাদের! কিসে তোমাদেরকে এত তাড়াতাড়ি ধ্বংস করল?!! এখনও নবী মুহাম্মদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অসংখ্য সাহাবী জীবিত আছেন। এই তো রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কাপড় এখনও পুরাতন হয়নি। তাঁর ব্যবহারকৃত থালা-বাসনগুলো এখনও ভেঙ্গে যায়নি। ঐ সত্কার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, তোমরা যে দ্বীন তৈরী করেছ তা কি মুহাম্মদের দ্বীন হতে উত্তম? না তোমরা গোমরাহীর দ্বার উন্মুক্ত করেছ? তারা বলল, হে আবু আব্দুর রাহমান! আমরা এর মাধ্যমে কল্যাণ ছাড়া অন্য কোন ইচ্ছা করিনি। তিনি বললেন অনেক কল্যাণকামী আছে, সে তার উদ্দেশ্য পযর্ন্ত পৌঁছতে পারে না। আল্লাহর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন যে, একটি দল কুরআন তেলাওয়াত করবে, কিন্তু কুরআন তাদের গলদেশের ভিতরে প্রবেশ করবে না। আল্লাহর শপথ করে বলছি, মনে হয় তাদের অধিকাংশই তোমাদের মধ্য থেকে বের হবে। অতঃপর ইবনে

মাসউদ (রাঃ) তাদেরকে ছেড়ে চলে আসলেন। আমরা ইবনু সালামা (রাঃ) বলেন, আমরা তাদের অধিকাংশকেই দেখলাম, নাহ্‌রাওয়ানের যুদ্ধে খারেজীদের সাথে আমাদের বিরুদ্ধে একত্রিত হয়েছে।

৩) একজন লোক ইমাম মালিক (রহঃ) এর নিকট আগমন করে বলল, আমি কোথা হতে ইহরাম বাঁধব? তিনি বললেন, রসূল (সসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইহরাম বাঁধার জন্য যে সমস্ত সস্থান নির্ধারণ করে দিয়েছেন, সেখান থেকে ইহরাম বাঁধ। লোকটি বলল, আমি যদি রসূল (সসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নির্ধারিত স্থান থেকে আরো একটু দূর হতে ইহরাম বাঁধি, তাহলে কি বৈধ হবেনা? ইমাম মালিক (রহঃ) বললেন, আমি ইহাকে বৈধ মনে করিনা। সে বলল, আপনি ইহার মধ্যে অপছন্দের কি দেখলেন? তিনি বললেন, আমি তোমার উপর ফিতনার ভয় করছি। সে বলল, ভাল কাজ বেশী করে করার ভিতর ফিতনার কি আছে? ইমাম মালিক লোকটির এ কথা শুনে বললেন, আল্লাহ তায়াল্লা বলেছেন:

فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

অর্থঃ অতএব, যারা তাঁর নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারা এ বিষয়ে সতর্ক হোক যে, ফিতনা (বিপর্যয়) তাদেরকে গ্রাস করবে অথবা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি-তাদেরকে আক্রমণ করবে। (সূরা নূর: ৬৩)। এর চেয়ে বড় মসিবত আর কি হতে পারে যে, তুমি এমন একটি ফজীলতের মাধ্যমে নিজেকে বৈশিষ্টমন্ডিত করতে চাচ্ছ, যার মাধ্যমে স্বয়ং রসূল (সসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেকে বৈশিষ্টমন্ডিত করেন নি।

বিদআতের প্রতিবাদের ক্ষেত্রে সালাফদের থেকে এমনি আরো অসংখ্য দৃষ্টান্ত রয়েছে। এ কয়েকটি উদাহরণই পাঠক সমাজের জন্য পেশ করা হল। আশা করি তাই যথেষ্ট হবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ - বিদ'আতীদের প্রতিবাদে আলেমগণের পদ্ধতি

বিদ'আতীদের প্রতিবাদে আহ্লে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের আলেমদের পদ্ধতি হলঃ তাঁরা এ ব্যাপারে আল্লাহর কিতাব ও রসূল (সসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাহের উপর নির্ভর করে থাকেন। আর এটিই হল সঠিক ও সন্তোষজনক পদ্ধতি। তাঁরা বিদ'আতীদের কথাগুলো প্রথমে বর্ণনা করেন। তারপর একটি একটি করে সেগুলো খণ্ডন করে থাকেন। সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা ওয়াজিব এবং বিদ'আত থেকে বিরত থাকা জরুরী, এ বিষয়ে তারা কুরআন-সুন্নাহ থেকে প্রমাণাদি উপস্থিত করে থাকেন। বিদ'আতীদের প্রতিবাদে তাঁরা অসংখ্য বই-পুস্তক রচনা করেছেন। ইসলামের মৌলিক বিষয়ের উপর লিখিত তাঁদের কিতাবগুলোতে তাঁরা খারেজী, যাহ্মীয়া, মুতাজেলা এবং আশায়েরা সম্প্রদায়ের রচিত ঈমান ও আক্বীদা বিষয়ক বিদআতী কথাগুলোর উত্তর দিয়েছেন। এ ব্যাপারে তাঁরা বিশেষ বিশেষ গ্রন্থও রচনা করেছেন। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল (রাঃ) যাহ্মীয়াদের উত্তরে কিতাব লিখেছেন। অন্যান্য ইমামগণও বিভিন্ন ফিরকার লোকদের উত্তরে বিভিন্ন কিতাব রচনা করেছেন। তাদের মধ্যে উসমান বিন সাঈদ দারেমী, শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া, তাঁর সুযোগ্য ছাত্র ইবনুল কাইয়িম, শাইখ

মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্‌হাবের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁরা কবর পূঁজারী, সূফী মতবাদ ও উপরোক্ত বাতিল ফিরকার লোকদের কঠোর প্রতিবাদ করেছেন। বিদআতীদের প্রতিবাদে যে সমস্ত কিতাব রচিত হয়েছে, তার সংখ্যা অনেক। নিম্নে উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটি কিতাবের নাম উল্লেখ করা হলঃ

পুরাতন লেখনীগুলোর মধ্যে রয়েছেঃ

- (১) ইকতেজাউস্ সিরাতিল মুসতাক্বীমঃ কিতাবটি শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া (রঃ) কর্তৃক রচিত। কিতাবের বিরাট একটি অংশ জুড়ে তিনি বিদআতীদের প্রতিবাদ করেছেন।
- (২) ইনকারচ্চল হাওয়াদেছ ওয়াল বিদআঃ রচনায় ইবনে ওয়াজ্জাহ
- (৩) আল-ইতেসামঃ ইমাম শাতেবী
- (৪) আল হাওয়াদেছ ওয়াল বিদআঃ তারতুসী
- (৫) আল বাঈছু আলা ইনকারিল বিদ্আহ্ ওয়াল হাওয়াদেছঃ আবু শামা
- (৬) মিনহাজ্জুস্ সুন্নাহ আন্ নাববীয়াহঃ শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া (রঃ)। এতে তিনি রাফেজী এবং ক্বাদরীয়া ফিরকার প্রতিবাদ করেছেন।

বর্তমান যুগে বিদআতীদের প্রতিবাদে যে সমস্ত-কিতাব রচিত হয়েছে, তার মধ্যেঃ

- (১) আল ই বদাউ ফী মাজিল বিদ্আহ্: শায়খ আলী মাহফুয
- (২) আস্ সুনানু ওয়াল মুবতাদাতাতঃ শায়খ মুহাম্মাদ বিন আহমাদ আশ্-শুকাইরী আল-হাওয়ামেদী।

(৩) আত্-তাহজীর মিনাল বিদআহ্: শায়খ ইবনে বায (রঃ) এ কিতাবটি বাংলা ভাষায় অনুবাদ হয়েছে।

সর্ব যুগের আলেমগণই লেখনী, ভাষণ, জুমআর খুৎবা, প্রচার মাধ্যম, পত্রিকা ও বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিদ'আত ও বিদ'আতীদের প্রতিবাদ করে আসছেন। এসব কর্মতৎপরতা মুসলমানদের সজাগ করণে এবং বিদআতের মূলৎপাটনে যথেষ্ট ভূমিকা রেখে চলেছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ - যে ব্যক্তি কোন খতীবকে বিভ্রান্তির দিকে অথবা বিদ'আতের দিকে আহ্বান করতে শুনে তখন তার করণীয় কি

আমাদের স্থানীয় ইমাম মানুষকে কতিপয় বিদ'আতের দিকে আহ্বান করেন। কিছু দ্বীনদার ভাই দলিল-প্রমাণসহ এ ব্যাপারে তাঁকে সাবধান করেছেন। কিন্তু এখন পর্যন্ত তিনি এ বিদ'আত গুলোর পক্ষে অটল অবস্থানে রয়েছেন। যদি জানা যায় যে, আজকের খোতবায় খতীবসাহেব বিদ'আতের ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করবেন যেমন- মিলাদ, শবে বরাত, ইত্যাদি সেক্ষেত্রে আপনারা কি এ পরামর্শ দিবেন যে, সে ব্যক্তি জুমার খোতবা শুনতে যাবে না। কেউ যদি মসজিদে গিয়ে শুনতে পায় যে, খতীব সাহেব বিদ'আতের ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করছেন তখন সে ব্যক্তির করণীয় কী? সে কী খোতবার মাঝখানে উঠে বাড়ীতে এসে যোহরের নামায আদায় করবে? অন্যথায় সে কী করবে? এ ধরনের খোতবা শুনায় হাজির থাকলে ব্যক্তি কি গুনাহগার হবে? কারণ কিছু ভাই নসিহত করার পরও খতীবসাহেব তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির উপর অটল অবস্থানে রয়েছেন। কেউ

যদি খোতবার মধ্যে দুর্বল ও বানোয়াট হাদীস উল্লেখ করে তার ক্ষেত্রেও কি একই হুকুম প্রযোজ্য? আল্লাহ আপনাদেরকে উত্তম প্রতিদান দিন।

এক: যে ব্যক্তির এলাকার মসজিদে কোন বিদ'আত পন্থী ইমাম ইমামতি করেন: তার বিদ'আত হয়তো কুফরি বিদ'আত হবে অথবা সাধারণ কোন বিদ'আত হবে। যদি কুফরি বিদ'আত হয় তাহলে ঐ ইমামের পিছনে সাধারণ নামায কিংবা জুমার নামায কোনটা পড়া জায়েয হবে না। আর যদি ইসলাম থেকে খারিজ করে দেয় এমন কোন বিদ'আত না হয় তাহলে অগ্রগণ্য মতানুযায়ী- তার পিছনে জুমা পড়া ও জামাতে নামায পড়া জায়েয। এ হুকুমটি এত বেশি প্রচার পেয়েছে যে, এটা এখন সুন্নাহ অনুসারীদের নিদর্শনে পরিণত হয়েছে। বিশুদ্ধ মতানুযায়ী, যদি কেউ এমন ইমামের পিছনে নামায আদায় করে ফেলে তাহলে তাকে সে নামায শোধরাতে হবে না। এ বিষয়ক নীতি হচ্ছে- “যে ব্যক্তির নিজের নামায শুদ্ধ; সে ব্যক্তির ইমামতিও শুদ্ধ”।

আর যদি সেই বিদ'আতী ইমামকে বাদ দিয়ে অন্য কোন ইমামের পিছনে নামায পড়ার সুযোগ থাকে তাহলে সেটাই করতে হবে। বিশেষতঃ আলেম শ্রেণী ও তালিবুল ইলমকে সেটা করতে হবে। তা করা সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ তুল্য। কিন্তু এ ইমামের পিছনে নামায বর্জন করতে গিয়ে ঘরে নামায পড়া জামাতযুক্ত নামাযের ক্ষেত্রে জায়েয নেই। সুতরাং জুমার ক্ষেত্রে জায়েয না হওয়া আরও বেশি যুক্তিযুক্ত। শাইখুল ইসলাম ইবনে

তাইমিয়া বলেন: যদি মোক্তাদি জানে যে, ইমাম বিদআতি, বিদআতের দিকে আহ্বান করে অথবা এমন ফাসেক (কবির-গুনাহগার) যার মধ্যে গুনাহর আলামত প্রকাশ্য এবং সেই-ই নির্ধারিত ইমাম; নামায পড়লে তার পিছনেই পড়তে হবে যেমন- জুমার ইমাম, ঈদের ইমাম, আরাফাতে হজ্জের নামাযের ইমাম ইত্যাদি এক্ষেত্রে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল আলেমের অভিমত হচ্ছে- মোক্তাদিকে তার পিছনেই নামায আদায় করতে হবে। এটি ইমাম আহমাদ, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আবু হানিফা ও অন্যান্য আলেমের অভিমত। এ কারণে আলেমগণ আকিদার কিতাবে লিখেন যে, ইমাম নেককার হোক কিংবা পাপাচারী হোক তিনি ইমামের পিছনে জুমার নামায ও ঈদের নামায আদায় করেন। অনুরূপভাবে এলাকাতে যদি শুধু একজন ইমাম থাকে তাহলে তার পিছনেই জামাতে নামাযগুলো আদায় করতে হবে। কেননা জামাতে নামায আদায় করা, একাকী নামায আদায় করার চেয়ে উত্তম; এমনকি ইমাম ফাসেক (কবির-গুনাহতে লিপ্ত) হলেও। এটি অধিকাংশ আলেম: আহমাদ ইবনে হাম্বল, শাফেয়ী ও অন্যান্যদের অভিমত। বরং ইমাম আহমাদের প্রকাশ্য অভিমত হচ্ছে - জামাতে নামায আদায় করা ফরজে আইন। ইমাম ফাসেক হওয়ার কারণে যে ব্যক্তি জুমার নামায ও জামাতে নামায পড়ে না সে ইমাম আহমাদ ও আহলে সুন্নাহর অন্যান্য ইমামের মতে- বিদআতী; আব্দুস, ইবনে মালেক ও আত্তারের রিসালা তে এভাবে এসেছে। **সঠিক মতানুযায়ী:** সে ব্যক্তি নামায পড়ে নিবে; তাকে এ নামাযকে পুনরায়

আদায় করতে হবে না। কারণ সাহাবায়ে কেরাম জুমার নামায, জামাতে নামায ফাসেক ইমামদের পিছনেও আদায় করেছেন; তাঁরা তাদের পিছনে আদায়কৃত নামায পুনরায় আদায় করতেন না। যেমন - ইবনে উমর হাজ্জাজের পিছনে নামায পড়তেন। ইবনে মাসউদ ও অন্যান্য সাহাবী ওয়ালিদ ইবনে উকবার পিছনে নামায পড়তেন। ওয়ালিদ বিন উকবা মদ্যপ ছিল। একবার ফজরের নামায চার রাকাত পড়েছে। এরপর বলল: আরো বাড়াব নাকি? তখন ইবনে মাসউদ বললেন: আজ তো আপনি বেশিই পড়িয়েছেন! এরপর তাঁরা তার বিরুদ্ধে ওসমান (রাঃ) এর নিকট অভিযোগ করেন। সহিহুল বুখারীতে এসেছে- ওসমান (রাঃ) যখন অবরুদ্ধ হলেন এবং জনৈক লোক এগিয়ে গিয়ে নামাযের ইমামতি করল তখন এক ব্যক্তি ওসমান (রাঃ) কে প্রশ্ন করল: নিঃসন্দেহে আপনি সর্বসাধারণের ইমাম। আর যে ব্যক্তি এগিয়ে এসে ইমামতি করল সে ফিতনার ইমাম। তখন ওসমান (রাঃ) বললেন: ভাতিষ্পুত্র শুন, নামায হচ্ছে- ব্যক্তির সবচেয়ে উত্তম কাজ। যদি লোকেরা ঠিকভাবে নামায আদায় করে তাদের সাথে ভাল ব্যবহার কর। আর যদি তারা মন্দ আচরণ করে তাদের সে মন্দ আচরণকে এড়িয়ে চল। এ ধরনের বাণী অনেক আছে।

ফাসেক বা বিদআতীর নামায সহিহ। অতএব, মোত্তাদি যদি তার পিছনে নামায পড়ে তাহলে তার নামায বাতিল হবে না। তবে, যারা বিদআতির পিছনে নামায পড়াকে মাকরুহ বলেছেন তারা দিক থেকে বলেছেন: সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ

ওয়াজিব। যে ব্যক্তি প্রকাশ্য বিদ'আত করে তাকে ইমাম হিসেবে নির্ধারণ না করাটা সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের অন্তর্গত। কেননা সে শাস্তিযোগ্য অপরাধী যতক্ষণ না তওবা করে। যদি তাকে এড়িয়ে চলা যায় যাতে করে সে তওবা করে সেটা— ভাল। যদি কোন কোন লোক তার পিছনে নামায পড়া ছেড়ে দিলে, অন্যেরা নামায পড়লে সেটা তার উপরে প্রভাব ফেলে যাতে করে সে তওবা করে অথবা বরখাস্ত হয় অথবা মানুষ এ জাতীয় গুনাহ থেকে দূরে সরে আসে এবং সে মোক্তাদির জুমা বা জামাত ছুটে না যায় যদি এমন হয় তাহলে এ ধরনের লোকের তার পিছনে নামায বর্জন করাতে কল্যাণ আছে। পক্ষান্তরে মোক্তাদির যদি জুমা ও জামাত ছুটে যাওয়ার আশংকা থাকে তাহলে তার পিছনে নামায বর্জন করাটা বিদ'আত এবং সাহাবায়ে কেরামের আমলের পরিপন্থী^{১১১}।

দুই: ইতিপূর্বের আলোচনা থেকে জানা যায় যে, যদি কেউ কোন খতীবকে বিদআতের দিকে ডাকে (যেমন যে বিদ'আত গুলোর কথা আপনি প্রশ্নে উল্লেখ করেছেন) অথবা বিদআতের ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করে অথবা দুর্বল ও বানোয়াট হাদীসগুলো উদ্ধৃত করতে গুনে তদুপরি তার জন্য মসজিদ ত্যাগ করা, খোতবা না-গুনা জায়েয হবে না। তবে যদি প্রভাবশালী আলেম হন এবং তিনি অন্য কোন খতীবের পিছনে নামায পড়বেন তাছাড়া ইতিপূর্বে ঐ খতীবকে নসিহত করেছেন, সত্যকে তার নিকট সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন-

^{১১১} আল-ফাতাওয়া আল-কুবরা (২/৩০৭-৩০৮)

তিনি তার পিছনে নামায বর্জন করতে পারেন। যদি তিনি ইতিপূর্বে তাকে নসিহত না করে থাকেন অথবা অন্য কোন মসজিদে তার নামায পড়ার সুযোগ না থাকে তাহলে অগ্রগণ্য মত হচ্ছে- খোতবাকালে মসজিদ থেকে বেরিয়ে যাওয়া জায়েয হবে না। তবে যদি এমন হয় যে, এ খতীবের পিছনে নামায পড়া জায়েয হবে না এমন পর্যায়ে তাহলে বেরিয়ে যেতে পারেন। প্রশ্নের জবাবে আমরা উল্লেখ করেছি জুমার নামাযের খতীব যদি কোন বিভ্রান্তির কথা বলে অথবা কোন বিদ'আত সাব্যস্ত করে অথবা শিরকের দিকে আহ্বান করে আমরা সে প্রশ্নের জবাবে খোতবার মাঝখানে প্রতিবাদ করাকে বৈধ উল্লেখ করেছি। তবে শর্ত হচ্ছে- মানুষের মাঝে বিশৃংখলা সৃষ্টি হতে পারবে না এবং জুমার নামায নষ্ট করা যাবে না। যে ব্যক্তি প্রতিবাদ করতে চায় তিনি খোতবা শেষে দাঁড়িয়ে মানুষের কাছে খতীবের ভুল তুলে ধরবেন।

যে ব্যক্তি প্রতিবাদ করতে চায় তার উচিত সত্য তুলে ধরা ও সে খতীবের সমালোচনার ক্ষেত্রে কোমল হওয়া। যাতে করে মন্দের প্রতিবাদ ফলপ্রসূ হয়।

স্থায়ী কমিটির আলেমগণকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে- যে খতীব তার খোতবার মাঝে অথবা গোটা খোতবা জুড়ে শুধু ইসরাইলী বর্ণনা ও দুর্বল হাদীস উল্লেখ করে এর মাধ্যমে মানুষকে চমকে দিতে চান ইসলামে এর হুকুম কী?

তাঁরা জবাবে বলেন: যদি আপনি সুনিশ্চিতভাবে (ইয়াকীনসহ) জানেন যে, খতীব খোতবার মধ্যে যে ইসরাইলী বর্ণনাগুলো উল্লেখ করেছেন

সেগুলো ভিত্তিহীন অথবা হাদীসগুলো দুর্বল তাহলে আপনি তাকে নসিহত করুন যেন অন্য সহিহ হাদীসগুলো উল্লেখ করে, আয়াতে কারীমাগুলো নিয়ে আসে। আর যে ব্যাপারে নিশ্চিতভাবে জানেন না সেটাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দিকে সম্পৃক্ত করবে না। যেহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ “দ্বীন হচ্ছে - নসিহত”। হাদীসটি ইমাম মুসলিম তাঁর সহিহ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। তবে নসিহত হতে হবে উত্তম পন্থায়; ককর্শ ও কঠিন আচরণের মাধ্যমে নয়। আল্লাহ আপনাকে তাওফিক দিন ও আপনাকে কল্যাণের ধারক বানান। শাইখ আব্দুল আযিয বিন বায, শাইখ আব্দুর রাজ্জাক আফিফি, শাইখ আব্দুল্লাহ গাদইয়ান^{১৮২}।

সার কথা হচ্ছে- যদি আপনি এমন কোন মসজিদে যেতে পারেন যেখানে বিদআত নেই, যে মসজিদের খতীব বিদআতের দিকে আহ্বান করে না সেটা ভাল। যদি না যেতে পারেন অথবা আপনাদের নিকটে অন্য কোন মসজিদ না থাকে তাহলে উল্লেখিত কারণে জামআত ও জুমা ত্যাগ করা আপনাদের জন্য জায়েয হবে না। আপনাদের কর্তব্য হচ্ছে- নসিহত করা ও আল্লাহর দিকে আহ্বান করা। দাওয়াতের ভাষা যেন কোমল হয় এবং পদ্ধতি যেন সুন্দর হয় সে ব্যাপারে সচেষ্টিত থাকা।

আসলে আমাদের খেয়াল রাখা উচিত যে, আমাদের দেশে এরকম বহু বিদআতী কাজ সংগঠিত হচ্ছে। তাই একজন খাঁটি মুসলিম কোন আমল সম্পাদনের আগে অবশ্যই পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখবে যে,

^{১৮২} ফাতাওয়াল লাজনাহ দায়িমা (৮/২২৯-২৩০)

তার কৃত আমলটি কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ দ্বারা প্রমানিত কি না? কিন্তু আমাদের দেশের সহজ সরল ধর্মপ্রাণ মানুষ এমন অনেক কাজ বা আমলের সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করে রেখেছেন যার সাথে শরীয়তে মুহাম্মাদ (সাঃ) আমলের সাথে কোন মিল নেই। এমন উল্লখযোগ্য বিদ'আত গুলো নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ-

- ১। শবে মেরাজের রাত্রি উদযাপন করা
- ২। মাহে শাবান ও শবে বরাত (شبه راءت) করণীয় ও বর্জনীয়
- ৩। শারীয়াতের দৃষ্টিতে ঈদে মীলাদুন্নাবী বা মীলাদ মাহ্ফিল
- ৪। কিয়াম নব আবিস্কৃত বিদ'আত
- ৫। মীলাদে কিয়াম করা
- ৬। নামাযের শুরুতে মুখে নিয়ত পাঠ করা
- ৭। ফরয নামাযের আগে-পরে দলবদ্ধভাবে জিকির করা
- ৮। ফরয সালাতের পরে সম্মিলিত মুনাজাতঃ একটি প্রচলিত বিদ'আত
- ৯। শাহাদাত আগুনে চুম্বন করা ও চোখে মাসাহ করা
- ১০। মৃত ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন বিদ'আত
- ১১। জানাযা নামাজ শেষে সম্মিলিতভাবে দুআ-মুনাজাত
- ১২। কবরে ফুল এবং ডাল পুঁতে দেওয়া শরিয়ত সম্মত নয় বরং বিদ'আত
- ১৩। কবর পাকা করা
- ১৪। কবর ওয়ালা মসজিদে সালাত/নামাজ পরা
- ১৫। কুলখানি বা চল্লিশা পালন

১৬। মৃত্যুবার্ষিকী পালন করা

১৭। রুহের মাগফেরাতের উদ্দেশ্যে ফাতিহা পাঠের বিদ'আত

১৮। মৃত ব্যক্তির কাযা বা ছুটে যাওয়া নামাজ সমূহের কাফফারা আদায় করা

১৯। কবরে মান্নত পেশ, পশু যবেহ এবং খতমে কুরআনের বিদ'আত

২২। কবরের কাছে বা মাযারে, পথের ধারে কুরআন পাঠ

২৩। সূফি তরিকা এবং তাদের সাথে অংশগ্রহণ

২৪। অলী আওলিয়াদের অসীলা গ্রহণ ও কাল্পনিক কারামাত

২৫। দুআ-মুনাজাতে নবী রাসূলের অসীলা দেয়া

২৬। আল্লাহকে পেতে মাধ্যম গ্রহণ ও বরকত হাসিল

২৭। পীর ব্যবসা বা পীরের মুরিদ হওয়া সর্ব নিকৃষ্ট বিদ'আত তেত্রিশ ওরস পালন করা

২৮। উচ্ছে কণ্ঠে বা চিৎকার করে যিকির করা

২৯। হালকায়ে যিকিরের অনুষ্ঠান করা

৩০। প্রচলিত পদ্ধতিতে কেক কেটে, মোমবাতি নিভিয়ে বার্থ-ডে বা

৩১। জন্মদিন পালন করা কি সুন্নাত না বিদ'আত

৩২। দুআকে অবহেলা করা ও আনুষ্ঠানিকতাকে উত্তম মনে করা

৩৩। দানের ক্ষেত্রে সুন্নাত পদ্ধতির চেয়ে প্রচলিত আনুষ্ঠানিকতাকে গুরুত্ব প্রদান ও কোনো দিন বা মৃত্যু দিনকে নির্ধারণ করা

৩৪। তাসবীহ গুনতে তাসবীহ-মালা ব্যবহার করা বিদ'আত

৩৫। বিভিন্ন প্রকার প্রচলিত খতমে (ختم) বিদ'আত

অধ্যায় - পাঁচ - আমাদের দেশে উল্লেখযোগ্য বিদ'আত প্রসঙ্গে প্রাসঙ্গিক আলোচনা
প্রথম পরিচ্ছেদ - শবে মেরাজের রাত্রি উদযাপন করা
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ - মাহে শাবান ও শবে বরাত করণীয় ও বর্জনীয়
শাবান মাসে রোজা রাখার বিধান
হাদীসের দৃষ্টিতে শবে বরাত
ফিকহের দৃষ্টিতে শবে বরাত
শবে বরাত নামাযের প্রথম প্রচলন
শবে বরাত নামাযের পদ্ধতি
শবে বরাত নামাযের হুকুম
ভ্রান্ত ধারণা ও সংশয় নিরসন
শবে বরাতে কুরআন নাযিল হয়েছে বলে ধারণা
শবে বরাতের রাতে আল্লাহ দুনিয়ার আকাশে নেমে আসার ধারণা
মৃত ব্যক্তির রুহ দুনিয়াতে আগমনের বিশ্বাস
হালুওয়া রুটির রহস্য
এ রাতে কবর যিয়ারতের পিছনে যুক্তি ও তা খন্ডন
মধ্যরাত্রির পরদিন কি রোযা রাখা যাবে
নিসফে শাবানের নামায সম্পর্কে বিন বায (রহঃ)
এর একটি ফতোয়া
শবে বরাতের রোযা
শবে বরাতের প্রচলন
এখন প্রশ্ন আসে আমল করতে হলে কিভাবে করা যাবে?
শাবানের মধ্যরজনীর ফযীলত সম্পর্কিত হাদীসসমূহের
শাবানের মধ্যরজনীর সম্পর্কিত হাদীসসমূহ পর্যালোচনার সারকথা
সৌভাগ্য রজনী ধর্ম বিকৃতির শামিল

শবে বরাত সম্পর্কে মুসলিম উম্মাহর অবস্থান
শবে বরাত সম্পর্কে একটি বিভ্রান্তির নিরসন
সন্দেহজনক নফল 'আমল থেকে দূরে থাকা উত্তম
তৃতীয় পরিচ্ছেদ - শারী'য়াতের দৃষ্টিতে 'ঈদে মীলাদুন্নবী বা মীলাদ মাহফিল
ঈদে মীলাদুন্নবী'র শাব্দিক বিশ্লেষণ
হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মদিন
মীলাদুন্নবী বা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের
জন্মদিবস পালন বা উদযাপন
ঈদে মীলাদুন্নবীর প্রাথমিক উদযাপন - যুগ ও প্রবর্তক পরিচিতি
ঈদে মীলাদুন্নবী ও মীলাদ আবিষ্কারের কাহিনী
বাদশাহ্ চরিত্রের বর্ণনা দিতে গিয়ে কয়েকজন প্রখ্যাত আলেমদের উক্তি
প্রচলিত মীলাদ - মাহফিল সম্পর্কে উলামায়ে কেরামের উক্তি
প্রচলিত মীলাদ পন্থীদের দলীল-প্রমাণ ও তার খন্ডন
সারকথা - মীলাদ মাহফিল করা বৈধ নয়
চতুর্থ পরিচ্ছেদ - কিয়াম - নব আবিষ্কৃত বিদ'আত
কিয়াম কাকে বলে
কিয়াম প্রচলনের ইতিহাস
সমাজ-সামাজিকতায় কিয়ামের হুকুম
পঞ্চম পরিচ্ছেদ - কিয়াম সম্পর্কে বিদ'আতীদের বক্তব্য ও তার খন্ডন
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ - বিয়ে সংক্রান্ত প্রচলিত কিছু বিদ'আত
বিবাহে প্রচলিত কু-প্রথার তালিকা
শরীয়তে বিবাহ বলতে কী বুঝায়
অভিভাবক হওয়ার শর্ত
বিবাহের তাৎপর্য

নারীদের জন্য বিবাহ বাধ্যতামূলক কি না
বিয়ের প্রস্তাব এবং তার নিয়ম
ইসলামের তালাক বিধান
তালাকের সहीহ পদ্ধতি
হিন্ধা বিয়ে ইসলাম বিরোধী ও নারীর প্রতি বৈষম্য তথা নব আবিষ্কৃত বিদ'আত
সপ্তম পরিচ্ছেদ - নামাযের শুরুতে মুখে নিয়ত পাঠ করা
নিয়তের গুরুত্ব
মুখে উচ্চারণকৃত নিয়তের ক্ষতিকারক দিক সমূহ
অষ্টম পরিচ্ছেদ - কতিপয় বিদ'আতী সালাত প্রসঙ্গে এবং জুমআর দিনের বিদ'আত প্রসঙ্গে প্রাসঙ্গিক আলোচনা
মা-বাপের জন্য নামায
ঈদের রাতের নামায
কাযা উমরী (উমরী কাযা)
স্বালাতুল আওয়াবীন
এহতিয়াতী যোহর
স্বালাতুল হিফয
মৃতের জন্য ঈসালে সওয়াবের নামায
মনগড়া প্রাত্যহিক নামায ও তার খেয়ালী সওয়াব
মনগড়া মাসিক নামায ও তার খেয়ালী সওয়াব
মহররম মাসের খেয়ালী নামায
সফর মাসের খেয়ালী নামায
রবিউল আওয়াল মাসের খেয়ালী নামায
রবিউস-সানী মাসের বিদ'আতী নামায
জুমাদাল আওয়াল মাসের খেয়ালী নামায

জুমাদাস সানী মাসের খেয়ালী নামায
রজব মাসের খেয়ালী নামায
শওয়াল মাসের খেয়ালী নামায
যুলকাদাহ মাসের খেয়ালী নামায
যুলহজ্জ মাসের খেয়ালী নামায
জুম'আর দিনের বিদ'আত প্রসঙ্গে প্রাসঙ্গিক আলোচনা
জুম'আর সালাতের জন্য দুই আযান দেওয়া
প্রচলিত জুম'আর খুতবা এবং মাতৃভাষায় জুম'আর খুতবা প্রসঙ্গে প্রাসঙ্গিক আলোচনা
মাতৃভাষায় খুতবা দান না করার যুক্তি
জুম'আর সালাতে বিদ'আত ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক আলোচনা
জুম'আর ফরজের আগে ও পরে কত রাকআত সালাত আদায় করব?
জুম'আর সালাত পড়া অবস্থায় যদি কোন মুক্তাদির ওয়ু ছুটে যায় তখন তার করণীয়
ঈদ ও জুম'আ একই দিনে হলে জুম'আ পড়ার হুকুম
মহিলাদের জুম'আয় শরীক হওয়া
নবম পরিচ্ছেদ - ফরয নামাযের আগে - পরে দলবদ্ধভাবে জিকির করা
দশম পরিচ্ছেদ - ফরয সালাতের পরে সম্মিলিত মুনাজাতঃ একটি প্রচলিত বিদ'আত
যে সকল স্থানে সহীহ হাদীস দ্বারা হাত তুলে দোয়া করার বিধান রয়েছে
বৃষ্টি প্রার্থনার জন্য
বৃষ্টি বন্ধের জন্য
চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণের সময়

উম্মাতের জন্য রাসূল (সাঃ) এর দোয়া
কবর জিয়ারতের সময়
কারো জন্য ক্ষমা চাওয়ার লক্ষ্যে হাত তুলে দোয়া
হজ্জে পাথর নিক্ষেপের সময়
যুদ্ধক্ষেত্রে
কোন গোত্রের জন্য দু'আ করা
সাফা মারওয়া সায়ী করার সময়
কুনুতে নাযেলার সময়
হাত তুলে দু'আ করার অন্যান্য সহীহ হাদীস সমূহ
হাত তুলে দু'আর প্রমাণে পেশকৃত যঈফ হাদীস সমূহ
ফরয সালাতের পরে সম্মিলিতভাবে হাত তুলে দু'আ করা সম্বন্ধে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ আলেমদের অভিমত
এগার তম পরিচ্ছেদ - পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের পর মুনাযাত
সালাত শেষে যে সকল দু'আ ও জিকির হাদীস দ্বারা প্রমাণিত
বার তম পরিচ্ছেদ - শাহাদাত আঙ্গুলে চুম্বন করা ও চোখে মাসাহ করা
তের তম পরিচ্ছেদ - মৃত ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন বিদ'আত
মৃত্যুর পরে সমাজে প্রচলিত আরও কতিপয় বিদ'আত সমূহ
চৌদ্দ তম পরিচ্ছেদ - জানাযা নামাজ শেষে সম্মিলিতভাবে দু'আ- মুনাযাত
মুজাদীদের কাতার কটা হবে?
মুসল্লী সংখ্যা কত হওয়া উচিত?
জানাযার নামাজ (صلاة الجنازة) পড়ার সহীহ নিয়ম
আত্মহত্যাকারী, বেনামাযী ও ফাসেকের জানাযা
গায়েবী জানাযা
মসজিদে জানাযার নামায চলে কিনা?

জানাযার ইমাম কে হওয়া উচিত?
জানাযার নামাজের সময়ের করণীয়
জানাযা নামাজ শেষে মুনাযাত
পনের তম পরিচ্ছেদ - কবরে ফুল এবং ডাল পুঁতে দেওয়া শরীয়ত সম্মত নয় বরং বিদ'আত
ষোল তম পরিচ্ছেদ - কবর পাকা করা
সতের তম পরিচ্ছেদ - কবর ওয়ালা মসজিদে সালাত/নামাজ পরার হুকুম কি
আঠার তম পরিচ্ছেদ - কুলখানি বা চল্লিশা পালন
উনিশ তম পরিচ্ছেদ - মৃত্যুবার্ষিকী পালন করা
বিশ তম পরিচ্ছেদ - রুহের মাগফেরাতের উদ্দেশ্যে ফাতিহা পাঠের বিদ'আত
একুশ তম পরিচ্ছেদ - মৃত ব্যক্তির কাযা বা ছুটে যাওয়া নামাজ সমূহের কাফফারা আদায় করা
বাইশ তম পরিচ্ছেদ - কবরে মান্নত পেশ, পশু যবেহ এবং খতমে কুরআনে বিদ'আত
তেইশ তম পরিচ্ছেদ - কবরের কাছে বা মাযারে, পথের ধারে কুরআন পাঠ
চব্বিশ তম পরিচ্ছেদ - সূফী তরিকা এবং তাদের সাথে অংশগ্রহণ
পচিশ তম পরিচ্ছেদ - অলী আওলিয়াদের অসীলা গ্রহণ : ইসলামী দৃষ্টিকোণ
ছাব্বিশ তম পরিচ্ছেদ - অসীলা গ্রহণ কী? এর বৈধতা কতটুকু?
সাতাশ তম পরিচ্ছেদ - কাল্পনিক কারামত
আঠাশ তম পরিচ্ছেদ - দুআ-মুনাযাতে নবী রাসূলের অসীলা দেয়া : একটি পর্যালোচনা
উনত্রিশ তম পরিচ্ছেদ - আল্লাহকে পেতে মাধ্যম গ্রহণ ও বরকত

হাসিল
বরকত হাসিল - আত - তাবাররুফ
বিভিন্ন শ্রেণীর কল্যাণকর বিষয়
যা দ্বারা বরকত হাসিল নিষিদ্ধ
রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কবর যিয়ারতের সহীহ নিয়ম
নিষিদ্ধ জিনিস থেকে বরকত হাসিলের কারণ
নিষিদ্ধ পন্থায় বরকত হাসিল প্রতিরোধের উপায়
ত্রিশ তম পরিচ্ছেদ - পীর ব্যবসা বা পীরের মুরিদ হওয়া সর্ব নিকৃষ্ট বিদ'আত এবং তাসাউফ ও তাসাউফ বিস্তারের কারন এবং বিশদ আলোচনা
তাসাউফ
তাসাউফ বিস্তারের কারণ
তাসাউফের প্রকারসমূহ
বিভিন্ন ফিরকার সাথে তাসাউফের সম্পর্ক
উম্মতে মুসলিমার উপর তাসাউফের প্রভাব
একত্রিশ তম পরিচ্ছেদ - ওরস
বত্রিশ তম পরিচ্ছেদ - উচ্ছে কঠে বা চিৎকার করে যিকির করা
তেত্রিশ তম পরিচ্ছেদ - হালকায়ে যিকিরের অনুষ্ঠান করা
চৌত্রিশ তম পরিচ্ছেদ - রাসূলের তাবলীগ বনাম প্রচলিত তাবলীগ
ইলায়াসী তাবলীগ বনাম রাসূলের তাবলীগ এর পার্থক্য
তাবলীগ জামাত এর গ্রন্থ (ফাযায়েল আমল)
স্বপ্ন কি দলিল?
স্বপ্নযোগে নবী করীম (সাঃ) কে দেখলেও এবং তার নিকট হতে কোনো নির্দেশ পেলেও তা পালন করার কোনো দায়িত্ব স্বপ্নদ্রষ্টারও

নেই, নেই উম্মতের কোনো লোকেরও তথা পীর ফকিরেরও। কারন দ্বীন ইসলাম পরিপূর্ণ - স্বপ্নের ফয়সালা মেনে নেয়া কি যাবে - না কি এটা স্পষ্ট একটা বিদয়াত?
চিল্লা প্রথা
বিশ্ব ইজতেমা প্রসঙ্গ
বিশ্ব বরণ্য আলিমগণের দৃষ্টিতে তাবলীগ জামা'আত ও তার নিসাব
পয়ত্রিশ তম পরিচ্ছেদ - জন্মদিন পালন করা বিদ'আত
জন্মদিন পালন এর সূচনা কাদের থেকে সৃষ্ট
বিভিন্ন ধর্মে জন্মদিন পালনের বিধান প্রসঙ্গে
ইসলামের ধর্মের দৃষ্টিতে জন্মদিন পালন শরীয়তসম্মত কি না?
ছত্রিশ তম পরিচ্ছেদ - দুআকে অবহেলা করা ও আনুষ্ঠানিকতাকে উত্তম মনে করা
সাতত্রিশ তম পরিচ্ছেদ - দানের ক্ষেত্রে সুন্নাত পদ্ধতির চেয়ে প্রচলিত আনুষ্ঠানিকতাকে গুরুত্ব প্রদান
আটত্রিশ তম পরিচ্ছেদ - কোনো দিন বা মৃত্যু দিনকে নির্ধারণ করা
উনচল্লিশ তম পরিচ্ছেদ - “স্বাদাক্বাল্লাহুল আযীম” (صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ) পড়া কি শরীয়ত সম্মত?
চল্লিশ তম পরিচ্ছেদ - তাসবীহ গুনতে তাসবীহ - মালা ব্যবহার করা কি বিদ'আত
একচল্লিশ তম পরিচ্ছেদ - হজ্জের বিদ'আতসমূহ
বেআল্লিশ তম পরিচ্ছেদ - বিভিন্ন প্রকার প্রচলিত খতমে বিদ'আত
খতমে কুরআন
ঈসালে সওয়াবে সঠিক পদ্ধতি
অভিজ্ঞতার দোহাই দিয়ে বৈধ করা
খতমে বুখারী

খতমে না-রী
অজুহাত ও তার পর্যালোচনা
খতমে ইয়াসিন
‘ইয়াসিন’ খতমের একটি বানোয়াট পদ্ধতি
প্রয়োজন পূরণে ইয়াসিনের খতম যার পদ্ধতি নিম্নরূপ
খতমে শিফা
খতমে তাহলীল
খতমে তাসমিয়া
খতমে খাজেগান
খতমে জালালী
খতমে দুরুদে মাহি
সূরা ইখলাস দ্বারা কুরআন খতম
তেতাল্লিশ তম পরিচ্ছেদ - মুহাররম মাসের সুন্নাত ও বিদ'আত
মুহাররম মাসের সুন্নাতী আমল
আশুরার সিয়ামের ফযীলত
আশুরার সিয়াম পালনের উদ্দেশ্য
মুহাররম মাসের বিদ'আত সমূহ
শাহাদতে হুসাইনের শোক পালনের উদ্দেশ্যে সিয়াম পালন করা
১০ই মুহাররমকে আনন্দ উৎসবে পরিণত করা
তা'যিয়া
১০ই মুহাররমে চোখে সুরমা লাগানো
১০ই মুহাররমে বিশেষ ফযীলতের আশায় বিশেষ পদ্ধতিতে সালাত আদায় করা
তাবেঈ ইয়াযীদ বিন মু'আবিয়া-কে ‘মালউন’ বা অভিশপ্ত বলে গালি দেওয়া

চৌআল্লিশ তম পরিচ্ছেদ - পোশাক পরিচ্ছেদের বিদ'আত
পয়তাল্লিশতম পরিচ্ছেদ - তওহীদি আকীদায় শিরক এর বিদ'আত
ছেচাল্লিশতম পরিচ্ছেদ - কদমবুসির বিদ'আত
সাতচাল্লিশতম পরিচ্ছেদ - শরীয়তের উৎস কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ এবং প্রচলিত ইজমা ও কিয়াস নব উদ্ভাবিত বিদ'আত
শরীয়াহ্ কি
ইসলামী শরীয়াহ্ এর দলীল ও উৎসসমূহ
শরীয়াহ্ ও ইজতিহাদ
শরীয়াহ্ কি উন্নয়ন ও আধুনিকতা বিরোধী?
কতিপয় সংশয়ের অপনোদন

অধ্যায় - পাঁচ - আমাদের দেশে উল্লেখযোগ্য বিদ'আত প্রসঙ্গে প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আমাদের দেশে বহু বিদআতী কাজ সংগঠিত হচ্ছে। তাই একজন খাঁটি মুসলিম কোন আমল সম্পাদনের আগে অবশ্যই পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখবে যে, তার কৃত আমলটি কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত কি না? কিন্তু আমাদের দেশের সহজ সরল ধর্মপ্রাণ মানুষ এমন অনেক কাজ বা আমলের সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করে রেখেছেন যার সাথে শরীয়তে মুহাম্মাদ (সাঃ) আমলের সাথে কোন মিল নেই। এমন উল্লেখযোগ্য বিদ'আত গুলো নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ-

- (১) শবে মিরাজ ও শবে-বরাত পালন করা।
- (২) ঈদে মিলাদুন্নবী বা মিলাদ মাহফিল এর অনুষ্ঠান করা।
- (৩) প্রচলিত পদ্ধতিতে বিবাহ অনুষ্ঠান যা শরীয়ত সম্মত নয়।
- (৪) মৃত ব্যক্তির কাযা বা ছুটে যাওয়া নামাজ সমূহের কাফফারা আদায় করা।
- (৫) মৃত্যুর পর তৃতীয়, সপ্তম, দশম এবং চল্লিমতম দিনে খাওয়া-দাওয়া ও দুআর অনুষ্ঠানের আয়োজন করা।
- (৬) ইসালে সওয়াব বা সাওয়ার রেসানী বা সওয়াব বখশে দেওয়ার অনুষ্ঠান করা।
- (৭) মৃত ব্যক্তির রুহের মাগফিরাতের জন্য অথবা কোন বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য খতমে কুরআন অথবা খতমে জালালীর অনুষ্ঠান করা।
- (৮) উচ্ছে কঠে বা চিৎকার করে যিকর করা।

(৯) হালকায়ে যিকিরের অনুষ্ঠান করা।

(১০) মনগড়া তরীকায় পীরের মুরিদ হওয়া

(১১) ফরয, সুন্নত, নফল ইত্যাদি সালাত শুরু করার আগে মুখে উচ্চারণ করে নিয়ত পড়া।

(১২) প্রসাব করার পরে পানি থাকা সত্ত্বেও অধিকতর পবিত্রতা হাসিলের উদ্দেশ্যে কুলুখ নিয়ে ২০/৪০/৭০ কদম হাঁটহাঁটি করা বা জোরে কাশি দেওয়া অথবা উভয় পায়ে কেঁচি দেওয়া বা বেহায়াপনা।

(১৩) ৩টি অথবা ৭টি চিল্লা দিলে ১ হজ্জের সওয়ার হবে এমনটি মনে করা।

(১৪) সম্মিলিত যিকির বা যিকিরে নানা অঙ্গভঙ্গি করা।

(১৫) উত্তম যিকির লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু কে সংকুচিত করে শুধু আল্লাহ, আল্লাহ বলা বা শুধু ইল্লাল্লাহু বা হু হু করা ইত্যাদি।

(১৬) দোয়া গানজুল আরশ, দোয়া জামিলা, দোয়া সুরয়ানী, দোয়া আক্বাশাহ, দোয়া হিব্বুল বাহার, দোয়া আমন, দোয়ায়ে হাবীব, আহাদ নামা, দরুদে তাজ, দরুদে শাহী, দরুদে তুনাজ্জিনা, দরুদে আকবর, হফত্ হায়কল শরীফ, চেহেল কাফ, কাদহে মুআয্যাম, শশ কুফল, ইত্যাদি ওযীফা সমূহ গুরুত্বের সহিত পড়া।

এ সব ওযীফা আমাদের দেশে বাস, ট্রেন, গাড়ী ও সাধারণ দোকান গুলিতে খুবই স্বল্প মূল্যে পাওয়া যায় যা সাদা-সিধে অজ্ঞ মুসলিম ভায়েরা ক্রয় করে থাকেন। প্রয়োজন বশত দুঃখ-মুসিবতের সময় কাজে লাগিয়ে থাকে। অথচ ইসলামে এর কোন ভিত্তি নেই এবং সম্পূর্ণ বিদআত।

প্রথম পরিচ্ছেদ - শবে মেরাজের রাত্রি উদযাপন করা

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মিরাজে গমন উপলক্ষে বিশেষ অনুষ্ঠান পালন করা এবং রজব মাসের ২৭ তারিখের রাত্রিতে শবে মিরাজের নামে এ রাত্রি উদযাপন করা ও এতে বিভিন্ন ইবাদতে লিপ্ত হওয়া বিদ'আত। এমনিভাবে হিজরী নব বর্ষ পালন করা এবং এতে শুভেচ্ছা বিনিময় করার ক্ষেত্রে শরীয়তের কোন দলীল নাই^{১৮৩}। তাছাড়া রজব মাস তথা শবে মেরাজ কে কেন্দ্র করে এবং ফজীলতপূর্ণ মনে করে এ মাসে বিভিন্ন ইবাদত করা বিদ'আত। এ মাসে ওমরাহ পালন করা। এটাকে রজবী ওমরাহ বলা হয়ে থাকে, বেশী করে নফল নামায পড়া এবং নফল রোযা রাখা, সবই বিদআতের অন্তর্ভুক্ত। কেননা অন্যান্য মাসের উপর রজব মাসের আলাদা কোন ফজীলত নেই। এ মাসের ওমরাহ, নামায, রোযা এবং অন্য কোন প্রকার ইবাদতে অন্য মাসের চেয়ে অতিরিক্ত কোন সওয়াব পাওয়া যায়না।^{১৮৪}

নিম্নে রজব মাসকে কেন্দ্র করে কতিপয় যেসব নতুন আবিষ্কৃত আমল (বিদ'আত) পালিত হয় তা সংক্ষেপে বিস্তারিত আলোচনা করা হলোঃ-

১. রজব মাসের রোজাঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তার সাহাবাদের থেকে রজব মাসের রোজার ফজীলতের ব্যাপারে প্রামাণ্য কোন দলিল নেই। তবে অন্যান্য মাসের মত এ মাসেও,

^{১৮৩} ইসরা ও মিরাজের ফলাফলু আবু মুহাম্মাদ যাকারিয়া, ইসলাম হাউজ।

^{১৮৪} তথ্যসূত্রঃ ডঃ শাইখ সালেহ বিন ফাউযান (হাফিযাছল্লাহ)। অনুবাদকঃ শাইখ আব্দুল্লাহ শাহেদ মাদানী। দাঈ ও শিক্ষক হিসেবে কর্মরতঃ জুবাইল দাওয়াহ এন্ড গাইডেন্স সেন্টার, সৌদী আরব।

সপ্তাহের সোমবার, বৃহস্পতিবার, মাসের তেরো, চৌদ্দ, পনেরো তারিখ, একদিন রোজা রাখা, পরের দিন না রাখা- সওয়াবের, বৈধ ও সুন্নত। ওমর (রাঃ) রজব মাসের রোজা হতে নিষেধ করতেন। কারণ, এতে ইসলাম-পূর্ব কুসংস্কারাচ্ছন্ন জাহেলি যুগের সাথে সামঞ্জস্য বিদ্যমান। হাফেজ ইবনে হাজার (রহঃ) বলেন, রজবের নির্দিষ্ট-অনির্দিষ্ট দিনের রোজা, কিংবা রজবের নির্দিষ্ট কোন রাতের রোজার ব্যাপারে প্রমাণ যোগ্য কোন সহিহ হাদীস বর্ণিত হয়নি। যে কয়টি সুস্পষ্ট অর্থবহ হাদীস বর্ণিত হয়েছে, তা দুভাগে বিভক্ত। জইফ বা দুর্বল, মওজু বা (বানোয়াট) জাল হাদীস। তিনি সব কয়টি হাদীস একত্র করেছেন, দেখা গেছে, ১১টি দুর্বল হাদীস, ২১টি জাল হাদীস। ইবনে কাইয়ুম (রহঃ) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লাগাতার তিন মাস (রজব, শাবান, রমজান) রোজা রাখেননি- যেমন কিছু লোক করে থাকে। রজবে কখনো রোজা রাখেননি, রোজা পছন্দও করেননি। লাজনায়ে দায়েমার ফতওয়াতে আছে, রজবের কতক দিনকে রোজার জন্য নির্দিষ্ট করার ব্যাপারে আমাদের কোন দলিল জানা নেই।

২. রজব মাসে ওমরা পালন করাঃ কোন হাদীসে প্রমাণ নেই, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রজব মাসে ওমরা করেছেন। এ জন্য নির্দিষ্ট ভাবে রজবে ওমরা করা কিংবা এতে ওমরার বিশেষ ফজিলত আছে-বিশ্বাস করা বিদআত। শায়েখ মুহাম্মাদ ইব্রাহিম (রহঃ) তার ফতওয়াতে বলেন, রজব মাসকে জিয়ারত ইত্যাদির মত আমল দ্বারা নির্দিষ্ট করার পিছনে কোন মৌলিক ভিত্তি নেই। কারণ,

ইমাম আবু শামা স্বীয় কিতাবে كتاب البدع والحوادث প্রমাণ করেছেন, শরীয়তকে পাশ কাটিয়ে বিশেষ কোন সময়ের সাথে কোন এবাদত নির্দিষ্ট করা অনুচিত, অবৈধ। কারণ, শরীয়ত কর্তৃক বিশেষ কিংবা সাধারণ আমলের জন্য কোন সময় নির্ধারণ করণ ব্যতীত, সব দিন-ক্ষণ-সময় সমান মর্যাদার। এ জন্যই ওলামায়ে কেরাম রজব মাসে বেশি বেশি ওমরা করতে নিষেধ করেছেন। তবে কেউ যদি স্বাভাবিক নিয়মে (ফজিলতের বিশ্বাস বিহীন) রজব মাসে ওমরা করে, তাতে দোষ নেই। কারণ, এ সময়েই তার জন্য ওমরা করার সুযোগ হয়েছে।

৩. সালাতে রাগায়েবঃ হাদীস শাস্ত্রে কতিপয় মিথ্যাচারের দ্বারা এ নামাজের সূচনা হয়। এ নামাজ রজবের প্রথম রাতে পড়া হয়। এ ব্যাপারে ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, এটি নিন্দনীয়, ঘৃণিত, জঘন্যতম বেদআত যা কয়েকটি অপরাধ ও নিষিদ্ধ কর্মের সমন্বয়ে রচিত। সুতরাং একে পরিত্যাগ করা, এর থেকে বিরত থাকা এবং এর সম্পাদনকারীকে নিষেধ করা কর্তব্য। শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলেন, ইমাম মালেক, শাফি, আবু হানিফা, সাওরি, লাইস প্রমুখের মতে সালাতে রাগায়েব বেদআত। হাদীস বিশারদগণের দৃষ্টিতে এ ব্যাপারে বর্ণিত সকল হাদীস জাল, বানোয়াট।

৪. রজব মাসের ২৭ তারিখ রজনী লাইলাতুল মিরাজ মনে করে জমায়েত হওয়া ও মাহফিল করাঃ মেরাজের রজনী কিংবা মেরাজের মাস নির্ধারণের ব্যাপারে কোন প্রমাণ দাঁড় করানো সম্ভব হয়নি। এ

নিয়ে অনেক মতভেদ আছে, সত্য অনুদ্বাটিত। তাই এ ক্ষেত্রে নিশ্চুপ থাকাই শ্রেয়। মেরাজের রজনী নির্দিষ্ট করণের ব্যাপারে কোন বিশুদ্ধ হাদীস বর্ণিত হয়নি। যা বিদ্যমান আছে, সব জাল, ভিত্তিহীন^{১৮৫}। অতএব এ রাতে অতিরিক্ত এবাদত ধার্য করা, যেমন রাত জাগা, দিনে রোজা রাখা, অথবা ঈর্ষা, উল্লাস প্রকাশ করা, নারী-পুরুষ অবাধ মেলা-মেশা, গান-বাদ্যসহ মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করা, যা বৈধ, শরিয়ত কর্তৃক স্বীকৃত ঈদেও না-জায়েজ-হারাম, এখানের তো বলার অপেক্ষা রাখে না। তাই এ বিষয়ে বলা যায় যে, রজব মাসের প্রথম জুমার রাতে মাহফিল করা বিদ'আত ও গর্হিত কাজ। ইমাম আবু বকর তরতুশী উল্লেখ করেন, আবু মুহাম্মাদ আল মাকদেসী (রহঃ) তাকে অবহিত করেছেন যে, রজব মাসে এ মীলাদ মাহফিল বায়তুল মুকাদ্দাসে ৪৮০ হিঃ সনে শুরু হয়। ইতিপূর্বে এ মাহফিল সম্পর্কে কিছু শুনিনি, দেখিওনি^{১৮৬}। বস্তুতঃ ইসরা ও মিরাজ আল্লাহ তা'আলার নিদর্শনাবলীর অন্যতম। যা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সত্যতা, আল্লাহর কাছে তাঁর উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন হওয়া, আল্লাহর কুদরত এবং তার আরশে অবস্থানের প্রতি ইঙ্গিত বহন করে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي
(۱) بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. (الإسراء)

^{১৮৫} বেদায়া নেহায়া ২:১০৭, মাজমুউল ফতওয়া ২৫:২৯৮

^{১৮৬} আল-হাওয়াদেস ওয়াল বিদআতঃ ২৬৭

অর্থঃ পবিত্র ও মহিমাময় তিনি যিনি স্বীয় বান্দা (রাসূলুল্লাহ) কে রাতে মসজিদুল হারাম হতে মসজিদুল আকসা পর্যন্ত ভ্রমণ করিয়েছিলেন তাকে নির্দশনাবলী দেখাবার জন্য। যার চারপাশ আমি বরকতময় করেছিলাম, তিনিই সর্বশ্রোতা সর্বদ্রষ্টা^{১৮৭}। হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আসমানে ভ্রমণ করেছিলেন, তাঁর জন্য আসমানের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়েছিল। এ পর্যায়ে তিনি সাত আসমান ভ্রমণ করেন। প্রথমে পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত ফরয করেছিলেন। অতঃপর আল্লাহ তাআলার কাছে বারবার যেতে থাকলে ও সহজ করার প্রার্থনা করতে থাকলে আল্লাহ তাআলা পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয করেন। তবে পাঁচ ওয়াক্তের বিনিময়ে পঞ্চাশ ওয়াক্তের সাওয়াব দিবেন। কেননা উম্মতে মুহাম্মাদীর প্রত্যেকটি নেক আমল দশ গুণ বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। তাই আল্লাহ তাআলার অসংখ্য নিয়ামতের শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি^{১৮৮}।

মিরাজের রাতে কোন মীলাদ মাহফিল, শরীয়ত অসমর্থিত কোন প্রকার ইবাদত না করা কয়েকটি কারণে জরুরী। যেমনঃ

এক : কোন রাতে মিরাজ সংঘটিত হয়েছে, তা নির্ধারণের ব্যাপারে কোন বিশুদ্ধ হাদীস নেই। কারো মতে নবুওয়াত প্রাপ্তির ১৫মাস পর, কারো মতে হিজরতের এক বছর পূর্বে রবিউল সানীর ২৭তম রাতে, কারো মতে নবুওয়াত প্রাপ্তির পাঁচ বছর পর, কারো মতে রবিউল আউয়ালের ২৭ তারিখ^{১৮৯}। ইমাম আবু শামা (রহঃ) বলেন,

^{১৮৭} ইসরা : ১

^{১৮৮} আত-তাহযীর মিনাল বিদআ : ১৬

^{১৮৯} ইমাম নববীর শরহে মুসলিম : ২/২৬৭

কতিপয় ঐতিহাসিকের মতে, ইসরা রজব মাসে হয়েছিল, যা বিজ্ঞজনের মতে সঠিক নয়^{১১০}। ইবনুল কাইয়্যিম (রহঃ) বলেন, ইসরা কোন রাতে হয়েছিল তা সঠিক ভাবে জানা নেই^{১১১}। আল্লামা আব্দুল আযীয ইবনে বায (রহঃ) বলেন, যে রাতে ইসরা ও মিরাজ সংঘটিত হয়েছিল তা রজব মাসে, না কি অন্য কোন মাসে, এটা নির্ধারণের জন্য কোন বিশুদ্ধ হাদীস নেই, আর তারিখ নির্ধারণের জন্য বর্ণিত সকল হাদীস মুহাদ্দিসগণের মতে বিশুদ্ধ নয়। মিরাজের তারিখ ভুলিয়ে দেয়ার মধ্যে আল্লাহর অনেক হিকমত নিহিত আছে^{১১২}। আর যদি তার জন্য নির্ধারিত কোন রাত প্রমাণিত হয়, তথাপি প্রমাণ ছাড়া তাতে বিশেষ কোন ইবাদত করা বৈধ হবে না।

দুই : কোন মুমিন বা আলেম থেকে এ কথা প্রমাণিত নেই যে, তারা মিরাজের রাতের বিশেষ কোন ফযীলত নির্ধারণ করেছেন। কেননা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ী ও তাবে তাবেয়ীগণ এ রাতে কোন ধরনের মাহফিল করতেন না, এ রাতকে ইবাদতের জন্য খাছ করতেন না এবং এ বিষয়ে কোন আলোচনা করতেন না। যদি মাহফিল করা শরীয়তে জায়েয হত তাহলে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অবশ্যই তা বর্ণনা করতেন অথবা আমল করে দেখাতেন। অবশ্যই তা প্রচার-প্রসার হত এবং তার সহীহ প্রমাণ পাওয়া যেত^{১১৩}।

^{১১০} কিতাবুল হাওয়াদেস ওয়াল বিদআ : ২৩২পৃ:

^{১১১} যাদুল মা আদ : ১/৫৮

^{১১২} আত তাহযীর মিনাল বিদআত : ১৭

^{১১৩} যাদুল মাআদ : ১/৫৮

তিন : আল্লাহ তাআলা এ উম্মতের জন্য দ্বীন পূর্ণাঙ্গ করে দিয়েছেন ও নিয়ামত পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেনঃ

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا.

অর্থঃ আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন পূর্ণাঙ্গ করলাম। তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীন হিসাবে মনোনীত করলাম^{১৯৪}। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেনঃ

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَالَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وَلَوْ لَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَفُضِّي بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ.

অর্থঃ তাদের কি কতগুলো দেবতা আছে যারা তাদের জন্য বিধান দিয়েছে? এমন দ্বীনের, যার অনুমতি আল্লাহ দেননি। ফায়সালার ঘোষণা না থাকলে তাদের বিষয়ে তো সিদ্ধান্ত হয়েই যেতো। নিশ্চয়ই যালিমদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি^{১৯৫}।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিদ'আত সম্পর্কে সতর্ক করে বলেছেন "প্রত্যেক বিদ'আত ভ্রষ্টতা তা প্রত্যাখ্যাত হবে তার প্রবর্তক ও আমলকারীসহ"। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ. (متفق عليه)

^{১৯৪} মায়েরা : ৩

^{১৯৫} সূরা: ২১

অর্থঃ যে ব্যক্তি আমাদের এ দ্বীনে এমন কিছু নতুন আবিষ্কার করেছে যা দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত নয়, তা প্রত্যাখ্যাত^{১৬৬}। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অন্যত্র আরও বলেনঃ

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ. (مسلم)

অর্থঃ যে এমন কোন আমল করে যাতে আমাদের কোন নির্দেশনা নেই তা প্রত্যাখ্যাত^{১৬৭}। সলফে সালাহীন বিদআত সম্পর্কে সতর্ক করেছেন। কেননা তা দ্বীনের মধ্যে অতিরঞ্জন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অনুমতি ছাড়া কোন কিছু শরীয়তে অন্তর্ভুক্ত করা এবং ইহুদী-খ্রীষ্টানদের ন্যায় দ্বীনের মধ্যে অতিরঞ্জনের নামান্তর^{১৬৮}।

উপরন্তু মেরাজ রাত্রি ঐতিহাসিকভাবেও সুনির্দিষ্ট নয়। প্রমাণিত মনে করলেও এতে মাহফিল করার কোন জো নেই। কারণ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কেরাম এবং আদর্শ পূর্বসূরীগণ হতে এ ব্যাপারে কোন দিক-নির্দেশনা পাওয়া যায়নি।

৫. রজব মাসে গুরুত্বসহকারে কবর জিয়ারত করাঃ এটিও বিদআত। কারণ, কবর জিয়ারত বছরের যে কোন সময় হতে পারে।

৬. রজব মাসে পশু জবাই বা এ জাতীয় কিছু উৎসর্গ করাঃ জাহিলিয়াতে রজব মাসকে নির্দিষ্ট করে এ ধরনের আমল সম্পাদন করা হত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা নিষেধ করেন।

^{১৬৬} বুখারী: ২৬৯৭ ও মুসলিম: ১৭১৮

^{১৬৭} মুসলিম :১৭১৮

^{১৬৮} আত-তাহযীর মিনাল বিদআ-ইবনে বায (র) ১৯ পৃ

ইমাম ইবনে রজব বলেন, রজব মাসে পুন্য মনে করে জবাই করা, ঈদ-উৎসব উদযাপন করার মত। অধিকন্তু আরও বলা যায় যে, রজব মাসের প্রথম জুমুআর রাতে অথবা ২৭শে রজব যে বিশেষ শবে মিরাজের সালাত ও বিদ'আত সাব্যস্ত হয়ে থাকে। কারন হিসাবে উল্লেখ করা যায় যে, “সালাফে সালাহীন তথা সাহাবায়ে কেলাম, ও তাবেরীন যদি কোন বাধা না থাকা সত্ত্বেও কোন ইবাদাতের কাজ করা কিংবা বর্ণনা করা অথবা লিপিবদ্ধ করা থেকে বিরত থেকে থাকেন, তাহলে এমন পরিস্থিতিতে তাদের বিরত থাকার কারণে প্রমাণিত হয় যে, কাজটি তাদের দৃষ্টিতে শরীয়তসিদ্ধ নয়। কারণ তা যদি শরীয়তসিদ্ধ হত তাহলে তাদের জন্য তা করার প্রয়োজন বিদ্যমান ছিল। তা সত্ত্বেও যেহেতু তারা কোন বাধা বিপত্তি ছাড়াই উক্ত আমল ত্যাগ করেছেন, তাই পরবর্তী যুগে কেউ এসে সে আমাল বা ইবাদাত প্রচলন করলে তা হবে বিদ'আত। হুজাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, “যে সকল ইবাদাত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাহাবাগণ করেন নি তোমরা সে সকল ইবাদাত কর না।”

রজব মাসে করণীয় ও বর্জনীয়

নিজের কিংবা অন্যের ওপর যুলম করা হতে বিরত থাকা, যার অর্থ- ইবাদতে আত্মনিয়োগ করা, বেশি বেশি নেক আমল করা, আল্লাহ কর্তৃক সংরক্ষিত ও নিষিদ্ধ বিষয় বস্তু পরিত্যাগ করা। অর্থাৎ নিখাদ তওবা করা, আল্লাহ তা'আলার শরণাপন্ন হওয়া, রমযান মাসের ভাগ্যবান ও লাইলাতুল কদরের মুক্তিপ্রাপ্ত হওয়ার জন্য প্রস্তুতি নেওয়া প্রয়োজন।

সুপ্রিয় পাঠক ও পাঠিকাবৃন্দ, আসুন বর্তমান মাস থেকেই নিজেদের তৈরি করি। আল্লাহর ইবাদত, আনুগত্য, অনুসরণে ব্রত হওয়ার জন্য অন্তর ও শরীরের অনুশীলন গ্রহণ করুন।

শবে মেরাজের সালাত প্রসঙ্গে

ইমাম ইযযুদ্দীন ইবনু আব্দুস সালাম (রহঃ) এ প্রকার সালাত এর বৈধতা অস্বীকার করে বলেন, “এ প্রকার সালাত যে বিদ’আত তার একটি প্রমাণ হলো দ্বীনের প্রথম সারির উলামা ও মুসলমানদের ইমাম তথা সাহাবায়ে কিরাম, তাবেয়ীন, তাবে তাবেয়ীন ও শরীয়াহ বিষয়ে গ্রন্থ প্রণয়নকারী বড় বড় আলিমগণ মানুষকে ফরয ও সুন্নাত বিষয়ে জ্ঞান দানের প্রবল আগ্রহ পোষণ করা সত্ত্বেও তাদের কারো কাছ থেকে এ সালাত সম্পর্কে কোন বর্ণনা পাওয়া যায় নি এবং কেউ তাঁর নিজ গ্রন্থে এ সম্পর্কে কিছু লিপিবদ্ধও করেন নি ও কোন বৈঠকে এ বিষয়ে কোন আলোকপাতও করেননি। বাস্তবে এটা অসম্ভব যে, এ সালাত আদায় শরীয়তে সুন্নাত হিসেবে বিবেচিত হবে অথচ দ্বীনের প্রথম সারির আলিমগণ ও মুমিনদের যারা আদর্শ, বিষয়টি তাদের সকলের কাছে থেকে যাবে সম্পূর্ণ অজানা”^{১৯৯}। এ প্রসঙ্গে ইমাম আবু শামা (রহঃ) বলেন, সালাতে রাগায়েব যা মানুষের মাঝে এখনও প্রসিদ্ধ হয়ে গেছে, তা রজব মাসের প্রথম জুমার রাতে মাগরিব ও ইশার সালাতের মধ্যবর্তী সময়ে পড়া হয়^{২০০}। ইবনে রজব (রহঃ) বলেন, রজব মাসের সাথে নির্দিষ্ট করে কোন সালাত আদায় করা

^{১৯৯} আত তারগীব আন সলাতির রাগাইব আল মাওদুয়া, পৃঃ ৫-৯

^{২০০} কিতাবুল বায়েস আলা ইনকারিল বিদয়ে ওয়াল হাওয়াদেস : ২৩৮

সঠিক নয়। রজব মাসের প্রথম জুমার রাতে সালাতে রাগায়েব সংক্রান্ত বর্ণিত সকল হাদীস মিথ্যা ও অশুদ্ধ। আর জমহুর আলেমের মতে এ সালাত বিদ'আত ^{২০১}। হাফেয ইবনে হাজার (রহঃ) বলেন, রজব মাসের ফযীলত, তাতে সিয়াম পালন এবং এর বিশেষ কোন রাতে সালাত আদায় সম্পর্কে কোন বিশুদ্ধ হাদীস নেই^{২০২}। অতঃপর তিনি বলেন, যে সকল হাদীসে রজব মাসের ফযীলত বা তাতে সিয়াম পালনের ফযীলত সম্পর্কে বর্ণনা রয়েছে, তা দু' প্রকার। ১. যয়ীফ ও ২. মওজু। অতঃপর তিনি সালাতে রাগায়েবের হাদীস উল্লেখ করেন। তাতে রয়েছে রজবের প্রথম বৃহস্পতিবার সিয়াম পালন, এরপর মাগরিব ও ইশার মাঝখানে বার রাকাত সালাত আদায়, প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতেহা ১বার, সূরা রুদর ৩ বার, ১২বার সূরা ইখলাস পড়া এবং প্রত্যেক দু'রাকাত পর পর সালাম ফিরানো। এরপর তিনি তাছবীহ, ইস্তেগফার, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর প্রতি দরুদ পাঠ। অতঃপর তিনি উল্লেখ করেন, এ হাদীসটি মওজু এবং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উপর মিথ্যারোপ মাত্র। তিনি বলেন, লোকজনের নিকট এ ইবাদতকে বড় ফজিলতপূর্ণ করে দেখানো হয়, অথচ এ সালাতে সাধারণতঃ তারাই আগ্রহী হয়, যারা নিয়মিত সালাতের জামাতে উপস্থিত হয় না^{২০৩}। ইমাম ইবনে সালাহ (রহঃ) সালাতে রাগায়েব

^{২০১} লাতায়েফুল মাআরিফ ফিমা লি মাওয়াসিমিল আম মিনাল ওয়ায়েফ : ২২৮

^{২০২} তিবইয়ানুল উযব বিমা ওয়ারাদা ফী শাহরি রজব : ২৩

^{২০৩} তিবইয়ানুল উযব বিমা ওয়ারাদা ফি শাহরে রজব : ৫৪পৃ:

সম্পর্কে বলেন, এ হাদীসটি মওজু। এটা হিজরী ১৪শ বছর পর নতুন করে আবিষ্কার করা হয়েছে^{২০৪}।

ইমাম আল-ইজ্জ বিন আবদুস সালাম (রহঃ) ৬৩৭ হিজরী সনে এক ফতোয়ায় লিখেন, সালাতে রাগায়েব বিদ'আত ও মুনকার এবং এ সংক্রান্ত হাদীস রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উপর মিথ্যারোপ ছাড়া কিছুই নয়^{২০৫}। পরিশেষে তিনি ইমাম আবু শামার (রহঃ) কথা সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরে সালাতে রাগায়েব বাতিল আখ্যায়িত করেন। তিনি উক্ত ইবাদতকে নেক আমল বিনষ্টকারী হিসেবে উল্লেখ করে নিম্নোক্ত বর্ণনা পেশ করেন।

উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, এ সালাত বিদ'আত। সর্বাধিক জ্ঞানী আলেম সমাজ এবং আইম্মাতুল মুসলিমীন যথাঃ সাহাবায়ে কেরাম, তাবয়ীন, তাবে তাবয়ীন ও অন্যান্য আলেমগণ যারা দ্বীনের অনেক কিতাব লিপিবদ্ধ করেছেন এবং অতি উৎসাহের সাথে মানুষদের দ্বীনের বিধি-বিধান, ফরজ ও সুন্নাত শিক্ষা দিয়েছেন, তাদের কারো থেকে এ ধরনের কোন বর্ণনা পাওয়া যায়নি। এ সালাত সম্পর্কে কোন বর্ণনা তাদের কিতাবে লিপিবদ্ধ হয়নি এবং তারা কোন মজলিশে এধরনের বক্তব্য দেননি। এটা যদি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সুন্নাত হত, তাহলে ওলামায়ে কেরামের নিকট তা অজ্ঞাত থাকত না।

২. এ সালাত তিনটি কারণে শরীয়ত পরিপন্থী।

^{২০৪} কিতাবুল বায়েস আলা ইনকারিল বিদয়ে ওয়াল হাওয়াদেস : ১৪৫পৃ:

^{২০৫} কিতাবুল বায়েস আলা ইনকারিল বিদয়ে ওয়াল হাওয়াদেস : ১৪৯পৃ:

প্রথম কারণঃ এ সালাত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসের পরিপন্থী। হাদীসটি হচ্ছেঃ

لَا تَخْتَصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي وَلَا تَخُصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الْأَيَّامِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ. (متفق عليه)

অর্থঃ তোমরা শুধু জুমার রাতকে ইবাদতের জন্য নির্দিষ্ট করো না এবং শুধু জুমার দিনকে সিয়ামের জন্য নির্দিষ্ট করো না। তবে হ্যাঁ; যদি কেউ ধারাবাহিক ভাবে সিয়াম পালন করতে থাকে তা স্বতন্ত্র কথা^{২০৬}। সুতরাং এ হাদীসের ভিত্তিতে অন্যান্য রাতকে বাদ দিয়ে শুধু জুমার রাতকে সালাতের জন্য নির্দিষ্ট করা জায়েয নেই^{২০৭}। এটা রজব মাসের প্রথম জুমার রাতের ব্যাপারেও প্রযোজ্য।

দ্বিতীয় কারণঃ রজব ও শাবান মাসে বিশেষ সালাত আদায় বিদআত। এ ব্যাপারে এমন সব কথা বলা হয়, যা হাদীসে নেই। তাই এর দ্বারা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উপর মিথ্যারোপ করা হয়। তেমনি এ রাতে আমলের প্রতিদান আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত বলার মাধ্যমে আল্লাহর উপরও মিথ্যারোপ করা হয়। অথচ এ ব্যাপারে তিনি কোন প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি। পক্ষান্তরে যে সকল ব্যাপারে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উপর মিথ্যারোপ করা হয়, তা মিথ্যাঞ্জন করা, পরিহার করা, নিকৃষ্ট মনে করা এবং জনগণের মাঝে এ

^{২০৬} বুখারী : ১৯৮৫ ও মুসলিম : ১১৪৪

^{২০৭} কিতাবুল বায়েস আলা ইনকারিল বিদয়ে ওয়াল হাওয়াদেস- ইমাম আবু শামা : ১৫৬পৃ.

সম্পর্কে ঘৃণা ছড়ানো একান্ত জরুরী। কেননা এ সবার সাথে একাত্মতার কারণে অনেক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়।

১ম বিশৃঙ্খলাঃ এ সকল ইবাদতের ফযীলত এবং তা ছেড়ে দেয়ার ক্ষতি সম্পর্কে যা কিছু মানুষের কানে আসে তার উপর নির্ভর করা। ফলে অধিকাংশ মানুষ দু'টি কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে। ১। ফরজ সমূহের ব্যাপারে শিথিলতা। এবং ২। পাপের মধ্যে লিপ্ত হয়ে পড়া। মানুষ এ রাতের অপেক্ষায় থাকে ও এতে সালাত আদায় করে মনে করে যে, বিগত দিনে যা ছেড়ে দিয়েছে এসব আমল তার পরিপূরক হয়ে যাবে এবং যে পাপে তারা লিপ্ত ছিল তা মাফ হয়ে যাবে। সালাতে রাগায়েবের ব্যাপারে হাদীস রচনাকারীরা ধারণা করেছিল যে, "মানুষ অধিক হারে সৎকাজে অনুগামী হবে"। কিন্তু বাস্তবে মানুষ অধিক হারে পাপ ও নিষিদ্ধ কাজে লিপ্ত হয়ে পড়েছে।

২য় বিশৃঙ্খলাঃ মানুষকে পথভ্রষ্ট করার জন্য-বিদ'আত পন্থীরা যে সকল বিদ'আত কাজের প্রচলন করে; যখন তারা দেখে তাতে মানুষ লিপ্ত হয়েছে ও সে বিদ'আত গুলো প্রচলিত হয়েছে, তখন তারা মানুষদেরকে এক বিদ'আত থেকে আরেক বিদআতের দিকে পথ দেখায়।

৩য় বিশৃঙ্খলাঃ যখন কোন আলেম বিদআতী কাজ করে তখন সাধারণ মানুষ ধারণা করে, এটা সুন্নাত। এ ক্ষেত্রে ঐ আলেম স্বীয় কাজের মাধ্যমে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উপর মিথ্যারোপ করে। অধিকাংশ মানুষ এ কারণেই বিদআতে লিপ্ত হয়ে পড়ে।

তৃতীয় কারণঃ এ বিদ'আতী সালাত বিভিন্ন কারণে শরয়ী সালাতের বিপরীত হয়।

এক : এ সালাতে সিজদার সংখ্যা, তাসবীহর সংখ্যা, প্রত্যেক রাকাতাতে নির্দিষ্ট সংখ্যায় সূরা রুদর ও সূরা ইখলাছ পড়ার মাধ্যমে সালাতের সুন্নাত পদ্ধতির বিরোধিতা করা হয়।

দুই : সালাতে অন্তর বিগলিত হওয়া, একাধতার সাথে সালাত আদায় করা, আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় সালাতের জন্য অবসর হওয়া ও কুরআনের অর্থের দিকে লক্ষ্য করে সালাত আদায় করা সুন্নাত। এখানে তা পাওয়া যায় না।

তিন : নফল সালাত মসজিদে আদায় করার চেয়ে ঘরে এবং একাকী আদায় করা উত্তম। তবে রমজান মাসে তারাবীহর সালাত জামাতের সাথে মসজিদে আদায় করা উত্তম।

চার : এ সালাত শেষ করার পর অতিরিক্ত দু'টি সিজদা আদায় করা, যার প্রকৃত কোন কারণ নেই।

উল্লিখিত দলিল-প্রমাণ, আলেমগণের বক্তব্য এবং ভ্রান্ত হওয়ার কারণ ও বিশৃংখলার প্রকার এ সব থেকে স্পষ্ট বুঝে আসে যে, সালাতে রাগায়েব বিদ'আত^{২০৮}।

রজব মাসে করণীয় ও বর্জনীয়

নিজের কিংবা অন্যের উপর জুলুম করা হতে বিরত থাকা, যার অর্থ ইবাদতে আত্মনিয়োগ করা, বেশি বেশি নেক আমল করা, আল্লাহ কর্তৃক সংরক্ষিত ও নিষিদ্ধ বিষয় বস্তু পরিত্যাগ করা। অর্থাৎ নিখাদ

^{২০৮} কিতাবুল বায়েস আলা ইনকারিল বিদয়ে ওয়াল হাওয়াদেস- ইমাম আবু শামা : ১৫৩-১৯৬পৃ:

তওবা করা, আল্লাহ তাআলার শরণাপন্ন হওয়া, রমজান মাসের ভাগ্যবান ও লাইলাতুল কদরের মুক্তিপ্রাপ্ত হওয়ার জন্য প্রস্তুতি নেয়া।

রজব সংক্রান্ত প্রচলিত যঈফ হাদীসসমূহ - পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ

প্রথমতঃ রজবের ফযীলত সম্পর্কে বর্ণিত হাদীসের ব্যাপারে ইবন হাজার (রহঃ) এর বক্তব্য মূলনীতির ন্যায়। ইবন হাজার (রহঃ) বলেন, রজব মাসের ফযীলত, রজব মাসের রোযার ফযীলত বা রজব মাসের নির্দিষ্ট কোন দিনের রোযার ফযীলত বা রজবের নির্দিষ্ট কোন রাতে সালাতের ফযীলত সম্পর্কে বিশুদ্ধ কোন হাদীস নেই যা প্রমাণ হিসেবে দাঁড় করানো যায়।^{২০৯} হাফেজে হাদীস আবু ইসমাইল আল-হিরাবী আমার পূর্বেই এ ব্যাপারে অনুরূপ মত খুব দৃঢ়তার সঙ্গে ব্যক্ত করেছেন, ইতিপূর্বে বিশুদ্ধ সূত্রে যার বর্ণনা আমরা দিয়েছি। তিনি আরো বলেছেন, যেসব হাদীস রজবের ফযীলত বা রজবের রোযার ফযীলত বা রজবের নির্দিষ্ট কোন দিনের রোযার ফযীলতের ব্যাপারে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে, তা দুপ্রকারঃ

(ক) দুর্বল এবং (খ) জাল বা বানোয়াট। আমরা এখানে দুর্বল হাদীসগুলোর উল্লেখ করব আর জাল বা বানোয়াট হাদীসগুলোর প্রতি সামান্য ইঙ্গিত দেব।^{২১০} দ্বিতীয়তঃ এখন লক্ষ্য করুন দুর্বল হাদীসগুলো, যা মানুষের মুখে, সভা ও মাহফিলে বারবার উচ্চারিত

^{২০৯} রজব সংক্রান্ত প্রচলিত হাদীসসমগ্র : একটি পর্যালোচনা - সানাউল্লাহ নজির আহমদ, সম্পাদনা : মুহাম্মদ শামসুল হক সিদ্দিক আলী হাসান তৈয়ব, ইসলাম হাউজ, পৃষ্ঠা নং - ৩ - ১২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

^{২১০} দেখুনঃ হাফেজ ইবন হাজার রচিত তাবইনুল উজব ফিমা ওরাদা ফী ফাজলে রজব (পৃষ্ঠাঃ ৬ ও ৮) এবং আল্লামা শাকিরী রচিত কিতাবুস সুনান ওয়াল মুবতাদিআত (পৃষ্ঠাঃ ১২৫)

হয়, অথচ তা বিশুদ্ধ সূত্রে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত নয়। যেমনঃ-

১. হাদীসঃ

اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي رَجَبٍ وَشَعْبَانَ، وَبَارِكْ لَنَا فِي رَمَضَانَ

অর্থঃ হে আল্লাহ, রজব ও শাবান মাসে আমাদের বরকত দান করুন এবং রমজান পর্যন্ত পৌঁছার তাওফীক দান করুন। হাদীসটি বর্ণনা করেছেন ইমাম আহমদ তার মুসনাদ গ্রন্থে এবং ইমাম তাবরানী তার আওসাত গ্রন্থে।

হায়সামী (রহ). বলেন, এ হাদীসটি বাযযার বর্ণনা করেছেন। এ হাদীসের বর্ণনাকারীদের একজন রয়েছেন জায়েদা বিন আবি রাকাদ, তার ব্যাপারে ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেছেন, মুনকারুল হাদীস। ইবন হাজার (রহঃ) স্বয়ং ইমাম বুখারী থেকে সহীহ সূত্রে বর্ণনা করেন, যার ব্যাপারে আমি মুনকারুল হাদীস বলব, তার হাদীস গ্রহণ করা বৈধ নয়^{১১১}।

হাদীস বর্ণনাকারীদের বৃহৎ একটি জামাত তাকে অখ্যাত বলেছেন। অখ্যাত বলার অর্থও তার হাদীস দুর্বল। খুব যাচাই বাছাই করে প্রমাণিত হলে গ্রহণ করা যায়^{১১২}। ইমাম নববী (রহঃ) তার আযকার নামক গ্রন্থে এ হাদীসটি দুর্বল বলেছেন। ইমাম যাহাবী (রহঃ) ও তাঁর রচিত মিয়ান (খ. ৩, পৃ. ৯৬, মুদ্রণঃ দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, সনঃ ১৯৯৫ ইং) গ্রন্থে এ হাদীসটি দুর্বল বলেছেন।

^{১১১} আলফায় ও ইবরাহুতুল জারহি ওয়াত-তাদিল বাইনালা ইফরাদ ওয়াত-তাকরীর ওয়াত-তারকীব: ২৬৭

^{১১২} মাজমাউয - যাওয়ায়েদঃ ২/১৬৫, প্রকাশকঃ দারুল-রাইয়ান, সনঃ ১৪০৭ হিঃ

২. হাদীসঃ

فَضَّلَ شَهْرَ رَجَبٍ عَلَى الشُّهُورِ كَفَضْلِ الْقُرْآنِ عَلَى سَائِرِ الْكَلَامِ

অর্থঃ রজব মাসের ফযীলত অন্যসব মাসের তুলনায় তেমন, যেমন কুরআনের ফযীলত অন্যসব কালামের ওপর। এ হাদীসের ব্যাপারে ইবন হাজার (রহঃ) বলেছেন, এটা জাল ও বানোয়াট^{২২০}।

৩. হাদীসঃ

إِنَّ شَهْرَ رَجَبٍ شَهْرُ اللَّهِ وَشَعْبَانَ شَهْرِي، وَرَمَضَانَ شَهْرُ أُمَّتِي

অর্থঃ রজব আল্লাহর মাস, শাবান আমার মাস আর রমযান আমার উম্মতের মাস। এ হাদীসটি দায়লামী (রহঃ) ও আরো কতক মুহাদ্দিস, সাহাবী আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর সূত্রে সরাসরি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু ইবনুল জাওয়ী (রহঃ) এ হাদীসটি তার রচিত জাল হাদীস সমগ্র কিতাবে উল্লেখ করেছেন। তিনি এ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এ হাদীস বর্ণনার বেশ কয়েকটি সূত্র পর্যালোচনা করার পর। তদ্রূপ হাফেজ ইবন হাজার (রহঃ) ও এ হাদীসটি তার রচিত তবাইনুল উজব ফিমা অরাদা ফী রজব' কিতাবে জাল বলেছেন^{২২১}।

৪. হাদীসঃ

لَا تَغْفَلُوا عَنْ أَوَّلِ لَيْلَةٍ فِي رَجَبٍ فَإِنَّهَا لَيْلَةٌ تُسَمِّيهَا الْمَلَائِكَةُ الرَّغَائِبَ

^{২২০} আজলুনী কর্তৃক রচিত কিতাব কাশফুল খাফা (খ. ২, পৃঃ ১১০, প্রকাশকঃ মুআসসাসাত্তুর-রিসালা, সনঃ ১৪০৫ হিঃ) এবং আলী ইবন সুলতান আল-কারী কর্তৃক রচিত, কিতাব আল-মাসনু (খ. ১, পৃঃ ১২৮, প্রকাশকঃ মাকতাবাতুর রুশদ, সনঃ ১৪০৪ হিঃ)

^{২২১} ইমাম মুনাব্বী (রহঃ) রচিত 'ফয়যুল কাদীর' (খ. ৪, পৃ. ১৬২ ও ১৬৬, প্রকাশকঃ মাকতাবা তিজারিয়া কুবরা, সনঃ ১৩৫৬ হিঃ)

অর্থঃ রজবের প্রথম জুমার ব্যাপারে তোমরা উদাসীন থেকে না, কারণ, তা এমন একটি রাত, ফেরেশতারা যার নামকরণ করেছে রাগায়েব হিসেবে ...। এটা দীর্ঘ হাদীস, এর মাধ্যে আরো মিথ্যাচার রয়েছে^{১১৫}।

৫. হাদীসঃ

رَجَبُ شَهْرٍ عَظِيمٍ، يُضَاعِفُ اللَّهُ فِيهِ الْحَسَنَاتِ، فَمَنْ صَامَ يَوْمًا مِنْ رَجَبٍ فَكَأَنَّمَا صَامَ سَنَةً، وَمَنْ صَامَ مِنْهُ سَبْعَةَ أَيَّامٍ غُلِقَتْ عَنْهُ سَبْعَةُ أَبْوَابِ جَهَنَّمَ، وَمَنْ صَامَ مِنْهُ ثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ فُتِحَتْ لَهُ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، وَمَنْ صَامَ مِنْهُ عَشْرَةَ أَيَّامٍ لَمْ يَسْأَلِ اللَّهُ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ، وَمَنْ صَامَ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا نَادَى مُنَادٍ فِي السَّمَاءِ قَدْ غُفِرَ لَكَ مَا مَضَى فَاسْتَثْنِفِ الْعَمَلَ، وَمَنْ زَادَ زَادَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، وَفِي رَجَبٍ حَمَلَ اللَّهُ نُوحًا فِي السَّفِينَةِ فَصَامَ رَجَبًا، وَأَمَرَ مَنْ مَعَهُ أَنْ يَصُومُوا، فَجَرَتْ بِهِمُ السَّفِينَةُ سِتَّةَ أَشْهُرٍ، آخِرُ ذَلِكَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ أَهِيْطَ عَلَى الْجُرُودِيِّ فَصَامَ نُوحٌ وَمَنْ مَعَهُ وَالْوَحْشُ شُكْرًا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَفِي يَوْمِ عَاشُورَاءَ أَفْلَقَ اللَّهُ الْبَحْرَ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، وَفِي يَوْمِ عَاشُورَاءَ تَابَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى آدَمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى مَدِينَةِ يُونُسَ، وَفِيهِ وَلِدَ إِبْرَاهِيمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

অর্থঃ রজব মাস একটি মহৎ মাস। আল্লাহ ত্বআলা এতে নেকীর পরিমাণ খুব বৃদ্ধি করেন। যে ব্যক্তি রজবের একদিন রোযা রাখল, সে প্রায় এক বৎসর রোযা রাখল। যে ব্যক্তি রজবে সাত দিন রোযা রাখবে, তার জন্য জাহান্নামের সাতটি দরজা বন্ধ করে দেয়া হবে। যে ব্যক্তি রজবের আট দিন রোযা রাখবে, তার জন্য জান্নাতের

^{১১৫} আজলুনী কর্তৃক রচিত 'কাশফুল খাফা' গ্রন্থ। (খ. ১, পৃ. ৯৫, প্রকাশকঃ মুআসসাসাতুর রিসালা, সনঃ ১৪০৫ হিঃ)

ইমাম ইবনুল কায়িম রচিত 'আল-মানারুল মুনীফ' গ্রন্থ, (খ. ১, পৃঃ ৮৩, প্রকাশকঃ দারুল কাদেরী, সনঃ ১৪১১ হিঃ)

আটটি দরজা সুসজ্জিত করা হবে। যে ব্যক্তি রজবের দশ দিন রোযা রাখবে, সে যা চাইবে আল্লাহ তাকে তাই দেবেন। যে ব্যক্তি রজবের পনের দিন রোযা রাখবে, তাকে আসমান থেকে একজন ঘোষণাকারী বলবে, আল্লাহ তোমার পিছনের সব কিছু মাফ করে দিয়েছেন, তুমি নতুন করে আমল কর। আর যে আরো বেশি রোযা রাখবে আল্লাহ তাকে আরো বেশি দেবেন। এ রজব মাসেই আল্লাহ নূহ (আ.) কে নৌকায় আরোহন করিয়েছেন। তিনি রজব মাসে রোযা রাখেন এবং যারা তার সঙ্গে ছিল তাদেরকেও তিনি রোযা রাখার নির্দেশ দেন। যার ফলে সাত মাস পানিতে নৌকা বিচরণ করে, যার সর্বশেষ দিন হচ্ছে আশুরা। তারা জুদি পাহাড়ে অবতরণ করেন। অতঃপর আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করার জন্য নূহ (আ.) রোযা রাখেন এবং যারা তার সঙ্গে ছিল তারা, এমনকি অন্যান্য জীবজন্তুও। আশুরার দিন আল্লাহ তা‘আলা বনী ইসরাইলের জন্য সমুদ্র বিদীর্ণ করেছিলেন। এ আশুরার দিনই আল্লাহ তা‘আলা আদম (আঃ) এর তওবা ও নবী ইউনুস (আঃ) - এর সম্প্রদায়ের তওবা কবুল করেছেন এবং আশুরাতেই ইবরাহীম (আঃ) জন্ম গ্রহণ করেছেন। যাহাবী (রহঃ) বলেছেন, এ হাদীস বাতিল ও ভ্রান্ত, এর সনদ অস্পষ্ট। হায়সামী (রহঃ) বলেছেন, এ হাদীস তাবরানী তার ‘কাবীর’ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। এ হাদীসের সনদে আব্দুল গাফুর নামক একজন বর্ণনাকারী রয়েছে যে মুহাদ্দিসীনের নিকট পরিত্যক্ত^{১৬}।

^{১৬} দেখুনঃ ইমাম যাহাবী রচিত ‘মীযান’ গ্রন্থ। (খ. ৫, পৃ. ৬২, প্রকাশকঃ দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, সনঃ ১৯৯৫ ই.)

ইমাম হায়সামী রচিত ‘মাজমাউয-যাওয়ায়েদ’ গ্রন্থ। (খ. ৩, পৃঃ ১৮৮, প্রকাশকঃ দারুল রাইয়ান, সনঃ ১৪০৭ হিঃ)

৬. (ক) রজবের প্রথম জুমার রাতে প্রচলিত সালাতে রাগায়েবের ব্যাপারে যত হাদীস রয়েছে, তা সব বাতিল ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ওপর মিথ্যাচার।

(খ) রজবের রোযা বা রজবের কতক রাতের নির্দিষ্ট রোযার ব্যাপারে যেসব হাদীস রয়েছে, তার সব মিথ্যা ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর মিথ্যাচার।

(গ) রজব মাসের প্রথম রাতে মাগরিবের পর যে ব্যক্তি বিশ রাকাত সালাত পড়বে, সে নাপাকবিহীন পুলসিরাত পার হবে।

(ঘ) যে ব্যক্তি রজবের কোন একদিন রোযা রাখল এবং তাতে দুরাকাত সালাত আদায় করল, যার প্রথম রাকাতে একশতবার আয়াতুল কুরসী পড়ল ও দ্বিতীয় রাকাতে একশত বার সুরায়ে ইখলাস পড়ল, সে জান্নাতে তার স্থান না দেখে মারা যাবে না।

(ঙ) যে রজব মাসে রোযা রাখল, সে ..., সে ...। ইমাম ইবনুল কায়্যিম (মৃতঃ ৬৯১ হি.) বলেন, এসব হাদীস মিথ্যা ও বানোয়াট^{২১৭}।

৭. হাদীসঃ

مَنْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ شَهْرِ حَرَامِ الْحَمِيسِ وَالْجُمُعَةِ وَالسَّبْتِ كَتَبَتْ لَهُ عُبَادَةٌ سَبْعِمِائَةِ سَنَةٍ

অর্থঃ যে ব্যক্তি সম্মানিত মাসে (যিলকদ, যিলহজ, মুহাররম ও রজব) বৃহস্পতি, শুক্র ও শনিবার তিনটি রোযা রাখবে, আল্লাহ তাকে সাত শত বৎসরের ইবাদত দেবেন। অন্য বর্ণনায় আছে, তাকে ষাট বৎসরের ইবাদত দেবেন। তাবরানী তার আওসাদ (খ.

^{২১৭} ইবনুল কায়্যিম রচিত 'আল-মানারুল মুনীফ' (খ. ১, পৃ. ৮৩-৮৪, প্রকাশকঃ দারুল কাদেরী, সনঃ ১৪১১ হিঃ)

২, পৃ. ২১৯, প্রকাশকঃ দারুল হারামাইন, সনঃ ১৪১৫ হি.) গ্রন্থে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, এ হাদীসটি মাসলামা থেকে একমাত্র ইয়াকুব বর্ণনা করেছে এবং তার থেকে শুধু মুহাম্মদ ইবন ইয়াহইয়া বর্ণনা করেছে। হায়সামী (রহঃ) বলেছেন, এ হাদীসটি তাবরানী তার আওসাত গ্রন্থে ইয়াকুব বিন মুসা আল-মাদানি থেকে বর্ণনা করেছেন, সে বর্ণনা করেছে মাসলামা থেকে। বর্ণনাকারী ইয়াকুব মুহাদ্দিসীনের নিকট অখ্যাত। আর মাসলামার পুরো না হচ্ছে মাসলামা বিন রাশেদ আল-হামানি। তার ব্যাপারে ইমাম হাতেম বলেছেন, সে হাদীসের ব্যাপারে দুদোল্যমান। ইমাম আযদী বলেছেন, সে হাদীসের ব্যাপারে খুবই দুর্বল, তার হাদীস দলিলের উপযুক্ত^{২১৮}। ইবন জাওয়াযী (রহঃ) তাঁর রচিত ‘আল-ইলাল আল-মুতানাহিয়াহ’ (খ. ২, পৃ. ৫৫৪, প্রকাশকঃ দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, সনঃ ১৪০৩ হিঃ) গ্রন্থে এ হাদীসটি বিশুদ্ধ নয় বলে প্রমাণ করেছেন।

৮. হাদীসঃ

صَوْمُ أَوَّلِ يَوْمٍ مِنْ رَجَبٍ كَفَّارَةٌ ثَلَاثِ سِنِينَ، وَالثَّانِي كَفَّارَةٌ سَنَتَيْنِ، وَالثَّلَاثِ
كَفَّارَةٌ سَنَةٍ ثُمَّ كُلُّ يَوْمٍ شَهْرًا

অর্থঃ রজব মাসের প্রথম রোযা তিন বৎসরের কাফ্ফারা স্বরূপ।
দ্বিতীয় দিনের রোযা দুই বছরের কাফ্ফারা স্বরূপ। অতঃপর প্রত্যেক
দিনের রোযা এক মাসের কাফ্ফারা স্বরূপ^{২১৯}।

^{২১৮} মাজমাউজ জাওয়ায়েদ (খ. ৩, পৃ. ১৯১, প্রকাশকঃ দারুল রাইয়ান, সনঃ ১৪০৭)

^{২১৯} মুনাবী রচিত ‘ফায়জুল বারী’ গ্রন্থ। (খ. ৪, পৃ. ২১০, প্রকাশকঃ মাকতাবা তিজারিয়া কুবরা, সনঃ ১৩৫৬ হিঃ)

৯. ইমাম ‘আজলুনী (রহঃ) বলেন, আরেকটি বানোয়াট হাদীস হচ্ছে, রজবের প্রথম জুমার রাতে বানোয়াট সালাত। যার নামকরণ করা হয়েছে সালাতে রাগায়েব হিসেবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুননত ও মুহাদ্দিসীনের নিকট এর কোন ভিত্তি নেই^{২২০}।

১০. হাফেযে হাদীস আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন আবু বকর দিমাশকী (মৃত : ৬৯১ হিঃ) বলেছেন, রজব মাসে রোযার ব্যাপারে ও তার বিশেষ রাতের সালাতের ব্যাপারে যে হাদীস রয়েছে, তা সব মিথ্যা, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর অপবাদ। তার মধ্যে একটি হাদীস যেমন, যে ব্যক্তি রজবের প্রথম রাতে বিশ রাকাত সালাত আদায় করবে, সে নাপাকবিহীন পুলসিরাত পার হয়ে যাবে^{২২১}। আল্লাহ ভাল জানেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ - মাহে শাবান ও শবে বরাত (شَبّ براءت) করণীয় ও বর্জনীয়

শবে বরাত আভিধানিক অর্থ অনুসন্ধানঃ শব ফারসী শব্দ। অর্থ রাত বা রজনী। বরাত শব্দটিও মূলে ফারসি। অর্থ ভাগ্য। দুশব্দের একত্রে অর্থ হবে, ভাগ্য-রজনী। বরাত শব্দটি আরবী ভেবে অনেকেই ভুল করে থাকেন। কারণ বরাত বলতে আরবী ভাষায় কোন শব্দ নেই। যদি বরাত শব্দটি আরবী বারাতাত শব্দের অপভ্রংশ ধরা হয় তবে তার অর্থ হবেঃ সম্পর্কচ্ছেদ বা বিমুক্তিকরণ। কিন্তু কয়েকটি কারণে এ অর্থটি এখানে অগ্রাহ্য, মেনে নেয়া যায় না। যেমনঃ

^{২২০} দেখুনঃ তার রচিত ‘কাশফুল খাফা’ (খ. ২, পৃ. ৫৬৩, প্রকাশকঃ মুআসসাসাত্তুর রিসালা, সনঃ ১৪০৫ হিঃ)

^{২২১} দেখুনঃ আল-মানার আল-মুনিফ গ্রন্থ (খ. ১, পৃ. ৯৬, প্রকাশকঃ মাকতাবা মাতবুআতুল ইসলামিয়া, সনঃ ১৪০৩ হিঃ)

১. আগের শব্দটি ফারসী হওয়ায় বরাত শব্দটিও ফারসি হবে, এটাই স্বাভাবিক

২. শাবানের মধ্যরজনীকে আরবী ভাষার দীর্ঘ পরম্পরায় কেউই বারা'আতের রাত্রি হিসাবে আখ্যা দেননি।

৩. রমযান মাসের লাইলাতুল ক্বাদরকে কেউ-কেউ লাইলাতুল বারাআত হিসাবে নামকরণ করেছেন, শাবানের মধ্য রাত্রিকে নয়।

মূলতঃ আরবী ভাষায় এ রাতটিকে লাইলাতুন নিছফি মিন শাবান শাবান মাসের মধ্য রজনী হিসাবে অভিহিত করা হয়। অধিকন্তু আরও বলা যায় যে, যেমন কুরআন মাজীদে সূরা বারায়াত রয়েছে যা সূরা তাওবা নামেও পরিচিত। ইরশাদ হয়েছেঃ

بِرَاءَةٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ

অর্থঃ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করার ঘোষণা। (সূরা তাওবা, আয়াত নং - ১)^{২২২}। এখানে বারায়াতের অর্থ হল সম্পর্ক ছিন্ন করা। 'বারায়াত' মুক্তি অর্থেও আল-কুরআনে এসেছে যেমনঃ

أَكْفَارُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أُولَئِكَ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ

অর্থঃ তোমাদের মধ্যকার কাফিররা কি তাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ? না কি তোমাদের মুক্তির সনদ রয়েছে কিতাবসমূহে? (সূরা কামার, আয়াত নং - ৩৪)^{২২৩}। আর 'বারায়াত' শব্দটি যদি ফারসী শব্দ ধরা হয় তাহলে উহার অর্থ হবে সৌভাগ্য। অতএব শবে বরাত শব্দটার অর্থ

^{২২২} সূরা তাওবা, আয়াত নং - ১

^{২২৩} সূরা কামার, আয়াত নং - ৩৪

দাড়ায় মুক্তির রজনী, সম্পর্ক ছিন্ন করার রজনী। অথবা সৌভাগ্যের রাত, যদি ‘বরাত’ শব্দটিকে ফার্সী শব্দ ধরা হয়। শবে বরাত শব্দটিকে যদি আরবীতে তর্জমা করতে চান তাহলে বলতে হবে ‘লাইলাতুল বারায়াত’। এখানে বলে রাখা ভাল যে এমন অনেক শব্দ আছে যার রূপ বা উচ্চারণ আরবী ও ফার্সী ভাষায় একই রকম, কিন্তু অর্থ ভিন্ন। যেমন ‘গোলাম’ শব্দটি আরবী ও ফার্সী উভয় ভাষায় একই রকম লেখা হয় এবং একইভাবে উচ্চারণ করা হয়। কিন্তু আরবীতে এর অর্থ হল কিশোর আর ফার্সীতে এর অর্থ হল দাস। সার কথা হল ‘বারায়াত’ শব্দটিকে আরবী শব্দ ধরা হলে এর অর্থ সম্পর্কচ্ছেদ বা মুক্তি। আর ফার্সী শব্দ ধরা হলে এর অর্থ হবে সৌভাগ্য।

অতএব, হিজরী সনের ৮ম মাস হচ্ছে শাবান মাস। তার পরই আসে বছরের শ্রেষ্ঠ রামাযান মাস। সে হিসেবে মুসলিমের জীবনে এ মাসের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। দীর্ঘ টানা একমাস তাকে সিয়াম সাধনা করতে করতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন মানসিক, শারিরিক ও আর্থিক প্রস্তুতি। আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রামাযানে প্রস্তুতি স্বরূপ অন্য মাসের তুলনায় শাবান মাসে বেশী বেশী নফল রোযা রাখতেন।

শাবান মাসে রোজা রাখার বিধান

কুতায়বা (রহঃ) আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " إِذَا بَقِيَ نِصْفُ مِنْ شَعْبَانَ فَلَا تَصُومُوا ". قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ عَلَى هَذَا اللَّفْظِ . وَمَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ مُفْطِرًا فَإِذَا بَقِيَ مِنْ شَعْبَانَ شَيْءٌ أَخَذَ فِي الصَّوْمِ لِحَالِ شَهْرِ رَمَضَانَ . وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يُشَبِّهُ قَوْلَهُمْ حَيْثُ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَا تَقْدَمُوا شَهْرَ رَمَضَانَ بِصِيَامٍ إِلَّا أَنْ يُوَافِقَ ذَلِكَ صَوْمًا كَانَ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ ". وَقَدْ دَلَّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ الْكَرَاهِيَّةَ عَلَى مَنْ يَتَعَمَّدُ الصِّيَامَ لِحَالِ رَمَضَانَ .

যখন শাবান মাসের অর্ধেক অতিবাহিত হয় তখন তোমরা রোযা রেখোনা^{২২৪}। আল্লামা আলবানী (রহঃ) সহীহ তিরমিযী নামক কিতাবে হাদীসটিকে সহীহ বলে আখ্যায়িত করেছেন (পৃ: ৫৯০)। হাদীসটি দ্বারা সুপষ্টভাবে প্রমাণিত হয়, শাবানের পনের দিন অতিবাহিত হওয়ার পর ১৬ তারিখ থেকে রোযা রাখা নিষিদ্ধ^{২২৫}। তবে এ ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে, এ বিষয়ে বিপরীতমুখী হাদীসও বিদ্যমান আছে, যেগুলো রোযা রাখা জায়েয হওয়াকে প্রমাণ করে। যেমন সহীহুল বুখারী - ১৯১৪, মুসলিম - ১০৮২ নং হাদীসে বর্ণনা করেন, আবু হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন: তোমরা রমজানের একদিন বা দুইদিন পূর্ব থেকে রোযা রাখা আরম্ভ করে রমায়ান মাসকে এগিয়ে এনো না। তবে

^{২২৪} আবু দাউদ হাদীস - ৩২৩৭, তিরমিযি হাদীস ৭৩৮, ইবনে মাযা হাদীস - ১৬৫১

^{২২৫} শাবান মাসের শেষার্ধে রোজা রাখার বিধান, জাকেরুল্লাহ আবুল খায়ের, পৃষ্ঠা নং - ২ - ৫

কারো পূর্ব থেকেই ঐ দিনে রোযা রাখার অভ্যাস থাকলে তার বিষয়টি ব্যতিক্রম, তার জন্য রোযা রাখাই উচিত, সে যেন রোযা রাখে। হাদীসটি দ্বারা প্রমাণিত হয় অর্ধ শাবানের পর রোযা রাখতে অভ্যস্ত এমন ব্যক্তির জন্য রোযা রাখা জায়েয আছে। যেমন- কোন ব্যক্তির অভ্যাস হলো প্রতি সোমবার অথবা বৃহস্পতিবারে রোযা রাখা। ঘটনাক্রমে শাবানের ২৯ তারিখ সোমবার অথবা বৃহস্পতিবার, তখন তার জন্য তার অভ্যাসানুযায়ী সেদিন নফল রোযা রাখাতে কোন অসুবিধা নাই। অথবা কোন ব্যক্তি একদিন পরপর রোযা রাখতো তার জন্যও রোযা রাখাতে কোন অসুবিধা নাই। ইমাম বুখারী - ৯৭০ এবং ইমাম মুসলিম ১১৫৬ - নং হাদীসে আয়েশা (রা.) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পূর্ণ শাবান মাস রোযা রাখতেন। তিনি শাবান মাসে রোযা রাখতেন তবে খুব কম সংখ্যক দিনই রোযা থেকে বিরত থাকতেন। ইমাম নববী বলেন **كَانَ يَصُومُهُ إِلَّا قَلِيلًا** এ বাক্যটি প্রথম বাক্যের ব্যাখ্যা স্বরূপ পুরো শাবান মাস রোযা রাখতেন এ কথা দ্বারা অধিকাংশ সময় রোযা রাখতেন বলাই উদ্দেশ্য। অন্যথায় তিনি একে বারে ধারাবাহিকভাবে পূর্ণ মাস কখনোই রোযা রাখতেন না। হাদীসটি দ্বারা প্রমাণিত হয় অর্ধ শাবানের পরও রোযা রাখা জায়েয আছে। তবে শর্ত হলো অর্ধ শাবানের পূর্বের ধারাবাহিকতা বা যোগসূত্রতা থাকতে হবে।

ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) উল্লেখিত সব হাদীসের উপরই আমল করেন। তিনি বলেন, অর্ধ শাবানের পর রোযা রাখা বৈধ হবে না। তবে যদি

কারো রোযা রাখার অভ্যাস থাকে অথবা যোগসূত্র থাকে তাহলে তার বিষয়টি ব্যতিক্রম। তার জন্য তার অভ্যাস অনুযায়ী অথবা যোগসূত্রতা ধরে রোযা রাখা বৈধ। এ মতটি - হাদীসের মধ্যে নিষেধটি হারাম বর্ণনার নিষেধ-শাফেয়ীদের অধিকাংশের মতে সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য এবং বিশুদ্ধ মত। আবার কারো মতে যেমন - রোয়ানী (রহঃ) - এখানে নিষেধটি হারামের জন্য নয় বরং নিষেধটি মাকরুহের জন্য নির্ধারিত^{২৬}। ইমাম নববী এ অধ্যায়ের আলোচনা করতে গিয়ে রিয়াদুস্ সালিহীনের পৃষ্ঠায় ৪১২ বলেন,

وذهب جمهور العلماء إلى تضعيف حديث النهي عن الصيام بعد نصف شعبان ، وبناءً عليه قالوا : لا يكره الصيام بعد نصف شعبان .

অর্থাৎ জমহুর ওলামার মতে অর্ধ শাবানের পর রোযা রাখা নিষেধ হওয়া সম্পর্কিত হাদীসগুলো দুর্বল। ফলে তারা বলেন অর্ধ শাবানের পর রোযা রাখা মাকরুহ নয়।

قال الحافظ : وَقَالَ جُمُهورُ الْعُلَمَاءِ : يَجُوزُ الصَّوْمُ تَطَوُّعًا بَعْدَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ وَضَعَّفُوا الْحَدِيثَ الْوَارِدَ فِيهِ ، وَقَالَ أَحْمَدُ وَابْنُ مَعِينٍ إِنَّهُ مُنْكَرٌ أَهْمَنْ فَتَحَ الْبَارِي . وَمَنْ ضَعَفَهُ كَذَلِكَ الْبَيْهَقِيُّ وَالطَّحَاوِيُّ .

হাফেজ (রহঃ) বলেন, জমহুরে ওলামাদের মতে অর্ধ শাবানের পর নফল রোযা রাখা জায়েয আছে। আর নিষেধাজ্ঞা হাদীসগুলোকে তারা দুর্বল হাদীস বলে আখ্যায়িত করেন। আহমাদ বিন (রহঃ) এবং ইবনে মুঈন (রহঃ) উভয়ে বলেন এ সব হাদীস মুনকার ...। ফতহুল বারী হতে সংগৃহীত। এ ছাড়া ইমাম বাইহাকী (রহঃ) এবং ইমাম

^{২৬} আল মাজমু-৬/৩৯৯-৪০০

তাহাবী (রহঃ) ও হাদীস গুলোকে দুর্বল বলে সাব্যস্ত করেন। আব্বাসী ইবনে কুদামাহ (রহঃ) বলেন, হাদীসটি সম্পর্কে ইমাম আহমাদ বলেন, হাদীসটি সমালোচনা মুক্ত নয়। আমরা আব্দুর রহমান বিন মাহদির নিকট প্রশ্ন করলে তিনি হাদীসটিকে সহীহ আখ্যা দেননি এবং তার থেকে তিনি মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত কোন হাদীস বর্ণনা করেননি। আর ইমাম আহমাদ বলেন আলা (রহঃ) একজন নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারি তার থেকে বর্ণিত এ একটি হাদীসকেই প্রত্যাখান করা যেতে পারে। আলা হলো আব্দুর রহমানের ছেলে সে হাদীসটি তার পিতা হতে এবং তার পিতা আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে হাদীসটি বর্ণনা করেন। ইবনুল কাইয়ুম (রহঃ) তাহজিবুস সুনান কিতাবে যারা হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন তাদের কথার উত্তর দিয়েছেন। তার উত্তরের সারাংশ নিম্নরূপঃ

মূলতঃ ইমাম মুসলিমের শর্তানুযায়ী হাদীসটি সহীহ। আলা (রহঃ) বর্ণনাকারির একা (তাফাররুদ) দ্বারা হাদীসটি সম্পর্কে কোন মন্তব্য গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, তিনি একজন নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারি। ইমাম মুসলিম তার মুসলিম শরিফ কিতাবে - আলা তার পিতা হতে এবং তার পিতা আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে - এ সনদে অনেক হাদীস বর্ণনা করেছেন। সুতরাং আলা (রহঃ) এর তাফাররুদ কোন দোষনীয় বিষয় নয়। এ ছাড়াও অনেক হাদীস এ রকম পাওয়া যায় যে, নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারি এখানে একা। তা সত্ত্বেও উম্মাত এ ধরনের হাদীসকে গ্রহণ করেছে এবং তদনুযায়ী আমল করে আসছেন। সুতরাং, হাদীসটি অগ্রাহ্য হওয়ার মত যৌক্তিক কোন কারণ বিদ্যমান

না থাকায় গ্রহণ করাই হলো ইনসাফ। অতঃপর তিনি বলেন, তবে এ ক্ষেত্রে দুই ধরনের হাদীস পাওয়া যাওয়ায় দ্বন্ধের যে অবকাশ দেখা দিয়েছে মূলত; এখানে কোন দ্বন্দ্বই নাই। কারণ, যে সব হাদীসে রোযা রাখার কথা এসেছে এসব হাদীস দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, যে ব্যক্তি রোযা রাখতে অভ্যস্ত অথবা পূর্বের যোগসূত্র ধরে রোযা রাখেন তাকেই বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ তার জন্য অর্ধ শাবানের পরে এ ধরনের রোযা রাখতে কোন অসুবিধা নাই। আর আলা বর্ণনা কারীর হাদীসে যে নিষেধ পাওয়া যাচ্ছে, তা হলো ঐ ব্যক্তির ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি নতুনভাবে রোযা রাখা আরম্ভ করে এবং তার পূর্ব রোযা রাখার কোন যোগসূত্রও নাই। ... বিন বায (রহঃ) কে অর্ধ শাবানের পর রোযা রাখা নিষেধ করা হয়েছে। হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, হাদীস সহীহ যেমনটি আব্বানামা নাসের উদ্দিন আল আলবানী বলেছেন। আর হাদীসের উদ্দেশ্য হলো অর্ধ শাবানের পর নতুনভাবে রোযা রাখতে আরম্ভ করা। তবে যদি কেউ অধিকাংশ মাস রোযা রাখে অথবা পুরো মাস রোযা রাখে সে অবশ্যই সুন্নাহের অনুসারী বলে গণ্য হবে। [মাজমুয়ায়ে ফাতাওয়া শেখ বিন বাজ-১৫/৩৪৯]। শেখ ইবনে উসাইমিন (রহঃ) রিয়াদুস সালাহীন কিতাবের ব্যাখ্যায় লিখেন, এমনকি যদি ধরে নেয়া হয় যে হাদীসটি সহীহ তবে হাদীসের নিষেধটি হারামের জন্য নয় বরং এখানে নিষেধটি শুধু মাকরুহ বুঝানোর জন্য অধিকাংশ আহলে ইলম এ মতটিকেই গ্রহণ করেছেন। কিন্তু যদি কেউ রোযা রাখতে অভ্যস্ত তবে তার জন্য অর্ধ শাবানের পর রোযা রাখা মাকরুহ হবে

না। উত্তরের সারাংশঃ মোট কথা শাবান মাসের দ্বিতীয়র্থে রোযা রাখা নিষেধ। যদি কেউ রোযা রাখে তবে তার রোযা হয়তো মাকরুহ হবে অথবা কারো মতে হারাম হবে। একমাত্র যে ব্যক্তি রোযা রাখতে পূর্ব থেকে অভ্যস্ত অথবা যার পূর্ব থেকে যোগসূত্র আছে, তার রোযা মাকরুহ বা হারাম হবে না। আল্লাহই সর্ব জ্ঞাত। এখানে নিষেধের হিকমত হল, লাগাতার রোযা রাখার দ্বারায় হয়তবার রমজানের রোযা রাখতে দুর্বল হয়ে যাবে, ফলে তার রমজানের রোজা রাখা ব্যাহত হবে। যদি বলা হয়, অনেক সময় এমন হয়, মাসের শুরুতে রোযা রাখার কারণে সে বেশি দুর্বল হয়ে যাওব তখন কি করা যাবে? উত্তরে বলা হবে, যে ব্যক্তি শুরু থেকে রোযা রাখে সে রোযা রাখতে অভ্যস্ত হয়ে পড়বে ফলে তার জন্য রোযা রাখতে কষ্ট কম হবে। মোল্লা আলী কারী বলেন, এখানে নিষেধটা মাকরুহে তানজিহি। এতেই উম্মাতের জন্য অনুগ্রহ যাতে সে রমজানের রোযা রাখতে দুর্বল হয়ে না যায় এবং রমজানের রোযা রাখতে পারে। আর যে শাবানের পুরো রোযা রাখবে সে রমজানের রোজা রাখতে অভ্যস্ত হয়ে পড়বে এবং তার থেকে কষ্ট দূর হয়ে যাবে। আল্লাহই ভালো জানেন। শাবানের মধ্যরাত্রির কি কোন ফযীলত বর্ণিত হয়েছে? শাবান মাসের মধ্য রাত্রির ফযীলত সম্পর্কে কিছু হাদীস বর্ণিত হয়েছে। যেমনঃ আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ

فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرِ إِلَّا رَمَضَانَ،
وَمَا رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ

আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে রামাযন ব্যতীত অন্য কোন পূর্ণ মাসে রোযা রাখতে দেখে নি। আর তাঁকে আমি শাবান মাসের চেয়ে অধিক রোযা অন্য কোন মাসে রাখতে দেখি নি^{২২৭}। সুতরাং শাবান মাসে আমরাও রাসূলের সুন্নাত অনুযায়ী বেশী বেশী করে রাখবো এবং আল্লাহর কাছে প্রাণ খুলে দুআ করবো, তিনি যেন আমাদেরকে রামাযন পর্যন্ত হায়াত দান করেন এবং রামাযানের ফজীলত ও বরকত হাসিল করার তাওফীক দেন। আমীন।

আল-কুরআনে শবে বরাতের কোন উল্লেখ নেই। শবে বরাত বলুন আর লাইলাতুল বারায়াত বলুন কোন আকৃতিতে শব্দটি কুরআন মাজীদে খুজে পাবেন না। সত্য কথাটাকে সহজভাবে বলতে গেলে বলা যায় পবিত্র কুরআন মাজীদে শবে বরাতের কোন আলোচনা নেই। সরাসরি তো দূরের কথা আকার ইংগিতেও নেই। অনেককে দেখা যায় শবে বরাতের গুরুত্ব আলোচনা করতে যেয়ে সূরা দুখানের প্রথম চারটি আয়াত পাঠ করেন। আয়াতসমূহ নিম্নরূপঃ

حَمِّ

১.) হা-মীম।

وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ

২) এই সুস্পষ্ট কিতাবের শপথ,

﴿أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ ۚ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ﴾

^{২২৭} সহীহুল বুখারী

৩) আমি এটি এক বরকত ও কল্যাণময় রাতে নাযিল করেছি। কারণ, আমি মানুষকে সতর্ক করতে চেয়েছিলাম।

فِيهَا يُفَرَّقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ

৪) এটা ছিল সেই রাত যে রাতে আমার নির্দেশে প্রতিটি বিষয়ের বিজ্ঞোচিত ফায়সালা দেয়া হয়ে থাকে।

আলোচ্য আয়াতগুলোর ব্যাখ্যায় বলা যায় যে, কিতাবুম মুবীন বা সুস্পষ্ট কিতাবের শপথ করা হয়েছে তা হলো এ কিতাবের রচয়িতা মুহাম্মাদ (ﷺ) নন, আমি (আল্লাহ) নিজে। অর্থাৎ কুরআন যে আল্লাহর বাণী এ বৈশিষ্ট্যের জন্য কুরআনেরই শপথ করা স্বতই এ অর্থ প্রকাশ করে যে, হে লোকজন, এই সুস্পষ্ট কিতাব তোমাদের সামনে বিদ্যমান। চোখ মেলে তা দেখো; এর সুস্পষ্ট দ্ব্যর্থহীন বিষয়বস্তু, এর ভাষা, এর সাহিত্য, এর সত্য ও মিথ্যার মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য সূচনাকারী শিক্ষা, সব কিছুই এ সত্যের সাক্ষ্য পেশ করছে যে, আল্লাহ ছাড়া এর রচয়িতা আর কেউ হতে পারে না। তার প্রমাণ অন্য কোথাও অনুসন্ধান করার দরকার নেই, এ কিতাবই তার প্রমাণের জন্য যথেষ্ট। এর পর আরো বলা হয়েছে, যে রাতে তা নাযিল করা হয়েছে সে রাত ছিল অত্যন্ত বরকত ও কল্যাণময়। অর্থাৎ যেসব নির্বোধ লোকদের নিজেদের ভালমন্দের বোধ পর্যন্ত নেই তারাই এ কিতাবের আগমনে নিজেদের জন্য আকস্মিক বিপদ মনে করছে এবং এর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বড়ই চিন্তিত। কিন্তু গাফলতির মধ্যে পড়ে থাকা লোকদের সতর্ক করার জন্য আমি যে মুহূর্তে এই কিতাব নাযিল করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি তাদের ও

গোটা মানব জাতির জন্য সেই মুহূর্তটি ছিল অত্যন্ত সৌভাগ্যময়। কোন কোন মুফাসসির সেই রাতে কুরআন নাযিল করার অর্থ গ্রহণ করেছেন এই যে, ঐ রাতে কুরআন নাযিল শুরু হয় আবার কোন কোন মুফাসসির এর অর্থ গ্রহণ করেন, ঐ রাতে সম্পূর্ণ কুরআন 'উম্মুল কিতাব' থেকে স্থানান্তরিত করে অহীর ধারক ফেরেশতাদের কাছে দেয়া হয় এবং পরে তা অবস্থা ও পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রয়োজন মত ২৩ বছর ধরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর নাযিল করা হতে থাকে। প্রকৃত অবস্থা কি তা আল্লাহই ভাল জানেন। ঐ রাত অর্থ সূরা কদরে যাকে 'লাইলাতুল কদর' বলা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে **إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ** আর এখানে বলা হয়েছে **إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَارَكَةٍ** তাছাড়া কুরআন মজীদেই একথা বলা হয়েছে যে সেটি ছিল রমযান মাসের একটি **شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي (أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ) (البقرة: ১৮৫)**

সূরা দুখানের ৪নং আয়াতে বলা হয়েছেঃ

﴿فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ﴾

৪) এটা ছিল সেই রাত যে রাতে আমার নির্দেশে প্রতিটি বিষয়ের বিজ্ঞোচিত ফায়সালা দেয়া হয়ে থাকে।

আয়াতটির ব্যাখ্যাঃ মূল আয়াতে আরবী **أَمْرٍ حَكِيمٍ** শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে যার দু'টি অর্থ। একটি অর্থ হচ্ছে, সেই নির্দেশটি সরাসরি জ্ঞানভিত্তিক হয়ে থাকে। তাতে কোন ত্রুটি বা অপূর্ণতার সম্ভাবনা নেই। অপর অর্থটি হচ্ছে, সেটি অত্যন্ত দৃঢ় ও পাকাপোক্ত সিদ্ধান্ত

হয়ে থাকে। তা পরিবর্তন করার সাধ্য কারো নেই। এ বিষয়টি সূরা কদরে বলা হয়েছে এভাবেঃ

تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ

সেই রাতে ফেরেশতারা ও জিবরাঈল তাদের রবের আদেশে সব রকম নির্দেশ নিয়ে অবতীর্ণ হয়। এ থেকে জানা যায়, আল্লাহর রাজকীয় ব্যবস্থাপনায় এটা এমন এক রাত যে রাতে তিনি ব্যক্তি, জাতি এবং দেশসমূহের ভাগ্যের ফয়সালা অনুসারে কাজ করতে থাকে। কতিপয় মুফাসসিরের কাছে এ রাতটি শা'বানের পনের তারিখের রাত বলে সন্দেহ হয়েছে তাদের মধ্যে হযরত ইকরিমার নাম সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। কারণ, কোন কোন হাদীসে এ রাত সম্পর্কে এ কথা উল্লেখ আছে যে, এ রাতেই ভাগ্যের ফয়সালা করা হয়। কিন্তু ইবনে আব্বাস, ইবনে উমর, মুজাহিদ, কাতাদা, হাসান বাসারী, সাঈদ ইবনে জুবাইর, ইবনে যায়েদ, আবু সালেক, দাহ্‌হাক এবং আরো অনেক মুফাসসির এ ব্যাপারে একমত যে, এটা রমযানের সেই রাত যাকে “লাইলাতুল কদর” বলা হয়েছে। কারণ, কুরআন মজীদ নিজেই সুস্পষ্ট করে তা বলছে। আর যে ক্ষেত্রে কুরআনের সুস্পষ্ট উক্তি বিদ্যমান সে ক্ষেত্রে ‘আখবারে আহাদ’* ধরনের হাদীসের ওপর ভিত্তি করে ভিন্ন কোন সিদ্ধান্ত নেয়া যায় না। ইবনে কাসীর বলেনঃ এক শা'বান থেকে অন্য শা'বান পর্যন্ত ভাগ্যের ফয়সালা হওয়া সম্পর্কে উসমান ইবনে মুহাম্মাদ বর্ণিত যে হাদীস ইমাম যুহরী উদ্ধৃত করেছেন তা একটি ‘মুরসাল’ হাদীস। কুরআনের সুস্পষ্ট উক্তির (نص) বিরুদ্ধে এ ধরনের হাদীস পেশ

করা যায় না। কাযী আবু বকর ইবনুল আরাবী বলেনঃ শা'বানের পনের তারিখের রাত সম্পর্কে কোন হাদীসই নির্ভরযোগ্য নয়, না তার ফযীলত সম্পর্কে, না ঐ রাতে ভাগ্যের ফয়সালা হওয়া সম্পর্কে। তাই সেদিকে ভ্রক্ষেপ না করা উচিত। (আহকামুল কুরআন)

* আখবারে আহাদ বলতে এমন হাদীস বুঝায় যে হাদীসের বর্ণনা সূত্রের কোনো এক স্তরে বর্ণনাকারী মাত্র একজন থাকে। এ বিষয়টি হাদীসের মধ্যে তুলনামূলভাবে কিছুটা দুর্বলতা সঞ্চর করে।

* যে হাদীসে মূল রাবী সাহাবীর নাম উল্লেখিত থাকে না বরং তাবেঈ নিজেই রাসূলের (ﷺ) থেকে হাদীস বর্ণনা করেন তাকে মুরসাল হাদীস বলে। ইমাম মালেক ও ইমাম আবু হানীফা ছাড়া অন্য কোনো ইমামই এ ধরনের হাদীসকে নিঃসংকোচে গ্রহণ করেননি। (সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী, তাফহীমুল কুরআন, আধুনিক প্রকাশনী, বাংলা বাজার, ঢাকা)^{২২৮}।

বস্তুতঃ শবে বরাত পন্থী আলেম উলামারা এখানে বরকতময় রাত বলতে ১৫ শাবানের রাতকে বুঝিয়ে থাকেন। আমি এখানে স্পষ্টভাবেই বলব যে, যারা এখানে বরকতময় রাতের অর্থ ১৫ শাবানের রাতকে বুঝিয়ে থাকেন তারা এমন বড় ভুল করেন যা আল্লাহর কালাম বিকৃত করার মত অপরাধ। অতএব বরকতময় রাত হল লাইলাতুল কদর। লাইলাতুল বারায়াত নয়। সূরা দুখানের প্রথম সাত আয়াতের ব্যাখ্যা হল এই সূরা আল-কদর। আর এ ধরনের

^{২২৮} সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী, তাফহীমুল কুরআন, আধুনিক প্রকাশনী, বাংলা বাজার, ঢাকা

ব্যাখ্যা অর্থাৎ আল-কুরআনের এক আয়াতের ব্যাখ্যা অন্য আয়াত দ্বারা করা হল সর্বোত্তম ব্যাখ্যা। শবে বরাত পন্থী আলেম উলামারা এখানে বরকতময় রাত বলতে ১৫ শাবানের রাতকে বুঝিয়ে থাকেন। আমি এখানে স্পষ্টভাবেই বলব যে, যারা এখানে বরকতময় রাতের অর্থ ১৫ শাবানের রাতকে বুঝিয়ে থাকেন তারা এমন বড় ভুল করেন যা আল্লাহর কালাম বিকৃত করার মত অপরাধ। কারণঃ (এক) কুরআন মাজীদে এ আয়াতের তাফসীর বা ব্যাখ্যা সূরা আল-কদর দ্বারা করা হয়। সেই সূরায় আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেনঃ

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ
وَمَا أَذْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ
لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ
تَنْزِيلُ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ
هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ

অর্থঃ আমি এই কুরআন নাযিল করেছি লাইলাতুল কদরে। আপনি জানেন লাইলাতুল কদর কি? লাইলাতুল কদর হল এক হাজার মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এতে প্রত্যেক কাজের জন্য মালাইকা (ফেরেশতাগণ) ও রুহ অবতীর্ণ হয় তাদের পালনকর্তার নির্দেশে। এই শান্তি ও নিরাপত্তা ফজর পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। (সূরা কাদর, আয়াত - ১-৫)। অতএব বরকতময় রাত হল লাইলাতুল কদর। লাইলাতুল বারায়াত নয়। সূরা দুখানের প্রথম সাত আয়াতের ব্যাখ্যা হল এই

সূরা আল-কদর। আর এ ধরনের ব্যাখ্যা অর্থাৎ আল-কুরআনের এক আয়াতের ব্যাখ্যা অন্য আয়াত দ্বারা করা হল সর্বোত্তম ব্যাখ্যা।

(দুই) সূরা দুখানের লাইলাতুল মুবারাকার অর্থ যদি শবে বরাত হয় তাহলে এ আয়াতের অর্থ দাড়ায় আল কুরআন শাবান মাসের শবে বরাতে নাযিল হয়েছে। অথচ আমরা সকলে জানি আল-কুরআন নাযিল হয়েছে রামাযান মাসের লাইলাতুল কদরে। যেমন সূরা বাকারার ১৮৫ নং আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীন বলেনঃ

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

অর্থঃ রামাযান মাস, যাতে নাযিল করা হয়েছে আল-রআন।

(তিন) অধিকাংশ মুফাচ্ছিরে কিরামের মত হল উক্ত আয়াতে বরকতময় রাত বলতে লাইলাতুল কদরকেই বুঝানো হয়েছে।

শুধু মাত্র তাবেয়ী ইকরামা (রহঃ) এর একটা মত উল্লেখ করে বলা হয় যে, তিনি বলেছেন বরকতময় রাত বলতে শাবান মাসের পনের তারিখের রাতকেও বুঝানো যেতে পারে। তিনি যদি এটা বলে থাকেন তাহলে এটা তার ব্যক্তিগত অভিমত। যা কুরআন ও হাদীসের বিরোধী হওয়ার কারণে পরিত্যাজ্য। এ বরকতময় রাতের দ্বারা উদ্দেশ্য যদি শবে বরাত হয় তাহলে শবে কদর অর্থ নেয়া চলবেনা।

(চার) উক্ত আয়াতে বরকতময় রাতের ব্যাখ্যা শবে বরাত করা হল তাফসীর বির-রায় (মনগড়া ব্যাখ্যা), আর বরকতময় রাতের ব্যাখ্যা লাইলাতুল কদর দ্বারা করা হল কুরআন ও হাদীস সম্মত তাফসীর।

সকলেই জানেন কুরআন ও হাদীস সম্মত ব্যাখ্যার উপস্থিতিতে মনগড়া ব্যাখ্যা (তাফসীর বির-রায়) গ্রহণ করার কোন সুযোগ নেই। (পাঁচ) সূরা দুখানের ৪ নং আয়াত ও সূরা কদরের ৪ নং আয়াত মিলিয়ে দেখলে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, বরকতময় রাত বলতে লাইলাতুল কদরকেই বুঝানো হয়েছে। সাহাবী ইবনে আব্বাস (রাঃ), ইবনে কাসীর, কুরতুবী প্রমুখ মুফাছিহে কিরাম এ কথাই জোর দিয়ে বলেছেন এবং সূরা দুখানের ‘লাইলাতুম মুবারাকা’র অর্থ শবে বরাত নেয়াকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। (তাফসীরে মাযারেফুল কুরআন দ্রষ্টব্য)। ইমাম কুরতুবী (রহঃ) তাঁর তাফসীরে বলেছেনঃ “কোন কোন আলেমের মতে ‘লাইলাতুম মুবারাকাহ’ দ্বারা উদ্দেশ্য হল মধ্য শাবানের রাত (শবে বরাত)। কিন্তু এটা একটা বাতিল ধারণা।” অতএব এ আয়াতে ‘লাইলাতুম মুবারাকাহ’ এর অর্থ লাইলাতুল কদর। শাবান মাসের পনের তারিখের রাত নয়।

(ছয়) ইকরামা (রঃ) বরকতময় রজনীর যে ব্যাখ্যা শাবানের ১৫ তারিখ দ্বারা করেছেন তা ভুল হওয়া সত্ত্বেও প্রচার করতে হবে এমন কোন নিয়ম-কানুন নেই। বরং তা প্রত্যাখ্যান করাই হল হকের দাবী। তিনি যেমন ভুলের উর্ধ্বে নন, তেমনি যারা তার থেকে বর্ণনা করেছেন তারা ভুল শুনে থাকতে পারেন অথবা কোন উদ্দেশ্য নিয়ে বানোয়াট বর্ণনা দেয়াও অসম্ভব নয়।

(সাত) শবে বরাতের গুরুত্ব বর্ণনায় সূরা দুখানের উক্ত আয়াত উল্লেখ করার মাধ্যমে মানুষের মধ্যে এ আকীদাহ বদ্ধমূল হয়ে গেছে যে, শবে বরাতে সৃষ্টিকূলের হায়াত-মাউত, রিয়ক-দৌলত সম্পর্কে

সিদ্ধান্ত নেয়া হয় ও লিপিবদ্ধ করা হয়। আর শবে বরাত উদযাপনকারীদের শতকরা নিরানব্বই জনের বেশী এ ধারণাই পোষণ করেন। তারা এর উপর ভিত্তি করে লাইলাতুল কদরের চেয়ে ১৫ শাবানের রাতকে বেশী গুরুত্ব দেয়। অথচ কুরআন ও হাদীসের আলোকে এ বিষয়গুলি লাইলাতুল কদরের সাথে সম্পর্কিত। তাই যারা শবে বরাতের গুরুত্ব বুঝাতে উক্ত আয়াত উপস্থাপন করেন তারা মানুষকে সঠিক ইসলামী আকীদাহ থেকে দূরে সরানোর কাজে লিপ্ত, যদিও মনে-প্রাণে তারা তা ইচ্ছা করেন না।

(আট) ইমাম আবু বকর আল জাসসাস তার আল-জামে লি আহকামিল কুরআন তাফসীর গ্রন্থে লাইলাতুল মুবারাকা দ্বারা মধ্য শাবানের রাত উদ্দেশ্য করা ঠিক নয় বলে বিস্তারিত আলোচনা করার পর বলেনঃ লাইলাতুল কদরের চারটি নাম রয়েছে, তা হলঃ লাইলাতুল কদর, লাইলাতুল মুবারাকাহ, লাইলাতুল বারাত ও লাইলাতুল সিক। (তথ্যসূত্রঃ আল জামে লি আহকামিল কুরআন, সূরা আদ-দুখানের তাফসীর দ্রষ্টব্য)। লাইলাতুল বারাত হল লাইলাতুল কদরের একটি নাম। শাবান মাসের পনের তারিখের রাতের নাম নয়। ইমাম শাওকানী (রহঃ) তার তাফসীর ফতহুল কাদীরে একই কথাই লিখেছেন। (তাফসীর ফতহুল কাদীরঃ ইমাম শাওকানী দ্রষ্টব্য)। এ সকল বিষয় জেনে বুঝেও যারা ‘লাইলাতুল মুবারাকা’র অর্থ করবেন শবে বরাত, তারা সাধারণ মানুষদের গোমরাহ করা এবং আল্লাহর কালামের অপব্যখ্যা করার দায়িত্ব এড়াতে পারবেন না।

হাদীসের দৃষ্টিতে শবে বরাত

শবে বরাত নামটি হাদীসের কোথাও উল্লেখ হয়নি প্রশ্ন থেকে যায় হাদীসে কি লাইলাতুল বরাত বা শবে বরাত নেই? সত্যিই হাদীসের কোথাও আপনি শবে বরাত বা লাইলাতুল বারায়াত নামের কোন রাতের নাম খুঁজে পাবেন না। যে সকল হাদীসে এ রাতের কথা বলা হয়েছে তার ভাষা হল ‘লাইলাতুন নিস্ফ মিন শাবান’ অর্থাৎ মধ্য শাবানের রাত্রি। শবে বরাত বা লাইলাতুল বারায়াত শব্দ আল-কুরআনে নেই, হাদীসে রাসূলেও নেই। এটা মানুষের বানানো একটা শব্দ। ভাবলে অবাক লাগে যে, একটি প্রথা ইসলামের নামে শত শত বছর ধরে পালন করা হচ্ছে অথচ এর আলোচনা আল-কুরআনে নেই। সহীহ হাদীসেও নেই। অথচ আপনি দেখতে পাবেন যে, সামান্য নফল ‘আমলের ব্যাপারেও হাদীসের কিতাবে এক একটি অধ্যায় বা শিরোনাম লেখা হয়েছে।

ফিকহের কিতাবের দৃষ্টিতে শবে বরাত

শুধু আল-কুরআনে কিংবা সহীহ হাদীসে নেই, বরং আপনি ফিকহের নির্ভরযোগ্য কিতাবগুলো পড়ে দেখুন, কোথাও শবে বরাত নামের কিছু পাবেন না। বাংলাদেশসহ ভারতীয় উপমহাদেশে দ্বিনি মাদ্রাসাগুলিতে ফিকহের যে সিলেবাস রয়েছে যেমন মালাবুদ্দা মিনহ, নুরুল ইজাহ, কদুরী, কানযুদ্ দাকায়েক, শরহে বিকায়া ও হিদায়াহ খুলে দেখুন না! কোথাও শবে বরাত নামের কিছু পাওয়া যায় কিনা! অথচ আমাদের পূর্বসূরী ফিকাহবিদগণ ইসলামের অতি সামান্য বিষয়গুলো আলোচনা করতেও কোন ধরনের কার্পণ্যতা দেখাননি।

তারা সূর্যগ্রহণ, চন্দ্রগ্রহণের সালাত সম্পর্কেও অধ্যায় রচনা করেছেন। অনুচ্ছেদ তৈরী করেছেন কবর যিয়ারতের মত বিষয়েরও। শবে বরাতের ব্যাপারে কুরআন ও সুন্নাহর সামান্যতম ইশারা থাকলেও ফিকাহবিদগণ এর আলোচনা মাসয়ালা-মাসায়েল অবশ্যই বর্ণনা করতেন। অতএব এ রাতকে শবে বরাত বা লাইলাতুল বারায়াত অভিহিত করা মানুষের মনগড়া বানানো একটি বিদ'আত যা কুরআন বা হাদীস দ্বারা সমর্থিত নয়। শবে বরাত সম্পর্কে এ বিশ্বাস পোষণ করা যে, আল্লাহ তা'আলা এ রাতে আল-কুরআন অবতীর্ণ করেছেন, তিনি এ রাতে মানুষের হায়াত, রিযিক ও ভাগ্যের ফায়সালা করে থাকেন, এ রাতে ইবাদাত-বন্দেগীতে লিপ্ত হলে আল্লাহ হায়াত ও রিযিক বাড়িয়ে সৌভাগ্যশালী করেন ইত্যাদি আকীদা কি আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের প্রতি মিথ্যা আরোপ করার মত অন্যায় নয় কি? আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা'আলা বলেনঃ

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ.

অর্থঃ তার চেয়ে বড় যালিম আর কে যে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে?^{২২৯}। শবে বরাত সম্পর্কে উলামায়ে কিরামের বক্তব্য এ শিরোনামে আমি শবে বরাত সম্পর্কে বিশ্ব বরেণ্য আলেম শায়খ আবদুল আযীয আবদুল্লাহ বিন বায (রহঃ) এর প্রবন্ধ -

حكم الاحتفال بليلة النصف من شعبان، للشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله.

^{২২৯} সূরা সাফ, আয়াত নং -৭

‘মধ্য শাবানের রাত উদযাপনের বিধান’ এর সার-সংক্ষেপ তুলে ধরব। তার এ প্রবন্ধে অনেক উলামায়ে কিরামের মতামত তুলে ধরা হয়েছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এ প্রসঙ্গে বলেনঃ

اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام
(৩ : দিনা. (المائدة)

অর্থঃ আজ আমি তোমাদের দ্বীনকে তোমাদের জন্য পূর্ণাঙ্গ করলাম ও তোমাদের জন্য আমার নেআমাত সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীন মনোনীত করলাম। (সূরা মায়িদা, ৩)। আল্লাহ তা’আলা আরো বলেনঃ

(২১ : أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. (الشورى)

অর্থঃ তাদের কি এমন কতগুলো শরীক আছে যারা তাদের জন্য ধর্মের এমন বিধান দিয়েছে যার অনুমতি আল্লাহ দেননি? (সূরা শুরা, ২১)

হাদীসে এসেছেঃ

عن عائشة رضى الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : من أحدث
(في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. (رواه البخاري ومسلم)

অর্থঃ যে আমাদের এ ধর্মে এমন কিছু প্রচলন করবে যা দ্বীনের মধ্যে ছিল না তা প্রত্যাখ্যাত হবে। (বুখারী ও মুসলিম)।

হাদীসে আরও এসেছেঃ সাহাবী জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম জুমু‘আর খুতবায় বলতেনঃ

عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبة يوم الجمعة: أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. (رواه مسلم)

অর্থঃ আর শুনে রেখ! সর্বোত্তম কথা হল আল্লাহর কিতাব ও সর্বোত্তম পথ-নির্দেশ হল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের পথ-নির্দেশ। আর ধর্মে নতুন বিষয় প্রচলন করা হল সর্ব নিকৃষ্ট বিষয়। এবং সব ধরনের বিদ’আতই পথভ্রষ্টতা। (মুসলিম)

এ বিষয়ে অনেক আয়াতে কারীমা ও হাদীস রয়েছে যা থেকে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তা‘আলা ইসলাম ধর্মকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন। আর নবী কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে কোন রকম অলসতা করেননি বা কার্পণ্যতা দেখাননি।

ইসলাম ধর্মের সকল খুটিনাটি বিষয় তিনি স্পষ্টভাবে তাঁর উম্মতের সামনে বর্ণনা করে গেছেন যা আজ পর্যন্ত সুরক্ষিত রয়েছে। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যুর পর যে সমস্ত নতুন আচার-অনুষ্ঠান, কাজ ও বিশ্বাস ধর্মের আচার বলে যা চালিয়ে দেয়া হবে তা সবগুলো প্রত্যাখ্যাত বিদ’আত বলেই পরিগণিত হবে, তা উহার প্রচলনকারী যে কেউ হোক না কেন এবং উদ্দেশ্য যত মহৎ হোক না কেন। সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) ও তাদের পরবর্তী উলামায়ে ইসলাম এ ব্যাপারে সতর্ক ছিলেন বলে তারা বিদ’আতকে প্রত্যাখ্যান করেছেন ও অন্যদের বিদ’আতের ব্যাপারে সতর্ক করেছেন। এ ধারাবাহিকতায় উলামায়ে কিরাম মধ্য শাবানের রাত

উদযাপন ও ঐদিন সিয়াম পালন করাকে বিদ'আত বলেছেন। কারণ এ বিষয়ের উপর ভিত্তি করে 'আমল করা যেতে পারে এমন কোন দলীল নেই। যা আছে তা হল কিছু দুর্বল হাদীস যার উপর ভিত্তি করে 'আমল করা যায় না। উক্ত রাতে সালাত আদায়ের ফাযীলাতের যে সকল হাদীস পাওয়া যায় তা বানোয়াট। এ ব্যাপারে হাফেয ইবনে রজব তার কিতাব লাতায়িফুল মাযারিফে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। একটি কথা অবশ্যই বলতে হয় যে, দুর্বল হাদীস ঐ সকল 'আমল ও ইবাদাতের ক্ষেত্রে গ্রহণ করা যায় যে সকল 'আমল কোন সহীহ হাদীস দ্বারা ইতোপূর্বে প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু মধ্য শাবানের রাতে একত্র হয়ে ইবাদাত-বন্দেগী করার ক্ষেত্রে কোন সহীহ হাদীস নেই। এ মূল নীতিটি ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) উল্লেখ করেছেন। সকল উলামায়ে কিরামের একটি ব্যাপারে ইজমা (ঐকমত্য) হয়েছে যে, যে সকল ব্যাপারে বিতর্ক বা ইখতিলাফ রয়েছে সে সকল বিষয় কুরআন ও সুন্নাহর কাছে ন্যস্ত করা হবে। কুরআন অথবা হাদীস যে সিদ্ধান্ত দিবে সেই মোতাবেক 'আমল করা ওয়াজিব। এ কথা তো আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নিজেই বলেছেনঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. (النساء)

অর্থঃ হে ঈমানদারগণ! যদি তোমরা আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাস কর তাহলে আনুগত্য কর আল্লাহর ও আনুগত্য কর রাসূলের এবং তাদের, যারা তোমাদের মধ্যে (ধর্মীয় জ্ঞানে ও শাসনের ক্ষেত্রে)

ক্ষমতার অধিকারী; কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ হলে তানাস্ত কর আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর। এটাই উত্তম ও পরিণামে উৎকৃষ্টতর। (সূরা নিসা, ৫৯)। এ বিষয়ে অসংখ্য আয়াত ও হাদীস রয়েছে। হাফেয ইবনে রজব (রহঃ) তার কিতাব লাতায়িফুল মাযারিফে লিখেছেনঃ “তাবেয়ীদের যুগে সিরিয়ায় খালিদ ইবনে মা’দান, মকহুল, লুকমান ইবনে আমের প্রমুখ আলিম এ রাতকে মর্যাদা দিতে শুরু করেন এবং এ রাতে বেশী পরিমাণে ইবাদাত-বন্দেগী করতেন। তখন লোকেরা তাদের থেকে এটা অনুসরণ করতে আরম্ভ করল। এরপর লোকদের মধ্যে মতানৈক্য শুরু হল; বসরা অঞ্চলের অনেক আবেদগণ এ রাতকে গুরুত্ব দিতেন। কিন্তু মক্কা ও মদীনার আলিমগণ এটাকে বিদ’আত বলে প্রত্যাখ্যান করলেন। অতঃপর সিরিয়াবাসী আলিমগণ দুই ভাগ হয়ে গেলেন। একদল এ রাতে মাসজিদে একত্র হয়ে ইবাদাত-বন্দেগী করতেন। এদের মধ্যে ছিলেন খালেদ ইবনে মা’দান, লোকমান ইবনে আমের। ইসহাক ইবনে রাহভিয়াহও তাদের অনুরূপ মত পোষণ করতেন। আলেমদের অন্যদল বলতেনঃ এ রাতে মাসজিদে একত্র হয়ে ইবাদাত-বন্দেগী করা মাকরুহ, তবে কেহ ব্যক্তিগতভাবে ইবাদাত-বন্দেগী করলে তাতে দোষের কিছু নেই। ইমাম আওয়ায়ী এ মত পোষণ করতেন।

মোট কথা হল, মধ্য শাবানের রাতের ‘আমল সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবায়ে কিরামদের থেকে কোন কিছু প্রমাণিত নয়। যা কিছু পাওয়া যায় তা তাবেয়ীগণের যুগে

সিরিয়ার একদল আলেমের ‘আমল।’ বিশুদ্ধ কথা হল, এ রাতে ব্যক্তিগত ‘আমল সম্পর্কে ইমাম আওয়ামী ও ইবনে রজব (রহঃ) এর মতামত যা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে তা তাদের ব্যক্তিগত অভিমত যা সহীহ নয়। আর এটাতো সকল আলেমে দ্বীনের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত যে, শরয়ীভাবে প্রমাণিত নয় তা ব্যক্তিগত হোক বা সমষ্টিগত, প্রকাশ্যে হোক অথবা গোপনে হোক তা কোন মুসলিমের ধর্মীয় ‘আমল হিসাবে পালন করা জায়েয নয়। এ ক্ষেত্রে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত নিন্মের হাদীস হল আম তথা ব্যাপক অর্থবোধক। তিনি বলেছেনঃ

من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد. (رواه مسلم)

অর্থঃ যে কেহ এমন ‘আমল করবে যা করতে আমরা (ধর্মীয়ভাবে) নির্দেশ দেইনি তা প্রত্যাখ্যাত। (সহীহ মুসলিম)।

ইমাম আবু বকর আত-তারতুশী (রহঃ) তার কিতাব (الحوادث) ‘আল-হাওয়াদিস ওয়াল বিদআ’তে উল্লেখ করেনঃ ইবনে ওয়াদ্দাহ য়ায়েদ বিন আসলাম সূত্রে বর্ণনা করে বলেনঃ আমাদের কোন উস্তাদ বা কোন ফকীহকে মধ্য শাবানের রাতকে কোন রকম গুরুত্ব দিতে দেখিনি। তারা মাকহূলের হাদীসের দিকেও তাকাননি এবং এ রাতকে অন্য রাতের চেয়ে ‘আমলের ক্ষেত্রে মর্যাদা সম্পন্ন মনে করতেন না। হাফেয ইরাকী (রহঃ) বলেনঃ মধ্য শাবানের রাতে সালাত আদায় সম্পর্কিত হাদীসগুলো বানোয়াট বা জাল এবং এটা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি মিথ্যা আরোপের শামিল। এ সম্পর্কে সকল উলামাদের মতামত যদি

উল্লেখ করতে যাই তাহলে বিরাট এক গ্রন্থ হয়ে যাবে। তবে সত্যানুরাগীদের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যা ইতোপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। মধ্য শাবানের রাতে সালাত আদায়ের জন্য একত্র হওয়া, ঐ দিন সিয়াম পালন করা ইত্যাদি নিকৃষ্ট বিদ'আত। অধিকাংশ উলামায়ে কিরাম এটাই বলেছেন। এ ধরনের 'আমল আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে যেমন ছিল না তেমনি ছিল না তাঁর সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) এর সময়ে। যদি এ রাতে ইবাদাত-বন্দেগী করা সওয়াবের কাজ হত তাহলে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মতকে সে সম্পর্কে সতর্ক ও উৎসাহিত করতে কার্পণ্য করতেন না, যেমন তিনি কার্পণ্য করেননি লাইলাতুল কদর ও রামাযানের শেষ দশ দিন ইবাদাত-বন্দেগী করার ব্যাপারে মুসলিমদের উৎসাহিত করতে। যদি মধ্য শাবানের রাতে অথবা রজব মাসের প্রথম জুমু'আর রাতে বা মি'রাজের রাতে ইবাদাত-বন্দেগী করা সওয়াবের কাজ হত তাহলে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মতকে এ ব্যাপারে অবশ্যই দিক-নির্দেশনা দিতেন। আর তিনি যদি দিক-নির্দেশনা দিতেন তাহলে তার সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) কোনভাবেই তা গোপন করতেন না। তারা তা অবশ্যই জোরে শোরে প্রচার করতেন। তারা তো নবীগণের পর উম্মতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।”

সম্মানিত পাঠক ও পাঠিকা বৃন্দ! চলমান শিরোনামে এতক্ষণ যা বলা হল তা ছিল শায়খ আবদুল আযীয আবদুল্লাহ বিন বাযের বক্তব্যের সার কথা। কেউ প্রশ্ন করতে পারেন যে, শবে বরাতের বিপক্ষে

উলামাদের বক্তব্য উল্লেখ করলেন, কিন্তু শবে বরাত উদযাপনের পক্ষেও তো অনেক বিখ্যাত উলামাদের বক্তব্য আছে তা তো উল্লেখ করলেন না। তাই ব্যাপারটা কি একপেশে ও ইনসাফ বহির্ভূত হয়ে গেল না? এর জবাবে আমি বলবঃ দেখুন, কোন বিষয় বিদ'আত হওয়ার ক্ষেত্রে উলামাদের বক্তব্য যথেষ্ট। কেননা কুরআন ও হাদীসে কোন বিষয়কে নির্দিষ্ট করে বলা হয়নি যে, অমুক কাজটি বিদ'আত। তাই আলেমগণ যেটাকে বিদ'আত বলে রায় দিবেন সেটা বিদ'আতই হবে। বিদ'আত নির্ধারণের দায়িত্ব আলেমদের। কিন্তু কোন বিষয়কে ওয়াজিব, সুন্নাত বা মুস্তাহাব অথবা সওয়াবের কাজ বলে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে আলেমদের বক্তব্য যথেষ্ট হবে না যদি না তার পক্ষে কুরআন ও হাদীসের সহীহ দলীল থাকে।

অতএব কোন বিষয় বিদ'আত হওয়ার ক্ষেত্রে উলামাদের বক্তব্য গ্রহণযোগ্য, কিন্তু সুন্নাত হওয়ার ব্যাপারে নয়। আর এ কারণে আমরা শবে বরাত প্রচলনের সমর্থনে আলেমদের বক্তব্য উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করিনা। এ বিবেচনায় যে সকল আলেম শবে বরাত উদযাপন করাকে বিদ'আত বলেছেন তাদের বক্তব্য গ্রহণ করতে হবে। যারা শবে বরাতের পক্ষে বলেছেন তাদের বক্তব্য এ জন্য গ্রহণ করা যাবে না যে, তা কুরআন ও সুন্নাহর সহীহ দলীলে উত্তীর্ণ নয়।

শবে বরাত নামাযের প্রথম প্রচলন

এ নামাযের প্রথম প্রচলন হয় হিজরী ৪৪৮ সনে। ফিলিস্তিনের নাবলুস শহরের ইবনে আবিল হামরা নামীয় একলোক বায়তুল

মুকাদ্দাস আসেন। তার তিলাওয়াত ছিল সুমধুর। তিনি শাবানের মধ্যরাত্রিতে নামায়ে দাঁড়ালে তার পিছনে এক লোক এসে দাঁড়ায়, তারপর তার সাথে তৃতীয় জন এসে যোগ দেয়, তারপর চতুর্থ জন। তিনি নামায শেষ করার আগেই বিরাট একদল লোক এসে তার সাথে যুক্ত হয়ে পড়ে। পরবর্তী বছর এলে, তার সাথে অনেকেই যোগ দেয় ও নামায আদায় করে। এতে করে মাসজিদুল আক্সাতে এ নামাযের প্রথা চালু হয়। কালক্রমে এ নামায এমনভাবে আদায় হতে লাগে যে অনেকেই তা সুন্নাত মনে করতে শুরু করে^{১০০}। আরও বিস্তারিতভাবে বলা যায় যে, এ রাতে একশত রাকাত নামাযের ব্যাপারে যত হাদীস রয়েছে, তার সবই জাল বা বানোওয়াট। এ নামায সম্পর্কে রাসূল (সাঃ) থেকে কোন হাদীস প্রমাণিত নেই। একশত রাকাত নামায পড়ার বিদআত টি ৪৪৮ হিজরীতে সর্বপ্রথম জেরুজালেমের বাইতুল মুকাদ্দাস মসজিদে প্রবর্তিত হয়।

এ প্রসঙ্গে ইমাম মাকদেসী (রহঃ) বলেনঃ “৪৪৮ হিজরীতে বাইতুল মাকদিসে আমাদের নিকট ইবনে আবী হুমায়রা নামক একজন লোক আগমণ করলো। তার তেলাওয়াত ছিল খুব সুন্দর। অর্ধ শাবানের রাতে সে মসজিদে আকসায় নামায়ে দাড়িয়ে গেল। তার পিছনে একজন এসে দাড়ালো। তারপর আরেকজন আসলো। এভাবে এক, দুই তিন করে নামায শেষ করা পর্যন্ত বিরাট এক

^{১০০} ঙ্কারতুসীঃ হাওয়াদেস ও বিদআ পৃঃ ১২১, ১২২, ইবনে কাসীরঃ বিদায়া ওয়ান নিহায়া ১৪/২৪৭, ইবনুল কাইয়েমঃ আল-মানারুল মুনিফ পৃঃ ৯৯

জামাতে পরিণত হলো।” (দেখুন **البدع ١٢ كار على الباعث**) (দেখুন **الحوادث** ১২৪-১২৫) পরবর্তীতে মসজিদের ইমামগণ অন্যান্য নামাযের ন্যায় এ নামাযও চালু করে দেয়।

শবে বরাত নামাযের পদ্ধতি

প্রথা অনুযায়ী এ নামাযের পদ্ধতি হলো, প্রতি রাকাতে সূরা ফাতিহার পর সূরা ইখলাস দশবার করে পড়ে মোট একশত রাকাত নামায পড়া। যাতে করে সূরা ইখলাস ১০০০ বার পড়া হয়^{২০১}। এ ধরনের নামায সম্পূর্ণ বিদআত। কারণ এ ধরনের নামাযের বর্ণনা কোন হাদীসের কিতাবে আসেনি। কোন কোন বইয়ে এ সম্পর্কে যে সকল হাদীস উল্লেখ করা হয় সেগুলো কোন হাদীসের কিতাবে আসেনি। আর তাই আল্লামা ইবনুল জাওয়যী^{২০২}, হাফেয ইরাকী (তাখরীজুল এহইয়া), ইমাম নববী^{২০৩}, আল্লামা আবু শামাহ (আল-বায়স পৃঃ ৩২-৩৬), শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া, (ইকতিদায়ে ছিরাতুল মুস্তাকীম ২/৬২৮), আল্লামা ইবনে আররাক (তানযীহুশ শরীয়াহ ২/৯২), ইবনে হাজার আল-আসকালানী, আল্লামা সূয়ুতী^{২০৪}, আল্লামা শাওকানী (ফাওয়ায়েদুল মাজমুআ পৃঃ ৫১)^{২০৫} সহ আরো অনেকেই এ গুলোকে “বানোয়াট হাদীস” বলে সুস্পষ্ট ঘোষণা দিয়েছেন।

^{২০১} এহইয়ায়ে উলুমুদীন (১/২০৩)

^{২০২} মাওদুআত ১/১২৭-১৩০

^{২০৩} আল-মাজমু ৪/৫৬

^{২০৪} আল-আমর বিল ইডেবা পৃঃ ৮১, আল-লাআলিল মাসনূআ ২/৫৭

^{২০৫} ফাওয়ায়েদুল মাজমুআ পৃঃ ৫১

শবে বরাত নামাযের হুকুম

সঠিক জ্ঞানের অধিকারী আলেমগণের মতে এ ধরনের নামায বিদআত; কেননা এ ধরনের নামায আল্লাহর রাসূলও পড়েননি। তার কোন খলীফাও পড়েননি এমনকি সাহাবাগণও পড়েননি। হেদায়াতের ইমাম তথা আবু হানিফা, মালেক, শাফেয়ী, আহমাদ, সাওরী, আওয়ামী, লাইসসহ অন্যান্যগণ কেউই এ ধরনের নামায পড়েননি বা পড়তে বলেননি। আর এ ধরনের নামাযের বর্ণনায় যে হাদীসসমূহ কেউ কেউ উল্লেখ করে থাকেন তা উম্মাতের আলেমদের ইজমা অনুযায়ী বানোয়াট^{২৩৬}।

ভ্রান্ত ধারণা ও সংশয় নিরসন

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, বর্তমান সময়ে আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষের মধ্যেই শাবান মাস সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে। বিশেষ করে প্রচলিত আছে সমাজের বিরাট এক অংশে শাবান মাসের ১৪ তারিখ দিবাগত রাতে কিয়াম করা তথা নফল নামায পড়া এবং পরের দিন সিয়াম পালন করার চিরাচরিত নিয়ম। যদিও রাসূল (সাঃ) থেকে এই রাতের নফল নামায এবং দিনের বেলা রোযা রাখার ব্যাপারে কোন সহীহ হাদীস পাওয়া যায়না। এ রাতকে আমাদের দেশের পরিভাষায় শবে বরাত বলা হয়ে থাকে। এ রাত সম্পর্কে মানুষের বিদআতী ধারণা এবং এ রাতে মানুষ যে সমস্ত

^{২৩৬} ইবনে তাইমিয়ার মাজমুল ফাতাওয়া ২৩/১৩১, ১৩৩, ১৩৪, ইকতিদায়ে হিরাতে মুত্তাকীম ২/৬২৮, আবু শামাহঃ আল-বায়েছ পৃঃ ৩২-৩৬, রশীদ রিদাঃ ফাতাওয়া ১/২৮, আলী মাহফুজ, ইবদা' পৃঃ ২৮৬, ২৮৮, ইবনে বাযঃ আত্‌তাহযীর মিনাল বিদআহ পৃঃ ১১-১৬

বিদআতী আমল করে তার বিস্তারিত কিছু বিবরণ নিম্নে উপস্থাপন করা হলঃ

শবে বরাতে কুরআন নাযিল হয়েছে বলে ধারণা

শবে বরাত পালনকারীদের বক্তব্য হল, শবে বরাতের রাতেই কুরআন নাযিল হয়েছে। সূরা দুখানের ৩নং আয়াতকে তারা দলীল হিসাবে পেশ করে থাকে। আল্লাহ বলেন-

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَارَكَةٍ

“আমি কুরআনুল কারীমকে একটি বরকতপূর্ণ রাতে অবতীর্ণ করেছি”^{২৩৭}

এ বরকতপূর্ণ রাতই হল শবে বরাতের রাত। কতিপয় আলেম এভাবেই অত্র আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন। তাদের এ ব্যাখ্যা মোটেই গ্রহণযোগ্য নয় বরং এখানে বরকতপূর্ণ রাত বলতে লাইলাতুল কদর উদ্দেশ্য।

আল্লামা ইবনে কাছীর (রহঃ) বলেন, অত্র বরকতপূর্ণ রাতই হল লাইলাতুল কদর বা কদরের রাত। যেমন অন্যত্র সুস্পষ্টভাবে উল্লেখিত হয়েছে। কুরআনের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য কথা হল, কুরআনের কোন অস্পষ্ট আয়াতের ব্যাখ্যা যদি অন্য কোন আয়াতে সুস্পষ্টভাবে পাওয়া যায়, তাহলে কুরআনের ব্যাখ্যাই গ্রহণ করতে হবে। আমরা দেখতে পাই যে, আল্লাহ সূরা কদরের শুরুতে বলেন,

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ

^{২৩৭} সূরা দুখান, আয়াত নং - ৩

“আমি কুরআনকে রুদরের রাতে অবতীর্ণ করেছি^{২৩৮}। আর এ কথা সর্বসম্মতভাবে স্বীকৃত যে, লাইলাতুল রুদর রামাযান মাস ব্যতীত অন্য কোন মাসে নয়। এমনিভাবে আল্লাহ তায়ালা রামাযান মাসে কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার কথা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করে সূরা বাকারায় বলেন-

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

“রামাযান মাস এমন একটি মাস, যাতে কুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে^{২৩৯}। সুতরাং শবে বরাতে কুরআন নাযিল হওয়ার কথা গ্রহণযোগ্য হতে পারেনা।

শবে বরাতে রাত্রে আল্লাহ দুনিয়ার আকাশে নেমে আসার ধারণা

শবে বরাতে ইবাদতের পক্ষের আলেমগণ বলে থাকে, এ রাত্রে শেষের দিকে আল্লাহ দুনিয়ার আসমানে নেমে আসেন এবং কলব গোত্রের বকরীগুলোর লোম সংখ্যার চেয়ে অধিক সংখ্যক লোকের গুনাহ ক্ষমা করে থাকেন।

উপরোক্ত অর্থ বহনকারী হাদীসটি কয়েকটি সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু সকল বর্ণনাই যঈফ বা দুর্বল^{২৪০}। ইমাম তিরিমিযী বলেন, “আমি আমার উস্তাদ মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল আল-বুখারীকে বলতে শুনেছি যে, এই হাদীসটি যঈফ”^{২৪১}। নির্দিষ্টভাবে এ রাত্রে আল্লাহর

^{২৩৮} সূরা রুদর, আয়াত নং - ১

^{২৩৯} সূরা বাকার, আয়াত নং - ১৮৫

^{২৪০} ইমাম আলবানী তাহকীকসহ মিশকাত (১/২৮৯) হাদীস নং- ১২৯৯

^{২৪১} তিরিমিযী (২/২৫৯) হাদীস নং- ৭৪৪

দুনিয়ার আকাশে নেমে আসার এবং সকল বান্দাকে ক্ষমা চাওয়ার প্রতি আহ্বান জানানোর হাদীসটি সুনানের কিতাবে যঈফ ও জাল সনদে বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়া হাদীসটি বুখারীসহ অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে বর্ণিত সহীহ হাদীসের বিরোধী। সহীহ হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক রাতের শেষ তৃতীয়াংশে দুনিয়ার আকাশে নেমে আসেন এবং বলতে থাকেন, “কোন ক্ষমা প্রার্থনাকারী আছে কি? আমি ক্ষমা করে দিব। অমুক আছে কি? অমুক আছে কি? এভাবে প্রতি রাতেই ঘোষণা করতে থাকেন”^{২৪২}।

সুতরাং জাল হাদীসের উপর ভিত্তি করে সহীহ হাদীসের মর্ম প্রত্যাখ্যান করে শবে বরাতের রাতে আল্লাহ দুনিয়ার আকাশে নেমে আসার আকীদা পোষণ করা এবং সে রাতে বিশেষ ইবাদত করা সম্পূর্ণ বিদআত। আরও বিস্তারিতভাবে নিম্নে আলোচনা করা হলোঃ

১. আলী (রাঃ) - এর বরাত দিয়ে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেছেনঃ “১৫ শা’বানের রাতে তোমরা বেশী বেশী করে ইবাদত কর এবং দিনের বেলায় রোযা রাখ। এ রাতে আল্লাহ তা’আলা সূর্যাস্তের সাথে সাথেই দুনিয়ার আকাশে নেমে আসেন এবং বলতে থাকেনঃ ‘কে আছো আমার কাছে গুনাহ মাফ চাইতে? আমি তাকে মাফ করতে প্রস্তুত। কে আছ রিযিক চাইতে? আমি তাকে রিযিক দিতে প্রস্তুত। কে আছ বিপদগ্রস্থ? আমি তাকে বিপদমুক্ত করতে প্রস্তুত। কে আছ ...’ এভাবে (বিভিন্ন প্রয়োজনের নাম নিয়ে)

^{২৪২} বুখারী, হাদীস নং- ১০৯৪, মুসলিম, হাদীস নং- ১৬৮।

ডাকা হতে থাকে সুবহে সাদেক পর্যন্ত”। (ইবনে মাজাহ কর্তৃক হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে)^{২৪০}। এ হাদীসটি যে আদৌ সহীহ নয়, সে ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে প্রখ্যাত হাদীস বিশারদ ইমাম হাফেজ শিহাব উদ্দিন তাঁর যাওয়ায়েদে ইবনে মাজাহ গ্রন্থে উল্লেখ করেন, হাদীসটির সনদ যইফ (দুর্বল), কারণ হাদীসটির সনদের মাঝখানে আবু বকর বিন আবু সাবরা নামে একজন রাবী (বর্ণনাকারী) অনির্ভরযোগ্য। এমনকি ইমাম আহমদ বিন হাম্বল এবং প্রখ্যাত হাদীস বিশারদ ইবনু মাইন তার ব্যাপারে মন্তব্য করেছেনঃ “লোকটি মিথ্যা হাদীস রচনা করে থাকে”^{২৪১}।

২. আয়েশা (রাঃ) - এর বরাত দিয়ে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেনঃ “আমি এক রাতে দেখতে পাই যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমার পাশে নেই। আমি উনার সন্ধানে বের হলাম। দেখি যে তিনি জান্নাতুল বাকী (কবর স্থানে) অবস্থান করছেন। উর্ধ্বাকাশপানে তাঁর মস্তক ফেরানো। আমাকে দেখে বললেন, ‘আয়েশা, তুমি কি আশঙ্কা করেছিলে যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সাঃ) তোমার প্রতি অবিচার করেছেন?’ আমি বললাম, ‘এমন ধারণা করিনি, তবে মনে করেছিলাম, আপনার অন্য কোন বিবির সান্নিধ্যে গিয়েছেন কিনা।’ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, ‘আল্লাহ তা’আলা ১৫ই শা’বানের রাতে দুনিয়ার আকাশে নেমে আসেন এবং কালব গোত্রের সমুদয় বকরীর সকল পশমের পরিমাণ মানুষকে মাফ করে দেন’^{২৪২}। ইমাম

^{২৪০} ইবনে মাজাহ

^{২৪১} সুনান ইবনে মাজাহ, মন্তব্য ও সম্পাদনাঃ মুহাম্মদ ফুয়াদ আব্দুল বারী, পৃষ্ঠা ৪৪৪

^{২৪২} তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ

তিরমিযী হাদীসটি বর্ণনা করে নিজেই মন্তব্য করেছেনঃ আয়েশা (রাঃ) - এর বরাত দিয়ে বর্ণিত এই হাদীসটি হাজ্জাজ বিন আয়তাআহ্ ছাড়া আর কেউ বর্ণনা করেছেন বলে জানা নেই। ইমাম বুখারী বলেছেনঃ এ হাদীসটি যইফ (দুর্বল)। হাজ্জাজ বিন আয়তাআহ্ বর্ণনা করেছেন ইয়াহইয়া বিন আবি কাসির থেকে অথচ হাজ্জাজ ইয়াহইয়া থেকে আদৌ কোন হাদীস শুনেনি। ইমাম বুখারী আরও বলেছেনঃ এমনকি ইয়াহইয়া বিন আবি কাসিরও রাবী ওরওয়া থেকে আদৌ কোন হাদীস শুনেনি।^{২৪৬}

৩. আবু মুসা আশ'আরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, “১৫-ই শা'বানের রাতে আল্লাহ তা'আলা নিচে নেমে আসেন এবং সকল মানুষকেই মাফ করে দেন। তবে মুশরিককে এবং মানুষের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টিকারীকে মাফ করেন না” (ইবনে মাজাহ)। এ হাদীসটির ব্যাপারে হাফেজ শিহাব উদ্দিন তাঁর যাওয়ায়েদে ইবনে মাজাহ গ্রন্থে উল্লেখ করেনঃ এর সনদ যইফ (দুর্বল)। একজন রাবী (বর্ণনাকারী) আব্দুল্লাহ বিন লাহইয়াহ্ নির্ভরযোগ্য নন। আরেকজন রাবী ওয়ালিদ বিন মুসলিম তাফলীসকারী (সনদের মাধ্যমে হেরফের করেতে অভ্যস্ত) হিসেবে পরিচিত।

প্রখ্যাত হাদীস বিশারদ আসসিন্দী বলেছেনঃ আরেকজন রাবী আদদাহহাক কখনও আবু মুসা থেকে হাদীস শুনেনি। শবে বরাত

^{২৪৬} জাম্বে তিরমিযী, সাওম অধ্যায়, মধ্য শুবানের রাত, পৃষ্ঠা ১৬৫-১৬৮

সংক্রান্ত বর্ণিত সবগুলো হাদীসের সনদের মধ্যেই এ জাতীয় দুর্বলতা বিদ্যমান থাকার কারণে একটি হাদীসও সহীহ'র মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হতে পারেনি।

মৃত ব্যক্তির রুহ দুনিয়াতে আগমনের বিশ্বাস

শবে বরাত পালনের পিছনে যুক্তি হল, এরাতে মানুষের মৃত আত্মীয়দের রুহসমূহ দুনিয়াতে আগমন করে স্ব স্ব আত্মীয়দের সাথে সাক্ষাৎ করে। এটি একটি অবান্তর ধারণা যা কুরআন-সুন্নার সুস্পষ্ট বিরোধী। আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ-

وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ

অনুবাদ:- ওদের (মৃতদের) পিছনে রয়েছে অন্তরায়, তারা সেখানে কিয়ামত দিবস অবদি অবস্থান করবে^{২৪৭}।

এ রাত্রে মানুষের হায়াত, মউত ও রিয়কের বার্ষিক ফয়সালা ভাগ্য লিখা হয় বলে ধারণা

তাদের এধারণাটিও ঠিক নয়। এ কথার পিছনে কুরআন হাদীসের কোন দলীল নেই। সহীহ হাদীসে রাসূল (সাঃ) বলেছেন,-

كَتَبَ اللَّهُ مَقَادِيرَ الْخَلَائِقِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ

অনুবাদঃ “আসমান-জমিন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বেই আল্লাহ তায়ালা স্বীয় মাখলুকের তাকদীর লিখে রেখেছেন^{২৪৮}।

শবে বরাতে মানুষের হায়াত, মউত ও রিয়কের বার্ষিক ফয়সালা হওয়া সংক্রান্ত যে হাদীসটি উসমান বিন মোহাম্মদ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, সে সম্পর্কে তিনি বলেছেন, হাদীসটি মুরসাল। অর্থাৎ,

^{২৪৭} সূরা মুমেনুনঃ ১০০

^{২৪৮} সহীহ মুসলিম

হাদীসের প্রথম বর্ণনাকারী হিসাবে যে সাহাবী রাসূলুল্লাহ (সাঃ) থেকে হাদীসটি শুনেছেন, তার কোন উল্লেখ নেই। ফলে এমন দুর্বল হাদীস দিয়ে কুরআন ও সহীহ হাদীসের অকাট্য বক্তব্যকে খণ্ডন করা যায়না^{২৪৯}। ইমাম কুরতুবী বলেনঃ “বরকতময় রাত্রি বলতে ক্বদরতের রাতকে বোঝানো হয়েছে, যদিও কেউবা বলেছেন সেটা মধ্য শা’বানের রাত। ইকরামাও বলেছেন সেটি হচ্ছে মধ্য শা’বানের রাত। তবে প্রথম মতটি অধিকতর শুদ্ধ। কেননা আল্লাহ বলেছেনঃ ‘আমি এই কুরআনকে লাইলাতুল ক্বদর-এ নাযিল করেছি।’

এ প্রসঙ্গে মানুষের হায়াত, মউত, রিয়ক, ইত্যাদির ফয়সালা শবে বরাতে সম্পন্ন হয় বলে যে রেওয়ায়েত এসেছে, সেটাকে তিনি অগ্রহণযোগ্য বলে বর্ণনা করেন। তিনি পূর্ণরায় উল্লেখ করেনঃ “সহীহ-শুদ্ধ কথা হচ্ছে, এ রাতটি লাইলাতুল ক্বদর।”

অতঃপর তিনি প্রখ্যাত ফকীহ কাযী আবু বকর ইবনুল আরাবীর উদ্ধৃতি পেশ করেনঃ জমহুর আলীমদের মতামত হচ্ছে, এ রাতটি লাইলাতুল ক্বদর। কেউ কেউ বলতে চেয়েছেন এটা মধ্য শা’বানের রাত। এ কথাটি একেবারেই বাতিল। কারণ, আল্লাহ স্বয়ং তাঁর অকাট্য বাণী কুরআনে বলেছেনঃ “রমজান হচ্ছে ঐ মাস যে মাসে কুরআন নাযিল করা হয়েছে।”

এখানে তিনি মাস উল্লেখ করে দিয়েছেন। আর বরকতময় রাত বলে লাইলাতুল ক্বদরকে উল্লেখ করে দিয়েছেন। যে ব্যক্তি এ মাসটিকে রমজান থেকে সরিয়ে অন্য মাসে নিয়ে যায়, সে মূলতঃ আল্লাহর

^{২৪৯} তাফসীর ইবনে কাসীর, খণ্ডঃ ৭, পৃষ্ঠা ৩১৬১

প্রতি মিথ্যা আরোপ করে বসে। মধ্য শা'বানের রাতটির ফজিলত এবং এ রাতে হায়াত-মউতের ফয়সালা সংক্রান্ত কোন একটি হাদীসও সহীহ এবং নির্ভরযোগ্য নয়। কাজেই কেউ যেন সেগুলোর প্রতি দৃষ্টিপাত না করে^{২৫০}।

হালুওয়া রুগটির রহস্য

তাদের বক্তব্য হচ্ছে শবে বরাতের দিন ওহুদ যুদ্ধে নবী (সাঃ) এর দাঁত মোবারক শহীদ হয়েছিল। তাই নবী (সাঃ) শক্ত খাবার খেতে না পারায় নরম খাদ্য হিসাবে হালুওয়া-রুগটি খেয়েছিলেন।^{২৫১} তাই আমরাও নবীর দাঁত ভাঙ্গার ব্যথায় সমবেদনা প্রকাশ করে হালুওয়া-রুগটি খেয়ে থাকি। এটি একটি কাল্পনিক কথা। কারণ ওহুদের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল তৃতীয় হিজরীর শাওয়াল মাসে, শাবান মাসে নয়। যাই হোক, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর প্রশংসায় আজকাল বাংলাদেশের মুসলিমদের মাঝে মারাত্মক অতিরঞ্জন ও সীমালংঘন করা হয়ে থাকে। অথচ এসব বিষয় থেকে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেনঃ

لَا تُظَرُّونِي، كَمَا أَظَرَّتِ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ، فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ، فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ.

অর্থ- আমার প্রশংসায় অতিরঞ্জন করো না যেভাবে নাসারাগণ মারইয়াম পুত্রের ('ঈসা ইবনু মারইয়াম - এর) প্রশংসায় অতিরঞ্জন

^{২৫০} তাফসীরে কুরতুবী, খণ্ডঃ ১৬, পৃষ্ঠাঃ ১২৬-১২৮

^{২৫১} বইটির মূল লেখক: ড: শাইখ সালেহ বিন ফাউযান (হাফিয়াহুল্লাহ)। অনুবাদক: শাইখ আব্দুল্লাহ শাহেদ মাদানী -দাঈ ও শিক্ষক হিসেবে কর্মরত: জুবাইল দাওয়াহ এন্ড গাইডেন্স সেন্টার, সৌদী আরব।

করেছিল। আমি তো কেবল তাঁর (আল্লাহর) বান্দাহ হই, অতএব তোমরা (আমাকে) বলো- “আল্লাহর বান্দাহ ও তাঁর রাসূল”।

এ রাতে কবর যিয়ারতের পিছনে যুক্তি ও তা খন্ডন

এ রাতে রাসূল (সাঃ) বাকী কবরস্থান যিয়ারত করেছেন। তাই আমাদেরকেও এ রাতে কবর যিয়ারত করতে হবে। এ মর্মে ইবনে মাজাহ শরীফে বর্ণিত হাদীসটি যঈফ।

হাদীসের সনদে হাজ্জাজ ইবনে আরত্বাত নামক একজন যঈফ রাবী রয়েছে। ইমাম বুখারী সহ অন্যান্য মুহাদ্দিছগণ হাদীসটিকে যঈফ বলেছেন।

শাবানের মধ্যরাত্রির পরদিন কি রোযা রাখা যাবে

আহমদ ইবন আশ্বল – আব্দুল্লাহ ইবন কায়স আয়েশা (রাঃ) - কে বলতে শুনেছেন,

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ،
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَيْسٍ، سَمِعَ عَائِشَةَ، تَقُولُ كَانَ أَحَبَّ الشُّهُورِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَصُومَهُ شَعْبَانُ ثُمَّ يَصِلَهُ بِرَمَضَانَ.

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) - এর নিকট মাস সমূহের মধ্যে (নফল) রোযার জন্য প্রিয়তম মাস ছিল শাবান মাস। এরপর তিনি রামাযানের রোযা রাখা শুরু করতেন^{২৫২}।

অধিকন্তু আরও বলা যায় যে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বহু সহীহ হাদীসে প্রমাণিত হয়েছে যে, তিনি শাবান

^{২৫২} সুনান আবু দাউদ :: সাওম বা রোজা অধ্যায় ১৪, হাদীস ২৪৩১

মাসে সবচেয়ে বেশী রোযা রাখতেন^{২৫৩}। সে হিসাবে যদি কেউ শাবান মাসে রোযা রাখেন তবে তা হবে সুন্নাত।

শাবান মাসের শেষ দিন ছাড়া বাকী যে কোন দিন রোযা রাখা জায়েয বা সওয়াবের কাজ। তবে রোজা রাখার সময় মনে করতে হবে যে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যেহেতু শাবান মাসে রোজা রেখেছিলেন তাকে অনুসরণ করে রোযা রাখা হচ্ছে অথবা যদি কারও আইয়ামে বিদের নফল রোযা তথা মাসের ১৩, ১৪, ১৫ এ তিনদিন রোযা রাখার নিয়ম থাকে তিনিও রোযা রাখতে পারেন। কিন্তু শুধুমাত্র শাবানের পনের তারিখ রোযা রাখা বিদআত হবে। কারণ শরীয়তে এ রোযার কোন ভিত্তি নেই। আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর রাসূলের পরিপূর্ণ পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলার তৌফিক দিন। আমীন।

নিসফে শাবানের নামায সম্পর্কে বিন বায (রহঃ) এর একটি ফতোয়া

আল্লামা আব্দুল আযীয বিন বায (রহঃ) কে নিসফে শাবানের রাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো- এ রাতে কোন বিশেষ নামায আছে কি না? উত্তরে তিনি বলেনঃ অর্ধ শাবানের রাত সম্পর্কে একটি সহীহ হাদীসও পাওয়া যায় নি। এ ব্যাপারে বর্ণিত সকল হাদীস বানোয়াট ও যঈফ, যার কোন ভিত্তি নেই। আর এটি এমন রাত্রি যার অতিরিক্ত কোন মর্যাদা নেই। তাতে কুরআন পাঠ, একাকী কিংবা

^{২৫৩} বুখারী, হাদীস নং ১৯৬৯, ১৯৭০, মুসলিম, হাদীস নং ১১৫৬, ১১৬১, মুসনাদে আহমাদ ৬/১৮৮, সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং ২৪৩১, সহীহ ইবনে খুযাইমা, হাদীস নং ২০৭৭, সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং ৬৫৭

জামাত বন্ধ হয়ে কোন নামায আদায় করা যাবে না। কতিপয় আলেম এই রাতের যে ফজীলতের কথা বলেছেন, তা দুর্বল। সুতরাং এ রাতের কোন অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্য নেই। এটিই সঠিক কথা। আল্লাহ্ সকলকে তাওফীক দিন^{২৫৪}।

ইমাম আলবানী (রহঃ) বলেনঃ অর্থ শাবানের রাতের ফজীলতে অনেকগুলো দুর্বল হাদীছ এসেছে। সবগুলো হাদীছ এক সাথে মিলালে সহীহর স্তরে পৌঁছে যায়^{২৫৫} তবে তিনি এ রাতে বিশেষ কোন এবাদত করাকে বিদ'আত বলে উল্লেখ করেছেন এবং কঠোর ভাষায় তার প্রতিবাদ করেছেন^{২৫৬}।

শবে বরাতের রোযা

শবে বরাতের রোযা রাখার প্রমাণ স্বরূপ দু'টি হাদীস পেশ করা হয়ে থাকে। প্রথম হাদীসঃ শাবান মাসের মধ্যরাত এলে তোমরা রাতে কিয়াম কর এবং দিনে সিয়াম পালন কর^{২৫৭}। এই হাদীসের সনদে ইবনে আবু সারাহ নামক একজন জাল হাদীস রচনাকারী রাবী থাকার কারণে হাদীসটি গ্রহণযোগ্য নয়^{২৫৮}। দ্বিতীয় হাদীসঃ ইমরান বিন হুসাইন (রাঃ) বলেন, একবার রাসূল (সাঃ) জনৈক ব্যক্তিকে বললেন, তুমি কি সিরারে শাবানের রোযা রেখেছ? লোকটি বলল না। অতপর নবী (সাঃ) রামাযানের পরে রোযা দু'টি কাযা আদায় করতে বললেন। (সহীহ মুসলিম) তারা এ হাদীস থেকে বুঝতে

^{২৫৪} ইবনে বায (রঃ) এর ফতোয়া সিরিজ প্রথম খন্ড

^{২৫৫} সিলসিলায়ে সহাহা, হাদীস নং- ১১৪৪

^{২৫৬} ইমাম আলবানীর ফতোয়া সিরিজ

^{২৫৭} সুনানে ইবনে মাজাহ

^{২৫৮} সিলসিলায়ে যাঈফা, হাদীস নং- ২১৩২

চেয়েছেন যে, এখানে সিরারে শাবান বলতে শবে বরাতের রোযা উদ্দেশ্য।

অধিকাংশ আলেমদের মতে সিরার অর্থ মাসের শেষ। উক্ত ব্যক্তি শাবানের শেষ পর্যন্ত নির্ধারিত রোযা পালনে অভ্যস্ত ছিল অথবা এটা তার মানতের রোযা ছিল। রামাযানের সঙ্গে মিশে যাওয়ার ভয়ে সে রোযা রাখা ছেড়ে দিয়েছিল। কারণ শাবান মাসের শেষের দিকে রামাযানের রোযার সাথে মিশিয়ে রোযা রাখার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। তাই রাসূল (সাঃ) তাকে রোযা দু'টি কাযা আদায় করতে বলেছিলেন^{২৫৯}।

শবে বরাতের প্রচলন

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, শবে বরাতের এ আয়োজন শুধুমাত্র বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তানসহ অনারব দেশসমূহেই দেখা যায়। প্রিয় পাঠক মন্ডলী! শবে বরাত উপলক্ষে আমাদের দেশের রেডিও, টেলিভিশন, ওয়াজ মাহফিল ও বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে শবে বরাতের পক্ষে বিশেষ প্রচারণা চালনা হয় এমনকি ঐ দিন সরকারী ছুটি পর্যন্ত ঘোষণা করা হয়। লক্ষ লক্ষ টাকা এর পিছনে ব্যয় করা হয়ে থাকে। অথচ এর কোন শরঈ ভিত্তি নেই। মুসলিম জাতির উচিত এ বিদ'আত থেকে বিরত থাকা। পরিতাপের বিষয় এই যে, অনেকেই এ বিদ'আত কে বিদআতে হাসানাহ বলে থাকে। আসলে বিদআতে হাসানাহ বলতে কিছু নেই। ইসলামের নামে তৈরীকৃত সকল বিদ'আত-ই মন্দ, হাসানাহ বা ভাল বিদ'আত নামে কোন

^{২৫৯} শরহুন্ নববী আলা সহীহ মুসলিম, (৪/১৮১)

বিদ'আতের অস্তিত্ব নেই। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ-

كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي الْكَارِ

“প্রতিটি বিদ'আত ই ভ্রষ্টতা আর সমস্ত ভ্রষ্টতার পরিণাম হল জাহান্নাম”^{২৬০}

ইবনে উমার (রাঃ) বলেন, “সমস্ত বিদ'আত ই ভ্রষ্টতা যদিও মানুষ তাকে উত্তম বলে থাকে^{২৬১}। অথচ আরব দেশসমূহে এর তৎপরতা নেই বললেই চলে। বিশেষ করে ইসলামের প্রাণ কেন্দ্র সৌদী আরবে শবে বরাত পালনের কোন অস্তিত্বই দেখা যায়না।

মক্কা-মদীনার সম্মানিত ইমামগণের কেউ কোন দিন শবে বরাত উদ্‌যাপন করার প্রতি জনগণকে উৎসাহিত করেন না। কারণ তারা ভাল করেই জানেন যে ইহা দ্বীনের কোন অংশ নয় বরং তা একটি নব আবিষ্কৃত বিদ'আত। এজন্যই তাঁরা শবে বরাতসহ অন্যান্য সকল বিদ'আত থেকে মুসলিম জাতিকে সতর্ক করে থাকেন এবং তাদের সকল জুমআর খুৎবা ও অন্যান্য আলোচনা ও ভাষণে বিনা শর্তে কুরআন-সুন্নার অনুসরণের আহ্বান জানান।

সুতরাং, আলোচনার সারাংশে বলা যায় যে, আসুন আমরা ইবাদতের নামে এই নব আবিষ্কৃত বিদ'আত কে পরিহার করি এবং অপরকে তা থেকে সাবধান করে দ্বীনি দায়িত্ব পালন করি।

^{২৬০} নাসাঈ

^{২৬১} الابتناء وخطر الشرع كمال بيان في الإبداع ২১-২২ পৃষ্ঠা

অতএব, কুরআন, হাদীস ও গ্রহণযোগ্য প্রখ্যাত আলেমদের উদ্ধৃত থেকে আমরা জানতে পারলাম শাবানের মধ্য রাত্রিকে ঘটা করে উদযাপন করা চাই তা নামাযের মাধ্যমে হোক অথবা অন্য কোন ইবাদতের মাধ্যমে অধিকাংশ আলেমদের মতে জগন্যতম বিদ'আত। শরীয়তে যার কোন ভিত্তি নেই। বরং তা সাহাবাদের যুগের পরে প্রথম শুরু হয়েছিল। যারা সত্যের অনুসরণ করতে চায় তাদের জন্যদ্বীনের মধ্যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা করতে বলেছেন তাই যথেষ্ট।

এবার প্রশ্ন আসে যইফ (দুর্বল) হাদীসের ভিত্তিতে কোন আমল করা যায় কি-না। অধিকাংশ মুহাদ্দেসীনের মতে যইফ হাদীসের উপর কোন আমল করা শরীয়তে জায়েয নেই। অধিকাংশ ফুকাহা আইন্মায়েরে কেরাম যইফ (দুর্বল) হাদীস দ্বারা শর্ত সাপেক্ষে আমল করা যেতে পারে বলে মত দিয়েছেন।

শর্তগুলো নিম্নরূপঃ

- ১। খুব বেশী যইফ (দুর্বল) পর্যায়ের না হওয়া।
- ২। শুধুমাত্র ফাযায়েল অধ্যায়ের হওয়া। অর্থাৎ ফাজায়েল অধ্যায় ব্যতীত অন্য কোন অধ্যায়ের যইফ হাদীসের ভিত্তিতে কোন প্রকার আমল করা যাবে না।
- ৩। আমল করার সময় সহীহভাবে প্রমাণিত হওয়ার ধারণা না রাখা। অর্থাৎ, এ ধারণা রাখতে হবে যে হাদীসটি সহীহভাবে প্রমাণিত নয়।

৪। কুরআন ও সহীহ হাদীসের বক্তব্যের সাথে সাংঘর্ষিক না হওয়া।
অর্থাৎ, সংশ্লিষ্ট যইফ হাদীসটি কুরআন বা সহীহ হাদীসের সাথে
সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।

উক্ত মূলনীতিগুলোর আলোকে শবে বরাতের আমল করা যেতে
পারে বলে অনেক ওলামায়ে কেরাম মতামত দিয়েছেন।

**এখন প্রশ্ন আসে আমল করতে হলে কিভাবে করা
যাবে?**

প্রথমতঃ ব্যক্তিগতভাবে বিছু ইবাদত বন্দেগী করা যেতে পারে। সে
জন্যে মসজিদে সমবেত হয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে পালন করার জন্য
ওয়াজ নসীহত, যিকির ইত্যাদির আয়োজন করা যাবেনা^{৬২}। কারণ,
রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এবং সাহাবায়ে কিরামগণ এমনটি করেননি। তাই
সে ত্বরিকার বাইরে ইবাদতের আনুষ্ঠানিকতা আবিষ্কার করলে সেটা
হয়ে যাবে বিদ'আত।

দ্বিতীয়তঃ হায়াত, মউত, রিয়ক ইত্যাদির ফয়সালা এ রাতে হয়, এটা
বিশ্বাস করা যাবে না। কারণ, এসব ফয়সালা যে লাইলাতুল ক্বদরে
হয়, তা সুস্পষ্টভাবে কুরআন ও সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমানিত।

তৃতীয়তঃ আমাদের দেশে (বাংলাদেশে) আলোকসজ্জা ও
আতশবজির যে তামাশা করা হয়, তা প্রকাশ্যে বিদ'আত। সে ধারণা
থেকে কোন এলাকায় এ রাতের নাম হচ্ছে বাতির রাত। এ সব
ধারণা ইসলামী শরীয়তে হিন্দুদের দিওয়ালী অনুষ্ঠান থেকে এসেছে
বলে মন্তব্য করেছেন উপ-মহাদেশের প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন মাওলানা

^{৬২} ফাতাওয়া শামীয়া, ইমাম বিন আবেদ্বীন, পৃষ্ঠা ৬৪২

আশরাফ আলী থানবী (রহঃ)। হালুয়া-রুটি বিলি-বন্টনের কার্যক্রমও বিদ'আত^{১৬৩}। ইবাদতের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। এসব অনেক আমল শিয়াদের কাছ থেকে উপ-মহাদেশের মুসলমানরা গ্রহণ করেছেন বলে মুফতী রশীদ আহমদ লুদিয়ানী উল্লেখ করেছেন^{১৬৪}।

চতুর্থতঃ নফল ইবাদতের জন্য সারা রাত মসজিদে এসে জেগে থাকা রাসূল (সাঃ) - এর সুন্নত বিরোধী। তিনি নফল ইবাদত ঘরে করতে এবং ফরয ইবাদত জামা'আতের সাথে মসজিদে আদায় করতে তাগিদ করেছেন। আর সারা রাত জেগে থেকে ইবাদত করাটাও সুন্নত বিরোধী। প্রিয় নবীজী (সাঃ) সব রাতেরই কিছু অংশ ইবাদত করতেন, আর কিছু অংশ ঘুমাতে। উনার জীবনে এমন কোন রাতের খবর পাওয়া যায়না, যাতে তিনি একদম না ঘুমিয়ে সারা রাত জেগে ইবাদত করেছেন।

পঞ্চমতঃ শবে বরাতের দিনের বেলায় রোযা রাখার হাদীস একেবারেই দুর্বল। এর ভিত্তিতে আমল করা যায় না বলে পাকিস্তানের প্রখ্যাত আলেম ও ফকীহ মুফতী মাওলানা তাকী উসমানী সাহেবের সুস্পষ্ট ফাতাওয়া রয়েছে। শবে বরাত, কবর যিয়ারত, ইত্যাদি অনেক আমলেরই কোন সহীহ দলিল না থাকার কারণে উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলেম ও ফকীহ মুফতী রশীদ আহমদ লুদিয়ানী, হাকীকুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী

^{১৬৩} ফাতাওয়া শামীয়া, ইমাম বিন আবেদ্বীন, পৃষ্ঠা ৬৪২

^{১৬৪} সাত মাসায়েলঃ শবে বরাতে শিয়াদের ভ্রষ্টতা, পৃষ্ঠা ৩৯-৪২

(রহঃ) - এর সাথে বহু বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করেছেন। মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রাহঃ) শেষের দিকে কিছু কিছু বিষয় অবশ্য প্রত্যাহার করে নিয়েছেন।

ষষ্ঠতঃ শবে বরাতের রোযার পক্ষে যেহেতু কোন মজবুত দলিল নেই, তাই যারা নফল রোযা রাখতে চান, তারা আইয়ামে বীজের তিনটি রোযা - ১৩, ১৪, ১৫ - রাখতে পারেন। এর পক্ষে সহীহ হাদীসের দলিল রয়েছে। শুধু একটি না রেখে এ তিনটি বা তার চেয়েও বেশী রোযা রাখতে পারলে আরও ভাল। কারণ, শা'বান মাসে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সবচেয়ে বেশী পরিমাণ নফল রোযা রেখেছেন। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদীসের উপর আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন এবং সমস্ত নব্য আবিষ্কৃত বিদ'আতী কাজ থেকে হেফাযত রাখুন।

শাবানের মধ্যরজনীর ফযীলত সম্পর্কিত হাদীসসমূহের

পর্যালোচনাঃ ১ নং হাদীস - ইমাম তিরমিযী (রহঃ) বলেনঃ আমাদের কাছে আহমাদ ইবনে মুনী' হাদীস বর্ণনা করেছেন যে তিনি ইয়াযীদ ইবনে হারুন থেকে, তিনি হাজ্জাজ ইবনে আরতাহ থেকে, তিনি ইয়াহইয়া ইবনে আবী কাছির থেকে, তিনি উরওয়াহ থেকে, তিনি উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে তিনি বলেছেনঃ

حدثنا أحمد بن منيع أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا الحجاج بن أرطاة عن يحيى بن أبي كثير عن عروة عن عائشة رضى الله عنها قالت : فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فخرجت فإذا هو بالبقيع فقال أكنت تخافين أن يحيف الله

.عليك ورسوله؟ قلت يا رسول الله ظننت أنك أتيت بعض نساءك
فقال إن الله تبارك وتعالى ينزل ليلة النصف من شعبان إلى سماء الدنيا فيغفر
لأكثر من عدد شعر غنم كلب
قال أبو عيسى: حديث عائشة لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث الحجاج،
وسمعت محمدا يقول يضعف هذا الحديث، وقال: يحيى بن كثير لم يسمع من
عروة، قال محمد والحجاج لم يسمع من يحيى بن كثير، انتهى كلامه، فهذا السند
منقطع بوجهين.

আমি এক রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে
বিছানায় পেলাম না তাই আমি তাকে খুঁজতে বের হলাম, ‘বাকী’
নামক কবরস্থানে তাকে পেলাম। তিনি (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া
সাল্লাম) বললেনঃ তুমি কি আশংকা করেছো যে আল্লাহ ও তার
রাসূল তোমার সাথে অন্যায় আচরণ করবেন? আমি বললামঃ হে
আল্লাহর রাসূল! আমি মনে করেছি আপনি আপনার অন্য কোন স্ত্রীর
কাছে গিয়েছেন। তিনি বললেনঃ আল্লাহ রাক্বুল আলামীন মধ্য
শাবানের রাতে দুনিয়ার আকাশে অবতরণ করেন, অতঃপর কালব
গোত্রের পালিত বকরীর পশমের পরিমানের চেয়েও অধিক পরিমান
লোকদের ক্ষমা করেন। ইমাম তিরমিযী বলেনঃ আয়িশা (রাঃ) এর
এই হাদীস আমি হাজ্জাজের বর্ণিত সনদ (সূত্র) ছাড়া অন্য
কোনভাবে চিনি না। আমি মুহাম্মাদকে (ইমাম বুখারী) বলতে শুনেছি
যে, তিনি হাদীসটিকে দুর্বল বলতেন। ইমাম তিরমিযী (রহঃ) বলেনঃ
ইয়াহুইয়া ইবনে কাসীর উরওয়াহ থেকে হাদীস শুনেনি। এবং
মুহাম্মদ (ইমাম বুখারী) বলেছেনঃ হাজ্জাজ ইয়াহুইয়াহ ইবনে কাসীর

থেকে শুনেনি। এখানে শুনেনি অর্থ হচ্ছে বয়সের পার্থক্যের হিসেবে একজনের সাথে আরেকজনের দেখা হওয়ার সুযোগ হয় নি বলে বুঝানো হয়েছে। তাছাড়া ইমাম বুখারী (রহঃ) যে হাদীসটিকে সহীহ বলেন নি বরং বলেছেন রাবীদের মধ্যে সমস্যা রয়েছে সেখানে এ হাদীসটি গ্রহণের আর কোন সুযোগই থাকছে না^{১৬৫}।

অতএব, এ হাদীসটি সম্পর্কে ইমাম বুখারী ও ইমাম তিরমিযীর মন্তব্যে প্রমাণিত হয় যে, হাদীসটি দুটো দিক থেকে মুনকাতি অর্থাৎ উহার সূত্র থেকে বিচ্ছিন্ন। অপর দিকে এ হাদীসের একজন বর্ণনাকারী হাজ্জাজ ইবনে আরতাহ মুহাদ্দিসীনদের নিকট দুর্বল বলে পরিচিত। সম্মানিত পাঠক ও পাঠিকাবৃন্দ! যারা শবে বরাতে বেশী বেশী ফাযীলাত বয়ান করতে অভ্যস্ত তারা তিরমিযী বর্ণিত এ হাদীসটি খুব গুরুত্বের সাথে উপস্থাপন করেন অথচ যারা হাদীসটির অবস্থা সম্পর্কে ভাল জানেন তাদের এ মন্তব্যটুকু গ্রহণ করতে চাননা। এ হাদীসটি ‘আমলের ক্ষেত্রে পরিত্যাজ্য হওয়ার জন্য ইমাম তিরমিযীর এ মন্তব্যটুকু কি যথেষ্ট নয়? যদি তর্কের খাতিরে এ হাদীসটিকে বিশুদ্ধ বলে ধরে নেয়া হয় তাহলে কি প্রমাণিত হয়? আমরা যারা ঢাকটোল পিটিয়ে মাসজিদে একত্র হয়ে যেভাবে শবে বরাত উদযাপন করি তাদের ‘আমলের সাথে এ হাদীসটির মিল কোথায়? বরং এ হাদীসে দেখা গেল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিছানা ছেড়ে চলে গেলেন, আর পাশে শায়িত আয়িশা (রাঃ) কে ডাকলেন না। ডাকলেন না অন্য কাউকে। তাকে জাগালেন

^{১৬৫} বিদআত – মোসাদ্দেক আহমদ, পৃষ্ঠা নং – ১১২

না বা সালাত আদায় করতে বললেন না। অথচ আমরা দেখতে পাই যে, রামাযানের শেষ দশকে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে রাত জেগে ইবাদাত-বন্দেগী করতেন এবং পরিবারের সকলকে জাগিয়ে দিতেন। বেশী পরিমাণে ইবাদাত-বন্দেগী করতে বলতেন। যদি ১৫ শাবানের রাতে কোন ইবাদাত করার ফাযীলাত থাকত তাহলে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেন আয়িশাকে (রাঃ) বললেন না? কেন রামাযানের শেষ দশকের মত সকলকে জাগিয়ে দিলেন না, তিনি তো নেক কাজের প্রতি মানুষকে আহ্বান করার ক্ষেত্রে আমাদের সকলের চেয়ে অগ্রগামী ছিলেন। এ ব্যাপারে তিনি তো কোন অলসতা বা কুপণতা করেননি।

২ নং হাদীস - আলা ইবনে হারিস থেকে বর্ণিত, আয়িশা (রাঃ) বলেনঃ

عن العلاء بن الحارث أن عائشة رضي الله عنها قالت : قام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل يصلي، فأطال السجود، حتى ظننت أنه قد قبض، فلما رأيت ذلك قمت حتى حركت إبهامه فتحرك فرجعت فلما رفع رأسه من السجود وفرغ من صلاته قال: يا عائشة أو يا حميراء أظننت أن النبي قد خان بك؟ قلت لا والله يا رسول الله، لكنني ظننت أنك قبضت لطول سجودك، فقال أتدريين أي ليلة هذه؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: هذه ليلة النصف من شعبان

إن الله عز وجل يطلع على عباده في ليلة النصف من شعبان فيغفر للمستغفرين ويرحم المسترحمين ويؤخر أهل الحقد كما هو. (رواه البيهقي في شعب الإيمان، وهذا حديث مرسل لأن علاء ما سمع عن عائشة

অর্থঃ এক রাতে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করছিলেন। সিজদাহ এত দীর্ঘ করলেন যে, আমি ধারণা করলাম তিনি ইন্তেকাল করেছেন। আমি এ অবস্থা দেখে দাঁড়িয়ে তার বৃদ্ধাঙ্গুল ধরে নাড়া দিলাম, অঙ্গুলটি নড়ে উঠল। আমি চলে এলাম। সালাত শেষ করে তিনি বললেনঃ হে আয়িশা অথবা বললেন হে হুমায়রা! তুমি কি মনে করেছ আল্লাহর নবী তোমার সাথে বিশ্বাস ভংগ করেছেন? আমি বললামঃ আল্লাহর কসম হে রাসূল! আমি এমন ধারণা করিনি। বরং আমি ধারণা করেছি আপনি না জানি ইন্তেকাল করলেন! অতঃপর তিনি বললেনঃ তুমি কি জান এটা কোন রাত? আমি বললামঃ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ভাল জানেন। তিনি বললেনঃ এটা মধ্য শাবানের রাত। এ রাতে আল্লাহ তা‘আলা তার বান্দাদের প্রতি মনোনিবেশ করেন। ক্ষমা প্রার্থনাকারীদের ক্ষমা করেন এবং রাহমাত প্রার্থনাকারীদের রহম করেন। আর হিংসুকদেরকে তাদের অবস্থার উপর ছেড়ে দেন। (বাইহাকী তার শুয়াবুল ঈমান কিতাবে বর্ণনা করেছেন)। হাদীসটি মুরসাল। সহীহ বা বিশুদ্ধ নয়। কেননা বর্ণনাকারী ‘আলা’ আয়িশা (রাঃ) থেকে শুনেছেন। অধিকন্তু আরও বলা যায় যে, এ হাদীসটি কোন হাদীস গ্রন্থের হাদীস নয়। মিশকাতুল মাসাবীহ এর ভারতীয় ভাষ্যকার এর রচিত উদ্ধৃতি এটি বর্ণিত হলেও এখানে কোন রাবীর উল্লেখ নেই। অতএব, এসব হাদীসের আলোকে বলা যায় যে, নাবী করিম (সাঃ) এর কবরস্থানে সিজদারত থাকার বিষয়টি কতটুকু গ্রহণযোগ্য তা বিশ্লেষকগণই ভালো বিবেচনা করার সুযোগ রাখেন

কারণ রাসূল (সাঃ) বারংবার বলেছেন যে, তোমরা কবরসমূহকে মসজিদে রূপান্তর করো না। তাই কবরস্থানে তাঁর সিজদারত থাকার বিষয়টি নিঃসন্দেহে প্রশ্নবিদ্ধ হওয়ার দাবী রাখে। আর বর্ণিত হাদীসটি সনদের দিক থেকেও অত্যন্ত দুর্বল হিসেবে প্রমানিত হয়েছে যা উপরেও উল্লেখ করেছি। আল্লাহ আমাদের সঠিক পথে চলার তৌফিক দিন, আমীন।

৩ নং হাদীস - আলী ইবনে আবী তালেব (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

: عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها فإن الله ينزل
فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا فيقول: ألا من مستغفر فأغفر له ألا من
مسترزق فأرزق له ألا من مبتلى فأعافيه ألا كذا ألا كذا حتى يطلع الفجر
رواه ابن ماجه، والبيهقي في شعب الإيمان. وهذا حديث ضعيف لأن في سنده
ابن أبي سبرة وهو معروف بوضع الحديث عند المحدثين. المرجع: تحفة
الأحوذى بشرح جامع الترمذي وقال ناصر الدين الألباني في هذا الحديث: إنه
(واه جداً)

যখন মধ্য শাবানের রাত আসে তখন তোমরা রাত জেগে সালাত আদায় করবে আর দিবসে সিয়াম পালন করবে। কেননা আল্লাহ তা‘আলা সূর্যাস্তের পর দুনিয়ার আকাশে অবতরণ করে বলেনঃ আছে কি কোন ক্ষমা প্রার্থনাকারী আমি তাকে ক্ষমা করব। আছে কি কোন রিযিক প্রার্থনাকারী আমি রিযিক দান করব। আছে কি কোন

বিপদে নিপতিত ব্যক্তি আমি তাকে সুস্থ্যতা দান করব। এভাবে ফজর পর্যন্ত বলা হয়ে থাকে^{২৬৬}।

প্রথমতঃ এ হাদীসটি দুর্বল। কেননা এ হাদীসের সনদে (সূত্রে) ইবনে আবি সাবুরাহ নামে এক ব্যক্তি আছেন, যিনি অধিকাংশ হাদীস বিশারদের নিকট হাদীস জালকারী হিসাবে পরিচিত। এ যুগের বিখ্যাত মুহাদ্দিস নাসিরুদ্দীন আল-বানী (রহঃ) বলেছেন, হাদীসটি সনদের দিক দিয়ে একেবারেই দুর্বল।

দ্বিতীয়তঃ অপর একটি সহীহ হাদীসের বিরোধী হওয়ার কারণে এ হাদীসটি গ্রহণযোগ্য নয়। সে সহীহ হাদীসটি হাদীসে নুযুল নামে পরিচিত, যা ইমাম বুখারী ও মুসলিম তাদের কিতাবে বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি হলঃ

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى في كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له ومن يسألني فأعطيه ومن يستغفرني فأغفر له. (أخرجه البخاري ومسلم)

অর্থঃ আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ আমাদের রব আল্লাহ তা‘আলা প্রতি রাতের এক তৃতীয়াংশ বাকী থাকতে দুনিয়ার আকাশে অবতরণ করেন ও বলতে থাকেনঃ কে আছ আমার কাছে দু‘আ করবে আমি কবুল করব। কে আছ আমার কাছে চাইবে আমি দান করব। কে আছ আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে আমি তাকে ক্ষমা

^{২৬৬} ইবনে মাজাহ ও বাইহাকী

করব^{২৬৭}। আর উল্লিখিত ৩ নং হাদীসের বক্তব্য হল আল্লাহ তা‘আলা মধ্য শাবানের রাতে নিকটতম আকাশে আসেন ও বান্দাদের দু‘আ কবুলের ঘোষণা দিতে থাকেন। কিন্তু বুখারী ও মুসলিম বর্ণিত এই সহীহ হাদীসের বক্তব্য হল আল্লাহ তা‘আলা প্রতি রাতের শেষের দিকে নিকটতম আকাশে অবতরণ করে দু‘আ কবুলের ঘোষণা দিতে থাকেন। আর এ হাদীসটি সর্বমোট ৩০ জন সাহাবী বর্ণনা করেছেন এবং বুখারী এবং মুসলিম ও সুনানের প্রায় সকল কিতাবে এসেছে। তাই হাদীসটি প্রসিদ্ধ। অতএব এই মশহুর হাদীসের বিরোধী হওয়ার কারণে ৩ নং হাদীসটি পরিত্যাজ্য হবে। কেহ বলতে পারেন যে, এই দু হাদীসের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। কারণ ৩ নং হাদীসের বক্তব্য হল আল্লাহ তা‘আলা দুনিয়ার আকাশে অবতরণ করেন মধ্য শাবানের রাতের শুরু থেকে। আর এ হাদীসের বক্তব্য হল প্রতি রাতের শেষ তৃতীয়াংশে আল্লাহ তা‘আলা দুনিয়ার আকাশে অবতরণ করেন। অতএব দু হাদীসের মধ্যে কোন বিরোধ নেই যে কারণে ৩ নং হাদীসকে পরিত্যাগ করতে হবে। আমি বলব আসলেই এ দু হাদীসের মধ্যে বিরোধ আছে। কেননা আবু হুরাইরা (রাঃ) বর্ণিত বুখারী ও মুসলিমের হাদীসের বক্তব্য হল আল্লাহ তা‘আলা প্রতি রাতের শেষ অংশে দুনিয়ার আকাশে আসেন। আর প্রতি রাতের মধ্যে শাবান মাসের পনের তারিখের রাতও অন্তর্ভুক্ত। অতএব এ হাদীস মতে অন্যান্য রাতের মত শাবান মাসের পনের তারিখের রাতের শেষ তৃতীয়াংশে আল্লাহ তা‘আলা দুনিয়ার আকাশে

^{২৬৭} বুখারী ও মুসলিম

আসেন। কিন্তু ৩ নং হাদীসের বক্তব্য হল শাবান মাসের পনের তারিখের রাতের প্রথম প্রহর থেকে আল্লাহ তা‘আলা দুনিয়ার আকাশে অবতরণ করেন।

৪ নং হাদীস - উসমান ইবনে আবিল আস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان ليلة النصف من شعبان نادى مناد: هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، فلا يسأل أحد إلا أعطي إلا زانية بفرجها أو مشرك. (أخرجه

(৬৫২) البيهقي في شعب الإيمان وضعفه الألباني في ضعيف الجامع رقم

অর্থঃ যখন মধ্য শাবানের রাত আসে তখন একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা দেয়ঃ আছে কি কোন ক্ষমা প্রার্থনাকারী আমি তাকে ক্ষমা করব। আছে কি কেহ কিছু চাইবার আমি তাকে তা দিয়ে দিব। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ মুশরিক ও ব্যভিচারী বাদে সকল প্রার্থনাকারীর প্রার্থনা কবুল করা হয়। (বাইহাকী, শুয়াবুল ঈমান)। বিখ্যাত মুহাদ্দিস নাসিরুদ্দীন আল-বানী (রহঃ) হাদীসটিকে তার সংকলন ‘যয়ীফ আল-জামে’ নামক কিতাবের ৬৫২ নং ক্রমিকে দুর্বল প্রমাণ করেছেন। শবে বরাত সম্পর্কে এ ছাড়া বর্ণিত অন্যান্য সকল হাদীস সম্পর্কে ইবনে রজব হাম্বলী (রহঃ) বলেনঃ এ মর্মে বর্ণিত অন্য সকল হাদীসই দুর্বল।

শাবানের মধ্যরজনীর সম্পর্কিত হাদীসসমূহ পর্যালোচনার সারকথা- শবে বরাত সম্পর্কিত হাদীসগুলো উল্লেখ করা হল। আমি মনে করি এ সম্পর্কে যত হাদীস আছে তা এখানে এসেছে। বাকী যা আছে

সেগুলোর অর্থ বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত। এ সকল হাদীসের দিকে লক্ষ্য করে আমরা কয়েকটি বিষয় স্পষ্টভাবেই বুঝে নিতে পারি।

(১) এ সকল হাদীসের কোন একটি দ্বারাও প্রমাণিত হয়নি যে, ১৫ শাবানের রাতে আল্লাহ তা'আলা আগামী এক বছরে যারা ইন্তেকাল করবে, যারা জন্ম গ্রহণ করবে, কে কি খাবে সেই ব্যাপারে ফায়সালা করেন। যদি থাকেও তাহলে তা আল-কুরআনের বক্তব্যের বিরোধী হওয়ায় তা গ্রহণ করা যাবে না। কারণ আল-কুরআনের স্পষ্ট কথা হল এ বিষয়গুলির ফায়সালা হয় লাইলাতুল কদরে।

(২) এ সকল হাদীসের কোথাও বলা হয়নি যে, এ রাতে মৃত ব্যক্তিদের আত্মা তাদের গৃহে আসে। বরং এটি একটি প্রচলিত বানোয়াট কথা। মৃত ব্যক্তির আত্মা কোন কোন সময় গৃহে ফিরে আসার ধারণাটা হিন্দুদের ধর্ম-বিশ্বাস।

(৩) এ সকল হাদীসের কোথাও এ কথা নেই যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবায়ে কিরাম এ রাতে গোসল করেছেন, মাসজিদে উপস্থিত হয়ে নফল সালাত আদায় করেছেন, যিকির-আযকার করেছেন, কুরআন তিলাওয়াত করেছেন, সারা রাত জাগ্রত থেকেছেন, ওয়াজ নাসীহাত করেছেন কিংবা অন্যদের এ রাতে ইবাদাত বন্দেগীতে উৎসাহিত করেছেন অথবা শেষ রাতে জামাতের সাথে দু'আ-মুনাজাত করেছেন।

(৪) এ হাদীসসমূহের কোথাও এ কথা নেই যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বা সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) এ রাতের সাহরী খেয়ে পরের দিন সিয়াম (রোযা) পালন করেছেন।

(৫) আলোচিত হাদীসসমূহে কোথাও এ কথা নেই যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বা সাহাবায়ে কিরাম এ রাতে হালুয়া-রুটি বা ভাল খানা তৈরী করে বিলিয়েছেন, বাড়ীতে বাড়ীতে যেয়ে মীলাদ পড়েছেন।

(৬) এ সকল হাদীসের কোথাও নেই যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বা সাহাবায়ে’ কিরাম (রাঃ) এ রাতে দলে দলে কবরস্থানে গিয়ে কবর যিয়ারত করেছেন কিংবা কবরে মোমবাতি জ্বালিয়েছেন। এমনকি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগ বাদ দিলে খুলাফায়ে রাশেদীনের ত্রিশ বছরের ইতিহাসেও কি এর কোন একটা ‘আমল পাওয়া যাবে? যদি না যায় তাহলে শবে বরাত সম্পর্কিত এ সকল ‘আমল ও আকীদা কি বিদ’আত নয়? এ বিদ’আত সম্পর্কে উম্মাতে মুহাম্মাদীকে সতর্ক করার দায়িত্ব কারা পালন করবেন? এ দায়িত্ব পালন করতে হবে আলেম-উলামাদের, দ্বীন প্রচারক, মাসজিদের ইমাম ও খতীবদের। যে সকল বিষয়ে কুরআন ও সহীহ হাদীসের ইশারা নেই সে সকল ‘আমল থেকে সাধারণ মুসলিম সমাজকে বিরত রাখার দায়িত্ব পালন করতে হবে নবী-রাসূলগণের উত্তরসূরীদের তথা উত্তম আলেমদের।

ভাগ্য লিপিবদ্ধ করা সম্পর্কিত একটি হাদীস ও পর্যালোচনা

“শবে বরাতে সৌভাগ্য বা এক বছরের তাকদীর লেখা সম্পর্কিত কোন হাদীস নেই” বলে আপনি যে দাবী করা হচ্ছে তা সঠিক নয়। ‘মিশকাত আল-মাসাবীহ’ কিতাবে এ সম্পর্কে হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে।

পাঠকগণের অবগতির জন্য উক্ত হাদীসটির পর্যালোচনা নিচে তুলে ধরলাম। হাদীসটি হলঃ

আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত নবী কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل تدرين ما هذه الليلة؟ يعني ليلة النصف من شعبان

قالت ما فيها يا رسول الله؟ فقال: فيها أن يكتب كل مولود (من) بني آدم في هذه السنة وفيها أن يكتب كل هالك من بني آدم في هذه السنة وفيها ترفع أعمالهم وفيها تنزل أرزاقهم

من مشكاة المصابيح في باب قيام شهر رمضان، رواه البيهقي في الدعوات الكبير

অর্থঃ তুমি কি জানো এটা (অর্থাৎ মধ্য শাবানের রাত) কোন্ রাত? তিনি জিজ্ঞেস করলেনঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ! এ রাতে কি রয়েছে? তিনি বললেনঃ এ রাতে এই বছরে যে সকল মানব-সন্তান জন্ম গ্রহণ করবে তাদের ব্যাপারে লিপিবদ্ধ করা হয়, যারা মৃত্যু বরণ করবে তাদের তালিকা তৈরী হয়, এ রাতে ‘আমলসমূহ পেশ করা হয়, এ রাতে রিযিক নাযিল করা হয়। আলোচ্য হাদীসটি আল-মিশকাতুল মাসাবীহ কিতাবে ‘রামাযান মাসে কিয়াম’ (রামাযান মাসের রাতের সালাত) অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি লিখেছেন যে, ইমাম বাইহাকী (রঃ) তার ‘আদ-দাওআত আল-কাবীর’ গ্রন্থে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। হাদীসটির পর্যালোচনা নিম্নে তুলে ধরলামঃ

(এক) উল্লিখিত হাদীসে ‘অর্থাৎ মধ্য শাবানের রাত’ বাক্যটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা নয়। এ বাক্যটি পরবর্তী কালের বর্ণনাকারীর নিজস্ব বক্তব্য বলে। আর আয়িশা (রাঃ) এমন কোন অজ্ঞ মহিলা ছিলেন না যে তাকে তারিখ বলে দিতে হবে।

(দুই) এ হাদীসে বর্ণিত ‘অর্থাৎ মধ্য শাবানের রাত’ কথাটি আয়িশার (রাঃ) বক্তব্য নয়। কারণ তার বক্তব্য শুরু হয়েছে ‘তিনি জিজ্ঞেস করলেন’ বাক্যটির পর। তাহলে এ বক্তব্যটি কার? এ বক্তব্যটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও আয়িশা (রাঃ) ব্যতীত অন্য কোন বর্ণনাকারীর নিজস্ব মন্তব্য, যা মেনে নেয়া আমাদের জন্য জরুরী নয়।

(তিন) এ হাদীসের বিষয়বস্তুর দিকে তাকালে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, হাদীসে ভাগ্য লেখার বিষয়টি লাইলাতুল কদরের সাথে সম্পর্কিত। কেননা জন্ম, মৃত্যু, ‘আমল পেশ, রিয়ক ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলী রামাযান মাসে লাইলাতুল কদরে স্থির করা হয়। এ কথা যেমন কুরআনের একাধিক আয়াত দ্বারা প্রমাণিত তেমনি বহু সংখ্যক সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

(চার) আল-মিশকাত আল-মাসাবীহর সংকলক বিষয়টি ভালভাবে বুঝেছেন বলে তিনি হাদীসটিকে রামাযান মাসের সালাত (কিয়ামে শাহরি রামাযান) অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন। বুঝা গেল যে, তার মত হল হাদীসটি রামাযান মাসের লাইলাতুল কদর সম্পর্কিত। যদি তিনি

বুঝতেন যে, হাদীসটি মধ্য শাবানের তাহলে তিনি তা রামাযান মাসের অধ্যায়ে আলোচনা করবেন কেন?

(পাঁচ) এ হাদীসটি আল-মিশকাত আল-মাসাবীহর সংকলক উল্লেখ করার পর বলেছেন, তিনি হাদীসটি ইমাম বাইহাকীর ‘আদ-দাওআত আল-কাবীর’ কিতাব থেকে নিয়েছেন। ইমাম বাইহাকী তার ‘আদ-দাওআত আল-কাবীর’ গ্রন্থে শবে বরাত সম্পর্কে মাত্র দুটি হাদীস উল্লেখ করেছেন। তার একটি হল এই হাদীস। তিনি তার ‘শুআ’বুল ঈমান’ গ্রন্থে শবে বরাত সম্পর্কিত এই বইয়ে আলোচিত ৫ নং হাদীসটি উল্লেখ করার পর লিখেছেনঃ

وقد روي في هذا الباب أحاديث مناكير، رواها قوم مجهولون ذكرنا في كتاب الدعوات منها حديثين

অর্থঃ এ বিষয়ে বহু মুনকার হাদীস বর্ণিত হয়েছে। যার বর্ণনাকারীরা অপরিচিত। আমি তা থেকে দু’টি হাদীস ‘আদ-দাওআত আল-কাবীর’ গ্রন্থে উল্লেখ করেছি।

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! তাহলে ফলাফল দাড়াল কি? ইমাম বাইহাকীর এ মন্তব্যে যা প্রমাণিত হলঃ

(১) শবে বরাত সম্পর্কে অনেক মুনকার (অগ্রহণযোগ্য) হাদীস রয়েছে।

(২) আদ-দাওআত আল-কাবীর গ্রন্থে শবে বরাত সম্পর্কে বর্ণিত হাদীস দুটি মুনকার।

(৩) তাই আলোচ্য হাদীসটি হাদীসে মুনকার।

(৪) তিনি ‘আদ-দাওআত আল-কাবীর’ গ্রন্থটি আগে সংকলন করেছেন, তারপরে শুআবুল ঈমান সংকলন করেছেন। এ কারণে তিনি পরবর্তী কিতাবে আগের কিতাবের ভুল সম্পর্কে পাঠকদের সতর্ক করেছেন। এটা তার আমানতদারী ও বিশ্বস্ততার একটি বড় প্রমাণ।

(৫) মুনকার হাদীস ‘আমলের জন্য গ্রহণ করা যায় না।

(৬) যিনি হাদীসটি আমাদের কাছে পৌঁছিয়েছেন তিনি নিজেই যখন হাদীসটি গ্রহণযোগ্য নয় বলে মতামত দিয়েছেন তখন আমরা তা সঠিক বলে গ্রহণ করব কেন?

সৌভাগ্য রজনী ধর্ম বিকৃতির শামিল

ইসলাম ধর্মে সৌভাগ্য রজনী বলতে কিছু নেই। নিজেদের সৌভাগ্য রচনার জন্য কোন অনুষ্ঠান বা ইবাদাত-বন্দেগী ইসলামে অনুমোদিত নয়। শবে বরাতকে সৌভাগ্য রজনী বলে বিশ্বাস করা একটি বিদ্বাতত তথা ধর্মে বিকৃতি ঘটানোর শামিল। এ ধরনের বিশ্বাস খুব সম্ভব হিন্দু ধর্ম থেকে এসেছে। তারা সৌভাগ্য লাভের জন্য গনেশ পূজা করে থাকে। সৌভাগ্য অর্জন করতে হলে জীবনের সর্বক্ষেত্রে কুরআন ও সুন্নাহ অনুসরণ করতে হবে। কুরআন-সুন্নাহ বাদ দিয়ে এবং সারা জীবন সালাত-সিয়াম-যাকাত ত্যাগ করে শুধুমাত্র একটি রাতে মাসজিদে উপস্থিত হয়ে রাত জেগে ভাগ্য বদল করে সৌভাগ্য হাসিল করে নিবেন এমন ধারণা ইসলামে একটি হাস্যকর ব্যাপার। ধর্মে বিকৃতির কৃতিত্বে শিয়া মতাবলম্বীদের জুড়ি নেই। এ শবে বরাত প্রচলনের কৃতিত্বও তাদের। ফারসী ভাষার “শবে বরাত”

নামটা থেকে এ বিষয়টা বুঝতে কারো কষ্ট হওয়ার কথা নয়। তারা এ দিনটাকে ইমাম মাহদীর জন্ম দিন হিসাবে পালন করে থাকে। তারা বিশ্বাস করে যে, এ রাতে ইমাম মাহদীর জন্ম হয়েছে। এ রাতে তারা এক বিশেষ ধরনের সালাত আদায় করে। যার নাম দিয়েছে “সালাতে জাফর”।

শবে বরাত সম্পর্কে মুসলিম উম্মাহর অবস্থান

শবে বরাত উদযাপন করা ও না করার ক্ষেত্রে বিশ্বের মুসলিমদেরকে চার ভাগে ভাগ করা যায়।

প্রথমতঃ যারা কোনভাবেই শবে বরাত উদযাপন করেন না ও উদযাপন করাকে ইসলাম সম্মত মনে করেন না।

দ্বিতীয়তঃ যারা সম্মিলিতভাবে শবে বরাত উদযাপন করেন না ঠিকই, কিন্তু এ রাতে ব্যক্তিগতভাবে চুপে চুপে আমল করা ফাযীলাতপূর্ণ মনে করেন, দিবসে সিয়াম পালন করেন ও রাত্রি জাগরণ করেন।

তৃতীয়তঃ যারা ১৫ শাবানের রাতে মাসজিদে জমায়েত হয়ে ইবাদাত-বন্দেগী করেন, কবর যিয়ারত করেন, মাসজিদে ওয়াজ-নাসীহাতে শরীক হন, পরের দিন সিয়াম পালন করেন, এই সরাতে হায়াত-মউত, রিযক-দৌলত সম্পর্কে আল্লাহ সিদ্ধান্ত নেন বলে বিশ্বাস করেন। সারা রাত জেগে ইবাদাত-বন্দেগী করেন। তবে আতশ-বাযি, মোমবাতি জ্বালানো ও আলোকসজ্জা ইত্যাদিকে নাজায়েয বলে জানেন।

চতুর্থতঃ যারা ১৫ শাবানের রাতে আতশবাজি, আলোক সজ্জা ও আমোদ ফুটি করেন ও সময় সুযোগ মত ইবাদাত-বন্দেগীও করেন। এ চার প্রকার লোকদের মধ্যে প্রথম প্রকারের মানুষের সংখ্যাই বেশী। আমি কিন্তু এ কথা বলতে চাচ্ছিনা যে, অধিকাংশ মুসলিম শবে বরাত পালন করেন না বলে তা করা ঠিক নয়। বরং আমি বলতে চাচ্ছি যে, শবে বরাত সম্পর্কে মুসলিম উম্মাহর এ বিভক্তি শবে বরাত উদযাপন বিদ'আত হওয়ার একটা স্পষ্ট আলামত। এ ক্ষেত্রে আমি বিশ্ববরেণ্য আলেমে দ্বীন আবুল হাসান আলী নদভী (রহঃ) এর কিতাব 'শরীক ও বিদয়াত' থেকে একটি উদ্ধৃতি দেয়া যথার্থ মনে করছি। তিনি লিখেছেনঃ “আল্লাহর দ্বীন ও শরীয়তের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো বিশ্বব্যাপী সম-আদর্শতা। এই সমাদর্শ ও স্বাদৃশ্যতা যেমন কাল ও সময়ের ক্ষেত্রে লক্ষণীয় তেমনি স্থানের ক্ষেত্রেও। আল্লাহ হছেন রাব্বুল মাশরিকাইন ওয়া রাব্বুল মাগরিবাইন; পূর্ব-পশ্চিম সকল কিছুর রব ও মালিক। তিনি স্থান ও কালের সীমা ও বাঁধার উর্দে। তাই তাঁর শরীয়াত ও তাঁর দ্বীনে এক অত্যোচর্ষ সমতা ও সমাদর্শ বিদ্যমান। তাঁর আখিরী শরীয়াত ও আখিরী নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনাদর্শে এসে যা হয়েছে তাকমীল -পূর্ণতা প্রদীপ্ত সূর্যের মতই সকলের জন্য সমান এবং আকাশ ও মাটির মত সকলের জন্য সম উপযোগীতাপূর্ণ। প্রথম যুগে এর যে রূপ ও আকৃতি ছিল হিজরী পনের শতকেও উহার রূপ ও আকৃতি সেই একই। প্রাচ্যবাসীদের জন্য এটি যেমন ও যতটুকু, ঠিক তেমন ও ততটুকুই প্রতীচ্যের

জন্য। যে সমস্ত নীতি ও নির্দেশ, ইবাদাতের যে রূপ ও আকৃতি, আল্লাহর নৈকট্য লাভের যে সমস্ত সুনির্ধারিত পন্থা ও উপায় আরবদের জন্য ছিল ঠিক তদ্রূপ আছে তা ভারতবাসীর জন্যও। তাই দুনিয়ার যে কোন অংশের একজন মুসলিম অধিবাসী অপর কোন অংশে যদি চলে যায় তাহলে ইসলামী ফরয আদায় এবং ইবাদাত-বন্দেগী করার ক্ষেত্রে তার কোন অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় না। তার জন্য কোন স্থানীয় গাইডের প্রয়োজন পড়ে না। তিনি যদি আলিম হন, শরীয়ত সম্পর্কে বিজ্ঞ হন তাহলে কেবল মুক্তাদীই নয় অধিকন্তু যে কোন স্থানে তিনি ইমামও হতে পারেন। বিদ'আতের অবস্থা এর বিপরীত। এতে সমদৃশ্যতা ও একত্বতা নেই। স্থান ও কালের প্রভাব এতে পরিস্ফুট থাকে। গোটা মুসলিম বিশ্বে এর একটিমাত্র রূপে প্রচলনও হয়ে ওঠে না।”

সকল ধরনের বিদ'আতের ক্ষেত্রে উপরোক্ত কথা প্রযোজ্য। শবে বরাত এমনি একটা বিষয় যা আমরা ভারতীয় উপমহাদেশের লোকেরা মহা ধুমধামে উদযাপন করছি, কিন্তু অন্য এলাকার মুসলিমদের কাছে এ সম্পর্কে কোন খবর নেই। কি আশ্চর্য! এমন এক মহা-নিয়ামাত যা মক্কা-মদীনার লোকেরা পেলনা, অন্যান্য আরবরা পেলনা, আফ্রিকানরা পেলনা, ইন্দোনেশীয়, মালয়েশীয়রা পেলনা, ইউরোপ - আমেরিকা - অস্ট্রেলিয়া মহাদেশের লোকেরা পেলনা; অথচ ভাগ্যক্রমে সৌভাগ্যের মহান রাত পেয়ে গেলাম আমরা উপ-মহাদেশের কিছু লোকেরা ও শিয়া মতাবলম্বীরা! এ বিষয়টি যদি

বিভ্রান্তিকর না হত তাহলে সকল মুসলিমের পাওয়ার কথা ছিল।
হাদীসে এসেছেঃ

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
إن الله تعالى لا يجمع أمتي على ضلالة. (رواه الترمذي وصححه الألباني في
صحيح الجامع رقم ১৮৪৮)

অর্থঃ সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসূলে
কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ আল্লাহ তাআলা
আমার উম্মতকে কোন গোমরাহী বা বিভ্রান্তিতে একমত হতে দিবেন
না (তিরমিযী)। অন্য বর্ণনায় এসেছেঃ সাহাবী আনাস (রাঃ) বলেন,
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى
১৭৪৬) ১৭৪৬) قد أجاز أمتي أن تجمع على ضلالة. (صحيح الجامع

অর্থঃ আল্লাহ তা‘আলা আমার উম্মতকে কোন ভ্রান্ত বিষয়ে একমত
হওয়া থেকে মুক্তি দিয়েছেন। (সহীহ জামেয়)। এ হাদীসের অর্থ হল
আমার উম্মত যদি কোন বিষয়ে একমত হয় তাহলে সে বিষয়টি
বিভ্রান্তিকর হতে পারে না। আর আমার উম্মতের কোন বিষয়ে
একমত না হওয়ার বিষয়টি বিভ্রান্ত হওয়ার একটা আলামত হতে
পারে। শবে বরাত এমনি একটি ‘আমল যে উম্মতে মুসলিমাহ এ
বিষয়ে কখনো একমত হয়নি, হওয়া সম্ভবও নয়। আবার যারা
উদযাপন করেন তাদের মধ্যেও দেখা যায় ‘আমল ও বিশ্বাসের
বিভিন্নতা। শবে বরাত সম্পর্কে মানুষকে সতর্ক করার দায়িত্ব
উলামায়ে কিরামের ইসলাম ধর্মে যতগুলো বিদ‘আত চালু হয়েছে তা

কিন্তু সাধারণ মানুষ বা কাফির মুশরিকদের মাধ্যমে প্রসার ঘটেনি। উহার প্রসারের জন্য দায়ী যেমন এক শ্রেণীর উলামা, তেমনি উলামায়ে কিরামই যুগে যুগে বিদ'আতের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন, নির্যাতন সহ্য করেছেন, দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন, জেল-যুল্ম বরদাশত করেছেন।

তাই বিদ'আত যে নামেই প্রতিষ্ঠা লাভ করুক না কেন তার বিরুদ্ধে লড়াই-সংগ্রাম করতে হবে আলেমদেরকেই। তারা যদি এটা না করে কারো অন্ধ অনুসরণ বা অনুকরণ করেন, বিভ্রান্তি ছড়ান বা কোন বিদ'আতী কাজ-কর্ম প্রসারে ভূমিকা রাখেন, তাহলে এ জন্য তাদেরকে আল্লাহর সম্মুখে জবাবদিহি করতে হবে। যে দিন বলা হবেঃ

وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ.

অর্থঃ আর সে দিন আল্লাহ তাদেরকে ডেকে জিজ্ঞেস করবেন, তোমরা রাসূলদের আহ্বানে কিভাবে সাড়া দিয়েছিলে^{৬৮}? সেদিন তো এ প্রশ্ন করা হবে না যে, তোমরা অমুক পীরের মত অনুযায়ী বা অমুক ইমামের মত অনুযায়ী 'আমল করেছিলে কিনা। যারা সহীহ সুন্নাহ মত 'আমল করবে তারাই সেদিন সফলকাম হবে।

শবে বরাত সম্পর্কে একটি বিভ্রান্তির নিরসন

১৫ শাবানে দিনের সিয়াম ও রাতের ইবাদাত-বন্দেগী, কুরআন তেলাওয়াত, নফল সালাত, কান্নাকাটি, দু'আ-মুনাজাত, কবর যিয়ারাত, দান-সাদকাহ, ওয়াজ-নাসীহাত প্রভৃতি নেক 'আমল

^{৬৮} সূরা কাসাস, ৬৫

গুরুত্বসহকারে পালন করাকে যখন কুরআন ও হাদীস সম্মত নয় বলে আলোচনা করা হয় তখন সাধারণ ধর্ম-প্রাণ ভাই-বোনদের পক্ষ থেকে একটি প্রশ্ন আসে যে, জনাব! আপনি শবে বরাতে উল্লিখিত ইবাদাত-বন্দেগীকে বিদ'আত বা কুরআন ও সুন্নাহ সম্মত নয় বলেছেন, কিন্তু রোযা রাখা সওয়াবের কাজ ও রুটি তৈরী করে গরীব দুঃখীকে দান করা ভাল কাজ নয় কি? আমরা কান্নাকাটি করে আল্লাহর কাছে কিছু চাইলে দোষের কি? সুপ্রিয় পাঠকবৃন্দ! নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য দু'আ-মুনাজাত, সালাত, সিয়াম, দান-ছাদাকাহ, কুরআন তিলাওয়াত, রাত্রি জাগরণ হল নেক আমল। এতে কারও দ্বি-মত নেই। আমরা কখনো এগুলিকে বিদ'আত বলি না। যা বিদ'আত বলি এবং যে সম্পর্কে উম্মাহকে সতর্ক করতে চাই তা হল এ রাতকে শবে বরাত বা সৌভাগ্য রজনী অথবা মুক্তি রজনী মনে করে বিভিন্ন প্রকার আমল ও ইবাদাত বন্দেগীর মাধ্যমে দিবসটি উদযাপন করা। এটা কুরআন ও সুন্নাহ পরিপন্থী। এটাই ধর্মে বাড়াবাড়ি। যা ধর্মে নেই তা উদযাপন করা ও প্রচলন করার নাম বিদ'আত। সুতরাং, আলোচনার সারাংশে বলা যায় যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর নবুওয়াতের তেইশ বছরের জীবনে কখনো তার সাহাবীগণকে সাথে নিয়ে মক্কায় মাসজিদুল হারামে অথবা মদীনায় মাসজিদে নবুবীতে কিংবা অন্য কোন মাসজিদে একত্র হয়ে উল্লিখিত ইবাদাত-বন্দেগীসমূহ করেছেন এমন কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না। তাঁর ইন্তেকালের পরে তাঁর সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) তথা খুলাফায়ে

রাশেদীনের যুগে কেহ জানতো না শবে বরাত কি এবং এতে কি করতে হয়। তারা নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের ‘আমল প্রত্যক্ষ করেছেন। আমাদের চেয়ে উত্তম রূপে কুরআন অধ্যয়ন করেছেন। তারা তাতে শবে বরাত সম্পর্কে কোন দিক-নির্দেশনা পেলেন না। তারা তাদের জীবন কাটালেন আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে, অথচ জীবনের একটি বারও তাঁর কাছ থেকে শবে বরাত বা মুক্তির রজনীর ছবক পেলেন না? যা পালন করতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলে যাননি, যা কুরআনে নেই, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের তা’লীমে নেই, সাহাবীগণের ‘আমলে নেই, তাদের সোনালী যুগের বহু বছর পরে প্রচলন করা শবে বরাতকে আমরা বিদ’আত বলতে চাই। আমরা বলতে চাই, এটা একটা মনগড়া পর্ব। আমরা মানুষকে বুঝাতে চাই, এই সব প্রচলিত ও বানোয়াট মুক্তির রজনী উদযাপন থেকে দূরে থাকতে হবে। অতএব, আমরা উম্মতকে কুরআন ও সুন্নাহমুখী করতে এবং সেই অনুযায়ী ‘আমল করাতে অভ্যস্ত করতে চাই। আল্লাহ আমাদের সঠিক পথে চলার তৌফিক দান করুন, আমীন।

সন্দেহজনক নফল ‘আমল থেকে দূরে থাকা উত্তম

যদি তর্কের খাতিরে ধরে নেই যে, শবে বরাত শর’য়ীভাবে প্রমাণিত, তাহলে উহার মর্যাদা কতটুকু হবে? বেশী হলে মুস্তাহাব। কেহ যদি সারা জীবন মুস্তাহাব শবে বরাতটা বর্জন করে তাহলে তার কি ক্ষতি হবে? কিন্তু যদি এটা বিদ’আত হয়, আর যারা এর দিকে মানুষকে

আহ্বান করল, উৎসাহিত করল, মানুষকে বিভ্রান্ত হতে প্ররোচিত করল, আকীদা-বিশ্বাসে বিকৃতি ঘটালো, এর প্রচার ও প্রসারে ভূমিকা রাখল তাহলে তাদের পরিণাম কি হবে? একটু ভেবে দেখবেন^{২৬৭}। ফিকাহর মূলনীতিতে একটি কথা আছে, “নতীজা আরজালের তাবে হয়” অন্যভাবে বলা যায়ঃ

دفع المضر أقدم من جلب المنافع

অর্থাৎ একটা বিষয় লাভ ও ক্ষতি উভয়ের সম্ভাবনা থাকলে ক্ষতির বিষয়টি প্রাধান্য পাবে এবং বিবেচনায় আনা হবে।

হাদীসে এসেছেঃ আবু আব্দুল্লাহ নুমান ইবনে বাশীর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে শুনেছিঃ

عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، (ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه). (رواه البخاري ومسلم)

অর্থঃ নিশ্চয়ই হালাল স্পষ্ট করে বলা হয়েছে ও হারাম পরিস্কারভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। আর এ দুটোর মাঝে কিছু সন্দেহজনক বিষয় আছে যা অনেক মানুষই জানে না। সুতরাং যে ব্যক্তি সন্দেহজনক বিষয় থেকে বেঁচে থাকল সে নিজের দ্বীন ও ইয়াত আবরুকে বাঁচাল। আর যে সন্দেহজনক বিষয়ে লিপ্ত হয় সে প্রকারান্তরে

^{২৬৭} শবে বরাত লেখকঃ আব্দুল্লাহ শহীদ

হারামে লিপ্ত হয়ে পড়ল। যেমন কোন রাখাল যদি তার গবাদিপশু নিষিদ্ধ চারণভূমির পাশে নিয়ে যায় তাহলে তার অচিরেই নিষিদ্ধ চারণভূমিতে ঢুকে যাওয়ার আশংকা থাকে। তোমরা সাবধানতা অবলম্বন কর! প্রত্যেক রাজা-বাদশার সংরক্ষিত এলাকা রয়েছে, আর আল্লাহ তা‘আলার সংরক্ষিত এলাকা হল তাঁর নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ^{২৭০}।

উপরোক্ত আলোচনার শেষ কথা হল, শবে বরাত একটি বিদ‘আতী পর্ব। অতএব আমরা এ সিদ্ধান্তে পৌঁছতে সক্ষম হলাম যেঃ

- (১) এ রাতকে কেন্দ্র করে কোন ধরনের ‘আমল করার সমর্থনে কোন সহীহ হাদীস নেই।
- (২) এ রাত সম্পর্কে যা কিছু আকীদাহ বিশ্বাস প্রচলিত আছে তা পোষণ করা জায়েয নয়।
- (৩) এ রাতে ইবাদাত বন্দেগী করলে সৌভাগ্য খুলে যায় এমন ধারণা একটি বাতিল আকীদাহ।
- (৪) এ রাতে হায়াত, মউত ও রিযিক বন্টনের বিষয় লেখা হয় বলে যে বিশ্বাস তা কুরআন ও হাদীসের বিরোধী। তাই তা প্রত্যাখ্যান করতে হবে।
- (৫) এ রাতকে কেন্দ্র করে যেমন সম্মিলিতভাবে ইবাদাত বন্দেগী করা, রাত্রি জাগরণ করা ঠিক নয় তেমনি ব্যক্তিগত ইবাদাত বন্দেগী করাও ঠিক হবে না। তবে নিয়ম বা রুটিন মাফিক ইবাদাত বন্দেগীর কথা আলাদা। যেমন কেহ সপ্তাহের দু দিন রাত্রি জাগরণ

^{২৭০} বুখারী ও মুসলিম

করে থাকে। ঘটনাচক্রে এ রাত সেদিনের মধ্যে পড়লে অসুবিধা নেই। কিন্তু এ রাতে ইবাদাত-বন্দেগী করলে অধিক সওয়াব হবে এমন ধারণায় ব্যক্তিগতভাবে বা চুপিসারে কিছু করাও ঠিক হবে না।

(৬) ১৫ শাবানের রাতই দু'আ কবুলের রাত নয় বরং প্রতি রাতের শেষ অংশ দু'আ কবুলের সময়।

(৭) শুধু ১৫ শাবানের রাতেই আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন প্রথম আকাশে অবতরণ করেন না, বরং প্রতি রাতের শেষ তৃতীয়াংশে তিনি প্রথম আকাশে অবতরণ করে বান্দাদেরকে তাদের প্রয়োজন পূরণের জন্য প্রার্থনা করতে আহ্বান জানান।

(৮) শবে বরাতের 'আমল সম্পর্কে বর্ণিত হাদীসগুলো কোনটা জাল, আবার কোনটা যযীফ বা দুর্বল সূত্রের।

অতএব এ রাত উদযাপন করা থেকে মানুষদেরকে নিষেধ করতে হবে। যে কোন ধরনের বিদ'আতী কাজ থেকে মানুষকে সাধ্যমত বিরত রাখা 'আল-আমর বিল-মারুফ ওয়ান নাহয়ি আনিল মুনকার' এর অন্তর্ভুক্ত। আর এ বিষয়ে সবচেয়ে বেশী ভূমিকা পালন করতে পারেন মুহতারাম উলামায়ে কিরাম, শ্রদ্ধেয় আইয়েম্মায়ে মাসাজিদ, দায়ী'গণ ও ইসলামী আন্দোলনে শরীক ব্যক্তিবর্গ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ - শারী'য়াতের দৃষ্টিতে 'ঈদে মীলাদুন্নাবী বা মীলাদ মাহফিল

ঈদে মীলাদুন্নাবী কিংবা মীলাদ মাহফিল পালন করা বিদ'আত। তেমনিভাবে জন্মদিন পালন করা, জন্মঅস্টমী (হিন্দু), বড়দিন (খ্রিস্টান), মীলাদুন্নাবী একই কথা একই কাজ। সুরা আল ইমরান

(৩) ১৪৯ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন – হে মানুষ, তোমরা যারা (আল্লাহর উপর) ইমান এনেছো, তোমরা যদি অমুসলিমদের অনুসরণ করতে শুরু করো তাহলে এরা তোমাদের পূর্ববর্তী (জাহেলিয়াতের) অবস্থা ফিরিয়ে নিয়ে যাবে। ফলে তোমরা নিদারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পরবে। নবী (ﷺ) এর (মৃত্যু) ইন্তেকালের পর কোন সাহাবী (রাঃ) নবী (ﷺ) এর মিলাদুন্নবী অনুষ্ঠান করেনি। তাহলে আমরা করছি কেন? তাহলে সাহাবীরা কি ভুল করে গেছেন? এ থেকে মানুষ শিখেছে নিজের, ছেলে মেয়ের জন্মদিন পালন। আরো লোক আছে তাদের জন্মদিন কেন পালন করছেন না? (সাহাবীরা, বাকি নবী-রাসুলরা কি দোষ করেছেন তাদের নাম তো আল্লাহ কোরআনে উল্লেখ করেছেন। নবী (ﷺ) ইদে মিলাদুন্নবীর দিন কয় রাকাত নামায পরেছেন? ঈদের দিনতো মানুষ ২ রাকাত নামায পড়ে নাকি? ঈদে মিলাদুন্নবী পালন করা মানে টাকার অপচয় এবং দ্বীনে নতুন বিষয় উদ্ভাবন করা আর দ্বীনে নতুন বিষয় উদ্ভাবন করা মানেই বিদআত। তাই এই বিষয় কাউকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় ভাই আপনি কেন মিলাদুন্নবী পালন করেন? উত্তরে সে বলে আমরা মিলাদুন্নবী করি কারন আমরা নবী (ﷺ) কে ভালবাসি। আপনি যে টাকা মিলাদুন্নবীর দিন খরচ করেছেন এইটা কি ঠিক?

আল্লাহ বলেছেন আল্লাহর পথে খরচ করতে (দান করেন)? যারা মিলাদুন্নবী করে তাদের চিন্তা দ্বীন পূর্ণাঙ্গ না তারা দ্বীন কে পূর্ণাঙ্গ করার অযথা চেষ্টা করছে। কিন্তু আল্লাহ বলেছেন – “আমি তোমাদের জন্য দ্বীন কে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম।” (সূরা আল মায়েদা,

আয়াত নং - ৩)। কিন্তু আমরা মুসলিমরা ইসলামের নিয়ম অনুযায়ী যেইটা করা উচিত সেটাই আমরা করি না। অথচ আমাদের ঈদে মিলাদুন্নবীর দিনে নবী (ﷺ) প্রতি অতিরিক্ত সলাত (দুরুদ) পাঠ করা উচিত যা তিনি আদেশ করে গেছেন। বিষয়টি আরও বিস্তারিতভাবে বলা যায় যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াস্লাম এর জন্ম উৎসব উদযাপন। সাহাবীগণ ও পূর্ববর্তী ‘আলিমগণ হতে এটি পালন করাতো দূরের কথা বরং অনুমোদন দানের কোন বর্ণনাও পাওয়া যায় না। ইমাম ইবনু তাইমিয়া (রহঃ) বলেন, “এ কাজটি পূর্ববর্তী সালাফগণ করেননি অথচ এ কাজ জায়য থাকলে সওয়াব লাভের উদ্দেশ্যে তা পালন করার কার্যকারণ বিদ্যমান ছিল এবং পালন করতে বিশেষ কোন বাধাও ছিল না। যদি এটা শুধু কল্যাণের কাজই হতো তাহলে আমাদের চেয়ে তারাই এ কাজটি বেশী করতেন। কেননা তারা আমাদের চেয়েও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াস্লাম-কে বেশী সম্মান ও মহব্বত করতেন এবং কল্যাণের কাজে তারা ছিলেন বেশী আগ্রহী।” নিম্নে বিষয়টি বিস্তারিত আলোচনা করা হলোঃ

ঈদে মিলাদুন্নবী’র শাব্দিক বিশ্লেষণ

‘ঈদ’ অর্থ হচ্ছে খুশি বা আনন্দ প্রকাশ করা। আর ‘মীলাদ’ ও ‘নবী’ দুটি শব্দ একত্রে মিলিয়ে ‘মীলাদুন নবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ’ বলা হয়। ‘মীলাদ’-এর তিনটি শব্দ রয়েছে- ميلاد মীলাদ, مولد মাওলিদ ও مولود মাওলূদ। ميلاد ‘মীলাদ’ অর্থ জন্মের সময়, مولد ‘মাওলিদ’ অর্থ জন্মের স্থান, مولود ‘মাওলূদ’ অর্থ সদ্যপ্রসূত

সন্তান। আর النبی ‘নবী’ শব্দ দ্বারা বিশ্বনবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম - কে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ আভিধানিক বা শাব্দিক অর্থে ميلاد النبی ‘মীলাদুন নবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম’ বলতে বিশ্বনবী রাসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম - ওনার বিলাদত শরীফকে বুঝানো হয়ে থাকে। আল্লামা ইবনে মানযূর তাঁর সুপ্রসিদ্ধ আরবী অভিধান “লিসানুল আরবে” লিখছেনঃ “ميلاد ” অর্থাৎ: “লোকটির মীলাদঃ যে সময়ে সে জন্মগ্রহণ করেছে সে সময়ের নাম” [তথ্যসূত্রঃ ইবনে মনজুর, লিসানুল আরব (বৈরুত, দারু সাদের) ৩/৪৬৮]^{২৭১}। স্বভাবতঃই মুসলিমগণ “মীলাদ” বা “মীলাদুননবী” বলতে শুধুমাত্র রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জন্মের সময়ের আলোচনা করা বা জন্ম কথা বলা বোঝান না। বরং তাঁরা “মীলাদুননবী” বলতে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের) জন্মের সময় বা জন্মদিনকে বিশেষ পদ্ধতিতে উদযাপন করাকেই বুঝানো হয়ে থাকে। সুতরাং عيد ميلاد النبی ‘ঈদু মীলাদিন নবী’ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম’ বলতে বিশ্বনবী রাসূল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওনার বিলাদত শরীফ উপলক্ষে খুশী প্রকাশ করাকে বুঝানো হয়েছে আর পারিভাষিক বা ব্যবহারিক অর্থে عيد ميلاد النبی ‘ঈদে মীলাদুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম’ বলতে বিশ্বনবী মুহাম্মাদ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম - ওনার বিলাদত শরীফ উপলক্ষে ওনার ছানা-ছিফত বর্ণনা করা, ওনার প্রতি

^{২৭১} ইবনে মনজুর, লিসানুল আরব (বৈরুত, দারু সাদের) ৩/৪৬৮

সালাত-সালাম পাঠ করা, ওনার পুতঃপবিত্র জীবনী মুবারকের সামগ্রিক বিষয়ের আলোচনা করাকে বুঝানো হয়। এক কথায় ‘ঈদে মীলাদুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম’ অর্থ বিশ্বনবী রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উনার পবিত্র ‘বিলাদত শরীফ’ উপলক্ষে খুশী প্রকাশ করা। অর্থাৎ খুশী প্রকাশ করে মীলাদ শরীফ মাহফিলের ব্যবস্থা করা, ওনার শান-মান, মর্যাদা-মর্তবা আলোচনা করা, সালাত-সালাম পাঠ করা। বিঃ দ্রঃ ঈদ, মীলাদ ও আননাবী তিনটি শব্দই আরবী। যেগুলো ফার্সী ভাষাতেও ব্যবহৃত হয়। শব্দ তিনটি একসাথে আরবীতে বললে এভাবে বলতে হবেঃ “ঈদু মীলাদিন নাবী” আর ফার্সীতে বললে হবেঃ “ঈদে মীলাদিন নাবী”। আর এ শব্দগুলো আমাদের দেশে দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত হয়ে আসছে “ঈদে মীলাদুন নবী” রূপে। সাধারণত ১২ রবীউল আওয়াল তারিখে নাবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্ম দিন উপলক্ষে এই উৎসব উদযাপিত হয়। তবে যে কোন ব্যক্তির জন্মদিন, নতুন ব্যবসায়ের সূত্রপাত, গৃহ নির্মাণ সমাপ্তি, মৃত্যু বার্ষিকী ইত্যাদি উপলক্ষে বছরের যে কোন সময় মীলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হতে দেখা যায়। অথচ আল্লাহ তা’আলা পবিত্র কুরআনের সূরা আহযাবের ৫৬ নং আয়াতে বলেছেনঃ

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

নিশ্চয় আল্লাহ (উর্ধ্ব জগতে ফেরেশতাদের মধ্যে) নবীর প্রশংসা করেন এবং তাঁর ফেরেশতাগণ নবীর জন্য দো'আ করেন*।

হে মুমিনগণ, তোমরাও নবীর উপর দরুদ পাঠ কর এবং তাকে যথাযথভাবে সালাম জানাও। অথচ আমাদের সমাজে বর্তমানে যেসব জঘন্য বিদ'আত অত্যন্ত ব্যাপকভাবে বিদ্যমান তন্মধ্যে অন্যতম হলো- রাবী'উল আওয়াল মাসে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর জন্মদিন পালন বা 'ঈদে মীলাদুন্নাবী' উদযাপন। এই বিদ'আত কর্মটি বিভিন্নভাবে পালিত হয়ে থাকে। কেউ কেউ এ (মীলাদুন্নাবী) উপলক্ষে সমবেত হয়ে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর জন্মকাহিনী পড়ে থাকেন কিংবা ওয়া'য-নাসীহাত এবং বিভিন্ন ধরনের ক্বাসীদাহ, গযল, কবিতা ইত্যাদি আবৃত্তি করে থাকেন। কেউ কেউ এ উপলক্ষে সমবেত লোকদের মাঝে সেমাই, মিষ্টি ও হালুয়া বিতরণ করে থাকেন। এসব মীলাদ মাহ্‌ফিল কেউ কেউ মাসজিদে আবার কেউ কেউ নিজ নিজ বাড়িতে আয়োজন করে থাকেন। আবার অনেকে এমনও আছেন যারা মীলাদুন্নাবী অনুষ্ঠানকে শুধুমাত্র উপরোক্ত কার্যাবলীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেন না, বরং তাতে তারা নানা ধরনের অবৈধ ও হারাম কাজ যেমন- নারী-পুরুষের সংমিশ্রণ, ঢোল-তবলা, নাচ-গান, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর কাছে সাহায্য প্রার্থনা, তাকে আহ্বান করা, তাঁর সাহায্যে শত্রুর বিরুদ্ধে বিজয় কামনা করা ইত্যাদি বিভিন্ন রকম শির্কী ও কুফরী কাজ-কর্ম করে থাকে। এই মীলাদুন্নাবী অনুষ্ঠান তা যেভাবেই পালন বা উদযাপন করা হোক না কেন কিংবা যে কোন উদ্দেশ্যেই করা হোক না কেন, ইসলামী শারী'য়াতে সর্বাবস্থায় এটি বিদ'আত

ও নিষিদ্ধ গর্হিত কাজ। এটি উত্তম যুগের অনেক পরে ইসলামের মধ্যে নব-আবিষ্কৃত একটি কাজ। স্বভাবতঃই আমরা যে কোন ইসলামী আলোচনা কুরআনুল কারীম ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীসের আলোকে শুরু করি। কুরআনুল কারীমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের “মীলাদ” অর্থাৎ তাঁর জন্ম, জন্ম সময় বা জন্ম উদযাপন বা পালন সম্পর্কে কিছুই বলা হয়নি। কুরআন করীমে পূর্ববর্তী কোন কোন নবীর জন্মের ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে, তবে কোথাও কোনভাবে কোন দিন, তারিখ, মাস উল্লেখ করা হয় নি। অনুরূপভাবে “মীলাদ” পালন করতে, অর্থাৎ কারো জন্ম উদযাপন করতে বা জন্ম উপলক্ষে আলোচনার মাজলিস করতে বা জন্ম উপলক্ষে আনন্দ প্রকাশের কোন নির্দেশ, উৎসাহ বা প্রেরণা দেওয়া হয় নি। শুধুমাত্র আল্লাহর মহিমা বর্ণনা ও শিক্ষা গ্রহণের জন্যই এসকল ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। ঐতিহাসিক তথ্যাদি আলোচনার মাধ্যমে এর আত্মিক প্রেরণার ধারাবাহিকতা ব্যহত করা হয় নি। এজন্য আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মদিন সম্পর্কে আলোচনায় মূলত: হাদীস শরীফ ও পরবর্তী যুগের মুসলিম ঐতিহাসিক ও আলেমগণের মতামতের উপর নির্ভর করবঃ

হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মদিন

হাদীস বলতে আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা, কর্ম, অনুমোদন বা তাঁর সম্পর্কে কোন বর্ণনা বুঝি। এছাড়াও

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সহাবীগণের কথা, কর্ম বা অনুমোদনকেও হাদীস বলা হয়ে থাকে^{২৭২}।

হাদীস (حَدِيث) আরবী শব্দ। এর বহুবচন (أَحَادِيث) হাদীস (حَدِيث) শব্দের আরেকটি অর্থ হচ্ছে নতুন, নবীন, আধুনিক, নব্য, সাম্প্রতিক। আরবী অভিধান ও কোরআনের ব্যবহার অনুযায়ী ‘হাদীস’ শব্দের অর্থ- কথা, বাণী [speech, word (s)], বার্তা, সংবাদ, বিষয়, খবর (خَبْرٌ) ও ব্যাপার^{২৭৩}।

حَدِيثٌ (হাদীস) শব্দটি একবচন, এর বহুবচন حَدِيثَاتٌ (হাদিসানুন) বা حَدِيثَاتٌ (আহাদীসু) বা حَدَاثَاتٌ (হদাসাউ)। যার লুগাতী বা শাব্দিক অর্থ হচ্ছে কথা, বাণী, সংবাদ, ব্যাপার, বিষয়, পুরাতন সংবাদ ইত্যাদি। আর ‘ইসতিলাহী’ বা পারিভাষিক অর্থে সাইয়্যিদুল মুরসালীন, ইমামুল মুরসালীন, খাতামুন্ নাবিয়্যীন, হাবীবুল্লাহ, সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা বলেছেন, করেছেন বা অন্যের কোন কথা বা কাজের প্রতি সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন তাকে সুন্নাহ বা হাদীস বলে। অর্থাৎ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা, কর্ম, সম্মতি, চারিত্রিক গুণবলীকে হাদীস বলা হয়। আল্লামা হাফেজ সাখাবী (রহঃ) বলেন-

والحديث لغة ضد القديم واصطلاحاً حاملاً ماضياً إلى النبي ﷺ قولاً له أو فعلاً له
أو تقريراً أو صفة حتى الحركات والسكنات في اليقظة والمنام

^{২৭২} আব্দুল হাই লাখনাবী, যাকরুল আমানী ফী মুখতাসারিল জুরজানী (সংযুক্ত আরব আমিরাত, দুবাই, দারুল ইলম, ১ম সংস্করণ, ১৯৯৫) ৩১-৩৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

^{২৭৩} আরবী - বাংলা অভিধান, ডঃ ফজলুর রহমান, পৃষ্ঠা ২৮০; আল মাওরিদ, (আরবী-ইংরেজী অভিধান) মুনির বাআলবাকী

অর্থঃ আভিধানিক অর্থে হাদীস শব্দটি কাদীম তথা অবিনশ্বরের বিপরীত আর পরিভাষায় বলা হয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দিকে সম্বন্ধযুক্ত। চাই তার বক্তব্য হোক বা কর্ম বা অনুমোদন অথবা গুণ এমন কি ঘুমন্ত অবস্থায় বা জাগ্রত অবস্থায় তাঁর গতি ও স্থির সবই হাদীস। সহীহ বুখারীতে বিশিষ্ট ব্যাখ্যাগ্রন্থ *عمدة القارى* এর মধ্যে হাদীস সম্বন্ধে রয়েছেঃ

علم الحديث هو علم يعرف به اقوال النبي ﷺ وافعاله واخواله

অর্থঃ ইলমে হাদীস এমন বিশেষ জ্ঞান যার সাহায্যে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কথা, কাজ ও অবস্থা জানতে পারা যায়। হাদীস শব্দের বিশ্লেষণ করে ইমাম রাগব ইসফাহানী লিখেছেনঃ

الْحَدِيثُ: وَالْحَدِيثُ كَوْنُ الشَّيْءِ بَعْدَ أَنْ لَمْ تَكُنْ عَرَضًا كَانَ تَوَّأَجَدُ هَرًا وَكُلَّ
-كَلَامٍ يَبْلُغُ الْإِنْسَانَ مِنْ جَهَةِ السَّمْعِ أَوْ الْوَحْيِ فِي يَقْظَتِهِ أَوْ مَنَامِهِ حَدِيثٌ

‘হাদীস’ আর ‘হুদুস’ বলতে বুঝায় কোন একটি অস্তিত্বহীন জিনিসের অস্তিত্ব লাভ করা, তা কোন মৌলিক জিনিস হোক কি অমৌলিক। আর মানুষের নিকট শব্দেরদ্বীয় বা ওহীর সূত্রে নিদ্রায় কিংবা জাগরণে যে কোন কথা পৌঁছায়, তাকেই হাদীস বলে।

অন্যত্র তিনি লিখেছেনঃ

شَيْءٌ يُلْقَى فِي رَوْعٍ أَحَدٍ مِنْ جَهَةِ الْمَلَأِ

উচ্চতর জগত হতে একজনের অন্তর্লোকে যা কিছু উদ্ভিত হয় তাই হাদীস^{২৭৪}।

^{২৭৪} হাদীস সংকলনের ইতিহাস, মাওলানা আব্দুর রহীম নামক, খায়রুন প্রকাশনী, পৃষ্ঠা নং -২০।

হিজরী দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতাব্দীতে প্রায় অর্ধশতাব্দিক গ্রন্থে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস ও তাঁর সাহাবাগণের মতামত সনদ বা বর্ণনাসূত্রসহ সংকলিত হয়। তন্মধ্যে “আল-কুতুবুস সিভাহ” নামে প্রসিদ্ধ ৬টি অতি প্রচলিত ও নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ সকল হাদীসগ্রন্থের সংকলিত হাদীস থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মবার, জন্মদিন ও জন্মতারিখ সম্বন্ধে প্রাপ্ত তথ্য নিম্নরূপঃ

একঃ জন্মবারঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মবার সম্পর্কে হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছেঃ

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ صَوْمِ الْاِثْنَيْنِ فَقَالَ: ”ذَاكَ يَوْمٌ وَلِدْتُ فِيهِ وَيَوْمٌ بُعِثْتُ أَوْ أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهِ

আবু কাতাদা আল-আনসারী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সোমবার দিন রোজা রাখা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়। তিনি বলেনঃ “এই দিনে (সোমবারে) আমি জন্মগ্রহণ করেছি এবং এই দিনেই আমি নবুয়ত পেয়েছি”^{২৭৫}।

ইমাম আহমদ তাঁর মুসনাদে সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেনঃ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ”وَلِدَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَاسْتُنْبِئَ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَتُوُفِّيَ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَخَرَجَ مُهَاجِرًا مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَقَدِمَ الْمَدِينَةَ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَرَفَعَ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ

ইবনে আববাস বলেনঃ “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সোমবারে জন্মগ্রহণ করেন, সোমবারে নবুয়ত লাভ করেন,

^{২৭৫} সহীহ মুসলিম (মিশর, কাইরো, দারু এহইয়াইল কুতুবিল আরাবিয়্যাহ, তারিখবিহীন) ২/৮১৯

সোমবারে ইন্তেকাল করেন, সোমবারে মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনার পথে রওয়ান করেন, সোমবারে মদীনা পৌছান এবং সোমবারেই তিনি হাজারে আসওয়াদ উত্তোলন করেন”^{২৭৬}। এভাবে আমরা হাদীস থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মবার জানতে পারি। সহীহ হাদীসের আলোকে প্রায় সকল ঐতিহাসিক একমত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সোমবার জন্মগ্রহণ করেন।

দুইঃ জন্ম বৎসরঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মবৎসর বা জন্মের সাল সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছেঃ

عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسِ بْنِ مَخْرَمَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: ”وُلِدْتُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفِيلِ. وَسَأَلَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ قُبَاتَ بْنِ أَشِيَمَ أَخَا بَنِي يَعْزَرَ بْنِ لَيْثٍ أَأَنْتَ أَكْبَرُ أَمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْبَرُ مِنِّي وَأَنَا أَقْدَمُ مِنْهُ فِي الْمِيلَادِ وَلِدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفِيلِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ

কায়স ইবনে মাখরামা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেনঃ আমি ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুজনেই “হাতীর বছরে” জন্মগ্রহণ করেছি। উসমান ইবন আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহু কুবাস ইবন আশইয়ামকে প্রশ্ন করেনঃ আপনি বড় না রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বড়? তিনি উত্তরে বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

^{২৭৬} আহমাদ ইবনে হাযাল, আল-মুসনাদ (মিসর, দারুল মজারিফ, ১৯৫০) ৪/১৭২-১৭৩, নং ২৫০৬ (সম্পাদক আহমদ শাকির সনদ আলোচনা করে বলেছেন: হাদীসটির সনদ সহীহ)

আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার থেকে বড়, আর আমি তাঁর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম “হাতীর বছরে” জন্মগ্রহণ করেন”^{২৭৭}। হাতীর বছর অর্থাৎ যে বৎসর আবরাহা হাতী নিয়ে কাবা ঘর ধ্বংসের জন্য মক্কা আক্রমণ করেছিল। ঐতিহাসিকদের মতে এ বছর ৫৭০ বা ৫৭১ খ্রীষ্টাব্দ ছিল^{২৭৮}।

তিন. জন্মমাস ও জন্ম তারিখঃ এভাবে আমরা হাদীসের আলোকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্ম বৎসর ও জন্ম বার সম্পর্কে জানতে পারি। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোন হাদীসে তাঁর জন্মমাস ও জন্মতারিখ সম্পর্কে কোন তথ্য পাওয়া যায় না। একারণে পরবর্তী যুগের আলেম ও ঐতিহাসিকগণ তাঁর জন্মতারিখ সম্পর্কে অনেক মতভেদ করেছেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মদিনঃ আলেমগণ ও ঐতিহাসিকদের মতামতঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্ম তারিখ সম্পর্কে যেহেতু হাদীসে রাসূলের হাদীসে কোন বর্ণনা আসে নি এবং সাহাবীগণের মাঝেও এ বিষয়ে কোন সুনির্দিষ্ট মত প্রচলিত ছিল না, তাই মুসলিম ঐতিহাসিকগণ এ বিষয়ে বিভিন্ন মত পোষণ করেছেন। ইবনে হিশাম, ইবনে সা‘দ, ইবনে কাসীর, কাসতাল্লানী ও অন্যান্য ঐতিহাসিক ও সীরাতুননবী

^{২৭৭} তিরমিযী, আল-জামিয়, প্রাগুক্ত ৫/৫৫০, নং ৩৬১৯। ইমাম তিরমিযী বলেছেনঃ হাদীসটি হাসান গরীব

^{২৭৮} আকরাম যিয়া আর-উমারী, আস-সীরাতুন নাবাবীয়াহ আস-সহীহা (মদীনা মুনাওয়ারা, মাকতাবাতুল উলুম ওয়াল হিকাম, ৪র্থ সংস্করণ ১৯৯৩) ১/৯৬-৯৮, মাহদী রেজকুল্লাহ আহমদ, আস-সীরাতুন নাবাবীয়াহ (সৌদি আরব, রিয়াদ, বাদশাহ ফয়সল কেন্দ্র, ১ম সংস্করণ, ১৯৯২) ১০৯-১১০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

লিখকগণ এ বিষয়ে নিম্নলিখিত মতামত উল্লেখ করেছেনঃ কারো মতে, তাঁর জন্ম তারিখ অজ্ঞাত, তা জানা যায় নি, এবং তা জানা সম্ভব নয়। তিনি সোমবারে জন্মগ্রহণ করেছেন এটুকুই শুধু জানা যায়, জন্ম মাস বা তারিখ জানা যায় না। এ বিষয়ে কোন আলোচনা তারা অবাস্তব মনে করেন। কারো কারো মতে, তিনি মুহাররম মাসে জন্মগ্রহণ করেছেন। অন্য মতে, তিনি সফর মাসে জন্মগ্রহণ করেছেন। কারও কারও মতে, তিনি রবিউল আউআল মাসের ২ তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। দ্বিতীয় হিজরী শতকের অন্যতম ঐতিহাসিক ও মাগাযী প্রণেতা মুহাদ্দিস আবু মাশার নাজীহ ইবন আব্দুর রহমান আস-সিনদী (১৭০হঃ) এই মতটি গ্রহণ করেছেন। অন্য মতে, তাঁর জন্ম তারিখ রবিউল আউআল মাসের ৮ তারিখ। আল্লামা কাসতাল্লানী ও যারকানীর বর্ণনায় এই মতটিই অধিকাংশ মুহাদ্দিস গ্রহণ করেছেন। এই মতটি দুইজন সাহাবী ইবনে আববাস ও জুবাইর ইবন মুতয়িম রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। অধিকাংশ ঐতিহাসিক ও সীরাতুননবী বিশেষজ্ঞ এই মতটি গ্রহণ করেছেন বলে তারা উল্লেখ করেছেন। প্রখ্যাত তাবেয়ী ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে মুসলিম ইবনে শিহাব আয-যুহরী (১২৫হঃ) তাঁর উস্তাদ প্রথম শতাব্দীর প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ও নসববিদ ঐতিহাসিক তাবেয়ী মুহাম্মাদ ইবনে জুবাইর ইবনে মুতয়িম (১০০হঃ) থেকে এই মতটি বর্ণনা করেছেন। কাসতালানী বলেনঃ “মুহাম্মাদ ইবনে জুবাইর আরবদের বংশ পরিচিতি ও আরবদের ইতিহাস সম্পর্কে অভিজ্ঞ ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্ম তারিখ সম্পর্কিত

এই মতটি তিনি তাঁর পিতা সাহাবী জুবাইর ইবন মুতয়িম থেকে গ্রহণ করেছেন। স্পেনের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ও ফকিহ আলী ইবনে আহমদ ইবনে হাযম (৪৫৬হিঃ) ও মুহাম্মাদ ইবনে ফাতুহ আল-হুমাইদী (৪৮৮হিঃ) এই মতটিকে গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেছেন। স্পেনের মুহাদ্দিস আল্লামা ইউসুফ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল বার (৪৬৩ হিঃ) উল্লেখ করেছেন যে, ঐতিহাসিকগণ এই মতটিই সঠিক বলে মনে করেন। মীলাদের উপর প্রথম গ্রন্থ রচনাকারী আল্লামা আবুল খাত্তাব ইবনে দেহিয়া (৬৩৩ হিঃ) ঈদে মীলাদুন্নবীর উপর লিখিত “আত-তানবীর ফী মাওলিদিল বাশির আন নাবীর” গ্রন্থে এই মতটিকেই গ্রহণ করেছেন। অন্য মতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্ম তারিখ ১০ই রবিউল আউয়াল। এই মতটি ইমাম হুসাইনের পৌত্র মুহাম্মাদ ইবন আলী আল বাকের (১১৪হিঃ) থেকে বর্ণিত। দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আমির ইবন শারাহিল আশ শাব্বী (১০৪হিঃ) থেকেও এই মতটি বর্ণিত। ঐতিহাসিক মুহাম্মাদ ইবন উমর আল-ওয়াকিদী (২০৭হিঃ) এই মত গ্রহণ করেছেন। ইবনে সা‘দ তার বিখ্যাত “আত-তাবাকাতুল কুবরা”-য় শুধু দুইটি মত উল্লেখ করেছেন, ২ তারিখ ও ১০ তারিখ^{২৭৯}। কারও কারও মতে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্ম তারিখ ১২ রবিউল আউয়াল। এই মতটি হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রখ্যাত ঐতিহাসিক মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক (১৫১হিঃ) গ্রহণ করেছেন। তিনি বলেছেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

^{২৭৯} ইবনে সা‘দ, আত-তাবাকাতুল কুবরা (বৈরুত, দারু এহইয়ায়েত তুরাসিল আরাবী) ১/৪৭

আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাতীর বছরে রবিউল আউয়াল মাসের ১২ তারিখে জন্মগ্রহণ^{২৮০}।

এখানে লক্ষণীয় যে, ইবনে ইসহাক সীরাতুন্নবীর সকল তথ্য সাধারণতঃ সনদ সহ বর্ণনা করেছেন, কিন্তু এই তথ্যটির জন্য কোন সনদ উল্লেখ করেন নি। কোথা থেকে তিনি এই তথ্যটি গ্রহণ করেছেন তাও জানান নি বা সনদসহ প্রথম শতাব্দীর কোন সাহাবী বা তাবেরী থেকে মতটি বর্ণনা করেন নি। এ জন্য অনেক গবেষক এই মতটিকে দুর্বল বলে উল্লেখ করেছেন^{২৮১}। অন্য মতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্ম তারিখ ১৭ই রবিউল আউয়াল। অন্য মতে তাঁর জন্ম তারিখ ২২ শে রবিউল আউয়াল। অন্য মতে তিনি রবিউস সানী মাসে জন্মগ্রহণ করেছেন। অন্য মতে তিনি রজব জন্মগ্রহণ করেছেন। অন্য মতে তিনি রমযান মাসে জন্মগ্রহণ করেছেন। ৩য় হিজরী শতকের প্রখ্যাত ঐতিহাসিক যুবাইর ইবনে বাক্বার (২৫৬ হি:) থেকে এই মতটি বর্ণিত। তাঁর মতের পক্ষে যুক্তি হলো যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বসম্মতভাবে রমযান মাসে নবুয়ত পেয়েছেন। তিনি ৪০ বৎসর পূর্তিতে নবুয়ত পেয়েছেন। তাহলে তাঁর জন্ম অবশ্যই রমযানে হবে^{২৮২}।

^{২৮০} ইবনে হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাবীয়াহ (মিশর, কায়রো, দারুল রাইয়ান, ১ম সংস্করণ, ১৯৭৮) ১/১৮৩

^{২৮১} মাহদী রেজকুল্লাহ আহমদ, আস-সীরাতুন নাবাবীয়াহ, ১০৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

^{২৮২} ইবনে স্মুদ, আত-তাবাকাতুল কুবরা ১/১০০-১০১, ইবনে কাসীর, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া (বেরুত, দারুল ফিকর, ১ম সংস্করণ, ১৯৯৬) ২/২১৫, আল-কাসতালানী, আহমদ বিন মুহাম্মাদ, আল-মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়া (বেরুত, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, ১ম সংস্করণ ১৯৯৬) ১/৭৪-৭৫, আল-যারকানী, শরহুল মাওয়াহিব আল-লাদুন্নিয়া (বেরুত, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, ১ম সংস্করণ ১৯৯৬) ১/২৪৫-২৪৮, ইবনে রাজাব, লাভায়েফুল মাযারেফ, প্রাগুক্ত ১/১৫০

মীলাদুন্নবী বা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের
জন্মদিবস পালন বা উদযাপন

ক) পূর্বকথাঃ উপরের আলোচনা থেকে আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মবার, জন্মমাস ও জন্মতারিখ সম্পর্কে হাদীস ও ঐতিহাসিকদের মতামত জানতে পেরেছি। তাঁর জন্মদিন সম্পর্কে ইসলামের প্রথম যুগগুলির আলেম ও ঐতিহাসিকদের মতামতের বিভিন্নতা থেকে আমরা সহজেই অনুমান করতে পারছি যে, প্রথম যুগে, সাহাবী, তাবয়ী ও তাবে-তাবয়ীদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মদিন পালন বা উদযাপন করার প্রচলন ছিল না। কারণ তাহলে এধরনের মতবিরোধের কোন সুযোগ থাকত না। মুহাদ্দিস, ফকিহ ও ঐতিহাসিকদের গবেষণা আমাদের এই অনুমানকে সত্য প্রমাণিত করেছে। আমরা জানি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মদিন পালন বা রবিউল আউয়াল মাসে “ঈদে মীলাদুন্নবী” পালনের বৈধতা ও অবৈধতা নিয়ে আলেম সমাজে অনেক মতবিরোধ হয়েছে, তবে মীলাদুন্নবী উদযাপনের পক্ষের ও বিপক্ষের সকল আলেম ও গবেষক একমত যে, ইসলামের প্রথম শতাব্দীগুলিতে “ঈদে মীলাদুন্নবী” বা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মদিন পালন করা বা উদযাপন করার কোন প্রচলন ছিল না। নবম হিজরী শতকের অন্যতম আলেম ও ঐতিহাসিক আল্লামা ইবনে হাজার আল-আসকালানী (মৃত্যুঃ ৮৫২হিঃ ১৪৪৯খ্রিঃ) লিখেছেনঃ “মাওলিদ পালন মূলতঃ বিদআত। ইসলামের সম্মানিত

প্রথম তিন শতাব্দীর সালফে সালেহীনদের কোন একজনও এ কাজ করেন নি”^{২৮৩}। নবম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের প্রখ্যাত মুদাদিস ও ঐতিহাসিক আল্লামা আবুল খাইর মুহাম্মাদ ইবন আব্দুর রহমান আস-সাখাবী (মৃত্যুঃ ৯০২হিঃ ১৪৯৭খ্রিঃ) লিখেছেনঃ হুইসলামের সম্মানিত প্রথম তিন যুগের সালফে সালেহীনদের (সাহাবী, তাবেরী ও তাব-তাবেরীদের) কোন একজন থেকেও মাওলিদ পালনের কোন ঘটনা খুজে পাওয়া যায় না। মাওলিদ পালন বা উদযাপন পরবর্তী যুগে উদ্ভাবিত হয়েছে। এরপর থেকে সকল দেশের ও সকল বড় বড় শহরের মুসলিমগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মমাস পালন করে আসছেন।

এ উপলক্ষ্যে তারা অত্যন্ত সুন্দর জাঁকজমকপূর্ণ উৎসবময় খানাপিনার মাহফিলের আয়োজন করেন, এ মাসের রাত্রে তাঁরা বিভিন্ন রকমের দান-সদকা করেন, আনন্দপ্রকাশ করেন এবং জনকল্যাণমূলক কর্ম বেশী করে করেন। এ সময়ে তাঁরা তাঁর জন্মকাহিনী পাঠ করতে মনোনিবেশ করেন”^{২৮৪}। লাহোরের প্রখ্যাত আলেম সাইয়েদ দিলদার আলী (১৯৩৫খ্রিঃ) মীলাদের সপক্ষে আলোচনা করতে গিয়ে লিখেছেনঃ “মীলাদের কোন আসল বা সূত্র প্রথম তিন যুগের (সাহাবী, তাবেরী ও তাব-তাবেরীগণ) কোন সালফে সালেহীন থেকে বর্ণিত হয় নি; বরং তাঁদের যুগের পরে এর

^{২৮৩} আস-সালেহী, মুহাম্মাদ বিন ইউসুফ, সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ ফী সীরাতি খাইরিল ইবাদ, আস-সীরাতুশ শামিয়্যাহ (বৈরুত, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৩) ১/৩৬৬

^{২৮৪} আস-সালেহী, সীরাত ১/৩৬২

উদ্ভাবন ঘটেছে”^{২৮৫}। আলেমদের এই ঐক্যমতের কারণ হলো, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শতাব্দীতে সংকলিত অর্ধশতাধিক সনদভিত্তিক হাদীসের গ্রন্থ, যাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কর্ম, আচার-আচরণ, কথা, অনুমোদন, আকৃতি, প্রকৃতি ইত্যাদি সংকলিত রয়েছে, সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেরীদের মতামত ও কর্ম সংকলিত হয়েছে সে সকল গ্রন্থের একটিও সহীহ বা দুর্বল হাদীসে দেখা যায় না যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায় বা তাঁর মৃত্যুর পরে কোন সাহাবী সামাজিকভাবে বা ব্যক্তিগতভাবে তাঁর জন্ম উদযাপন, জন্ম আলোচনা বা জন্ম উপলক্ষে আনন্দ প্রকাশের জন্য নির্দিষ্ট কোন দিনে বা অনির্দিষ্টভাবে বৎসরের কোন সময়ে কোন অনুষ্ঠান করেছেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামই ছিলেন তাঁদের সকল আলোচনা, সকল চিন্তা চেতনার প্রাণ, সকল কর্মকাণ্ডের মূল। তাঁরা রাহমাতুল্লিল আলামীনের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের) জীবনের ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর ঘটনা নিয়ে আলোচনা করেছেন, তাঁর জীবনের বিভিন্ন ঘটনা আলোচনা করে তাঁর ভালবাসায় চোখের পানিতে বুক ভিজিয়েছেন। তাঁর আকৃতি, প্রকৃতি, পোষাক আশাকের কথা আলোচনা করে জীবন অতিবাহিত করেছেন। কিন্তু তাঁরা কখনো তাঁর জন্মদিন পালন করেন নি। এমনকি তাঁর জন্মমুহূর্তের ঘটনাবলী আলোচনার জন্যও তাঁরা কখনো

^{২৮৫} সাইয়েদ দিলদার আলী, রাসূলুল কলাম ফিল মাওলিদ ওয়াল কিয়াম (লাহোর), ১৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

বসেন নি বা কোন দান-সাদকা, তিলাওয়াত ইত্যাদির মাধ্যমেও কখনো তাঁর জন্ম উপলক্ষে আনন্দ প্রকাশ করেন নি। তাঁদের পরে তাবেয়ী ও তাবে তাবেয়ীদের অবস্থাও তাই ছিল। বস্তুতঃ কারো জন্ম বা মৃত্যুদিন পালন করার বিষয়টি আরবের মানুষের কাছে একেবারেই অজ্ঞাত ছিল। জন্মদিন পালন “আ‘জামী” বা অনারবীয় সংস্কৃতির অংশ। প্রথম যুগের মুসলিমগণ তা জানতেন না। পারস্যের মাজুস (অগ্নি উপাসক) ও বাইযান্টাইন খ্রিষ্টানদের ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল জন্মদিন, মৃত্যুদিন ইত্যাদি পালন করা। তবে প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীতে পারস্য, সিরিয়া, মিসর ও এশিয়া মাইনরের যে সকল মানুষ ইসলামের ছায়াতলে আসেন তাঁরা জীবনের সকল ক্ষেত্রে সাহাবীদের অনুসরণ অনুকরণ করতেন এবং তাঁদের জীবনাচারে আরবীয় রীতিনীতিরই প্রাধান্য ছিল। হিজরী তৃতীয় শতাব্দী থেকে মুসলিম সাম্রাজ্যে অনারব পারস্যিান ও তুর্কী মুসলিমদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এরপর থেকে মুসলিম সাম্রাজ্যে বিভিন্ন নতুন নতুন সামাজিক ও ধর্মীয় রীতিনীতির প্রচলন ঘটে, তন্মধ্যে পবিত্র ঈদে মীলাদুন্নবী অন্যতম।

ঈদে মীলাদুন্নবী উদযাপন - প্রাথমিক প্রবর্তন ও সীমিত উদযাপন

আমরা জানতে পারলাম প্রথম যুগগুলোর পরে মীলাদ অনুষ্ঠান বা ঈদে মীলাদুন্নবী উদযাপনের শুরু হয়েছে। কিন্তু কবে থেকে? কে শুরু করলেন? আসুন আমরা তাদের সাথে পরিচিত হই এবং কিভাবে তাঁরা এই অনুষ্ঠান পালন করতেন তা জানার চেষ্টা করি।

ইতিহাসের আলোকে যতটুকু জানতে পেরেছি, দুই ঈদের বাইরে কোন দিবসকে সামাজিক ভাবে উদযাপন শুরু হয় হিজরী ৪র্থ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে শিয়াদের উদ্যোগে। সর্বপ্রথম ৩৫২ হিজরীতে (৯৬৩খ্রিঃ) বাগদাদের আববাসী খলীফার প্রধান প্রশাসক ও রাষ্ট্রের প্রধান নিয়ন্ত্রক বনী বুয়াইহির শিয়া শাসক মুইজ্জুদৌলা ১০ই মুহাররাম আশুরাকে শোক দিবস ও জিলহজ্জ মাসের ৮ তারিখ গাদীর খুম দিবস উৎসব দিবস হিসাবে পালন করার নির্দেশ দেন। তার নির্দেশে এই দুই দিবস সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় মর্যাদার সাথে পালন করা হয়। যদিও শুধুমাত্র শিয়ারাই এই দুই দিবস পালন করেন, তবুও তা সামাজিক রূপ গ্রহণ করে। কারণ রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতার ফলে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ প্রথম বৎসরে এই উদযাপনে বাধা দিতে পারেন নি। পরবর্তী যুগে যতদিন শিয়াদের প্রতিপত্তি ছিল এই দুই দিবস উদযাপন করা হয়, যদিও তা মাঝে মাঝে শিয়া-সুন্নী ভয়ঙ্কর সংঘাত ও গৃহযুদ্ধের কারণ হয়ে দাঁড়ায় [তথ্যসূত্রঃ আগাখানী, বুহরা, বাতেনী শিয়াদের পূর্বপুরুষ]। ঈদে মীলাদুননবী উদযাপন করার ক্ষেত্রেও শিয়াগণ অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। উবাইদ বংশের রাফেযী ইসমাজিলী শিয়াগণ^{২৮৬}। ফাতেমী বংশের নামে আফ্রিকার উত্তরাংশে রাজত্ব স্থাপন করেন। ৩৫৮ হিজরীতে (৯৬৯ খ্রিঃ) তারা মিশর দখল করে তাকে ফাতেমী রাষ্ট্রের কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তোলেন এবং পরবর্তী ২

^{২৮৬} বিস্তারিত দেখুনঃ মাহমুদ শাকির, আত-তারিখুল ইসলামী (বাইরুত, আল-মাকতাব আল-ইসলামী, ১ম সংস্করণ ১৯৮৫ ইং) ৬/১১১-১১২, ১২৩-১২৪, ১৩৬-১৩৭, ১৬৫-১৬৮, ১৮০-১৮২, ১৯৩-১৯৬, ২০৮-২০৯, ২৩৩, ২৪৮, ২৬৫, ২৮৭-২৮৯, ৩০৩-৩০৭

শতাব্দীরও অধিককাল মিশরে তাদের শাসন ও কর্তৃত্ব বজায় থাকে। গাজী সালাহুদ্দীন আইউবীর মিশরের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণের মাধ্যমে ৫৬৭ হিজরীতে (১১৭২খ্রিঃ) মিশরের ফাতেমী শিয়া রাজবংশের সমাপ্তি ঘটে^{২৮৭}। এই দুই শতাব্দীর শাসনকালে মিশরের ইসমাইলী শিয়া শাসকগণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় ২ ঈদ ছাড়াও আরো বিভিন্ন দিন পালন করতেন, তন্মধ্যে অধিকাংশই ছিল জন্মদিন। তাঁরা অত্যন্ত আনন্দ, উৎসব ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে ৫টি জন্মদিন পালন করতেনঃ

- ১) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মদিন,
- ২) আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর জন্মদিন,
- ৩) ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা'র জন্মদিন,
- ৪) হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহুর জন্মদিন ও
- ৫) হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর জন্মদিন।

এ ছাড়াও তারা তাদের জীবিত খলীফার জন্মদিন পালন করতেন এবং “মীলাদ” নামে ঈসা আলাইহিস সালামের জন্মদিন (বড়দিন বা ক্রীসমাস), যা মিশরের খ্রিষ্টানদের মধ্যে প্রচলিত ছিল তা আনন্দ প্রকাশ, মিষ্টি ও উপহার বিতরণের মধ্য দিয়ে উদযাপন করতেন^{২৮৮}। ঈদে মীলাদুন্নবীর প্রাথমিক উদযাপন - যুগ ও প্রবর্তক পরিচিতি হিজরী ৪র্থ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে মিশরে এই উদযাপন শুরু হয়। এ যুগকে আববাসীয় খেলাফতের দুর্বলতার যুগ হিসাবে চিহ্নিত

^{২৮৭} আল-মাকরীযী, আহমদ বিন আলী, আল-মাওয়াযিজ ওয়াল ইতিবার বি যিকরিল খুতাতি ওয়াল আসার (মিশর, কাইরো, মাকতাবাতুস সাকাফা আদ দীনীয়াহ) ৪৯০-৪৯৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

^{২৮৮} বিস্তারিত দেখুনঃ ইবনে কাসীরঃ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, প্রাগুক্ত, ৭ম খন্ড, মাহমূদ শাকির, আত-তারিখ আল-ইসলামী, ৫ম ও ৬ষ্ঠ খন্ড

করেছেন ঐতিহাসিকগণ। আববাসীয় খেলাফতের প্রথম অধ্যায় শেষ হয় ২৩২ হিঃ (৮৪৭খ্রিঃ) ৯ম আববাসী খলিফা ওয়াসিক বিল্লাহের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে। এরপর সুবিশাল মুসলিম সাম্রাজ্যে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অবনতির সূচনা হয়। কারণ কেন্দ্রীয় প্রশাসন দুর্বল হয়ে পড়ে। বিশাল সাম্রাজ্য বিভিন্ন ছোট ছোট রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়ে যায়। এসকল রাষ্ট্রের মধ্যে অবিরত যুদ্ধ বিগ্রহ চলতে থাকে। এছাড়া কেন্দ্রীয় প্রশাসনের দুর্বলতার কারণে বিভিন্ন এলাকায় সংঘবদ্ধ দুর্বৃত্তরা লুটতরাজ চালানোর সুযোগ পায়। সামাজিক নিরাপত্তা ব্যহত হয়। বিশেষ করে ৩৩৪ হিঃ (৯৪৫খ্রিঃ) থেকে বাগদাদে শীয়া মতাবলম্বী বনু বুয়াইহ শাসকগণ সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হয়ে যান, ফলে ইসলামী জ্ঞানচর্চা, হাদীস ও সুন্নাহের অনুসরণ ব্যহত হয়। রাফেযী শিয়া মতবাদের প্রসার ঘটতে থাকে। অপরদিকে সংখ্যাগরিষ্ঠ সুন্নী জনগণ শিয়াদের বাড়াবাড়িতে অতিষ্ঠ হয়ে প্রতিবাদ করলে তা অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিয়া-সুন্নী সংঘর্ষ ও গৃহযুদ্ধের রূপ ধারণ করত। এ সকল সংঘর্ষ মূলতঃ দেশের সার্বিক অবস্থার আরো অবনতি ঘটাত। আভ্যন্তরীণ অশান্তি ও অনৈক্য বহির্শত্রুর আগ্রাসনের কারণ হয়। এশিয়া মাইনর, আর্মেনীয়া, ও মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন খ্রিষ্টান শাসক সুযোগমত ইসলামী সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে আগ্রাসন চালাতে থাকেন। এছাড়া ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অপপ্রচার ও উস্কানীমূলক কর্মকান্ড পরিচালনা করতে থাকেন। এই পরিস্থিতিতে জ্ঞানচর্চা, ধর্মীয় মূল্যবোধের বিকাশ ব্যহত হয়। অপরদিকে সমাজের মানুষের মধ্যে

বিলাসিতা ও পাপাচারের প্রসার ঘটতে থাকে। সমাজের বিভিন্ন স্তরে ইসলাম বিরোধী আচার আচরণ, কুসংস্কার, ধর্মীয় বিকৃতি ছড়িয়ে পড়ে। এই যুগের বিচ্ছিন্ন ইসলামী সম্রাজ্যের একটি বিশেষ অংশ ও ইসলামী সভ্যতার অন্ত্যম কেন্দ্র মিশরে ফাতেমী খলীফা আল-মুয়িজ্জ লি-দীনিল্লাহ সর্বপ্রথম ঈদে মীলাদুন্নবী, অন্যান্য জন্মদিন পালন ও সে উপলক্ষে বিভিন্ন উৎসবের শুরু করেন। তিনি ৩৫৮ হিজরীতে মিসর অধিকার করেন এবং কায়রো শহরের পত্তন করেন। তিনি সিরিয়া ও হেজাজের বিভিন্ন অঞ্চল ও তাঁর অধীনে আনেন। ৩৬২ হিজরীতে (৯৭২খ্রিঃ) মুয়িজ্জ কায়রো প্রবেশ করেন এবং কায়রোকেই তাঁর রাজধানী হিসাবে গ্রহণ করেন। ৩৬৫ হিজরীতে তিনি মৃত্যু বরণ করেন। তাঁর শাসনামলে মিশরে শিয়া শাসকদের যে সকল উৎসবাদি প্রচলিত হয় তার অন্যতম ছিল ঈদে মীলাদুন্নবী উৎসব^{১৯৯}। আল মুয়িজ্জ এর প্রচলিত এই ঈদে মীলাদুন্নবী ও অন্যান্য জন্মদিন পালন ও উদযাপন পরবর্তী প্রায় ১০০ বৎসর কায়রোতে শিয়াদের মধ্যে এই উৎসব চালু থাকে। ৪৮৭ হি: (১০৯৪ খ্রিঃ) ফাতেমী খলীফা আল-মুস্তানসিরের মৃত্যু হলে সেনাপতি আল-আফযাল ইবন বদর আল-জামালীর সহযোগিতায় মুস্তানসিরের ছোট ছেলে ২১ বৎসর বয়স্ক আল-মুস্তা'লী খলীফা হন। সেনাপতি আফযাল সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হয়ে পড়েন। তিনি ৪৮৮ হিজরীতে ফাতেমীদের প্রচলিত ঈদে

^{১৯৯} যাহাবী, নুবালা, ১৫/১৬৪। আরো দেখুনঃ ইবনে খাল্লিকান, ওয়াফাইয়াতুল আউয়ান (ইরান, কুম, মানসুরাতুশ শরীফ আর-রাযী, ২য় সংস্করণ) ৫/২২৪-২২৮, আল-যিরিকলী, আল-আলাম বৈরুত, দারুল ইলম লিল মালানিন, ৯ম সংস্করণ, ১৯৯০) ৭/২৬৫

মীলাদুন্নবী উৎসব ও অন্যান্য জন্মদিনের উৎসব বন্ধ করে দেন। পরবর্তী কোন কোন ফাতেমী শাসক পুনরায় এ সকল উৎসব সীমিত পরিসরে চালু করেন, তবে ক্রমান্বয়ে ফাতেমীদের প্রতিপত্তি সঙ্কুচিত হতে থাকে এবং এ সকল উৎসব জৌলুস হারিয়ে ফেলে^{২৯০}।

ঈদে মীলাদুন্নবী ও মীলাদ আবিষ্কারের কাহিনী

চতুর্থ হিজরী শতাব্দীতে ফাতিমী গোত্রের তথাকথিত দাবিদার [যারা নিজেদেরকে ফাতিমাহ (رضي الله عنه) এর বংশধর বলে মিথ্যা দাবি করে] ‘উবায়দী গোত্রের শী‘আ শাসকগণ এবং তাদের মধ্যে সর্বপ্রথম আল মু‘য়িয লি দ্বীনিল্লাহ নামক শাসক মিশরে এই বিদ‘আত প্রবর্তন করে। অতঃপর ৬ষ্ঠ হিজরী শতাব্দীর শেষ দিকে অথবা ৭ম হিজরী শতাব্দীর শুরুর দিকে, বিখ্যাত ঐতিহাসিক যথাক্রমে ইবনু কাসীর ও ইবনু খালকানের মতে ইরদীল শহরের শাসক মুযাফ্ফার আবু সাঈদ মুযাফ্ফরুদ্দীন কুকুবুরী পুনরায় নব উদ্যমে এই বিদ‘আতটি চালু করে। আরও বিস্তারিতভাবে বলা যায় যে, ক্রসেড বিজেতা মিসরের সুলতান সালাহউদ্দীন আইয়ুবী (৫৩২ – ৫৮৯ হিজরী) কর্তৃক নিয়োজিত ইরাকের ‘এরবল’ এলাকার গর্ভনর মুযাফ্ফার আবু সাঈদ মুযাফ্ফরুদ্দীন কুকুবুরী (৫৮৬ – ৬৩০ হিজরী) সর্বপ্রথম কারও মতে ৬০৪ হিজরী ও কারো হিসাব মতে ৬২৫ হিজরীতে মীলাদের সূচনা ঘটে^{২৯১}। তাঁর এই মীলাদ

^{২৯০} ইজ্জত আলী আতিয়্যা, আল-বিদয়াত (বৈরুত, দারুল কিতাব আল-আরাবী, ২য় সংস্করণ, ১৯৮০) ৪১১ পৃ., ইসমাঈল বিন মুহাম্মাদ আল-আনসারী, আল-কাউলুল ফাসল (সৌদী আরব, রিয়াদ, আর-রিয়াসা আল-আমাহ লি ইদারাতিল বুহুস, ১৯৮৫) ৬৪-৭২

^{২৯১} মুহাম্মাদ জুনাগড়ী, মীলাদে মুহাম্মাদী (মউ, ইউ পি, ১৯৬৭, পৃষ্ঠা নং – ৫, আবুবকর আল-জাযায়েরী, অধ্যাপক মদীনা বিশ্ববিদ্যালয় (কুয়েত ছাপা, তাবি), পৃষ্ঠা নং – ৩১।

আবিষ্কারের পিছনের কাহিনী আর কিছুই নয় বরং মিথ্যা নাবী প্রেমের মহড়া দেখিয়ে জনসাধারণের মন জয় করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। যেমন তিনি প্রতি বছর মিলাদুন্নবী উৎসের নামে প্রাসাদের নিকট তৈরী অনূন ২০টি খানকাহে গান-বাদ্যের আসর বসাতেন। কখনও মহররম বা সফর মাস থেকেও এইসব গান-বাজনার মহড়া শুরু হত। এমনকি কবি, গায়কদের দিয়ে জোর করিয়ে এইসব বিদ'আতী আয়োজনের অনুষ্ঠান করত এবং ঈদে মিলাদুন্নবী আয়োজনের মাধ্যমে চরম স্বেচ্ছাচারিতায় লিপ্ত হত^{২৯২}। এ প্রসঙ্গে ইবনুল জাওয়ী (রহঃ) বলেনঃ গর্ভনর নিজে নাচে অংশ নিতেন^{২৯৩}। অধিকন্তু আরও বলা যায় যে, সে প্রতি বছর রাষ্ট্রীয় বিশাল অর্থ ব্যয় করে রাবী'উল আওয়াল মাসে মীলাদুন্নবী উপলক্ষে অত্যন্ত জমকালো অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে থাকে। আর এভাবেই এই জঘন্য বিদ'আতটি মুসলিম সমাজে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে।

অতএব বুঝা গেল, প্রচলিত মিলাদের প্রবর্তক বাদশা মুজাফফর ইসলামী বিধি বিধানের গুরুত্ব দিতেন না। গান বাজনায় লিপ্ত হতেন। ক্ষমতা ধরে রাখার জন্য রাষ্ট্রীয় অর্থ খরচ করে মিলাদের আয়োজন করতেন। আলেমদেরকে প্রলোভন দিয়ে ইচ্ছা মত ব্যবহার করতেন। অন্য দিকে যে আলেম প্রচলিত মিলাদ প্রবর্তনে সাহায্য করেন তার নাম মাজদুদ্দিন আবুল খাত্তাব উমার বিন হাসান বিন আলী বিন জমায়েল। তিনি নিজেকে সাহাবী দাহেয়াতুল কালবি

^{২৯২} তারিখু ইবনে খাল্লিকান, (বেরুত ছাপা, তাবি), ৪/১১৩-২১ পৃষ্ঠা।

^{২৯৩} আব্দুস সাত্তার দেহলোভী, মীলাদুন্নবী, পৃষ্ঠা নং - ২০, ৩৫।

এর বংশধর বলে দাবি করেন। অথচ তা ছিল মিথ্যা দাবি। কারণ দাহেয়াতুল কালবি (রাঃ) কোনো উত্তরসূরী ছিল না। তাছাড়া তার বংশধারায় মধ্যস্তন পূর্বপুরুষরা ধংসের মধ্যে নিপাপিত হয়েছিল। তারপরেও তার বর্ণিত বংশ ধারায় অনেক পুরুষের উল্লেখ নাই। (মিজানুল ইতিদাল (১/১৮৬) এই সরকারি দরবারী আলেম একটি পুস্তক রচনা করেন। এই পুস্তকে মিলাদের রূপরেখা বর্ণনা করা হয়। ৬০৪ হিজরীতে শাসক মুজাফ্ফারকে পুস্তকটি উপহার দেন। এতে তিনি খুশি হয়ে তাকে দশ হাজার দিনার বখশিশ দেন। আর সে বছর হতেই তিনি মিলাদুন্নবী পালন করতে শুরু করেন। (টিকা সিয়রু আলা মিনুবালা ১৫/২৭৪)^{২৯৪}। মিলাদ প্রথা আবিষ্কারের পরে সে সময়ের মানুষ বছরে একটি দিনে (১২ রবিউল আউয়াল) তা পালন করত এবং তা কয়েকদিন ধরে চলত। পরবর্তিতে ভক্তরা এটাকে সওয়াবের কাজ মনে করে বছরের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উপলক্ষে পালন করতে শুরু করে। আগে বড় ধরনের মাহফিলের আয়োজন করা হত। বর্তমান মনগড়া কিছু দুরুদ ও গজল গেয়ে শেষ করা হয়।

বাদশাহ্ চরিত্রের বর্ণনা দিতে গিয়ে কয়েকজন প্রখ্যাত আলেমদের উক্তি

এই বাদশাহ্ চরিত্রের বর্ণনা দিতে গিয়ে ইমাম আহমদ ইবনে মুহাম্মাদ মিসরী মালেকী উল্লেখ করেনঃ

^{২৯৪} সিয়রু আলা মিনুবালা ১৫/২৭৪

كانت ملكا مسرفا يأمر علماء زمانه ان يعملوا باستنباطهم واجتهادهم وان لا يتبعوا المذهب غيرهم
حتى مالت اليه جماعة من العلماء وطائفة من الفضلاء ويحتفل لمولد النبي صلى الله عليه وسلم
في الربيع الاول وهو اول من الملوك هذا العمل . القول المعتمد في عمل المل المولد

অর্থঃ সে ছিল একজন অপচয়ী বাদশাহ্। সে তার সময়কার উলামায়ে কেরামকে অন্যের মাযহাব অনুসরণ বর্জন করে নিজ নিজ ইজতিহাদ ও গবেষণা অনুসারে চলার নির্দেশ দিত। আর এতে দুনিয়া পুজারী উলামা ও ফুযালার একটি দল তার দিকে ঝুকে পড়ে। সে রবিউল আওয়ল মাসে মীলাদ-মাহফিলের আয়োজন করত। বাদশাহদের মাঝে এ-ই সর্বপ্রথম ব্যক্তি যিনি এই বিদ'আতের (মীলাদ-মাহফিলের) প্রচলন করেন। এ অপচয়ী বাদশাহ্ প্রজাদের অন্তরকে নিজের দিকে আকৃষ্ট ও অনুরক্ত রাখার জন্য এই বিদ'আত উৎসবের আয়োজন করত, আর তাতে জাতির বিপুল পরিমাণ অর্থ সম্পদ অকাতরে অপচয় করত। এ অপচয়ের বর্ণনা দিতে গিয়ে আল্লামা যাহাবী (রহঃ) বলেন,

كان ينفق كل سنة على مولد النبي صلى الله عليه وسلم نحو ثلاث مائة الف

অর্থঃ সে প্রতি সৎসর মীলাদ-মাহফিলে প্রায় তিন লাখ (দিরহাম/দীনার) ব্যয় করত।^{২৯৫}

দুনিয়ালোভী দরবারী মৌলভী উমার ইবনে হাছান ইবনে দেহইয়া আবুল খাত্তাব যিনি মীলাদ-মাহফিল ও জশনে জুলুসের স্বপক্ষে দলীল প্রমাণ সম্বলিত কিতাব রচনা করে বাদশাহর কাছ থেকে প্রচুর অর্থ কড়ি হাতিয়ে নিয়েছেন, তার ব্যাপারে হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ) বর্ণনা করেন,

^{২৯৫} দুয়ালুল ইসলাম ২/১০৩

كثير الواقعة في الائمة وفي السلف من العلماء خبيث اللسان احمق شديد المكر قليل النظر
في امور الدين متهاونا

অর্থাৎ, সে আইস্মায়ে দ্বীন এবং পূর্বসূরী উলামায়ে কেরামের ব্যাপারে অত্যন্ত আপত্তিকর ও গালিগালাজ মূলক কথাবার্তা বলত। সে ছিল দুষ্টভাষী, আহমক ও চরম ধোকাবাজ। আর ধর্মীয় ব্যাপারে ছিল চরম উদাসীন^{২৯৬}। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী আরো বর্ণনা করেনঃ

قال ابن النجار رايته الناس محتمين على كذبه وضعفه

অর্থাৎ ইবনে নাজ্জার (রহঃ) বলেন, আমি মানুষদেরকে তার (উমার ইবনে হাছান ইবনে দেহইয়া আবুল খাত্তাব-এর) মিথ্যা ও অবিশ্বাস যোগ্যতার উপর ঐক্যবদ্ধ বা একমত পেয়েছি।^{২৯৭}

সুতরাং উপরোক্ত বিবরণ থেকে বোঝা গেল যে, মীলাদ মাহফিল প্রচলনকারীদের একজন হলেন প্রতারক, ধূর্তবাজ বাদশাহ, আরেকজন হলেন স্বার্থান্বেষী দুনিয়ালোভী মৌলভী। আর তাদের সাথে মিলিত হয়েছেন ঐ সকল পীর, সুফী-যারা ধর্মীয় জ্ঞানের গভীরতায় পৌঁছেননি। এ তিন দলের সমন্বিত প্রয়াস ও অপপ্রচারে সাধারণ জনগণ হয়েছেন বিভ্রান্ত। আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহঃ) যথার্থই বলেছেন,

وهل افسد الدين الا الملوك + واحبار سوء ورهبانها

অর্থাৎ, রাজা বাদশাহ অসৎ পন্ডিত ও সাধুরাই ধর্মকে নষ্ট করে থাকে।

^{২৯৬} লিসানুল মীযান

^{২৯৭} ঐ

প্রচলিত মীলাদ-মাহফিল সম্পর্কে উলামায়ে কেরামের উক্তি

তাই সর্বযোগের হক পন্থীরা এবং সর্বস্তরের উলামায়ে কেরাম কঠোরভাবে এর (মীলাদ-মাহফিলের) বিরোধিতা করেছেন এবং বাতিল পন্থীদের সমস্ত ভ্রান্ত যুক্তি খন্ডন করেছেন। শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া হাম্বলী (রহঃ)^{২৯৮}, ইমাম নাসিরগদ্দিন শাফেঈ رشاد الاخيار গ্রন্থে, মুজাদ্দিদে আলফেসানী (রহঃ) مکتوبات ৫ম খন্ডের ২২ নং পৃষ্ঠায় এবং ইবনে আমীরুল হাজ্ব মালেকী (রহঃ) সুস্পষ্ট রূপে বর্ণনা করেছেন,

ومن جملة ما احدثوا من البدع مع اعتقادهم ان ذلك من اكبر العبادات
واظهار الشعائر ما يفعلون في الشهر الربيع الاول من المولد وقد احتوى ذلك
على بدع ومحرمات الى ان قال وهذه المفاصد مترتبة على فعل المولد اذا علم
بالسماع فان خلا منه وعمل طعاما فقط ونوى به المولد ودعا اليه الا خوان
وسلم من كل ما تقدم ذكره فهو بدعة بنفس نيته فقط لان ذلك زيادة في الدين
وليس من عمل السلف الماضين واتباع السلف اولى

আল্লামা আব্দুর রহমান মাগরীবী তার ফাতাওয়ায় উল্লেখ করেন,

ان عمل المولد بدعة لم يقل به ولم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم
والخلفاء الائمة
- كذا في الشريعة الالهية

অর্থাৎ মীলাদকর্ম বিদ'আত। রাসূল (ﷺ), খোলাফায়ে রাশেদীন ও ইমামগণ কেউ এ ব্যাপারে বলেননি এবং তা করেননি। আল্লামা আহমদ ইবনে মুহাম্মদ মিসরী মালেকী (রহঃ) লিখেন-

^{২৯৮} শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া হাম্বলী (রহঃ) তাঁর ফাতাওয়ার ১ম খন্ডের ৩১২ নং পৃষ্ঠা থেকে সংগ্রহীত।

قد اتفق علماء المذاهب الاربعة بدم هذا العمل - راه سنة از القول المعتمد في عمل المولد
অর্থাৎ মাযহাব চতুর্থয়ের উলামায়ে কেরাম এই কাজ (মীলাদ)
নিন্দনীয় হওয়ার ব্যাপারে ঐক্যবদ্ধ।

প্রচলিত মীলাদ পন্থীদের দলীল-প্রমাণ ও তার খন্ডন

পূর্বের বক্তব্যে সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, খাইরুল কুরুনে এই মীলাদ
মাহফিলের সূচনা হয়নি। বরং ৬ষ্ঠ শতাব্দির পর এর সূচনা হয়েছে।
সূচনা কারীদদের অবস্থা আলোচিত হয়েছে যে, তৎকালীন এক
বদকার বাদশাহ এর পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। আর গৃহিত এই
নীতির পরে সর্ব সাধারণের মাঝে এর ব্যপক প্রভাব পড়েছে যা এই
বিষয়ে উপরে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এমনকি বিশেষ
বিশেষ ব্যক্তিবর্গও এই বিভ্রান্তির শিকার হয়ে পড়েছেন। এত কিছু
পর মীলাদের স্বপক্ষে গ্রহণযোগ্য যুক্তি প্রমাণ না দিতে পেরে প্রসিদ্ধ
বিদআতী মৌলভী আব্দুস সামাদ সাহেব আরো অনেকে নিজেদের
আত্ম প্রশান্তি ও অনুসারীদের সান্তনা প্রদানের জন্য তিহাতরজন
মনীষীর তালিকা পেশ করেছেন, যারা মীলাদ অনুষ্ঠানকে পছন্দ
করতেন। কিন্তু এ তালিকায় সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন, আইম্মায়ে
মুজতাহিদীন এবং নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিছীনে কেরামের নাম নেই।
যাদের নাম আছে তাদের অধিকাংশই সূফীয়ায়ে কেরাম, মুজাদ্দিদে
আলফে সানী (রহঃ) এর কথা [হালাল হারামের ব্যাপারে সূফীদের
কথা সনদ নয়] অনুযায়ী যাদের আমল গ্রহণযোগ্য নয়। আর যে
কয়েকজন দার্শনিক আলেম রয়েছেন তারা ভ্রান্ত কিয়াসের শিকার
হয়েছেন। মুফতী আহমদ ইয়ার খান সাহেব মীলাদের স্বপক্ষে একটি

দলীল পেশ করেছেন যে, হারামাইন শরীফাইনে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে পবিত্র মীলাদ মাহফিলের আয়োজন করা হয় এবং যে রাষ্ট্রেই যাবে সেখানেই মুসলমানদের মাঝে এ কাজটি পাবে। বুয়ুর্গানে দ্বীন এবং উলামায়ে কেরাম এর বড় বড় ফায়দা বর্ণনা করেছেন। তিনি লিখেছেন, সবযুগেই সবস্থানেই উলামায়ে কেরাম, মাশায়েখ ও সাধারণ মুসলমান মুস্তাহাব জেনে আসছেন-“মুস্তাহাব হওয়া-এর জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, মুসলমান কাজটিকে ভাল জানে।”

যুক্তি খন্ডনঃ

এই দলীলের উত্তর হল - তখন এ হারামাইন শরীফাইনও ছিল, সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন, তাবে-তাবেঈন, আইম্মায়ে মুজতাহিদ্বীন তাঁরাও ছিলেন। তাঁরা কি মীলাদ মাহফিলের বরকত ও ফযীলত সম্পর্কে অবগত ছিলেন না? তবে কেন তাঁরা করেন নি? সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন, তাবে-তাবেঈন, আইম্মায়ে মুজতাহিদ্বীন সকলেই এমন একটি উত্তম কাজ পরিত্যাগ করেছেন তা কি মেনে নেয়া যায়? অথচ খুলাফায়ে রাশিদ্বীন সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেনঃ

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ مِنْ بَعْدِي، عَصُوا عَلَيْهَا بِالتَّوَاجِدِ،
وَأَيَّاكُمْ وَمُحَدَّثَاتِ الْأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحَدَّثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ.

অর্থ- তোমাদের উপর আবশ্যকীয় হলো আমার সুন্নাত এবং আমার পরে খুলাফায়ে রাশিদ্বীনের ছুন্নাত অবলম্বন করা, তোমরা একে মাড়ি দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরো (শক্ত করে আঁকড়ে ধরো) এবং তোমরা নব-আবিষ্কৃত বিষয়াদী হতে সাবধান থেকো! কেননা প্রতিটি নব-

আবিষ্কৃত বিষয়ই হলো বিদ'আত আর প্রতিটি বিদ'আতই হলো পথভ্রষ্টতা^{২৯৯}। তাছড়া শরী'আতের ভাষ্যসমূহ (نصوص) এর মাঝে হারামাইন শরীফাইনের অনেক ফযীলত ও মর্যাদার কথা এসেছে। তবে হারামাইন শরীফাইন তথা সেখানকার আমল শরী'আতের দলীল নয়। সেখানে শরী'আত পরিপন্থী কাজের প্রচলনও হয়ে পড়তে পারে। শরী'আতের দলীল মাত্র দুটি যথা পবিত্র কুরআন এবং সহীহ হাদীস। তাই হারামাইন শরীফাইনে যদি কোন ভাল কাজ হয় তাহলে ভাল نور على نور। অন্যথায় কক্ষনো তা দলীল হতে পারে না। হারামাইনেও মাঝে মধ্যে অন্যায় কর্ম সংঘটিত হয়েছে তার প্রমাণ রয়েছে।

মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ) এক সময়কার হারামাইন শরীফাইনের অবস্থার বিবরণ দিয়ে বলেছেনঃ

في الحرمين الشريفين من شيوخ الظلم وكثرة الجهل وقلة العلم وظهور المنكرات وفشو البدع
والسيئات واكل الحرام والشبهات

অর্থাৎ, হারামাইন শরীফাইনের মাঝে অন্যায় অত্যাচার ব্যাপক লাভ করেছে, অজ্ঞতা বেড়ে গেছে, ইলম কমে গেছে, অপ্ৰীতিকর কার্যকলাপ সংঘটিত হচ্ছে, বিদ'আত প্রসার লাভ করেছে, হারাম ও সন্দেহপূর্ণ জিনিস খাওয়া বেড়ে গেছে।^{৩০০} অতএব হারামাইন শরীফাইন দলীল হতে পারে না। আর মুফতী আহমদ ইয়ার খান সাহেব বলেছেন, মুস্তাহাব হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, মুসলমান সেটাকে ভাল জানে। অথচ মুস্তাহাব তো অনেক - উঁচু

^{২৯৯} সহীহ ইবনু মাজাহ, তাহকীক আলবানী, হা/৯৭

^{৩০০} মেরকাত ৫ম খন্ড ৬১৪ নং পৃষ্ঠা

জিনিস বরং (মোবাহ হওয়াটা) ও শরী'আতের একটি হুকুম যা নবী কারীম (সাঃ) এর কথা বা কাজ ছাড়া প্রমাণিত হয় না। এ ব্যাপারে আল্লামা শামী (রহঃ) লিখেছেন,

الاستحباب حكم شرعى لا بدله من دليل

অর্থাৎ, মুস্তাহাব হওয়া শরী'আতের একটি হুকুম। তাই তার জন্য দলীলের প্রয়োজন রয়েছে।

সারকথা – মিলাদ মাহফিল করা বৈধ নয়

উপরের এই সুদীর্ঘ আলোচনা থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, প্রচলিত মীলাদ-মাহফিল বিদ'আত এবং দ্বীন-বহির্ভূত বিষয়। মিলাদ মাহফিল করা বিদ'আত। হিজরী চতুর্থ শতাব্দীতে উবায়দীরা এ বিদ'আতের প্রবর্তন করে।

বর্তমান ও পূর্বকার সকল উলামায়ে কেরাম একে বাতিল বলে আখ্যায়িত করেছেন। যারা এ ধরনের বিদ'আতের প্রবর্তন করেছে ও আমল করেছে, উলামায়ে কেরাম তাদের প্রত্যাখ্যান করেছেন। তাই মিলাদ মাহফিল করা বৈধ নয়। কারণ :

১ম কারণঃ যে সকল কুসংস্কারের ব্যাপারে শরীয়তে কোন প্রমাণ নেই; তার অন্যতম হল মিলাদ মাহফিল। কেননা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে এ প্রসঙ্গে কোন বক্তব্য, আমল বা সমর্থন পাওয়া যায় না। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

অর্থঃ রাসূল যা কিছু নিয়ে এসেছেন তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাক^{৩০১}। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ
(২১: كَثِيرًا). (الأحزاب)

অর্থঃ অবশ্যই আল্লাহর রাসূলের জীবনের মাঝে রয়েছে উত্তম আদর্শ
ঐ ব্যক্তির জন্য, যে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও কিয়ামত দিবসে (মুক্তির)
আশা করে। আর অধিক পরিমাণে আল্লাহকে স্মরণ করে^{৩০২}। রাসূল
(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ

مَنْ أَخَذَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ. (بخاري ومسلم)

অর্থঃ যে আমাদের দ্বীনের মধ্যে এমন কিছু প্রবর্তন করে যা এর
অন্তর্ভুক্ত নয়, তা প্রত্যাখ্যাত^{৩০৩}।

২য় কারণঃ খোলাফায়ে রাশেদীন এবং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়া সাল্লাম) এর অন্যান্য সাহাবীগণ মিলাদ মাহফিল করেননি।
এমন কি তার দাওয়াতও দেননি, অথচ তারাই হচ্ছেন নবী
(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পর সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত।

খুলাফায়ে রাশেদীনের মর্যাদা সম্পর্কে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ

فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا
(بِالتَّوَّاجِدِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحَدَّثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ). (أبو داود)

^{৩০১} হাশর : ৭

^{৩০২} আহযাব : ২১

^{৩০৩} বুখারী : ২৬৯৭ ও মুসলিম : ১৭১৮

অর্থঃ তোমাদের জন্য আবশ্যিক আমার ও আমার পরবর্তী হেদায়াত প্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদার সুন্নাতকে এমনভাবে আঁকড়ে ধরা যেভাবে দাঁত দিয়ে কোন জিনিস দৃঢ়ভাবে কামড়ে ধরা হয়। আর শরীয়তে নিত্য নতুন জিনিস আবিষ্কার করা হতে বেঁচে থাক। কেননা সকল নবসৃষ্ট বস্তুই বিদ'আত। আর প্রত্যেক বিদ'আত ই গোমরাহী^{৩০৪}।

৩য় কারণঃ মীলাদ মাহফিল করা বক্রতা সৃষ্টিকারী পথভ্রষ্টদের প্রথা। এ প্রথাকে সর্ব প্রথম ফাতেমী ও উবাইদী গোত্রের লোকেরা হিজরী চতুর্থ শতাব্দীতে প্রবর্তন করে। তারা নিজেদেরকে ফাতেমা (রা) এর সাথে সম্পৃক্ত করে, যা অন্যায়, অযৌক্তিক ও অপবাদ ব্যতীত আর কিছুই নয়। মূলতঃ তারা ইহুদী। কেউ বলেন, তারা অগ্নিপূজক, আবার কেউ বলেন, তারা মূলহিদ্দীন বা নাস্তিক। তাদের প্রথম ব্যক্তি হল, মুইজুদ্দীন ওবায়দী। সে পাশ্চাত্যের অধিবাসী। সেখান থেকে সে ৩৬১ হিজরীর শাওয়াল মাসে মিশরে আগমন করে এবং ৩৬২ হিজরী রমজান মাস পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করে^{৩০৫}। এখন কোন বুদ্ধিমানের জন্য এটা কি উচিত হবে যে, সে রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সুন্নাত ছেড়ে একজন ইহুদীর অনুসরণ করবে? (আদৌ নয়)।

৪র্থ কারণঃ আল্লাহ তা'আলা এ দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ

﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَأَتَمَّمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ (المائدة)

^{৩০৪} বুখারী : ২৬৯৭ ও মুসলিম : ১৭১৮

^{৩০৫} বিদায়া ওয়ান নিহায়া-ইবনে কাসীর: ১১/২৭২-৭৩

অর্থঃ আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন পরিপূর্ণ করে দিলাম ও আমার নিয়ামত সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে দ্বীন হিসেবে মনোনীত করলাম^{৩০৬}।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পরিপূর্ণভাবে দ্বীনের প্রচার করেছেন। জান্নাতে পৌঁছার সকল পথ ও জাহান্নাম হতে বাঁচার সকল উপায় উম্মতের সামনে বর্ণনা করে দিয়েছেন। একথা সকলের জানা যে, আমাদের রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সকল নবীগণের সর্দার এবং তিনি সর্বশেষ নবী, পরিপূর্ণভাবে দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছিয়েছেন এবং আল্লাহর বান্দাদের কল্যাণ কামনা করেছেন।

সুতরাং যদি মীলাদ মাহফিল দ্বীনের অংশ হতো আর আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের কারণ হতো, তাহলে অবশ্যই তিনি তা উম্মতের জন্য বর্ণনা করতেন বা তাঁর জীবনে একবার হলেও আমল করে দেখাতেন।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ

مَا بَعَثَ اللَّهُ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ يَذُلَّ أُمَّتُهُ عَلَى خَيْرِ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ، وَيُنْذِرُهُمْ
(شَرَّ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ). (مسلم)

অর্থঃ আল্লাহ যত নবী প্রেরণ করেছেন তাদের সকলের উপর দায়িত্ব ছিল উম্মতকে ভাল কাজের দিক নির্দেশনা দেয়া ও অন্যায় কাজ হতে ভীতি প্রদর্শন করা^{৩০৭}।

৫ম কারণঃ মীলাদ মাহফিলের মত বিদ'আত আমলের আবিষ্কারের মাধ্যমে এ কথা প্রতীয়মাণ হয় যে, আল্লাহ তা'আলা দ্বীনকে এ

^{৩০৬} মায়দা: ৩

^{৩০৭} মুসলিম: ১৮৪৪

উম্মতের জন্য পরিপূর্ণ করেননি, তাই দ্বীনের পরিপূরক কিছু আবিষ্কারের প্রয়োজন হয়েছে। তেমনি একথাও বুঝা যায় যে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উম্মতের জন্য কল্যাণকর সকল বিষয়ের তাবলীগ বা প্রচার করেননি।

যে কারণে পরবর্তীতে আল্লাহর অনুমোদন ব্যতিরেকে শরীয়তে নতুন কিছু আবিষ্কারের প্রয়োজন দেখা দেয়। এর মাধ্যমে তারা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে চায়। এটা চূড়ান্ত পর্যায়ের অন্যায় ও ভুল। এটা আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উপর অভিযোগ অথচ আল্লাহ তা'আলা তাঁর দ্বীনকে পরিপূর্ণ ও বান্দাদের জন্য সকল নিয়ামত সম্পূর্ণ করে দিয়েছেন।

৬ষ্ঠ কারণ : এ উম্মতের বড় বড় আলেমগণ কুরআন ও হাদীসের ভিত্তিতে মীলাদ মাহফিলের প্রতি অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। তারা বিদ'আত পরিহার করতে ও রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর অনুসরণ করতে বলেন এবং কথা, কাজ ও আমলে তাঁর বিরোধিতা করা হতে সতর্ক করেন।

৭ম কারণ : মীলাদ মাহফিলের দ্বারা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ভালবাসা অর্জিত হয় না বরং তাঁর অনুসরণ ও সুন্নাত অনুযায়ী আমলের দ্বারা তা অর্জিত হয়। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ
(৩১: غَفُورٌ رَحِيمٌ) (আল عمران)

অর্থঃ হে নবী (আপনি বলে দিন, তোমরা যদি আল্লাহর ভালবাসার দাবি কর, তাহলে আমার অনুসরণ কর। ফলে আল্লাহ তোমাদের ভালবাসবেন এবং তোমাদের সকল গুনাহ মাফ করে দিবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু^{৩০৮}।

৮ম কারণ : মীলাদ মাহফিল, জসনে জুলুস ও ঈদে মিলাদুন্নবী ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের উৎসবের সাদৃশ্য। আর ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের সাদৃশ্য অবলম্বন করতে ও তাদের অনুসরণ করতে আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিষেধ করেছেন^{৩০৯}।

৯ম কারণঃ সারাদেশে মীলাদ মাহফিলে অধিক হারে লোক সমাগম দ্বারা জ্ঞানী লোকেরা কখনও প্রভাবিত হয় না। কেননা সঠিক ও সত্য হওয়াটা মানুষের আধিক্যতা দ্বারা বুঝা যায় না বরং শরীয়তের দলিলের মাধ্যমে বুঝা যায়। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ

وَإِنْ تُطِيعُوا أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. (الأنعام)

অর্থ : যদি আপনি দুনিয়ার সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকদের অনুকরণ করেন, তাহলে তারা আপনাকে আল্লাহর পথ হতে বিচ্যুত করে দেবে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ

وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ. (يوسف)

অর্থ : যদিও আপনি মনে প্রাণে চান তবুও অধিকাংশ লোক ঈমানদার নয়^{৩১০}। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ

وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ. (السبا)

^{৩০৮} আল-ইমরান: ৩১

^{৩০৯} যাদুল মায়াদ-ইবনে কাইয়্যাম (র): ১/৫৯

^{৩১০} ইউসুফ: ১০৩

অর্থ : আমার বান্দাদের কম সংখ্যকই কৃতজ্ঞ^{৩১১}।

১০ম কারণ : শরয়ী নীতিমালার যে সকল ব্যাপারে মানুষ বাক-বিতণ্ডা ও ঝগড়া করে, সে সকল বিষয়ে কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাতে রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অনুসরণ করা উচিত। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ (٥٩) :تَأْوِيلًا. (النساء)

অর্থঃ হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের অনুগত হও এবং তোমাদের নেতৃবৃন্দের আনুগত্য কর। অতঃপর যদি তোমাদের মধ্যে কোন বিষয়ে মত বিরোধ দেখা দেয় তবে আল্লাহ ও রাসূলের দিকে প্রত্যাবর্তিত হও যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে থাক। এটাই কল্যাণকর ও শ্রেষ্ঠতর^{৩১২}। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ

وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ.

অর্থঃ তোমরা যে বিষয়েই মতভেদ কর না কেন ওর মীমাংসাতো আল্লাহরই নিকট^{৩১৩}।

নিঃসন্দেহে যে ব্যক্তি মীলাদ মাহফিলের ব্যাপারে আল্লাহ ও রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দিক নির্দেশনার প্রতি ধাবিত হবে, সে জানতে পারবে, আল্লাহ তা'আলা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

^{৩১১} সাবাহ: ১৩

^{৩১২} নিসা: ৫৯

^{৩১৩} আশ-শুবা: ১০

সাল্লাম) এর অনুসরণের নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেনঃ

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

অর্থ : রাসূল তোমাদের কাছে যা নিয়ে এসেছেন তা গ্রহণ কর এবং যা হতে নিষেধ করেছেন তা হতে বিরত থাক^{৩৪}। আল্লাহ তাআলা দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ ও পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মীলাদ মাহফিলের জন্য কাউকে নির্দেশ দেননি, তিনি এবং তাঁর সাহাবীগণও তা কখনও করেননি। সুতরাং মীলাদ মাহফিল দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত নয়। বরং তা নব্যসৃষ্ট বিদ'আত।

১১তম কারণঃ সোমবার সিয়াম পালন শরীয়ত সিদ্ধ। কেননা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে সোমবারের সিয়াম সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে, তিনি বলেন,

ذَلِكَ يَوْمٌ وَلِدْتُ فِيهِ، وَيَوْمٌ بُعِثْتُ أَوْ أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهِ. (مسلم)

অর্থঃ এটা এমন দিন যে দিন আমি জন্ম গ্রহণ করেছি, আমি নবুওয়াত প্রাপ্ত হয়েছি অথবা আমার প্রতি সেদিন কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে^{৩৫}। সুতরাং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর আদর্শ হল সোমবার সিয়াম পালন করা, তবে এ উপলক্ষে মীলাদ মাহফিল করা বৈধ নয়।

১২তম কারণঃ ঈদে মীলাদুন্নবী উদযাপন করা গর্হিত ও নিষিদ্ধ বিষয়াবলীর অন্যতম। আর তা বুঝা যায় এ ধরনের মাহফিলে

^{৩৪} হাশর : ৭

^{৩৫} সহীহ মুসলিম

উপস্থিত হওয়া দ্বারা। এ ধরনের গর্হিত কাজের কিছু উদাহরণ নিম্নে উল্লেখ করা হল।

১। মীলাদে অংশগ্রহণকারীদের রচিত অধিকাংশ কবিতা ও স্ততিমূলক বাক্যগুলোতে শিরকী ও বাড়াবাড়িমূলক কথা পাওয়া যায়। অথচ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর প্রশংসা করার ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করে বলেন,

لَا تُظَرُونِي كَمَا أَظَرَّ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ

অর্থঃ তোমরা আমার প্রশংসার ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করো না, যেমন খ্রীষ্টানরা ইবনে মারইয়ামের প্রশংসার ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করেছিল। নিশ্চয়ই আমি আল্লাহর বান্দা। সুতরাং তোমরা বল আল্লাহর বান্দা ও রাসূল^{৩৬}।

২। মীলাদ মাহফিলে অনেক ক্ষেত্রে হারাম কাজ হয়ে থাকে। যেমন নারী-পুরুষ মিলেমিশে বসা, গান-বাদ্য করা, মদ-গাজা সেবন ইত্যাদি। আর কখনও কখনও এতে শিরকে আকবরও সংঘটিত হয়। যেমন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কাছে বা অন্য কোন ওলীর কাছে সাহায্য চাওয়া, আল্লাহর কিতাবের অসম্মান করা, কুরআনের মজলিসে ধূমপান করা ইত্যাদি। মীলাদের দিনগুলোতে উচ্চস্বরে মসজিদে জিকির করা ও সুর করে শরীয়ত পরিপন্থী কবিতা আবৃত্তি করা। যা হক্কানী আলেমগণের ঐকমত্যে শরীয়ত সম্মত নয়।

^{৩৬} বুখারী : ৩৪৪৫

৩। মীলাদ মাহফিলে আরো কিছু গর্হিত কাজ সংঘটিত হয়। যেমন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর জন্মের ঘটনা আলোচনা কালে তাঁর সম্মানার্থে দাঁড়ান এই বিশ্বাস নিয়ে যে, তিনি এ মীলাদ মাহফিলে উপস্থিত হয়েছেন। তাই তাঁর অভ্যর্থনার জন্য দাঁড়িয়ে যায়। আর এ সবই চরম ভ্রান্তি ও মূর্খতা যা নিন্দিত। কেননা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কিয়ামতের পূর্বে কবর থেকে বের হবেন না। কোন লোকের সাথে সাক্ষাত করবেন না, কোন সম্মেলনে উপস্থিত হবেন না। বরং তিনি কিয়ামত পর্যন্ত নিজ কবরে অবস্থান করবেন। আর তাঁর রুহ ইল্লিয়ানের সর্বোচ্চ স্তরে তাঁর প্রভুর কাছে সম্মানিত স্থানে রয়েছে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেনঃ

ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ، ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ

অর্থঃ এরপর তোমরা অবশ্যই মৃত্যুবরণ করবে। অতঃপর কিয়ামতের দিন তোমাদের পুনরুত্থিত করা হবে^{৩৭}। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ

أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَوَّلُ مَنْ يَنْشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ وَأَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفِّعٍ

অর্থঃ আমি কিয়ামতের দিন আদম সন্তানের নেতা, সর্ব প্রথম কবর থেকে উত্থিত ব্যক্তি, সর্বপ্রথম সুপারিশকারী এবং সর্বপ্রথম আমার সুপারিশ গ্রহিত হবে^{৩৮}।

উক্ত আয়াত, হাদীস এবং এ জাতীয় আয়াত ও হাদীসসমূহ থেকে বুঝে আসে যে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অন্যান্য

^{৩৭} মুমিনুন : ১৫-১৬

^{৩৮} মুসলিম : ২২৭৮

মৃতদের ন্যায় মৃত। তিনি কিয়ামতের দিন কবর থেকে উত্থিত হবেন। আব্দুল আযীয ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে বায বলেন, এ বিষয়ে সমস্ত আলেমের ঐকমত্য রয়েছে, এতে কারো মতবিরোধ নেই^{৩১৯}।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ - কিয়াম - নব আবিষ্কৃত বিদ'আত

কিয়াম কাকে বলে

“কিয়াম” শব্দের আভিধানিক অর্থ দাঁড়ানো। আর মুআশারা তথা সমাজ সামাজিকতার পরিভাষায় “কিয়াম” বলতে বোঝায় কারও আগমনে দাঁড়ানো। আর মীলাদ প্রসঙ্গে উল্লেখিত কিয়াম দ্বারা বোঝানো হয় বিশেষ ধরনের কাসিদা পাঠ করার পর রাসূল (সাঃ) মজলিসে হাজির হয়ে গেছেন ধারণায় “ইয়া নবী...” বলার সময় দাঁড়িয়ে যাওয়া এবং দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দুরূদ পাঠ করা।

কিয়াম প্রচলনের ইতিহাস

প্রচলিত মিলাদের সাথে আর একটি প্রথা সংযোজিত হয়েছে। তা হল রাসূল (সাঃ) এর সম্মানাথে দাড়ান। এটি মৌলিক বিদ'আতের অন্তর্ভুক্ত। সম্পূর্ণ অপ্রাসাংগিক একটি বিষয় মিলাদের সাথে জুড়ে দেয়া হয়েছে। এটি মিলাদের পরে আবিষ্কৃত হয়েছে। ৭৫১ হিজরির কথা। খাজা তকিউদ্দিন ছিলেন একজন ভাব কবি ও মাজযুব (ভাবাবেগে উদ্বেলিত) ব্যক্তি।

মহানাবী (সাঃ) এর নামে তিনি বিভিন্ন কাসিদা রচনা করেন। বরাবরের ন্যায় একদিন তিনি কাসিদা পাঠ করছিলেন। বসা থেকে ভাবাবেগে হঠাৎ তিনি দাঁড়িয়ে কাসিদা পাঠ করতে থাকলেন।

^{৩১৯} আত-তাহযীর মিনাল বিদআ : ১৪

ভক্তরাও তার দেখা দেখি দাঁড়িয়ে গেল। বাস, ঘটনা এখানেই শেষ। তিনি আর কখনো এমনটি করেননি। এখানে একটা বিষয় লক্ষ্যণীয় যে, খাজা তকিউদ্দিন কবিতা পাঠ করতে করতে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন। এটি কোন মিলাদের অনুষ্ঠান ছিল না। তিনি অনিচ্ছাকৃত দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু মিলাদের জন্মের একশত বছর পরে বিদ'আত পন্থীরা এটিকে মিলাদের সাথে জুড়ে দেয়। ফলে কিয়াম বিশিষ্ট মিলাদ বিদ'আত হওয়ার বিষয়টি আরো স্পষ্ট হয়ে উঠে। বস্তুত আমাদের দেশে এমন অনেক বিদ'আত রয়েছে জা বুজুগদের বিশেষ মুহূর্তের আমল থেকে সৃষ্ট। অতএব, সংশ্লিষ্ট বুজুগ কখনো তার ভক্তদের এসব করার নিদেশ দেননি, অনুসারীরা অজ্ঞতাবশত এসব কাজ চালু করেছে।

সমাজ-সামাজিকতায় কিয়ামের হুকুম

কোন বুয়ুগ তথা সম্মানী ব্যক্তি যখন স্বশরীরে আগমন করেন, তখন কোন কোন মুহূর্তে কোন ধরনের বাড়াবাড়ি ছাড়াছাড়ি ছাড়া ক্লেয়াম করা (আগন্তুক ব্যক্তির সম্মানে দাঁড়িয়ে যাওয়া) বৈধ। এ ব্যাপারে ইমাম নববী (রহঃ) **قوموا الى سيدكم** (অর্থাৎ, তোমরা তোমাদের নেতার কাছে গিয়ে দাঁড়াও) হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন।

অন্যান্য উলামায়ে কেরাম এর ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন এ ভাবে যে, হযরত সাআদ ইবনে মু'আয (রাঃ) আঘাত প্রাপ্ত ছিলেন। নবী কারীম (সাঃ) তাঁকে গাঁধার পিঠ থেকে নামানোর জন্য মজলিস থেকে উঠেছিলেন। এটা কোন সম্মান প্রদর্শনের নিমিত্তে দাঁড়ানো নয়। এ ব্যাপারে মুসনাদে আহমদে বিবরণ নিম্নরূপঃ

অর্থাৎ, তোমরা তোমাদের নেতার কাছে গিয়ে দাঁড়াও তাঁকে গাঁধার পিঠ থেকে নামাও। এজন্যই **إلى سيدكم** “তোমাদের নেতার কাছে” কথাটা বলেছে- **لسيدكم** “নেতার জন্য” কথাটা বলেননি”^{৩২০}। যা হোক উপরোক্ত হাদীস অকাট্য অর্থ বোধক না হওয়ায় এ ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরামের আমল কি ছিল এবং নবী কারীম (সাঃ) কোন আমলটিকে পছন্দ করতেন, তা দেখা দরকার এবং সেটাই হবে আমাদের আমল। আর এ বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে যানা যায় হযরত আনাস (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীস দ্বারা-

عن انس قال - لم يكن شخص احب اليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا اذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهيته لذلك - رواه الترمذی في ابواب الاستيذان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - باب ماجاء في ركاية قيام الرجل للرجل وقال هذا حديث حسن صحيح غريب ورواه احمد حديث رقم ۱۲۴۸۵ واسناده صحيح كذا في هامشه

অর্থাৎ, হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, সাহাবায়ে কেরামের কাছে নবী কারীম (সাঃ) এর জাত মোবারকের চেয়ে বড় সম্মানের ও প্রিয় এ দুনিয়াতে আর কোন কিছুই ছিল না, এতদসত্ত্বেও তাঁরা নবী কারীম (সাঃ) কে দেখলে কিয়াম করতেন না। যেহেতু তারা জানতেন নাবী কারীম (সাঃ) এ কাজটিকে (তাঁর সম্মানে দাড়িয়ে যাওয়া কিয়াম করাকে) অপছন্দ করেন^{৩২১}।

উল্লেখিত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, নাবী কারীম (সাঃ) নিজের জন্য কিয়াম করাকে অপছন্দ করতেন। তাই সাহাবায়ে কেরাম নাবী কারীম (সাঃ) এর প্রতি চরম ভালবাসা ও মহব্বত পোষণ করা

^{৩২০} মুসনাদে আহমদ

^{৩২১} তিরমিযী ও মুসনাদে আহমদ

সত্বেও নবী কারীম (সাঃ) যখন স্বশরীরে উপস্থিত হতেন তখন তাঁকে দেখতে পেয়েও তাঁরা দাঁড়াতে না। কেননা, নাবী কারীম (সাঃ) এর জীবদ্দশায় ও তাঁর জন্য কিয়াম করা হত না এবং তিনি তাঁর উদ্দেশ্যে কিয়াম করা তথা দাঁড়িয়ে যাওয়াকে পছন্দ করতেন না। তদুপরি মীলাদ-মাহফিলে রাসূল (সাঃ) এর নাম আসলে সেখানে রাসূল (সাঃ) এর আগমন ঘটে এটা শরী‘আতের কোন দলীল দ্বারাও প্রমাণিত নয় বরং রাসূল (সাঃ) এর উদ্দেশ্যে দুরূদ পাঠ করা হলে তিনি সেখানে হাজির হন না বরং নির্ধারিত ফেরেশতারা রাসূল (সাঃ) এর কাছে সে দুরূদ পৌঁছে দেন - এ কথা স্পষ্ট হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

হাদীসে এরশাদ হয়েছে, হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন যে, রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেছেন,

عن ابى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى على عند قبرى سمعته ومن صلى على ناءيا ابلغته رواه البيهقى في شعب الايمان في باب في تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم واجلاله وتوقيره - حديث رقم ١٥٨٣ وللحديث شواهد ساقها البخارى في القول البديع

অর্থাৎ, যে আমার কবরের নিকট এসে আমার উপর দুরূদ পাঠ করবে আমি তা সরাসরি শুনব, আর যে দূরে থেকে আমার উপর দুরূদ পাঠ করবে তা আমার নিকট পৌঁছানো হবে (শুআবুল ইমান)।

অন্য এক হাদীসে ইরশাদ হয়েছে,

عن عبيد الله بن مسعود رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله ملئته سياحين في الارض يبلغوني من امتى السلام رواه الدررى في كتاب الرقاق - باب في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم . حديث رقم ٢٧٧٤

ورواه النسائي في كتاب الافتتاح - باب التسليم على النبي . واسناده صحيح كذا في هامشه
 صلى الله عليه وسلم . ورواه ابن حبان صحيحه . حديث رقم ٩٠٢ . واللفظ للداري
 অর্থাৎ, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন যে, রাসূল
 (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, আল্লাহর কতক ফেরেশতারা রয়েছেন, যারা
 পৃথিবীতে ভ্রমণ করেন এবং আমার উম্মতের সালাম আমার নিকট
 পৌঁছান^{৩২২}।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ - কিয়াম সম্পর্কে বিদ'আতীদের বক্তব্য ও তার খন্ডন

বিদ'আতীদের বক্তব্য হল মীলাদ-মাহফিলে রাসূল (সাঃ) এর নাম
 আসলে তিনি মজলিসে হাজির হয়ে যান। তাই তাঁর সম্মানার্থে
 কিয়াম করতে হবে অর্থাৎ দাঁড়িয়ে যেতে হবে। বিদ 'আতীগণ এই
 কিয়াম করাকে জায়েয এবং মুস্তাহাব হিসাবে গন্য করেন। এমনকি
 এটাকে ওয়াজিব ও ফরয বলেও আখ্যায়িত করেন। আর কিয়াম না
 করলেওয়ালাদেরকে কাফের পর্যন্ত বলা হয়। (এ কথার বরাত একটু
 পরেই উল্লেখ করছি)।

খন্ডন

পূর্বোল্লিখিত হাদীসে স্পষ্ট রাসূল (সাঃ) বলেছেন যে, তাঁর কাছে
 দূরুদ সালাম পৌঁছে দেয়া হয়, তিনি হাজির হন না। অথচ
 বিদ'আতীগণ বলেছেন তার বিপরীত। হাদীসে বর্ণিত আকীদার
 বিপরীত কোন বিষয় কিভাবে মুস্তাহাব এমনকি ফরয হয়ে যায় তা
 বোধগম্য নয়। আর যারা হাদীসে বর্ণিত আকীদা মোতাবেক মীলাদের

^{৩২২} নাসায়ী, দারিমী ও ইবনে হিব্বান

মজলিসে রাসূল (সাঃ) এর হাজির না হওয়ার আকীদা রাখেন, তারা কিভাবে কাফের হয়ে যান তা আরও অবোধগম্য বৈ কি? যারা কুরআন হাদীসের বর্ণনা মোতাবেক আকীদা পোষণ করেন তাদেরকে কাফের আখ্যায়িত করা, পক্ষান্তরে যারা কুরআন হাদীসের বর্ণনার বিপরীত আকীদা পোষণ করেন তাদেরকে খাঁটি মুসলমান মনে করাটা কি কুফরি নয়? সুতরাং ‘মিলাদ’ এবং ‘কিয়াম’ শব্দদ্বয় ইসলামে নব আবিষ্কার। নাবী করিম (সাঃ) এর ওফাতের ৬০০ বছর পর, ইমাম চতুষ্ঠয়ের ৪০০ বৎসরেরও অধিক সময় পর ‘মিলাদ’ এবং কিয়াম শব্দদ্বয় আবিষ্কৃত যা উপরে আলোচনা করা হয়েছে। তাই মিলাদ এবং কিয়াম আবিষ্কারের আলোচনার সারাংশে বলা যায় যে, এটিও প্রকাশ্য বিদ’আত যা নাবী করিম (সাঃ) বা সাহাবী বা তাবা-তাবিঈ কর্তৃক স্বীকৃত বা অনুসৃত নয়^{৩২৩}। কয়েকটি কারনে ঈদে মিলাদুন্নাবী এবং প্রচলিত মীলাদ কেন বিদ’আত তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো:-

১. মহানবীর (সাঃ) জন্মদিন পালন করা যা বিজাতীয় সংস্কৃতি। যেমন হিন্দুরা শ্রী কৃষ্ণের, খৃষ্টনরা ঈসা (আঃ) জন্মদিন পালন করে।
২. রবিউল আউয়াল মাসের ১২ তারিখ তার জন্য নির্ধারিত করা।
৩. প্রচলিত মীলাদ মাহফিলে অতিরঞ্জন করে দুরুদ পাঠের জন্য নিদিষ্ট করা।
৪. মুহাম্মাদ (সাঃ) এর আত্মা উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছে মনে করে দাঁড়ানো।

^{৩২৩} বিদ’আত – মোসাদ্দেক আহম্মাদ, পৃষ্ঠা নং – ১৪০

উপরোক্ত আলোচনার পর বিষয়টি আরও বিস্তারিতভাবে উপস্থাপন করে নিম্নে আলোচনা করা হলোঃ

পূর্ববর্তী এবং বর্তমান সময়ের প্রায় সকল হাক্কানী ‘উলামায়ে কিরাম ‘ঈদে মীলাদুন্নাবী কিংবা মীলাদুন্নাবী অনুষ্ঠান পালনকে নিম্নোক্ত দালীল ও সুস্পষ্ট কারণ সমূহের ভিত্তিতে বিদ’আত ও হারাম বলে অভিহিত করেছেন। যে সব বিশুদ্ধ দালীল ও সুস্পষ্ট কারণের ভিত্তিতে ‘উলামায়ে কিরাম এটিকে বিদ’আত ও নিষিদ্ধ বা হারাম, বলেছেন, তন্মধ্যে কয়েকটি হলো নিম্নরূপঃ

১) এটি দ্বীনে ইসলামের মধ্যে নব-আবিষ্কৃত একটি বিষয়। কেননা এর পক্ষে আল্লাহ (سبحانه وتعالى) কোন প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি। রাসূলুল্লাহ্‌ও (ﷺ) তাঁর কথা, কাজ কিংবা কোনরূপ অনুমোদন দ্বারা এ কাজটি প্রবর্তন করেননি। অথচ তিনি হলেন আমাদের অনুসরণীয় ও ইমাম। ক্বোরআনে কারীমে আল্লাহ (سبحانه وتعالى) ইরশাদ করেছেনঃ

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا.

অর্থাৎ- রাসূল তোমাদেরকে যা কিছু দিয়েছেন তোমরা তা অবলম্বন করো, আর যা কিছু থেকে তিনি তোমাদেরকে বারণ করেছেন তা থেকে বিরত থাকো^{৩২৪}। রাসূল (ﷺ) এ প্রসঙ্গে বলেছেনঃ-

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، وَوَكَيْعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ "

^{৩২৪} সূরা হাশর, আয়াত নং - ৭

যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করল সে যেন আল্লাহরই আনুগত্য করল। আর যে ব্যক্তি আমাকে আমাকে অমান্য করল সে যেন আল্লাহকেই অমান্য করল^{৩২৫}। আল্লাহ (سبحانه وتعالى) এ প্রসঙ্গে আরো ইরশাদ করেছেনঃ

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا.
অর্থাৎ- নিশ্চয় তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহর মধ্যে রয়েছে উত্তম-
অনুপম আদর্শ; যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের আশা রাখে এবং
আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ করে^{৩২৬}। রাসূল (ﷺ) জুম'আর
খুতবায়ে ঘোষণা করেছেনঃ

مُحَدَّثَاتُهَا الْأُمُورَ وَشَرُّ مُحَمَّدٍ هُدًى الْهُدَى وَخَيْرُ اللَّهِ كِتَابُ الْحَدِيثِ خَيْرٌ فَإِنَّ
مُسْلِمَ). ضَلَالَةٌ بِدْعَةٍ وَكُلُّ

অর্থঃ উত্তম বাণী হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার বাণী। আর উত্তম পথ
নির্দেশনা হচ্ছে মুহাম্মাদ (ﷺ) এর পথ নির্দেশনা। নিকৃষ্টতম বিষয়
হচ্ছে (দ্বীনের মধ্যে) নতুন নতুন বিধান ইবাদতের নামে প্রবর্তন
করা, প্রত্যেক বিদ'আত ই ভ্রষ্টতা। (মুসলিম : ৮৬৭)^{৩২৭}। রাসূলুল্লাহ
(ﷺ) আরও বলেছেনঃ

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ.

অর্থ- যে আমাদের এই দ্বীনের (শারী'য়াতের) মধ্যে নতুন কিছু
উদ্ভাবন করবে, তাহলে তা হবে প্রত্যাখ্যাত।

^{৩২৫} তাখরীজ আলবানীঃ ইরওয়াউল গালীল ৩৯৪

^{৩২৬} সূরা আহযাব, আয়াত নং- ৩৩/২১

^{৩২৭} মুসলিম : ৮৬৭

২) মীলাদুন্নাবী উপলক্ষে ‘ঈদ উদযাপন বা অনুষ্ঠান পালন করা - এটি হলো বিপথগামী পথভ্রষ্টদের প্রবর্তিত একটি প্রথা। যেমন আমরা আলোচনার শুরুতেই জেনেছি যে, আনুষ্ঠানিকভাবে মীলাদুন্নাবী পালনের প্রথা সর্বপ্রথম চতুর্থ হিজরী শতাব্দীতে ফাতিমী ‘উবায়দী শী‘আ শাসকগণ প্রবর্তন করেছিল। সুতরাং বিবেকসম্পন্ন কোন মুসলমান কি কখনো রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর সুন্নাতের বিরোধিতা করতে পারে এবং শী‘আ-রাফিযীদের প্রবর্তিত পথ ও প্রথা অনুসরণ করতে পারে? অবশ্যই না।

৩) আল্লাহ (سبحانه وتعالى) দ্বীনে ইসলামকে পরিপূর্ণ ও সুসম্পন্ন করে দিয়েছেন। পবিত্র কুরআনে কারীমে তিনি ইরশাদ করেছেনঃ

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا.

অর্থাৎ- আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং তোমাদের উপর আমার নি‘মাত সুসম্পন্ন করে দিলাম এবং ইসলামকে দ্বীন হিসেবে তোমাদের জন্য মনোনীত করে দিলাম^{৩২৮}। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আল্লাহর এই দ্বীনকে অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে মানবজাতির নিকট পৌঁছে দিয়েছেন। মানুষকে জাহান্নামের নিকটবর্তী করবে এবং জাহান্নাম থেকে দূরে সরিয়ে রাখবে এমন প্রত্যেকটি বিষয় তিনি তাঁর উম্মাতকে অত্যন্ত পরিস্কারভাবে জানিয়ে গেছেন। মোটকথা, উম্মাতের জন্য কল্যাণকর এমন কোন বিষয় নেই যে সম্পর্কে তিনি [রাসূলুল্লাহ (ﷺ)] তাঁর উম্মাতকে অবহিত করেননি

^{৩২৮} সূরা মায়দা, আয়াত নং - ৩

এবং উম্মাতের জন্য অকল্যাণকর বা অনিষ্টকর এমন কোন বিষয় নেই যে সম্পর্কে তিনি উম্মাতকে সতর্ক করেননি। আমাদের নাবী ছিলেন আল্লাহ্ (سُبْحَانَہٗ وَتَعَالَى) এর প্রেরিত সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নাবী। মানবজাতির কাছে আল্লাহ্র বার্তা পৌঁছে দেয়ার এবং আল্লাহ্র বান্দাহদেরকে নাসীহাত প্রদানের ক্ষেত্রে সকল নাবী-রাসুলের মধ্যে তিনি ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বোত্তম। যদি মীলাদুন্নাবী অনুষ্ঠান বা ‘ঈদে মীলাদুন্নাবী পালন করা এমন কোন দ্বীনী কাজ বা ‘ইবাদাত হতো- যেটাকে আল্লাহ (سُبْحَانَہٗ وَتَعَالَى) পছন্দ করেন এবং যদ্বারা আল্লাহ্র (سُبْحَانَہٗ وَتَعَالَى) সন্তুষ্টি অর্জন করা যায়, তাহলে অবশ্যই রাসূলুল্লাহ (ﷺ) স্বীয় উম্মাতকে তা জানিয়ে দিতেন অথবা তিনি তাঁর জীবদ্দশায় নিজে এ কাজটি করতেন। কিন্তু তিনি নিজে এরূপ করেছেন কিংবা উম্মাতকে তা করতে বলেছেন মর্মে আদৌ কোন প্রমাণ নেই। অথচ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেনঃ

إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيٍّ قَبْلِي إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ يَذُلَّ أُمَّتُهُ عَلَى خَيْرِ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ، وَيُذِرَهُمْ شَرَّ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ.

অর্থ- আমার পূর্বে যতো নাবী ছিলেন, তাদের প্রত্যেকের উপরই ওয়াজিব ছিল যতো কিছু তাদের (নিজ নিজ উম্মাতের) জন্য মঙ্গলজনক বা কল্যাণকর হিসেবে জানেন সেসব বিষয়ে তাদেরকে পথ-নির্দেশ দেয়া, আর যতো কিছু তাদের জন্য অকল্যাণকর বলে জানেন সেসব বিষয়ে তাদেরকে সতর্ক ও সাবধান করা।

৪) দ্বীনে ইসলামে এ ধরনের মীলাদ বা জন্মদিবস পালনের বিদআতী প্রথা প্রবর্তনের দ্বারা প্রথমতঃ এ কথাই বুঝা যায় যে,

আল্লাহ (سبحانه وتعالى) এই উম্মাতের জন্য দ্বীনে ইসলামকে পরিপূর্ণ করে দেননি বরং তা অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে। তাই তা সম্পূর্ণ করার জন্য নতুন কিছু করার প্রয়োজন।

দ্বিতীয়তঃ দ্বীনের মধ্যে কোন বিদ'আতী পন্থা প্রবর্তনের দ্বারা বুঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এই উম্মাতের কল্যাণের জন্য যা কিছু প্রয়োজন ও প্রাপ্য ছিল তা তিনি পুরোপুরি ও যথাযথভাবে তাদের নিকট পৌঁছে দেননি। তাই পরবর্তীতে এইসব বিদ'আতীগণ শারী'য়াতের মধ্যে নতুন কিছু বিষয় (বিদ'আত) প্রবর্তন ও সংযোজন করে দিয়ে উম্মাতের সেই দ্বীনী প্রয়োজনটুকু পূরণ করে দিয়েছে। (এসব জঘন্য কথা-বার্তা ও ধ্যান ধারণা থেকে আমরা আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। তাদের ধারণা হলো যে, এরূপ কাজের দ্বারা তারা আল্লাহ্র নৈকট্য লাভ করতে পারবে। অথচ প্রকৃতপক্ষে এরূপ কোন কাজ করার অনুমতি আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে দেননি।

শুধু তাই নয় বরং এর দ্বারা প্রকারান্তরে তারা একদিকে যেমন আল্লাহ্র উপর অভিযোগ আরোপ করছে, অপরদিকে একথাই বলছে যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে আদায় করেননি। বরং তিনি আল্লাহ (سبحانه وتعالى) প্রদত্ত রিসালাতের আমানাত খিয়ানাত করেছেন। সুবহানালাহ! এরূপ ধারণা আল্লাহ (سبحانه وتعالى) ও তাঁর রাসূলের (ﷺ) উপর অপবাদ আরোপ ও জঘন্য মিথ্যাচার বৈ কিছু নয়। আল্লাহ (سبحانه وتعالى) ও তাঁর রাসূল (ﷺ) এরূপ অভিযোগ ও অপবাদ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ও পুতঃপবিত্র।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ (سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى) অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন যে, তিনি তাঁর দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন এবং বান্দাহগণের উপর তাঁর এই নি'মাত সুসম্পন্ন করে দিয়েছেন। বিদায় হাজ্জের ভাষণে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) উপস্থিত সাহাবায়ে কিরাম (رضي الله عنه) কে সাক্ষী রেখে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে জানিয়ে গেছেন যে, আল্লাহ্র পক্ষ হতে তাঁর প্রতি যা কিছু নাযিল হয়েছিল, সে সবই তিনি উম্মাতের নিকট যথাযথভাবে পৌছিয়ে দিয়েছেন; কোন কিছুই তিনি অবশিষ্ট বা অসম্পূর্ণ রাখেননি।

৫) বিদ'আত বর্জন করার ও বিদ'আত থেকে সতর্ক ও সাবধান থাকার বিষয়ে এবং সর্বক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর অনুসরণ করার, কথায় কাজে বা 'আমালে তাঁর বিরোধিতা না করার বিষয়ে ক্বোরআন ও সুন্নাহতে যেসব সুস্পষ্ট দালীল রয়েছে, সেসব দালীলের ভিত্তিতে হাক্কানী 'উলামায়ে কিরাম মীলাদ তথা জন্মদিন বা জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে কোনরূপ অনুষ্ঠান আয়োজন বা 'ঈদ উদযাপনকে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বিদ'আত বলে অভিহিত করেছেন।

৬) মীলাদুন্নাবী পালনের দ্বারা রাসূলের (ﷺ) প্রতি আদৌ কোন ভালোবাসা প্রদর্শিত হয় না। কস্মিনকালেও নয় বরং রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর যথাযথ অনুসরণ, তাঁর সুন্নাহ অনুযায়ী 'আমাল এবং তাঁর প্রতি পূর্ণ আনুগত্যের মাধ্যমেই প্রকৃত অর্থে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর প্রতি সত্যিকার ভালোবাসা প্রদর্শিত হয়ে থাকে। (সত্যিকার অর্থে যে যাকে ভালোবাসে, সে তার আনুগত্য করে থাকে)। ক্বোরআনে কারীমে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেনঃ

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ.

অর্থঃ:- (হে নাবী) আপনি বলুন! যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাস তাহলে আমাকে অনুসরণ করো- আল্লাহ তোমাদিগকে ভালোবাসবেন এবং তোমাদের জন্য তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দিবেন, আর আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

৮) ঈদে মীলাদুন্নাবী উদযাপন কিংবা জন্মদিবস পালনের মধ্যে ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের ঈদ বা বড়দিন পালনের সাথে মিল তথা সামঞ্জস্য রয়েছে। এর দ্বারা ‘আমাল বা কর্মে তাদের (ইয়াহুদী-নাসারাদের) সাদৃশ্য ধারণ করা হয়। অথচ আমাদেরকে (মুসলমানদেরকে) তাদের (ইয়াহুদী-নাসারাদের) সাদৃশ্য ধারণ করতে এবং তাদের অনুসরণ করতে নিষেধ করা হয়েছে^{৩৯}।

৯) তবে কারো ইচ্ছা হলে সে সোমবার দিন রোযা রাখতে পারে। কেননা একদা রাসূলুলাহ (ﷺ) - কে সোমবার দিন রোযা পালন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেনঃ

ذَاكَ يَوْمٌ وَلِذَتْ فِيهِ، وَيَوْمٌ بُعِثْتُ - أَوْ أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهِ.

অর্থ- এটা (সোমবার) হলো সেই দিন যেদিন আমি জন্মলাভ করেছি, এবং এই দিনেই আমাকে রাসূল হিসাবে পাঠানো হয়েছে অথবা এই দিনে আমার প্রতি অহী (ক্বোরআন) নাযিল হয়েছে। সুতরাং শারী‘য়াতের বিধান হলো- সোমবার দিন নাফল রোযা পালনের

^{৩৯} ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ রাহিমাহুল্লাহ এর “ইকতিযাউস্ সিরাতিল মুহতাকীম লি মুখালাফাতি আসহাবিল জাহীম” গ্রন্থের; বিশেষ করে ২/৬১৪-৬১৫ নং পৃষ্ঠা দুটি পড়ুন। আরো দেখুন! ইবনুল কায়্যিম রাহিমাহুল্লাহ সংকলিত গ্রন্থ “যাদুল মা‘আদ”- ১/৯৫

মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর অনুসরণ করা, তাঁর প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন করা এবং কোন অবস্থাতেই মীলাদ মাহ্ফিল বা ‘ঈদে মীলাদুন্নাবী ইত্যাদি বিদ‘আতী কর্মকান্ড না করা।

১১) মীলাদ মাহ্ফিল বা মীলাদুন্নাবী অনুষ্ঠান পালন কিংবা ‘ঈদে মীলাদুন্নাবী উদযাপন উপলক্ষে অনেক রকম শারী‘য়াত বিরোধী কর্মকান্ড সংঘটিত হয়ে থাকে। তন্মধ্যে মাত্র দু-তিনটি নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

(ক) মীলাদ মাহ্ফিলগুলোতে যেসব ক্বাসীদাহ্-গজল, না‘তে রাছূল ইত্যাদী পাঠ করা হয়, সেসবের বেশিরভাগের মধ্যে শিরকী শব্দ, বাক্য ও কথা-বার্তা ব্যবহৃত হয়। এতদ্ব্যতীত এসব অনুষ্ঠানে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর প্রশংসায় মারাত্মক বাড়াবাড়ি ও সীমালংঘন করা হয়ে থাকে। অথচ এসব বিষয় থেকে বিরত থাকার জন্য রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেনঃ

لَا تُظَرُونِي، كَمَا أَظَرَّتِ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ، فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ، فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ.

অর্থ- আমার প্রশংসায় অতিরঞ্জন করো না যেভাবে নাসারাগণ মারইয়াম পুত্রের (ঈসা ইবনু মারইয়াম- এর) প্রশংসায় অতিরঞ্জন করেছিল। আমি তো কেবল তাঁর (আল্লাহর) বান্দাহ্ হই, অতএব তোমরা (আমাকে) বলো - “আল্লাহর বান্দাহ্ ও তাঁর রাসূল”।

খ) অধিকাংশ মীলাদ মাহ্ফিলগুলোতে বিভিন্ন রকমের হারাম কর্ম-কান্ড সংঘটিত হয়ে থাকে। যেমন- তাতে নারী-পুরুষের সংমিশ্রণ, গান-বাজনা, নেশাজাতীয় দ্রব্য (মদ, গাজা ইত্যাদি) পান করা হয়ে থাকে। কখনো এসব মাহ্ফিলে রাসূলুল্লাহ্ কিংবা অন্য কোন অলী-

আউলিয়া এর নিকট আশ্রয় বা সাহায্য প্রার্থনার মাধ্যমে শির্কে আকবার করা হয়। সেখানে ক্বোরআনে কারীম তিলাওয়াতের মাজলিসে বিড়ি-সিগারেট পান করা হয়, যেটি মূলতঃ ক্বোরআন অবমাননার শামিল। অনর্থক কাজে বিপুল পরিমাণ টাকা-পয়সা অপব্যয় ও অপচয় করা হয়। মীলাদুন্নাবী উদযাপনের দিনগুলোতে বিভিন্ন মাছজিঙ্গে উচ্চস্বরে-সমস্বরে তালে তাল মিলিয়ে, কোথাও কোথাও দেখা যায় হাতে জোরে জোরে তালি বাজিয়ে নানারকম বিকৃত (বিদ'আতী) বানোয়াট যিকর-আযকারের আয়োজন করা হয়। অথচ উপরোক্ত কার্যকলাপ যে আদৌ শারী'য়াত সম্মত নয় বরং তা হারাম তথা নিষিদ্ধ - সে ব্যাপারে সকল হাক্কানী 'উলামায়ে কিরাম একমত; এ বিষয়ে তাদের কারো কোন দ্বিমত নেই।

উপরোক্ত আয়াত, হাদীস এবং এর সমর্থক আরো যেসব আয়াত ও হাদীস রয়েছে- সবগুলোই প্রমাণ করে যে, রাছুলুল্লাহ এবং অন্যান্য সকল মৃত ব্যক্তি ক্রিয়ামাতের দিন নিজ নিজ ক্বাব্র থেকে বের হবেন। কোন অবস্থাতেই এর আগে নয়। এমনকি রাসূলুল্লাহ্ ও ঐদিনই ক্বাব্র থেকে বের হবেন, প্রথমে তাঁর ক্বাব্র-ই বিদীর্ণ হবে এবং তিনিই সর্বপ্রথম ক্বাব্র থেকে উঠবেন।

আশ্ শাইখ আল 'আল্লামা আব্দুল আযীয ইবনু বায (রহঃ) বলেছেন যে, উপরোক্ত বিষয়ে (সকল কালের সকল যুগের) সকল 'উলামায়ে কিরামের ঐকমত্য রয়েছে। এ সম্পর্কে তাদের কারো কোন দ্বিমত নেই। দ্বীন ইসলামের ব্যাপারে এমন অজ্ঞতা আর উপেক্ষার কারণেই আমরা মুসলমানরা আজ ইসলামের নামে “মুহাম্মাদ (সাঃ) কে সৃষ্টি

করা না হলে আসমান-যমীন কিছুই সৃষ্টি হতো না,” “মুহাম্মাদ (সাঃ) নূরের সৃষ্টি,” “মিলাদ মাহফিলে তিনি উপস্থিত হন,” “তিনি হায়াতুন নবী” এমন অনেক বানোয়াট কথায় বিশ্বাস করি; ‘শবে বরাত’, ‘শবে মিরাজ’, ‘জুম‘আতুল বিদাহ’, ‘মিলাদ’ ও ‘ঈদে মিলাদুন নবীর’ মতো অসংখ্য অনুষ্ঠান উদযাপন করে সওয়াবের নিয়তে পরিশ্রম করে গুনাহ অর্জন করি। ‘দোয়ায়ে গঞ্জে আরশ’, ‘দরুদে নারিয়া’, ‘দরুদে হাজারী’ ইত্যাদি ধরনের বিদ‘আতী ও শিরকী দরুদ সওয়াবের উদ্দেশ্যে পাঠ করি। কথাগুলো শুনতে আপনার কাছে যতোই আজব মনে হোক না কেন, আসলে ব্যাপারগুলো তিক্ত হলেও বাস্তব সত্য। ইসলামের নামে আমাদের বর্তমান সমাজে এমন অসংখ্য বিশ্বাস, নিয়ম-নীতি, আচার-অনুষ্ঠান, এবাদত-বন্দেগী চালু রয়েছে, বাস্তবে যেগুলোর সাথে ইসলামের, আল্লাহর, তাঁর রসুলের, কুরআনের ও বিশুদ্ধ সুন্নাহর কোনো সম্পর্ক নেই। অথচ এ কাজগুলোকে আমরা তথাকথিত “ধর্মীয় ভাব গান্ধীর্যের” মধ্য দিয়েই উদ্যাপন করে থাকি অথচ এসব আনুষ্ঠানিকতা সম্পূর্ণ বিদ‘আত। কেউ কেউ বলেন যে, মিলাদ ও মিলাদুন নবী হলো ‘বিদ‘আহ হাসানা’ বা উত্তম বিদ‘আহ।

তাদের অবগতির জন্য বলবো যে, যেখানে স্বয়ং রসূলুল্লাহ (সাঃ) সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছেন যে “কুল্লু বিদ‘আতিন দলালাহ” অর্থাৎ সকল বিদ‘আহ পথভ্রষ্টতা, সেখানে কোনো ব্যক্তি যদি বলে যে, “না না কিছু বিদ‘আহ আছে ভালো”, তাহলে সে কি স্বয়ং রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর সাথে চরম বেয়াদবী করলো না? সে কি নিজেকে

আল্লাহর রসূলের চেয়েও অধিক জ্ঞানী বলে দাবী করলো না? (নাউযুবিল্লাহ)। আল্লাহ আমাদের এসব নব-আবিষ্কৃত বিদ'আতী কাজ থেকে হেফযত করুন, আমীন।

উপরোক্ত কারণ ও দালীল-প্রমাণের ভিত্তিতে সুদৃঢ়ভাবে প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর জন্মদিন বা জন্মবার্ষিকী আনুষ্ঠানিকভাবে কিংবা বিশেষভাবে পালন করা কিংবা 'ঈদে মীলাদুননাবী পালন বা উদযাপন করা দ্বীনে ইছলামে নব-আবিষ্কৃত একটি বিদ'আত ও শারী'য়াত বহির্ভূত কাজ- যা অবশ্যই বর্জনীয়^{৩৩}।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ - বিয়ে সংক্রান্ত প্রচলিত কিছু বিদ'আত

প্রচলিত বিবাহ প্রথা থেকে শুরু করে অন্যান্য সামাজিক অনুষ্ঠান বা রসমগুলো যা ইসলাম শরঈ সমর্থন করে না বরং এসব অনুষ্ঠান মূলতঃ টাকার অপচয় ব্যতীত আর কিছুই নয়। আল্লাহ আমাদের খুশির ও আনন্দের জন্য ২টি ঈদ দিয়েছেন আর আমরা চিন্তা করি কি করে আরো খুশির ও আনন্দের দিন আমাদের মাঝে আনা যায় - নবী (ﷺ) যে গুলো আমাদের শিখিয়ে দিয়ে গিয়েছেন তার মধ্যে নতুন কিছু বা অনুষ্ঠান যুক্ত করা বিদ'আত। আমরা যদি ৯৫% ইসলাম মেনে চলি আর ১% থেকে ৫% অন্য কোন ধর্ম থেকে নিয়ে মেনে চলি তাহলে এটা আর ইসলাম থাকে? মূলতঃ ইসলাম শুধু নামায-রোযার নয়; ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। তাই এখানে সালাত-সিয়ামের সঙ্গে সঙ্গে বিয়ে-শাদীর আমলও অনেক গুরুত্বপূর্ণ। আজকাল মসজিদে আমরা মুসলিম পরিচয় বজায় রাখি;

^{৩৩} নুরুন্ সুন্নাহ ওয়া যুলুমাডুল বিদ'আহ

কিন্তু বিয়ে-শাদীতে কেন যেন ইসলাম পরিপন্থী তথা বিদ'আতই কাজই বেশি করি। বিয়ে-শাদীর আগে যেহেতু কনে দেখার পর্ব তাই আগে বিয়ের প্রস্তাব বা কনে দেখা সংক্রান্ত ইসলামী নির্দেশনাগুলো আগে তুলে ধরার প্রয়াস পাচ্ছি এ গ্রন্থে। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন, আমীন। সূরা আল ইমরান (৩) ১৪৯ নং আয়াতে আল্লাহ বলছেন – হে মানুষ, তোমরা যারা (আল্লাহর উপর) ইমান এনেছো, তোমরা যদি অমুসলিদের অনুসরণ করতে শুরু করো তাহলে এরা তোমাদের পূর্ববর্তী (জাহেলিয়াতের) অবস্থা ফিরিয়ে নিয়ে যাবে। ফলে তোমরা নিদারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পরবে। সূরা বাকারা (২) ২৭০ নং আয়াতে আল্লাহ বলছেন – তোমরা যা কিছু খরচ করো আর যা কিছু মানত করো আল্লাহ তা নিশ্চই জানেন, যালেমদের কোন সাহায্য কারি নাই।

তিরমিযী গ্রন্থে - মিনা বুক হাউস - কিয়ামত অধ্যায় - ২৩৫৮ নং হাদীস - মাসুউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত নবী (ﷺ) বলেন, রোজ কিয়ামতে পাঁচটি বিষয়ে প্রশ্ন করা হবে তার একটি হল তুমি তোমার ধন সম্পদ কোথা থেকে আয় করেছো এবং কোন খাতে ব্যবহার করেছো? মেশকাত গ্রন্থ - সালাউদ্দিন বই ঘর - ৬ষ্ঠ খন্ড - ৩০৭৩ নং হাদীস - আনাস (রাঃ) বলেন, নবী (ﷺ) যয়নবের বিয়েতে যত বড় বিবাহ ভোজ করেছেন তা অন্য কোন বিবির জন্য করেনি, তাতে তিনি একটা ভেড়া দিয়ে বিবাহ ভোজ করিয়েছেন। অতএব, বিবাহের সময় অনুষ্ঠান বা বিবাহ ভোজ একটা (যে পক্ষই অনুষ্ঠান করুক বা উভই পক্ষ একত্রে অনুষ্ঠান করুক) এগুলো

বিদ'আত কেন - নবী (ﷺ) এর সময় লোকজন বিয়ে করেছে ও নবী (ﷺ) অনেকের বিয়ে দিয়েছেন কিন্তু নবী (ﷺ) বৌ ভাত, গায়ে হলুদ অনুষ্ঠান করেনি এজন্য এগুলো বিদ'আত। [নবী (ﷺ) মাগরিবের নামায পড়েছেন ৩ রাকাত এখন আপনি কি ৪ রাকাত নামায পড়বেন মাগরিবে? তিনি বিয়ের নিয়ম আমাদের বলে দিয়ে গেছেন?]

মিশকাত গ্রন্থে - সালাউদ্দিন বইঘর - ৬ষ্ঠ খন্ড - ৩০৮০ নং হাদীস আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত নবী (ﷺ) বলেছেন সর্বাপেক্ষা মন্দ সে অলীমার ভোজ (বিবাহ ভোজ) যাতে ধনীদেব দাওয়াত করা হয় আর গরীবদের বাদ দেওয়া হয়। আমাদের উচিত যাদের বিবাহ ভোজে যাচ্ছি তাদের জন্য দোয়া করা। সেইটা অধিকাংশ লোকই আমরা করি না।

গিফট বা উপহার সামগ্রী না নিয়ে গেলে মান সম্মান থাকবে না অথচ গিফট বা উপহার সামগ্রী বিবাহ ভোজের অংশ না, দোয়া বিবাহ ভোজের অংশ। (গিফট বা উপহার সামগ্রী দেওয়া যাবে না তা না, কিন্তু আমাদের দোয়া করা উচিত। যাই হোক, বিয়ে যেহেতু আমাদের জীবনে একটি স্বাভাবিক ও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। তেমনি আমাদের সমাজে বা দেশে প্রচলিত যেসব প্রথা ইসলামের দৃষ্টিতে হারাম সেগুলো আমরা বর্জন করা উচিত। বিয়ের সময় যৌতুক, গায়ে হলুদ বা গান বাজনা করা ইত্যাদি বিদাত বা হারাম তা আমরা সবাই জানি। এগুলো ছাড়াও আরোও কিছু কুপ্রথা আমাদের সমাজে প্রচলিত আছে।

বিবাহে প্রচলিত কু-প্রথার তালিকা

বিবাহ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিবাহ করা নবীগণের (আলাহিসসালাতু আসসালাম) সুন্নাত। রাসুল (সালামু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি বিয়ে করার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও বিয়ে করে না, সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়^{৩৩}। এ প্রসঙ্গে ইমাম রাগিব বলেনঃ বিয়েকে দুর্গ বলা হয়েছে, কেননা (বিয়ে) স্বামী-স্ত্রী উভয়কে সকল প্রকার লজ্জাজনক কাজ থেকে দুর্গবাসীদের মতোয় বাচিয়ে রাখে। (মুফরাদাত)। তবে এই পবিত্র কর্ম পালন করতে গিয়ে মাঝে মাঝে কিছু কু-প্রথা মানা হয় যা কিনা অনুচিত। আসুন নবীগণের (আলাহিসসালাতু আসসালাম) এই সুন্নাত কে সুন্নাত তরীকায় পালন করি। নিম্নে কিছু তালিকা উপস্থাপন করা হলোঃ-

১. চন্দ্র বর্ষের কোন মাসে বা কোন দিনে অথবা বর/কনের জন্ম তারিখে বা তাদের পূর্ব পুরুষের মৃত্যুর তারিখে বিবাহ শাদী হওয়া অথবা যে কোন শুভ সং কাজ করার জন্য ইসলামী শারী'য়াতে বা ইসলামী দিন তারিখের কোন বিধি নিষেধ নেয়। বরং উপরিউক্ত কাজগুলো বিশেষ কোন মাসে বা যে কোন দিনে করা যাবে না মনে করাই গুনাহ।
২. বিবাহ উৎসবে অথবা অন্য যে কোন উৎসবে পটকা-আতশবাজি ফুটান, অতিরিক্ত আলোকসজ্জা করা, রংবাজী করা বা রঙ দেওয়ার

^{৩৩} দারিমী-কিতাবুন নিকাহ

ছড়াছড়ি ইসলামের দৃষ্টিতে অবৈধ ও অপচয়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেনঃ

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

“নিশ্চয় অপচয়কারী শয়তানের ভাই। আর শয়তান হচ্ছে তার প্রভুর প্রতি বড় অকৃতজ্ঞ^{৩৩২}।”

৩. বাঁশের কুলায় চন্দন, মেহদি, হলুদ, কিছু ধান-দূর্বা ঘাস কিছু কলা, সিঁদুর ও মাটির চাটি নেওয়া হয়। মাটির চাটিতে তেল নিয়ে আগুন জ্বালানো হয়। স্ত্রী ও বরের কপালে তিনবার হলুদ লাগায় এমনকি মূর্তিপূজার ন্যায় কুলাতে রাখা আগুন জ্বালানো চাটি বর-কনের মুখের সামনে ধরা হয় ও আগুনের ধূঁয়া ও কুলা হেলিয়ে-দুলিয়ে বাতাস দেওয়া হয়। এসব হিন্দুয়ানী প্রথা ও অনৈসলামিক কাজ।

৪. বরের আত্মীয়রা কনেকে কোলে তুলে বাসর ঘর পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়া অথবা বরের কোলে করে মুরুব্বীদের সামনে স্ত্রীর বাসর ঘরে গমনের নীতি একটি বেহায়াপনা, নিরলজ্জতা ও অনৈসলামিক কাজ।

৫. বরের ভাবী ও অন্য যুবতী মেয়েরা বরকে সমস্ত শরীরে হলুদ মাখিয়ে গোসল করিয়ে দেওয়া নির্লজ্জ কাজ যা ইসলাম সমর্থন করে না।

^{৩৩২} সূরা বানী ইসরাঈল-২৭

৬. বর ও কনেকে হলুদ বা গোসল করতে নিয়ে যাওয়ার সময় মাথার উপর বড় চাদর এর চার কোনা চার জনের ধরা হিন্দুয়ানী প্রথা।

৭. বিবাহ করতে যাওয়ার সময় বরকে পিড়িতে বসিয়ে বা সিল-পাটাই দাড় করিয়ে দই-ভাত খাওয়ান ইসলামিক প্রথা নয়।

৮. বিবাহ কাজ সম্পূর্ণ হওয়ার পর বরকে দাড় করিয়ে সালাম দেওয়ানোর প্রথা রাসুল (ﷺ) ও তার সাহাবীদের (রাঃ) দ্বারা প্রমানিত নয়।

৯. বর ও কনের মুরব্বীদের কদমবুসি করা একটি মারাত্মক কু-প্রথা। বিয়ে তো নয় এমনকি যে কোন সময় কদমবুসি করা রাসুল (ﷺ) ও তার সাহাবীদের (রাঃ) দ্বারা কোন কালে প্রমানিত নয়। কদমবুসি করার সময় সালাতের রুকু-সিজদার মত অবস্থা হয়। বেশি সম্মান প্রদর্শন করতে গিয়ে হিন্দুয়ানী প্রণামকে প্রথা হিসেবে নিয়ে আসা মুমিনদের বৈশিষ্ট্য নয়।

উপরে উল্লেখিত বিদ'আত, প্রচলিত রসম বা কুপ্রথা ব্যতীত আরও বিয়ে সংক্রান্ত যেসব বিষয়ক বিদ'আত, প্রচলিত রসম ও কুপ্রথা আমাদের মুসলিম সমাজে প্রচলিত রয়েছে সেসব বিষয়ে নিয়ে কুরআন ও হাদীসের আলোকে যেসব আলোচনা রয়েছে তা নিম্নে স্পষ্টভাবে আলোচনা করা হলোঃ-

শরীয়তে বিবাহ বলতে কী বুঝায়

নারী-পুরুষ একে অপর থেকে উপকৃত হওয়া এবং আদর্শ পরিবার ও নিরাপদ সমাজ গড়ার উদ্দেশ্যে পরস্পর চুক্তিবদ্ধ হওয়া। এ

সংজ্ঞা থেকে আমরা অনুধাবন করতে পারি, বিবাহের উদ্দেশ্য কেবল ভোগ নয়; বরং এর সঙ্গে আদর্শ পরিবার ও আলোকিত সমাজ গড়ার অভিপ্রায়ও জড়িত। অথচ আজকাল প্রায়শই দেখা যায় যে, মেয়ের অবিভাবকের অনুমতি ছাড়া পালিয়ে বিয়ে করা একটা রেওয়াজে পরিণতি হয়েছে কিন্তু ইসলাম শরীয়তে এটা স্পষ্টভাবে হারাম। অর্থাৎ মেয়ের শরীয়ত সম্মত অবিভাবক ছাড়া বিয়ে শরীয়তের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য নয়। নবী করিম (ﷺ) বলেন- “ওলী ছাড়া বিয়ে হয় না।” আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত – কোন মহিলা তার ওলীর বিনা অনুমতিতে নিজেই বিয়ে করে ফেললো তার সম্বন্ধে নবী করিম (ﷺ) বলেছেন, তার বিয়ে বাতিল, বাতিল, বাতিল (তিনবার বলেছেন)।”

ওলী অর্থ হচ্ছে শরীয়ত সম্মত অবিভাবক। অপরপক্ষে একটি ছেলে তার অবিভাবকের সম্মতি ছাড়াও বিয়ে করতে পারে। বস্তুতঃ যে কোন নারীর বিবাহের জন্য ওলী বা অবিভাবক আবশ্যিক।

অবিভাবক হওয়ার শর্ত

অবিভাবক উপযুক্ত হওয়ার জন্য ৬টি শর্ত আছেঃ

- (১) আকল বা বিবেক সম্পন্ন হওয়া (পাগল হলে হবে না)
- (২) প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া
- (৩) স্বাধীন হওয়া
- (৪) পুরুষ হওয়া (বিবাহের ক্ষেত্রে নারী নারীর অবিভাবক হতে পারবে না)

(৫) অভিভাবক ও যার অভিভাবক হচ্ছে উভয়ে একই দ্বীনের অনুসারী হওয়া। (কাফের মুসলিম নারীর অভিভাবক হবে না। মুসলিম কাফের নারীর অভিভাবক হবে না)।

(৬) অভিভাবক হওয়ার উপযুক্ত হওয়া। (অর্থাৎ বিবাহের জন্য কুফূ বা তার কন্যার জন্য যোগ্যতা সম্পন্ন বা সমকক্ষ পাত্র নির্বাচন করার জ্ঞান থাকা ও বিবাহের কল্যাণ-অকল্যাণের বিষয় সমূহ অনুধাবন জ্ঞান থাকা)

উপরের কোন একটি শর্ত না পাওয়া গেলে তখন ঐ ব্যক্তি অভিভাবকত্ব হারাবে, তখন ঐ অভিভাবকত্ব পরবর্তী নিকটতম ব্যক্তির নিকট স্থানান্তরিত হবে। যেমন দাদা, তারপর ভাই, তারপর চাচা ইত্যাদি। শেষ পর্যন্ত যদি কেউ না থাকে, তবে দেশের মুসলিম শাসক বা তার প্রতিনিধি বা গভর্নর ঐ নারীর অভিভাবক হিসেবে গণ্য হবে।

আজকের যুব সমাজে প্রচলিত কোর্ট ম্যারেজের ক্ষেত্রে অন্তত মেয়ে পক্ষের অভিভাবকের অনুমতি নিতে হবে। তাছাড়া সে বিয়ে ইসলামের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য হবে না। তবে যদি কোন মেয়ে মনে করে যে তার বাবা মা কোন কিছুর লোভে বা কারও ভয়ে তাকে কুপাত্রেণের কাছে বিয়ে দিতে চাচ্ছে বা তাদের কে বোঝানো যাচ্ছেনা আবার বিয়েতে রাজী না হলে কোন প্রকার সমস্যা হবে অথবা ইত্যাদি আরও অনেক সমস্যার কারনে পালিয়ে যাওয়া ছাড়া কোন উপায় না থাকে তবে সেক্ষেত্রে কোন বিজ্ঞ আলেমের কাছ থেকে পরামর্শ নিয়ে বিয়ে করা উচিত।

বিবাহের তাৎপর্য

বিবাহ একটি বৈধ ও প্রশংসনীয় কাজ। প্রত্যেক সামর্থ্যবান ব্যক্তির ক্ষেত্রেই এর যার গুরুত্ব অপরিসীম। বিয়ে করা নবী-রাসূলদের (আলাইহুমুস সালাম) সুন্নাত। আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন,

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً

‘আর অবশ্যই তোমার পূর্বে আমি রাসূলদের প্রেরণ করেছি এবং তাদেরকে দিয়েছি স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি।’^{৩৩৩} রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে বিবাহ করেছেন এবং এর প্রতি উদ্বুদ্ধ করতে গিয়ে বলেছেন,

أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنتِي فَلَيْسَ مِنِّي

‘আমি নারীকে বিবাহ করি। (তাই বিবাহ আমার সুন্নত) অতএব যে আমার সুন্নত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, সে আমার দলভুক্ত নয়’^{৩৩৪}। এ জন্যই আলিমগণ বলেছেন, সাগ্রহে বিবাহ করা নফল ইবাদতের চেয়ে উত্তম। কারণ, এর মধ্য দিয়ে অনেক মহৎ গুণের বিকাশ ঘটে এবং অবর্ণনীয় কল্যাণ প্রকাশ পায়। কারও কারও ক্ষেত্রে বিবাহ করা ওয়াজিব হয়ে পড়ে।

যেমন : যদি কেউ বিবাহ না করলে হারাম কাজে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা করে। তখন নিজেকে পবিত্র রাখতে এবং হারাম কাজ থেকে বাঁচতে তার জন্য বিয়ে করা ওয়াজিব হয়ে দাঁড়ায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

^{৩৩৩} সূরা রাদ : ৩৮।

^{৩৩৪} বুখারী : ৫০৫৬ ; মুসলিম : ৩৪৬৯।

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ
، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

‘হে যুব সম্প্রদায়, তোমাদের মধ্যে যারা বিবাহের সামর্থ্য রাখে সে যেন বিয়ে করে। কেননা তা চক্ষুকে অবনত করে এবং লজ্জাস্থানকে হেফাযত করে। আর যে এর সামর্থ্য রাখে না, তার কর্তব্য রোযা রাখা। কেননা তা যৌন উত্তেজনার প্রশমন ঘটায়।’^{৩৩৫} ইসলাম বিবাহকে উৎসাহিত করে। কারণ মানুষের প্রাকৃতিক চাহিদা পূরণের এবং মানব বংশের ধারা অব্যাহত রাখার এটিই একমাত্র বৈধ পন্থা। কৌমার্য বরণের মাধ্যমে স্বাভাবিক (Natural) চাহিদা দমন করাকে ইসলাম সমর্থন করে না। তাছাড়া বিবাহ রাসূলুল্লাহ (স.) এর একটি গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত। আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত সহীহুল বুখারীর হাদীসটি তার প্রমাণ : “তিন ব্যক্তির একটি দল রাসূলুল্লাহ (স.) এর স্ত্রীগণের কাছে নবী (স.) এর ইবাদাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার জন্য আগমন করল। তাদেরকে এ সম্পর্কে জানানো হলে তারা নিজেদের ইবাদাতের পরিমাণকে যথেষ্ট মনে করলো না এবং তারা বলল- কীভাবে আমরা নবীর সমকতা অর্জন করতে পারি যাঁর পূর্বের ও পরের সব গুনাহ মা করে দেয়া হয়েছে। এ সময় তাদের মধ্য থেকে একজন বলল- আমি আজীবন রাতভর নামাজ পড়তে থাকব। অন্যজন বলল- আমি সারা বছর রোজা রাখবো এবং কখনও রোজা ভাঙ্গবো না (অর্থাৎ বিরতি দেব না)। তৃতীয় ব্যক্তি বলল - আমি সর্বদা নারী থেকে দূরে থাকবো এবং কখনও বিবাহ করবো না।

^{৩৩৫} বুখারী : ৫০৬৬; মুসলিম : ৩৪৬৪।

অতঃপর নবী (স.) তাদের কাছে আসলেন এবং বললেন, তোমরা কী সেই লোক যারা এরূপ কথাবার্তা বলেছে? আল্লাহর শপথ, আমি আল্লাহর প্রতি তোমাদের চেয়ে বেশি অনুগত এবং তাঁকে তোমাদের চেয়ে বেশী ভয় করি। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি রোজা রাখি আবার বিরতিও দেই, রাতে নিদ্রা যাই এবং মহিলাদের বিবাহও করি। যারা আমার সুন্নতের প্রতি বিরাগ পোষন করে (অনুসরণ করে না), তারা আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়।” [সহীহুল বুখারী]

ইসলাম একদিকে যেমন কৌমার্য (Celibacy) এর দ্বারা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তিকে দমন করার পক্ষপাতী নয় ঠিক তেমনি এটি লাগামহীন অবিবেচক যৌন জীবনকেও অনুমোদন করে না। রাসূল (স.) বলেন, “হে যুবসমাজ, তোমাদের মধ্যে যারা বিবাহ করতে সমর্থ তারা যেন বিবাহ করে, কারণ এটি চোখকে আকর্ষণপূর্ণ দৃষ্টি থেকে দূরে রাখে এবং পবিত্রতা রক্ষা করে। আর যারা বিবাহের সামর্থ্য রাখে না তারা যেন রোজা রাখে। যাতে এটি ঢাল হিসেবে তাকে রা করতে পারে। এতদসত্ত্বেও বিবাহ সম্পর্কিত ইসলামের নির্দেশনা ব্যক্তি বিশেষের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ভিন্ন ভিন্ন হয়। কখনও এটি বাধ্যতামূলক, কখনও বিশেষ পছন্দনীয় বা মুস্তাহাব, কখনও এটি শুধুমাত্র হালাল বা বৈধ আবার কোন কোন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এটি হারামও হতে পারে।

ইসলামিক ইনস্টিটিউট অব টরন্টো, কানাডা এর একজন সিনিয়র লেকচারার শেখ আহমদ কুটী বলেছেন, যদিও ইসলামিক ফিকাহ শাস্ত্র মতে বিবাহ একটি বিশেষ পছন্দনীয় (Highly

recommended) কাজ, তদুপরি অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে একে চার ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

১. ফরজ বা বাধ্যতামূলক (Obligatory)

২. মুস্তাহাব বা পছন্দনীয় (Recommended)

৩. হালাল বা বৈধ (Permitted)

৪. হারাম বা নিষিদ্ধ (Forbidden)

বিবাহ তখনই ফরজ বা বাধ্যতামূলক হয় যখন একজন ব্যক্তি (নারী ও পুরুষ) তীব্র যৌন চাহিদা অনুভব করে এবং তার দ্বারা ব্যভিচার ঘটে যাবার আশংকা থাকে। যেহেতু ব্যভিচার থেকে দূরে থাকা ফরজ এবং বিবাহই একমাত্র এই চাহিদা পূরণের বৈধ পন্থা, সেহেতু ঐ ব্যক্তির জন্য বিবাহ ফরজ। এক্ষেত্রে ফিকাহ শাস্ত্রের মূলনীতিটি হলো, “যদি একটি ফরজ কাজ অন্য একটি কাজ ব্যতীত আদায় সম্ভব না হয় তবে ঐ সহায়ক কাজটিও মূল ফরজের মতোই ফরজ হিসেবে গণ্য হবে।” যদি কোন ব্যক্তির যৌন চাহিদা খুব তীব্র না হয় এবং তার দ্বারা ব্যভিচার সংঘটিত হবার সম্ভাবনা না থাকে কিন্তু বিবাহ করার সব রকম সামর্থ্য ও সুযোগ তার থাকে এমতাবস্থায় বিবাহ তার জন্য মুস্তাহাব বা পছন্দনীয় কাজ। কারণ এটির দ্বারা সে রাসূল (স.) এর একটি গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাতকে অনুসরণ করছে। একজন ব্যক্তির বিবাহ করার মতো ন্যূনতম অর্থনৈতিক সামর্থ্য যদি না থাকে (মোহরানা আদায় ও স্ত্রীর ভরণ-পোষণ স্বামীর জন্য ফরজ) এবং এভাবে সে যদি বিবাহের দায়িত্বসমূহ পালনে অসমর্থ হয় কিন্তু

বিবাহের তীব্র প্রয়োজন অনুভব করে, সেক্ষেত্রে বিবাহ করা তার জন্য হালাল (Permitted) এই শর্তে যে-

- সে তার সামর্থ্য অনুযায়ী সৎপন্থায় উপার্জনের সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যাবে এবং

- ভাবী স্ত্রীকে নিজের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা দান করবে। সত্য গোপন করা এক্ষেত্রে প্রতারণার সামিল।

আল্লাহ এরূপ অভাবী ব্যক্তিকে সাহায্য করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন। এ ক্ষেত্রে আরেকটি বিষয় উল্লেখযোগ্য, এমন পরিস্থিতিতে মুসলিম সমাজের দায়িত্ব হলো ঐ ব্যক্তিকে আত্মনির্ভরশীল হবার পূর্ব পর্যন্ত সাহায্য করা। কিন্তু পরিস্থিতি যদি এমন হয় যে ব্যক্তিটি সৎভাবে উপার্জনের কোন পথই পাচ্ছে না এবং বৈবাহিক দায়িত্ব (অর্থনৈতিক) পালনের কোন উপায়ই তার সম্মুখে খোলা নেই, এমতাবস্থায় ঐ ব্যক্তিকে রোযা ও অন্যান্য সংযম সাধনের (Acts of sublimation) মাধ্যমে নিজেকে দমনের চেষ্টা চালাতে হবে। যদি কোন ব্যক্তি মনে করে যে তার দ্বারা বিবাহের আবশ্যক (ফরজ) দায়িত্ব-কর্তব্য পালন করা সম্ভবপর নয় এবং তার ব্যভিচারে লিপ্ত হবার সম্ভাবনাও নেই, তখন ঐ ব্যক্তির জন্য বিবাহ হারাম বা নিষিদ্ধ। ইসলাম আমাদের অন্য ব্যক্তির প্রতি অন্যায় (Injustice) এবং অন্য ব্যক্তির অধিকার হরণকে হারাম করেছে। কাজেই স্বামী বা স্ত্রীর একের অন্যের প্রতি ফরজ দায়িত্বের অবহেলা পুরোপুরি হারাম। বিবাহ কখন হারাম সে সম্পর্কে বিশিষ্ট ইসলামি চিন্তাবিদ, ফিক্হ আস-সুন্নাহ বই এর লেখক মরহুম শেখ সাইয়েদ সাবিক

বলেন, “একজন পুরুষের জন্য বিবাহ হারাম তখন যখন তার স্ত্রীর অধিকার করার সামর্থ্য না থাকে। এ সামর্থ্যহীনতা দৈহিক বা অর্থনৈতিক যেটাই হোক না না কেন। কোন পুরুষ যদি দৈহিক মিলনে অক্ষম হয় বা স্ত্রীর ভরণ-পোষণের ব্যয় বহনের মতো অর্থনৈতিক সামর্থ্য তার না থাকে তবে তার জন্য বিবাহ বৈধ নয়।” এ সম্পর্কে অপর একজন বিশিষ্ট চিন্তাবিদ আল কুরতুবী (রহ.) বলেন, “যদি কোন ব্যক্তি বিবাহের খরচ বহনের মতো সামর্থ্যবান না হয়, যদি তার মোহরানা পরিশোধের সামর্থ্য না থাকে বা স্ত্রীর অন্যান্য অর্থনৈতিক অধিকার (Financial right) আদায়ের সামর্থ্য না থাকে তবে তার বিবাহ বৈধ নয়, যতণ না সে তার অবস্থা ভাবী স্ত্রীকে জানায় অথবা সে অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা লাভ করে। আর যদি সে দৈহিক দুর্বলতা বা ত্রুটির কারণে দৈহিক মিলনে অসমর্থ হয় তবে তাও ভাবী স্ত্রীকে পরিপূর্ণভাবে জানাতে হবে। এক্ষেত্রে লুকোচুরি বা গোপন করার মাধ্যমে স্ত্রীকে প্রতারিত করা স্পষ্ট নিষিদ্ধ। একই নিয়ম মহিলাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কোন মহিলা যদি স্বামীর হক আদায়ে অসমর্থ হন অথবা তার এমন কোন ত্রুটি থাকে যার ফলে সে দৈহিক মিলনে অম হন তবে এসব গোপন করে বিবাহ করা স্পষ্টতঃ নিষিদ্ধ (হারাম)। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়- স্থায়ী মানসিক রোগ (Insanity), কুষ্ঠরোগ (Leprosy), গোদ রোগ (Elephantiasis) অথবা স্ত্রীর অঙ্গের কোন রোগ (Genital or vaginal disease)। এমন এক সমস্যা থাকলে তা বিবাহের পূর্বেই পুরুষটিকে জানিয়ে দিতে হবে। ব্যাপারটি অনেকট ক্রয়-বিক্রয়ের

চুক্তির ন্যায়। বিক্রেতা বাধ্য থাকবে পণ্যের ত্রুটির সম্পর্কে ক্রেতাকে অবহিত করতে। যদি কোন পণ্য নিজের ত্রুটি একে অপরের নিকট গোপন করে তবে এ ব্যাপারে (যার নিকট গোপন করা হয়েছে) বিবাহ বাতিলের অধিকার রাখে। যদি স্বামী বিবাহের পর এমন কোন মারাত্মক ত্রুটি স্ত্রীর মধ্যে পান যা তার নিকট গোপন করা হয়েছিল তবে তিনি বিবাহ বাতিল করতে পারবেন এবং মোহরানা ফেরত নিতে পারবেন (যদি তিনি ইচ্ছা করেন)। অনুরূপ কোন স্ত্রী যদি বিবাহের পর স্বামীর এমন কোন ত্রুটি পান যা গোপন রাখা হয়েছিল, তাকে বিবাহের পূর্বে অবহিত করা হয় নি (যা দ্বারা তার ফরজ অধিকার লঙ্ঘিত হয়), তবে তিনি বিবাহ বাতিলের সম্পূর্ণ অধিকার রাখেন।” এক্ষেত্রে স্ত্রী তার মোহরানা কতটা পাবেন সে ব্যাপারে ইমাম মালেক (রহ.) দু’টি মত ব্যক্ত করেছেন। যদি দৈহিক মিলন ঘটানোর পরে (After consummating marriage) স্ত্রী বিবাহ বাতিল করেন তবে তিনি পূর্ণ মোহরানা পাবেন। অন্যথায় (অর্থাৎ বিবাহের পর পরই দৈহিক মিলন ঘটানোর পূর্বেই বিচ্ছেদ ঘটলে) তিনি অর্ধেক মোহরানা পাবেন।

নারীদের জন্য বিবাহ বাধ্যতামূলক কি না

আমরা জেনেছি নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবার জন্য বিয়ে বাধ্যতামূলক কি না। এখন আমরা যে বিষয়ে আলোকপাত করতে চাই তা হলো নারীদের জন্য বিবাহ বাধ্যতামূলক কি না। এ ব্যাপারে ২৬ বছর বয়স্ক একজন মহিলা চিঠি লিখেছিলেন ইসলাম অনলাইনে একথা জানতে চেয়ে যে, তার মা-বাবা তাকে বিয়ের জন্য চাপ দিচ্ছে। কিন্তু

আশে-পাশে অনেক অসুখী পরিবার দেখে সে ভীত। একদিকে পিতা-মাতার অনুরোধ, অন্যদিকে বিয়ে ভীতি-এমতাবস্থায় তার কী করণীয়। এর উত্তরে বলা হয়েছে। যদিও সাধারণত বিয়েকে ইসলাম উৎসাহিত করে তথাপি অবস্থা ও পারিপার্শ্বিকতার উপর ভিত্তি করে এটি কোন কোন ব্যক্তির জন্য ফরজ হয়, কারও জন্য মুস্তাহাব, কারও জন্য শুধুই হালাল এমনকি কারও কারও জন্য হারামও হয়ে থাকে (বিস্তারিত পূর্ব আলোচনায় দ্রষ্টব্য)। এই নীতি নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্য প্রযোজ্য। কাজেই মেয়েটির উচিত হবে নিজ অবস্থা পর্যালোচনা করে সেরূপে সিদ্ধান্ত নেয়া। এ প্রসঙ্গে বর্তমান সময়ের বিশিষ্ট ইসলামি চিন্তাবিদ শেখ আহমদ কুট্টি প্রশ্নকারী মেয়েটির উদ্দেশ্যে বলেন - “যেহেতু ইসলাম পিতা-মাতাকে বিশেষ সম্মানের চোখে দেখার নির্দেশ দেয় সেহেতু তাদের সাথে যে কোন ব্যাপারে মত বিনিময়ের সময় তাদের প্রতি বিনয়ী, নম্র ও সহানুভূতিশীল হওয়া আমাদের কর্তব্য। সব পিতা-মাতাই সন্তানের ব্যাপারে উদ্বিগ্ন থাকেন। তাই যে কোন সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে সেটি বাবা-মা এর জন্য কতটা কষ্টদায়ক হবে তা চিন্তা করে সন্তানদের সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত। তবে ইসলাম বিয়ের ব্যাপারে সম্মতি দান করা বা না করার পুরোপুরি অধিকার নারীকে দিয়েছে। এ ব্যাপারে পিতা-মাতার মতামতের চেয়ে পাত্রীর মতামতকে ইসলাম প্রাধান্য দেয়।” এর স্বপক্ষে কিছু হাদীস উল্লেখ করা যেতে পারে : আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, কোন বিধবা মহিলাকে তার

সম্মতি ব্যতীত বিবাহ দেয়া যাবে না। কোন কুমারী মহিলাকেও তার অনুমতি ব্যতীত বিবাহ দেয়া চলবে না। (সহীছুল বুখারী)

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, “হযরত খানসা বিনতে খিয়াম (বা খিদাম) (রা.) এর একবার বিয়ে হয়েছিল। এরপর তিনি স্বামীহীন হন। এমতাবস্থায় তার পিতা তাকে অন্য এক ব্যক্তির সাথে বিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু হযরত খানসা এ বিয়ে পছন্দ করেননি। তিনি রাসূলুল্লাহ (স.) এর কাছে এসে তাঁকে একথা জানালেন। ঘটনাটি শোনার পর নবী করীম (স.) এ বিয়ে বাতিল করে দিলেন।” (সহীছুল বুখারী)। এ প্রসঙ্গে শেখ আহমদ কুট্রি আরও বলেন, “পিতা-মাতার অধিকার আছে সন্তানকে উপদেশ দেয়ার। তাঁরা তাদের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে সন্তানদের জন্য মঙ্গলজনক পরামর্শ দিয়ে থাকেন। এজন্য সন্তানদের তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত। কিন্তু ব্যাপারটি যখন বিয়ে সম্পর্কিত এবং চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিকার ইসলাম সংশ্লিষ্ট নারীটিকে দিয়েছে, তার বাবা-মাকে নয়, সেক্ষেত্রে সতর্কতার সাথে চিন্তা-ভাবনা করে যে কোন সিদ্ধান্ত নেয়ার সম্পূর্ণ অধিকার নারীর আছে। কারণ সারা জীবন ঐ ব্যক্তির সাথে তাকেই থাকতে হবে, বাবা-মাকে নয়। তাছাড়া আশেপাশের অসফল বিবাহ বা অসুখী দম্পতি (Dis-functional marriage) দেখে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছানো ভুল যে, সব বিবাহই অসফল বা সব দম্পতিই অসুখী। বিয়ে সফল হবে কি বিফল হবে তা নির্ভর করে স্বামী এবং স্ত্রী জীবনের ব্যাপারে কোন ধরনের দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করে তার উপর। মুসলিম হিসেবে আমরা

বিশ্বাস করি যে সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহর এবং আমাদের আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করা উচিত। সূরা আল ইসরা এর ৯নং আয়াতে আল্লাহ বলেন, “এই কুরআন এমন পথ প্রদর্শন করে যা সর্বাধিক সরল ..”। (১৭:৯)। কাজেই স্বামী এবং স্ত্রী যদি আল্লাহ নির্দেশ মোতাবেক পরিচালিত হয়, ইসলাম প্রদত্ত পরস্পরের হকসমূহ আদায় করে, অন্যকে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করে এবং নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন থাকে তবে আশা করা যায় বিবাহ সফল হবে এবং দম্পতি সুখী হবে।”

বিয়ের প্রস্তাব এবং তার নিয়ম

কেউ যখন কোনো নারীকে বিবাহ করতে আগ্রহী হয় তার জন্য সমীচীন হলো ওই মেয়ের অভিভাবকের মাধ্যমে তাকে পেতে চেষ্টা করা। আর এর জন্য রয়েছে কিছু মুস্তাহাব ও ওয়াজিব কাজ, যা উভয়পক্ষের আমলে নেওয়া উচিত :

১। শরীয়তে বিয়ের প্রস্তাব কী বুঝায় : এমন ব্যক্তির পক্ষ থেকে বিয়ে করতে চাওয়া যার কাছ থেকে এমন প্রস্তাব গ্রহণ হতে পারে। এটি বিবাহ পর্ব সূচনাকারীদের প্রাথমিক চুক্তি। এটি বিবাহের ওয়াদা এবং বিবাহের প্রথম পদক্ষেপ।

২। ইস্তিখারা করা : মুসলিম নর-নারীর জীবনে বিবাহ একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। তাই যখন তারা বিবাহের সিদ্ধান্ত নেবেন তাদের জন্য কর্তব্য হলো ইস্তিখারা তথা আল্লাহর কাছে কল্যাণ কামনা করা। জাবির রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

عَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُعَلِّمُنَا
الِاسْتِخَارَةَ فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا، كَالسُّورَةِ مِنَ الْقُرْآنِ : (إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالْأَمْرِ
فَلْيَرْكَعْ رَكَعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ، ثُمَّ يَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ، وَ
أَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، وَ
تَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ
لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أُمْرِي - أَوْ قَالَ : فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ - فَاقْدُرْهُ لِي،
وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أُمْرِي - أَوْ قَالَ :
فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ - فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، وَاقْدِرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ
كَانَ، ثُمَّ رَضِّنِي بِهِ. (وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ.)

‘যখন তোমাদের কেউ গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে চায় সে যেন
দু’রাকাত নফল নামাজ পড়ে অতপর বলেঃ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ
فَإِنَّكَ تَقْدِرُ، وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ، وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ
تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أُمْرِي، أَوْ قَالَ عَاجِلِ أَمْرِي
وَآجِلِهِ - فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ
لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أُمْرِي، أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ - فَاصْرِفْهُ
عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدِرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي.

হে আল্লাহ, আমি আপনার ইলমের মাধ্যমে আপনার নিকট কল্যাণ
কামনা করছি। আপনার কুদরতের মাধ্যমে আপনার নিকট শক্তি
কামনা করছি এবং আপনার মহা অনুগ্রহ কামনা করছি। কেননা
আপনি শক্তিধর, আমি শক্তিহীন, আপনি জ্ঞানবান, আমি জ্ঞানহীন
এবং আপনি অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞানী। হে আল্লাহ, এই

কাজটি (এখানে উদ্দিষ্ট কাজ বা বিষয়টি উল্লেখ করবেন) আপনার জ্ঞান মোতাবেক যদি আমার দীন, আমার জীবিকা এবং আমার পরিণতির ক্ষেত্রে অথবা ইহলোক ও পরলোকে কল্যাণকর হয়, তবে তাতে আমাকে সামর্থ্য দিন।

পক্ষান্তরে এই কাজটি আপনার জ্ঞান মোতাবেক যদি আমার দীন, জীবিকা ও পরিণতির দিক দিয়ে অথবা ইহকাল ও পরকালে ক্ষতিকর হয়, তবে আপনি তা আমার থেকে দূরে সরিয়ে রাখুন এবং আমাকেও তা থেকে দূরে সরিয়ে রাখুন এবং কল্যাণ যেখানেই থাকুক, আমার জন্য তা নির্ধারিত করে দিন। অতঃপর তাতেই আমাকে পরিতুষ্ট রাখুন^{৩৩৬}।

৩। পরামর্শ করা : বিবাহ করতে চাইলে আরেকটি করণীয় হলো বিয়ে ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ, পাত্রী ও তার পরিবার সম্পর্কে ভালো জানাশুনা রয়েছে এমন ব্যক্তির সঙ্গে পরামর্শ করা।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীদের সঙ্গে অধিক পরিমাণে পরামর্শ করতেন। আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَكْثَرَ مَشُورَةً لِأَصْحَابِهِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

‘আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেয়ে অন্য কাউকে আপন সাথীদের সঙ্গে বেশি পরামর্শ করতে দেখি নি।’^{৩৩৭}

হাসান বসরী (রহঃ) বলেন,

^{৩৩৬} বুখারী : ১১৬৬; আবু দাউদ : ১৫৪০।

^{৩৩৭} তিরমিযী : ১৭১৪; বাইহাকী : ১৯২৮০।

ثلاثة فرجل رجل ورجل نصف رجل ورجل لا رجل فأما الرجل الرجل فذو
الرجل الذي هو نصف رجل فالذي له رأي ولا يشاور وأما الرأي والمشورة وأما
الرجل الذي ليس برجل فالذي ليس له رأي ولا يشاور

‘মানুষের মধ্যে তিন ধরনের ব্যক্তিত্ব রয়েছে : কিছু ব্যক্তি পূর্ণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, কিছু ব্যক্তি অর্ধেক ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এবং কিছু ব্যক্তি একেবারে ব্যক্তিত্বহীন। পূর্ণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ব্যক্তি সেই, যিনি সিদ্ধান্ত নিতে পারেন এবং পরামর্শও করেন। অর্ধেক ব্যক্তিত্বসম্পন্ন সেই, যিনি সিদ্ধান্ত নিতে পারেন তবে পরামর্শ করেন না। আর ব্যক্তিত্বহীন ব্যক্তি তিনিই, যিনি সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না আবার কারো সঙ্গে পরামর্শও করেন না।’^{৩৩৮} এদিকে পরামর্শদাতার কর্তব্য বিশ্বস্ততা রক্ষা করা। তিনি যেমন তার জানা কোনো দোষ লুকাবেন না, তেমনি অসদুদ্দেশ্যে আদতে নেই এমন কোনো দোষের কথা বানিয়েও বলবেন না। আর অবশ্যই এ পরামর্শের কথা কাউকে বলবেন না।

৪। কনে দেখাঃ কনে দেখার ক্ষেত্রে পাত্র পক্ষের মহিলারা ও পাত্র নিজে দেখতে পারেন। অন্য কোন পুরুষ লোক মেয়ে পক্ষের সাথে আলোচনা করতে পারবেন কিন্তু মেয়ে দেখতে পারবেন না। তবে পাত্রের নিজে দেখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ প্রসঙ্গে রাসূল (সাঃ) এর একটি হাদীস উল্লেখ করা যায়। যেমনঃ জাবের ইবন আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

^{৩৩৮} শিহাবুদ্দীন আবশীহী, আল-মুসতাতারিফ ফী কুল্লি মুসতায়রিফ : ১/১৬৬।

إِذَا خَظَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَقَدَرَ عَلَى أَنْ يَرَى مِنْهَا مَا يُعْجِبُهُ وَيَدْعُوهُ إِلَيْهَا
قَالَ جَابِرٌ: فَلَقَدْ خَظَبْتُ امْرَأَةً مِنْ بَنِي سَلِمْةَ فَكُنْتُ أَتَّخِبُ فِي أَصُولِ. فَلْيَفْعَلِ
النَّخْلَ حَتَّى رَأَيْتُ مِنْهَا بَعْضَ مَا أَعْجَبَنِي فَتَزَوَّجْتُهَا.

তোমাদের কেউ যখন নারীকে বিবাহের প্রস্তাব দেয়, অতপর তার পক্ষে যদি ওই নারীর এতটুকু সৌন্দর্য দেখা সম্ভব হয়, যা তাকে মুগ্ধ করে এবং মেয়েটিকে (বিবাহ করতে) উদ্বুদ্ধ করে, সে যেন তা দেখে নেয়।^{৩৩৯} শুধু তাই নয়, নবী করীম (ﷺ) সাহাবীদের নিজের চোখে পাত্রী দেখে পছন্দ করতে নির্দেশ বা উপদেশ দিয়েছেন। যেমনঃ আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ
قَالٍ لَا. قَالَ. أَنْظَرْتُ إِلَيْهَا «لَا أَنْصَارُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَادْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّ فِي أَغْيُنِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا».

‘আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ছিলাম। এমতাবস্থায় তাঁর কাছে এক ব্যক্তি এসে জানাল যে সে একজন আনসারী মেয়েকে বিয়ে করেছে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘তুমি কি তাকে দেখেছো?’ সে বললো, না। তিনি বললেন, যাও, তুমি গিয়ে তাকে দেখে নাও। কারণ আনসারীদের চোখে (সমস্যা) কিছু একটা রয়েছে’।^{৩৪০} ব্যাখ্যাঃ ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, ‘এ হাদীস থেকে জানা যায়, যাকে বিবাহ করতে ইচ্ছুক তাকে দেখে নেয়া

^{৩৩৯} বাইহাকী, সুনান কুবরা : ১৩৮৬৯।

^{৩৪০} মুসলিম : ৩৫৫০।

মুস্তাহাব।^{৩৪১} অধিকন্তু আরও বলা যায় যে, হাদীসটি হতে মোট দুটি কথা জানা যায়। একটি এই যে, নবী করীম (ﷺ) আনসার বংশের লোকদের চোখে একটা কিছু থাকার কথা বললেন এমন ব্যক্তিকে যে সেই বংশের একটি মেয়েকে বিবাহ করেছে। আর দ্বিতীয় কথা এই যে, রাসূলে করীম (সাঃ) আনসার বংশের মেয়ের স্বামীকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি সেই মেয়েটিকে দেখেছ কিনা? সে যখন দেখে নাই বলে জানাল, তখন নবী করীম (ﷺ) মেয়েটিকে দেখার জন্য তাকে নির্দেশ দিলেন। প্রথম কথাটি সম্পর্কে হাদীস ব্যাখ্যাকারগণ বলেছেনঃ এই রূপে বলা কল্যাণকামী ব্যক্তির জন্য সম্পূর্ণ জায়েয। এটি কোন গীবত নয়, নয় তারও বিষয়ে মিথ্যা দুর্নাম রটানো বা কোন রূপ বিদ্বেষ ছড়ানো বরং একটা প্রকৃত ব্যাপারের সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে পরিচিত করা মাত্র। কেননা আনসার বংশের মেয়েদের চোখে যদি এমন কিছু থাকে যা অন্য লোকদের পছন্দনীয় নাও হতে পারে, তা হলে সেই মেয়েকে নিয়ে দাম্পত্য জীবন সুখের নাও হতে পারে। তাই পূর্বাঙ্কেই সে বিষয়ে জানিয়ে দেয়া কল্যাণকামী ব্যক্তির দায়িত্বও বটে। কিন্তু আনসার বংশের লোকদের চোখে কি জিনিস থাকার কথা রাসূলে করীম (সাঃ) বলেছিলেন? কেউ কেউ বলেছেন, আনসার বংশের লোকদের চক্ষু আকারে ক্ষুদ্র হত। আর ক্ষুদ্র চোখ অনেকেই স্বাভাবিকভাবেই পছন্দ করে না। কেহ কেহ বলেছেন যে, তাদের চক্ষু নীল বর্ণের হত, যা অনেক

^{৩৪১} নববী, শারহ মুসলিম : ৯/১৭৯।

লোকেরই অপছন্দ। রাসূলে করীম (সাঃ) এই দিতেই ইঙ্গিত করিয়াছেন। মোট কথা, এটি কোন বিশেষ বংশ বা শ্রেণীর বিরুদ্ধে বিদ্বেষ প্রচারণাও নয় বরং রাসূলে করীম (সাঃ) - এর দ্বিতীয় কথাটি হতে জানা যায়, যে মেয়েকে বিবাহ করা হবে, তাকে দেখে নেয়া বাঞ্ছনীয়। বিবাহ করার পর স্বামীকে জিজ্ঞাসা করা যে, সে বিয়ে-করা-মেয়েটিকে দেখেছিল কিনা, এটিতে দুটির তাৎপর্য হতে পারে? হয় এটি হবে যে, বিবাহ করার পূর্বে তাকে দেখেছে কিনা নতুবা এই হবে যে, বিয়ে করার পর-পরই তাকে দেখেছে কিনা। আলোচ্য লোকটি বিবাহ করেছে, এই সংবাদ দেয়ার পর নবী করীম (ﷺ) তাকে চলে যেতে ও তাকে দেখতে বললেন- দেখতে হুকুম করলেন। অতএব, হাদীস আলোচনায় বলা যায় যে, প্রচলিত সামাজিক নিয়ম আমাদের দেশে রাসূল (ﷺ) এর সুন্নাহত পরিপন্থী। তাই এই সব নতুন নিয়ম বিদ'আত এবং বাতিল বলে বিবেচিত হবে তাতে কোন প্রকার সন্দেহ নেই। শুধু তাই নয়, আমাদের অনেকের ধারণা যে মামাতো বোন, খালাতো বোনদের মেয়ে বিয়ে করা জায়েজ নয় কারন তারা আমাদের ভাগ্নি বা ভাতিজী হয়। কিন্তু ইসলামের দৃষ্টিতে তাদের বিয়ে করা জায়েজ।

৫। এ্যাংগেজমেন্ট করা বা আংটি পড়ানো : ইদানীং পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণে বিয়েতে এ্যাংগেজমেন্ট করার রেওয়াজ ব্যাপকতা পেয়েছে। এই আংটি পরানোতে যদি এমন ধরে নেওয়া হয় যে এর মাধ্যমে বিবাহের কথা পাকাপোক্ত হয়ে গেল তবে তা শরীয়তের দৃষ্টিতে হারাম। কেননা, মুসলিম সমাজ বা শরীয়তে এর

কোনো ভিত্তি নেই। আরও নিন্দনীয় ব্যাপার হলো, এ আংটি প্রস্তাবদানকারী পুরুষ নিজ হাতে কনেকে পরিয়ে দেয়। কারণ, এ পুরুষ এখনো তার জন্য বেগানা। এখনো সে মেয়েটির স্বামী হয়নি। কেননা, কেবল বিবাহ চুক্তি সম্পাদিত হবার পরেই তারা স্বামী-স্ত্রী বলে গণ্য হবেন।^{৩৪২} শাইখ আলবানী (রহঃ) 'আদাবুয যিফাফ' গ্রন্থে বলেন, 'এতে মূলত কাফেরদের অন্ধানুকরণই প্রকাশ পায়। কেননা তা খ্রিস্টানদের সনাতন রীতি।

৬। বিবাহের আগে প্রস্তাবদানকারীর সঙ্গে বাইরে বের হওয়া বা নির্জনে অবস্থান করা : বিয়ের আগে প্রস্তাব দেয়া নারীর সঙ্গে নির্জন অবস্থান বা তার সঙ্গে ঘুরতে যাওয়া বৈধ নয়। কেননা, এখনো সে বেগানা নারীই রয়েছে। পরিতাপের বিষয়, আজ অনেক মুসলমানই তার মেয়েকে লাগামহীন ছেড়ে দিয়েছেন। ফলে তারা প্রস্তাবদানকারী পুরুষের সঙ্গে ঘরের বাইরে যায়! উপরন্তু তার সঙ্গে সফরও করে! ভাবখানা এমন যে মেয়েটি যেন তার স্ত্রী হয়ে গেছে।

৭। বর-কনের পারস্পরিক যোগাযোগ করা : প্রস্তাব দেয়া নারীর সঙ্গে ফোন বা মোবাইলে এবং চিঠি ও মেইলের মাধ্যমে শুধু বিবাহের চুক্তি ও শর্তাদি বোঝাপড়ার জন্য যোগাযোগের অনুমতি রয়েছে। তবে এ যোগাযোগ হতে হবে ভাব ও আবেগবিবর্জিত ভাষায়, যা একজন বেগানা নারী-পুরুষের জন্য বৈধ ভাবা হয় না। আর বলাবাহুল্য, বিবাহের প্রস্তাব প্রেরণকারী কনের কেউ নন, যাবৎ

^{৩৪২} ফাতাওয়া জামেয়া লিল-মারআতিল মুসলিমা।

না তারা বিবাহের বন্ধনে আবদ্ধ হয়। উল্লেখ্য, এ যোগাযোগ উভয়ের পিতার সম্মতিতে হওয়া শ্রেয়।

৮। একজনের প্রস্তাবের ওপর অন্যজনের প্রস্তাব না দেয়া : যে নারীর কোথাও বিয়ের কথাবার্তা চলছে তাকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়া বৈধ নয়। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ، أَوْ يَتْرُكْ

‘কেউ তার ভাইয়ের প্রস্তাবের ওপর যেন প্রস্তাব না দেয়, যাবৎ না সে তাকে বিবাহ করে অথবা প্রস্তাব প্রত্যাহার করে নেয়।’^{৩৪৩}

হ্যা, দ্বিতীয় প্রস্তাবদাতা যদি প্রথম প্রস্তাবদাতার কথা না জানেন তবে তা বৈধ। এ ক্ষেত্রে ওই নারী যদি প্রথমজনকে কথা না দিয়ে থাকেন তবে দু’জনের মধ্যে যে কাউকে গ্রহণ করতে পারবেন।

৯। ইদতে থাকা নারীকে প্রস্তাব দেয়া : বায়ান তালাক বা স্বামীর মৃত্যুতে ইদত পালনকারী নারীকে সুস্পষ্ট প্রস্তাব দেয়া হারাম। ইঙ্গিতে প্রস্তাব দেয়া বৈধ। কেননা, আল্লাহ ত্বালা বলেন,

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ

‘আর এতে তোমাদের কোন পাপ নেই যে, তোমরা নারীদেরকে ইশারায় যে প্রস্তাব করবে।’^{৩৪৪} তবে ‘রজঈ’ তালাকপ্রাপ্তা নারীকে সুস্পষ্টভাবে তো দূরের কথা আকার-ইঙ্গিতে প্রস্তাব দেয়াও হারাম। তেমনি এ নারীর পক্ষে তালাকদাতা ব্যক্তি ছাড়া অন্য কারও প্রস্তাবে

^{৩৪৩} বুখারী : ৫১৪৪; নাসাঈ : ৩২৪১।

^{৩৪৪} সূরা আল-বাকারা, আয়াত : ২৩৫।

সাড়া দেয়াও হারাম। কেননা এখনো সে তার স্ত্রী হিসেবেই রয়েছে।
(সুস্পষ্ট প্রস্তাব : যেমন এ কথা বলা, আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই। অস্পষ্ট প্রস্তাব : যেমন এ কথা বলা, আমি তোমার মতো মেয়েই খুঁজছি ইত্যাদি বাক্য)।

১০। উপযুক্ত পাত্রের প্রস্তাব প্রত্যাখান করা : উপযুক্ত পাত্র পেলে তার প্রস্তাব নাকচ করা উচিত নয়। আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إِذَا خَظَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَرَّوْجُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِضٌ

যদি এমন কেউ তোমাদের বিয়ের প্রস্তাব দেয় যার ধার্মিকতা ও চরিত্রে তোমরা সন্তুষ্ট তবে তোমরা তার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দেবে। যদি তা না করো তবে পৃথিবীতে ব্যাপক অরাজতা সৃষ্টি হবে।^{৩৪৫}

১১। মেয়ের কবুল বলাঃ আমাদের সমাজে আরেকটি বিদআত হচ্ছে বিয়ের দিন মেয়ের তিনবার কবুল বলা। বস্তুত মেয়ের কবুল বলার কোন প্রয়োজন বা বিধান নেই। বিয়ের দিন মেয়ের অবিভাবক মেয়ের বিয়েতে সম্মতি দিলে ছেলে কবুল বললেই বিয়ে হয়ে যায়। তাই বিয়ের দিন মেয়ের কোন কাজ নেই। অবিভাবক আগেই মেয়ের অনুমতি নিয়ে নিতে হয়। উল্লেখ্য মেয়ের অনুমতি ছাড়া বিয়ে হবেনা। যেমন রাসূল (ﷺ) এর একটি হাদীস এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। হাদীসটি হচ্ছেঃ হযরত আবু হুরায়রা

^{৩৪৫} তিরমিযী: ১০৮৪।

(রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলে করীম (ﷺ) বলেছেনঃ পূর্বে স্বামীসঙ্গ প্রাপ্তা কনের স্পষ্ট আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত তাকে বিবাহ দেয়া যাবে না এবং পূর্বে স্বামী অ-প্রাপ্তা কনের অনুমতি না পাওয়া পর্যন্ত তাকে বিবাহ দেয়া যাবে না। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, তাহলে অনুমতি কিভাবে নেয়া যেতে পারে? রাসূল (ﷺ) বললেনঃ তার চুপ থাকাই হলো (অনুমতি)^{৩৪৬}। পক্ষান্তরে আরেকটি হাদীসের উদাহরন এখানে উল্লেখ করা যায়। যেমনঃ যরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছেঃ তিনি বলেনঃ ইয়া রাসূল! কুমারী মেয়ে তো বিবাহের অনুমতি দিতে লজ্জাবোধ করে। তা হলে তার অনুমতি পাওয়া যাবে কিভাবে? রাসূলে করীম (ﷺ) বলেনঃ তার চুপ থাকাটাই তার অনুমতি ও রাযী থাকা বুঝাবে^{৩৪৭}। অতএব, হাদীসগুলো আলোচনা করে বলা যায় যে, প্রচলিত আমাদের দেশের বিবাহ পদ্ধতিতে তথা বিয়ের দিন মেয়ের তিনবার কবুল বলা শরীয়ত সম্মত নয় তথা বিদ'আত।

১২। ওকিল বানানোঃ বিয়ের দিনে ওকিল ও সাক্ষী দিয়ে মেয়ের অনুমতি নেয়ার প্রথা আমাদের দেশের অনেক জায়গায় প্রচলিত। মেয়ের অনুমতি নেওয়ার দায়িত্ব তার অভিভাবকের। তাই বাইরের কোন লোক, ওকিল বা সাক্ষী ইত্যাদি ইসলাম সম্মত নয়।

১৩। কবুল বলার পর সালাম করাঃ আমাদের দেশে আরেকটি বিদাত হলো কবুল বলার পর বর দাড়িয়ে সবাইকে সালাম করে।

^{৩৪৬} মুসলিম, বুখারী, নাসাঈ

^{৩৪৭} সহীহ মুসলিম

আসলে সালাম করতে হয় কারও সাথে দেখা হলে বা কোথাও গেলে বা বিদায় নেওয়ার সময়। বিয়ের অনুষ্ঠানের মাঝখানে দাড়িয়ে এভাবে সালাম দেয়ার প্রথা নবী (সঃ) এর আমলে ছিলোনা অর্থাৎ তা পরে আবিষ্কৃত।

১৪। বিয়ের মোহরানাঃ বিয়ের মোহরানা নির্ধারণের ক্ষেত্রে সামাজিক সম্মান বিবেচনা করে অসম্ভব বা অসাধ্য পরিমাণ মোহরানায় রাজী হওয়া বা বরপক্ষকে চাপ দিয়ে রাজী করানো ইত্যাদি শরীয়ত সম্মত নয়। নবী করীম (ﷺ) নগদ মোহরানা দিয়ে বিয়ে করেছেন বা সাহাবীদের সাধ্যমতো মোহরানা দেয়ে বিয়ে পড়িয়েছেন। মোহরানা হতে পারে টাকা পয়সা, জমিজমা, অলংকার এমনকি জ্ঞান বা শিক্ষাও হতে পারে।

১৫। বিয়ের অনুষ্ঠানঃ আমাদের দেশে বিয়ের অনুষ্ঠান উপলক্ষে যেসব প্রচলিত রসম বা কুপ্রথা বা বিদআতী কাজ পরিলক্ষিত হতে দেখা যায় তা নিম্নে আলোচনা করা হলোঃ-

১- বিয়েতে পুরুষদের বর্জনীয় কাজ - দাঁড়ি মুগুন করা : আল্লাহর রাসূলের নির্দেশ অমান্য করে বিয়ে উপলক্ষে দাঁড়ি মুগুনো তো এখন অনেকের কাছেই অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। দাঁড়ি না কামিয়ে বিয়েতে যাওয়াকে অনেকে দোষের মনে করেন। অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ وَفَرُّوا اللَّحْيَ وَأَخْفُوا الشَّوَارِبَ

'তোমরা মুশরিকদের বিরোধিতা করো : দাড়ি বড় করো এবং গোঁফ ছোট করো'।^{৩৪৮} হাদীসে দাড়ি রাখতে সুস্পষ্ট নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে, যা থেকে প্রমাণিত হয় দাড়ি রাখা ওয়াজিব। কোনো অজুহাত দাঁড় করিয়ে দাড়ি কাটার অবকাশ নেই। দাড়ি মুগুনো হারাম। মুগুনকারী গুনাহগার। কারণ, এতে কাফের ও নারীদের সঙ্গে সাদৃশ্য অবলম্বন করা হয়। সরাসরি লজ্জিত হয় আল্লাহর রাসূলের নির্দেশ।

২- বিয়েতে নারীদের বর্জনীয় কাজসমূহ :

১. ঙ্র উপড়ানো : ঙ্র উপড়ানো বা পাতলা করা এমন একটি কাজ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা হারাম করেছেন এবং এ কাজ করা ব্যক্তির ওপর অভিশাপ দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন,

لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْتَامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ
لِلْخُسْنِ الْمُغْيِرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ

'আল্লাহ অভিসম্পাত করেছেন সেসব মহিলার ওপর যারা সৌন্দর্যের জন্য উক্কি অঙ্কন করে ও করায়, ঙ্র উৎপাটন করে ও করায় এবং দাঁত ফাঁকা করে'।^{৩৪৯}

২. চুল কাটা : চুল কাটার তিনটি ধরন রয়েছে : এক. পুরুষের সাদৃশ্য গ্রহণ করে চুল কাটা। এটি হারাম এবং কবীরা গুনাহ। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুরুষদের সাদৃশ্য

^{৩৪৮} বুখারী : ৫৮৯২; মুসলিম : ৬২৫।

^{৩৪৯} মুসলিম : ৫৬৯৫।

অবলম্বনকারী নারীদের অভিসম্পাত করেছেন। এখানে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর একটি হাদীস উল্লেখ করা যায়। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এ প্রসঙ্গে বলেনঃ

ثَلَاثٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، وَلَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : الْعَاثُ بِوَالِدَيْهِ،
وَالْمَرْأَةُ الْمُتَرَجِّلَةُ - الْمُتَشَبِّهَةُ بِالرِّجَالِ - وَالذَّيُّوثُ

‘তিন ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না এবং কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের দিকে তাকাবেন না : পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান, পুরুষের সাদৃশ্য অবলম্বনকারী নারী এবং কোটনা তথা ব্যভিচারের দূত।’^{৩৫০}

দুই. যদি চুল ছোট করা হয় এমনভাবে যে তাতে পুরুষের সাদৃশ্য গ্রহণ হয় না তবে ইমাম আহমদ (রহঃ) - এর মতে তা মাকরুহ।

তিন. যদি চুল ছোট করা হয় অমুসলিম রমণীদের অনুকরণে তবে তা হারাম। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

‘যে বিজাতির সাদৃশ্য অবলম্বন করবে সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত।’^{৩৫১}

৩. অশ্লীল কিংবা প্রসিদ্ধি ও অহংকারের পোশাক পরা : অতি টাইট, পাতলা ও গোপন সৌন্দর্যকে প্রস্ফুটিত করে এমন পোশাক পরা। বক্ষ, বাহু ও কটি দৃশ্যমান হয় এমন অপ্রচলিত ও দৃষ্টিকটু পোশাক পরে অহংকার দেখানো এবং পর পুরুষের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করা। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

^{৩৫০}. মুসনাদ আহমদ : ৬১৮০।

^{৩৫১}. আবু দাউদ : ৪০৩৩।

صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ
وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَّاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلْنَ
الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةٍ كَذَا وَكَذَا.

‘দুই শ্রেণীর জাহান্নামী লোক যাদের আমি এখনো দেখিনি। (তবে তারা অচিরেই সমাজে দেখা দেবে) এক. সন্তাসী দল, তাদের সাথে গরুর লেজ সদৃশ চাবুক থাকবে। তারা এর দ্বারা লোকজনকে আঘাত করবে।

দুই. এমন নারী যারা (পাতলা ফিনফিনে কাপড়) পরিহিতা অথচ উলঙ্গ, অপরকে আকর্ষণকারিণী আবার নিজেরাও অপরের দিকে আকৃষ্ট। তাদের মস্তকগুলো হবে বুখতি উটের হেলানো কুজের মতো। এরা জান্নাতে প্রবেশ করবে না, এমনকি জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না। অথচ জান্নাতের ঘ্রাণ এমন এমন দূরত্ব থেকেও পাওয়া যায়’^{৩৫২}। অপর এক হাদীসে তিনি বলেন,

مَنْ لَبَسَ ثَوْبَ شَهْرَةٍ فِي الدُّنْيَا، أَلْبَسَهُ اللَّهُ ثَوْبَ مَذَلَّةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

‘যে ব্যক্তি প্রসিদ্ধির পোশাক পরিধান করবে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে লাঞ্ছনার পোশাক পরাবেন’^{৩৫৩}।

৪. সুগন্ধি ব্যবহার করা : বিবাহ অনুষ্ঠানে ইদানীং মেয়েরা বিশেষত তরুণীরা মহা উৎসাহে সেন্ট ব্যবহার করে অংশগ্রহণ করে। অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ، فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا رِيحَهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ

^{৩৫২}. মুসলিম : ৫৭০৪; বাইহাকী : ৩৩৮৬।

^{৩৫৩}. আবু দাউদ : ৪০২৩; ইবন মাজাহ : ৩৬০৩।

‘যে নারী সুগন্ধি ব্যবহার করে অতপর মানুষের পাশ দিয়ে অতিক্রম করে যাতে তার সুগন্ধি পায়, সে ব্যভিচারিণী’^{৩৫৪}।

৫. ছবি তোলা : নারী-পুরুষ কারো জন্য কোনোভাবে কোনো ছবি বা ফটো বিনিময় বৈধ নয়। কারণগুলো নিম্নরূপঃ আলোচনা করা হলোঃ-

প্রথমত. এ ছবি অন্যরাও দেখার সম্ভাবনা রয়েছে, যাদের জন্য তা দেখার অনুমতি নেই।

দ্বিতীয়ত. ছবি কখনো পূর্ণ সত্য তুলে ধরে না। প্রায়শই এমন দেখা যায়, কাউকে ছবিতে দেখে বাস্তবে দেখলে মনে হয় তিনি একেবারে ভিন্ন কেউ।

তৃতীয়ত. কখনো এমন হতে পারে যে প্রস্তাব ফিরিয়ে নেয়া হয় বা প্রত্যাখ্যাত হয় অথচ ছবি সেখানে রয়েই যায়। ছবিটিকে তারা যাচ্ছে তাই করতে পারে। তাছাড়া প্রয়োজন ব্যতীরেকে ইসলাম শরীয়তে ছবি তোলা নিষিদ্ধ। কারন এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

كُلُّ مُصَوِّرٍ فِي النَّارِ

‘প্রত্যেক ছবি অঙ্কনকারীই জাহান্নামে যাবে’^{৩৫৫}।

অতএব সেই ছবি সম্পর্কে আর কী বলার প্রয়োজন আছে যা পর পুরুষের হাতে প্রিন্ট হয়, পর পুরুষরা দেখে এবং তার প্রতি আকৃষ্ট হয়।

^{৩৫৪}. নাসাঈ : ৯৩৬১; আহমদ : ১৯৭২৬।

^{৩৫৫}. মুসলিম : ৫৬৬২।

৬. দাওয়াত খাওয়ানো ও নব দম্পত্তির জন্য দু'আ করাঃ আমাদের দেশের প্রচলিত বিয়ের ক্ষেত্রে মেয়ে পক্ষ ঘটা করে অনুষ্ঠান করে লোক দাওয়াত দিয়ে খাওয়ায়। ইসলামী দৃষ্টিতে মেয়ে পক্ষের অনুষ্ঠান করা বা লোক খাওয়ানোর কোন বিধান নেই। তবে কেউ যদি বিয়ের দাওয়াত দেয় তাহলে সে দাওয়াত কবুল করা সুন্নত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا.

'তোমাদের কাউকে যখন বৌভাতের দাওয়াত দেয়া হয়, সে যেন তাতে অংশ নেয়'^{৩৫৬}। অপর এক হাদীসে তিনি বলেন,

وَمَنْ لَمْ يَجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ.

'আর যে দাওয়াত কবুল করল না সে যেন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যাচরণ করল।'^{৩৫৭} কিন্তু আমাদের দেশে সামাজিক নিয়মের চাপে পড়ে বাবা মা ধারদেনা করে বিয়ের আয়োজন করে আর বরপক্ষ বরযাত্রী নিয়ে ধুমধাম করে এসে দাওয়াত খায়। উপরন্তু খাবার দাবারে সমস্যা হলে মেয়ে পক্ষকে দু একটি কথা না শুনিয়ে ছাড়ে না। তাছাড়া দাওয়াত কবুল করার পাশাপাশি নব-দম্পত্তির জন্য দু'আ করা উচিত কিন্তু আমাদের দেশে এর সঠিক প্রথা একদম পরিলক্ষিত হতে দেখা যায় না বললেই চলে। অথচ নব দম্পত্তির জন্য দু'আ করা সুন্নত। দোআটি হলো - আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু

^{৩৫৬}. বুখারী : ৫১৭৩; মুসলিম : ৩৫৮২।

^{৩৫৭}. মুসলিম : ৩৫৯৮।

আনহু থেকে বর্ণিত, যখন কোনো ব্যক্তি বিবাহ করত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন,

بَارَكَ اللَّهُ لَكَ، وَبَارَكَ عَلَيْكَ، وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ.

‘আল্লাহ তোমার জন্য বরকত দিন, তোমার ওপর বরকত দিন এবং তোমাদের উভয়েক কল্যাণে মিলিত করুন’^{৩৫৮}।

৭. গান বাজনাঃ বিয়ের অনুষ্ঠানে আজকাল গান বাজনা করতেও দেখা যায় যা ইসলাম শরীয়তে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। নিম্নোক্ত প্রমাণসমূহের ভিত্তিতে গান-বাজনা হারাম তা স্পষ্টভাবে বলা যায়।

ক. পবিত্র কুরআন থেকে : আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ (৬) وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَن فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَسَّشْهُ بَعْذَابٍ أَلِيمٍ

‘আর মানুষের মধ্য থেকে কেউ কেউ না জেনে আল্লাহর পথ থেকে মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য বেহুদা কথা খরিদ করে, আর তারা ঐগুলোকে হাসি-ঠাট্টা হিসেবে গ্রহণ করে; তাদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাকর আযাব। আর তার কাছে যখন আমার আয়াতসমূহ পাঠ করা হয় তখন সে দম্ভভরে মুখ ফিরিয়ে নেয়, যেন সে শুনতে পায়নি, তার দু‘কানে যেন বধিরতা; সুতরাং তাকে যন্ত্রণাদায়ক আযাবের সুসংবাদ দাও’^{৩৫৯}। আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, ‘আল্লাহর কসম, বেহুদা কথা দ্বারা এখানে উদ্দেশ্য

^{৩৫৮}. আবু দাউদ, সুনান : ২১৩০।

^{৩৫৯}. সূরা লুকমান : ৬-৭।

গান।' এ কথা তিনি তিনবার আওড়ান। আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু জাবের রাদিআল্লাহু আনহু ও ইকরামা রাদিআল্লাহু আনহু থেকেও এমনটি বর্ণিত হয়েছে।

খ. হাদীস থেকে : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحَرَ وَالْحَرِيرَ وَالْحُمْرَ وَالْمَعَارِفَ وَلَيُنْزِلَنَّ أَقْوَامٌ إِلَى جَنْبِ عَلِمٍ يَرُوحُ عَلَيْهِمْ بِسَارِحَةٍ لَهُمْ يَأْتِيهِمْ، يَغْنِي الْفَقِيرَ - لِحَاجَةٍ فَيَقُولُوا ارْجِعْ إِلَيْنَا غَدًا فَيَبْيِئُهُمُ اللَّهُ وَيَضَعُ الْعِلْمَ وَيَمْسَخُ آخِرِينَ قِرْدَةً وَخَنَازِيرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

'আমার উম্মতের মধ্যে একদল লোক এমন হবে যারা ব্যভিচার, রেশমি বস্ত্র পরিধান, মদ পান এবং বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার ইত্যাদি হালাল মনে করবে। আর কিছু লোক এমন হবে যারা একটি পর্বতের কাছে অবস্থান করবে এবং সন্ধ্যাবেলায় তাদের মেষপালক তাদের কাছে মেষগুলো নিয়ে আসবে এবং তাদের কাছে কিছু চাইবে। তখন তারা বলবে, আগামীকাল ফেরত এসো। রাতের বেলায় আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ধ্বংস করে দেবেন এবং তাদের ওপর পর্বত ধ্বসিয়ে দেবেন। বাকি লোকদেরকে তিনি বানর ও শূকরে পরিণত করে দেবেন এবং শেষ বিচারের দিন পর্যন্ত তারা এই অবস্থায় থাকবে'।^{৩৬০} রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন,

إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيَّ، أَوْ حُرَّمَ الْحُمْرُ، وَالْمَيْسِرُ، وَالْكُوبَةُ قَالَ: وَكُلُّ مُشْكِرٍ حَرَامٌ

'আল্লাহ আমার ওপর হারাম করেছেন অথবা (তিনি বলেছেন) মদ, জুয়া ও তবলা হারাম করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, আর প্রতিটি নেশাজাতীয় দ্রব্যই হারাম।'^{৩৬১}

^{৩৬০}. বুখারী : ৫৫৯০।

^{৩৬১}. আবু দাউদ : ৩৬৯৬।

গ. সাহাবীদের উক্তি থেকে : আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু বলেন,

الدُّفُّ حَرَامٌ وَالْمَعَازِفُ حَرَامٌ وَالْكُوبَةُ حَرَامٌ وَالْمِزْمَارُ حَرَامٌ.

‘দফ হারাম, বাদ্যযন্ত্র হারাম, তবলা হারাম এবং বাঁশি হারাম।’^{৩৬২}

ঘ. সালাফের উক্তি থেকে : প্রখ্যাত বুয়ুর্গ হাসান বসরী (রহঃ) বলেন, মুসলিমের জন্য দফ বাজানো কিছুতেই শোভনীয় নয়, আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদিআল্লাহু আনহু -এর শিষ্যগণ দফ ভেঙ্গে ফেলতেন।^{৩৬৩}

উল্লেখ্য, গান ও বাদ্যযন্ত্র হারাম হওয়ার ব্যাপারে সকল ইমাম একমত। তবে বিয়ের ঘোষণার স্বার্থে শুধু দফ বাজানো এবং নির্দোষ সঙ্গীত গাওয়ার অনুমতি রয়েছে। তবে সে সঙ্গীতে রূপের বর্ণনা কিংবা অবৈধ কিছুর আহ্বান না থাকতে হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

فَضْلُ مَا بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ الصَّوْتُ، وَضَرْبُ الدُّفِّ.

‘হালাল ও হারাম বিয়ের মধ্যে পার্থক্য কেবল ঘোষণা ও দফ বাজানো।’^{৩৬৪}

৪- বিয়েতে হারাম কাজ হলেও তাতে অংশ নেয়া : বিয়ের অনুষ্ঠানে যদি নিষিদ্ধ কিছুর আয়োজন থাকে তবে তাতে অংশ নেয়ার অনুমতি নেই। আলী রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

^{৩৬২}. বাইহাকী : ২১৫২৯।

^{৩৬৩}. আলবানী, তাহরীমু আলাতিত-তারব : ১/১০৪।

^{৩৬৪}. তিরমিযী : ১১১১; মুসনাদ আহমদ : ১৮৩০৫।

صَنَعْتُ طَعَامًا وَدَعَوْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ، فَرَأَى فِي الْبَيْتِ
تَصَاوِيرَ فَرَجَعَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ رَجَعْتَ؟ قَالَ: إِنَّ فِي الْبَيْتِ شَيْئًا فِيهِ
تَصَاوِيرُ وَأَنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ تَصَاوِيرُ.

'আমি একটি খাবার তৈরি করলাম এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দাওয়াত দিলাম। ফলে তিনি এলেন। তারপর ঘরে ছবি দেখতে পেয়ে ফেরত এলেন। আমি তখন জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনি ফিরে এলেন কেন? তিনি বললেন, 'ঘরে কিছু রয়েছে যাতে ছবি আঁকা। আর যে ঘরে ছবি থাকে তাতে ফেরেশতা প্রবেশ করেন না'^{৩৬৫}। এ হাদীসের আলোকে আলিমগণ বলেন, যে দাওয়াতে নিষিদ্ধ বিষয় রয়েছে, তা বর্জন করা উচিত। ইমাম আওয়ায়ী (রহঃ) বলেন, 'সে ঘরে বিয়ের দাওয়াতে যাওয়া যাবে না, যেখানে তবলা এবং বাদ্যযন্ত্র রয়েছে'^{৩৬৬}। বস্তুতঃ এসবই ইসলামের নিয়মের বাইরে আমাদের সামাজিক প্রথা যা একেতো অন্যায় এবং তা ইসলামী সংস্কৃতির সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ। তবে কেউ যদি বিয়ের দাওয়াত দেয় তাহলে সে দাওয়াত কবুল করা সুন্নত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا.

'তোমাদের কাউকে যখন বৌভাতের দাওয়াত দেয়া হয়, সে যেন তাতে অংশ নেয়'^{৩৬৭} - অপর এক হাদীসে তিনি বলেন,

وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ.

^{৩৬৫}. প্রাগুক্ত।

^{৩৬৬}. মুসনাদ বাযযার : ৫২৩; ইবন মাজা : ৩৩৫৯।

^{৩৬৭}. বুখারী : ৫১৭৩; মুসলিম : ৩৫৮২।

‘আর যে দাওয়াত কবুল করল না সে যেন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যাচরণ করল।’^{৩৬৮}

৮। মালামাল দেয়াঃ বিয়েতে কনে পক্ষ বিয়ের দিন বরের বাড়ীতে যে মালামাল পাঠায় তাও ইসলামী সংস্কৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য পূর্ণ নয়। এগুলো বেদাত এবং তাতে মেয়ে পক্ষের উপর খরচের চাপ পড়ে। এবং এ খরচ মিটাতে গিয়ে মেয়ের বাবা মা ধার দেনা গ্রস্থ হয়ে পরেন।

৯। উপহার নেয়াঃ আমাদের দেশী বিয়েতে উপহার নেওয়ার প্রথা রয়েছে। শুধু তাই নয়, বিয়েতে উপহার নিয়ে তা লিপিবদ্ধ করে রাখা হয়। গেইট দিয়ে ঢুকেই উপহার গ্রহনকারী লোক জনের মুখামুখি হতে হয়। এতে যারা উপহার নিয়ে আসেন নি বা উপহার আনার সামর্থ্য যাদের নেই তারা ভীষন বিব্রতকর পরিস্থিতির মুখে পড়েন। উপহার লিপিবদ্ধ করার কারনে দামী উপহার না দিলে সামাজিক অবস্থান হারানোর একটা আশংকা থাকায় অনেকে বাধ্য হয়ে দামী উপহার দিতে বাধ্য হন। ওনেকে উপহার সামগ্রী দেওয়ার অসামর্থ্যের কারনে বিয়েতে আসেন না। উপহার সামগ্রী দেওয়া একটা সওয়াবের কাজ কিন্তু এভাবে পরোক্ষ চাপ দিয়ে উপহার সামগ্রী আদায় করা সম্পূর্ণ অনৈসলামিক।

১০। ওয়ালিমা না করাঃ আমাদের দেশ প্রচলিত বিয়েতে মেয়ে পক্ষ ঘটা করে অনুষ্ঠান করলেও ছেলে পক্ষ অনেক ক্ষেত্রে ওয়ালিমা করেনা। এটা শরীয়তের দৃষ্টিতে পুরো উল্টা সিস্টেম। ইসলামে মেয়ে

^{৩৬৮}. মুসলিম : ৩৫৯৮।

পক্ষের অনুষ্ঠান করা বা লোক খাওয়ানোর বিধান নেই কিন্তু ছেলে পক্ষের ওয়ালিমা করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। কিছু কিছু আলেম ওয়াজিব ও বলেছেন।

নাবী করীম (সঃ) সাহাবী আব্দুর রহমান বিন আওয়াফ (রাঃ) এর বিয়ের পর তাকে বল্লেন যে, কমপক্ষে একটা ছাগল দিয়ে হলেও ওয়ালিমা করো। ওয়ালিমার দাওয়াতের ক্ষেত্রে গরীবদের অবশ্যই প্রাধান্য দিতে হবে।

আবু হুরায়রা (রাঃ) কতৃক বর্ণিত, “নাবী করীম (সাঃ) বলেছেন, সবচেয়ে নিকৃষ্ট খাবার হচ্ছে সে ওয়ালিমার খাবার যেখানে ধনীদেবকে তো ডাকা হয় কিন্তু ফকির গরীবদের কে ডাকা হয়না।” তিনি আরও বলেন- “যে ব্যক্তি ওয়ালিমার দাওয়াত ছেড়ে দিলো সে আল্লাহ ও রাসুল (সাঃ) এর সাথে নাফরমানী করলো। চাই তাই কোন জরুরী কোন কাজ বা সমস্যা না হলে অবশ্যই ওয়ালিমার আসতে হবে। কেননা বিয়ের আরেকটি সুন্নত হলো অলীমা করা তথা মানুষকে দাওয়াত করে খাওয়ানো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কাজে উদ্বুদ্ধ করেছেন। এমনকি তিনি আবদুর রহমান বিন আউফ রাদিআল্লাহু আনহু -এর উদ্দেশে বলেন,

أُولِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ.

‘অলীমা কর, হোক না তা একটি ছাগল দিয়ে হয়।’^{৩৬৬}

১১। মেয়ে পক্ষের খরচ করাঃ ইসলাম সম্মত বিয়েতে বিয়ের সময় বা বিয়ের অনুষ্ঠানে মেয়ে পক্ষের খরচ করার মতো তেমন কিছু

^{৩৬৬}. বুখারী : ২০৪৯; মুসলিম : ৩৫৫৬।

নেই। বিয়েতে মোহরানা দিবে ছেলে। ওয়ালিমা করবে ছেলে। কনে ঘরে আনার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ঘরের আসবাব পত্রের ব্যবস্থা করবে ছেলে। অথচ আমাদের দেশে হয় ঠিক তার উল্টো। যৌতুক দেয় মেয়ে পক্ষ, অনুষ্ঠান করে লোক খাওয়ায় মেয়ে পক্ষ, মেয়ের সাথে প্রয়োজনীয় ফার্নিচার বা আসবাব দেয় মেয়ে পক্ষ। এসবই হচ্ছে বিদাতী প্রথা।

১২। আরও কিছু বিদ'আতী প্রথাঃ আরও কিছু কুপ্রথা আমাদের দেশে প্রচলিত আছে যেমন, বিয়ের পরে মেয়ে কর্তৃক শশুরের পায়ে তেল মালিশ করে দেয়া। এটা বিদ'আতী প্রথা। যেমনঃ বিয়ের পরে মেয়ে পক্ষের পক্ষ হতে রমজানে ইফতার দেয়া, মৌসুমী ফল পাঠানো, ঈদের সময় কাপড় চোপার পাঠানো ইত্যাদিতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে চাপ প্রয়োগ করা বা সামাজিক চাপের কারনে মেয়ে পক্ষ তা দিতে সম্মত হলেও তাদের কষ্ট হবে জেনেও ছেলে তা পাঠাতে বারণ না করা ইসলামের দৃষ্টিতে গর্হিত কাজ। এটি জুলুম ও বটে। আমাদের সমাজে কিছু বিভ্রান্তি আছেন যারা মনে করেন যে, তাদের সামর্থ্য আছে তাই তারা মেয়ের বিয়েতে দাওয়াত দিয়ে ঘটা করে লোক খাওয়াবেন বা মেয়ের সাথে আসবাব পত্র দিবেন ইত্যাদি ইত্যাদি।

উপহার সামগ্রী দেওয়া ভালো কিন্তু এক্ষেত্রে তাদের খেয়াল রাখা উচিত তাদের এই কাজের ফলে একটি বিদ'আতী প্রথা প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে কি না যাতে পরে অন্য একজন অসামর্থ্যবান পিতা তার মেয়ের বিয়েতে তা করতে পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে বাধ্য হন। যদি

তাই হয় তাহলে তাই এই প্রথা প্রতিষ্ঠিত করার কারনে ঐ বিভবান ব্যক্তি গোনহগার হবেন। সবচেয়ে ভালো হয় উপহার সামগ্রী সবার অগোচরে নির্দিষ্ট ব্যক্তির নিকট প্রদান করা।^{৩৭০}

উপরোক্ত আলোচনায় বলা যায় যে, মানব জীবনে বিয়ের গুরুত্ব অপরিসীম। বিয়ে মানুষকে দায়িত্ববান বানায়। জীবনে আনে স্বস্তি ও প্রশান্তি। বিয়ের মাধ্যমে নারী-পুরুষ সক্ষম হয় যাবতীয় পাপাচার ও চারিত্রিক স্থলন থেকে দূরে থাকতে। অব্যাহত থাকে বিয়ের মধ্য দিয়ে পৃথিবীতে মানব সভ্যতার ধারা। বৈধ ও অনুমোদিত পন্থায় মানুষ তার জৈবিক চাহিদা মেটায় কেবল এ বিয়ের মাধ্যমে। এককথায় বিয়েতে রয়েছে প্রভূত কল্যাণ ও অননুমোদিত উপকারিতা। বিয়ের বিবিধ কল্যাণের প্রতি ইঙ্গিত করে আল্লাহ তা'আলা তাই ইরশাদ করেন,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

‘আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের থেকেই স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে প্রশান্তি পাও। আর তিনি তোমাদের মধ্যে ভালবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয় এর মধ্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে সে কওমের জন্য, যারা চিন্তা করে।’^{৩৭১} বিয়ের সঙ্গে পৃথিবীতে মানুষের বংশ ধারার সম্পর্ক নির্দেশ করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

^{৩৭০} ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার আয়োজিত শায়খ মতিউর রহমান এর ওয়াজ “বিবাহ নবীগনের সুন্নাতের অবলম্বনে লেখা।

^{৩৭১} ক্রম : ২১।

تَزَوَّجُوا الْوُلُودَ الْوُدُودَ، فَإِنِّي مُكَاثِّرٌ بِكُمْ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

'তোমরা অধিক সন্তানদানকারী স্বামীভক্ত নারীদের বিয়ে করো। কেননা কিয়ামতের দিন আমি তোমাদের (সংখ্যা) নিয়ে নবীদের সামনে গর্ব করবো'^{৩৭২}। সুতরাং বলাবাহুল্য যে, বিয়ে করা একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। অতএব, কেউ যখন বিয়ে করবেন তার উচিত বিয়ের করণীয় ও বর্জনীয় বিষয়গুলো সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা অর্জন করা। প্রিয় পাঠক-পাঠিকা, আজ আমাদের ভেবে দেখা দরকার, ইসলামের আদর্শ কোথায় আর আমরা কোথায়। ইসলাম কী বলে আর আমরা কী করি। আমরা কি অস্বীকার করতে পারি যে, এসব আদর্শ আজ আমাদের আমলের বাইরে চলে গেছে। আমাদের যাপিত জীবনে ইসলামের বিমল রঙ ফিকে হয়ে এসেছে। সত্যি কথা বলতে গেলে, আমরা বরং বর্জনীয় কাজগুলো করি আর করণীয়গুলো ভুলে থাকি। আল্লাহ মাফ করুন। এ কারণেই আমাদের বিয়ে-শাদীতে বরকত নেই। বিবাহিত জীবনে সুখ নেই। দাম্পত্য জীবনের সুখ আজ সোনার হরিণে পরিণত হয়েছে। প্রকৃত সুখের পরশ পেতে হলে, সুখ পাখির আগুন ডানা ছুঁতে হলে আজ আমাদের তাই ইসলামের কাছেই ফিরে আসতে হবে। ইসলামের আদর্শকেই আকড়ে ধরতে হবে। শুধু কনে দেখা আর বিয়ে-শাদীতেই নয়; জীবনের প্রতিটি কর্মে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। মুখে নয়; কাজে পরিণত করতে হবে তাঁর উম্মত দাবী। প্রিয় ভাই ও বোনেরা,

^{৩৭২}. মুসনাদ আহমাদ : ১২৬৩৪।

এসব কাজ থেকে একটু বিরত হোন। নিজেকে রক্ষা করুন এবং আল্লাহ হিসাব নেয়ার আগে নিজে নিজের হিসাব নিন। কেননা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عُمْرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ وَعَنْ عِلْمِهِ فِيمَا فَعَلَ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَينَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ وَعَنْ جَسَدِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ.

'কিয়ামতের দিন কোনো বান্দার পা নড়বে না যাবৎ না তাকে প্রশ্ন করা হবে তার হায়াত সম্পর্কে : কোন কাজে তা ব্যয় করেছে, জিজ্ঞেস করা হবে তার ইলম সম্পর্কে : তার কতটুকু আমল করেছে, প্রশ্ন করা হবে তার সম্পদ বিষয়ে : কোথেকে তা উপার্জন করেছে এবং কোথায় তা খরচ করেছে এবং জিজ্ঞেস করা হবে তার দেহ সম্পর্কে : কোথায় তা কাজে লাগিয়েছে।'^{৩৭৩}

পরিশেষে বলা যায় যারা নিজের জীবনের প্রতিটি পর্বকে কুরআন-সুন্নাহর আদলে গড়ে তোলেন এবং সর্ব প্রকার নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত থাকেন, আশা করা যায় তারাই হবেন সফল ও কামিয়াব। তাদের মৃত্যু হবে পরম সৌভাগ্যকে সঙ্গে নিয়ে। আর তারাই হলেন সে দলের অন্তর্ভুক্ত আল্লাহ যাদের কথা বলেছেন এভাবেঃ

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا (৭৪) أُولَٰئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا (৭৫)
خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا (৭৬)

'আর যারা বলে, 'হে আমাদের রব, আপনি আমাদেরকে এমন স্ত্রী ও সন্তানাদি দান করুন যারা আমাদের চক্ষু শীতল করবে। আর

^{৩৭৩} তিরমিযী : ২৬০২।

আপনি আমাদেরকে মুত্তাকীদের নেতা বানিয়ে দিন'। তারাই, যাদেরকে [জান্নাতে] সুউচ্চ কক্ষ প্রতিদান হিসাবে দেয়া হবে যেহেতু তারা সবর করেছিল সেজন্য। আর তাদের সেখানে অভ্যর্থনা করা হবে অভিবাদন ও সালাম দ্বারা। সেখানে তারা স্থায়ী হবে। অবস্থানস্থল ও আবাসস্থল হিসেবে তা কতইনা উৎকৃষ্ট! (সূরা ফুরকান : ৭৪-৭৬)^{৩৭৪}। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে তাঁর প্রতিটি নির্দেশ মেনে চলার তাওফীক দিন। আমাদের জীবনের প্রতিটি কথা ও কাজে তাঁর প্রিয় হাবীবের সুনুতের অনুবর্তী হবার তাওফীক দিন। আমীন।

ইসলামের তালাক বিধান

‘তালাক’ (الطلاق) অর্থ : বন্ধনমুক্তি। যেমন বলা হয়: أَطْلَقَ الْأَسِيرُ: ‘বন্দী মুক্ত হয়েছে’। শারঈ পরিভাষায় তালাক অর্থ : স্বামী-স্ত্রীর বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করা। ইসলামে তালাককে অপসন্দ করা হয়েছে। যদিও বেদ্বীনী, অবাধ্যতা, যেনাকারিতা প্রভৃতি চূড়ান্ত অবস্থায় এটাকে জায়েয রাখা হয়েছে এবং তালাকের মাধ্যমে বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করার এখতিয়ার দেওয়া হয়েছে। দরসে বর্ণিত আয়াতের আলোকে এক্ষণে আমরা ইসলামের তালাক বিধান সম্পর্কে আলোকপাত করব। ইসলামে তালাকের অধিকার সীমিত করা হয়েছে তিনবারের মধ্যে। প্রথম দু’বার ‘রাজ’ঈ ও শেষেরটি ‘বায়েন’। অর্থাৎ ইসলামে তালাকের বিধান রাখা হ’লেও স্বামীকে ভাববার ও সমঝোতার সুযোগ দেওয়া হয় স্ত্রীর তিন ঋতু বা তিন মাসকাল যাবত। এর

^{৩৭৪}. সূরা ফুরকান : ৭৪-৭৬।

মধ্যে স্বামী তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে পারেন। যাকে ‘রাজআত’ বলা হয়। কিন্তু গভীর ভাবনা-চিন্তার পর ঠান্ডা মাথায় তৃতীয়বার তালাক দিলে তখন আর ফিরিয়ে নেওয়ার সুযোগ থাকে না। মূলতঃ এ কারনেই একত্রে তিন তালাক প্রদান প্রসঙ্গে শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী বলেন,

وكره أيضا جمع الطلقات الثلاث في طهر واحد، وذلك لأنه إهمال للحكمة
المرعية في شرع تفريقها فإنها شرعت ليتدارك المفراط ولأنه تضيق على نفسه
وتعرض للندامة، وأما الطلقات الثلاث في ثلاثة أطهار فأيضاً تضيق ومظنة
ندامة غير أنها أخف من الأول من جهة وجود التروى والمدة التي تتحول فيها
الأحوال.

“এক তুহুরে তিন তালাক প্রদান করা অপছন্দনীয়। কারণ এতে তিন তুহুরে তিন তালাক প্রদান করার যে অন্তর্নিহিত তাৎপর্য রয়েছে তা ব্যাহত হয়। সীমালংঘনকারীর যাতে শুভবুদ্ধির উদয় হয় সেজন্য তিন তুহুরে তিন তালাক প্রদান করা বিধিবদ্ধ করা হয়েছে। অনুরূপভাবে তা তালাক প্রদানকারীর মনোপীড়ার যেন কারণ হয় এবং সে লজ্জিত হয় সেজন্যও এ রীতি প্রবর্তিত হয়েছে। অপরপক্ষে তিন তুহুরে তিন তালাক প্রদান করাও অন্তঃপীড়া ও লজ্জিত হওয়ার কারণ। কিন্তু চিন্তা-ভাবনা এবং অবস্থার পরিবর্তন হওয়ার মত যথেষ্ট সময় পাওয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে তা প্রথম পদ্ধতির চেয়ে কম পীড়াদায়ক।”

সূরা আল বাকারার ২৯-৩০ ও সূরা আত তালাকের ১নং আয়াত দ্বারা দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রমাণিত হয় যে, তালাক একটা পর্যায়ক্রমিক

প্রক্রিয়া। যদি এক সাথে তিন তালাকের মাধ্যমে স্বামী স্ত্রীর সাথে চূড়ান্তভাবে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটায় তাহলে এই প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন অসম্ভব। সিরিয়ার প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ ড. মুস্তাফা আস্ সিবাযী (১৯১৫-৬৪) বলেন, “এক সাথে একই বাক্যে তিন তালাক দিলে তাকে এক তালাক বিবেচনা করা উচিত। এ ব্যাপারে হানাফী মাযহাবের মত এই যে, এক সাথে তিন তালাক দিলে তিন তালাকই সংঘটিত হবে। এই মত অনুসৃত হবার কারণে মুসলিম সমাজ দীর্ঘকাল জটিল সমস্যায় ভুগছে এবং কলংকজনক ‘হীলা’ প্রথা চালু হয়েছে। যার কথা ভাবতেও লজ্জায় মাথা হেট হয়ে যায়।” তিনি আরো বলেন, “আমি সকল মহলের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করতে চাই যে, আল-কুরআনের তালাক সংক্রান্ত আয়াতগুলো থেকে স্পষ্টতই শেযোক্ত (এক সাথে তিন তালাক দিলে এক তালাক গণ্য হওয়া) মতটিই অভ্রান্ত বলে প্রতীয়মান হয়। তালাক সংক্রান্ত আয়াতগুলো থেকে বুঝা যায় যে, তালাকের সংখ্যা তিনে নির্ধারণের উদ্দেশ্য এই যে, প্রথম ও দ্বিতীয় তালাকের পর স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে আপোষ ও আন্তরিকতা ফিরে আসার সুযোগ ও অবকাশ সৃষ্টি হোক।”

তালাকের সহীহ পদ্ধতি

(১) স্ত্রীকে তার ঋতুমুক্তির পর পবিত্র অবস্থার শুরুতে মিলন ছাড়াই স্বামী প্রথমে এক তালাক দিবে। অতঃপর সহবাসহীন অবস্থায় তিন ঋতুর ইদত অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বে স্বামী স্ত্রীকে রাজ‘আত করতে পারে। অর্থাৎ ফিরিয়ে নিতে পারে। কিন্তু ইদতকাল শেষ হওয়ার

পরে ফেরত নিতে চাইলে তাকে উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে নতুন বিবাহের মাধ্যমে ফেরত নিতে হবে। ইদতকালে স্ত্রী স্বামীগৃহে অবস্থান করবে। অবস্থানকালে স্বামী স্ত্রীকে খোরপোষ দিবে। এটিই হ'ল তালাকের সর্বোত্তম পস্থা।

(২) সহবাসহীন তোহরে প্রথম তালাক দিয়ে ইদতের মধ্যে পরবর্তী তোহরে ২য় তালাক দিবে এবং ইদতকাল গণনা করবে। অতঃপর পরবর্তী তোহরের শুরুতে তৃতীয় তালাক দিবে ও ঋতু আসা পর্যন্ত সর্বশেষ ইদত পালন করবে। তৃতীয়বার তালাক উচ্চারণ করলে স্ত্রীকে আর ফেরৎ নেওয়া যাবে না। অতএব ২য় তোহরে ২য় তালাক দিলে ৩য় তোহরের শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা করাই বুদ্ধিমানের কাজ। এখানেও পূর্বের ন্যায় যাবতীয় বিধান বহাল থাকবে^{৩৭৫}। ইসলামের সোনালী যুগে এই তালাকই চালু ছিল। যেমন আল্লাহ স্বীয় রাসূলকে সম্বোধন করে বলেন,

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَذَرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ الطَّلَاقِ ذَلِكَ أَمْرٌ

‘হে নবী! যদি আপনি স্ত্রীদের তালাক দিতে চান, তাহ’লে ইদত অনুযায়ী তালাক দিন এবং ইদত গণনা করতে থাকুন। আপনি আপনার প্রভু সম্বন্ধে হুঁশিয়ার থাকুন। সাবধান তালাকের পর স্ত্রীদেরকে গৃহ হ’তে বিতাড়িত করবেন না, আর তারাও যেন

^{৩৭৫} বাক্বারাহ ২/২২৯; তালাক ৬৫/১

স্বামীগৃহ ছেড়ে বহির্গত না হয়। অবশ্য তারা যদি খোলাখুলিভাবে ফাহেশা কাজে লিপ্ত হয়, তাহ'লে স্বতন্ত্র কথা। এগুলি আল্লাহকৃত সীমারেখা। যে ব্যক্তি উক্ত সীমারেখা লংঘন করে, সে নিজের উপরে যুলুম করে। কেননা সে জানে না যে, তালাকের পরেও আল্লাহ কোন (সমঝোতার) পথ বের করে দিতে পারেন'^{৩৭৬}।

উক্ত আয়াতের তাৎপর্য এই যে, তালাক হ'ল মূলতঃ ইদতের তালাক, আকস্মিক বা যুগপৎ তালাক নয়। স্বামী-স্ত্রীকে অবশ্যই নির্ধারিত ইদত গণনা করতে হবে। এজন্য কমপক্ষে তিন ঋতু মুক্তির তিন মাস স্বামী অবকাশ পাবেন যে, তিনি স্ত্রীকে নিয়ে ঘর করতে পারবেন কি-না। এছাড়াও স্ত্রীকে স্বামীগৃহেই অবস্থান করতে হবে। এর দ্বারা উভয়কে পুনর্মিলনের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন, এগুলি হ'ল আল্লাহকৃত 'হুদূদ' বা সীমারেখা, যা অতিক্রম করা নিষিদ্ধ।

এখানে প্রশ্ন হ'ল : এক মজলিসে একসাথে তিন তালাক বায়েন দিলে উক্ত সীমারেখা পালন করা যায় কি? যেখানে প্রথম তালাকের ইদতকাল এক ঋতু শেষে ২য় তালাক।

অতঃপর ২য় তালাকের ইদতকাল ২য় ঋতু শেষে ৩য় তালাক - এভাবে হিসাব করে বিরতিসহ ইদত গণনার কোন সুযোগ থাকে কি? যদি না থাকে, তাহ'লে সেটা কোন্ ধরনের তালাক হবে? কুরআন ও সহীহ হাদীসের কোথাও এরূপ তালাকের কোন অস্তিত্ব আছে কি?

^{৩৭৬} তালাক ৬৫/১

বিভিন্ন ফিকহ গ্রন্থে তালাককে আহসান, হাসান ও বিদ'আত তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে এবং কুরআন-হাদীসে বর্ণিত উপরোক্ত তালাক বিধানকে 'সুন্নী তালাক' ও আবিষ্কৃত একত্রিত তিন তালাককে 'বেদ'ঈ তালাক' নামে অভিহিত করা হয়েছে^{৩৭৭}। অথচ মুসলমান 'সুন্নাত' মানতে পারে, কিন্তু কোন অবস্থাতেই 'বিদ'আত' মানতে পারে না। কেননা দ্বীনের নামে সকল প্রকার বিদ'আত প্রত্যাখ্যাত^{৩৭৮} এবং বিদ'আতের একমাত্র পরিণাম হ'ল জাহান্নাম^{৩৭৯}। অথচ বিদ'আতী তালাককে আইনসিদ্ধ করার মাধ্যমে মুসলিম সমাজে পাপের পথ খুলে দেওয়া হয়েছে। সুন্নাতী তালাকের স্থলে বিদ'আতী তালাক সিদ্ধ করে 'তাহলীল'-এর ন্যায় জাহেলী আরবের নোংরা কুপ্রথাকে অসিদ্ধ ফাসিদ ক্রিয়াসের মাধ্যমে ইসলামী সমাজে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। যার সরাসরি ও অসহায় শিকার হচ্ছে এদেশের সরল-সিধা মুসলিম নারী সমাজ। উল্লেখ্য যে, সূরায়ে তালাক - এর ২য় আয়াতের **وَأَشْهَدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنكُمْ** আলোকে সাহাবীগণের মধ্যে হযরত আলী ও ইমরান বিন হুছাইন (রাঃ), তাবেঈগণের মধ্যে আত্বা, ইবনু জুরায়েজ ও ইবনু সীরীন এবং ইমামিয়া শী'আ বিদ্বান মন্ডলী তালাকের ক্ষেত্রেও দু'জন ন্যায়বান সাক্ষীর শর্ত আরোপ করেন। যেক্ষেপ বিবাহের ক্ষেত্রে করা হয়ে থাকে। তবে প্রাচীন ও আধুনিক সকল যুগের অন্যান্য বিদ্বানদের নিকটে তালাক কেবলমাত্র স্বামীর অধিকার। এর জন্য কোন সাক্ষীর

^{৩৭৭} হেদায়া ২/৩৫৪-৫৫

^{৩৭৮} মুত্তাফাকু আলাইহ, মিশকাত হা/১০৪ 'কিতাব ও সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরা' অনুচ্ছেদ

^{৩৭৯} নাসাঈ হা/১৫৭৯ 'কিভাবে ঈদায়নের খুৎবা দিতে হবে' অনুচ্ছেদ

প্রয়োজন নেই। কেননা এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ও জমহূর ছাহাবায়ে কেরামের পক্ষ থেকে কোনরূপ প্রমাণ নেই^{৩৮০}।

উপরোক্ত তালাক বিধানে দেখা যাচ্ছে যে, ইসলাম বাধ্যগত অবস্থায় তালাক জায়েয রাখলেও মূলতঃ সেটা তার কাম্য নয়। বরং স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে সমঝোতা সৃষ্টি ও তাদেরকে পুনরায় দাম্পত্য জীবনে ফিরে আসার সকল বৈধ সুযোগ সৃষ্টি করে রেখেছে। তাকে এক মাস, দু'মাস, তিন মাস যাবত চিন্তা করার সুযোগ দিয়েছে। ইদতকালে স্ত্রীকে স্বামীগৃহে অবস্থানের সুযোগ দিয়েছে।

সবশেষে দ্বিতীয়বার পর্যন্ত 'তালাক' শব্দটি উচ্চারণ করলেও কুরআন 'তৃতীয় তালাক' বা 'তালাকে বায়েন' (বিচ্ছিন্নকারী তালাক) কথাটি উচ্চারণ করেনি। বরং ইঙ্গিতে বলেছে, দ্বিতীয়বার তালাক দেওয়ার পরে এক্ষণে সে তার স্ত্রীকে সুন্দরভাবে রাখুক অথবা সদ্যবহারের মাধ্যমে বিদায় করুক'।

জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) - কে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল! কুরআনে দু'বার তালাক দেবার কথা পাচ্ছি। কিন্তু তৃতীয় তালাক কোথায়? রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, **أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ** অথবা সদ্যবহারের মাধ্যমে বিদায় করুক^{৩৮১}। অর্থাৎ আল্লাহ চান না যে, বান্দা স্বীয় স্ত্রীকে তৃতীয় তালাক দিক। কেননা তৃতীয় তালাক দিলে সে আর তার স্ত্রীকে ফেরত পাবে না। যতক্ষণ না সে দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করে এবং সেই স্বামী তাকে স্বেচ্ছায় তালাক দেয়। আর সেটা

^{৩৮০} ফিকহুস সুন্নাহ ২/২৯০-৯২ পৃঃ

^{৩৮১} আহমাদ, ইবনু আবী হাতেম, ইবনু মারদুভিয়াহ, ইবনু কাছীর ১/২৭৯-৮০ পৃঃ

নিতান্তই কল্পনার বস্তু। কুরতুবী বলেন, বিদ্বানগণ এ বিষয়ে একমত হয়েছেন যে, **أَوْ تَشْرِيعٌ بِإِحْسَانٍ** অথবা সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে বিদায় করুক' দ্বারা দুই তালাকের পরে তৃতীয় তালাক বুঝানো হয়েছে। আর এটা বুঝা গেছে পরবর্তী বক্তব্য **فَإِنْ طَلَّقَهَا....** 'অতঃপর যদি সে তাকে তালাক দেয়' আয়াতাংশ দ্বারা।

অতঃপর বিদ্বানগণ এ বিষয়ে একমত হয়েছেন যে, যে ব্যক্তি তার স্ত্রীকে এক তালাক অথবা দুই তালাক দিবে, সে ব্যক্তি তাকে ফিরিয়ে নিতে পারবে। কিন্তু যদি তৃতীয়বার তালাক দেয়, তাহ'লে ঐ স্ত্রী তার জন্য আর হালাল হবে না, যতক্ষণ না সে অন্য স্বামীকে বিবাহ করবে'। আর এটিই কুরআনের স্পষ্ট বক্তব্য **(مَحْكَمُ الْقُرْآنِ)**।

যাতে কারু কোনরূপ মতভেদ নেই^{৩৮২}।

আল্লাহ এতই মেহেরবান যে, সর্বশেষ তৃতীয়বার তালাকের কারণে উক্ত স্বামী ও স্ত্রীকে চিরকালের মত পরস্পরের জন্য নিষিদ্ধ করেননি বরং যদি কখনও দ্বিতীয় স্বামী তাকে স্বেচ্ছায় তালাক দেয়, তখন সে পুনরায় তার পূর্বতন স্বামীর কাছে ফিরে আসতে পারে, যদি উভয়ে স্বেচ্ছায় ও সাগ্রহে রাখী হয়।

এতেই বুঝা যায় যে, বিবাহের পবিত্র বন্ধনকে আল্লাহ পাক কত বেশী গুরুত্ব প্রদান করেছেন এবং একে টিকিয়ে রাখার জন্য কতভাবেই না বান্দাকে উদ্বুদ্ধ করেছেন।

^{৩৮২} তাফসীরে কুরতুবী, বাক্বারাহ ২২৯

হিল্লা বিয়ে ইসলাম বিরোধী ও নারীর প্রতি বৈষম্য তথা নব আবিষ্কৃত বিদ'আত

হিল্লা বিয়ে কি?

আভিধানিকভাবে হিল্লা বলতে উপায়, গতি, ব্যবস্থা, আশ্রয় ও অবলম্বন বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন - তোমার কি কোন হিল্লা (গতি বা উপায়) হয়েছে? বা মেয়েটির কোন হিল্লা বা আশ্রয় হয়েছে? কিন্তু প্রচলিত পরিভাষায় হিল্লা বলতে, কোন স্বামীর তিন তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে এ শর্তে বিয়ে করা যে, বিয়ের পর সহবাস শেষে স্ত্রীকে তালাক দেবে, যেন সে পূর্বের স্বামীর জন্য হালাল হয়, সে তাকে পুনরায় বিয়ে করতে পারে।

এই হিল্লা বিয়ে শুধু বাংলাদেশ, পাকিস্তান, আর ভারতে নয়, পৃথিবীর সব মুসলিম অধ্যুষিত দেশেই কম-বেশী প্রচলিত আছে। আরবে এই হিল্লা বিয়েকে হাল্লালা বলে। হিল্লা শব্দটি আরবী (حِلَّة) 'হালা' থেকে এসেছে। এর অর্থ বৈধতা/বৈধকরণ। যদিও আরবী হালাল শব্দের অর্থ হলো ইসলামে অনুমোদনপ্রাপ্ত। কিন্তু হিল্লা বিয়ে মোটেই হালাল নয়।

হিল্লা বিবাহ হারাম এবং তা মূলত কোনো বিয়েই নয় বরং হিল্লা স্বামীর সাথে বিয়ে ও সহবাস হারাম। সে যাই হোক এখন প্রশ্ন হলো, তালাকের পরে আপন স্ত্রী যদি পর নারী হয়েই যায় তবে তাকে আবার বিয়ে করা বৈধ হওয়া উচিত। কেননা আপন ভগ্নী, খালা-ফুফু ইত্যাদি ছাড়া অন্য কাউকে বিবাহ করা জায়েজ। সে তো তখন ঐ গোত্রেই পরে।

প্রসঙ্গ বাংলাদেশ

হিঙ্কা বিয়ে জানেন না এমন বাংলাদেশী হয়ত একজনও খুঁজে পাওয়া যাবে না। বাংলায় এটা কোনকালেই ছিল না কিন্তু এখন গত পনেরো বিশ বছর ধরে এটা খবরের কাগজে প্রায়ই ওঠে। গ্রাম-গঞ্জের কাঠমোল্লা ও মাতুব্বররা মিলে ফতোয়ার তাৎক্ষণিক আদালতে বিভিন্ন মামলার শারিয়া-মাফিক বিচার করে রায় ঘোষণা করেন। রাষ্ট্রীয় বৈধতা না থাকলেও সে-রায় প্রচণ্ড সামাজিক শক্তিতে অপরাধীর ওপরে প্রয়োগ করা হয়। হিঙ্কা হল এরই একধরনের শারিয়া-মামলা যাতে কোন হিঙ্কা বিয়ের-কারণে শারিয়া-আদালত কোন দম্পতির বিয়ে বাতিল ঘোষণা করেন। তারপর তাদের আবার বিয়ে দেবার শর্ত হিসেবে স্ত্রীকে অন্য লোকের সাথে বিয়ে ও সহবাসে বাধ্য করেন। দ্বিতীয় স্বামী স্বেচ্ছায় তালাক দিলে তবে সে আবার আগের স্বামীকে বিয়ে করতে পারে। এটা ঘটে প্রধানত স্বামী রাগের মাথায় স্ত্রীকে একসাথে তিনবার তালাক বলে ফেলেছে বলে, তার কথা শোনার সাক্ষী কখনো থাকে, কখনো থাকে না।

এক শ্রেণীর মূর্খ ও বক ধার্মিক লোকেরা, শিক্ষিত ও ব্যক্তিত্বশালী আলেমদের কাছে না গিয়ে অল্প শিক্ষিত মোল্লাদের পরামর্শে তালাক প্রাপ্তা মহিলাকে তার আগের স্বামীর কাছে ফিরিয়ে দেওয়া বা হালাল করে দেয়ার জন্য হিঙ্কা বিয়ের আয়োজন করে এবং এটিকে ইসলামের বিধান বলে চালিয়ে দেয়। যার ফলে বিতর্কিত এবং কলুষিত হচ্ছে ইসলামের সুন্দর বিধান ও মহান আদর্শ। আর ইসলামের শত্রুরা এটাকে তাদের মোক্ষম হাতিয়ার হিসেবে পেয়ে

কুরআন ও ইসলামের কুৎসা রটনার ক্ষেত্রে তাদের কোন প্রচেষ্টার ত্রুটি রাখছে না। অথচ তারা হাদীস সম্পর্কে কোন জ্ঞানই রাখে না। স্বামী কর্মক্ষেত্রে থেকে বাড়ীতে ফিরেছে। এসে দেখলো এখনও রান্না শেষ হয়নি। বাস মাথায় উঠে গেল প্রচন্ড রাগ। স্ত্রীর সাথে শুরু করে দিল ঝগড়া। পেটে ক্ষুধা এবং মাথায় রাগ। এক পর্যায়ে বলে ফেললো তালাক। বাস আর যাবে কোথায়?

মসজিদের কাঠমোল্লা দিয়ে দিল তালাকের ফতোয়া। স্ত্রী চলে গেল বাবার বাড়ী। কিন্তু যখন স্বামীর মাথা ঠান্ডা হলো যখন নিজের ভুল বুঝতে পারলো। এবার স্ত্রীকে আনার জন্য উদগ্রীব। কিন্তু বাঁধ বসালো কাঠমোল্লা আর মাতুব্বর। স্ত্রীকে আনতে হলে হিল্লা বিয়ে দিতে হবে। কিন্তু কাঠমোল্লারা একটু চিন্তা-ভাবনা করে না যে, যেখানে রাগ হলো স্বামীর, দোষ করলো স্বামী এবং অপরাধী হলো স্বামী। সেখানে স্ত্রী কেন অপরাধী হবে? স্ত্রী কেন স্বামীর পাপের বোঝা বহন করবে?

কুরআন কি বলে?

কিছু কাঠমোল্লারা না বুঝলেও আল্লাহ পাক ঠিকই বোঝেন। তাই মহান আল্লাহ পাক এরশাদ করেন-

أَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ

অর্থাৎ “একে অপরের কৃতকর্মের জন্য দায়ী হইবে না” (সূরা নজম ৩৮)। এ কথা সবাই স্বীকার করবেন যে, অপরাধ হোক বা না-হোক, সেটা করেছে স্বামী। অথচ হঠাৎ তালাক দিলে নিরপরাধ স্ত্রীর জীবন ধ্বংস হয়ে যায়। সে হারায় তার স্বামী-সংসার ও সন্তান।

কিন্তু একজনের অপরাধে অন্যের শাস্তি হওয়া চরম অন্যায়। সে জন্যই কুরআন কি চমৎকার বলেছে -

وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ

অর্থাৎ “তাহাদের কর্ম সম্পর্কে তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে না” (সূরা বাকারা-১৪১)।

তালাক এবং তাৎক্ষণিক-দ্বিতীয় বিয়ে (হিল্লা বিয়ে) সম্পূর্ণ কুরআন বিরোধী। কুরআন মোতাবেক কোন নারীকে বিয়েতে বাধ্য করার অধিকার কারো নেই। সেই সময়ে নারীকে এ অসাধারণ অধিকার দিয়েছে কুরআন। হিল্লা বিবাহ স্ত্রীকে দিয়ে জোরপূর্বক এক ধরনের বেশ্যাবৃত্তি, যা সম্পূর্ণ হারাম। এই হারাম কাজে যারা জড়িত থাকবে হোক সে মসজিদের ইমাম, অবশ্যই সে জাহান্নামী হবে।

নাবী কারীম (সাঃ) কি বলেছেন?

এবার আসুন নাবী করিম (সাঃ) হিল্লা বিয়ে সম্পর্কে কি বলেন। ইসলামের ইতিহাসে হিল্লা বিবাহের কোন ঠাই নাই। নবীজি (সাঃ) হিল্লা বিবাহকে শুধু ঘৃণাই করতেন না, হিল্লাকারীদের উপর লানত করতেন। জামে আত তিরমিজী ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীস।

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: “لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحِلَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ.” قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

অর্থাৎ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, “রাসূলুল্লাহ (সাঃ) হিল্লাকারী এবং যার জন্য হিল্লা করা হয় উভয়কে লানত করেছেন।*” ইমাম তিরমিজী বলেন (রহঃ), এই হাদীসটি হাসান

সহিহ। (জামে আত তিরমিজী, ২য় খন্ড, হাদীস নং ১১২০, হুসাইন আল মাদানী প্রকাশনী)। ইবনে মাজাহ তে হযরত আলী (রা) হতে বর্ণিত আছে,

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُجِلَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ

অর্থাৎ “রাসূলুল্লাহ (সাঃ) হিলাকারী এবং যার জন্য হিলা করা হয় উভয়কে লানত (অভিসম্পাত) করেছেন।” (সুনানে ইবনে মাজাহ, ২য় খন্ড, ১৯৩৫ নং হাদীস, ইসলামিক ফাউন্ডেশন)।

* উল্লেখ্য যে, হিলাকারী হলো দ্বিতীয় স্বামী এবং যার জন্য হিলা করা হয় সে হলো প্রথম স্বামী।

হিলা সম্পর্কে সাহাবী উকবা বিন আমের (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীস:

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: “أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ؟”، قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: “هُوَ الْمُجِلُّ”، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: “لَعَنَ اللَّهُ الْمُجِلَّ، وَالْمُحَلَّلَ لَهُ” هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَوَافَقَهُ الذَّهَبِيُّ.

অর্থাৎ উকবা ইবনে আমের (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, “রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন আমি কি তোমাদেরকে ভাড়া করা পাঠা সম্পর্কে বলবো? তারা বললোঃ অবশ্যই হে আল্লাহর রাসূল, তিনি বললেন, হিলাকারী। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, আল্লাহ হিলাকারী ও যার জন্য হিলা করা হয় উভয়কে অভিসম্পাত করেছেন^{৩৮৩}।”

^{৩৮৩} সুনানে ইবনে মাজাহ, ২য় খন্ড, ১৯৩৬ নং হাদীস, ইসলামিক ফাউন্ডেশন

হাদীস দুটিতে লক্ষ্য করুন। প্রথম হাদীসে স্বামী এবং হিল্লাকারী পুরুষকে লানত করা হয়েছে। অর্থাৎ অভিশাপ দেওয়া হয়েছে, তারা আল্লাহর রহমত হতে বঞ্চিত।

দ্বিতীয় হাদীসে হিল্লাকারী পুরুষকে ভাড়া করা পাঠার সাথে তুলনা করা হয়েছে। কোন ব্যক্তি যদি বলে আমি অমুকের স্ত্রীকে হিল্লা বিয়ে করে আবার তালাক দিব যাতে সে তার স্ত্রীকে পুনরায় গ্রহণ করতে পারে। হাদীস অনুযায়ী সে ব্যক্তি হলো ভাড়া করা পাঠা। আর এ পাঠার দলে যারা থাকে তারাও পাঠার দল। অতএব যে সমস্ত কাঠমোল্লা বা মাতুব্বর হিল্লাকে বৈধ মনে করবে তারাও পাঠা। আমার জানা মতে এই পাঠাকে একমাত্র কালি পূজায় বলি দেওয়া হয়। দেখুন হযরত উমর (রা) কি বলেন।

“হযরত আসরাম (র) কাবিসাবিল জাবের (রা) হতে বর্ণনা করেন, একদিন হযরত উমর (রা) তাঁর খেলাফতকালে মসজিদের মিম্বরে উঠে বললেন, আমার নিকট যদি এমন মামলা আসে যাতে হিল্লাকারী (২য় স্বামী) এবং যার জন্য হিল্লা করা হয় (১ম স্বামী) এমন কাউকে আনা হয়, আমি দুজনকেই পাথর মেরে হত্যা করবো।” যারা পাপ করে তারা পাপী এবং যারা সেই পাপের সহযোগিতা করে তারাও পাপী। অতএব সাবধান যারা হিল্লা বিবাহকে সহযোগিতা করবে তারাও পাপের অংশীদার।

হিল্লা বিয়ে সংক্রান্ত সাহাবী ও স্ফলারদের অভিমত

ইসলামে হিল্লা বিয়ে হারাম। এ প্রসঙ্গে ড. ওয়াহবাহ আয-যুহায়লী বলেন,

فهو حرام باطل مفسوخ لقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله المحلل والمحلل له
 “রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বাণী: আল্লাহ
 হিল্লাকারী এবং যার জন্য হিল্লা করা হয় তাদের উভয়ের প্রতি
 অভিসম্পাত করেছেন এর জন্য হিল্লা বিয়ে হারাম ও বাতিল বলে
 গণ্য হবে।”

উকবা বিন আমির (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ
 (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله قال: هو المحلل، لعن الله
 المحلل والمحلل له.

“আমি কি তোমাদেরকে ভাড়াটে ষাঁড় সম্পর্কে অবহিত করব না?
 সাহাবীগণ বললেন, অবশ্যই হে রাসূলুল্লাহ। তখন তিনি বললেন, সে
 হল হালালকারী। আল্লাহ অভিসম্পাত করেছেন হালালকারী ও যার
 জন্য হালাল করা হয় উভয় ব্যক্তিকে।”

ইমাম শাওকানী বললেন,

والأحاديث المذكورة تدل على تحريم التحليل لأن اللعن إنما يكون على ذنب كبير
 “উল্লেখিত হাদীসগুলো হিল্লা বিয়ে হারাম হওয়ার প্রতি নির্দেশ
 করে। কারণ বড় পাপের ক্ষেত্রেই অভিসম্পাত করা হয়।”

আল্লামা সান‘আনী বলেন, “এ হাদীস হল তাহলীল হারাম হওয়ার
 দলীল। কেননা হারামকারী ব্যতীত অন্যের ওপরে অভিসম্পাত করা
 হয় না। আর প্রত্যেক হারাম বস্তু নিষিদ্ধ। এখানে নিষিদ্ধতার দাবী
 হল বিবাহ ভঙ্গ হওয়া। তাহলীল-এর অনেকগুলি পদ্ধতি লোকেরা
 বর্ণনা করেছে। অভিসম্পাতের কারণে সকল পদ্ধতির হিল্লা বিয়ে

বাতিল।”

ইবনু উমার (রা) বলেন, “আমরা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যুগে এটিকে ব্যভিচার বলে গণ্য করতাম।” তিনি আরো বলেন, “এরা দু’জনেই ব্যভিচারী। যদিও তারা ২০ বছর যাবৎ স্বামী-স্ত্রী নামে দিন যাপন করে।”

উমার ফারুক (রা) বলতেন, “হালালকারী বা যার জন্য হালাল করা হয়েছে, এমন কাউকে আমার কাছে আনা হলে আমি তাকে প্রস্তারাঘাতে হত্যা করব।”

ইবনুল কাইয়িম (র) বলেন, “তাহলীল-এর সময় মুখে শর্ত করুক বা না করুক, মদীনাবাসী বিদ্বানমন্ডলী এবং আহলুল হাদীস ও তাদের ফকীহদের নিকটে ঐ বিয়ে বাতিল। কেননা এই সাময়িক বাহ্যিক বিয়ে মিথ্যা ও ধোঁকা ছাড়া আর কিছুই নয়। আল্লাহ দ্বীনের মধ্যে এ বিয়েকে বিধিসম্মত করেননি এবং কারো জন্য একে বৈধও করেননি। কেননা এর ক্ষতিকারিতা কারো নিকটে গোপন নয়।”

ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ (র:) বলেন, “আল্লাহর দ্বীন অতি পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন। তা কখনোই হারাম পন্থায় কোন নারীকে হালাল করার অনুমতি দেয় না। যতক্ষণ না কোন পশু স্বভাবের পুরুষকে ভাড়াটে ষাঁড় হিসেবে উক্ত কাজে ব্যবহার না করা হয়।” তিনি আরো বলেন, “কীভাবে কোন হারাম বস্তু অন্যকে হালাল করতে পারে? কীভাবে কোন অপবিত্র বস্তু অন্যকে পবিত্র করতে পারে?”

সাইয়িদ সাবিক বলেন, “এটাই সঠিক কথা এবং এ কথায় বলেন, ইমাম মালেক, আহমাদ, সাওরী, আহলুয যাহের এবং অন্যান্য

ফকীহগণ। যেমন হাসান বাসরী, ইবরাহীম নাখঈ, কাতাদাহ, লাইস, ইবনুল মুবারাক প্রমুখ। পক্ষান্তরে ইমাম আবু হানীফা ও যুফার (র) বলেন, তাহলীল - এর সময় যদি প্রথম স্বামীর জন্য হালাল করে দেয়ার শর্ত করে তাহলে বিয়ে সিদ্ধ হবে। তবে তা মাকরুহ হবে। কেননা অন্যায় শর্তের জন্য বিয়ে বাতিল হতে পারে না। ইমাম আবু ইউসুফ (র:) - এর মতে উক্ত বিয়ে বাতিল হবে। কেননা এটি সাময়িক বিয়ে। ইমাম মুহাম্মাদ (র:) - এর মতে দ্বিতীয় বিয়ে সিদ্ধ হবে। তবে প্রথম স্বামীর জন্য উক্ত স্ত্রী হালাল হবে না।

মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম বলেন, “এ রীতি কুরআনের পূর্বোক্ত আয়াত থেকে প্রমাণিত নয়, প্রমাণিত নয় কোন হাদীস থেকে। এ হচ্ছে সম্পূর্ণ মনগড়া, নিজেদের প্রয়োজনে আবিষ্কৃত ও উদ্ভাবিত এক জঘন্য পন্থা।” তিনি আরো বলেন, “হানাফী মাযহাবের লোকদের মতে এরূপ বিয়ে মাকরুহ। কিন্তু প্রথমোক্তদের মত যে এ ব্যাপারে খুবই শক্তিশালী এবং অকাট্য দলীলভিত্তিক তাতে সন্দেহ নেই। যে ‘তাহলীল’ বিয়ে এবং ‘হালালকারী’ সম্পর্কে রাসূলে করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) লা’নত ঘোষণা করেছেন, তাকে শুধু মাকরুহ বলে ছেড়ে দেয়া কিছুতেই সমীচীন হতে পারে না। বস্তুত এ ‘তাহলীল’ বিয়ের সুযোগ নিয়ে সমাজে যে অশ্লীলতার বন্যা প্রবাহিত হয়েছে, তাতে গোটা সমাজটাই পংকিল হয়ে যাবার উপক্রম হয়েছে। দ্বিতীয়ত, এতে করে তিন তালাকের পর স্ত্রীর হারাম হয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যই বিনষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তিন তালাকের পর এত সহজে স্ত্রী লাভের সুযোগ থাকলে কেউই তিন তালাক দিতে

একবিন্দু পরোয়া করবে না। উল্লেখ্য, ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইনেও হিফ্ফা বিয়ে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

যেভাবে শুরু হলো হিফ্ফা বিয়ের প্রথা

এখন আসি কিভাবে হিফ্ফা বিয়ের প্রথা শুরু হলো। নবী (সাঃ) এর ওফাতের পর মানুষ ধীরে ধীরে ধর্ম থেকে দূরে সরে আসার কারণে এই মুসলিম সমাজে তালাকের প্রবণতা বেড়ে যায়। ফলে এর সমাধানের জন্য এক শ্রেণীর মোল্লাদের দ্বারা হিফ্ফা বিয়ের মত কু-প্রথা সমাজে চালু হয়ে পড়ে। আর এর জন্য নিম্নের কুরআনের আয়াতকে অপব্যবহার করা হয়। মূলত যে সমস্ত আলেম বা কাঠমোল্লা হিফ্ফা বিয়ে জায়েজ করতে চায় তারা কুরআন-হাদীস সম্পর্কে অজ্ঞ এবং অপব্যখ্যা করে। আর তারা তাদের স্বার্থে সূরা বাকারার ২৩০ নং আয়াতকে দলিল হিসাবে তুলে ধরে।

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

অর্থাৎ “তারপর যদি সে স্ত্রীকে তালাক দেয়, তবে সে স্ত্রী যে পর্যন্ত তাকে ছাড়া অপর কোন স্বামীর সাথে বিয়ে করে না নেবে, তার জন্য হালাল নয়। অতঃপর যদি দ্বিতীয় স্বামী তালাক দিয়ে দেয়, তাহলে তাদের উভয়ের জন্যই পরস্পরকে পুনরায় বিয়ে করাতে কোন পাপ নেই, যদি আল্লাহ হুকুম বজায় রাখার ইচ্ছা থাকে। আর এই হলো আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সীমা; যারা উপলব্ধি করে তাদের জন্য এসব বর্ণনা করা হয়^{৩৮৪}।”

^{৩৮৪} সূরা বাকার-২৩০

প্রকৃত বিশ্লেষণ

কাঠামোল্লারা উপরের আয়াতের দোহাই দিয়ে হিল্লা বিবাহ জায়েজ করতে চায়। কিন্তু তারা গবেষণা করে না যে এই আয়াতটি কাদের জন্য প্রযোজ্য। তারা এটাও লক্ষ্য করে না যে, পরবর্তী ২৩২ নং আয়াতে আল্লাহ কি বলেছেন। এবার সূরা বাকার ২৩২ নং আয়াত লক্ষ্য করি। মহান আল্লাহ এরশাদ করেন-

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَظْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

অর্থাৎ “তোমরা যখন স্ত্রীদেরকে তালাক দাও এবং তারা তাদের ইদতকাল পূর্ণ করে তবে স্ত্রীগণ নিজেদের স্বামীদেরকে পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে বিয়ে করতে চাইলে তাদের বাঁধা দিও না। এ উপদেশ তাকেই দেয়া হচ্ছে, যে আল্লাহ ও কেয়ামত দিনের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করেছে। এর মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে একান্ত পরিশুদ্ধতা ও অনেক পবিত্রতা। আর আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না³⁸⁵।” উল্লেখিত আয়াতে দেখা যাচ্ছে যে, স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার পর যদি নির্ধারিত ইদত শেষও হয়ে যায়, তখন স্বামীর সাথে পারস্পরিক সম্মতিক্রমে বিয়ে করা যাবে। এখানে মনে হতে পারে যে, সূরা বাকারার ২৩০নং আয়াত ২৩২ নং আয়াতের সাথে বিরোধপূর্ণ, কিন্তু বাস্তবে তা নয়। উক্ত দুটি আয়াত ব্যাখ্যাগত দিক দিয়ে বিরোধপূর্ণ নয়। এ দুটি আয়াত বোঝার জন্য এখন হাদীস

³⁸⁵ সূরা বাকার-২৩২

শরীফ অনুসন্ধান করতে হবে। দেখতে হবে নবীজি (সাঃ) কি করেছেন। তার আগে আমি সূরা বাকারার ২৩২ নং আয়াতে শানে নুজুল উল্লেখ করতে চাই। অর্থাৎ কোন প্রেক্ষাপটে সূরা বাকারার ২৩২ নং আয়াত নাজিল হয়েছে। তাফসীরে ইবনে কাসীর-এ সূরা বাকারার ২৩২ নং আয়াতের শানে নুজুল সম্পর্কে উল্লেখ আছে- “আয়াতটি হযরত মা’কাল বিন ইয়াসার (রা) এবং তাঁর বোনের সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়। হযরত মা’কাল বিন ইয়াসার (রা) বলেন, ‘আমার নিকট আমার বোনের বিয়ের প্রস্তাব আসলে আমি তার বিয়ে দেই। তার স্বামী কিছুদিন পর তাকে তালাক দেয়। ইদ্দত অতিক্রান্ত হওয়ার পর পুনরায় সে আমার নিকট বিয়ের প্রস্তাব করে। আমি তা প্রত্যাখ্যান করি। আমি শপথ করি যে, তার সাথে আমার বোনে বিবাহ দিব না। তখন এই আয়াতটি (সূরা বাকারার ২৩২ নং আয়াত) অবতীর্ণ হয়। এটা শুনে হযরত মা’কাল (রা) বলেন, শপথ করা সত্ত্বেও আমি আল্লাহর নির্দেশ শুনেছি এবং মেনে নিয়েছি। অতঃপর তিনি তাঁর বোনকে ডেকে পাঠিয়ে পুনরায় তার সাথে তাঁর বোনের বিয়ে দিয়ে দেন এবং নিজের কসমের কাঙ্ক্ষা আদায় করেন। তাঁর বোনের নাম ছিল জামীল বিনতে ইয়াসার (রা) এবং তাঁর স্বামীর নাম ছিল আবুল বাদাহ (রা)।” আয়াতের শানে নুজুলে দেখা যাচ্ছে কোন হিল্লা বিয়ে ছাড়াই হযরত মা’কাল বিন ইয়াসার (রা) তার বোনকে পূর্বের স্বামীর সাথে বিবাহ দিলেন। ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত বুখারী শরীফ ৭ম খন্ড, ৪১৭৩ নং হাদীসেও উক্ত ঘটনা বর্ণিত আছে। তাই জোর দিয়ে বলা

যায় সূরা বাকারার ২৩০ নং আয়াত দিয়ে হিফ্ফা বিবাহের যে অপব্যখ্যা দেয়া হয় তা সম্পূর্ণ বানোয়াট। সূরা বাকারার ২৩০ নং আয়াতের ব্যাখ্যা ভিন্ন হবে যা, পরে আলোচনা করছি। আসলে ঐ সব মোল্লারা এই আয়াতের শানে নজুল জানে না বা নিজেদের স্বার্থ রক্ষার জন্য এই আয়াতের অপব্যখ্যা করে থাকে। এবার আমি ২৩২ নং আয়াতের স্বপক্ষে কিছু হাদীস পেশ করছি।

আবু দাউদ শরীফের কিতাবুত তালাক অধ্যায়ে ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রুকানার পিতা আবদ ইয়াযীদ উম্মে রুকানাকে তালাক প্রদান করেন এবং যুযায়না গোত্রের জনৈক স্ত্রীলোককে বিবাহ করেন। সেই মহিলা নবী করীম (সাঃ) এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে বলে, সে সহবাসে অক্ষম, যেমন আমার মাথার চুল অন্য চুলের কোন উপকারে আসে না। কাজেই আপনি তার ও আমার মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিন। এত শ্রবণে নবী করীম (সাঃ) রাগান্বিত হন এবং তিনি রুকানা ও তার ভাইদিগকে আহ্বান করেন। এরপর তিনি সেখানে উপস্থিত করে সাথীদের সম্বোধন করে বলেন, তোমারা লক্ষ্য করে দেখ যে, এদের মধ্যে অমুক অমুকের বিশেষ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ তাদের পিতা আবদ ইয়াযীদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সঙ্গে কি মিল খাচ্ছে না? তখন তারা বলেন, হ্যাঁ। নবী করীম (সাঃ) আবদ ইয়াযীদকে বলেন, তুমি তাকে তালাক দিয়ে দাও। তিনি তাকে তালাক দিলেন। এরপর তিনি তাকে নির্দেশ দেন যে, তুমি উম্মে রুকানাকে (পূর্ব স্ত্রী) পুনরায় গ্রহণ কর। তখন তিনি বলেন, আমি তো তাকে তিন তালাক প্রদান করেছি, ইয়া রাসূল্লাহ!

তখন তিনি বলেন, আমি তোমার তালাক প্রদানের কথা অবগত আছি। তুমি তাকে পুনরায় গ্রহণ কর। এরপর তিনি কুরআনের আয়াত তিলাওয়াত করেন, ‘হে নবী! যখন তোমাদের স্ত্রীদের তালাক প্রদান করবে, তখন তাদেরকে ইদ্দত পালনের জন্য তালাক দিবে।’ ইমাম আবু দাউদ (রঃ) বলেন, আবদ ইয়াযীদ তার স্ত্রীকে তালাক প্রদান করলে নবী করিম (সাঃ) তাকে পুনরায় গ্রহণের জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। (আবু দাউদ, ৩য় খন্ড, ২১৯৩নং হাদীস, ইসলামিক ফাউন্ডেশন)।

উক্ত হাদীসে দেখা যাচ্ছে যে, উম্মে রুকানাকে নবী করীম (সাঃ) হিল্লা বিবাহ ছাড়াই তার স্বামী আবদ ইয়াযীদ এর সাথে পুনরায় বিবাহ দিলেন। অতএব নবীজি হিল্লা বিবাহকে হারাম জানতেন তা প্রমানিত হলো।

**** ইবনে আব্বাস (রা) ও উমার (রা) হতে বর্ণিত **** - ‘নবী করীম (সাঃ) হযরত হাফসা (রা) কে তালাক প্রদান করেন। এরপর তিনি তাঁকে পুনরায় স্বীয় স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করেন^{৩৮৬}।’ এ হাদীসেও হিল্লা বিবাহের কোন অস্তিত্ব নেই। হিল্লা বিবাহ ছাড়াই নবীজি (সাঃ) হযরত হাফসা (রাঃ) কে পুনরায় বিবাহ করলেন। তাই হিল্লা বিবাহ অবৈধ, এতে কোন সন্দেহ নেই। যেহেতু সূরা বাকারার ২৩২ নং আয়াত সম্পর্কে হাদীসে প্রমান পাওয়া যায় যে, হিল্লা বিয়ে ছাড়াই তালাকের পর পুনরায় স্ত্রীকে গ্রহণ করা যায়, সেহেতু ২৩০ নং

^{৩৮৬} আবু দাউদ শরীফ, ৩য় খন্ড, ২২৭৭ নং হাদীস এবং সুনানে নাসাই শরীফ, ৩য় খন্ড, ৩৫৬১নং হাদীস, ইসলামিক ফাউন্ডেশন

আয়াতের ব্যাখ্যা ভুল। সূরা বাকারার ২৩০ নং আয়াত ঐ সমস্ত নারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যারা তালাক প্রাপ্ত হয়ে যাবার পর স্বেচ্ছায় দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করে এবং পরবর্তীতে আবার পূর্বের স্বামীর নিকট ফিরে যেতে চায়।

উল্লেখিত হাদীসসমূহ হতে আমরা সূরা বাকারার ২৩০ নং আয়াতে ব্যাখ্যা বুঝতে পারলাম। অর্থাৎ প্রথম স্বামী স্ত্রীকে তালাক দিলে ঐ স্ত্রী যদি স্বেচ্ছায় দ্বিতীয় বিবাহ করে, তবে ঐ স্ত্রী পূর্বের স্বামীর নিকট ফিরে যেতে পারবে না, যতক্ষণ না দ্বিতীয় স্বামী স্বেচ্ছায় ঐ স্ত্রীকে তালাক না দেয়। আর সূরা বাকারার ২৩২ নং আয়াতের ব্যাখ্যা হলো, যদি স্ত্রী প্রথম স্বামীর নিকট হতে তালাক প্রাপ্ত হওয়ার অন্য কোথাও বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ না হয়, তবে সে পূর্বের স্বামীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে উভয়ের সম্মতিতে। এতে কোন ধর্মীয় বা আইনি বাঁধা থাকবে না।

হিল্লা বিয়ে নামে যা প্রচলিত আছে, তা হারাম এবং অনৈসলামিক কর্মকাণ্ড। তাই সূরা বাকারার ২৩০ ও ২৩২ নং আয়াত দুটি ব্যাখ্যাগত দিক দিয়ে অনুরসণ যোগ্য।

আমাদের দেশে সেই পাকিস্তানী আমল থেকে ১৯৬১ সালে মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ দ্বারা তালাকে বিদা নিষিদ্ধ এবং হিল্লা বিয়ের প্রথা নিষিদ্ধ করা হয়। আশা করি বিশ্বের অন্যান্য মুসলিম দেশেও এই আইন কার্যকর হবে এবং হিল্লা বিয়ের মত অনৈসলামিক প্রথা চিরতরে ইসলামী সমাজ থেকে বন্ধ করা যাবে। এ ব্যাপারে আমাদের সকলকে সচেতন হতে হবে যেন ধর্মের নামে

হিল্লা বিয়ে দিয়ে কোন মা-বোনের ইজ্জত নিয়ে ছিনিমিনি খেলা না হয়। যদি কোথাও এরকম কোন দুঃখজনক পরিস্থিতি দেখা দেয় তবে সেই বিপদের হাত থেকে অসহায় নারীকে উদ্ধার করা ওয়াজিব। জেনে শুনে যারা অসহায়কে সাহায্য করে না তাদের উপর আল্লাহর রহমত আসে না। এ ব্যাপারে কারো সহযোগিতা না পেলে সরাসরি স্থানীয় প্রশাসন, থানা অথবা গণমাধ্যমকর্মীর সাহায্য নিন। একজন অসহায় নারীকে বিপদ হতে উদ্ধারের জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলা আপনাকে বড় ধরনের কোন পুরস্কার দিবেন। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে ইসলামের সঠিক বুঝ দান করুন এবং হিল্লা বিবাহে প্রতিরোধ গড়ে তোলার তাওফিক দিন। আমিন

সপ্তম পরিচ্ছেদ - নামাযের শুরুতে মুখে নিয়ত পাঠ করা

পাঁচ ওয়াক্ত নামাযসহ অন্যান্য সকল নামাযের শুরুতে নাওয়াইতু বলে মুখে নিয়ত উচ্চারণ করা একটি বিদ'আত। কারণ এটা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সুন্নাতে নেই। আল্লাহ তায়া'লা বলেন,

قُلْ أَتَعْلَمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

অর্থঃ তোমরা কি আল্লাহকে তোমাদের ধর্মের ব্যাপারে শিক্ষা দিতে চাও? অথচ আল্লাহ তায়া'লা আকাশ-যমীনের মধ্যকার সকল বস্তুসম্পর্কে অবগত আছেন। আর আল্লাহ প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে

সম্যক অবগত আছেন^{৩৮৭}। নিয়ত বিষয়ে সহীহ হাদীসও আছে।
সহীহুল বুখারীতে হাদীসটি এসেছে। হাদীসটি নিম্নরূপঃ

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَاصٍ اللَّيْثِيَّ، يَقُولُ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ " إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ "

(সহীহ বুখারী :: খন্ড ১ :: অধ্যায় ১ :: হাদীস ১)^{৩৮৮}। হুমায়দী (রহঃ)

..... ‘আলকামা ইবন ওয়াক্কাস আল-লায়সী (রহঃ) থেকে বর্ণিত,
আমি উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) - কে মিসরের ওপর দাঁড়িয়ে বলতে
শুনেছিঃ আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে বলতে শুনেছিঃ প্রত্যেক কাজ
নিয়তের সাথে সম্পর্কিত। আর মানুষ তার নিয়ত অনুযায়ী ফল
পাবে। তাই যার হিজরত হবে দুনিয়া লাভের অথবা নারীকে বিয়ে
করার উদ্দেশ্যে - সেই উদ্দেশ্যেই হবে তার হিজরতের প্রাপ্য।”

অতএব, উপরোক্ত কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে বলা যায়
যে, নিয়তের স্থান অন্তর। এটা অন্তরের কাজ, মুখের কাজ নয়।
মুখে নিয়ত উচ্চারণের পক্ষে কোন সহীহ তো দূরের কথা, কোন
যঈফ হাদীছও পাওয়া যায় না। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া
সাল্লাম), সাহাবায়ে কেরাম, কোন তাবেঈ বা চার ইমামের কোন

^{৩৮৭} সূরা হুজরাতঃ ১৬

^{৩৮৮} সহীহ বুখারী :: খন্ড ১ :: অধ্যায় ১ :: হাদীস ১

ইমাম এভাবে নিয়ত উচ্চারণ করেন নি। এটা কোন এক বুয়ুর্গ ব্যক্তির তৈরী করা প্রথা। ইসলামের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। সুতরাং তা বর্জন করা প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তির জন্য ফরজ। পূর্বেই বলা হয়েছে, নিয়ত শব্দের অর্থঃ ইচ্ছা বা সঙ্কল্প করা। আর তা অন্তরের মাধ্যমে হয়ে থাকে। মুখের মাধ্যমে নয়। সুতরাং কোন কিছু করার জন্য অন্তরে ইচ্ছা বা সঙ্কল্প করলেই সে কাজের নিয়ত হয়ে গেল। তা মুখে বলতে হবেনা।

নিয়তের গুরুত্ব

শরীয়তে নিয়তের গুরুত্ব অপরিসীম। ব্যক্তির আমল আল্লাহর নিকট গ্রহণীয় হয়না যতক্ষণে বান্দা তার নিয়ত সঠিক না করে নেয়। অর্থাৎ, আল্লাহর জন্যে তাঁর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে না করে নেয়। আল্লাহ বলেনঃ (তাদেরকে এছাড়া কোন নির্দেশ করা হয়নি যে, তারা খাঁটি মনে একনিষ্ট ভাবে আল্লাহর এবাদত করবে)। (সূরা বাইয়্যিনাহ/৫) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ “আমল সমূহ নিয়তের (ইচ্ছার) উপর নির্ভরশীল, আর প্রত্যেক ব্যক্তি তাই পাবে যা সে নিয়ত করবে। সুতরাং যে ব্যক্তি পার্থিব জীবনে সুখ-শান্তি লাভের উদ্দেশ্যে হিজরত করবে সে তাই পাবে। কিংবা কোন মহিলাকে বিবাহ করার উদ্দেশ্যে হিজরত করবে সে তাই পাবে”। (বুখারী, প্রথম হাদীস)। হাদীসটিতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বক্তব্য স্পষ্ট যে, মানুষ তার নিয়ত অনুযায়ী প্রতিফল পায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ হিজরত। হিজরত অর্থঃ ইসলামের বিধি-বিধান পূর্ণ রূপে পালন করতে পারা যায়না এমন দেশ ছেড়ে সে দেশে

যাওয়া যেখানে বিনা অসুবিধায় পালন করা যায়। অন্য কথায়, কুফরের দেশ ত্যাগ করে ঈমানের দেশে প্রত্যাবর্তন করা^{৩৮৯}।

তাই কোন ব্যক্তি যদি এ কারণে দেশ ত্যাগ করে যে, সে যে দেশে যাচ্ছে সেখানে যাওয়ার তার উদ্দেশ্যে হল কোন রমণীকে বিবাহ করা বা দুনিয়াবী কোন সুবিধা অর্জন করা, তাহলে সে তাই পাবে। হিজরতের ফলে কোন নেকী পাবেনা। যদি সে ঈমান বাঁচানোর উদ্দেশ্যে হিজরত করতো, তাহলে নেকী পেত। কাজ একই কিন্তু নিয়তের পরিবর্তনের কারণে নেকী পাওয়া এবং না পওয়া নির্ভর করছে। প্রকৃত নিয়ত হচ্ছে - ইবনুল কাইয়ুম (রহঃ) বলেন - “নিয়ত হচ্ছে, কোন কিছু করার ইচ্ছা করা এবং সংকল্প করা। নিয়তের স্থান হচ্ছে অন্তর যবানের সাথে আসলে তার কোন সম্পর্ক নেই। এ কারণে না তো নবীজী হতে আর না কোন সাহাবী হতে নিয়তের শব্দ বর্ণিত হয়েছে”^{৩৯০}।

সত্য প্রিয় ভাই ও বোনেরা! হ্যাঁ, প্রকৃতপক্ষে নিয়তের স্থান হচ্ছে অন্তর মুখে বলা বা পড়ার সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। উদাহরণ স্বরূপ, ধরুন আপনার গ্রামে মসজিদ উন্নতি কল্পে জালসা হচ্ছে। আপনি জালসায় আগত আলেমদের আলোচনা শোনার উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বের হলেন। সাথে এক শত টাকাও নিলেন। সভা শেষে ১০০ টাকা দান করে বাড়ি ফিরলেন। বলুন তো, আপনি যে এ নেকীর কাজটি করলেন এর জন্য কি আপনাকে মুখে আরবী বা

^{৩৮৯} ফাতহুল বারী, ১/২১

^{৩৯০} ইগাসাতুল্ লাম্ফান, ১/২১৪

বাংলায় এরূপ বলতে হল কি যে, হে আল্লাহ! আমাদের গ্রামে মসজিদের উন্নতি কল্পে আয়োজিত জালসায়, আগত উলামাদের আলোচনা শোনার উদ্দেশ্যে এবং এক শত টাকা দান করার উদ্দেশ্যে জালসা শুনতে উপস্থিত হলাম বা হতে যাচ্ছি? যদি কেউ এরূপ বলে তাহলে অনেকে তাকে মাথা খারাপ বলে মন্তব্য করবে।

নামাযের লাইনে দাঁড়িয়ে আমরা কিন্তু অজান্তে আল্লাহকে আরবীতে তাই বলে যাচ্ছি। বলছিঃ হে আল্লাহ! অমুকের পিছনে অমুক নামায পড়তে, কিবলামুখী হয়ে উপস্থিত হয়েছি।

নামাযী যখন নামাযের উদ্দেশ্যে মসজিদে প্রবেশ করে সেটাই নামাযের নিয়ত হয়। অতঃপর যখন সে যহর, আসর বা মাগরিবের নামায সম্পাদনের জন্য দাঁড়ায় তখন সেটাই তার উক্ত নামাযের নিয়ত হয়। অনুরূপ সুন্নত, নফল, ১, ২, ৩, বা চার রাকাত পড়ার তার অন্তরে যে ইচ্ছা জাগে সেটাই নিয়ত।

মুখে শব্দ দ্বারা কোন কিছু বলার প্রয়োজন নেই। আরবী বা বাংলায় বিশেষ শব্দ দ্বারা নিয়ত পড়া: পূর্বের আলোচনা হতে সুস্পষ্ট যে নিয়তের জন্য আরবী বা বাংলায় কিছু বলতে হয় না। তবুও অনেকে আরবীতে এরূপ নিয়ত পড়ে থাকে যেমন ফজর নামাযের নিয়ত কালে বলেঃ ‘নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লাহি তাআলা রাকাতাই সালাতিল ফাজরে ফারযুল্লাহে তাআলা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা’বাতিশ শারীফাতে- আল্লাহ্ আকবার’।

নিয়তের বিষয়টির সঠিকতা বিশ্লেষণার্থে সহীহ দলীল ভিত্তিক আরো কিছু আলোচনা করার প্রয়াস করা হলঃ

প্রিয় পাঠক ও পাঠিকা! নামায তথা অযু, রোযা, যাকাত, দান-খয়রাত কোন ক্ষেত্রেই প্রিয় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরকম শব্দ পড়ে নিয়ত করেন নি। কোন সাহাবী বা তাবেয়ী আর না চার ইমামদের কেউ এরকম নিয়ত পড়তেন। তাই যে আমল নবীজী কিংবা সালাফে সালাহীন দ্বারা প্রমাণিত নয় সে আমল অবশ্যই একটি শরীয়তে আবিষ্কৃত নতুন আমল যা, বিদআত। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ “যে ব্যক্তি শরীয়তে নতুন কিছু আবিষ্কার করল যা, শরীয়তের অংশ নয় তা বর্জনীয়”। (মুসলিম)। নামাযের শুরু "তকবীরে তাহরীমা" এর পূর্বে নিয়ত পড়া হয়। এখন বিষয়টির সত্যতা যাঁচাই করার জন্য প্রত্যেক নামাযী ভাইকে এতটুকুই অনুরোধ করব যে, নবীজীর নামাযের বর্ণনা প্রত্যেক হাদীসের বইতে বিস্তারিত এসেছে। যদি এধরনের নিয়ত হাদীসে থাকে তো যে কোন হাদীসের বই পড়ে দেখতে পারেন। অবশ্যই কোথাও পাবেন না। নিম্নে নামায শুরু করার সম্পর্কে কয়েকটি হাদীস বর্ণনা করা হচ্ছে যা দ্বারা বুঝা যেতে পারে যে, আল্লাহ আকবার বলার পূর্বে মুখে নিয়ত পড়ার প্রমাণ আছে না নেই।

ইবনে উমার (রা:) বলেনঃ নবীজী যখন নামাযে দাঁড়াতেন; তখন তিনি তাঁর হাত দুটি বাহু বরাবর উঠাতেন। অতঃপর তকবীর ‘আল্লাহ আকবার’ বলতেন^{৩৯১}। হাদীসটি স্পষ্ট যে, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তকবীরের মাধ্যমে নামায শুরু করতেন। নিয়ত পড়ে তকবীর দিতেন না।

^{৩৯১} মুসলিম, অধ্যায়ঃ নামায, অনুচ্ছেদ নং ৯ হাদীস নং ৮৬০-৮৬১

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নামায ভুলকারী জনৈক সাহাবীকে নামায শিক্ষা দেওয়ার সময় বলেনঃ “যখন নামাযে দাঁড়াবে তখন তকবীর দিবে”^{৩৯২}। এখানেও হাদীস স্পষ্ট যে, নামাযে দাঁড়ালে তকবীর দিয়ে নামায শুরু করতে হয়। কেউ যদি নিয়ত পড়ে শুরু করে তাহলে হাদীসের বরখেলাফ তো অবশ্যই হয়।

নবীজী আরো বলেনঃ “নামাযের চাবি পবিত্রতা অর্জন, (পার্শ্বিক কাজ-কর্ম, কথা-বার্তা ইত্যাদি) তকবীর বলার মাধ্যমে হারাম হয়, (আর সে সকল হালাল হয়) সালামের মাধ্যমে”^{৩৯৩}।

এ হাদীসে নামাযের শুরু এবং শেষ বর্ণিত হয়েছে। শুরু হচ্ছে তকবীরে তাহরীমা তথা আল্লাহু আকবার বলা। নিয়ত পড়া নয়। উল্লেখ্য যে, কায়েদা বগদাদীতে নিয়ত লেখা আছে বলে কিছু অজ্ঞ লোক তাই দলীল মনে করে এবং আমল করে। এটি চরম ভুল। কায়েদা বগদাদী শরীয়তের কোন দলীলের বই নয়, উহা কেবল একটি আরবী বর্ণ পরিচয়ের বই। যেমন বাংলা বর্ণ পরিচয়ের জন্য শিশু শিক্ষা, বাল্য পাঠ বা অন্য কোন বই। শরীয়তের দলীল হচ্ছে কুরআন এবং হাদীস।

মুখে উচ্চারণকৃত নিয়তের ক্ষতিকারক দিক সমূহ

অনেক ভাইকে নামাযের কথা বললে, বলেঃ নিয়তই জানি না নামায কিরূপে পড়ব? অর্থাৎ সে মনে করে আরবীতে তৈরি করা এসব

^{৩৯২} বুখারী, হাদীস নং ৭৯৩

^{৩৯৩} তিরমিযী, অধ্যায় পবিত্রতা অর্জন, প্রথম হাদীস

নিয়ত মুখস্ত না করলে নামায হয় না। কি আশ্চর্য! আবিষ্কৃত বিদআতী কিছু শব্দ মানুষকে নামায থেকে দূরে সরায়!

মকতব মাদরাসায় অনেক ছাত্রকে ডজনেরও অধিক আরবী নিয়ত মুখস্ত করানো হয়, অথচ দেখা যায় সে ছাত্রটি এখনও দু চারটি সূরা মুখস্ত করে নি। বলুন তো, এ ক্ষেত্রে নিয়ত মুখস্ত করানো জরুরী না সূরা মুখস্ত করানো জরুরী? যেহেতু নিয়তের প্রচলিত বাক্যগুলি আরবী ভাষায় আর আমরা আরবী বুঝি না। অন্যদিকে নামাযের রাকাতাত সংখ্যা ভিন্ন ভিন্ন, অনুরূপ নামাযও বিভিন্ন। যেমন ফরয, সুন্নত এবং নফল। আর নিয়তে বর্ণিত থাকে এই সব ব্যাপার। তাই নিয়তের শব্দ সমূহে সামান্য পার্থক্য থাকে। এবার মুখস্ত করার সময় এবং নামাযের পূর্বে পড়ার সময় অনেকের গোলমাল বেঁধে যায়, ফলে এই সমস্যায় পড়ে কেউ মাদরাসার পড়া ছাড়ে আর অনেকে রাকাতাত ছড়ে।

অর্থাৎঃ নামাযী মসজিদে ঢুকে দেখে যে, ইমাম সাহেব সূরা ফাতেহা পড়ার পর অন্য ছোট সূরা পড়তে শুরু করেছে, তখন সে তাড়াতাড়ি নিয়ত পড়তে গিয়ে গোলমালে পড়ে। দেখা যায় ইমাম সাহেব রুকুতে চলে গেছেন আর সে হাত খাড়া করে নিয়তের গোলমাল ঠিক করতে ব্যস্ত। আর অনেক সময় নিয়ত পড়তে গিয়ে সূরা ফাতেহা না পড়ে রুকুতে शामिल হয়। সূরা ফাতেহা যা পড়ার শব্দ নির্দেশ এসেছে সে তা পড়তে অনিচ্ছুক কিন্তু তৈরিকৃত নিয়ত পড়তে এ অবুঝ খুবই সচেতন! খুবই আগ্রহী!!

অষ্টম পরিচ্ছেদ - কতিপয় বিদ'আতী সালাত প্রসঙ্গে এবং জুম'আর দিনের বিদ'আত প্রসঙ্গে প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যে কোন ইবাদত কবুল হওয়ার মূল ভিত্তি হল তওহীদ। আর তা শুদ্ধ হওয়ার মৌলিক শর্ত হল ২টি; ইখলাস ও মুহাম্মাদী তরীকা। সুতরাং যে নামায মুহাম্মাদী তরীকায় নেই, তাতে পূর্ণ ইখলাস থাকলেও তা বিদ'আত। মহানবী (সাঃ) বলেন, “যে ব্যক্তি আমাদের এ (দ্বীন) ব্যাপারে নতুন কিছু উদ্ভাবন করবে যা তার পর্যায়ভুক্ত নয়, তা প্রত্যাখ্যাত^{৩৯৪}।”

“যে ব্যক্তি এমন আমল করে, যাতে আমাদের কোন নির্দেশ নেই, তা প্রত্যাখ্যাত^{৩৯৫}।” “আর নব রচিত কর্মসমূহ থেকে দূরে থেকো। কারণ, নবরচিত কর্ম হল বিদ'আত এবং প্রত্যেক বিদ'আত ই ভ্রষ্টতা^{৩৯৬}।” “আর প্রত্যেক ভ্রষ্টতাই হল জাহান্নামে^{৩৯৭}।”

সাধারণ নফল নামায নিষিদ্ধ সময় ছাড়া যে কোন সময়ে ইচ্ছামত সংখ্যায় পড়া যায়। কিন্তু সেই সাধারণ নামাযকে নিজের তরফ থেকে সময়, সংখ্যা, পদ্ধতি, স্থান, গুণ (ফযীলত) বা কারণ দ্বারা নির্দিষ্ট করলে তা বিদ'আত বলে পরিগণিত হয়। যে নামাযের কথা কেবল যযীফ বা দুর্বল হাদীসে বর্ণিত হয়েছে এবং কোন হাসান বা সহীহ হাদীসে তার বর্ণনা নেই, সে নামায বিদ'আত।

^{৩৯৪} বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ১৪০ নং হাদীস

^{৩৯৫} মুসলিম, সহীহ হাদীস নং - ১৭১৮

^{৩৯৬} আহমাদ, মুসনাদ, আব্দাউদ, সুনান, তিরমিযী, সুনান, ইবনে মাজাহ, সুনান, মিশকাত হাদীস নং - ১৬৫

^{৩৯৭} সহীহ, নাসাঈ, সুনান হাদীস নং - ১৪৮৭

উপরোক্ত পটভূমিকায় নিম্নে এমন কতিপয় নামাযের কথা আলোচনা করব, যা বিদ'আত। আর তা কেবল জানার জন্যই; যাতে কেউ অজান্তে সেই বিদ'আত না করে বসে।

মা-বাপের জন্য নামায

প্রত্যেক ফরয নামাযের পর সুন্নাতে মুআক্কাদাহ পড়ে বসে বসে ২ রাকআত নফল। মা-বাপের উদ্দেশ্যে এমন নামায বিদ'আত ^{৩৯৮}।

ঈদের রাতের নামায

উভয় ঈদের রাতে বিশেষ নামায (যইফ জামে ৫৩৫৮, ৫৩৬১) এবং এই রাত্রি জেগে ইবাদত বিদ'আত। (মু'জামুল বিদাহ' ৩৩২পৃঃ) ঈদুল ফিতরের রাতের ১০০ রাকআত এবং ঈদুল আযহার রাতের ২ রাকআত নামাযও বিদ'আত। (ঐ ৩৪৪পৃঃ)।

যে হাদীসে বলা হয়েছে যে, “যে ব্যক্তি ঈদুল ফিতর ও আযহার রাত্রি জাগরণ (ইবাদত) করবে, তার হৃদয় সেদিন মারা যাবে না, যেদিন সমস্ত হৃদয় মারা যাবে।” (ত্বাবারানী, মু'জাম) সে হাদীসটি জাল ও মনগড়া হাদীস। (সিলসিলাহ যারীফাহ, আলবানী ৫২০, যইফ জামে ৫৩৬১ নং হাদীস দ্রষ্টব্য)।

কাযা উমরী (উমরী কাযা)

কাযা উমরী বা উমরী কাযা নামাযের অস্তিত্ব শরীয়তে নেই। বিধায় তা বিদ'আত। বিদআতীরা বলে, যদি কোন লোকের বহু সময়ের নামায কাযা হয়ে থাকে এবং সে তার সংখ্যা জানে না, তবে সে জুমআর দিন ফরয নামাযের পূর্বে ৪ রাকআত নফল নামায এক

^{৩৯৮} মু'জামুল বিদাহ' ৩৪৫ নং পৃষ্ঠা

সালামে আদায় করবে। এই নামাযে প্রত্যেক রাকআতে সূরা ফাতিহার পর আয়াতুল কুরসী ৭ বার এবং সূরা কাওসার ১৫ বার পড়বে। এই নামায পড়লে নামাযী ও তার পিতা-মাতার (?) অসংখ্যকাযা নামায নাকি আল্লাহ মাফ করে দিবেন!

স্বালাতুল আওয়াবীন

আওয়াবীনের নামায আসলে চাশতের নামাযের অপর নাম। মহানবী (সাঃ) বলেন, “চাশতের নামায হল আওয়াবীনের নামায।” (জামে হাদীস নং - ৩৮২৭) আর এ হাদীস এ কথারই দলীল যে, মাগরেবের পর উক্ত নামের নামাযটি ভিত্তিহীন ও বিদআত। যেমন এই নামাযের খেয়ালী উপকার বর্ণনায় বলা হয়ে থাকে যে, সৃষ্টিজগৎ ঐ নামাযীর অনুগত হয়ে যায় এবং ১২ বছরের কবুল হওয়া ইবাদতের সওয়াব লিখা হয়। যে হাদীসে মাগরেব ও এশার মধ্যবর্তী সময়ের নামাযকে আওয়াবীনের নামায বলা হয়েছে, তা সহীহ নয়; যয়ীফ^{৩৯৯}।

তিরমিযী ও ইবনে মাজাতে যে ৬ রাকআত নামায মাগরেবের পর পড়লে ১২ বছর ইবাদতের সমান হওয়ার কথা বলা হয়েছে তা সহীহ নয়। বরং তা খুবই দুর্বল হাদীস। (তিরমিযী, সুনান ৬৬, সিয়া: ৪৬৯, যইফ জামে ৫৬৬১ নং হাদীস) যেমন ৫০ বছরের গুনাহ মাফ হওয়ার হাদীসও দুর্বল। (সিলসিলাহ যায়ীফাহ, আলবানী ৪৬৮, যইফ জামে ৫৬৬৫নং)। তদনুরূপ এই সময়ে ২০ রাকআত

^{৩৯৯} সিলসিলাহ যায়ীফাহ, আলবানী ৪৬১৭, যইফ জামে ৫৬৭৬ নং হাদীস

নামায়ে বেহেশ্তে একটি গৃহ লাভের হাদীসটিও জাল ও মনগড়া^{৪০০}। অবশ্য সাধারণভাবে নফল নামায যেমন নিষিদ্ধ সময় ছাড়া যে কোন সময়ে পড়া যায়, তেমনি মাগরেব ও এশার মধ্যবর্তী সময়ে সাধারণ নফল অনির্দিষ্টভাবে পড়া যায়। মহানবী (সাঃ) এই সময়ে নফল নামায পড়তেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। (জামে ৪৯৬২ নং হাদীস)।

এহুতিয়াতী যোহর

জুমআর নামাযের পর অনেকে যোহরের নিয়তে ৪ রাকআত নামায পড়ে থাকে যা ভিত্তিহীন, মনগড়া ও বিদ'আত। (আল-আজবিবাতুন নাফেআহ্, আন আসইলাতি লাজনাতি মাসজিদিল জামেআহ্, মুহাদ্দিস আলবানী ৭৪পৃ:, মু'জামুল বিদাহ' ১২০, ৩২৭পৃ:)

স্বালাতুল হিফয

কুরআন হিফয সহজ হওয়ার উদ্দেশ্যে জুমআর রাতে ৪ রাকআত এই নামায পড়া হয়। এর প্রথম রাকআতে সূরা ফাতিহার পর সূরা ইয়াসীন, দ্বিতীয় রাকআতে সূরা ফাতিহার পর সূরা দুখান, তৃতীয় রাকআতে ফাতিহার পর সূরা সাজদাহ এবং চতুর্থ রাকআতে ফাতিহার পর সূরা মুলক পড়া হয়।

আর এর শেষে লম্বা দুআ করা হয়। এ আমলের জন্য যেহাদীস বর্ণনা করা হয় তা জাল ও মনগড়া হাদীস। (তিরমিযী, সুনান ৭১৯, সিলসিলাহ যায়ীফাহ, আলবানী ৩৩৭৪ নং হাদীস) বিধায় তা বিদ'আত। (মু'জামুল বিদাহ' ৩৩৯পৃ:)।

^{৪০০} সিলসিলাহ যায়ীফাহ, আলবানী ৪৬৭, যইফ জামে ৫৬৬২নং

মৃতের জন্য ঈসালে সওয়াবের নামায

মৃতব্যক্তির কল্যাণের জন্য সওয়াব পোঁছবার উদ্দেশ্যে নামায পড়া এবং তার সওয়াব তার নামে বখশে দেওয়া বিদ'আত । (মু'জামুল বিদাহ' ৩৪০পৃঃ)

মনগড়া প্রাত্যহিক নামায ও তার খেয়ালী সওয়াব

শুক্রবার : শুক্রবারে যোহর ও আসরের মধ্যবর্তী সময়ে (?) ২ রাকআত; প্রথম রাকআতে আয়াতুল কুরসী ১ বার ও সূরা ফালাক ২৫ বার এবং দ্বিতীয় রাকআতে সূরা ইখলাস ১ বার এবং সূরা ফালাক ২০ বার পড়া। ফযীলত: মরার পূর্বে স্বপ্নে আল্লাহর ও বেহেশ্তে নিজের জায়গার দর্শন লাভ! এই দিনে মাগরেব ও এশার মধ্যবর্তী সময়ে ১২ রাকআত নামায। ফযীলত: বেহেশ্তে মহল লাভ, সমগ্র মুসলিম জাতির তরফ থেকে সদকাহ্ দেওয়ার সওয়াব লাভ এবং পাপ নাশ হবে। এই দিনে চাশতের সময় নির্দিষ্ট সূরার সাথে ৪ অথবা ১০ রাকআত নামায পড়া। (মু'জামুল বিদাহ' ৩৪১পৃঃ)

ফযীলত: নবীর সুপারিশে বেহেশ্ত লাভ, মা-বাপেরও গুনাহ মাফ! মহানবী (সাঃ)-কে দেখার উদ্দেশ্যে অনেকে জুমআর রাতে ২ রাকআত নামায পড়ে। প্রত্যেক রাকআতে সূরা ইখলাস ২৫ বার, সালামের পর নবীর প্রতি দরুদ ১০০০ বার। (মু'জামুল বিদাহ' ৩৪৩পৃঃ)

শনিবার : শনিবারের যে কোন সময়ে ৪ রাকআত এক সালামে; প্রত্যেক রাকআতে ৩ বার সূরা কাফিরুন এবং নামায শেষে ১ বার আয়াতুল কুরসী। ফযীলত: ১ বছরের রোযা ও রাতের ইবাদতের

এবং শহীদের সওয়াব লাভ, প্রত্যেক হ্রফের বদলে এক হজ্জ ও ওমরার সওয়াব লাভ, কিয়ামতে নবী ও শহীদানের সাথে আরশের ছায়া লাভ!!! শনিবার দিনগত রাতের ২০ রাকআত নামায; প্রত্যেক রাকআতে সূরা ইখলাস ৫০ বার, সূরা ফালাক একবার এবং সূরা নাস একবার। তারপর নানান দুআ ১০০ বার। ফযীলত: পৃথিবীর সকল মানুষের সংখ্যার সমান (প্রায় ৬০০ কোটি) সওয়াব লাভ, কিয়ামতে নিরাপত্তা লাভ এবং নবীদের সাথে বেহেশ্ত প্রবেশ!!!

রবিবার : রবিবার যে কোন সময়ে ৪ রাকআত ১ সালামে, প্রত্যেক রাকআতে সূরা বাক্বরার শেষ ২ আয়াত পড়া।

ফযীলত: নাসারাদের নর-নারীর সংখ্যার সমান নেকী লাভ, নবীর সওয়াব লাভ, হজ্জ ও উমরার সওয়াব লাভ, প্রত্যেক রাকআতের বদলে ১০০০ নামাযের সওয়াব লাভ এবং প্রত্যেক হ্রফের বদলে বেহেশ্তে মিসকের শহর লাভ!!!

রবিবার দিনগত রাতে যে কোন সময়ে ৪ রাকআত ১ সালামে, প্রথম রাকআতে সূরা ইখলাস ১০ বার, দ্বিতীয় রাকআতে ২০ বার, তৃতীয় রাকআতে ৩০ বার এবং চতুর্থ রাকআতে ৪০ বার পড়া। নামাযের পর নির্দিষ্ট অযীফা ৭৫ বার করে।

ফযীলত: দোযখী হলেও বেহেশ্ত লাভ হবে! সমস্ত জাহেরী গুনাহ মাফ হয়ে যাবে। প্রত্যেক আয়াতের বিনিময়ে হজ্জ ও উমরার সওয়াব লাভ এবং আগামী সোমবারের ভিতরে মরলে শহীদ হবে।

সোমবার : সোমবার চাশতের সময় ২ রাকআত নামায, প্রত্যেক রাকআতে আয়াতুল কুরসী ১ বার, সূরা ইখলাস ১ বার, সূরা ফালাক

১ বার এবং সূরা নাস ১ বার পড়া। ফযীলত: সমস্ত গুনাহ মাফ হবে। এই দিনে আরো ১২ রাকআত নামায।

ফযীলত: কিয়ামতে এক হাজার বেহেশতী যেওর ও তাজ পরানো হবে, ১ লক্ষ ফিরিশ্তা এই নামাযীকে নিয়ে যাবে এবং প্রত্যেক ফিরিশ্তার অসংখ্য উপহার থাকবে! সোমবার দিবাগত রাতে ১২ রাকআত এবং প্রত্যেক রাকআতে সূরা নাসর ৫ বার করে পড়া।

ফযীলত: বেহেশ্তে ৭ পৃথিবীর সমান বিরাট ঘর তৈরী হবে!

মঙ্গলবার : মঙ্গলবার দিনে চাশতের সময় অথবা সূর্য ঢলার সঙ্গে সঙ্গে ১০ রাকআত এবং প্রত্যেক রাকআতে আয়াতুল কুরসী ১ বার ও সূরা ইখলাস ৩ বার পড়া। ফযীলত: ৭০ দিন কোন লিখা হবে না! ৭০ বছরের গুনাহ মাফ। আর ঐ দিনে মরলে সে শহীদ হবে!

মঙ্গলবার দিবাগত রাতে ২ রাকআত; প্রথম রাকআতে ১০ বার সূরা ফালাক এবং দ্বিতীয় রাকআতে ১০ বার সূরা নাস পড়া।

ফযীলত: ৭০ হাজার ফিরিশ্তা আসমান থেকে নাজেল হয়ে এই নামাযীর জন্য কিয়ামত পর্যন্ত সওয়াব লিখতে থাকবে !!!

বুধবার : বুধবার দিনে সকালে ১২ রাকআত; প্রত্যেক রাকআতে আয়াতুল কুরসী ১ বার, সূরা ইখলাস ৩ বার, সূরা ফালাক ৩ বার এবং সূরা নাস ৩ বার পড়া। ফযীলত: সমস্ত গুনাহ মাফ, কবরের আযাব, সংকীর্ণতা ও অন্ধকার দূর হবে, নবীদের মত আমল নিয়ে কিয়ামতে উঠবে (!) এবং কিয়ামতের কষ্ট দূর হবে।

বুধবার মাগরেব ও এশার মাঝে ২ রাকআত; প্রত্যেক রাকআতে আয়াতুল কুরসী ৫ বার, সূরা ইখলাস ৫ বার, সূরা ফালাক ৫ বার

এবং সূরা নাস ৫ বার পড়া। ফযীলত: মা-বাপের নামে বখশালে মা-বাপের হুক আদায় হয়ে যাবে; যদিও দুনিয়াতে তারা তার উপর নারাজ ছিল (?!) সিদ্দীক ও শহীদগণের সওয়াব লাভ হবে!

বৃহস্পতিবার : বৃহস্পতিবার দিনে যোহর ও আসরের মধ্যবর্তী সময়ে (?) ২ রাকআত; প্রথম রাকআতে আয়াতুল কুরসী ১০০ বার এবং দ্বিতীয় রাকআতে সূরা ইখলাস ১০০ বার পড়া। সালামের পর দরুদ ১০০ বার। ফযীলত: রজব, শা'বান ও রমযান মাসের রোযাদারদের মত, কা'বা শরীফের হাজীদের মত এবং মুমিনদের সংখ্যা অনুপাতে সওয়াব লাভ হয়! বৃহস্পতিবার মাগরেব ও এশার মধ্যবর্তী সময়ে ১২ রাকআত; প্রত্যেক রাকআতে সূরা ইখলাস ১০ বার পড়া।

ফযীলত: ১২ বছরের দিনের রোযার এবং রাতের ইবাদত করার সওয়াব লাভ হয়!

মনগড়া মাসিক নামায ও তার খেয়ালী সওয়াব

মহররম মাসের খেয়ালী নামায - মহররম মাসের প্রথম তারীখের রাতে ২ রাকআত; প্রত্যেক রাকআতে সূরা ইখলাস ১১ বার। এই রাতে আরো ৬ রাকআত; প্রত্যেক রাকআতে সূরা ইখলাস ১০ বার। এতে বেহেস্তে ২০০০ মহল লাভ হবে; প্রত্যেক মহলে ইয়াকূতের ১০০০ দরজা এবং প্রত্যেক দরজায় সবুজ রঙের তখতার উপর হুঁর বসে থাকবে। ৬০০০ বালা দূর হবে এবং ৬০০০ সওয়াব লাভ হবে! এই তারীখে দিনে ২ রাকআত; প্রত্যেক রাকআতে সূরা ইখলাস ৩ বার। এতে দু জন ফিরিশ্তা বডিগাড পাওয়া যায় এবং সারা বছর শয়তান থেকে নিরাপত্তা লাভ। আশুরার রাতে ২

রাকআত; প্রত্যেক রাকআতে সূরা ইখলাস ৩ বার। এতে কিয়ামত পর্যন্ত রেশন থাকবে। এই রাতে আরো ৪ রাকআত। প্রত্যেক রাকআতে সূরা ইখলাস ৫০ বার। এতে ৫০ বছরের আগের ও পরের গুনাহ মাফ হয়! আশুরার দিনে ৪ রাকআত নামায; প্রত্যেক রাকআতে সূরা ইখলাস ৫০ বার। এতে ৫০ বছরের আগের ও পরের গুনাহ মাফ হয়! বেহেষ্টে ১০০০ নূরের মহল তৈরী হয়। এই দিনে রয়েছে আরো ৪ রাকআত খেয়ালী নামায। অথবা যোহর ও আসরের মধ্যবর্তী সময়ে ৪ রাকআত; প্রত্যেক রাকআতে ফাতিহার পর আয়াতুল কুরসী ১০ বার, সূরা ইখলাস ১১ বার এবং নাস ও ফালাক ৫ বার। নামায শেষে ইস্তিগফার ৭০ বার। এ নামাযও বিদআত। (মু'জামুল বিদাহ' ৩৪০-৩৪১পৃ:)। এই মাসের ১ থেকে ১০ তারীখ পর্যন্ত প্রত্যেক দিন যোহরের পর ৪ রাকআত; প্রত্যেক রাকআতে সূরা ইখলাস ১৫ বার। এ নামায হযরতহাসান-হোসেনের রুহের উপর বখশে দিলে কিয়ামতে তাঁদের সুপারিশ (!) লাভ হবে।

সফর মাসের খেয়ালী নামায - প্রথম তারীখের রাতে এশার পর ৪ রাকআত; প্রথম রাকআতে সূরা কাফিরুন ১৫ বার। দ্বিতীয় রাকআতে সূরা ইখলাস ১৫ বার। তৃতীয় রাকআতে সূরা ফালাক ১৫ বার এবং চতুর্থ রাকআতে সূরা নাস ১৫ বার। এতে সমস্ত বালা থেকে রেহাই পাওয়া যায় এবং খুব বেশী সওয়াব লাভ হয়। এই মাসের শেষ বুধবার বা আখেরী চাহার শোম্বার চাশতের সময় ২ রাকআত; প্রত্যেক রাকআতে সূরা ইখলাস ১১ বার। এ মাসের ১ম

সপ্তাহের জুমআর রাতে এশার পরে ৪ রাকআত নফল এবং তার খেয়ালী সওয়াবের কথার উল্লেখ রয়েছে অনেক কিতাবে।

রবিউল আওয়াল মাসের খেয়ালী নামায - এই মাসের প্রথম হতে ১২ তারীখ পর্যন্ত প্রত্যেক দিন ২০ রাকআত; প্রত্যেক রাকআতে সূরা ইখলাস ২১ বার। এই নামায নবী (সাঃ)-এর নামে বখশে দিলে তিনি নামাযীকে বেহেশ্তের সুসংবাদ দেবেন! অনেকের মতে এ মাসে নিয়মিত দরুদ পড়লে ধনী হওয়া যায়।

রবিউস-সানী মাসের বিদ'আতী নামায - এই মাসের ১, ১৫ ও ২৯ তারীখে ৪ রাকআত; প্রত্যেক রাকআতে সূরা ইখলাস ৫ বার। এতে ১০০০ সওয়াব লাভ, ১০০০ পাপ মাফ এবং ৪টি হ্র লাভ হবে। অনেকের খেয়াল মতে এ মাসের ১৫ তারীখে মাগরেবের পর ৪ রাকআত নামায পড়লে উভয়কালে কামিয়াবী লাভ হয়। এ মাসের শেষ রাতে ৪ রাকআত নামায পড়লে কবরের আযাব থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

জুমাদাল আওয়াল মাসের খেয়ালী নামায - এই মাসের প্রথম তারীখের রাতে ৪ রাকআত; প্রত্যেক রাকআতে সূরা ইখলাস ১১ বার। এতে ৯০,০০০ বছরের নেকী লাভ হবে এবং ৯০,০০০ বছরের গুনাহ মোচন হয়ে যাবে! কারো খেয়াল মতে এ মাসের প্রথম তারীখে ২০ রাকআত নামায পড়তে হয়।

জুমাদাস সানী মাসের খেয়ালী নামায - এই মাসের প্রথম তারীখের রাতে ৪ রাকআত; প্রত্যেক রাকআতে সূরা ইখলাস ১৩ বার। এতে

১ লাখ নেকী লাভ হবে এবং ১ লাখ গুনাহ মোচন হবে! এ রাতে ১২ রাকআত নামাযের কথাও বর্ণনা করা হয়ে থাকে।

রজব মাসের খেয়ালী নামায - এই মাসে ১, ১৫, ও শেষ তারীখে গোসল করলে (গঙ্গাজলে স্নান করার মত) প্রথম দিনকার শিশুর মত নিষ্পাপ হওয়া যায়! এই মাসে ৩০ রাকআত নামায এবং তার ৫টি রাত ইবাদত করার খেয়ালী ফযীলত বর্ণনা করা হয়ে থাকে। কারো মতে এ মাসের ১৫ তারীখে এশার পরে ৭০ রাকআত নামায পড়লে পৃথিবীর বৃক্ষরাজি পরিমাণ সওয়াব লাভ হয়। (মু'জামুল বিদাহ' ৩৪১ পৃ: দ্র:)

শওয়াল মাসের খেয়ালী নামায - এই মাসের ১ তারীখের রাতে অথবা ঈদের নামাযের পর ৪ রাকআত; প্রত্যেক রাকআতে সূরা ইখলাস ২১ বার। এতে বেহেশ্তের ৮টি দরজা খোলা এবং দোযখের ৭টি দরজা বন্ধ হয়ে যায়। মরার পূর্বে বেহেশ্তে নিজের স্থান দেখা যায়। এ ছাড়া দিনে অথবা রাতে আরো ৮ রাকআত নামাযের কথা বলা হয়।

যুলক্বাদাহ্ মাসের খেয়ালী নামায - এই মাসের ১ তারীখের রাতে ৪ রাকআত; প্রত্যেক রাকআতে সূরা ইখলাস ২৩ বার। এতে বেহেশ্তে ৪০০০ লাল ইয়াকূতের ঘর তৈরী হয়! প্রত্যেক ঘরে জওহারের সিংহাসন থাকবে!! প্রত্যেক সিংহাসনে ছর বসা থাকবে; তাদের কপাল সূর্য অপেক্ষা বেশী উজ্জ্বল হবে!!! এ ছাড়া এই মাসের প্রত্যেক রাতে ২ রাকআত নামায পড়লে ১ জন শহীদ ও ১ হাজার

সওয়াব লাভ হবে! আর এই মাসের প্রত্যেক শুক্রবার ৪ রাক'আত নামায পড়লে ১টি হজ্জ ও ১টি উমরার সওয়াব হবে!!

যুলহজ্জ মাসের খেয়ালী নামায - এই মাসের ১ তারীখের রাতে ৪ রাক'আত; প্রত্যেক রাক'আতে সূরা ইখলাস ২৫ বার। এতে বেগমার সওয়াব লাভ হয়। এ মাসের প্রথম ১০ দিনের বিতরের নামাযের পর ২ রাক'আত; প্রত্যেক রাক'আতে সূরা কাওসার ৩ বার এবং সূরা ইখলাস ৩ বার পড়লে 'মাকামে ইল্লীন' (?) লাভ হবে, প্রত্যেক কেশের বদলে ১০০০ নেকী এবং ১০০০ দ্বীনার সদকা করার সওয়াব লাভ হবে! এ ছাড়া আরো কত মনগড়া নামাযের কথা রয়েছে অনেক বই-পুস্তকে।

আসলে সওয়াব তাদের নিজের পকেট থেকে বলেই এত এত সওয়াব অর্জনের ব্যাপারে আশ্চর্য ও অবাক হওয়ার কোন কারণ নেই। প্রাত্যহিক ও মাসিক ঐ শ্রেণীর নির্দিষ্ট নামায যে বিদ'আত , সে প্রসঙ্গে উলামাদের স্পষ্ট উক্তি রয়েছে। (মু'জামুল বিদাহ' ৩৪২পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

জুম'আর দিনের বিদ'আত প্রসঙ্গে প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(১) জুম'আর সালাতের জন্য দুই আযান দেওয়া

জুম'আর সালাতের জন্য দুই আযান দেওয়ার যে প্রথা সমাজে চালু আছে তা সুন্নাহ সন্দেহ নয়। জুম'আর আযান হবে একটি। ইমাম খুৎবা দেওয়ার জন্য যখন মিস্বরে বসবেন, তখন মুয়াযযিন আযান দিবে।^{৪০১} রাসূল (সাঃ), আবুবকর ও ওমর (রাঃ) - এর আমলে এবং

^{৪০১} বুখারী হা/৯১৫ ও ৯১৬, ১/১২৫ পৃঃ, (ইফাবা হা/৮৬৯ ও ৮৭০, ২/১৮৩ পৃঃ)

ওছমান (রাঃ) - এর খেলাফতের প্রথমাংশে জুম'আর আযান একটিই ছিল। অতঃপর মানুষের সংখ্যা যখন বেড়ে গেল, তখন ওছমান (রাঃ) মসজিদে নববীর অনতিদূরে 'যাওরা' নামক বাজারে জুম'আর পূর্বে আরেকটি আযান চালু করেন।^{৪০২} ওসমান (রাঃ) যে কারণে আরেকটি আযান চালু করেছিলেন, কোথাও উক্ত কারণ বিদ্যমান থাকলে তা এখনো চালু করা জায়েয। কারণ খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাহের অনুসরণে ওসমান (রাঃ)-এর আযান যদি সকল মসজিদের জন্য পালনীয় হত, তাহলে তিনি মক্কায় চালু করলেন না কেন? অনুরূপ অন্যান্য মসজিদে চালু হল না কেন? আলী (রাঃ)-এর আমল পর্যন্ত অন্য কোথাও উক্ত আযান চালু হয়নি। এমনকি মক্কাতেও চালু হয়নি। বর্তমানে আমরা কি উক্ত আযান চালু করে সাহাবীদের চেয়ে বেশী দীনদারীর ভাব দেখাতে চাই? এ জন্যই হয়ত ইবনু ওমর (রাঃ) উক্ত আযানকে বিদ'আত বলেছেন।^{৪০৩} অনুরূপ ইমাম কুরতুবী (ম্ঃ ৬৭১) ইমামের সামনে মিস্রের নিকটে দেয়া প্রচলিত আযানকে বিদ'আত বলেছেন।^{৪০৪}

ওমর ইবনু আলী আল-ফাকেহানী (৬৫৪-৭৩৪/১২৫৬-১৩৩৪ খৃঃ) বলেন, ডাক আযান প্রথম বছরায় চালু করেন যিয়াদ এবং মক্কায় চালু করেন হাজ্জাজ বিন ইউসুফ। আর আমার কাছে এখন খবর পৌঁছেছে যে, নিকট মাগরিবে অর্থাৎ আফ্রিকার তিউনিস ও আলজেরিয়ার পূর্বাঞ্চলের লোকদের নিকট কোন আযান নেই, মূল

^{৪০২} বুখারী হা/৯১২, ১/১২৪ পৃঃ, (ইফরা হা/৮৬৬, ২/১৮১ পৃঃ)।

^{৪০৩} মুহাম্মাদ ইবনে আবী শায়বাহ হা/৫৪৭৭-৫৪৮৩; আলবানী, আল-আজবেবাতুন নাফে'আহ, পৃঃ

^{৪০৪} তাফসীরে কুরতুবী ১৮/১০১ পৃঃ, সূরা জুম'আ ৯ নং আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রঃ

এক আযান ব্যতীত’।^{৪০৫} আলী (রাঃ)-এর (৩৫-৪০ হিঃ) রাজধানী কূফাতেও এই আযান চালু ছিল না।^{৪০৬} ইবনু হাজার আসকালানী বলেন, উমাইয়া খলীফা হেশাম বিন আব্দুল মালেক (১০৫-২৫/৭২৪-৭৪৩ খৃঃ) সর্বপ্রথম ওসমানী আযানকে ‘যাওরা’ বাজার থেকে এনে মদীনার মসজিদে চালু করেন।^{৪০৭}

ইবনুল হাজ্জ মালেকী বলেন, অতঃপর হেশাম খুৎবাকালীন মূল আযানকে মসজিদের মিনার থেকে নামিয়ে ইমামের সম্মুখে নিয়ে আসেন’।^{৪০৮} এভাবে হাজ্জাজী ও হেশামী আযান সর্বত্র চালু হয়েছে।^{৪০৯} অতএব বর্তমানে যে আযান চলছে সেটা রাসূল (সাঃ)-এর আযানও নয়, ওছমান (রাঃ)-এর আযানও নয়। সুতরাং উক্ত বিদআতী আযান অবশ্যই পরিত্যাজ্য। রাসূল (সাঃ)-এর যুগে যে আযান চালু ছিল আমাদের সবাইকে সেই আযানে ফিরে যেতে হবে।
জ্ঞাতব্য : হেদায়ার লেখক উক্ত বানোয়াট ও ভিত্তিহীন বিদআতী আযানের পক্ষে অবস্থান করে বলেছেন,

الْمُؤَدِّتُونَ بَيْنَ يَدَيِ الْمُنْبَرِ بِذَلِكَ جَرَى وَإِذَا صَعِدَ الْإِمَامُ الْمُنْبَرِ جَلَسَ وَأَذَّنَ
إِلَّا هَذَا الْأَذَانُ وَلَمْ يَكُنْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ التَّوَارُثُ

যখন ইমাম মিম্বরে উঠে বসবেন তখন মুয়াযযিন মিম্বরের সামনে আযান দিবে। আর এই আযানই ধারাবাহিকভাবে চলে আসছে। আর এই আযান ছাড়া রাসূল (সাঃ) - এর যুগে অন্য কোন আযান চালু

^{৪০৫} মিরআতুল মাফাতীহ ৪/৪৯২

^{৪০৬} তাফসীরে জালালাইন, ৪৬০ পৃঃ, টীকা ১৯; কুরতুবী ১৮/১০০ পৃঃ, তাফসীর সূরা জুমআ-৯

^{৪০৭} মিরআতুল মাফাতীহ (দিল্লী ছাপা : তাবি) ৩/২৬৩

^{৪০৮} আওনুল মা’বুদ শরহ আবুদাউদ (কায়রো : ১৪০৭/১৯৮৭) ৩/৪৩৩-৩৪ পৃঃ, হা/১০৭৪-৭৫-এর ব্যাখ্যা

^{৪০৯} আওনুল মা’বুদ ৩/৪৩৭-৩৮। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা দ্রঃ ছালাতুর রাসূল (সাঃ), পৃঃ ১৯৪ ও ১৯৫

ছিল না।^{৪১০} সুধী পাঠক! লেখক মসজিদের ভিতরের আযানের সমাধান দিয়েছেন, কিন্তু পূর্বের ডাক আযানের বিষয়টি উল্লেখ করেননি। তাহলে জুম'আর সালাতের আধা ঘণ্টা পূর্বে যে আযান দেয়ার প্রচলন হয়েছে তার ভিত্তি কি? লেখক রাসূল (সাঃ), আবুবকর, ওমর (রাঃ)-এর সুন্নাতী আযানকে উল্লেখ করতে ভুলে গেছেন কিন্তু ভিত্তিহীন বিদ'আতী আযান উল্লেখ করতে ভুলেননি।^{৪১১} এটা যে মাযহাবী ফাঁদ, এখান থেকে তিনি মুক্ত হবেন কিভাবে? অতএব আমাদেরকে রাসূল (সাঃ)-এর আযানই আকড়ে ধরে থাকতে হবে। অন্যগুলো সব প্রত্যাখ্যান করতে হবে।

(২) প্রচলিত জুমআর খুতবা এবং মাতৃভাষায় জুমআর খুতবা প্রসঙ্গে প্রাসঙ্গিক আলোচনা

নিজ ভাষায় খুতবা না দেয়ার কারণে যেহেতু তা মানুষের বোধগম্য হয় না এজন্যই এই খুতবার আগে খতীবগণ বয়ানের ব্যবস্থা রেখেছেন, যা শরীয়তের দৃষ্টিতে একটি জঘন্যতম বিদ'আত। কারণ খুতবা দানের পূর্বে বয়ান দেয়া এবং ইহাকে এভাবে স্থায়ী রূপ দেয়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে আদৌ প্রমাণিত নয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুতবার পূর্বে কখনো এ ধরনের বয়ান দেন নি। দিতে বলেছেন বলে ও কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। এজন্যই এ সউদী আরবের বরেন্য মুফতী শাইখ ইবনে উসাইমীন (রহ:) কে মাতৃভাষায় খুতবা প্রদান সম্পর্কে সওয়াল করা হলে তিনি

^{৪১০} হেদায়া ১ম খন্ড, পৃঃ ১৭১-১৭২

^{৪১১} আলবানী, আল-আজবেবাতুন নাফে'আহ, ৯৭, নং ৩০

তা সরাসরি জায়েজ বলে মন্তব্য করেন এবং একথা স্পষ্ট ভাবে বলেন যে, খতীবকে নিজ ভাষায় খুতবা দিতে হবে^{৪২}। বর্তমানে আমাদের দেশের বেশ কিছু জামে মসজিদে মাতৃভাষায় খুতবা দেয়া হয়ে থাকে। বস্তুত: এটাই সুন্নত। এর বিপরীত সুন্নত বিরোধী কাজ যা অবশ্যই পরিত্যাজ্য। আল্লাহ আমাদেরকে দ্বীনের সঠিক ইলম দান করুন এবং যাবতীয় বিদ'আত পরিত্যাগ করার তাওফীক দিন (আমীন) [লেখক: শাইখ আখতারুল আমান বিস আব্দুস সালাম। সম্পাদনা: আব্দুল্লাহিল হাদী বিন আব্দুল জলীল]। অধিকাংশ মসজিদ গুলোতে আরও একটি বিষয় দেখা যায় সেটা হল, ইমাম বসে বসে ৩নং খুত্বা দেওয়ার পর খুত্বার মাঝে সুন্নাত সালাতের সময় নির্ধারণ করে দেওয়া হয়। এবং ৩নং খুত্বা চলাকালীন কেউ মসজিদে ঢুকেই সালাত আদায় করতে চাইলে মুছল্লীদেরকে বারণ করা হয় এবং বলা হয় এটা পড়ার সময় দেওয়া হবে। (যা ঐ বিষয়ে কোরআন, হাদীসের বিধানাবলী না জানা কমিটি কর্তৃক নির্ধারণ হয়েছে)। সেজন্য আমাদের মসজিদ গুলোতে শরীয়তের পূর্ণাঙ্গ বিষয় গুলো জানা লোকদের নিয়ে কমিটি গঠন এবং যারা না জানে তাদের স্পষ্ট দলীল সহকারে জেনে নেওয়া উচিত উল্লেখ্য জুম'আর পূর্বে কোন নির্দিষ্ট সুন্নাত নেই তবে যত খুশি নফল আদায় করতে পারেন। প্রতিটি সহীহ হাদীসে দুটি খুত্বার কথা উল্লেখ আছে ৩টি নয়। এবং খুত্বা দুটিই দাড়িয়ে দিতে হয়। এবং মসজিদে প্রবেশ পূর্বক দুই রাক'আত সালাত আদায় করে বসার নির্দেশ

^{৪২} দেখুন: শাইখ ইবনে উসাইমীনের ফাতাওয়া আরকানিল ইসলাম

রয়েছে, এমনকি খুৎবা চলাকালীনও। ইমাম সাহেব দাড়িয়ে খুৎবা দিবেন। দ্বিতীয় খুৎবা (পূর্বে) একটু বসবেন, প্রথম খুৎবায় হামদ, দরুদ ও কিরাআত ছাড়া সকলকে নছিয়ত (উপদেশ) করবেন। দ্বিতীয় খুৎবায় হামদ ও দরুদ সহ সকল মুসলমানদের জন্য দোয়া করবেন। (মুসলিম, মিশকাত হা/১৪০৫-১৫-১৬)।

হযরত আম্মারা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল - কে বলতে শুনেছি কোন ব্যক্তির সালাতের দীর্ঘতা এবং খুৎবার সংক্ষিপ্ততা তার শরিয়তের সুক্ষ জ্ঞানেরই পরিচায়ক। সুতরাং তোমরা সালাতকে দীর্ঘ করবে এবং খুৎবাকে সংক্ষেপ করবে। নিশ্চয় কোন কোন বক্তৃতা (খুৎবা) যাদু স্বরূপ। (মুসলিম, মিশকাত হা/১৪০৬)।

এই হাদীসে বোঝা যায় দু'টি খুৎবায় সংক্ষেপে করতে হবে এবং অর্থ পূর্ণ করতে হবে। অতিরিক্ত আলোচনার নামে তৃতীয় খুৎবা সহীহ সুন্নাহ ও কোরআনের নির্দেশ পরিপন্থী। যেমন, আল্লাহ বলছেন, তোমরা তাড়াতাড়ি জুম'আর সালাতের জন্য হাজির হও এবং জুম'আর শেষে তাড়াতাড়ি রিযিক অশ্বেষণে বেরিয়ে পড়। (সূরা জুম'আ ৯-১০)। অতএব জুম'আর শেষে মানুষের সময় নষ্ট করা যাবে না।

(৩) মাতৃভাষায় খুৎবা দান না করার যুক্তি

আরবী ব্যতীত অন্য কোন ভাষায় বা আরবী খুৎবার মধ্যে অন্য ভাষায় তরজমা করা বিদ'আত। তবে নিয়মিত খুৎবার পূর্বে কারো সুন্নাহ পড়ার ক্ষতি না হয় এরূপ ব্যবস্থা করে নিলে বা নামায শেষে খুৎবার অর্থ শ্রোতাগণকে শুনিয়ে দেয়া ভাল। (নূরানী মজমুমায়ে

খুৎবাও মিলাদে মোস্তফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সহ; মোঃ সামছুল হক পৃষ্ঠা নং - ৩)। এটা দলীল বিহীন ভিত্তিহীন কথা। আসলে আমরা যারা বিদ'আতী কার্যকলাপ করি, তাদের জ্ঞান উল্টাপাল্টা হয়ে যায়। ফলে আমরা বিদ'আতকে সুন্নাত আর সুন্নাতকে বিদ'আত মনে করি।

সবকিছুতে ভুল বুঝতে শুরু করি। আর নির্দিধায় তা করতে থাকি এবং সমাজে প্রচলনের চেষ্টা করি। এছাড়াও কতগুলো যুক্তি দেখানো হয়েছেঃ উম্মতের সকল উলামায়ে কেরাম একমত খুতবা আরবিতেই দিতে হবে। যারা খুতবা মাতৃভাষায় বা বাংলায় দেওয়ার কথা বলেন তাদের যুক্তি হল খুতবা একটি সাপ্তাহিক বক্তৃতা এর মাধ্যমে মুসলমানদেরকে দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভাষা আরবী ছিল তাই তিনি আরবিতে খুতবা দিতেন।

আমাদের ভাষা বাংলা আমরা বাংলায় খুতবা দেব এটাই স্বাভাবিক। তাছাড়া আরবিতে খুতবা দেওয়া হলে আমরা এর কিছুই বুঝিনা এতে করে খুতবার মূল উদ্দেশ্যই ব্যহত হচ্ছে। তাই খুতবা বাংলা ভাষায় হওয়া উচিত। তাদের এসব কথার ভিত্তি হল خطبة শব্দের আভিধানিক অর্থ। কেননা خطبة এর অর্থ হল বক্তৃতা। যদি আভিধানিক অর্থের মাধ্যমে সবকিছু ঠিক করা যেত তাহলে নামাজ না পড়ে দিনে পাঁচবার নিতম্ব দোলালেই হত। কেননা সালাতের আভিধানিক অর্থ নিতম্ব দোলানো। এখন আমি খুব সংক্ষিপ্তভাবে বলার চেষ্টা করব কেন খুতবা আরবিতে দেওয়া হয়।

১. খুতবা হল যিকরুল্লাহ বা আল্লাহর যিকির।

২. খুতবা নামজের স্থলবিধিভূ।

৩. খুতবা ইসলামের প্রতীক।

৪. খুতবার একটি বিশেষ উদ্দেশ্য।

এই চারটা বিষয় একটু খুলে বলি তাহলে আশা করি বিষয়গুলি স্পষ্ট হবে।

১. খুতবা সাধারণ কোন বক্তৃতা নয় খুতবা হল আল্লাহ যিকির দেখুন কোরানের আয়াত কি বলে

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا
الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ [৭:১৬২]

মুমিনগণ, জুমআর দিনে যখন নামাযের আযান দেয়া হয়, তখন তোমরা আল্লাহর স্মরণের পানে ত্বরান্বিত কর এবং বেচাকেনা বন্ধ কর। এটা তোমাদের জন্যে উত্তম যদি তোমরা বুঝ। (সূরা জুমা আয়াত ৯)।

এই আয়াতের মধ্যকার যিকরুল্লাহ দ্বারা প্রায় সকল মুফাসসিরদের মতে খুতবা উদ্দেশ্য। (তাফসিরে রাযি ১/৪৪৬, তাফসিরে রুহুল মাআনি ২৮/১০২, তাফসিরে ইবনে আব্বাস রাঃ) হাদীসেও খুতবাকে যিকির হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر

যখন ইমাম খুতবা দিতে বের হন তখন ফেরেশতারা এসে যিকির শুনে অর্থাৎ খুতবা শোনে। (বুখারী ১/৩০১, মুসলিম হাদীস নং ৮০৫)। ফিকহের কিতাবগুলোতেও খুতবাকে যিকির বলা হয়েছে।

ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) বলেন কেউ যদি শুধু আলহামদুলিল্লাহ বলে তাহলেও খুতবা আদায় হয়ে যাবে। খুতবার মধ্যে যত বড় বক্তৃতাই দেওয়া হোক না কেন সেটা খুতবা হিসেবে গন্য হবেনা যদি তার মধ্যে যিকরুল্লাহ না থাকে। আর যদি যিকরুল্লাহ ছাড়া আর কিছুই না থাকে তাহলেও সেটা খুতবা হিসেবে গন্য হবে।

খুতবা যিকির বলেই আমরা দেখি যে ইমাম সাহেবগন খুতবা শুরু করেন আলহামদুলিল্লাহ বলে এবং শেষ করেন কোরানের আয়াত পড়ে। এসকল আয়াত ও হাদীস থেকে একথাই প্রমান হয় যে খুতবা নিছক কোন বক্তৃতা বিবৃতি নয় বরং খুতবা হল যিকির আর যিকির কোন ভাষায় করবেন সেটা বলাই বাহুল্য।

২. জুমার খুতবাকে দুই রাকাত নামজের স্থলাবিসিদ্ধ করা হয়েছে।
হযরত ওমর ও আয়েশা (রঃ) থেকে বর্ণিত -

حَدِيثُ عُمَرَ وَعَائِشَةَ أَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا قُصِرَتْ الصَّلَاةُ لِأَجْلِ الْخُطْبَةِ

জুমার নামাজ কে খুতবার জন্য ছোট করে দেওয়া হয়েছে। (ইবনে হাজার আসকালানি তালখিসুল হাবির ২/১৭৬)

كَانَتِ الْجُمُعَةُ أَرْبَعًا فَجُعِلَتِ الْخُطْبَةُ مَكَانَ الرَّكْعَتَيْنِ

জুমাআর নামাজ চার রাকাত ছিল অতঃপর খুতবাকে দুই রাকাতের স্থলাবিসিদ্ধ করা হয়েছে (বাইহাকি ৫২৫৮ নং)। অর্থাৎ জুমার নামাজ চার রাকাত ফরজের স্থলে দুই রাকাত ফরজ রাখা হয়েছে আর দুই রাকাতের জায়গায় খুতবাকে রাখা হয়েছে।

খুতবা নামাজের মত বলেই আমরা দেখি যে খুতবার আগে আযান দেওয়া হয়, খুতবা চলা কালে কথাবার্তা এমনকি নামাজ পড়াও

নিষেধ যা নামাজের মধ্যেও নিষেধ। এছাড়া ও আরও অনেক বিধান রয়েছে যার দ্বারা বোঝা যায় খুতবা নামাজের মত। নামাজের মত নামাজ না কিন্তু ভুল বুঝবেন না কেউ। অথচ সাধারণ বক্তৃতা লেকচারের ক্ষেত্রে এই বিধানগুলো প্রযোজ্য নয়। খুতবার জন্য এ সকল বিধিবিধান ও নির্দেশনাবলী একথাই প্রমান করে যে খুতবা একটা গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত, নিছক কোন বক্তৃতা বা লেকচার নয়।

৩. খুতবা ইসলামের একটা প্রতীক অর্থাৎ আযান, ইকামাত, নামাজ, তাকবির এগুলো যেমন ইসলামের প্রতীক তেমনি খুতবাও একটি প্রতীক। আযান ইকামাত যেমন অন্য ভাষায় দেওয়া যায় না তেমনি খুতবাও অন্য ভাষায় দেওয়া যাবে না। আজকে খুতবা বাংলায় দেওয়ার দাবী উঠছে কাল নামাজ বাংলায় করার দাবী উঠবে। উঠবে কি উঠেছে (লিংকটি দেখতে হলে অবশ্যই প্রবেশ অথবা নিবন্ধন করতে হবে)

৪. খুতবার একটি বিশেষ উদ্দেশ্য। আরবী ভাষা মুসলমানদের ধর্মীয় ভাষা এ ভাষা শিক্ষা করা ফরজে কেফায়া। কারন কোরআন হাদীস বোঝা আমাদের কর্তব্য।

কোরআন হাদীস বোঝার জন্য আরবী জ্ঞান থাকা আবশ্যিক। এই আরবী শেখার প্রতি উৎসাহিত করার জন্য আরবীতে খুতবা দেওয়া হয়। একজন আরবী না জানা ব্যক্তির সামনে যখন প্রতি সপ্তাহে আরবিতে খুতবা দেওয়া হবে তখন তার সামনে নিজের অক্ষমতাটা বারবার স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়বে যা তাকে আরবি শিখতে উৎসাহিত করবে।

(৪) জুম'আর সালাতে বিদ'আত ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক আলোচনা
জুম'আর ফরজের আগে ও পরে কত রাকআত সালাত আদায়
করব?

আমরা সকলেই জানি যে, জুম'আর ফরজ হল ২ রাকআত। আর সূনাত হল- ফরজের আগে দুই রাকআত (তাহিয়াতুল মাসজিদ) এবং পরে চার রাকআত বা দুই রাকআত। আর বাইরে ফরজের আগে অতিরিক্ত নির্দিষ্ট সংখ্যক কোন সালাত নেই। অতএব, দুই দুই রাকআত করে যে যত রাকআত ইচ্ছা নফল হিসেবে আদায় করতে পারে।

উল্লেখ্য যে, প্রচলিত কাবলাল জুম'আ শিরোনামে চার রাকআত বিশিষ্ট কোন সালাত সহীহ হাদীসে পাওয়া যায় না। খুৎবার আগে এক সালামে চার রাকআত আদায়ের পক্ষে দলীল হিসাবে আনীত হাদীসটির সনদ খুবই দুর্বল যা গ্রহণযোগ্য নয়। তবে কমপক্ষে দুই রাকআত 'তাহিয়াতুল মাসজিদ' সালাত পড়তেই হবে। এমনকি ইমাম সাহেবের খুৎবা চলাকালীন সময়ে মসজিদে প্রবেশ করলেও। তবে যারা আগে থেকেই দুই রাকআত তাহিয়াতুল মাসজিদ সালাত আদায় করে বসে আছেন, তারা খুৎবার সময় কোন নামাজ পড়বে না। অতঃপর জুম'আর ফরজের পর রাসুলুল্লাহ (সাঃ) চার রাকআত সালাত আদায় করতে বলেছেন (মুসলিমঃ ১৯১৩ ইফা)। তবে আব্দুল্লাহ (রাঃ) বর্ণিত এক হাদীসে পাওয়া যায় যে, নবী (সাঃ) জুম'আর নামাজ পড়ে ফিরে এসে নিজ বাড়িতে দুই রাকআত নামাজ পড়তেন (মুসলিমঃ ১৯১৬ ইফা)। আরেকটি হাদীসে সুহাইল

(রাঃ) বলেন, তোমরা তাড়াহুড়া থাকলে মসজিদে দুই রাকআত এবং (বাড়িতে) ফিরে গিয়ে দুই রাকআত পড়ো (মুসলিমঃ ১৯১৪ ইফা)। এ থেকে ইজতিহাদ করে ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রাঃ) বলেছেন যে, ফরজের পর মসজিদে হলে চার রাকআত আর বাড়িতে হলে দুই রাকআত সুন্নাত নামাজ পড়বে।

জুম'আর সালাত পড়া অবস্থায় যদি কোন মুক্তাদির ওয়ু ছুটে যায় তখন তার করণীয়

মসজিদ থেকে বের হয়ে যাবে (এমন ভঙ্গীতে যেন নাক দিয়ে রক্ত বের হচ্ছে)। নতুন ভাবে ওয়ু করে ফিরে এসে যদি দ্বিতীয় রাকআতের রুকু পাওয়া যায় তাহলে এক রাকআত পাওয়া গেল বলে গন্য হবে। অতঃপর ইমামের সালাম ফিরানোর পর দাঁড়িয়ে আরেক রাকআত নিজে নিজে পড়ে নেবে। আর যদি দ্বিতীয় রাকআতের রুকু না পায়, সিজদা বা তাশাহুদের বৈঠকে শরীক হয় তাহলে জুম'আ পেল না। সেক্ষেত্রে সে যোহরের নিয়ত করে ("নিয়ত পড়ে না") চার রাকআত আদায় করবে।

নামাজরত অবস্থায় যদি ইমামের ওয়ু ছুটে যায় তাহলে তার করণীয় পেছন থেকে একজনকে টেনে এনে ইমামের জায়গায় দাঁড় করিয়ে ওয়ু করতে চলে যাবেন। ওয়ু শেষে পূর্বের নিয়মে বাকি নামাজ আদায় করবেন। ইমাম যদি বিনা অযুতে সালাত আদায়ের পর মনে হয় যে, তার ওয়ু ছিল না এবং ওজু ছুটে গিয়েছিল তার বিধান - মুক্তাদীদের সালাত আদায় হয়ে যাবে। তবে ইমাম সাহেব যোহরের ফরজের নিয়তে একা চার রাকআত পড়ে নেবেন।

ঈদ ও জুম'আ একই দিনে হলে জুম'আ পড়ার হুকুম

এমন হলে যার ইচ্ছা সেদিন জুম'আ পড়বে। আর না পড়লে গুনাহ হবে না। তবে জুম'আ না পড়লে যোহরের সালাত আদায় করতে হবে। উল্লেখ্য যে, জুম'আর দিন ঈদ হলে ইমামের জন্য জুম'আর সালাত আদায় করা বাধ্যতামূলক।

মহিলাদের জুম'আয় শরীক হওয়া

জুম'আয় অংশ গ্রহন মেয়েদের জন্য ফরজ নয়। তবে কোন নিষেধ ও নেই। রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর জামানায় মুহাজির মহিলাগণ নবীজি (সাঃ) এর পেছনে জুম'আর সালাত আদায় করতেন। জুম'আয় শরীক হওয়ার মধ্যে মেয়েদের জন্য কল্যানের ভাগই বেশী। কারণ দ্বীন শিক্ষার সুযোগ সুবিধা মেয়েদের জন্য ততটুকু নেই যতটুকু পুরুষদের আছে। কলেজ ইউনিভার্সিটি শিক্ষায় তারা অগ্রসর হলেও কুরআন ও হাদীসের শিক্ষায় তারা অনেক পেছনে। কমপক্ষে সাপ্তাহিক একটি খুৎবায় তারা ধর্মীও নিরক্ষরতা অনেকটা কাটিয়ে উঠতে পারে।

দ্বীনী ইলমের আলো তারা পেলে পারিবারিক জীবন আরও সুন্দর এবং ছেলে মেয়েদেরকে দ্বীনী পথে মানুষ করার কাজ সহজ হবে। সে লক্ষ্যে নারীদের মসজিদে যাওয়ার সুযোগ করে দেওয়া ও মসজিদে তাদের আলাদা জায়গা রাখা কর্তৃপক্ষের জন্য একটি মহৎ কাজ হিসেবে বিবেচিত হবে এবং এ হিসাবে তারা সওয়াবও

পাদেন, ইনশাআল্লাহ। শুধু একটা শর্ত যে, মহিলারা পূর্ণ পর্দার সাথে ও সর্বাপেক্ষা শালীনতা বজায় রেখে মসজিদে গমনাগমন করবেন^{৪১৩}।

নবম পরিচ্ছেদ - ফরয নামাযের আগে-পরে দলবদ্ধভাবে জিকির করা

আমর বিন ইয়াহয়া হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমার পিতাকে আমার দাদা হতে বর্ণনা করতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমরা একবার ফজরের নামাযের পূর্বে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) এর ঘরের দরজার সামনে বসা ছিলাম। উদ্দেশ্য হল তিনি যখন বের হবেন, আমরা তার সাথে পায়ে হেঁটে মসজিদের দিকে যাত্রা করব। এমন সময় আমাদের কাছে আবু মূসা আশআরী (রাঃ) আগমণ করে বললেন, আবু আব্দুর রাহমান (ইবনে মাসউদের উপনাম) কি বের হয়েছেন? আমরা বললাম, এখনও বের হন নি। তিনিও আমাদের সাথে বসে গেলেন। তিনি যখন বের হলেন, আমরা সকলেই তাঁর কাছে গেলাম।

আবু মূসা আশআরী (রাঃ) বললেন, হে আবু আব্দুর রাহমান! আমি মসজিদে এখনই একটি নতুন বিষয় দেখে আসলাম। আল-হাম্দু লিল্লাহ, এতে খারাপ কিছু দেখিনি। তিনি বললেন সেটি কি? আবু মূসা (রাঃ) বললেন, আপনার হায়াত দীর্ঘ হলে আপনিও তা দেখতে পাবেন। তিনি বললেন, আমি দেখলাম মসজিদে একদল লোক গোলাকার হয়ে বসে নামাযের অপেক্ষা করছে। সেই দলের

^{৪১৩} লেখকঃ অধ্যাপক মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম, সূত্রঃ বই-প্রশ্নোত্তরে জুমু'আ ও খুৎবা, পরিমার্জনেঃ ডঃ মোহাম্মদ মনজুরে ইলাহী, ডঃ আবু বকর মুহাম্মদ জাকারিয়া মজুমদার, ডঃ মুহাম্মদ সাইফুল্লাহ

মাঝখানে একজন লোক রয়েছে। আর সবার হাতে রয়েছে ছোট ছোট পাথর। মাঝখানের লোকটি বলছে, একশতবার আল্লাহ্ আকবার পাঠ কর। এতে সকলেই একশতবার আল্লাহ্ আকবার পাঠ করে। তারপর বলে একশতবার লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ পাঠ কর। এ কথা শুনে সবাই একশতবার লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ পাঠ করে থাকে। তারপর লোকটি বলে এবার একশতবার সুবহানাল্লাহ পাঠ কর। সবাই একশতবার সুবহানাল্লাহ পাঠ করে থাকে।

একথা শুনে ইবনে মাসউদ (রাঃ) বললেন, তুমি তাদেরকে তাদের পাপের কাজগুলো গণনা করে রাখতে বললে না কেন? আর এটা বললে না কেন যে তাদের নেকীর কাজগুলো থেকে একটি নেকীও নষ্ট হবে না। কাজেই এগুলো হিসাব করে রাখার কোন দরকার নাই। অতঃপর ইবনে মাসউদ (রাঃ) চলতে থাকলেন। আমরাও তার সাথে চললাম এবং একটি হালাকার (বৈঠকের) কাছে এসে উপস্থিত হলাম। তিনি তাদের কাছে দাঁড়িয়ে বললেন, একি করছ তোমরা? তারা সবাই বলল পাথরের মাধ্যমে গণনা করে আমরা তাকবীর, তাসবীহ্ ইত্যাদি পাঠ করছি।

ইবনে মাসউদ (রাঃ) বললেন, তাহলে তোমরা তোমাদের পাপের কাজগুলোর হিসাব কর। কারণ পাপের কাজগুলো হিসাব করে তা থেকে তাওবা করা দরকার। আমি এ ব্যাপারে জিম্মাদার হলাম যে, তোমাদের ভাল কাজগুলোর একটি ভাল কাজও নষ্ট হবে না। এ কথা বলার কারণ এই যে আল্লাহর কাছে কারও আমল বিনষ্ট হয় না। বরং একটি আমলের বিনিময়ে দশটি সাওয়াব দেয়া হয় এবং দশ থেকে

সাত শত গুণ পর্যন্ত বাড়িয়ে দেয়া হয়। তারপর তিনি বললেন, হে মুহাম্মাদের উম্মাত! অমঙ্গল হোক তোমাদের! কিসে তোমাদেরকে এত তাড়াতাড়ি ধ্বংসের পথে নিয়ে যাচ্ছে? এখনও নবী মুহাম্মাদের অসংখ্য সাহাবী জীবিত আছেন। এই তো রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কাপড় এখনও পুরাতন হয়নি। তাঁর ব্যবহারকৃত থালা-বাসন গুলো এখনও ভেঙ্গে যায়নি। ঐ সত্কার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, তোমরা যে দ্বীন তৈরী করেছ তা কি মুহাম্মাদের দ্বীন হতে উত্তম? না তোমরা গোমরাহীর দ্বার উন্মুক্ত করেছ? তারা বলল, হে আবু আব্দুর রাহমান! আমরা এর মাধ্যমে কল্যাণ ছাড়া অন্য কোন ইচ্ছা করিনি। তিনি বললেন, অনেক কল্যাণকামী আছে, যে তার উদ্দেশ্য পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না। আল্লাহর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন যে, একটি দল কুরআন তিলাওয়াত করবে, কিন্তু কুরআন তাদের কণ্ঠনালীর ভিতরে প্রবেশ করবেনা। আল্লাহর শপথ করে বলছি, মনে হয় তাদের অধিকাংশই তোমাদের থেকে বের হবে। অতঃপর ইবনে মাসউদ (রাঃ) তাদেরকে ছেড়ে চলে আসলেন।

আমর ইবনু সালামা (রাঃ) বলেন, আমরা তাদের অধিকাংশকেই দেখলাম নাহরাওয়ানের যুদ্ধে খারেজীদের সাথে আমাদের বিরুদ্ধে একত্রিত হয়েছে। এখানে কয়েকটি কারণে ইবনু মাসউদ (রাঃ) এ ভালকাজ গুলো অপছন্দ করেছেনঃ

প্রথমতঃ তাস্বীহ পাঠ করার জন্য গোলাকার হয়ে বসা।

দ্বিতীয়তঃ তাসবীহ্ সমূহের সংখ্যা ১০০ নির্ধারণ করা। তৃতীয়তঃ পাথরের মাধ্যমে হিসাব করে এগুলো পাঠ করা। কেননা তাসবীহ্ পাঠের উল্লেখিত পদ্ধতির কোনটিই রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে প্রমাণিত নয়। সুতরাং, জিকিরের ক্ষেত্রে মূলনীতি হল, প্রত্যেক ব্যক্তি হাদীসে বর্ণিত জিকিরগুলো একা একা পাঠ করবে। অতএব, সালাত শেষে বা সালাতের আগে দলবদ্ধভাবে যিকির করা বিদ'আত যা ইসলাম সমর্থন করে না। তাই এইসব কাজ আমাদের পরিত্যাগ করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সঠিক পথে চলার তৌফিক দান করুন, আমীন।

দশম পরিচ্ছেদ - ফরয সালাতের পরে সম্মিলিত মুনাজাতঃ একটি প্রচলিত বিদ'আত

আমাদের সমাজে যতগুলি বিদ'আত প্রচলিত আছে, তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে ফরয সালাতের পর সম্মিলিত মুনাজাত। এই সম্মিলিত মুনাজাতের দলীল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে পাওয়া যায় না। কোন কোন বিদ'আত বছরে একবার করা হয়, কোন কোনটি হয়ত মাসে একবার, কোন কোনটি হয়তো সপ্তাহে একবার। কিন্তু সম্মিলিত মুনাজাত এমন এক বিদ্‌আত যা প্রতিদিন পাঁচবার করা হয়।

সুতরাং এর থেকে দূরে থাকতে হবে। হাদীসে বর্ণিত ফরয সালাতের পর পঠিতব্য দুআ ও যিকিরগুলো এককী পড়তে হবে, দলবদ্ধভাবে নয়। কারণ, হাদীসে এ ক্ষেত্রে পঠিতব্য দুআগুলো প্রায়ই সবই এক বচনের শব্দে এসেছে।

দুঃখজনক হলেও সত্য যে, ভারত বর্ষের প্রায় সকল মুসলিম জনগণ (আলিম ও সাধারণ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক সালাতের পর পঠিতব্য দুআর তালিকাটি আংশিক বা পুরোপুরি বাদ দিয়ে নিজেরাই বিভিন্ন দুআ নির্বাচন ও সংযুক্ত করেছে। এর সাথে আরো যোগ করেছে দলবদ্ধ ও সম্মিলিত রূপ। ফলে সালাতের পরে দুআর নামে সম্মিলিত মুনাজাতের মাধ্যমে অনেকগুলো সুন্নাত উৎখাত হয়েছে।

প্রথমতঃ যে সুন্নাতটি উঠেছে সেটা হল, ফরয সালাতের পর যে নির্দিষ্ট কিছু দুআ ও যিকির রয়েছে এটার জ্ঞানই অধিকাংশ লোকের নেই। যার জন্য ওগুলো কণ্ঠস্থ করার সুযোগ তাদের হয়নি। ঐ সকল দু'আ ও যিকির সম্মিলিত হাদীসগুলো পড়ার কিম্বা ইমাম সাহেবের মাধ্যমে শোনার অবকাশ হয়নি বা নেই।

যে সকল স্থানে সহীহ হাদীস দ্বারা হাত তুলে দোয়া করার বিধান রয়েছে

এখন আমি যে সকল স্থানে হাত তুলে দোয়া করা যায় তা সহীহ হাদীসের মাধ্যমে তুলে ধরবো। যে সকল স্থানে হাত তুলে দোয়া করা যায়ঃ

(১) বৃষ্টি প্রার্থনার জন্যঃ আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যামানায় এক বছর দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। সে সময় একদিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুৎবা প্রদানকালে জনৈক বেদুঈন উঠে দাঁড়াল এবং আরয করল, হে আল্লাহর রাসূল! বৃষ্টি না হওয়ার কারণে

সম্পদ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, পরিবার পরিজন অনাহারে মরছে। আপনি আমাদের জন্য দোয়া করুন। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় হস্তদয় উত্তোলন পূর্বক দোয়া করলেন। সে সময় আকাশে কোন মেঘ ছিল না। (রাবী বলেন) আল্লাহর কসম করে বলছি, তিনি হাত না নামাতেই পাহাড়ের মত মেঘের খন্ড এসে একত্র হয়ে গেল এবং তার মিস্রার থেকে নামার সাথে সাথেই ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়তে লাগল। এভাবে দিনের পর দিন ক্রমাগত পরবর্তী জুমআ পর্যন্ত হতে থাকল। অতঃপর পরবর্তী জুম'আর দিনে সে বেদুঈন অথবা অন্য কেউ দাঁড়িয়ে বলল, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অতি বৃষ্টিতে আমাদের বাড়িঘর ভেঙ্গে পড়ে যাচ্ছে, ফসল ডুবে যাচ্ছে।

অতএব আপনি আল্লাহর নিকট আমাদের জন্য দোয়া করুন। তখন তিনি দুহাত তুললেন এবং বললেন, 'হে আল্লাহ! আমাদের পার্শ্ববর্তী এলাকায় বৃষ্টি দাও, আমাদের এখানে নয়। এ সময় তিনি স্বীয় আঙ্গুলী দ্বারা মেঘের দিকে ইশারা করছিলেন। ফলে সেখান থেকে মেঘ কেটে যাচ্ছিল। (বুখারী, প্রথম খন্ড, পৃঃ ১২৭, হা/৯৩৩ জুমআর সালাত অধ্যায়)।

একই বিষয় সম্পর্কিত আরও হাদীস দেখুন – বুখারী প্রথম খন্ড, পৃঃ ১৪০, হা/১০২৯ 'ইস্তিস্কা' অধ্যায়। সহীহুল বুখারী, প্রথম খন্ড, পৃঃ ১৩৭; মুসলিম, প্রথম খন্ড, পৃঃ ২৯৩-২৯৪। মুসলিম, মিশকাত হা/১৪৯৮ 'ইস্তিস্কা' অনুচ্ছেদ। বুখারী, প্রথম খন্ড, পৃঃ ১৪০, হা/১০৩১; মিশকাত হা/১৪৯৯।

(২) বৃষ্টি বন্ধের জন্যঃ উপরে এক নম্বরে আলোচিত দলীল সমূহ।

(৩) চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণের সময়ঃ আব্দুর রহমান ইবনু সামুরাহ (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (সাঃ) এর জীবদ্দশায় এক সময় তীর নিক্ষেপ করছিলাম। হঠাৎ দেখি সূর্য গ্রহণ লেগেছে। আমি তীর গুলো নিক্ষেপ করলাম এবং বললাম, আজ সূর্য গ্রহণে রাসূল (সাঃ) এর অবস্থান লক্ষ্য করব। অতঃপর আমি তাঁর নিকট পৌছলাম। তিনি তখন দু'হাত উঠিয়ে প্রার্থনা করছিলেন এবং তিনি “আল্লাহ্ আকবার”, “আলহামদু লিল্লাহ”, “লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ” বলছিলেন। শেষ পর্যন্ত সূর্য প্রকাশ হয়ে গেল। অতঃপর তিনি দু'টি সূরা পড়লেন এবং দু'রাকাত সালাত আদায় করলেন। (মুসলিম ১ম খন্ড, পৃঃ ২৯৯ হা/৯১৩, চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণের সালাত অধ্যায়)।

(৪) উম্মাতের জন্য রাসূল (সাঃ) এর দোয়াঃ আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনু আস (রাঃ) বলেন, একদা রাসূল (সাঃ) সূরা ইবরাহীমের ৩৫ নং আয়াত পাঠ করে দু'হাত উঠিয়ে বলেন, আমার উম্মাত, আমার উম্মাত এবং কাঁদতে থাকেন। তখন আল্লাহ তায়ালা বলেন, হে জিবরীল! তুমি আমার মুহাম্মাদের নিকট যাও এবং জিজ্ঞেস কর, কেন তিনি কাঁদেন। অতঃপর জিবরীল তাঁর নিকটে আগমন করে কাঁদার কারণ জানতে চাইলেন। তখন রাসূল (সাঃ) তাঁকে বললেন, আল্লাহ তায়ালা তা অবগত। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা জিবরীলকে বললেন, যাও, মুহাম্মাদকে বল যে, আমি তার উপর এবং তার উম্মাতের উপর সন্তুষ্ট আছি। আমি তার অকল্যাণ কবর না' (মুসলিম, ১ম খন্ড, পৃঃ ১১৩, হা/৩৪৬ ‘ঈমান’ অধ্যায়)

(৫) কবর জিয়ারতের সময়ঃ আয়েশা (রাঃ) বলেন, একদা রাতে রাসূল (সাঃ) আমার নিকটে ছিলেন। শোয়ার সময় চাদর রাখলেন এবং জুতা খুলে পায়ের নিচে রেখে শুয়ে পড়লেন। তিনি অল্প সময় এ খেয়ারে থাকলেন যে, আমি ঘুমিয়ে পড়েছি। অতঃপর ধীরে চাদর ও জুতা নিলেন এবং ধীরে দরজা খুলে বেরিয়ে পড়লেন এবং দরজা বন্ধ করে দিলেন। তখন আমিও কাপড় পরে চাদর মাথায় তাঁর পিছনে চললাম। তিনি “বাকীউল গারক্বাদে” (জান্নাতুল বাকী) পৌঁছলেন এবং দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকলেন। অতঃপর তিন তিন বার হাত উঠিয়ে প্রার্থনা করলেন। (মুসলিম, ১ম খন্ড, পৃঃ ৩১৩, হা/৯৭৪ ‘জানাযা’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ - ৩৫)। আয়েশা (রাঃ) বলেন, কোন এক রাতে রাসূল (সাঃ) বের হলেন, আমি বারিরা (রাঃ) কে পাঠালাম, তাঁকে দেখার জন্য যে, তিনি কোথায় যান। তিনি জান্নাতুল বাকীতে গেলেন এবং পার্শ্বে দাঁড়ালেন। অতঃপর হাত তুলে দোয়া করলেন। তারপর ফিরে আসলেন। বারিরাও ফিরে আসলো এবং আমাকে খবর দিল। আমি সকালে তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি গত রাতে কোথায় গিয়েছিলেন? তিনি বললেন জান্নাতুল বাকীতে গিয়েছিলাম কবর বাসীর জন্য দোয়া করতে। (ইমাম বুখারী, রাফউল ঈয়াদাঈন, পৃঃ ১৭, হাদীস সহীহ; মুসলিম হা/৯৭৪ (মর্মার্থ)]

(৬) কারো জন্য ক্ষমা চাওয়ার লক্ষ্যে হাত তুলে দোয়াঃ আউতাসের যুদ্ধে আবু আমেরকে তীর লাগলে আবু আমের স্বীয় ভতিজা আবু মুসার মাধ্যমে বলে পাঠান যে, আপনি আমার পক্ষ থেকে রাসূল

(সাঃ) কে সালাম পৌঁছে দিবেন এবং ক্ষমা চাইতে বলবেন। আবু মুসা আশ'আরী (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর কাছে এ সংবাদ পৌঁছালে তিনি পানি নিয়ে ডাকলেন এবং ওয়ু করলেন এবং হাত তুলে প্রার্থনা করলেন, “হে আল্লাহ! উবাইদ এবং আবু আমেরকে ক্ষমা করে দাও। (রাবী বলেন) এ সময় আমি তাঁর বগলের শুভ্রতা দেখলাম। তিনি বললেন, “হে আল্লাহ! ক্রিয়ামতের দিন তুমি তাকে তোমার সৃষ্টি মানুষের অনেকের উর্ধ্বে করে দিও। (বুখারী, ২য় খন্ড, পৃঃ ৯৪৪, হা/৪৩২৩ ও ৬৩৮৩ ‘দু’আ সমূহ’ অধ্যায়)

(৭) হজ্জে পাথর নিক্ষেপের সময়ঃ আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) তিনটি জামারায় সাতটি পাথর খন্ড নিক্ষেপ করতেন এবং প্রতিটি পাথর নিক্ষেপের সাথে তাকবীর বলতেন। প্রথম দু’জামারায় পাথর নিক্ষেপের পর ক্বিবলামুখী হয়ে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে দু’হাত তুলে দু’আ করতেন। তবে তৃতীয় জামারায় পাথর নিক্ষেপের পর দাঁড়াতে না। শেষে বলতেন, আমি রাসূল (সাঃ) কে এগুলো এভাবেই পালন করতে দেখেছি। (বুখারী, ১ম খন্ড, পৃঃ ২৩৬৭, হা/১৭৫১ ‘হজ্জ’ অধ্যায়)

(৮) যুদ্ধক্ষেত্রেঃ ওমর ইবনু খাত্তাব (রাঃ) হ’তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (সাঃ) বদরের যুদ্ধে মুশরিকদের দিকে লক্ষ্য করে দেখলেন, তাদের সংখ্যা এক হাজার। আর তাঁর সাথীদের সংখ্যা মাত্র তিনশত উনিশ জন। তখন তিনি ক্বিবলামুখী হয়ে দুহাত উঠিয়ে দুআ করতে লাগলেন। এ সময় তিনি বলছিলেন, ‘হে আল্লাহ! তুমি আমাকে সাহায্য করার ওয়াদা করেছ। হে আল্লাহ! তুমি যদি এই

জামা'আতকে আজ ধ্বংস করে দাও, তাহ'লে এই জমীনে তোমাকে ডাকার মত আর কেউ অবশিষ্ট থাকবে না। এভাবে তিনি উভয় হাত তুলে ক্বিবলা মুখী হয়ে প্রার্থনা করতে থাকলেন। এ সময় তাঁর কাঁধ হতে চাদরখানা পড়ে গেল।

আবু বকর (রাঃ) তখন চাদরখানা কাঁধে তুলে দিয়ে রাসূল (সাঃ) কে জড়িয়ে ধরে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! (সাঃ) আপনার প্রতিপালক প্রার্থনা কবুলে যথেষ্ট। নিশ্চয়ই তিনি আপনার সাথে কৃত ওয়াদা পূরণ করবেন। (মুসলিম, ২য় খন্ড, পৃঃ ৯৩, হা/১৭৬৩, 'জিহাদ' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ - ১৮)

(৯) কোন গোত্রের জন্য দু'আ করাঃ আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, একদা আবু তুফাইল রাসূল (সাঃ) এর কাছে গিয়ে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! দাউস গোত্রও অবাধ্য ও অবশীভূত হয়ে গেছে, আপনি তাদের জন্য আল্লাহর কাছে বদ দু'আ করুন। তখন রাসূল (সাঃ) ক্বিবলামুখী হলেন এবং দু'হাত তুলে বললেন, হে আল্লাহ! তুমি দাউস গোত্রকে হেদায়াত দান কর এবং তাদেরকে সঠিক পথে নিয়ে আস। (বুখারী, মুসলিম, সহ আল আদাবুল মুফরাদ, পৃঃ ২০৯, হা/৬১১ সনদ সহীহ)

(১০) সাফা মারওয়া সায়ী করার সময়ঃ আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কায় প্রবেশ করলেন এবং পাথরের নিকট এসে পাথর চুম্বন করলেন, বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করলেন এবং সাফা পাহাড়ে এসে তার উপর উঠলেন। অতঃপর

তিনি বায়তুল্লাহর দিকে লক্ষ্য করে দু'হাত উত্তোলন পূর্বক আল্লাহকে ইচ্ছামত স্মরণ করতে লাগলেন এবং প্রার্থনা করতে লাগলেন^{৪১৪}।

(১১) কুনুতে নাযেলার সময়ঃ আবু উসামা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (সাঃ) কুনুতে নাযেলায় হাত তুলে দু'আ করেছিলেন। (ইমাম বুখারী, রাফউল ঈয়াদাঈন, সনদ সহীহ)

হাত তুলে দু'আ করার অন্যান্য সহীহ হাদীস সমূহ

(১২) খালিদ বিন ওয়ালিদ (রাঃ) এর অপছন্দ কর্মের কারণে হাত তুলে দু'আঃ সালেমের পিতা হতে বর্ণিত, নবী করীম (সাঃ) খালিদ ইবনু ওয়ালিদকে বনী জামীমার বিরুদ্ধে এক অভিযানে পাঠালেন। খালিদ তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। তারা এ দাওয়াত গ্রহণ করে নিল। কিন্তু 'ইসলাম গ্রহণ করেছি'না বলে তারা বলতে লাগল, 'আমরা নিজেদের ধর্ম ত্যাগ করেছি' তখন খালিদ তাদেরকে কতল ও বন্দী করতে লাগলেন এবং বন্দীদেরকে আমাদের প্রত্যেকের হাতে সমর্পণ করতে থাকলেন।

একদিন খালিদ আমাদের প্রত্যেককে স্ব স্ব বন্দী হত্যা করার নির্দেশ দিলেন। আমি বললাম, আল্লাহর কসম! আমি নিজের বন্দীকে হত্যা করব না এবং আমার সাথীদের কেউই তার বন্দীকে হত্যা করবে না। অবশেষে আমরা নবী করীম (সাঃ) এর খেদমতে হাযির হলাম এবং তার কাছে উক্ত ঘটনা বর্ণনা করলাম। তখন নবী করীম (সাঃ) স্বীয় হস্ত উত্তোলন পূর্বক প্রার্থনা করলেন, 'হে আল্লাহ ! খালিদ যা

^{৪১৪} সহীহ আবু দাউদ, হা/১৮৭২ সনদ সহীহ, মিসকাত হা/২৫৭৫ 'হজ্জ' অধ্যায়

করেছে তার দায় থেকে আমি মুক্ত’ – এ কথা তিনি দু’বার বললেন। (বুখারী, ২য় খন্ড, পৃঃ ৬২২, হা/৪৩৩৯ ‘মাগাযী অধ্যায়’)।

(১৩) সাদা ক্লাহ আদায়কারীর ভুল মন্তব্য শুনে হাত তুলে দু’আঃ আবু হুমায়েদ সায়েদী (রাঃ) বলেন, একবার নবী (সাঃ) ইবনু লুত্ববিইয়াহ নামক ‘আসাদ’ গোত্রের এক ব্যক্তিকে যাকাত আদায়ের জন্য কর্মচারী নিযুক্ত করলেন। তখন সে যাকাত নিয়ে মদীনা ফিরে এসে বলল, এ অংশ আপনাদের প্রাপ্য যাকাত আর এ অংশ আমাকে হাদীয়া স্বরূপ দেয়া হয়েছে।

এ কথা শুনে নবী (সাঃ) ভাষণ দানের জন্য দাঁড়ালেন এবং প্রথমে আল্লাহর গুণগান বর্ণনা করলেন। অতঃপর বললেন, আমি তোমাদের কোন ব্যক্তিকে সে সকল কাজের জন্য কর্মচারী নিযুক্ত করি, যে সকল কাজের দায়িত্ব আল্লাহ তায়ালা আমার উপর সমর্পণ করেছেন। অতঃপর তোমাদের সে ব্যক্তি এসে বলে বলে যে, এটা আপনাদের প্রাপ্য যাকাত, আর এটা আমাকে হাদীয়া স্বরূপ দেয়া হয়েছে। সে কেন তার পিতা-মাতার ঘরে বসে থাকল না? দেখা যেত কে তাকে হাদীয়া দিয়ে যায়।

আল্লাহর কসম, যে ব্যক্তি এর কোন কিছু গ্রহণ করবে, সে নিশ্চয়ই ক্রিয়ামতের দিন তা আপন ঘাড়ে বহন করে হাযির হবে যদি আত্মসাৎকৃত বস্তু উট হয়, উটের ন্যায় ‘চি চি করবে, যদি গরু হয় তবে ‘হায়া হায়া’ করবে। আর যদি ছাগল-ভেড়া হয়, তবে ‘ম্যা ম্যা’ করবে। অতঃপর রাসূল (সাঃ) স্বীয় হস্তদ্বয় উঠালেন, তাতে আমরা তাঁর বগলের শুভ্রতা প্রত্যক্ষ করলাম। তিনি বললেন, ‘হে

আল্লাহ! নিশ্চয়ই তোমার নির্দেশ পৌঁছে দিলাম। হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই আমি পৌঁছে দিলাম। (বুখারী, পৃঃ ৯৮২, হা/ ৬৬৩৬ ‘কসম ও মানত’ অধ্যায়)

(১৪) মুমিনকে কষ্ট বা গালি দেয়ার প্রতিকারে হাত তুলে দু’আঃ আয়েশা (রাঃ) রাসূল (সাঃ) কে হাত তুলে দু’আ করতে দেখেন। তিনি দু’আয় বলছিলেন, ‘নিশ্চয় আমি মানুষ। কোন মুমিনকে গালি বা কষ্ট দিয়ে থাকলে তুমি আমাকে শাস্তি প্রদাণ কর না। (সহীহ আল আদাবুল মুফরাদ, হা/৬১০, পৃঃ ২০৯; সিলসিলাহ সহীহা, হা/৮২-৮৩, সনদ সহীহ)।

সম্মানিত পাঠকগণ! এখানে হাত তুলে দু’আ করার প্রমাণে অনেকগুলো হাদীস পেশ করা হল, যদ্বারা প্রমাণিত হয় যে, হাত তুলে দু’আ করার বিধান শরীয়াতে রয়েছে।

উক্ত হাদীস গুলোতে এককভাবে হাত তুলে দু’আ করার কথা এসেছে। শুধু প্রথম হাদীসটিতে সম্মিলিতভাবে দু’আ করার কথা এসেছে যা ইসতিস্কা বা পানি চাওয়া সংক্রান্ত। ইসতিস্কা বিষয়ে অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে, যাতে সম্মিলিতভাবে দু’আ করার কথা আছে। তাই এই দু’আ করতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর নিয়ম পদ্ধতির এক চুলও ব্যতিক্রম করা যাবে না। যে ক্ষেত্রে যেভাবে দু’আ করার কথা সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে সেভাবেই দু’আ করতে হবে। কেননা দু’আও ইবাদতেরই অংশ বিশেষ। অতএব এর ব্যতিক্রম ঘটলে তা বিদ’আতে পরিণত হবে। (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৭ ‘ঈমান’ অধ্যায়)

হাত তুলে দু'আর প্রমাণে পেশকৃত যঈফ হাদীস সমূহ

(১) আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ যখন কোন বান্দা প্রত্যেক সালাতের পর দু'হাত প্রশস্ত করে, অতঃপর বলে, হে আমার মাবুদ এবং ইবরাহিম, ইসহাক (আঃ) এর মাবুদ এবং জিবরীল, মীকাঈল ও ইসরাফীল (আঃ) এর মাবুদ, তোমার কাছে আমি চাচ্ছি, তুমি আমার প্রার্থনা কবুল কর। আমি বিপথগামী, তুমি আমাকে আমার দ্বীনের উপর রক্ষা কর। তুমি আমার উপর রহমত বর্ষণ কর। আমি অপরাধী, তুমি আমার দারিদ্রতা দূর কর। আমি দৃঢ়ভাবে তোমাকে গ্রহণ করি। তখন আল্লাহর উপর হুকু হয়ে যায় তার খালি হাত দু'খানা ফেরত না দেয়া^{৪১৫}। হাদীসটি যঈফ। হাদীসটির সনদে আব্দুল আযীয ইবনু আব্দুর রহমান ও খাদীফ নামে দু'জন দুর্বল রাবী রয়েছে। তা সত্ত্বেও অত্র দুর্বল হাদীসে একক ব্যক্তি হাত তুলে দু'আ প্রমাণিত হয়, দলবদ্ধভাবে দু'আ প্রমাণিত হয় না।

(২) আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, একদা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাম ফিরার পর ক্বিবলা মুখ হয়ে দু'হাত উঠালেন এবং বললেন, হে আল্লাহ! ওয়ালিদ ইবনু ওয়ালিদকে পরিত্রাণ দাও।

আইয়াশ, ইবনু আবী রবী'আহ, সালাম ইবনু হিশাম এবং দুর্বল মুসলমানদের পরিত্রাণ দাও। যারা কোন কৌশল জানে না। যারা কাফিরদের হাত হতে কোন পথ পায় না – (ইবনু কাসীর, ২য় খন্ড

^{৪১৫} ইবনুস সুন্নী, আমালুল ইয়াম ওয়াল লাইল ৪৯ পৃষ্ঠা

পৃঃ ৫৫৫ সুরা নিসা ৯৭ আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রঃ)। হাদীসটি যঈফ (ইবনু হাজার আসকালানী, তাহযীবুত তাহযীব, ৭/২৭৪, রাবী নং ৪৯০৫)। আলোচ্য হাদীসে আলী ইবনু যায়েদ ইবনু জাদআন যঈফ রাবী। (ইবনু হাজার আসকালানী, তাক্বীর, পৃঃ ৪০১, রাবী নং ৪৭৩৪। এ রাবীকে শায়খ আলবানীও দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন, দেখুন “যিলালিল জাম্মাহ”(৬৩০), “আল ইসরা ওয়াল মি’রাজ”(পৃঃ ৫২) ও কিসসাতু মাসীহিদ দাজ্জাল”গ্রন্থে (পৃঃ ৯৪) অন্য প্রসঙ্গে বর্ণিত একটি হাদীসে)

আলোচ্য হাদীসটি মুনকার তথা সহীহ বুখারী ও মুসলিম সহ বিভিন্ন গ্রন্থে বর্ণিত সহীহ হাদীস বিরোধী। আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণিত বুখারীর হাদীসে সালাতের মধ্যে রুকুর পর দু’আ করার কথা রয়েছে। অথচ এ দুর্বল হাদীসে সালামের পরের কথা রয়েছে।

বুখারীর হাদীসে হাত তোলার কথা নেই, কিন্তু এ হাদীসে হাত তোলার কথা বলা হয়েছে। অথচ ঘটনা একটিই এবং দু’আ হল কুনুতে নাযেলা। (সহীহুল বুখারী, হা/২৯৩২, ‘জিহাদ’অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ৯৮, মুসলিম ৬৭৫, নাসাঈ ১০৭৪, আবু দাউদ ১৪৪২, ইবনু মাজাহ ১২৯৪, আহমাদ ৭৪১৫, ও দারেমী ১৫৯৫)অতএব সালাতের পর দলবদ্ধভাবে দু’আর প্রমাণ পেশ করা শরীয়ত বিকৃত করার শামিল।

(৩) ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, সালাত দু’ দু’ রাকাত এবং প্রত্যেক দু’রাকাতেই তাশাহুদ, ভয়, বিনয় ও দ্বীন তার ভাব থাকবে। অতঃপর তুমি

কিবলামুখী হয়ে তোমার দু'হাতকে তোমার মুখের সামনে উঠাবে এবং বলবে, হে আমার প্রতিপালক! হে আমার প্রতিপালক! যে এরূপ করবে না তার সালাত অসম্পূর্ণ (মিশকাত, পৃঃ ৭৭ হাদীস/৮০৫ 'সালাতের বর্ণনা' অনুচ্ছেদ) হাদীসটি যঈফ। 'আব্দুল্লাহ ইবনু নাফি' ইবনিল আময়া যঈফ রাবী (আলবানী, যঈফ আবু দাউদ, হা/১২৯৬, যঈফ ইবনে মাজাহ, হা/১৩২৫, ইবনু খুজায়মা, হা/১২১২, যঈফুল জামে আস সগীর, হাদীস/৩৫১২; তাহকীক মিশকাত হা/৮০৫-এর টিকা নং ৩; তাকরীবুত তাহযীব পৃঃ ৩২৬, রাবী নং ৩৬৫৮)। এ হাদীসটি দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও এতে নফল সালাতের কথা বলা হয়েছে এবং এককভাবে দু'আর কথা এসেছে।

(৪) খাল্লাদ ইবনু সাযিব (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন দু'আ করতেন, তখন তাঁর দু'হাত মুখের সামনে উঠাতেন (মাযমাউয যাওয়ায়েদ, ১ম খন্ড, পৃঃ ১৬৯) হাদীসটি যঈফ। হাফস ইবনু হাসি ইবনু উৎবা যঈফ রাবী (তাকরীবুত তাহযীব, পৃঃ ১৭৪, রাবী নং ১৪৩৪)

(৫) আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা হাতের পেট দ্বারা চাও পিঠ দ্বারা চেয়ো না। অতঃপর তোমরা যখন দু'আ শেষ কর তখন তোমাদের হাত দ্বারা চেহারা মুছে নাও। (হাদীসটি দুর্বল, দেখুন যঈফ আবু দাউদ, ১৪৮৫, উল্লেখ্য তোমরা হাতের পেট দ্বারা চাও পিঠ দ্বারা চেয়ো না, এই অংশ টুকু সহীহ, দেখুন সহীহ আবু দাউদ, ১৪৮৬,

সহীহ জামেউস সগীর, ৫৯৩ ৩৬৩৪ ও সিলসিলাহ আহাদীসিস সহীহাহ, ৫৯৫)।

প্রকাশ থাকে যে, হাত তুলে দুআ করার পর হাত চেহারায় মুছার প্রমাণে কোন সহীহ হাদীস নেই। বিস্তারিত দেখুন - ইরওয়াউল গালীল ২/১৭৮-১৮২, হা/৪৩৩ ও ৪৩৪ এর আলোচনা তাহকীক মিশকাত হা/২২৫৫ এর টিকা নং ৪।

(৬) সাযিব ইবনু ইয়াযিদ তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন দুআ করতেন তখন দুহাত উঠাতেন এবং দুহাত দ্বারা চেহারা মুছে নিতেন। (আবু দাউদ, হা/১৪৯২; মিশকাত হা/২২৫৫)। হাদীসটি যঈফ। আলোচ্য হাদীসে আব্দুল্লাহ ইবনু লাহইয়াহ নামক রাবী যঈফ। (যঈফ আবু দাউদ, হা/১৪৯২, পৃঃ ১১২; আউনুল মাবুদ, ১ম খন্ড, পৃঃ ৩৬০; তাকরীব পৃঃ ৩১৯ রাবী নং ৩৫৬৩)

(৭) আসওয়াদ আমিরী তার পিতা হতে বর্ণনা করেন, তার পিতা বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে ফজরের সালাত আদায় করেছি। যখন তিনি সালাম ফিরালেন এবং ঘুরলেন তখন হাত উঠিয়ে দুআ করলেন। (ইবনু আবী শায়বা, ১ম খন্ড, পৃঃ ৩৩৭)।

প্রকাশ থাকে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার হাত উঠালেন এবং দুআ করলেন, এই অংশটুকু মূল হাদীসে নেই। (ইবনু আবী শায়বা, আল মুসান্নাফ, ১/৩৩৭, সালাত অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ৭৬) মিয়াঁ নায়ীর হুসাইন দেহলভী এবং আল্লামা আব্দুর রহমান

মুবারকপুরী তারা নিজ নিজ গ্রন্থে হাদীসগুলো আলোচনা করেছেন। কিন্তু সহীহ যঈফের মানদণ্ডে হাদীসগুলো সহীহ নয়। তাই এখনও যারা এ হাদীস বক্তব্য বা লিখনীর মাধ্যমে প্রচার করতে চাইবেন তাদেরকে অবশ্যই হাদীসের মূল কিতাব দেখে পরিত্যাগ করতে হবে অন্যথা তারা হবেন নবীর উপর মিথ্যারোপকারী এবং মিথ্যা প্রচারকারী, যাদের পরিণতি ভয়াবহ। (মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৮, ১৯৯ ইলম অধ্যায়)।

(৮) আব্দুল্লাহ ইবনু যুবায়ের একজন লোককে সালাত শেষের পূর্বে হাত তুলে দুআ করতে দেখলেন। যখন তিনি দুআ শেষ করলেন, তখন আব্দুল্লাহ ইবনু যুবায়ের তাকে বললেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাত শেষ না করা পর্যন্ত হাত তুলে দুআ করতেন না – (মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ১ম খন্ড, পৃঃ ১৬৯)। হাদীসটি যঈফ, (মুনকার), সহীহ হাদীস বিরোধী।

সহীহ হাদীসে সালাতের মধ্যে রুকুর পর কনুতে নাযেলা পড়ার সময় হাত তুলার কথা আছে – (আহমাদ, তাবারানী, সনদ সহীহ, ইরওয়াউল গালীল, ২/১৮১, হ/৮৩৮-এর আলোচনা দ্রঃ)। তবে সালাতের পর হাত তোলার কোন সহীহ হাদীস নেই।

(৯) আবু নাজিম (রাঃ) বলেন, আমি ওমর ও ইবনু যুবায়ের (রাঃ) কে তাদের দুহাতের তালু মুখের সামনে করে দুআ করতে দেখেছি। অত্র হাদীসে মুহাম্মাদ ইবন ফোলাইহ এবং তার পিতা তারা দুজনই যঈফ রাবী। (আল আদাবুল মুফরাদ, তাহকীক, হা/৬০৯ পৃঃ ২০৮; দুআয় হাত তোলা অনুচ্ছেদ, পৃঃ ২০৮)

ফরয সালাতের পরে সম্মিলিতভাবে হাত তুলে দু'আ করা সম্বন্ধে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ আলেমদের অভিমত

(১) আহমাদ ইবনু তাইমিয়াহ (রাঃ) কে ফরয সালাতের পর ইমাম মুক্তাদি সম্মিলিতভাবে দু'আ করা জায়েয কি-না জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, “সালাতের পর ইমাম মুক্তাদি সম্মিলিতভাবে দু'আ করা বিদ'আত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যুগে এরূপ দু'আ ছিল না। বরং তার দু'আ ছিল সালাতের মধ্যে। কারণ সালাতের মধ্যে মুসল্লি স্বীয় প্রতিপালকের সাথে নীরবে কথা বলে আর নীরবে কথা বলার সময় দু'আ করা যথাযথ। (মাজমুআ ফাতাওয়া, ২২/ ৫১৯ পৃঃ)।

(২) শায়খ আব্দুল্লাহ বিন বায (রাহঃ) বলেন, “পাঁচ ওয়াক্ত ফরয সালাত ও নফল সালাতের পর দলবদ্ধভাবে দু'আ করা স্পষ্ট বিদ'আত। কারণ এরূপ দু'আ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যুগে এবং তাঁর সাহাবীদের যুগে ছিল না। যে ব্যক্তি ফরয সালাতের পর অথবা নফল সালাতের পর দলবদ্ধভাবে দু'আ করে সে যেন আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের বিরোধীতা করে।” (হাইয়াতু কেবারিল ওলামা ১/২৪৪ পৃঃ)।

তিনি আরো বলেন, “ইমাম-মুক্তাদি সম্মিলিতভাবে দু'আ করার প্রমাণে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) থেকে, কথা, কর্ম ও অনুমোদন (কাওলী, ফে'লী, তাকরীরী) কোন হাদীস সম্পর্কে আমরা অবগত নই। আর একমাত্র রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আদর্শের অনুসরণেই রয়েছে সমস্ত কল্যাণ। সালাত আদায়ের পর ইমাম-

মুক্তাদির দু'আ সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আদর্শ সুস্পষ্ট আছে, যা তিনি সালাতের পর পালন করতেন। চার খলীফা সহ সাহাবীগণ এবং তাবৈঈ গণ যথাযথভাবে তাঁর আদর্শ অনুসরণ করেছেন। অতঃপর যে ব্যক্তি তাঁর আদর্শের বিরোধীতা করবে, তাঁর আমল পরিত্যাজ্য হবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, “যে ব্যক্তি আমার নির্দেশ ব্যতীত কোন আমল করবে, তা পরিত্যাজ্য।” কাজেই যে ইমাম হাত তুলে দু'আ করবেন এবং মুক্তাদীগণ হাত তুলে আ-মীন আ-মীন বলবেন তাদের নিকট এ সম্পর্কে গ্রহণযোগ্য দলীল চাওয়া হবে। অন্যথায় (তারা দলীল দেখাতে ব্যর্থ হলে) তা পরিত্যাজ্য।” (হাইয়াতু কেবারিল ওলামা ১/২৫৭)

(৩) বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দীস আল্লামা শায়খ নাসিরউদ্দীন আলবানী (রহঃ) বলেন, “দু'আয়ে কুনুতে হাত তুলার পর মুখে হাত মুছা বিদ'আত। সালাতের পরেও ঠিক নয়। এ সম্পর্কে যত হাদীস রয়েছে, এর সবগুলিই যঈফ। এজন্য ইমাম আযউদ্দীন বলেন, সালাতের পর হাত তুলে দু'আ করা মুর্খদের কাজ। (সিফাতু সালাতিন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পৃঃ ১৪১)।

(৪) শায়খ উছায়মিন (রহঃ) বলেন, সালাতের পর দলবদ্ধভাবে দু'আ করা বিদ'আত। যার প্রমাণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণ থেকে নেই। মুসল্লিদের জন্য বিধান হচ্ছে প্রত্যেক মানুষ ব্যক্তিগতভাবে যিকির করবে। (ফাতাওয়া উছায়মিন, পৃঃ ১২০)

(৫) আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (রহঃ) বলেন, ফরয সালাতের পর হাত তুলে দু'আ করা ব্যতীত অনেক দু'আ ই রয়েছে। (রফুস সামী, পৃঃ ৯৫)

(৬) আল্লামা আব্দুল হাই লাক্ষনৌভী (রহঃ) বলেন, বর্তমান সমাজে প্রচলিত প্রথা যে, ইমাম সালাম ফিরানোর পর হাত উঠিয়ে দু'আ করেন এবং মুক্তাদীগণ আ-মীন, আ-মীন বলেন, এ প্রথা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যুগে ছিল না। ফৎওয়া আব্দুল হাই, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১০০)

(৭) আল্লামা ইউসুফ বিন নূরী বলেন, অনেক স্থানেই এ প্রথা চালু হয়ে গেছে যে ফরয সালাতের সালাম ফিরানোর পর সম্মিলিতভাবে হাত উঠিয়ে মুনাজাত করা হয় যা রাসূল (সাঃ) হতে প্রমাণিত নয়। (মা'আরেফুস সুনান, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৪০৭)

(৮) আল্লামা আবুল কাশেম নানুতুবী (রহঃ) বলেন, ফরয সালাতের সালাম ফিরানোর পর ইমাম মুক্তাদি সম্মিলিতভাবে মুনাজাত করা নিকৃষ্ট বিদ'আত। (এমদুদ্দীন, পৃঃ ৩৯৭)

(৯) আল্লামা ইবনুল কাইয়েম (রহঃ) বলেন, ইমাম পশ্চিমমুখী হয়ে অথবা মুক্তাদী গণের দিকে ফিরে মুক্তাদী গণকে নিয়ে মুনাজাত করা কখনও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর তরীকা নয়। এ সম্পর্কে একটিও সহীহ অথবা হাসান হাদীস নেই। (ইবনুল কাইয়েম, যাদুল মা'আদ, ১ম খন্ড, পৃঃ নং ১৪৯ 'ফরয সালাতের পর দু'আ করা সম্পর্কে লেখকের মতামত' অনুচ্ছেদ)

(১০) আল্লামা মাজদুদ্দীন ফিরোযাবাদী (রহঃ) বলেন, ফরয সালাতের সালাম ফিরানোর পর ইমামগণ যে সম্মিলিতভাবে মুনাজাত করেন, তা কখনও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম করেননি এবং এ সম্পর্কে কোন হাদীসও পাওয়া যায় না। (ছিফরুস সা'আদাত, পৃঃ ২০)

(১১) আল্লামা শাত্তেবী (রহঃ) বলেন, শেষ কথা হল এই যে, ফরয সালাতের পর সম্মিলিতভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেও মুনাজাত করেননি, করার আদেশও দেননি। এমনকি তিনি এটা সমর্থন করেছেন, এ ধরনের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। (আল-ইতেসাম, ১ম খন্ড, পৃঃ ৩৫২)

(১২) আল্লামা ইবনুল হাজ মাক্কী বলেন, নিঃসন্দেহে এ কথা বলা চলে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরয সালাতের সালাম ফিরানোর পর হাত উঠিয়ে দু'আ করেছেন এবং মুক্তাদীগণ আ-মীন, আ-মীন বলেছেন, এরূপ কখনও দেখা যায় না। চার খলীফা থেকেও এর কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তাই এ ধরনের কাজ, যা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম করেননি, তাঁর সাহাবীগণ করেননি, নিঃসন্দেহে তা না করা উত্তম এবং করা বিদ'আত। (মাদখাল, ২য় খন্ড, পৃঃ ২৮৩)

(১৩) মাওলানা আশরাফ আলী খানভী (রহঃ) বলেন, ফরয সালাতের পর ইমাম সাহেব দু'আ করবেন এবং মুক্তাদীগণ আ-মীন আ-মীন বলবেন, এ সম্পর্কে ইমাম আরফাহ এবং ইমাম গারবহিনী বলেন,

এ দু'আকে সুন্নাত অথবা মুস্তহাব মনে করা না জায়েজ। (ইস্তিবাবুদ দাওয়াহ পৃঃ ৮)

(১৪) মুফতী মুহাম্মাদ শফী (রাহঃ) বলেন, বর্তমানে অনেক মসজিদের ইমামদের অভ্যাস হয়ে গেছে যে, কিছু আবরী দু'আ মুখস্থ করে নিয়ে সালাত শেষ করেই (দু'হাত উঠিয়ে) ঐ মুখস্থ দু'আ গুলি পড়েন। কিন্তু যাচাই করে দেখলে দেখা যাবে যে, এ দু'আগুলোর সারমর্ম তাদের অনেকেই বলতে পারে না। আর ইমামগণ বলতে পারলেও এটা নিশ্চিত যে, অনেক মুজাদী এ সমস্ত দু'আর অর্থ মোটেই বুঝে না। কিন্তু না জেনে না বুঝে আ-মীন, আ-মীন বলতে থাকে। এ সমস্ত তামাশার সারমর্ম হচ্ছে কিছু শব্দ পাঠ করা মাত্র। প্রার্থনার যে রূপ বা প্রকৃতি, তা এতে পাওয়া যায় না। (মা'আরেফুল কুরআন, ৩য় খন্ড, পৃঃ ৫৭৭) তিনি আরো বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরাম এবং তাবৈঈনে ইযাম হ'তে এবং শরীয়তের চার মাযহাবের ইমামগণ হতেও সালাতের পরে এ ধরনের মুনাজাতের প্রমাণ পাওয়া যায় না। সারকথা হল, এ প্রথা পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদীসের প্রদর্শিত পন্থা ও সাহাবায়ে কেরামের আদর্শের পরিপন্থি। (আহকামে দু'আ, পৃঃ ১৩)

(১৫) মুফতী আযম ফয়যুল্লাহ হাটহাজারী বলেন, ফরয সালাতের পর দু'আর চারটি নিয়ম আছে। (১) মাঝে মাঝে একা একা হাত উঠানো ব্যতীত হাদীসে উল্লিখিত মাসনুন দু'আ সমূহ পড়া। নিঃসন্দেহে তা সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। (২) মাঝে মাঝে একা

একা হাত উঠিয়ে দু'আ করা। এটা কোন সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়। তবে কিছু যঈফ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। (৩) ইমাম ও মুক্তাদীগণ সম্মিলিতভাবে দু'আ করা। এটা না কোন সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত, না কোন যঈফ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। (৪) ফরয সালাতের পর সর্বদা দলবদ্ধভাবে হাত উঠিয়ে প্রার্থনা করার কোন প্রমাণ শরীয়তে নেই। না সাহাবী ও তাবেঈদের আমল দ্বারা প্রমাণিত, না হাদীস সমূহ দ্বারা, সহীহ হোক অথবা যঈফ হোক অথবা জাল হোক। আর না ফিকাহ এর কিতাবের কোন পাতায় লিখা আছে। এ দু'আ অবশ্যই বিদ'আত (আহকামে দু'আ, পৃঃ ২১)।

(১৬) পাকিস্তানের বিখ্যাত মুফতী আল্লামা রশীদ আহমাদ বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত সালাত পাঁচবার প্রকাশ্যে জামা'আত সহকারে পড়তেন। যদি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনও সম্মিলিতভাবে মুক্তাদীগণকে নিয়ে মুনাজাত করতেন তাহলে নিশ্চয়ই একজন সাহাবী হলেও তা বর্ণনা করতেন। কিন্তু এতগুলো হাদীসের মধ্যে একটি হাদীসও এ মুনাজাত সম্পর্কে পাওয়া যায়নি। তারপর কিছুক্ষনের জন্য মুস্তাহাব মানলেও বর্তমানে যেরূপ গুরুত্ব দিয়ে করা হচ্ছে, তা নিঃসন্দেহে বিদ'আত। (আহসানুল ফাতাওয়া, ৩য় খন্ড, পৃঃ ৬৮)

(১৭) মাওলানা মওদুদী বলেন, এতে সন্দেহ নেই যে, বর্তমানে জামা'আতে সালাত আদায় করার পর ইমাম ও মুক্তাদী মিলে যে নিয়মে দু'আ করেন, এ নিয়ম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যামানায় প্রচলিত ছিল না। এ কারণে বহুসংখ্যক আলেম এ

নিয়মকে বিদ'আত বলে আখ্যায়িত করেছেন। (আহসানুল ফাতাওয়া, ৩য় খন্ড, পৃঃ ৬৯৮)

(১৮) মাসিক মঈনুল ইসলাম পত্রিকার প্রশ্নোত্তর কলামে বলা হয়েছে, জামা'আতে ফরয সালাতান্তে ইমাম-মুজাদী সম্মিলিতভাবে মুনাজাত করা বিদ'আত ও মাকরুহে তাহরীমী। কেননা সাহাবয়ে কেলাম, তাবেঈন, তাবে তাবেঈনদের কেউ এ কাজ শরী'আত মনে করে 'আমল করেছেন বলে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তা নিশ্চয়ই মাকরুহ ও বিদ'আত। (মাসিক মঈনুল ইসলাম, ছফর সংখ্যা ১৪১৩ হিঃ)। প্রকাশ থাকে যে, কোন কোন 'আলেম ফরয সালাতান্তে হাত উঠিয়ে দু'আ করার প্রমাণে কিছু পুস্তক লিখলেও প্রকৃতপক্ষে বিষয়টি বিতর্কিত নয়।

সিদ্ধান্তহীনতার ফলে অথবা স্বার্থান্বেষী হয়ে আমরাই বিষয়টিকে বিতর্কিত করেছি। কারণ একথা সর্বজন বিদিত যে, রাসূল (সাঃ), সাহাবীগণ ও তাবেঈগণ ইমাম-মুজাদী মিলে হাত উঠিয়ে কখনো দু'আ করেননি এবং পৃথিবীর শীর্ষস্থানীয় 'আলিমগণ করেননি এবং বর্তমানেও করেন না। কাজেই এটি স্পষ্ট বিদ'আত। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলকে পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদীস অনুযায়ী 'আমল করার তাওফীক দান করুন - আমীন !!

এগার তম পরিচ্ছেদ - পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের পর মুনাজাত
আমাদের দেশে বলতে গেলে ভারতীয় উপমহাদেশে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পর দুআ-মুনাজাতের প্রচলন দেখা যায়। এ বিষয় এখন কিছু আলোচনা করার ইচ্ছা করছি।

পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ সালাত শেষে দুআ করুল হওয়ার কথা বহু সহীহ হাদীস থেকে প্রমাণিত। তাহলে এ নিয়ে বিতর্ক কেন? আসলে পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের পর দুআ নিয়ে বিতর্ক নয়, বিতর্ক হল এর পদ্ধতি নিয়ে। যে পদ্ধতিতে দুআ করা হচ্ছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বা তাঁর সাহাবায়ে কেলাম এভাবে দুআ করেছিলেন কিনা? তাই আমি এখানে আলোচনা করব সে দুআ-মুনাজাত নিয়ে যার মধ্যে নিম্নোক্ত সবকটি শর্ত বিদ্যমানঃ

এক. পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের পর দুআ করা।

দুই. যে দুআ-মুনাজাত জামাআতের সঙ্গে করা হয়।

তিন. প্রতিদিন প্রতি ফরজ সালাত শেষে দুআ-মুনাজাত করা। এ শর্তাবলী বিশিষ্ট দুআ-মুনাজাত কতটুকু সুন্নাত সম্মত সেটাই এ অধ্যায়ের মূল আলোচ্য বিষয়। পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ সালাত আদায়ের পর প্রচলিত মুনাজাত করা না করার ব্যাপারে আমাদের দেশের লোকদের সাধারণত তিন ভাগে বিভক্ত দেখা যায়।

এক. যারা সালাম ফিরানোর পর বসে বসে কিছুক্ষণ যিকির-আযকার আদায় করেন, যা সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

দুই. যারা সালাম ফিরানোর পর যিকির-আযকার না করে তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়ে যান সুন্নাত নামায আদায়ের জন্য।

তিন. যারা সালাম ফিরানোর পর সর্বদা ইমাম সাহেবের সঙ্গে একত্রে মুনাজাত করেন। এবং মুনাজাত শেষ হওয়ার পর সুন্নাত নামায আদায় করেন। আর এ তিন ধরনের লোকদেরই এ সকল আমলের

সমর্থনে কোনো না কোনো দলীল প্রমাণ রয়েছে। হোক তা শুদ্ধ বা অশুদ্ধ। স্পষ্ট বা অস্পষ্ট।

প্রথম দলের দলীল-প্রমাণ স্পষ্ট। তাহল বুখারী ও মুসলিমসহ বহু হাদীসের কিতাবে সালাতের পর যিকির-আযকার অধ্যায়ে বিভিন্ন যিকিরের কথা সহীহ সনদে বর্ণিত আছে, যা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তার সাহাবায়ে কেরাম আমল করেছেন। অনেক ইমাম ও উলামায়ে কেরাম এ যিকির-আযকার সম্পর্কে স্বতন্ত্র পুস্তক সংকলন করেছেন।

দ্বিতীয় দলের প্রমাণ হল নিম্নোক্ত হাদীস - আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন,

عن عائشة رضى الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام." أخرجه ابن ماجة والنسائي والترمذي وقال حديث حسن صحيح وهو كما قال، صححه الألباني في صحيح ابن ماجة رقم الحديث

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন সালাম ফিরাতেন তখন আল্লাহুমা আনতাচ্ছালাম ওয়ামিনকাচ্ছালাম তাবারাকতা ইয়া জালজালালি ওয়াল ইকরাম পড়তে যতটুকু সময় লাগে তার চেয়ে বেশি সময় বসতেন না। (তিরমিজী, নাসায়ী, ইবনু মাজাহ)। তারা এ হাদীস দ্বারা বুঝে নিয়েছেন যে, এ যিকিরটুকু আদায় করতে যতটুকু সময় লাগে এর চেয়ে বেশি বসা ঠিক নয়। তাই তাড়াতাড়ি সূনাত আদায়ের জন্য দাঁড়িয়ে যেতে হবে। আসলে এ হাদীস দ্বারা তারা যা বুঝেছেন তা সঠিক নয়। হাদীসটির ব্যাখ্যা হল, আল্লাহর রাসূল

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেহেতু ইমাম ছিলেন তাই তিনি সালাম ফিরানোর পর এতটুকু সময় মাত্র কেবলামুখী হয়ে বসতেন এরপর তিনি মুসল্লীদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসতেন। আর তিনি যে প্রত্যেক ফরজ নামাযের পর মুসল্লীদের দিকে মুখ করে বসতেন তা বহু সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। (মজমু আল ফাতাওয়া : ইমাম ইবনু তাইমিয়া)। এ হাদীস দ্বারা কখনো প্রমাণিত হয় না যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছালাম ফিরিয়ে এ দুআটুকু পড়ে তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়ে যেতেন সুন্নাত সালাত আদায়ের জন্য। ফরজ সালাত আদায়ের পর যিকির, তাছবীহ, তাহলীল বর্জন করে তাড়াতাড়ি সুন্নাত আদায়ের জন্য দাঁড়িয়ে যাওয়া মোটেও সুন্নাত নয়। বরং সুন্নাত হল সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যিকির, দুআ, তাছবীহ, তাহলীল সাধ্যমত আদায় করে তারপর সুন্নাত আদায় করা।

তৃতীয় দল যারা ফরজ নামাযের পর সম্মিলিতভাবে (জামাআতের সঙ্গে) মুনাজাত করেন তাদের দলীল হল ওই সকল হাদীস যাতে সালাত শেষে দুআ কবুলের কথা বলা হয়েছে এবং দুআ করতে উৎসাহিত করা হয়েছে। এ সকল হাদীস ছাড়া তাদের এ কাজের সমর্থনে হাদীস থেকে সরাসরি কোনো প্রমাণ নেই। এমন কোনো হাদীস তারা পেশ করতে পারবেন না যাতে দেখা যাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রত্যেক সালাত জামাআতের সঙ্গে আদায় শেষে সকলকে নিয়ে সর্বদা হাত তুলে মুনাজাত করেছেন। তারা যে সকল হাদীস প্রমাণ হিসেবে পেশ করতে চান তার শিরোনাম হল -

الدعاء عقيب الصلوات، الدعاء دبر الصلوات

তারা মনে করে নিয়েছেন আকীবাস সালাত ও দুবুরাস সালাত অর্থ সালাম ফিরানোর পর। আসলে তা নয়। এর অর্থ হল সালাতের শেষ অংশে। এ সকল হাদীসে সালাতের শেষ অংশে অর্থাৎ শেষ বৈঠকে দরুদ পাঠ করার পর ছালাম ফিরানোর পূর্বে দুআ করার কথা বলা হয়েছে। পরিভাষায় যা দুআয়ে মাছুরা হিসেবে আমাদের কাছে পরিচিত। সালাত শেষে দুআ কবুল সম্পর্কে যত হাদীস এসেছে তা সবগুলো দুআ মাছুরা সম্পর্কে। যার সময় হল সালাম ফিরানোর পূর্বে। আর দুআ মাছুরা শুধু একটা নয়, অনেক। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে সালাতের শেষে দুআ সংক্রান্ত এ সকল হাদীসে বাদাস সালাত বলা হয়নি। হাদীস গ্রন্থে এ সকল দুআকে

الأدعيةاء دبر الصلوات أو الدعاء عقيب الصلاة

(সালাত শেষের দুআ) অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে দুটো বিষয়; প্রথমটা হল সালাত শেষের দুআ। দ্বিতীয়টা হল সালাত শেষের যিকির। প্রথমটির স্থান হল ছালাম ফিরানোর পূর্বে। আর দ্বিতীয়টির স্থান হল সালাম ফিরানোর পর। ইমাম ইবনু তাইমিয়া (রহ.) ইবনুল কাযিম (রহ.) প্রমুখ উলামায়ে কেরামের মত এটা-ই। এ মতটা কুরআন ও হাদীসের আলোকে বেশি যুক্তিগ্রাহ্য। বান্দা যখন সালাতে থাকে তখন সে আল্লাহর নিকটে অবস্থান করে। দুআ মুনাজাতের সময় তখনই। যখন সালাতের সমাপ্তি ঘোষিত হল তখন নয়। তখন সময় হল আল্লাহর যিকিরের, যেমন আল্লাহ বলেনঃ

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ.

যখন তোমরা সালাত শেষ করলে তখন দাঁড়িয়ে, বসে ও শুয়ে আল্লাহকে স্মরণ করবে। (আন নিসা : ১০২)। এ সম্পর্কিত হাদীসগুলোর ভাষা এবং সঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আমলসমূহ গভীরভাবে পর্যালোচনা করলে এ বিষয়টিই বুঝে আসে সালাম ফিরানোর পরের সময়টা দুআ করার সময় নয়, যিকির করার সময়। তারপরও প্রশ্ন থেকে যায় যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরজ সালাতের পর কখনো কি দুআ করেননি? হ্যাঁ করেছেন। তবে তা সম্মিলিতভাবে নয়। যেমন হাদীসে এসেছেঃ

عن البراء بن عازب قال : كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحياناً نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه فسمعته يقول : رب فني عذابك (يوم تبعث عبادك) (رواه البخاري)

আল-বারা ইবনু আযেব বলেন, আমরা যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পিছনে সালাত আদায় করতাম, তিনি আমাদের দিকে মুখ করতেন, কখনো কখনো শুনতাম তিনি বলতেন, হে আল্লাহ ! আপনার শাস্তি থেকে আমাকে বাঁচান যেদিন আপনি আপনার বান্দাদের উঠাবেন। (বুখারী)। জামাআতের সঙ্গে তিনি মুসল্লীদের নিয়ে দুআ করেছেন, এমন কোনো বর্ণনা নেই। যা আছে তা তার বিপরীত। যেমন বর্ণিত হাদীসটির প্রতি লক্ষ্য করুন! সেখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবচন শব্দ ব্যবহার করেছেন। বলেছেন আমাকে বাঁচান...। সকলকে সঙ্গে নিয়ে

দুআটি করলে বলতেন আমাদেরকে বাঁচান। আরেকটি হাদীসের প্রতি লক্ষ্য করুনঃ

قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل " لا تدعن في دبر كل صلاة أن (رواه أبو داود و النسائي تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.)
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুআজ বিন জাবালকে বলেছেন, তুমি অবশ্যই প্রত্যেক সালাতের পর বলবে, হে আল্লাহ! আপনার যিকির, আপনার শোকর, আপনার জন্য উত্তম ইবাদত করতে আমাকে সাহায্য করুন। (আবু দাউদ, নাসায়ী)।

দেখুন! প্রখ্যাত সাহাবী মুআজ বিন জাবাল (রা.) কওমের ইমাম ছিলেন। রাসূল তাঁকে ইয়েমেনের গভর্নর, শিক্ষক ও ইমাম হিসেবে পাঠিয়েছিলেন। তিনি সালাতে ইমামতি করতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে এ দুআটি সকলকে নিয়ে করার নির্দেশ দিতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা দেননি। তিনি তাঁকে একা একা দুআটি করার জন্য বলেছেন। হাদীসের ভাষাই তার প্রমাণ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছালাম ফিরনোর পর তিনবার আস্তাগফিরুল্লাহ (আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাচ্ছি) বলেছেন। তিনি যদি এটা সকলকে নিয়ে করতেন তাহলে নাস্তাগফিরুল্লাহ (আমরা আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাচ্ছি) বলতেন। যারা ফরজ সালাত শেষে কোনো যিকির-আযকার না করে উঠে গেল তারা একটা সুন্নাত (মুস্তাহাব) ছেড়ে দিল। আবার যারা সালাত শেষে সম্মিলিতভাবে মুনাজাত করে উঠে গেল তারা একটা সুন্নাত বাদ দিয়ে সে স্থানে অন্য একটি বিদআত আমল করল। তাই

সারকথা হল, পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায়ের পর সব সময় জামাআতের সঙ্গে মুনাযাত করা একটি বিদ'আত যা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম করেন নি, সাহাবায়ে কেলাম ও তাবয়ীগণ করেছেন বলেও কোনো প্রমাণ নেই। তবে যদি কেউ জামাতে সালাত আদায়ের পর একা একা দুআ মুনাযাত করেন তা সুন্নাতের খেলাফ হবে না। এমনিভাবে ইমাম সাহেব যদি সকলকে নিয়ে বিশেষ কোনো পরিস্থিতিতে কোনো কোনো সময় দুআ-মুনাযাত করেন তবে তা নাজায়েয হবে না। ইমাম ইবনু তাইমিয়া, ইবনুল কায়্যিম, মুফতীয়ে আজম ফয়জুল্লাহ (রহ.) সহ অনেক আলেম-উলামা এ মত ব্যক্ত করেছেন।

সালাত শেষে যে সকল দুআ ও জিকির হাদীস দ্বারা প্রমাণিত
আমি এখানে সালাত শেষে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেসকল দুআ ও যিকির আদায় করেছেন ও করতে বলেছেন তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত হিসেবে পেশ করতে চাই। যাতে পাঠক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর এই সুন্নাতকে আমল হিসেবে গ্রহণ করেন এবং এ সম্পর্কিত বিদ'আত পরিহার করেন।

عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قيل للأوزاعي وهو أحد رواة الحديث كيف الاستغفار؟ قال استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. (رواه مسلم : : يقول

সাওবান (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন যখন সালাত শেষ করতেন তখন

তিনবার ক্ষমা প্রার্থনা করতেন এবং বলতেন, আল্লাহুম্মা আনতাহ্‌ছালাম . . . (হে আল্লাহ! তুমি শান্তিময় এবং তোমার নিকট হতে শান্তির আগমন, তুমি কল্যাণময়ত, হে মর্যাদাবান, মহানুভব! ইমাম আওয়যীকে জিজ্ঞেস করা হল - যিনি এ হাদীসের একজন বর্ণনাকারী - রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাত শেষে ক্ষমা প্রার্থনা করতেন কিভাবে? বললেন, তিনি বলতেন, আস্তাগফিরুল্লাহ! আস্তাগফিরুল্লাহ! আস্তাগফিরুল্লাহ! (আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাচ্ছি)। (সহীহ মুসলিম)

كتب المغيرة بن شعبة إلى معاوية رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة وسلم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطى لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. (أخرجه البخاري ومسلم)

মুগীরা ইবনু শোবা (রা.) মুয়াবিয়া (রা.) এর কাছে লিখেছেন যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন সালাত শেষ করে সালাম ফিরাতেন তখন বলতেন, লা-ইলাহা ইল্লাহ ওয়াহদাছ লা শারীকা লাছ লাছল মুলকু ওয়া লাছল হামদু ওয়াছ্যা আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর, আল্লাহুম্মা লা- মানেআ লিমা আতাইতা ওয়ালা মুতিয়া লিমা মানাতা ওয়ালা ইয়ান ফাউ জাল জাদ্দি মিনকাল জাদ্দু। (আল্লাহ ব্যতীত ইবাদতের যোগ্য কোনো মাবুদ নেই। তিনি এক তাঁর কোনো শরীক নেই। রাজত্ব তাঁরই এবং প্রশংসা তাঁর। তিনি সকল কিছুর ওপর ক্ষমতাবান। হে আল্লাহ আপনি যা দান করেন তা বাধা দেয়ার কেউ নেই। আর আপনি যা বাধা দেবেন তা দেয়ার মত

কেউ নেই। আর আযাবের মুকাবেলায় ধনবানকে তার ধন কোনো উপকার করতে পারে না)। (বুখারী ও মুসলিম)

لا : عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه كان يقول دبر كل صلاة حين يسلم لا حول ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير قوة إلا بالله . لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. قال ابن الزبير : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة. (رواه مسلم)

আব্দুল্লাহ ইবনু যুবাইর (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি প্রত্যেক সালাতের শেষে সালাম ফিরানোর পর বলতেন, লা-ইলাহা ইল্লাহ ওয়াহদাহ্ লা শারীকা লাহ্ লাহ্‌ল মুলকু ওয়া লাহ্‌ল হামদু ওয়াহ্‌য়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর, লা হাওলা ওয়ালা কুয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহ, লাইলাহা ইল্লাল্লাহ্ ওয়ালা নাবুদু ইল্লা ইয়্যাহ, লাহ্‌ন নিমাতু ওয়ালাহ্‌ ফজলু ওয়ালাহ্‌ছ ছানাউল হাসান, লাইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌ মুখলিহীনা লাহ্‌দ্দীন ওয়ালাও কারিহাল কাফিরুন। (আল্লাহ ব্যতীত ইবাদতের যোগ্য কোনো মাবুদ নেই। তিনি এক তাঁর কোনো শরীক নেই। রাজত্ব তাঁরই এবং প্রশংসা তাঁর। তিনি সকল কিছুর ওপর ক্ষমতাবান। আল্লাহ প্রদত্ত শক্তি ব্যতীত গুনাহ থেকে বিরত থাকার ও ইবাদত করার শক্তি কারো নেই। আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। আমরা তাঁকে ছাড়া আর কারো ইবাদত করি না। সমস্ত অনুগ্রহ ও শ্রেষ্ঠত্ব তাঁরই। সকল সুন্দর ও ভাল প্রশংসা তাঁরই জন্য। তিনি ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই। আমরা ধর্মকে একমাত্র তাঁরই জন্য নির্ধারণ করে নিয়েছি, যদিও কাফেরা তা পছন্দ করে না)। ইবনু

যুবাইর (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রত্যেক সালাতের শেষে এ বাক্যগুলোর মাধ্যমে আল্লাহর ইলাহিয়াতের ঘোষণা দিতেন। (মুসলিম)

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من سبح الله في دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين وحمد الله ثلاثا وثلاثين وكبر الله ثلاثا وثلاثين وقال تمام المائة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد رواه مسلم). وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياہ وإن كانت مثل زبد البحر আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক সালাতের পর তেত্রিশবার ছুবহানালাহ বলবে, তেত্রিশ বার আলহামদু লিল্লাহ বলবে ও তেত্রিশবার আল্লাহু আকবার বলবে এর পর লা-ইলাহা ইল্লাহ ওয়াহদাহ লা শারীকা লাহু লাহল মুলকু ওয়া লাহল হামদু ওয়াহুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর (আল্লাহ ব্যতীত ইবাদতের যোগ্য কোনো মাবুদ নেই। তিনি এক তাঁর কোনো শরীক নেই। রাজত্ব তাঁরই এবং প্রশংসা তাঁর। তিনি সকল কিছুর ওপর ক্ষমতাবান) বলে একশ বাক্য পূর্ণ করবে তার পাপগুলো ক্ষমা করে দেয়া হবে যদিও তা সমুদ্রের ফেনা পরিমাণ হয়। (মুসলিম)। এ ছাড়াও সালাতের পর আরো অনেক যিকির ও দু'আর কথা হাদীসে এসেছে। সেগুলো আদায় করা যেতে পারে। যেমন সূরা ইখলাছ, সূরা ফালাক, সূরা নাছ পাঠ করার কথা এসেছে। আয়াতুল কুরসী পাঠ করার বর্ণনা এসেছে। এ সকল দু'আ যে সবগুলো একইসঙ্গে আদায় করতে হবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। সময় ও সুযোগ মত যা সহজ

সেগুলো আদায় করা যেতে পারে। মোট কথা হল, এ সুন্নাহটি যেন আমরা কোনো কারণে ভুলে না যাই সে বিষয়ে সতর্ক থাকা দরকার। অনেককে নামায শেষে এমন কিছু আমল করতে দেখা যায় যেগুলো হাদীসে পাওয়া যায় না, সেগুলো বর্জন করা উচিত। যেমন, মাথায় হাত দিয়ে কিছু পাঠ করা বা কিছু পাঠ করে চোখে ফুঁক দেয়া ইত্যাদি^{৪৬}। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে সঠিক পথের হিদায়াত দান করুন!

বার তম পরিচ্ছেদ - শাহাদাত আঙ্গুলে চুম্বন করা ও চোখে মাসাহ করা

“আশহাদু আল্লা মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ - শুনে শাহাদাত আঙ্গুলে চুম্বন করা ও চোখে মাসাহ করা! একটি বিদ'আতী আমল। কারন উক্ত আমল শরী'আত সম্মত নয়। এর পক্ষে কোন সহীহ হাদীস নেই। এর পক্ষে যা কিছু বর্ণনা এসেছে তা জাল বা মিথ্যা। যেমন-

■ ১ম বর্ণনাঃ খিযির (আঃ) বলেন, মুয়াযযিন যখন ‘আশহাদু আল্লা মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ’ বলবে, তখন যে ব্যক্তি বলবে, আমার প্রিয় ব্যক্তিকে স্বাগত, মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহর কারণে আমার চক্ষু শীতল হয়েছে, অতঃপর তার দুই হাতের বৃদ্ধা আংগুলে চুম্বন করবে ও দুই চোখ মাসাহ করবে, সে কখনো অন্ধ হবে না এবং তার চোখও উঠবে না।

►তাহকীকঃ বানোয়াট ও ভিত্তিহীন বর্ণনা। এর কোন সনদই নেই।

^{৪৬} ফায়সাল বিন আলী আল-বানাদী, অনুবাদ: আব্দুল্লাহ শহীদ আব্দুর রহমান, সূত্র: ইসলাম প্রচার ব্যুরো, রাবওয়াহ, রিয়াদ, সৌদিআরব

■ ২য় বর্ণনাঃ আবুবকর (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি যখন মুয়াযযিনের ‘আশহাদু আল্লা মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ’ বলা শুনতেন, তখন তিনি অনুরূপ বলতেন। অতঃপর দুই শাহাদাত আগুলের পেটে চুষন করতেন এবং দুই চোখ মাসাহ করতেন। তখন রাসূল (সঃ) বলেন, আমার বন্ধু যা করল তা যদি কেউ করে, তবে আমার শাফা‘আত তার জন্য ওয়াজিব হয়ে যাবে।

► তাহকীকঃ এটিও ডাহা মিথ্যা বর্ণনা। এর কোন সনদ নেই।

তের তম পরিচ্ছেদ - মৃত ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন বিদ‘আত
মৃত ব্যক্তির উপকারের জন্য কুলখানি, চল্লিশা, হাফেজ-আলেমদের দাওয়াত দিয়ে কুরআন খতম, সবীনা খতম পড়িয়ে মৃতের রুহের উপর বখশানো, খতমে ইউনুস, খতমে জালালী, ফাতেহা খানি, ইসালে সাওয়াব ও অন্যান্য অনুষ্ঠান পালন করা সম্পূর্ণ বিদ‘আত। এগুলোর পক্ষে কোন দলীল নেই। এ সমস্ত- অনুষ্ঠানে শরীক হয়ে হাদীয়া ও টাকা-পয়সা গ্রহণ বা প্রদান করা সম্পূর্ণ হারাম। আল-কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে-

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ. (الحشر)

‘যারা তাঁদের পরে এসেছে তারা বলে ‘হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে ও আমাদের যে সকল ভাই পূর্বে ঈমান গ্রহণ করেছে তাদের ক্ষমা কর’^{৪১৭} এ আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যে সকল মুসলিম দুনিয়া থেকে চলে গেছেন, তাদের মাগফিরাতের জন্য প্রার্থনা করতে শিখিয়েছেন। তাই এক্ষেত্রে বুঝে আসে যে মৃত

^{৪১৭} সূরা হাশর, আয়াত ১০

ব্যক্তিদের জন্য মাগফিরাতের দুআ তাদের জন্য কল্যাণ বয়ে আনে। যদি এটা তাঁদের জন্য কল্যাণকর না হত, তবে আল্লাহ তা করতে আমাদের উৎসাহিত করতেন না। এমনিভাবে, আল্লাহ রাসূল আলামীন মৃত ব্যক্তিদের জন্য দুআ-প্রার্থনা করার কথা কুরআনের একাধিক আয়াতে উল্লেখ করেছেন। হাদীসে এসেছে-

عن أبي أسيد الساعدي قال سأل رجل من بني سلمة فقال يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما بعد موتهما، فقال نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما بعد موتهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. رواه أبو داود وابن ماجه

সাহাবী আবু উসাইদ আস-সায়েদী (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত যে, বনু সালামা গোত্রের এক ব্যক্তি এসে জিজ্ঞেস করল: হে আল্লাহর রাসূল! আমার পিতা-মাতার মৃত্যুর পর এমন কোন কল্যাণমূলক কাজ আছে যা করলে পিতা-মাতার উপকার হবে? আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তর দিলেন: হ্যাঁ, আছে। তাহল, তাদের উভয়ের জন্য আল্লাহর রহমত প্রার্থনা করা। উভয়ের মাগফিরাতের জন্য দুআ করা। তাদের কৃত ওয়াদা পূর্ণ করা। তাদের আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সু-সম্পর্ক রাখা ও তাদের বন্ধু-বান্ধবদের সম্মান করা^{৪১৮}

উপরোক্ত কুরআন ও সঠিক হাদীসের জ্ঞান না থাকার কারণে বর্তমানে বাংলাদেশে জনসাধারণ কল্যাণকর মনে করে এমন কিছু করে যা মৃত ব্যক্তির জন্য কল্যাণ বয়ে আনে না। এমন কাজ করে

^{৪১৮} আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ

যা কুরআন বা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়। বরং তার কাজগুলো বিদ'আত ও সুন্নাহ পরিপন্থী হওয়ার কারণে গুনাহ হয়। ভাবতে গিয়ে অবাক না হয়ে পারা যায় না যখন দেখা যায় যে, হাদীসে রাসূল (সাঃ) এর এ সম্পর্কে স্পষ্ট দিক-নির্দেশনা আছে তা পাশ কাটিয়ে প্রচলিত কুসংস্কার তথা বিদআতের আশ্রয় নেয়া হয়। এমন কাজ করা হয় যা কোনভাবেই মৃত ব্যক্তির কল্যাণে আসে না এবং এগুলো যে মৃত ব্যক্তির জন্য কোন কল্যাণ বয়ে আনে, তার সমর্থনে কোন প্রমাণ নেই। কোনো ব্যক্তির মৃত্যুর পর থেকে দাফন করা ও দাফনোত্তর যতসব কাজ বিভিন্ন এলাকা ও অঞ্চল ভিত্তিক কালক্রমে নতুন নতুন উদ্ভাবিত হয়েছে তা সবই বিদ'আত ও নাজায়েয।

যেমনঃ মৃত ব্যক্তির জন্য মাগফিরাত কামনার নামে তাহলীল পড়ানো, কুরআন খতম পড়ানো মত ব্যক্তির চার পাশে বসে কুরআন পাঠ করা, গোসলের জন্য গরম পানি দেওয়ার জন্য পাক ঘরের চুলা বাদ দিয়ে বাইরে চুলা করে গরম পানি দেয়া মৃত ব্যক্তিকে যেখানে গোসল দেওয়া হয় সে স্থান ৪দিন কিংবা ৪০ দিন পর্যন্ত বেড়া দিয়ে সংরক্ষণ করা এবং রাতের বেলায় সেখানে মোম, হারিকেন বা বৈদ্যুতিক বাতি দিয়ে আলোকিত করে রাখা, জানাযা নিয়ে যাওয়ার সময় আল্লাহ্ রাব্বী, মুহাম্মাদুন নবী কিংবা কালিমা শাহাদাৎ পাঠ করা, জানাযা কবর স্থানে নিয়ে যাওয়ার সময় খাটিয়ার উপর আগর বাতি জ্বালানো এবং জানাযার যাত্রীদের উপর গোলাপ জল ছিটানো, কবর স্থানে জানাযা নেয়ার সময় খাটিয়াকে ছাতা বা কোনো আচ্ছাদন দিয়ে ছায়াদান করে নিয়ে যাওয়া, জানাযার সালাত

শেষে “এ মানুষটি কেমন ছিল “উপস্থিত সবাই “বেশ ভালো ছিল ” একথা বলা, জানাযার সালাতের পূর্বে মৃত ব্যক্তির স্মৃতিচারণ করে বক্তব্য দেয়া, জানাযা পড়ানোর সময় ইমামের একখন্ড সাদা কাপড় জায়নামায হিসেবে ব্যবহার করা - যা মূলত কাফনের কাপড়ের অংশ বিশেষ, জানাযার সালাত পড়ার পর পুনরায় খাটিয়ার সামনে দু’আ করা ঐ সময় ক্বিয়াম করা সালাত ও সালাম পেশ করা, জানাযার সালাতের পর মৃত ব্যক্তিকে শেষ বারের মত দেখার জন্য মুখের কাফন খোলা, কাফনের উপর যে কোনো রকমের দু’আ লিখে দেয়া কিংবা দু’আ লিখিত কাপড় খন্ডকাফনের সাথেলাগিয়ে দেয়া, কোনো কাপড় খন্ডের উপর কালিমা লিখে ঐ কাপড় খন্ড কবরের ভেতর মৃতের ডান পাশেমুখ বরাবর কবরের দেয়ালে টাঙ্গিয়ে দেয়া, কবরের উপর পুষ্পস্তবক অর্পণ করা, দাফন করার সময় প্রথম তিন অঞ্জলি মাটি দেওয়ার ক্ষেত্রে মিনহা খালাকনাকুমওয়া মিনহা ” কুরআন মাজীদে এ আয়াত পাঠ করা, দাফনের পর দু’আ করার পূর্বে একবার সূরা ফাতিহা তিনবার সূরা ইখলাছ. একবারসূরা ফালাক একবার সূরা নাস এভাবে কুরআন মাজীদ থেকে কোনো সূরা বা আয়াতপাঠ করা, দাফন ও দু’আ শেষে সবাই চলে আসার পর একজন বসে কবর তালক্বীন করা, *কবর পাকা করা ও তাতে মৃত ব্যক্তির নাম ফলক করা, কবরের উপর ঘর তৈরি করা বা মাযার নির্মাণ করা, মৃত্যুর পর চার দিন পর্যন্ত কিংবা চল্লিশ দিন পর্যন্ত বিভিন্ন ফাতিহা পড়ানো, মৃত ব্যক্তির বাড়িতে তিন দিন পর্যন্ত আত্মীয় - স্বজন কত্রিক পালা ক্রমেখানা পাঠানো, মৃত্যুর পর চার

দিন বা চল্লিশ দিন পর্যন্ত মোল্লা - মৌলভী দিয়ে প্যাণ্ডেল টাঙ্গিয়ে কবর পাহারা দেয়া, মৃত ব্যক্তির বাড়িতে তিন পর্যন্ত চুলা না জ্বালানো ও খানা পাক না করা, মৃত ব্যক্তি রাষ্ট্রীয় ব্যক্তিত্ব কিংবা জাতীয় নেতা-নেত্রী হলে অথবা সামরিক ব্যক্তি হলে দাফনের সময় তোপধ্বনি করা ও যুদ্ধের বাজনা বাজানো, জানাযার সালাতের সময় জুতা-স্যাণ্ডেল পাক থাকলেও খুলে রাখা (সুন্নাত হল জুতা-স্যাণ্ডেল খুলে না রাখা), জানাযার সালাতে প্রথম তাকবীরের পর হুজু'না পড়া, (সুন্নাত হল 'ছানা না পড়ে সূরা ফাতিহা পড়া), মৃত ব্যক্তিকে কবরে রাখার সময় আযান দেয়া, নেককার বা বুয়ুর্গ ব্যক্তি হিসেবে কোনো কবরে বিছানা-বালিশ দেয়া, মৃত্যুর পূর্বেই কবর খনন করে রাখা, মৃত ব্যক্তির কাযা নামায থাকলে কিংবা মৃত ব্যক্তি বেনামাযী হলে তার নামাযের আর্থিক কাফফারা হিসাব করে কাফফারা আদায় করা এং এ মৃত ব্যক্তি গরীব লোক হলে কাফফারার পরিবর্তে একটি কুরআন মাজীদ কাউকে হাদীয়া প্রদান করে কাফফারা এসকাত্ব (দূরীভূত করা) ইত্যাদি ইত্যাদি।

মৃত্যুর পরে সমাজে প্রচলিত আরও কতিপয় বিদআত সমূহ

- (১) মৃত্যুর আগে বা পরে মাইয়েতকে ক্বিবলার দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া
- (২) মাইয়েতের শিয়রে বসে সূরা ইয়াসীন বা কুরআন তেলাওয়াত করা (তালখীছ ৯৬, ৯৭)।
- (৩) মাইয়েতের নখ কাটা ও গুণ্ডাঙ্গের লোম ছাফ করা^{৪১৯}
- (৪) কাঠি দিয়ে (বা নির্দিষ্ট সংখ্যক নিম্ন কাঠি দিয়ে) দাঁত খিলাল করানো
- (৫) নাক-কান-গুণ্ডাঙ্গ প্রভৃতি স্থানে তুলা

^{৪১৯} বুখারী, মিশকাত হা/১৬৯৫; মিরআত ৫/৪২৮-২৯; ফিকহুস সুন্নাহ ১/২৯০

ভরা^{৪২০} (৬) দাফন না করা পর্যন্ত পরিবারের লোকদের না খেয়ে থাকা^{৪২১} (৭) বাড়ীতে বা কবরস্থানে এই সময় ছাদাক্বা বিলি করা (৯৯, ১০৩) (৮) চীৎকার দিয়ে কান্নাকাটি করা, বুক চাপড়ানো, কাপড় ছেঁড়া, মাথা ন্যাড়া করা, দাড়ি-গোঁফ না মুন্ডানো ইত্যাদি^{৪২২} (৯) তিন দিনের অধিক (সপ্তাহ, মাস, ছয় মাস ব্যাপী) শোক পালন করা কেবল স্ত্রী ব্যতীত। কেননা তিনি ৪ মাস ১০ দিন ইদ্দত পালন করবেন (১০) কাফির, মুশরিক, মুনাফিকদের জন্য দো'আ করা (১১) শোক দিবস (শোকের মাস ইত্যাদি) পালন করা, শোকসভা করা ও এজন্য খানাপিনার বা (কাঙ্গালী ভোজের) আয়োজন করা ইত্যাদি (১২) মসজিদের মিনারে বা বাজারে মাইকে অলি-গলিতে 'শোক সংবাদ' প্রচার করা (১৩) কবরের উপরে খাদ্য ও পানীয় রেখে দেওয়া। যাতে লোকেরা তা নিয়ে যায় (১৪) মৃতের কক্ষে তিন রাত, সাত রাত (বা ৪০ রাত) ব্যাপী আলো জ্বেলে রাখা (১৫) কাফনের কাপড়ের উপরে কুরআনের আয়াত ও দো'আ-কালেমা ইত্যাদি লেখা (১৬) এই ধারণা করা যে, মাইয়েত জান্নাতী হ'লে ওয়নে হালকা হয় ও দ্রুত কবরের দিকে যেতে চায় (১৭) মাইয়েতকে দূরবর্তী নেককার লোকদের গোরস্থানে নিয়ে দাফন করা (১৮) জানাযার পিছে পিছে উচ্চৈঃস্বরে যিকর ও তেলাওয়াত করতে থাকা (১৯) জানাযা শুরুর প্রাক্কালে মাইয়েত কেমন ছিলেন বলে লোকদের কাছ

^{৪২০} তালখীছ, পৃঃ ১০২

^{৪২১} তালখীছ, পৃঃ ৫৮-৬৫, ৬৯; মির'আত 'মাইয়েতের দাফন' অনুচ্ছেদ, ৫/৪২৬-৫৭

^{৪২২} আহমাদ হা/২২২৪১, সনদ যঈফ; তালখীছ পৃঃ ১০২; আলবানী, আহকামুল জানায়েয, টীকা দ্রঃ, মাসআলা নং ১০৬ দ্রঃ

থেকে সমস্বরে সাক্ষ্য নেওয়া (২০) জানাযার ছালাতের আগে বা দাফনের পরে তার শোকগাথা বর্ণনা করা (২১) জুতা পাক থাকা সত্ত্বেও জানাযার ছালাতে জুতা খুলে দাঁড়ানো। (২২) কবরে মাইয়েতের উপরে গোলাপ পানি ছিটানো (২৩) কবরের উপরে মাথার দিক থেকে পায়ের দিকে ও পায়ের দিক থেকে মাথার দিকে পানি ছিটানো। অতঃপর অবশিষ্ট পানিটুকু কবরের মাঝখানে ঢালা (২৪) তিন মুঠি মাটি দেওয়ার সময় প্রথম মুঠিতে মিনহা খালাকনা-কুম' দ্বিতীয় মুঠিতে 'ওয়া ফীহা নু'ঈদুকুম' এবং তৃতীয় মুঠিতে 'ওয়া মিনহা নুখরিজুকুম তা-রাতান উখরা' বলা (ত্বোয়াহা ৫৫; ১০২) (২৫) অথবা 'আল্লা-হুম্মা আজিরহা মিনাশ শায়তান'.... পাঠ করা (ইবনু মাজাহ হা/১৫৫৩, 'যঈফ')। (২৬) কবরে মাথার দিকে দাঁড়িয়ে সূরায়ে ফাতিহা ও পায়ের দিকে দাঁড়িয়ে সূরায়ে বাক্বারাহর গুরুর অংশ পড়া (২৭) সূরায়ে ফাতিহা, রুদর, কাফেরুণ, নছর, ইখলাছ, ফালাক ও নাস এই সাতটি সূরা পাঠ করে দাফনের সময় বিশেষ দো'আ পড়া (২৮) কবরের কাছে বসে কুরআন তেলাওয়াত ও খতম করা (২৯) কবরের উপরে শামিয়ানা টাঙ্গানো (৩০) নির্দিষ্ট ভাবে প্রতি জুম'আয় কিংবা সোম ও বৃহস্পতিবারে পিতা-মাতার কবর যেয়ারত করা (৩১) এতদ্ব্যতীত আশূরা, শবে মে'রাজ, শবেবরাত, রামাযান ও দুই ঈদে বিশেষভাবে কবর যেয়ারত করা (৩২) কবরের সামনে হাত জোড় করে দাঁড়ানো ও সূরায়ে ফাতিহা ১ বার, ইখলাছ ১১ বার কিংবা সূরা ইয়াসীন ১ বার পড়া। (৩৩) কুরআন পাঠকারীকে উত্তম খানা-পিনা ও টাকা-পয়সা দেওয়া বা এ বিষয়ে

অছিয়ত করে যাওয়া (৩৪) কবরকে সুন্দর করা। (৩৫) কবরে রুমাল, কাপড় ইত্যাদি বরকত মনে করে নিক্ষেপ করা। (৩৬) কবরে চুম্বন করা। (৩৭) কবরের গায়ে মৃতের নাম ও মৃত্যুর তারিখ লেখা। (৩৮) কবরের গায়ে বরকত মনে করে হাত লাগানো এবং পেট ও পিঠ ঠেকানো। (৩৯) ত্রিশ পারা কুরআন (বা সূরা ইয়াসীন) পড়ে এর সওয়াব সমূহ মৃতের নামে বখশে দেয়া। যাকে এদেশে ‘কুরআনখানী’ বলে। (৪০) কাফেরুণ, ইখলাছ, ফালাক ও নাস এই চারটি ‘কুল’ সূরার প্রতিটি ১ লক্ষ বার পড়ে মৃতের নামে বখশে দেওয়া, যাকে এদেশে ‘কুলখানী’ বলে। (৪১) কালেমা ত্বাইয়িবা ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ ১ লক্ষ বার পড়ে মৃতের নামে বখশে দেওয়া, যাকে এদেশে ‘কালেমাখানী’ বলে। (৪২) ১ম, ৩য়, ৭ম (বা ১০ম দিনে) বা ৪০ দিনে চেহলাম বা চল্লিশার অনুষ্ঠান করা (৪৩) ‘খানা’র অনুষ্ঠান করা (৪৪) যারা কবর খনন করে ও দাফনের কাজে সাহায্য করে, তাদেরকে মৃতের বাড়ী দাওয়াত দিয়ে বিশেষ খানার ব্যবস্থা করা। যাকে এদেশে ‘হাত ধোয়া খানা’ বলা হয় (৪৫) আযান শুনে নেকী পাবে বা গোর আযাব মাফ হবে ভেবে মসজিদের পাশে কবর দেওয়া (৪৬) কবরের পাশে দাঁড়িয়ে ‘ফাতিহা’ পাঠ করা (৪৭) কাফন-দাফনের কাজকে নেকীর কাজ না ভেবে পয়সার বিনিময়ে কাজ করা (৪৮) মৃত ব্যক্তির কবরের পাশে আলো জ্বেলে ও মাইক লাগিয়ে রাত্রি ব্যাপী উচ্চৈঃস্বরে কুরআন খতম করা (৪৯) মৃত্যুবার্ষিকী পালন করা (৫০) ছালাত, ক্বিরাআত ও অন্যান্য দৈহিক ইবাদত সমূহের নেকী মৃতদের জন্য হাদিয়া দেওয়া। যাকে এদেশে

‘সওয়াব রেসানী’ বলা হয় (৫১) আমল সমূহের সওয়াব রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নামে (বা অন্যান্য নেককার মৃত ব্যক্তিদের নামে) বখশে দেওয়া। যাকে এদেশে ‘ঈছালে সওয়াব’ বলা হয় (৫২) নেককার লোকদের কবরে গিয়ে দো‘আ করলে তা কবুল হয়, এই ধারণা করা। (৫৩) মৃত্যুর সাথে সাথে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায় বলে ধারণা করা (৫৪) জানাযার সময় স্ত্রীর নিকট থেকে মোহরানা মাফ করিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করা (৫৫) ঐ সময় মৃতের ক্বাযা ছালাত সমূহের বা উমরী ক্বাযার কাফফারা স্বরূপ টাকা আদায় করা (৫৬) মৃত্যুর পরপরই ফকীর-মিসকীনদের মধ্যে চাউল ও টাকা-পয়সা বিতরণ করা (৫৭) দাফনের পরে কবরস্থানে মহিষ বা গবাদি-পশু যবহ করে গরীবদের মধ্যে গোশত বিতরণ করা (৫৮) লাশ কবরে নিয়ে যাওয়ার সময় রাস্তায় তিনবার নামানো (৫৯) কবরে মাথার কাছে ‘মক্কার মাটি’ নামক আরবীতে ‘আল্লাহ’ লেখা মাটির টেলা রাখা (৬০) মাইয়েতের মুখে ও কপালে আতর দিয়ে ‘আল্লাহ’ লেখা (৬১) কবরে মোমবাতি, আগরবাতি ইত্যাদি দেওয়া (৬২) পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের সময় বদনায় পানি দিয়ে যাওয়া এই নিয়তে যে, মৃতের রুহ এসে ওযু করে ছালাত আদায় করে যাবে (৬৩) মৃতের ঘরে ৪০ দিন যাবৎ বিশেষ লৌহজাত দ্রব্য রাখা (৬৪) মৃত্যুর ২০দিন পর রুটি বিলি করা ও ৪০ দিন পর বড় ধরনের ‘খানা’র অনুষ্ঠান করা (৬৫) মৃতের বিছানা ও খাট ইত্যাদি ৭দিন পর্যন্ত একইভাবে রাখা (৬৬) মৃতের পরকালীন মুক্তির জন্য তার বাড়ীতে মীলাদ বা ওয়ায মাহফিল করা (৬৭) নববর্ষ, শবেবরাত ইত্যাদিতে

কোন বুয়র্গ ব্যক্তিকে ডেকে মৃতের কবর যিয়ারত করিয়ে নেওয়া ও তাকে বিশেষ সম্মানী প্রদান করা (৬৮) শবেবরাতে ঘরবাড়ী পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে মৃত স্বামীর রুহের আগমন অপেক্ষায় তার পরিত্যক্ত কক্ষে বা অন্যত্র সারা রাত জেগে বসে থাকা ও ইবাদত-বন্দেগী করা (৬৯) ঈছালে ছওয়াবের অনুষ্ঠান করা (৭০) নিজের কোন একটি বা একাধিক সমস্যা সমাধানের নিয়তে কবরের গায়ে বা পাশের কোন গাছের ডালে বিশেষ ধরনের সুতা বা ইটখন্ড ঝুলিয়ে রাখা। (৭১) মাযার থেকে ফিরে আসার সময় কবরের দিকে মুখ করে বেরিয়ে আসা (৭২) মৃত্যুর আগেই কবর তৈরী করা (৭৩) কবরে মৃত ব্যক্তির ব্যবহৃত বস্তু সমূহ রাখা এই ধারণায় যে, সেগুলি তার কাজে আসবে (৭৪) কবরে কা'বা গৃহের কিংবা কোন পীরের কবরের গেলাফের অংশ কিংবা তাবীয লিখে দাফন করা এই ধারণায় যে, এগুলি তাকে কবর আযাব থেকে বাঁচিয়ে দেবে (৭৫) কবরে 'ওরস' উপলক্ষে বা অন্য সময়ে রান্না করা খিচুড়ী বা তৈরী করা রুটি বা মিষ্টি 'তাবাররুক' নাম দিয়ে বরকতের খাদ্য মনে করে ভক্ষণ করা (৭৬) আজমীরে খাজাবাবার কবরে টাকা পাঠানো বা অন্য কোন পীর বাবার কবরে গরু-ছাগল, টাকা-পয়সা ও অন্যান্য হাদিয়া পাঠানো (৭৭) কবরের মধ্যবর্তী স্থানে আঙ্গুল প্রবেশ করিয়ে মৃতের জন্য দো'আ পড়া (৭৮) কবরের উপরে একটি বা চার কোণে চারটি কাঁচা খেজুরের ডাল পোতা বা কোন গাছ লাগানো এই ধারণা করে যে, এর প্রভাবে কবর আযাব হালকা হবে। (৭৯) খাটিয়া ও মাইয়েত ঢাকার কাপড় খুব সুন্দর করা (৮০) কালেমা ও পবিত্র

কুরআনের আয়াত লিখিত কালো কাপড় দিয়ে খাটিয়া ঢাকা। (৮১)
 মৃতের প্রত্যেক অঙ্গ ধোয়ার সময় পৃথক পৃথক দো‘আ পড়া (৮২)
 জানাযা বহনের সাথে সাথে ছাদাক্বা বিতরণ করা এবং লোকদের
 কোল্ড ড্রিংকস পান করানো (৮৩) লাশের নিকট ভিড় করা (৮৪)
 মৃতের জন্ম ও মৃত্যুবার্ষিকী বা অন্য কোন উপলক্ষে দিনভর
 উচ্চৈঃস্বরে তার বক্তৃতা বা কুরআনের ক্যাসেট বাজানো (৮৫)
 বিশেষ কোন নেককার ব্যক্তির কবর থাকার কারণে জনপদের
 লোকেরা রুযিপ্রাপ্ত হয় ও আল্লাহর সাহায্যপ্রাপ্ত হয় বলে ধারণা
 পোষণ করা। (৮৬) জানাযা গুরুর পূর্বে ইমামের পক্ষ থেকে
 মুছল্লীদের উদ্দেশ্যে উচ্চৈঃস্বরে ‘নয়ত’ বলে দেওয়া (৮৭) ইমাম ও
 মুক্তাদীর ‘ছানা’ পড়া। (৮৮) সূরা ফাতিহা ও একটি সূরা ছাড়াই
 জানাযার ছালাত আদায় করা। (৮৯) জানাযা শেষ হবার পরেই
 সেখানে দাঁড়িয়ে অথবা দাফন শেষে একজনের নেতৃত্বে সকলে
 দু’হাত তুলে দলবদ্ধভাবে মুনাজাত করা। (৯০) জানাযার সময়ে
 সকলকে মৃতের বাড়ীতে কুলখানির অনুষ্ঠানে দাওয়াত দেওয়া।
 উপরে বর্ণিত বিষয়গুলি ছাড়াও মৃত ব্যক্তি ও কবরকে কেন্দ্র করে
 হাযারো রকমের শিরকী আক্বীদা ও বিদ‘আতী রসম-রেওয়াজ
 উপমহাদেশে মুসলিম সমাজে চালু আছে। অতএব প্রত্যেক মুমিনের
 কর্তব্য হবে এসকল শিরক ও বিদ‘আতী কর্মকান্ড হ’তে দূরে থাকা।
 আল্লাহ আমাদের হেফযত করুন।- আমীন!!
 জানা আবশ্যক যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) দু’টি কবরের উপরে যে
 খেজুরের দু’টি কাঁচা চেরা ডাল পুঁতেছিলেন, সেটা ছিল তাঁর জন্য

‘খাছ’। তাঁর বা কোন সাহাবীর পক্ষ থেকে পরবর্তীতে এমন কোন আমল করার নযীর নেই বুরাইদা আসলামী (রাঃ) ব্যতীত। কেননা তিনি এটার জন্য অছিয়ত করেছিলেন (বুখারী)।

অতএব এটা স্পষ্ট যে, কেবলমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে নেক আমলের কারণেই কবর আযাব মাফ হ’তে পারে। ফুল দেওয়া বা কাঁচা ডাল পোতার কারণে নয়। কেননা এসবের কোন প্রভাব মাইয়েতের উপর পড়ে না। যেমন আব্দুর রহমান (রাঃ)-এর কবরের উপর তাঁবু খাটানো দেখে ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, ওটাকে হটিয়ে ফেল হে বৎস! কেননা ওটা তার আমলের উপরে ছায়া করছে বা বাধা সৃষ্টি করছে^{৪২০}।

উল্লেখিত কাজসমূহ বিভিন্ন সময়ে ব্যক্তি বিশেষ কর্তৃক সম্পূর্ণ নব উদ্ভাবিত। এসব কাজের কোন শারঈ ভিত্তি নেই। অর্থাৎ আল্লাহর যেমন এসব কাজ করেছেন বলে কোন প্রমাণ নেই, তেমনি সাহাবায়ে কেলাম এসব কাজ করেছেন বলে কোন ভিত্তি নেই। উল্লেখ্য, যে কাজ আল্লাহর রাসূল কিংবা তার সাহাবাগণ হতে পাওয়া যাবে না। তা কোন শরঈ কাজ বলে গণ্য হবে না। অথচ আমাদের দেশের নানান জায়গায় ইসালে সাওয়াব-মাহফিলের আয়োজন করতে দেখা যায় যা বা উক্ত কাজগুলো ইসলাম শরীয়ত সম্মত নয় এবং স্পষ্ট বিদআত।

অধিকন্তু আরও বলা যায় যে, মৃত ব্যক্তির রুহের মাগফিরাতের জন্য অথবা কোন বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য খতমে কুরআন অথবা

^{৪২০} মুত্তাফাকুআলাইহ, মিশকাত হা/৩৩৮; ফিকহুস সুন্নাহ ১/২৯৯

খতমে জালালীর অনুষ্ঠান করা। যেমন: কেউ যদি কুরআন তিলাওয়াত করে মৃত ব্যক্তিকে ঈসালে সাওয়াব করে, আলেমদের বিশুদ্ধ মতানুযায়ী এ সাওয়াব মৃত ব্যক্তির নিকট পৌঁছায় না, কারণ এটা মৃত ব্যক্তির আমল নয়। আল্লাহ তাআলা বলেছেন:

﴿وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾

(আর এই যে, মানুষ যা চেষ্টা করে, তাই সে পায়) [সূরা নাজম: ৩৯]। এ তিলাওয়াত জীবিত ব্যক্তির চেষ্টা বা আমল, এর সাওয়াব সে নিজেই পাবে, অন্য কাউকে সে ঈসালে সাওয়াব করার অধিকার রাখে না। বিশুদ্ধ হাদীস থেকে প্রমাণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবর যিয়ারত করতেন এবং কিছু বাক্য দ্বারা তিনি কবরবাসীদের জন্য দু‘আ করতেন, যা তিনি সাহাবাদের শিখিয়েছেন, তারাও তার থেকে শিখে নিয়েছে। যেমনঃ

السلام عليكم اهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وانا ان شاء الله بكم لاحقون، نسال الله لنا ولكم العافية

হে কবরবাসী মুমিন ও মুসলমানগণ, তোমাদের উপর সালাম, ইনশাআল্লাহ অতিসত্বর আমরা তোমাদের সাথে মিলিত হবো, আল্লাহর নিকট আমাদের জন্য ও তোমাদের জন্য নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি।” [ইবনে মাজাহ : ১৫৩৬]।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবর যিয়ারত করার সময় কুরআন বা তার কোন আয়াত তিলাওয়াত করেছেন এমন প্রমাণিত নয়, অথচ তিনি খুব কবর যিয়ারত করতেন। যদি তা বৈধ হত বা মৃতরা তার দ্বারা উপকৃত হত, তাহলে অবশ্যই তিনি তা করতেন

এবং সাহাবাদের নির্দেশ দিতেন। বরং নবুওয়তের দায়িত্ব আদায়, উম্মতের প্রতি দয়া ও সাওয়াবের বিবেচনায় এটা তার কর্তব্য ছিল। কারণ, তার ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেছেনঃ

﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ﴾

নিশ্চয় তোমাদের নিজেদের মধ্য থেকে তোমাদের নিকট একজন রাসূল এসেছেন, তা তার জন্য কষ্টদায়ক যা তোমাদেরকে পীড়া দেয়। তিনি তোমাদের কল্যাণকামী, মুমিনদের প্রতি স্নেহশীল, পরম দয়ালু। [সূরা তওবা: ১২৮]।

অতএব, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মধ্যে দয়া, উম্মতের কল্যাণ কামনা ও অনুগ্রহ থাকা সত্ত্বেও যেহেতু তিনি তা করেন নি, তাই প্রমাণ করে যে এটা না-জায়েয। সাহাবায়ে কেরাম তাই বুঝেছেন এবং এর উপরই তারা আমল করেছেন। সুতরাং, আধুনিককালে সমাজে কবর যেয়ারত নিয়ে যেসব কাজসমূহ দেখা যায় তা বিদ'আত।

অতএব, মৃত ব্যক্তির জন্য যেসব কাজ নাজায়েজ ও বিদ'আত বলে উপরে উল্লেখ করা হয়েছে তা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) - এর এই সহীহ হাদীস অনুযায়ী সত্যিই নাজায়েয এবং বিদ'আত। আর বিদ'আত হলো - গোমরাহী যা অবশ্যই পরিত্যাজ্য।

চৌদ্দ তম পরিচ্ছেদ - জানাযা নামাজের (صلاة الجنازة) নিয়ম ও জানাযা নামাজ (صلاة الجنازة) শেষে সম্মিলিতভাবে দুআ-মুনাজাত

প্রত্যেক মুসলিম আহলে ক্বিবলার উপর জানাযার সালাত বা নামাজ 'ফরযে কেফায়াহ'^{৪২৪}। অর্থাৎ মুসলমানদের কেউ জানাযা পড়লে উক্ত ফরয আদায় হয়ে যাবে। না পড়লে সবাই দায়ী হবে। সালাত হিসাবে অন্যান্য সালাতের ন্যায় ওযু, ক্বিবলা, সতর ঢাকা ইত্যাদি সালাতে জানাযার শর্তাবলীর অন্তর্ভুক্ত। তবে পার্থক্য এই যে, জানাযার সালাতে কোন রুকু-সিজদা বা বৈঠক নেই এবং এ সালাতের জন্য নির্দিষ্ট কোন ওয়াক্ত নেই। বরং দিনে-রাতে সকল সময় এমনকি নিষিদ্ধ তিন সময়েও পড়া যায়^{৪২৫}। বস্তুতঃ জানাযার নামাজ ও তার ফযীলত যখন কোন মুসলমান মারা যায় তখন তার আত্মার শান্তির জন্য বিশেষভাবে কিছু দুআ করা হয়। ঐ বিশেষ প্রক্রিয়ায় দুআ করার নাম জানাযার নামাজ।

এই নামাযের ফযীলত সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের জানাযায় শরীক হয়ে নামাজ পড়ে এবং তাকে কবরও দেয় সে দু কীরাত নেকী পায়। প্রত্যেক কীরাত উহুদ পাহাড় সমান নেকী। আর যে ব্যক্তি শুধু জানাযায় নামাজ পড়ে এবং মাটি দেয় না সে এক কীরাত নেকী

^{৪২৪} ইবনু মাজাহ হা/১৫২৬ জানায়েযু অধ্যায়-৬, আহলে ক্বিবলার উপর সালাত অনুচ্ছেদ-৩১; ফিকহুস সুন্নাহ ১/২৭১, ২৭৯-৮০।

^{৪২৫} ইবনু মাজাহ হা/১৫১৯; ফিকহুস সুন্নাহ ১/৮২-৮৩, ২৭১।

পাবে^{৪২৬}। জানাযার নামাজের জন্য অযু শর্ত বিখ্যাত তাবেয়ী নাফেঅ বলেন, আবদুল্লা ইবনু ওমর বলতেন, কেউ যেন বিনা অযুতে জানাযার নামায না পড়ে^{৪২৭}। তবে হ্যাঁ, অযু করতে গিয়ে জানাযা যদি ছেড়ে যাবার আশংকা থাকে তাহলে ইবনু আব্বাস (রা.) বলেন, তুমি তায়াম্মুম কর এবং নামাজ পড়^{৪২৮}।

লাশ ও ইমামের অবস্থান কিরূপ হবে? সামুরাহ ইবনু জুনদুব (রাঃ) বলেন, একদা আমি রাসুলুল্লাহর পেছনে একটি মেয়ের জানাযা পড়ি। তখন রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লাশের মাঝ বরাবর দাঁড়ান^{৪২৯}।

মুজাদীদে কাতার কটা হবে?

মালিক ইবনু হোরাযরা (রা.) বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, যে মুসলমানের মরার পর তার জানাযায় মুসলমানদের তিন লাইন লোক নামাজ পড়ে তার জন্য (আল্লাহতা'য়ালা ক্ষমা) অপরিহার্য করে দেন।

তাই জানাযা ইমাম মোজাদীদ সংখ্যা যখন কম মনে করতো তখন মালেক (রা.) এই হাদীসটির ভিত্তিতে তিনটি কাতার করে নিতেন^{৪৩০}। আরও বিস্তারিতভাবে বলা যায় যে, ইমামের পিছনে তিনটি কাতার দেওয়া মুস্তাহাব। যেমনঃ মুহাম্মদ ইবন উবায়দ (রঃ),

^{৪২৬} বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত, ১৪৪ পৃষ্ঠা

^{৪২৭} মুত্তা ইমাম মালিক, ৮০ পৃষ্ঠা

^{৪২৮} মুসল্লাফ ইবনু আবী শায়বা, ৩য় খণ্ড, ৩০৫ পৃষ্ঠা

^{৪২৯} সহীহুল বুখারী, মুসলিম, মিশকাত, ১৪৫ পৃষ্ঠা

^{৪৩০} আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনু মাজা, মিশকাত, ১৪৭ পৃষ্ঠা

মালিক ইবন হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন,

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مَرْثَدِ بْنِ الْيَزِيدِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ هُبَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيُصَلِّيَ عَلَيْهِ ثَلَاثَةٌ صُفُوفٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا أُوجِبَ ". قَالَ فَكَانَ مَالِكٌ إِذَا اسْتَقَلَّ أَهْلَ الْجَنَازَةِ جَزَّأَهُمْ ثَلَاثَةَ صُفُوفٍ لِلْحَدِيثِ. ضَعِيفٌ لَكِنِ الْمَوْقُوفِ حَسَنٌ (الألباني)

যে কোন মুসলমান ব্যক্তির জন্য জীবিত মুসলমানরা তিন কাতার করে (তার জানাযার) নামায পড়লে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব করে দেন। রাবী বলেনঃ এ জন্য মালিক (রঃ) যখন কোন ব্যক্তির জানাযায় লোক কম দেখতেন, তখন তাদের তিন কাতারে বিভক্ত করে দিতেন^{৪০৩}।

১ম কাতারে ইমামের কাছাকাছি মাইয়েতের উত্তরাধিকারীগণ ও দ্বীনদার গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ দাঁড়াবেন। এ ক্ষেত্রে রাসূল (সাঃ) এর হাদীস উল্লেখযোগ্য। যেমনঃ মুহাম্মাদ ইবন মুসা কাত্তান ওয়াসিতী (রঃ) খালিদুল হাযযা (রঃ) এ সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি বলেছেন,

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْقَطَّانُ الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا الْمُتَنَّى بْنُ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْحُسَيْنِ، حَدَّثَنَا خَالِدُ الْحَذَّاءُ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ " وَاخْلُفْهُ فِي تَرَكَّتِهِ ". وَقَالَ " اللَّهُمَّ أَوْسِعْ لَهُ فِي قَبْرِهِ ". وَلَمْ يَقُلْ " افْسَحْ لَهُ ". وَزَادَ قَالَ خَالِدُ الْحَذَّاءُ وَدَعَا أُخْرَى سَابِعَةً نَسِيَتْهَا

^{৪০৩} সুনান আবু দাউদ :: কিতাবুল জানাযা ২১, হাদীস ৩১৬৬

তার উত্তরাধিকারীদের মধ্য থেকে প্রতিনিধি নিযুক্ত কর এবং বলেছেন, হে আল্লাহ! তার কবরকে প্রশস্ত করে দাও। কিন্তু তিনি আরবী শব্দ বলেন নি।

তিনি আরো বলেন যে, খালিদুল হাযযা (রঃ) বলেছেন, ছটি দু'আর পর সপ্তম আরেকটি দু'আ করেছিলেন, যা আমি ভুলে গেছি^{৪০২}। চারজন হ'লে ইমামের পিছনে দু'জন দু'জন করে দাঁড়াবেন।

ইমাম ব্যতীত একজন পুরুষ ও একজন মহিলা মুক্তাদী হ'লে ইমামের পিছনে পুরুষ ও তার পিছনে মহিলা দাঁড়াবেন। মুক্তাদী একজন হ'লে তিনি ইমামের পিছনে দাঁড়াবেন। কোন লোক না পেলে একাকী জানাযা পড়বেন^{৪০৩}।

তবে শিরক ও বিদ'আতী আকীদা ও আমল মুক্ত দ্বীনদার মুছল্লীর সংখ্যা জানাযায় যত বেশী হবে, মাইয়েতের জন্য তা তত বেশী উপকারী হবে এবং তাদের দো'আ কবুল করা হবে^{৪০৪}।

মুসল্লী সংখ্যা কত হওয়া উচিত?

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, কোন মুসলমানের জানাযায় এমন চল্লিশজন লোক যারা আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করেননি যদি শরীক হয়ে ঐ লাশের জন্য দু'আ করে তাহলে আল্লাহ তা'য়ালার তাদের সুপারিশ নিশ্চয়ই কবুল করবেন (মুসলিম, মিশকাত, ১৪৫)

^{৪০২} সলিম, মিশকাত হা/১০৮৮৬ সালাতু অধ্যায়-৪, অনুচ্ছেদ-২৪; শারহুল মুনতাহা ৩/৫৫-৫৯।

^{৪০৩} হাকেম ১/৩৬৫, বায়হাকী ৪/৩০-৩১; তালখীছ ৫০-৫১ পৃঃ।

^{৪০৪} মুসলিম, মিশকাত হা/১৬৬০-৬১ 'জানায়েয' অধ্যায়-৫, অনুচ্ছেদ-৫।

জানাযার নামাজ (صلاة: الجنازة) পড়ার সহীহ নিয়ম

আবু ওমামাহ ইবনু সহাল ইবনু হোনাযফ (রাঃ) বলেন, জানাযার নামাজে সুন্নত হল তাকবীর দেয়া। তারপর সূরায়ে ফাতেহা পড়া। কিছু আয়াত পড়া তারপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপরে দরুদ পড়া। তারপর মাইয়েতের জন্য আন্তরিক দোয়া পড়া^{৪৩৫}।

জানাযার সালাতে চার তাকবীর দিবে। পাঁচ থেকে নয় তাকবীর পর্যন্ত প্রমাণিত আছে। তবে চার তাকবীরের হাদীস সমূহ অধিকতর সহীহ ও সংখ্যায় অধিক। মুক্তাদী ইমামের পিছে পিছে তাকবীর বলবে^{৪৩৬}।

প্রথমে মনে মনে জানাযার নিয়ত করে সরবে ‘আল্লাহু আকবর’ বলে দু’হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠিয়ে বাম হাতের উপর ডান হাত বুকে বাঁধবে। এ সময় ‘ছানা’ পড়বে না^{৪৩৭}। নাভির নীচে হাত বাঁধার হাদীস সর্বসম্মতভাবে ‘যঈফ’^{৪৩৮}। আনাস, ইবনে ওমর, ইবনে আববাস (রাঃ) প্রমুখ সাহাবীগণ সকল তাকবীরেই হাত উঠাতেন^{৪৩৯}। অতঃপর আ‘উযুবিল্লাহ-বিসমিল্লাহ সহ সূরায়ে ফাতিহা ও অন্য একটি সূরা পড়বে^{৪৪০}। তারপর ২য় তাকবীর দিবে ও দরুদে ইবরাহীমী পাঠ

^{৪৩৫} ফতহুলবারী ৩য় খণ্ড ২০৩ পৃ:

^{৪৩৬} মুত্তাফাক ‘আলাইহ, মিশকাত হা/১৬৫২; তালখীছ ৫৪ পৃঃ।

^{৪৩৭} শারহুল মুনতাহা ৩/৬০; তালখীছ পৃঃ ১০১।

^{৪৩৮} শারহুল মুনতাহা ৩/৬০; তালখীছ পৃঃ ১০১।

^{৪৩৯} শারহুল মুনতাহা ৩/৬০; তালখীছ পৃঃ ১০১।

^{৪৪০} বুখারী ১/১৭৮, হা/১৩৩৫, ‘জানাযেয’ অধ্যায়-২৩, অনুচ্ছেদ-৬৫; মিশকাত হা/১৬৫৪; নাসাঈ হা/১৯৮৭, ৮৯; তালখীছ, ৫৪ পৃঃ।

করবে, যা আত্মহিঁয়াতু-র পরে পড়া হয়। তারপর ওয় তাকবীর দিবে ও দো‘আ সমূহ পড়বে। দো‘আ পাঠ শেষে ৪র্থ তাকবীর দিয়ে প্রথমে ডাইনে ও পরে বামে সালাম ফিরাবে। ডাইনে একবার মাত্র সালাম ফিরানোও জায়েয আছে^{৪৪১}। জানাযার সালাত সরবে ও নীরবে পড়া যায়^{৪৪২}। ইমাম সরবে পড়লে মুক্তাদীগণ আ‘উযুবিল্লাহ-বিসমিল্লাহ সহ কেবল সূরায়ে ফাতিহা চুপে চুপে পড়বে এবং পরে দরুদ ও অন্যান্য দো‘আ সমূহ পড়বে। তবে ইমাম নীরবে পড়লে মুক্তাদীগণ সূরা ফাতিহা ও অন্য একটি সূরা এবং অন্যান্য দো‘আ সমূহ পড়বে।

আত্মহত্যাকারী, বেনামাযী ও ফাসেকের জানাযা

জাবের বলেন, একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে একজন আত্মহত্যাকারীর লাশ আনা হলে তিনি তার জানাযা পড়েননি (মুসলিম, বুলুগুল মারাম, ৩৯ পৃষ্ঠা)। এইরূপ জোহায়না গোত্রের এক ব্যক্তি খায়বারের দিনে গনীমতের (জেহাদেলব্ধ) মাল চুরি করায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জানাযা না পড়ে বলেন, তোমরা তোমাদের সাথীর জানাযা পড়ে নাও (বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, নাসাঈ)। উক্ত হাদীসের ভিত্তিতে ওলামায়ে কিরাম বলেন, আত্মহত্যাকারী এবং চোর ও ডাকাতির জানাযা

^{৪৪১} বুখারী ১/১৭৮, হা/১৩৩৫, জায়েয অধ্যায়-২৩, অনুচ্ছেদ-৬৫; মিশকাত হা/১৬৫৪; নাসাঈ হা/১৯৮৭, ৮৯; তালখীছ, ৫৪ পৃঃ।

^{৪৪২} বুখারী ১/১৭৮, হা/১৩৩৫, জায়েয অধ্যায়-২৩, অনুচ্ছেদ-৬৫; মিশকাত হা/১৬৫৪; নাসাঈ হা/১৯৮৭, ৮৯; তালখীছ, ৫৪ পৃঃ।

আলেম ও পরহেযগার লোক না পড়ে সাধারণ লোক পড়বে। যাতে অন্যান্য লোকেরা সাবধান হয়ে যায় এবং শিক্ষা পায়।

গায়েবী জানাযা

আবিসিনিয়ার বাদশাহ আসহিমাহ নাজ্জাশী যেদিন মারা যান সেদিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদেরকে ঐ মৃত্যু সংবাদ দিয়ে তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে মাঠে গিয়ে গায়েবী জানাযা পড়েন (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত, ১৪৪ পৃষ্ঠা)।

ইমাম ইবনু হায়ম বলেন, এই হাদীস প্রমাণ করে যে, জামায়াত সহকারে গায়েবী জানাযা পড়া সাহাবায়ে কিরামের ইজমা বা সর্ববাদীসম্মত অভিমত। এর খেলাফ করা বৈধ নয় (মুহাল্লা, ৫ম খণ্ড, ১৬৯ পৃষ্ঠা)।

আল্লামা আব্দুল্লাহ ইবনু ইউসুফ যাইলায়ী হানাফী (রহ.) বাইহাকী এবং ওয়াকিদীর কিতাবুল মাগা-যীর বরাত দিয়ে বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত্যু যুদ্ধের দুই শহীদ রাসুলুল্লাহ পালক পুত্র যায়দ ইবনু হা-রিসাহ এবং আলীর বড় ভাই জাফর ইবনু আবী তা-লিবের গায়েবী জানাযা পড়েছিলেন (নাসবুর রা-য়াহ ২য় খণ্ড, ২৮৪ পৃষ্ঠা)।

মসজিদে জানাযার নামায চলে কিনা?

আয়েশা বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাইয়ার দুই পুত্র সুহাইল এবং তার ভাইয়ের জানাযা মসজিদে পড়েছিলেন^{৪৪০}। আর এক মুহাদ্দিস আল্লামা যাইলায়ী বলেন, ঐরূপ

^{৪৪০} মুসলিম, মিশকাত, ১৪৫ পৃষ্ঠা

হাদীস ইবনু আদীর আলকা-মিলেও আছে। কিন্তু ইমাম নবভী বলেন, ঐ সব হাদীসই যযীফ। যা দলিল যোগ্য হতে পারে না^{৪৪৪}।

মোসান্নাফ ইবনু আবী শায়বা এবং সুনানে সাঈদ ইবনু মনসুরে আছে যে, ওমর আবু বাক্রের জানাযা মসজিদে পড়েছিলেন^{৪৪৫}।

এ ব্যাপারে হাফেয ইবনুল কাইয়েম বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রায়ই মসজিদের বাইরে পড়তেন এবং কখনো কখনো মসজিদের ভেতরেও পড়েছেন। দু'রকমই জায়েয। তবে অসুবিধা না হলে মসজিদের বাইরে পড়াটাই উত্তম^{৪৪৬}।

জানাযার ইমাম কে হওয়া উচিত?

মাইয়েত যদি জীবদ্দশায় তার জানাযা পড়বার জন্য কাউকে অসিয়্যত করে থাকে তাহলে সেইই জানাযা পড়াবে^{৪৪৭}। যেমন- আবুবাকর ওমরকে, ওমর সুহাইবকে এবং তার পুত্র হাযেরকে, ইবনু মসউদ ইবনু যুবায়রকে এবং আয়েশা আবু হুরায়রাকে তাদের জানাযা পড়বার জন্য অসিয়্যত করেছিলেন। তাই তারাই জানাযা পড়িয়েছিলেন। ফলে এটা ইজমায় পরিণত হয়^{৪৪৮}। ইমাম নবভী (রহঃ) বলেন, অসিয়্যতের পর অলী বা মাইয়েতের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় জানাযা পড়াবে। তারপর মসজিদের ইমাম। ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের মধ্যে

^{৪৪৪} নাসবুর রা-য়াহ ২য় খণ্ড, ২৭৫-২৭৬ পৃষ্ঠা

^{৪৪৫} হাশিয়া দেহলঅবী আলা-বুলুগল মারা-ম, ১ম খণ্ড, ২৯৩ পৃষ্ঠা

^{৪৪৬} যা-দুল মাআ-দ, ১ম খণ্ড, ১৪০ পৃষ্ঠা

^{৪৪৭} শারহুল মুনতাহা ৩/৫৬-৫৭; বায়হাকী ৪/২৮-২৯।

^{৪৪৮} আসইয়লাহ, ১ম খণ্ড, ২৬৫ পৃষ্ঠা

প্রথমে পিতা, তারপর দাদা, তারপর পুত্র, তারপর পৌত্র, তারপর ভাই^{৪৪৯}।

জানাযার নামাজের সময়ের করণীয়

এই পৃথিবীতে জীবন চলার পথে প্রত্যেক মানুষই ভাল-মন্দ নিয়েই জীবন অতিবাহিত করতে বাধ্য হন। ভুলের ঊর্ধ্বে কেউ এই নশ্বর পৃথিবীতে নেই। সেজন্য কোন মানুষের মৃত্যু খবর শোনামাত্র তার ভুল-ত্রুটিগুলো সবারই ক্ষমা করে দেয়া উচিত। মৃত ব্যক্তি যদি কারো কাছে ঋণ থাকেন তাহলে তার ওয়ারিশগণ পরিশোধ করে দেবেন। আর যদি তারা অসচ্ছল হয় ও ঋণদাতা স্বচ্ছল হন তাহলে ক্ষমা করে দেয়াই হবে মহোত্তম কাজ। এক স্থানে জানাযা পড়তে গিয়ে একটি অভিনব ঘটনার সূত্রপাত হলো। সবাই জানাযা নামাজ পড়ার জন্য দাঁড়িয়ে রয়েছে। এমন সময় ইমাম সাহেব বলছেন, মৃত ব্যক্তির কত ওয়াক্ত নামাজ কাযা গিয়েছে? পরিবারের লোকজন সঠিক হিসাব দিতে পারছিলেন না।

ইমাম সাহেব বললেন, যত ওয়াক্ত নামাজ কাযা গিয়েছে তা হিসাব করে কাফফরা না দিলে জানাযা নামাজ পড়ানো যাবে না। এভাবে সময়ক্ষেপণ করায় উপস্থিত মুসল্লিরা বিব্রত হচ্ছিলেন। আসলে ঐ বিষয়টি ইমামের পরিষ্কার জানা নেই যে জানাযা আটকিয়ে রেখে নামাজের কাফফরা আদায় করার কোন বিধান কুরআন হাদীসে নেই। কারণ যতক্ষণ মানুষের সেন্স থাকে ততক্ষণ ইশারায় হলেও নামাজ পড়তে হবে। আর কাযা হলে কাযা আদায় করবেন। আর

^{৪৪৯} রওয়াতুত তলবীন, ২য় খণ্ড, ১২১ পৃষ্ঠা

যার কাযা আদায় করা সম্ভব হয়নি তিনি তওবা করলে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেবেন। এর জন্য তাকে কোনো কাফফারা দেয়ার প্রয়োজন নেই^{৪৫০}।

জানাযা নামাজ শেষে মুনাযাত

আমাদের দেশের অনেক স্থানে দেখা যায় যে, জানাযা নামাজ পড়া হলে মৃত ব্যক্তির প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা নিবেদন ও তার জন্য মাগফিরাত কামনার জন্য দুআ-প্রার্থনা করে। অথচ ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী এরূপ করা সম্পূর্ণ বিদ'আত। জানাযা নামাজে তার জন্য দুআ-মুনাযাত শেষ করে আবার সাথে সাথে দুআ-মুনাযাত করার মধ্যে কি হিকমত থাকতে পারে? উদ্দেশ্য হতে পারে, আল্লাহকে এ কথা জানিয়ে দেয়া যে, হে আল্লাহ! মৃত ব্যক্তির জন্য দুআ-মুনাযাত করার যে পদ্ধতি আপনার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের শিখিয়ে গেছেন, তাতে আমরা সন্তুষ্ট হতে পারলাম না। তাই আমরা আবার আমাদের পছন্দ মত নিয়মানুসারে আমাদের মত করে দুআ-মুনাযাত করে নিলাম। জানাযা নামাজ শেষে দুআ-মুনাযাত করার অনুমোদন নেই। তবে দাফন শেষে কবরের কাছে দুআ করার অনুমোদন আছে। যেমন হাদীসে এসেছে-

كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه، وقال :

استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت، فإنه الآن يسأل. رواه أبو داود

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মৃত ব্যক্তির দাফন শেষ করতেন তখন তার কবরের কাছে কিছুক্ষণ দাঁড়াতেন এবং

^{৪৫০} জানাযার নামাজ - প্রফেসর ড ফারুক আব্দুল্লাহ নামক গ্রন্থ থেকে সংগ্রহীত।

বলতেন, তোমরা তোমাদের ভাইয়ের জন্য ক্ষমা-প্রার্থনা কর এবং তার অবিচল থাকার জন্য দুআ কর। কারণ এখন তাকে প্রশ্ন করা হবে^{৪৫১}।

পরিশেষে আল্লাহতায়ালা আমাদের সকলকে সঠিকভাবে মৃত ব্যক্তিদের দাফন কার্য সম্পন্ন করে তাদের রুহের মাগফেরাত কামনা করার তাওফিক দান করুন, আমীন।

পনের তম পরিচ্ছেদ - কবরে ফুল এবং ডাল পুঁতে দেওয়া শরিয়ত সম্মত নয় বরং বিদ'আত

একটি হাদীসকে ভুল ব্যাখ্যার মাধ্যমে কবরে খেজুরের শাখা বা গাছের ডাল পুতে দেওয়া কিংবা গাছ লাগিয়ে দেওয়া কিংবা ফুল দেওয়া আমাদের সমাজে ধর্মীয় রীতিতে পরিণত হয়েছে। এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা জানা এবং বুঝা আমাদের জন্য জরুরী। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে, একদা রাসূল (সাঃ) দুটি কবর অতিক্রম করছিলেন বা দুটি কবরের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি (কবর দুটি দেখে) বললেন : দুটি কবরেই শাস্তি হচ্ছে তবে বড় কোন কারণে শাস্তি হচ্ছে না। অতঃপর বললেন : হ্যাঁ অবশ্যই বড় কারণ। কেননা দু'কবরবাসীর একজন নিজেকে পেশাব হতে বাঁচাত না, আর দ্বিতীয়জন পরনিন্দা করতো। অতঃপর রাসূল (সাঃ) খেজুর গাছের একটি কাঁচা ডাল আনতে বললেন এবং তা (লম্বালম্বিভাবে) দ্বিখন্ডিত করলেন এর খন্ড দুটি দু'কবরের উপর পুঁতে দিলেন এবং বললেন : সম্ভবত ডাল দুটো না শুকানো পর্যন্ত

^{৪৫১} আবু দাউদ

দু'কবরবাসীর শাস্তি লাঘব হবে। - হাদীসটি বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, নাসাঈ, আহমাদ হাদীস গ্রন্থে সহিহ সনদে বর্ণিত আছে।

এ হাদীসটি দেখলে আমাদের কাছে সাধারণভাবে মনে হয় যে কবরে খেজুরের ডাল পুতে দিলে কবরবাসির জন্য উপকার হয়। কিন্তু এটা আসলে আমাদের বুঝার মারাত্মক ভুল। হাদীসটি ভালভাবে লক্ষ্য করলে এবং বুঝার চেষ্টা করলে আমরা যা পাই,

১/ রাসুল (সাঃ) পথ দিয়ে সাহাবীদের নিয়ে যাচ্ছিলেন এবং পথে দুটো কবর অতিক্রম করছিলেন। তিনি কিন্তু কবরকে লক্ষ্য করে রওয়ানা হন নি।

২/ সাহাবীদের শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে মহান আল্লাহ রাসুল (সাঃ) কে মোজেজা দান করেন এবং কবরের আজাব সম্পর্কে অবহিত করান। কেননা কবরের আজাব একটি অদৃশ্য বিষয়।

৩/ তিনি একটি খেজুরের ডাল দুই টুকরা করা দুই কবরে পুতে দিয়ে আশা পোষণ করলেন যে সম্ভবত ডাল দুটি না শুকান পর্যন্ত আজাব লাঘব হবে।

৪/ কবরের আযাব সম্পর্কে ধারণা দান এবং পেশাব ও চোগলখুরী থেকে সতর্ক থাকার পরামর্শ হিসেবে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।

মূলত এ ঘটনাটি একটি মোজেজা। এটা রাসুল (সাঃ) এর জন্যই নির্দিষ্ট। কারন এই ঘটনার পরও কোন সাহাবী কখনও কোন কবরে ডাল পুতে দিয়েছেন এর স্বপক্ষে কোন প্রমাণ নাই। অথচ রাসুল (সাঃ) সাহাবাদের সামনেই এই কাজ করে দেখিয়েছেন। তার মানে

হচ্ছে এটা রাসুল (সাঃ) এর জন্যই নির্দিষ্ট। এটা বুঝতে হলে আর একটু জানতে হবে।

মূলত কোন মানুষই গায়েব জানতে পারে না যদি না আল্লাহ জানিয়ে দেন। স্বয়ং রাসুল (সাঃ) কে সম্বোধন করে আল্লাহ নিজেই কুরয়ানুল কারীমে মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন, হে মুহাম্মাদ! সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপনি ঘোষণা করে দিন যে, একমাত্র আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া আমার নিজের ভাল-মন্দ, লাভ-লোকসান, কল্যাণ-অকল্যাণ ইত্যাদি বিষয়ে আমার কোনই হাত নেই। আর আমি যদি গায়েবের খবর জানতাম, তাহলে বহু কল্যাণ লাভ করতে পারতাম, আর কোন প্রকার অকল্যাণ আমাকে স্পর্শ করতে পারত না। (আল-আ'রাফ : ১৮৮)।

এই আয়াত প্রমাণ করে যে কবরের আজাব সম্পর্কে মানুষের জানা সম্ভব নয় যে কোন কবরে আজাব হচ্ছে কোন কবরে হচ্ছে না।

“বলুন, মহাকাশ মন্ডলী আর পৃথিবীর কেউই গায়েব জানেনা একমাত্র আল্লাহ ছাড়া। - সুরা নামাল ৬৫।

বলুন, আমি তোমাদের এ কথা বলি না যে, আমার কাছে আল্লাহর ধন ভান্ডার আছে। গায়েব সম্বন্ধেও আমি জানি না। তোমাদের এ কথাও বলি না যে, আমি ফেরেশতা। আমি শুধু অবতীর্ণ ওহীর অনুসরণ করি। - সুরা আল আন আম ৫০। অর্থাৎ বুঝা যাচ্ছে, সাহাবাদের পেশাব থেকে ভালভাবে পবিত্র হওয়া, চগলখুরির থেকে সতর্ক থাকার ও কবরের আযাব বিষয়ে শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে আল্লাহর ওহী ভিত্তিক এই ঘটনা। এটা রাসুল (সাঃ) মোজেজা। তিনি

দুয়া করেছেন কবরবাসির জন্য এবং ডাল দুটো শুকান না হয় এপর্যন্ত কবরের আজাব লাঘব হবে বলে আশা পোষণ করেন। এখানে আসলে ডাল সজীব থাকার সময়টা পর্যন্ত আজাব লাঘবের বিষয় বলা হয়েছে। আমরা অনেকে ধারণা করি যে সজীব ডাল আল্লাহর জিকির করে তাই জিকিরের কারনে কবরের আজাব লাঘব হবে এ জন্য অনেকে আস্ত গাছ লাগিয়ে দেন। ফুল দেন। আসলে সজীব বা জড় বস্তু সব কিছুই আল্লাহর জিকির করে। এ জন্য সতেজ ডাল হওয়ার প্রয়োজন নেই। মরা শুষ্ক ডালও আল্লাহর জিকির করে। এর দলিল হচ্ছেঃ 'সপ্ত আকাশ ও পৃথিবী এবং এগুলোর মধ্যে যা কিছু আছে সব কিছুই তাঁরই তাসবিহ পাঠ করে। এমন কিছু নেই যা তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে না। - বনী ইসরাঈল ৪৪। অর্থাৎ জড় বস্তুও আল্লাহর জিকির করে থাকে।

অতএব সজীব ডাল জিকির করে বলে আজাব লাঘব বিষয়টা তা নয়। আসলে সেটা ছিল সময় নির্ধারন। অর্থাৎ রাসুল (সাঃ) কবর দুটির বাসিন্দার জন্য দুয়া করেছেন যেন পুতে দেওয়া ডাল দুটি শুকিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত আযাব লাঘব হয়। তাছাড়া ডালের জিকিরের কারনে আজাব বন্ধ হওয়ার কোন দলিল নাই। কাফের এর কবরে ডাল পুতে দিলে কি জিকির কারনে আযাব লাঘব হবে? হবে না। আমরা কেন কবরে ডাল পুঁতব না বা কেন ফুল দিবো না? উপরের হাদীসের প্রেক্ষিতেও আমরা কবরে ডাল পুতে দেব না কারন,

১/ আমরা জানিনা কবরবাসী কি অবস্থায় রয়েছে।

২/ আমরা জানিনা কবরবাসির আজাব হচ্ছে কিনা।

৩/ যদি ধারণা করি যে হয়ত আজাব হচ্ছে তাহলে এটা মৃত ব্যক্তির উপর খারাপ ধারণা পোষণ করা হল। তাছাড়া গায়েবের বিষয় নিয়ে যেটা আমরা জানিনা সেটা নিয়ে স্বিকান্ত নেয়া হল।

৪/ রাসুল (সাঃ) জানতে পেরেছিলেন কারন তাঁর নিকট ওহী নাজিল হত, আমাদের উপর কিছুই নাজিল হয়না তাই আমাদের জানার অবকাশ নাই কবরবাসির কি আজাব হচ্ছে নাকি হচ্ছে না।

৫/ পূর্ববর্তী সৎ লোকেরা অর্থাৎ সাহাবিগণ কেউ এই কাজ করেন নাই। অতএব বুঝা যাচ্ছে এই ঘটনা শুধু রাসুল (সাঃ) এর একটি মোজেনজা ছিল মাত্র এবং ঘটনাটি রাসুল (সাঃ) এর জন্য নির্দিষ্ট ছিল।

৬/ রাসুল (সাঃ) তাঁর জীবদ্দশায় অনেক সাহাবীকে কবর দিয়েছেন। অথচ এ দু'টি কবর ছাড়া অন্য কোন কবরে খেজুর ডাল পুঁতেছেন বলে কোন বর্ণনা নেই। তার মানে সেটা শুধু ওই বিশেষ অবস্থার জন্যই। এর প্রমানে একটি হাদীস, মৃত ব্যক্তির দাফন শেষ করে রাসুল (সাঃ) সাহাবাদের দুয়া শিক্ষা দিয়েছেনঃ 'তোমরা তোমাদের ভাইয়ের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং তার দৃঢ় থাকার জন্য আল্লাহর নিকট দো'আ কর। কেননা সত্ত্বর সে জিজ্ঞাসিত হবে'। আল্লা-হুম্মাগফির লাহু ওয়া ছাবিবতহু' (অর্থ: হে আল্লাহ! আপনি তাকে ক্ষমা করুন ও তাকে দৃঢ় রাখুন। - - আবু দাউদ জানাজা অধ্যায়। এই হাদীস থেকে দেখা যাচ্ছে মৃত ব্যক্তির জন্য দুয়া করতে বলা হয়েছে। এখানে কিন্তু মৃতকে কবর দেয়ার পর ডাল বা ফুল

দেওয়ার কথা বলা নাই। এখানে দুয়া করার কথা বলা আছে। অতএব আমরা এই কাজ করতে পারব না। কেননা মৃত ব্যক্তির অবস্থা সম্পর্কে আমাদের জানার সুযোগ নেই। আর আমাদের দুয়া কবুলের কোন নিশ্চয়তা নাই। রাসুল (সাঃ) এর নিকট ওহী আস্ত এবং তাঁর দুয়া কবুলের নিশ্চয়তা ছিল কেননা তিনি রাসুল। তাই তিনি খেজুর ডাল শুকানো পর্যন্ত আজাব লাঘবের দুয়া করেছিলেন। আমরা নিজেরাই গুনাহগার আমাদের দুয়া কবুলের নিশ্চয়তা কোথায় যে ডাল শুকানো পর্যন্ত আমাদের দুয়া অনুযায়ী আজাব লাঘব হবে? আর আমরা জানিই তো না যে কবরে কি আজাব হচ্ছে নাকি হচ্ছে না! রাসুল (সাঃ) এর কোন সাহাবী থেকে এরকম আমল প্রমাণিত নয়। অর্থাৎ এই ঘটনার হাদীস বর্ণিত হওয়ার পরেও কোন সাহাবী এই কাজ অর্থাৎ ডাল পুতে দেওয়ার কাজ করেছেন এমন প্রমাণ নাই। অতএব কবরে ডাল পুতে দেওয়ার যে ধারণা আমাদের সমাজে তা শরিয়ত সম্মত নয়। কবরে ফুল দেওয়া একই রকম অবস্থা তবে ক্ষেত্র বিশেষে শিরক! ফুল সজীব থাকলে আযাব লাঘব হবে এই ধারণা উপরে ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছে। এই কাজ বিদ'আত। অনেকে কবরে ফুল দিয়ে থাকে মৃত ব্যক্তিকে শ্রদ্ধা করার জন্য সম্মান করার জন্য। এটা কখনও সরাসরি শিরক হয়ে যায় নতুবা কখনও শিরকের সাদৃশ্য হয়ে যায়। কেননা এভাবে মূর্তি পূজকরা মূর্তির পূজা করে থাকে। অতএব ইনশা আল্লাহ আমরা কবরের আজাব লাঘবের উদ্দেশ্যে কোন ডাল পালা বা ফুল বা বৃক্ষ রোপণ করব না। এবং কেউ যদি করে তাহলে সুন্দর করে বিষয়টা বুঝিয়ে

বলব। তবে এখানে একটা বিষয় যে কবরকে ভেঙ্গে যাওয়া থেকে রক্ষার জন্য বা জন্তু জানোয়ার যেন কবর খুঁড়ে লাশ খতিগ্রস্থ করতে না পারে সে জন্য নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থাহিসেবে কাটা ডাল পালা রেখে দেওয়া ভিন্ন বিষয়। অন্তরের নিয়ত হচ্ছে মূল বিষয়। অতএব, উপরোক্ত আলোচনার সারাংশে বলা যায় যে, কবরে ফুল দেওয়াকে অনেকে বিদাতে সাযিয়াহ বা মন্দ বিদাত বলে থাকে। আসলে এই কবরে ফুল দেওয়া কখনো বিদাত এবং কখনো শিরক। দ্বীনের মধ্যে বিদাতের কোনো প্রকার নেই। হাসানাহ সাযিয়াহ সবই বিদ'আত। রাসুল (সাঃ) দুটি কবরে খেজুরের ডাল পুতে দিয়েছিলেন সেটা ছিল রাসুল (সাঃ) এর সাথে খাস বা আলাদা। এটা রাসুল (সাঃ) এর মোজেজা আল্লাহর পক্ষ থেকে। ওই দিন ব্যতীত রাসুল (সাঃ) পরবর্তিতে অন্য কোনো দিন এই কাজ করেন নি। সাহাবী গণ কেউ কোনদিন কোনো কবরে এভাবে ডাল পুতে দেন নি। ওই ডালের যুক্তিতে এখন ফুল দেওয়া হয় এবং ইসলামিক স্কলারগণ একে বিদাত সাবস্ত করেছেন। সাধারণভাবে কবরে ফুল দেওয়া তাই বিদ'আত। এখন কেউ যদি সম্মান করে কবরে ফুল ফেয় তাহলে তা হয়ে যাবে শিরক। কেউ যদি কবরে টাকা দেয় যে এই কবরের আওলিয়া বুঝি উপকার করবে আমার জন্য দুআ করবে তাহলে তা হবে শিরক। বড় শিরক।

ষোল তম পরিচ্ছেদ - কবর পাকা করা

পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে কবর পাকা করা, চুনকাম করা, কবর উঁচু করার প্রবনতা দেখা যায়। বিশেষ করে আমাদের দেশ বাংলাদেশ,

ভারত ও পাকিস্তানে এ ধরনের কর্মকান্ড খুবই বেশী। প্রতিনিয়ত তা বেড়েই চলছে। মানুষের ধারণা হল এ সমস্ত কাজ শরীয়ত সম্মত এবং এতে ছোয়াব রয়েছে। তাই দেখা যায় করবস্থানে, রাস্তার আশে-পাশে, চৌরাস্তায় ও বটগাছ তলায় কবর পাকা করে, চুনকাম করে, তাতে উন্নত নেমপ্লেট ব্যবহার করে মৃত্যু ব্যক্তির জন্ম, মৃত্যু তারিখ ও বিভিন্ন বানী লিখে রাখা হয়। এ জাতীয় সকল কাজ শরীয়ত বিরোধী। শরীয়তে এর হুকুম হল বিদ'আত। কারণ এ গুলো করার পিছনে ইসলামী শরীয়তে কোন দলীল নেই, বরং এ গুলো থেকে দূরে থাকার ব্যাপারে শরীয়ত কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। বিশিষ্ট সাহাবী জাবের (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন,

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُحْصَصَ الْقَبْرُ وَأَنْ يُقَعَّدَ عَلَيْهِ وَأَنْ يُنْبَى عَلَيْهِ.

“রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কবরে চুন কাম করা, তার উপর বসা এবং তার উপর বিল্ডিং নির্মাণ করতে নিষেধ করেছেন। (মুসলিম)। এ হাদীস দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণ হল যে, কবরে প্লাস্টার লাগানো, চুন কাম করা, পাকা করা, কবরের উপর বিল্ডিং ও গম্বুজ নির্মাণ করা কঠোর ভাবে নিষেধ। তারা বলে থাকেন আমরা সৌন্দর্য প্রকাশ ও কবরকে হেফাযতের জন্য এ গুলো করে থাকি। জেনে রাখুন সৌন্দর্য প্রকাশের জন্য হোক, মানুষকে আকৃষ্ট করার জন্য হোক কিংবা হেফাযতের জন্য হোক, তা শরীয়তে জঘন্যতম বিদ'আত। এ গুলো করার পিছনে কোন দলীল নেই। বর্তমান কালে অধিকাংশ মুসলিম সমাজ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে চলছে। রাসূল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়া সালাম যা নিষেধ করেছেন, তারা তাতেই লিপ্ত হয়েছে। এতে করে তারা বড় শিক্কে লিপ্ত হয়েছে। কবরে উপর নির্মাণ করছে মাসজিদ ও গম্বুজ। কবরকে পরিণত করছে মাযারে ও যিয়ারতের স্থানে। সেখানে তারা পশু যবেহ করা ও কবর বাসীর কাছে চাওয়া-পাওয়া, নযর-নেওয়াজ ইত্যাদি সকল প্রকার ইবাদতে লিপ্ত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লাম এর যুগে বদর, উহুদ, খন্দক, তাবুক যুদ্ধ ছাড়াও যে সকল সাহাবী শহীদ হয়েছেন অথবা মৃত্যু বরণ করেছেন তাঁদের কারও কবর উচু করা হয় নাই। তাঁদের কারও কবর পাকা ও চুনকামও করা হয়নি এবং তাতে নামও লিখা হয়নি। তাঁদের কারও কবর মোজাইক অথবা পাথর দ্বারা বাঁধানো হয়নি বরং এ সকল কাজ যেমন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিষেধ করেছেন, তাঁর পরে স্বর্ণ যুগের খোলাফায়ে রাশেদীন গণও কঠোর হস্তে দমন করেছেন। এর একটি উজ্জল উদাহরণ হল, প্রখ্যাত তাবেয়ী আবুল হাইয়াজ আল আসাদী বলেন, আমাকে আলী (রাঃ) বললেনঃ

أَلَا أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي لَا تَدَعُ تَمَثَّلًا
إِلَّا طَمَسْتُهُ وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتُ

“তোমাকে কি আমি এমন একটি কাজ দিয়ে পাঠাবো না যে কাজ দিয়ে আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পাঠিয়েছিলেন? তা হল কোন প্রতিকৃতি ও মূর্তি পেলে তাকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে ফেলবে, আর কোন উচু কবর পরিলক্ষিত হলে তা সাধারণ কবরের সমপরিমান করে দিবে।” (মুসলিম)

আকীদাগত ক্ষতিঃ আমরা যদি দৃষ্টি নিক্ষেপ করি তবে দেখতে পাব এসব উচু উচু কবরের কারণে অধিকাংশ লোকের আকীদাহ বিপন্ন হতে চলছে। দেখুন আমাদের দেশে বিভিন্ন এলাকাতে কবর উচু করা হয়েছে, তাতে মূল্যবান মোজাইক পাথর দ্বারা সৌন্দর্যমন্ডিত করা হয়েছে, সুন্দরভাবে বাঁধাই করা হয়েছে, বিভিন্ন রংবেরং এর বাতিও লটকানো হয়েছে। যা ইসলামী শরীয়ত আদৌ সমর্থন করে না। এসব কবরের কাছে নারী-পুরুষের আড্ডা বসে, তারা সেখানে কবরকে সামনে করে দীর্ঘ সময় তসবীহ জপে, কান্না-কাটি করে, আর্জি পেশ করে, মনের কাকুতি-মিনতি নিয়ে সকল সমস্যার কথা তুলে ধরে, আবার মাঝে মাঝে সেজদায় লুটিয়ে পড়ে। অথচ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কবরের কাছে বা কবরের দিকে মুখ করে নামায আদায় করতে নিষেধ করেছেন। মুসলমানরা তাঁর নিষেধ অমান্য করে কবরকে নামাযের স্থানে পরিণত করেছে। তিনি কবরকে মাসজিদ বানাতে নিষেধ করেছেন। তারা তাকে মাসজিদ বানিয়েছে। তিনি কবরে বাতি জ্বালাতে নিষেধ করেছেন। তারা বাতি জ্বালিয়ে প্রচুর অর্থ অপচয় করছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কবরের পাশে ওরশ-উৎসব করতে নিষেধ করেছেন এরা প্রতি বছর ঈদের মত ধুমধামের সাথে ওরশ অনুষ্ঠান পালন করে চলছে। কখন কখনও আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন হওয়ার পরিবর্তে আল্লাহর যিকির-আযকারের ন্যায় যিকর করে। অনেক সূফী বিদআতী ভন্ড মুরীদরা নামায বাদ দিয়ে সেখানে সময় অতিবাহিত করে। আবার নামায পড়া অবস্থায় পীরের ধ্যান করে থাকে। আরও দেখা যায় এ

ধরণের কবর যা রাস্তার পার্শ্বে অবস্থিত সেখান দিয়ে পথচারী পথ চলার সময় বিদআতী নিয়মে সালাম করে এবং বুয়ুর্গের অধিক তা'যিমের জন্য কবরে চুমু খায়, কবরের মাটি গায়ে মাখে, কখনও তওয়াফ করে, সাথে সাথে কিছু অর্থও দান করে যায়। অথচ দান করা, নযর-মানত করা, প্রার্থনা করা, দুআ করা, সেজদাহ করা, যিকির করা, আর্জি পেশ করা ইত্যাদি সকল কিছু হতে হবে একমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্যে। এ সম্পর্কে কুরআনে ও হাদীসে যথেষ্ট আলোচনা করা হয়েছে, যাতে রয়েছে মানব জীবনের পূর্ণ দিক নির্দেশনা। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

قُلْ إِنْ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

“আপনি বলুন, নিশ্চয় আমার নামায, আমার হজ্ব ও কুরবানী, আমার জীবন-মরণ একমাত্র মহান আল্লাহর জন্য যিনি জগত সমূহের প্রতিপালক।” (সূরা আনআমঃ ১৬২)। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ

إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ

“কোন কিছু চাওয়ার হলে আল্লাহর কাছে চাইবে এবং সাহায্য চাইলে একমাত্র তাঁর কাছেই সাহায্য চাইবে।” (তিরমিযী)

সুপ্রিয় পাঠক বন্ধুগণ! কবরের ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি বলেছেন? আর এরা করছে কি? এরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নতের সম্পূর্ণ বিপরীত পথে চলছে। তাদের বিদআতী কাজ-কর্মের বর্ণনা দিয়ে শেষ করা যাবে না।

আরও লক্ষ্য করুন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে কেন কবর যিয়ারত করতে বলেছেন? আমাদেরকে কবর যিয়ারত করতে বলেছেন যাতে আমাদেরকে আখেরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় এবং যাতে কবরবাসীর পাশে গিয়ে কবরবাসীর জন্য দুআ করি, তাদের জন্য আল্লাহর রহমত ও ক্ষমা প্রার্থনা করতে পারি। আর বর্তমান যুগের মুসলমানেরা কবর যিয়ারতের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সম্পূর্ণ পাল্টিয়ে ফেলেছে। তাদের উদ্দেশ্য হল সেখানে গিয়ে শির্কে লিপ্ত হওয়া। কবরবাসীর কাছে দুআ করা। সমস্যার কথা তুলে ধরা। তার উসিলা দিয়ে আল্লাহর কাছে দুআ করা, প্রয়োজন পূরণের আবেদন করা ইত্যাদি। এ ধরনের শিরক ও বিদ'আত কোথা থেকে চালু হয়েছে? এ ধরনের শিরক ও জঘন্যতম বিদ'আত চালু হয়েছে ইহুদী-খ্রীষ্টানদের দ্বারা। এগুলো হল ইহুদী-খ্রীষ্টানদের রীতি। খ্রীষ্টানরা ঈসা ও মরিয়ম এবং ক্রশের পূজা করে থাকে। ইউরোপীয়ান, আমেরিকান এবং রাশিয়ানরা তাদের নেতাদের প্রতিমূর্তির পূজা করে এবং তাদের সম্মানার্থে তাদের সামনে মাথা নত করে। আর তাদের অনুকরণে অনেক মুসলিম উক্ত শিরক ও বিদআতে লিপ্ত হয়েছে। যা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়। ইসলাম পূর্ব লোকেরা তাদের নবীদের কবরকে মাসজিদ বানিয়ে নিয়ে সেখানে ইবাদত করত। এ কথা হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পরিস্কার ভাবে বলে দিয়েছেনঃ

أَلَا وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ ۖ
فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ ۚ إِنِّي أَنهَاكُمُ عَنْ ذَلِكَ

“জেনে রাখা উচিৎ যে, তোমাদের পূর্বের লোকেরা তাদের নবীদের কবরসমূহকে মাসজিদে পরিণত করত। সাবধান! তোমরা কবরগুলোকে মাসজিদে পরিণত কর না। আমি তোমাদেরকে তা থেকে নিষেধ করছি।” (মুসলিম)

কবরকে মাসজিদে পরিণত করার অর্থ হল কবরের কাছে নামায আদায় করা। যদিও তার উপর মাসজিদ নির্মাণ করা হয়নি। মূলতঃ নামাযের জন্য কোন স্থানে গমন করাই উক্ত স্থানকে মাসজিদে রূপান্তরিত করার শামিল।

রাসূল সাল্লাল্লাহু ইহুদী-খ্রীষ্টানদের প্রতি লা'নত করেছেন, কেননা তারা তাদের নবীদের কবরকে মাসজিদ বানিয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কবর কি উঁচু করা হয়েছে? এর উত্তর হল, না। অর্থাৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কবর উঁচু করা হয় নি। তার কবর বাঁধানোও হয়নি, তার কবরকে মাযারও বানানোও হয়নি, কোন খানকাতে পরিণত করা হয়নি, তাতে কোন প্রকার বাতিও জ্বালানো হয়নি। বর্তমানে কোন কোন এলাকাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কবরের উঁচু ছবি পরিলক্ষিত হয়, যা দেখতে মাযারের মত তা মোটেই ঠিক নয়। এ ধরনের ছবি বানোয়াট।

অতএব এ ধরনের জঘন্যতম অপরাধ থেকে আমাদেরকে ফিরে এসে সঠিক পথে চলা দরকার এবং আল্লাহর কাছে খালেছ ভাবে তাওবা করা দরকার। অন্যথায় পরকালে মুক্তির কোন উপায় নেই। আল্লাহ আমাদের মুক্তি দিন।

সতের তম পরিচ্ছেদ - কবর ওয়ালা মসজিদে সালাত/নামাজ পরার হুকুম

কবর সংশ্লিষ্ট মসজিদে নামায আদায় করা দু'ভাগে বিভক্তঃ

প্রথম প্রকারঃ প্রথমে কবর ছিল। পরবর্তীতে তাকে কেন্দ্র করে মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ওয়াজিব হচ্ছে এই মসজিদ পরিত্যাগ করা; বরং মসজিদ ভেঙ্গে ফেলা। যদি না করা হয় তবে মুসলিম শাসকের উপর আবশ্যিক হচ্ছে উক্ত মসজিদ ধ্বংস করে ফেলা।

দ্বিতীয় প্রকারঃ প্রথমে মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে। পরে সেখানে কোন মৃতকে দাফন করা হয়েছে। তখন ওয়াজিব হচ্ছে, কবর খনন করে মৃত ব্যক্তি বা তার হাড়-হাড়ি সেখান থেকে উত্তোলন করে, মুসলমানদের গোরস্থানে দাফন করা। এই মসজিদে শর্ত সাপেক্ষে ছালাত আদায় করা জায়েয। আর তা হচ্ছে, কবর যেন মসজিদের সম্মুখভাগে না হয়। কেননা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কবরের দিকে সালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন। কেউ প্রশ্ন করতে পারে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কবর তো মসজিদের মধ্যে? এর জবাব কি? এর জবাব হচ্ছে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মৃত্যুর পূর্বেই মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে। একথা সবার জানা যে, তাঁকে মসজিদের মধ্যে দাফন করা হয়নি; বরং মসজিদ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা স্থান, তাঁর নিজ গৃহে তাঁকে দাফন করা হয়েছে। কিন্তু পরবর্তীতে ৮৮ হিঃ সনে খলীফা ওয়ালিদ বিন আবদুল মালিক তার অধীনস্থ মদীনার আমীর ওমর

বিন আবদুল আযীযকে পত্র মারফত নির্দেশ প্রদান করেন, মসজিদে নববী ভেঙ্গে পূর্ণঃনির্মাণ করার সময় যেন উম্মুল মু'মেনীন তথা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর স্ত্রীদের গৃহগুলোকে মসজিদের আওতার মধ্যে নিয়ে আসা হয়। তখন ওমর বিন আবদুল আযীয মদীনার নেতৃস্থানীয় লোক এবং ফিক্বাহবিদদেরকে একত্রিত করে তাঁদের সামনে খলীফার পত্র পড়ে শোনান। বিষয়টি তাদের কাছে খুবই কঠিন মনে হয়। তাঁরা বললেন, কবর ও গৃহগুলোকে বর্তমান অবস্থাতেই রেখে দেয়া উচিত। উপদেশ গ্রহণ করার জন্য এটাই সর্বাধিক সঠিক উপায়। বর্ণিত আছে যে, সাঈদ বিন মুসাইয়েব আয়েশা (রাঃ) এর গৃহ তথা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কবরকে মসজিদের মধ্যে শামিল করার ব্যাপারে দৃঢ়ভাবে বাধ্য প্রদান করেন। কেননা তিনি আশংকা করছিলেন যে, এই কবরকে মসজিদে রূপান্তরিত করা হতে পারে। যা হাদীসের ভাষায় নিষিদ্ধ। বিষয়টি ওমর লিখে পাঠালেন খলীফা ওয়ালিদের কাছে। কিন্তু ওয়ালিদ তার নির্দেশই বাস্তবায়ন করার আদেশে অটল রইলেন। ফলে বাধ্য হয়ে ওমর খলীফার নির্দেশ মোতাবেক কবরকে মসজিদের মধ্যে শামিল করে ফেললেন। অতএব আপনি দেখলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কবর মূলতঃ মসজিদের মধ্যে দেয়া হয়নি। আর কবরের উপর মসজিদও বানানো হয়নি। সুতরাং যারা মসজিদে দাফন করা বা কবরের উপর মসজিদ তৈরীর বৈধতার পক্ষে কথা বলে তাদের কোন দলীল নেই। নবী (সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত হয়েছে তিনি বলেন:

لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ

“ইহুদী ও খৃষ্টানদের প্রতি আল্লাহর লা’নত (অভিসম্পাত), তারা তাদের নবীদের কবর সমূহকে মসজিদে রূপান্তরিত করেছে।”

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুমূর্ষু অবস্থায় ইহুদী খৃষ্টানদের কার্যকলাপ থেকে কঠিনভাবে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে উপরোক্ত বাণী পেশ করেন। উম্মে সালামা (রাঃ) হাবশায় হিজরত করে খৃষ্টানদের গীর্জা বা উপাসনালয়ে স্থাপিত বহু মূর্তী দেখেছিলেন। বিষয়টি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর কাছে উল্লেখ করলে তিনি বলেন:

أُولَئِكَ قَوْمٌ إِذَا مَاتَ فِيهِمُ الْعَبْدُ الصَّالِحُ أَوْ الرَّجُلُ الصَّالِحُ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّوَرِ أُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ

“ওরা এমন জাতি, তাদের মধ্যে কোন নেক বান্দা বা সৎলোক মৃত্যু বরণ করলে তার কবরের উপর তারা মসজিদ তৈরী করত এবং ঐ মূর্তিগুলো স্থাপন করত। ওরা আল্লাহর কাছে সৃষ্টির মধ্যে সর্বনিকৃষ্ট।” আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, “সর্বাধিক নিকৃষ্ট লোক হচ্ছে তারা, যাদের জীবদ্দশায় ক্রিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে। আর যারা কবর সমূহকে মসজিদে রূপান্তরিত করেছে।” ইমাম আহমাদ উত্তম সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেন। অতএব মু’মিন কখনই ইহুদী-

খৃষ্টানদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে সন্তুষ্ট হবে না এবং সৃষ্টি কুলের মধ্যে সর্বনিকৃষ্ট হবে না।

আঠার তম পরিচ্ছেদ - কুলখানি বা চল্লিশা পালন

মানুষ মারা যাওয়ার কুলখানি বা চল্লিশা পালন করা বিদআত। পরে মৃতের কুলখানি বা চল্লিশা উপলক্ষ্যে খানার আয়োজন করা অথবা চল্লিশদিন পর্যন্ত প্রত্যেক বৃহস্পতিবার শোক পালন করা, মৃত্যুর পর প্রথম ঈদকে বিশেষভাবে শোকদিবস হিসেবে পালন করা, সে দিন কুরআনের হাফেয বা কারী সাহেবদের ডেকে কুরআন পড়ানো এবং শোক পালনের জন্য লোকজন একত্রিত করা ইত্যাদি সবই বিদআত এবং হারাম। ইমাম আহমদ বিন হাম্বল এবং ইমাম ইব্ন মাজাহ (রহঃ) সহীহ সনদে আব্দুল্লাহ আল বাজালী (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন “আমরা মৃত্যুবরণকারী সাহাবীগনের কাফন-দাফন সম্পন্ন করে মৃতের বাড়ীতে একত্রিত হওয়া এবং তাদের পক্ষ থেকে খাবারের আয়োজন করাকে ‘নাওহা’ এর মতই মনে করতাম।”

ইমাম আহমদ বলেন, “এটি একটি জাহেলী কাজ।” নাওহা অর্থঃ কারো মৃত্যুতে চিৎকার করে কান্নাকাটি করা, শরীরে আঘাত করা, চুল ছেড়া, জামা-কাপড় ছেড়া ... ইত্যাদি। ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলেন, শোক পালনের জন্য মজলিস করা অপছন্দীয় কাজ। এমনকি ইমাম আওয়ামীও অনুরূপ বলেছেন⁴⁵² অতএব, চল্লিশা পালন

⁴⁵² মৃত ব্যক্তির নিকট কুরআন পাঠের সওয়াব পৌঁছে কি? - সম্পাদনায়ঃ খলীলুর রহমান বিন ফযলুর রহমান (রহঃ), পৃষ্ঠা নং - ৩৮

কুরআন ও সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমানিত নয়। তাই এসব কাজ করা ইসলামে হারাম।

উনিশ তম পরিচ্ছেদ - মৃত্যুবার্ষিকী পালন করা

আমাদের সমাজে যেমন জন্ম-দিবস পালনের রেওয়াজ আছে তেমনি আছে মৃত্যু দিবস পালনের প্রথাও। এ প্রথাটি সম্পূর্ণ বিধর্মীদের। ইসলাম বা মুসলমানদের আচার নয়। দুর্ভাগ্যজনক সত্য হল, মুসলিমগণ কাফেরদের অনুসরণ করে তাদের এ প্রথা মত আমল করে যাচ্ছে। যদি এটাকে ধর্মীয় আচার মনে করে করা হয় তবে তা বিদ'আত হিসেবে একটা গুনাহের কাজ বলে পরিগণিত হবে। আর যদি সমাজে প্রচলিত প্রথা হিসেবে করা হয় তবে তা অমুসলিমদের অনুসরণ-অনুকরণের দোষে দুষিত হবে, যা নিঃসন্দেহে একটি মারাত্মক অপরাধ ও নিষিদ্ধকর্ম। অথচ আজকে আমাদের সমাজে পিতা-মাতা, দাদা-দাদী সন্তান-সন্ততি ইত্যাদির মৃত বার্ষিকী অত্যন্ত জমজমাট ভাবে পালন করা হয়ে থাকে। সেখানে অনেক টাকা-পয়সা খরচ করে বিশাল খাবার-দাবারের আয়োজন করা হয়। যদিও গরীব শ্রেণীর চেয়ে অর্থশালীদের মধ্যে এটা পালন করার ব্যাপারটি বেশি চোখে পড়ে কিন্তু আমরা কজনে জানি বা জানার চেষ্টা করি যে, মৃত্যুবার্ষিকী কিংবা কারো মৃত্যু উপলক্ষ্যে শোক দিবস পালন পালন করা জঘন্যতম বিদ'আত? অথচ ইসলামের দৃষ্টিতে এ উপলক্ষ্যে শামিয়ানা টাঙ্গানো, ঘর-বাড়ী সাজানো, আলোকসজ্জা করা এবং কুরআন তেলাওয়াত বা বিভিন্ন তাসবীহ-ওয়ীফা ইত্যাদি পাঠ করে সেগুলোর সাওয়াব মৃতব্যক্তির রুহের উদ্দেশ্যে বখশানো

বিদ্বাত। আব্দুল্লাহ ইব্ন উমর (রাঃ) বলেন, মৃত ব্যক্তিকে ছায়া দিতে পারে কেবল তার আমল; তাঁবু টানিয়ে ছায়া দেয়া সম্ভব নয়। ৮

বিশ তম পরিচ্ছেদ - রুহের মাগফেরাতের উদ্দেশ্যে ফাতিহা পাঠের বিদআত

নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং খেলাফয়ে রাশেদীনের রুহের প্রতি ঈসালে সাওয়াবের উদ্দেশ্যে ফরয নামাযের পর এই বিশ্বাস সহকারে সূরা ফাতিহা পড়া বিদ্বাত যে, এ সকল পবিত্র রুহসমূহের উদ্দেশ্যে সূরা ফাতিহা পড়লে তাঁরা মৃত্যুর পর গোসল দেয়ার সময় এবং কবরে সাওয়াব-জওয়াবের সময় উপস্থিত থাকবেন। আফসোস! এটা কত বড় মূর্খতা এবং গোমরাহী! এসব কথার না আছে ভিত্তি; না আছে দলীল। এদের বিবেক দেখে বড় করুণা হয়। অনুরূপভাবে, কোথাও কোথাও নামাযের শেষে দু'আ শেষ করে করে মৃতের ফাতিহা পাঠের রেওয়াজ দেখা যায়। কোন জায়গায় জুমআর নামায শেষ করে ইমাম হুসাইন (রাঃ) এর উদ্দেশ্যে ফাতিহা পাঠের নিয়ম চালু রয়েছে। এসবই বিদআত। অনুরূপভাবে কোন কবর বা মাযারের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় কেবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে যাওয়া এবং হাত উঠিয়ে কবর বা মাযারে মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে ফাতিহা পাঠ করা, আবার সে মৃত ব্যক্তির নিকটে ফরিয়াদ করা বা তার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা, মৃত মানুষের দাফন শেষে গোরস্থান থেকে ফিরে আসার সময় চল্লিশ কদম দূরে দাঁড়িয়ে ফাতিহা পাঠ করা এবং সাধারণ মৃত মুসলমানদের রুহের উদ্দেশ্যে সাওয়াব রেসানীর উদ্দেশ্যে ফাতিহা

পড়া শুধু মূর্থতাই নয় বরং বিদ্‌আত। অতএব, বিশুদ্ধ হাদীস থেকে প্রমাণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবর যিয়ারত করতেন এবং কিছু বাক্য দ্বারা তিনি কবরবাসীদের জন্য দু'আ করতেন যা তিনি সাহাবাদের শিখিয়েছেন, তারাও তার থেকে শিখে নিয়েছে। যেমনঃ

السلام عليكم اهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وانا ان شاء الله بكم لاحقون، نسال الله لنا ولكم العافية

হে কবরবাসী মুমিন ও মুসলমানগণ, তোমাদের উপর সালাম, ইনশাআল্লাহ অতিসত্ত্বর আমরা তোমাদের সাথে মিলিত হবো, আল্লাহর নিকট আমাদের জন্য ও তোমাদের জন্য নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি^{৪৫০}। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবর যিয়ারত করার সময় কুরআন বা তার কোন আয়াত তিলাওয়াত করেছেন এমন প্রমাণিত নয়, অথচ তিনি খুব কবর যিয়ারত করতেন। যদি তা বৈধ হত বা মৃতরা তার দ্বারা উপকৃত হত, তাহলে অবশ্যই তিনি তা করতেন এবং সাহাবাদের নির্দেশ দিতেন বরং নবুওয়তের দায়িত্ব আদায়, উম্মতের প্রতি দয়া ও সাওয়াবের বিবেচিনায় এটা তার কর্তব্য ছিল। কারণ, তার ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেছেনঃ

﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ﴾

“নিশ্চই তোমাদের নিজেদের মধ্য থেকে তোমাদের নিকট একজন রাসূল এসেছেন, তা তার জন্য কষ্টদায়ক যা তোমাদেরকে পীড়া

^{৪৫০} ইবনে মাজাহ : ১৫৩৬

দেয়। তিনি তোমাদের কল্যাণকামী, মুমিনদের প্রতি স্নেহশীল, পরম দয়ালু।”^{৪৫৪} অতএব, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মধ্যে দয়া, উম্মতের কল্যাণ কামনা ও অনুগ্রহ থাকা সত্ত্বেও যেহেতু তিনি তা করেন নি, তাই প্রমাণ করে যে এটা না-জায়েয। সাহাবায়ে কেরাম তাই বুঝেছেন এবং এর উপরই তারা আমল করছেন, আল্লাহ তাদের সকলের উপর সন্তুষ্ট হোন তারা কবর যিয়ারতের সময় মৃতদের জন্য দু‘আ করতেন ও নিজের নসহিত হাসিল করতেন। তারা মৃতদের জন্য কুরআন তিলাওয়াত করেন নি। তাই প্রমাণিত হল যে, কবর যিয়ারতের সময় কুরআন তিলাওয়াত করা পরবর্তীতে আবিষ্কৃত বিদ্বআত।

একুশ তম পরিচ্ছেদ - মৃত ব্যক্তির কাযা বা ছুটে যাওয়া নামাজ সমূহের কাফফারা আদায় করা

সহীহ হাদীসে অনাদায়ী নামাজের জন্য কোন কাফ্ ফারার বিধান নেই। অথচ আমাদের সমাজে দেখা যায় যে, কোন ব্যক্তির কিছু ওয়াস্ত বা কিছুদিনের জন্য নামাজ কাযা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে ঐ ব্যক্তির পাপ মুক্তির জন্য ইমাম সাহেব মৃত ব্যক্তির ওয়ারিগণের উপর একটা টাকার পরিমাণ ধরে যা শরীয়ত অনুযায়ী ঠিক নয় এবং প্রচলিত নিয়ম বিদ‘আত ছাড়া আর কিছুই নয়। তাই এসব বিদ‘আত পরিত্যাজ্য। তাছাড়া শুধু মৃত মানুষের ক্ষেত্রেই নয় জীবিত মানুষের মধ্যেও নামাজের বিষয়ে প্রচুর বিদ‘আত পরিলক্ষিত হয়। তাই এ ক্ষেত্রে বলা যায় যে, ছুটে যাওয়া কাযা নামাজ সমূহ প্রথমে

^{৪৫৪} সূরা তওবা: ১২৮

আদায় করবে। তারপর বর্তমান সময়ের নামায আদায় করবে। দেরী করা ঠিক হবে না। মানুষের মধ্যে একটি ধারণা প্রচলিত বিদ্বাতী প্রথা আছে যে, কারো যদি একাধিক ফরয নামায ছুটে গিয়ে থাকে, তবে ঐ নামাযের সময় উপস্থিত হলে তার কাযা আদায় করবে। আজ কারো ফজর নামায ছুটে গেছে। সে উক্ত নামায পরবর্তী দিন ফজরের সময়ে কাযা আদায় করবে। এটা মারাত্মক ভুল এবং নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বাণী ও কর্মের বিরোধী। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বাণীঃ

مَنْ نَسِيَ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا

“যে ব্যক্তি সালাত আদায় না করে ঘুমিয়ে পড়ে অথবা ভুলে যায়, সে যেন ইহা আদায় করে যখনই স্মরণ হবে।” এখানে এরূপ বলা হয়নি, দ্বিতীয় দিন ইহা আদায় করে নিবে। খন্দক যুদ্ধের সময় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কয়েকটি নামায ছুটে যায়। তখন তিনি বর্তমান সময়ের নামাযের আগেই উক্ত নামাযগুলোর কাযা আদায় করেন। অতএব ছুটে যাওয়া নামাযের কাযা প্রথমে আদায় করবে তারপর বর্তমান সময়ের নামায আদায় করবে। কিন্তু যদি ভুলক্রমে বা অজ্ঞতা বশতঃ কাযা নামাযের আগে বর্তমান সময়ের নামায আদায় করে ফেলে তবে তা বিশুদ্ধ হবে। কেননা এটা তার ওযর। উল্লেখ্য যে, কাযা নামায সমূহ তিন ভাগে বিভক্তঃ প্রথম প্রকারঃ দেরী করার ওযর দূর হয়ে গেলেই কাযা আদায় করে নিবে। তা হচ্ছে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের ক্ষেত্রে। অনুরূপভাবে বিতর ও সুন্নাত নামায সমূহ। দ্বিতীয় প্রকারঃ যার পরিবর্তে অন্য নামায কাযা

হিসেবে আদায় করবে। তা হচ্ছে, জুমআর নামায। এ নামায ছুটে গেলে তার পরিবর্তে যোহর নামায আদায় করবে। কেউ যদি জুমআর দিন ইমামের দ্বিতীয় রাকাআতের রুকু থেকে মাথা উঠানোর পর নামাযে शामिल হয়, তবে সে যোহর নামায আদায় করবে। ঐ অবস্থায় যোহরের নিয়ত করে ইমামের সাথে নামাযে शामिल হবে। অনুরূপভাবে কেউ যদি ইমামের সালামের পর আসে তবে সেও যোহর পড়বে। তবে কেউ যদি দ্বিতীয় রাকাআতে ইমামের সাথে রুকু পায়, তবে সে জুমআর নামাযই আদায় করবে। অর্থাৎ ইমাম সালাম ফিরালে এক রাকাআত আদায় করবে। অনেক লোক ইমামের দ্বিতীয় রাকাআতের রুকু থেকে মাথা উঠানোর পর জুমআর নামাযে शामिल হয়। অতঃপর সালাম শেষে জুমআর নামায হিসেবে দু'রাকাআত নামায আদায় করে। এটা ভুল। বরং তার জন্য উচিত হচ্ছে ইমামের সালাম ফেরানোর পর যোহর হিসেবে চার রাকাআত নামায আদায় করা। কেননা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

مَنْ أَذْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَذْرَكَ الصَّلَاةَ

“যে ব্যক্তি নামাযের এক রাকআত পেয়ে গেল, সে পূর্ণ সালাত পেয়ে গেল।” এদ্বারা বুঝা যায় কেউ যদি এর কম পায় সে নামায পেল না। তখন জুমআর কাযা আদায় করবে যোহর নামায আদায় করার মাধ্যমে।

এই কারণে নারীরা বাড়িতে, মসজিদে আসতে অপারগ অসুস্থ ব্যক্তির যোহর নামায আদায় করবে। তারা জুমআ আদায় করবে

না। তারা যদি জুমআ আদায়ও করে, তাদের নামায প্রত্যাখ্যাত হবে- বাতিল বলে গণ্য হবে।

তৃতীয় প্রকারঃ এমন নামায যা ছুটে যাওয়া সময়েই কাযা আদায় করতে হবে। আর তা হচ্ছে ঈদের নামায। ঈদের দিন সম্পর্কে জানা গেল না। কিন্তু সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে যাওয়া পর জানা গেল যে আজকে ঈদের দিন ছিল। এক্ষেত্রে বিদ্বানগণ বলেন, পরবর্তী দিন সকাল বেলা উক্ত ঈদের নামাযের কাযা আদায় করতে হবে। কেননা ঈদের নামায আদায় করার সময় হচ্ছে সকাল বেলা।

বাইশ তম পরিচ্ছেদ - কবরে মান্নত পেশ, পশু যবেহ এবং খতমে কুরআনের বিদ'আত

মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে কবরে খতমে কুরআন আয়োজন করা, পশু যবেহ করে কুরআনখানী বা মৃত্যুবার্ষিকীতে অংশ গ্রহণকারীদেরকে খানা খাওয়ানো এবং কবরে টাকা-পয়সা মান্নত হিসেবে পেশ করা জঘন্যতম বিদ'আত। এসব কাজের সাথে যদি বিশ্বাস করা হয় যে, কবরবাসীরা এগুলোতে খুশি হয়ে আমাদের উপকার করবে, আমাদেরকে ক্ষয়-ক্ষতি এবং বিপদাপদ থেকে রক্ষা করবে এবং যদি বিশ্বাস করা হয় যে, তারা এ হাদিয়া-তোহফা দিলে কবুল করেন তবে তা শুধু বিদ'আতই নয় বরং বরং শির্ক। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ ধরনের ক্রিয়াকলাপকে লানত করেছেনঃ

(لَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ)

“যে ব্যক্তি গাইরুল্লাহর উদ্দেশ্যে পশু যবেহ করে তার প্রতি আল্লাহর অভিশম্পাত।” (মুসলিম, অধ্যায়ঃ গাইরুল্লাহর উদ্দেশ্যে পশু জবেহ

করা হারাম)। মান্নত একটি ইবাদত। আর গাইরুল্লাহর জন্য ইবাদত করা শির্ক। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ “এক ব্যক্তি একটি ছোট মাছির জন্য জান্নাতে গেছে এবং অন্য একজন জাহান্নামে গেছে। সাহাবীগণ কারণ, জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, পূর্ববর্তী উম্মতের দু জন লোক সফরকালে এমন এক জায়গা দিয়ে যাচ্ছিল যেখানে ছিল একটি মূর্তি। মূর্তির সেবকগণ এ দু জন লোককে কোন কিছু মূর্তির উদ্দেশ্যে কোন কিছু উৎসর্গ করতে আদেশ করল। এমনকি হুমকি দিয়ে বলল, “অবশ্যই কিছু না কিছু উৎসর্গ করতে হবে। কমপক্ষে একটি মাছি হলেও মূর্তির উদ্দেশ্যে দিতে হবে। অন্যথায় তোমাদেরকে হত্যা করা হবে।” কোন উপায় না পেয়ে হয়ে দু জনের মধ্যে একজন একটি মাছি ধরে মূর্তির মন্ডপে নিক্ষেপ করল। যার ফলে সে জাহান্নামে স্থান করে নিল। আরেকজন কোন কিছু দিতে অস্বীকার করল। ফলে তাকে হত্যা করা হল এবং সে জান্নাতবাসী হয়ে গেল। (সহীহ মুসলিম)

তেইশ তম পরিচ্ছেদ - কবরের কাছে বা মাযাবে, পথের ধারে কুরআন পাঠ

কবরের কাছে বা মাযার, পথের ধারে বা লোক সমাগম হয় এমন কোন স্থানে কুরআন তেলাওয়াত করে ভিক্ষা করা বিদ্বাত এবং হারাম। আবার দেখা যায় যে, কবরের কাছে বা মাযারে, পথের ধারে কেউ সূরা ইয়াসীন পড়েন, কেউ পড়েন সূরা তাকাসুর। কেউ সূরা ফাতেহা পড়েন। আবার কেউ তিন বার সূরা ইখলাস পড়ে তার

সওয়াব মৃত ব্যক্তির জন্য পাঠিয়ে দেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জীবনে বহু বার কবর যিয়ারত করেছেন। তিনি কখনো কোন কবরের কাছে গিয়ে সূরা ফাতেহা, কুরআন থেকে কোন সূরা বা কোন আয়াত পাঠ করেননি। কুরআনের ফযীলত তার সঠিক ব্যবহার সম্পর্কে সকলের চেয়ে বেশি অবগত ছিলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। কবরের কাছে কুরআন তিলাওয়াত সম্পর্কে ইমামদের তিনটি মত পাওয়া যায়।

এক. না-জায়েয ও বিদ'আত। ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) ইমাম মালেক (রহঃ) ও ইমাম আহমদ (রহঃ) এ মত পোষণ করতেন।

দুই. জায়েযঃ ইমাম মুহাম্মাদ বিন হাসান এ মত পোষণ করতেন।

তিন. শুধু দাফনকালে কবরের কাছে কুরআন তিলাওয়াত জায়েয। ইমাম শাফিয়ী (রহঃ) এ মত পোষণ করেন এবং ইমাম আহমদ থেকে একটি বর্ণনা পাওয়া যায়। ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দু ব্যক্তির কবরে খেজুর ডাল গেড়ে দিয়েছিলেন এ জন্য যে খেজুর ডাল যতক্ষণ তাজা থাকবে ততক্ষণ জিকির করবে ফলে কবরে আযাব হবে না। যদি খেজুর ডালের জিকিরের কারণে কবর আযাব বন্ধ হয় তাহলে কুরআন তিলাওয়াত করলে কবরের আযাব বন্ধ হবে না কেন? তাই কবরের কাছে কুরআন তিলাওয়াত করা যেতে পারে। কিন্তু তার এ মত অনুমান নির্ভর মাত্র। এর সমর্থনে অনুমান ছাড়া অন্য কোন প্রমাণ নেই। কেননা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরআন তিলাওয়াতের প্রতি অধিক যত্নবান ছিলেন। তবে এ দু

কবরের কাছে কুরআন তিলাওয়াত করেননি। মুজতাহিদ ইমামদের মতামত যা-ই হোক, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বা তার সাহাবাদের থেকে যা অনুমোদিত নয়, তা শরীয়ত সম্মত বলে স্বীকৃতি পাবে না কখনো। ইমামদের মতামত হল ব্যক্তিগত ইজতিহাদ। এ ইজতিহাদে ভুল করলেও তারা সওয়াব পাবেন আল্লাহর কাছে। কোন কবরের কাছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বা তাঁর সাহাবাদের কেউ কুরআন থেকে কোন কিছুই পাঠ করেন নি - না সূরা ফাতেহা না সূরা ইখলাস বা সূরা তাকাসুর। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কবর যিয়ারতকালে কবরবাসীকে সালাম দিয়েছেন ও তাদের জন্য দুআ করেছেন। বহু হাদীসে কীভাবে তিনি সালাম দিয়েছেন ও দুআ করেছেন - তার বর্ণনা এসেছে। যেমন তিনি কবর যিয়ারত কালে বলতেন -

السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. (رواه مسلم)

হে মুমিন মুসলিম কবরবাসী! তোমাদের উপর শানি-বর্ষিত হোক। আল্লাহর ইচ্ছায় আমরা তোমাদের সাথে মিলিত হব। আল্লাহর কাছে আমাদের ও তোমাদের জন্য সুখ ও শানি- প্রার্থনা করছি। যাই হোক, যেহেতু মহাগ্রন্থ কুরআনকে ভিক্ষার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা অত্যন্ত নিকৃষ্ট কাজ তাই এর মাধ্যমে আল্লাহর কালামকে অপমান করা হয়। ইসলাম সাধারণভাবে ভিক্ষাবৃত্তিকেই তো নিন্দা করেছে আবার কুরআনকে মাধ্যম ধরে ভিক্ষা করা?! এটা শুধু হারামই নয় বরং কঠিন গুনাহের কাজ। এভাবে অসংখ্য বিদ'আত আমাদের সমাজে জেঁকে বসে আছে যেগুলোর প্রতিবাদ

করতে গেলেও হয়ত প্রতিবাদকারীকে উল্টো বিদআতী উপাধী নিয়ে ফিরে আসতে হবে। তবে বর্তমানে জ্ঞান চর্চার অবাধ সুযোগে আমাদের নতুন প্রজন্ম, যুব সমাজ, তরুণ আলেম সমাজ সবাই যদি উন্মুক্ত হৃদয়ে দ্বীনে ইসলামের বুক থেকে বিদআতের পাথরকে সরানোর জন্য তৎপর হয় তবে অদূর ভবিষ্যতে ইসলাম তার আগের মহিমায় ভাস্বর হবে। ইসলামের প্রকৃত সৌন্দর্য্যে ভরে উঠবে আমাদের সপ্নিল বসুন্ধরা। আল্লাহ আমাদের সাহায্য করুন।

চব্বিশ তম পরিচ্ছেদ - সুফী তরীকা এবং তাদের সাথে অংশগ্রহণ

সুফীদের রয়েছে বিভিন্ন তরীকা। স্থান ও কাল অনুযায়ী অসংখ্য সুফী তরীকা আত্ম প্রকাশ করার কারণে এর সঠিক সংখ্যা নির্ধারণ করা কঠিন। আমাদের ভারতীয় উপমহাদেশে অসংখ্য সুফী তরীকা আত্মপ্রকাশ করেছে। তার মধ্যে নিম্নের কয়েকটি তরীকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রায়ই সুফী তরীকার পীর ও মুরীদদের মুখে এ সমস্ত তরীকার নাম উচ্চারণ করতে শুনা যায়। এ সমস্ত তরীকা হচ্ছেঃ

১) কাদেরীয়া তরীকাঃ আব্দুল কাদের জিলানীকে (মৃত ৫৬১ হিঃ) এ তরীকার প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে সুফীরা দাবী করে থাকেন। কিন্তু নিরপেক্ষ বিশ্লেষণ ও তার জীবনী অধ্যয়ন করলে জানা যায় যে, তিনি কোন তরীকা প্রতিষ্ঠা করে যান নি। তার নামে যে সমস্ত কারামত বর্ণনা করা হয় তা সম্পূর্ণ বানোয়াট ও ভিত্তিহীন।

২) নকশবন্দীয়া তরীকাঃ মুহাম্মাদ বাহাউদ্দীন নকশবন্দীকে (মৃত ৭৯১ হিঃ) এই তরীকার প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে উল্লেখ করা হয়।

৩) চিশতীয়া তরিকাঃ খাজা মঈন উদ্দীন চিশতীকে (মৃত ৬২০ হিঃ) এ তরীকার প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে উল্লেখ করা হয়। ভারতের আজমীরে তার মাজার রয়েছে। হিন্দু-মুসলিম সকলেই এ মাজার যিরারত করে থাকে।

৪) মুজাদ্দেদীয়া তরিকাঃ মুজাদ্দেদ আলফে ছানীকে (মৃত ১০৩৪ হিঃ) এই তরীকার প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে দাবী করা হয়।

৫) সোহরাওয়ার্দী তরিকাঃ শিহাব উদ্দীন উমার সোহরাওয়ার্দীর (মৃত ৬৩২ হিঃ) নামে এই তরীকাটির নিসবত করা হয়। এই পাঁচটি তরীকার নামই আমাদের দেশের সুফীদের মুখে ব্যাপকভাবে উচ্চারণ করতে শুনা যায়।

সুতরাং, উপরোক্ত তরিকাগুলোর প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, সুফী তরিকাসমূহ যেমনঃ সায়ারি'য়া, তারিকা, মুজাদ্দেদীয়া তরিকা, সোহরাওয়ার্দী তরিকা, কাদেরীয়া তরিকা, নকশবন্দীয়া তরিকা হাকিকা এবং মা'রিফা; এই তরিকাগুলো কি সত্যিই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাহাবাগণ (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) দের শিক্ষা দিয়েছেন? আসুন এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা যাক। উপরোক্ত আলোচনার আলোকে বলা যায় যে, সুফিয়াহ صوفية শব্দটি সুফিয়া سوفيা শব্দ থেকে গৃহীত, গ্রীক ও পুরাতন হিন্দি ভাষায় তার অর্থ আল-হিকমাহ বা 'হিকমত'। এ সুফিয়া শব্দ থেকেই فيلاسوفيا ফাইলাসুফিয়া ও فيلسوف ফাইলাসুফ শব্দদ্বয়ের উৎপত্তি, তার অর্থ محب الحكمة বা হিকমত প্রেমসী বা জ্ঞান প্রেমিক, যেরূপ صوفية ثير (সির সুফিয়াহ) শব্দের অর্থ

ইলাহের সাথে সম্পৃক্ত হিকমত। সূফীবাদ একাল ও সেকালের প্রসিদ্ধ এক মাযহাব। হিন্দুরা সুফিয়াহ শব্দটি ব্রাহ্মন সন্ন্যাসী ও তাদের আধ্যাত্মিক পণ্ডিতদের জন্য ব্যবহার করে, যারা তাদের ধারণাপ্রসূত হিকমত ও মারেফাতের তালাশে বন-জঙ্গলে উলঙ্গ ঘুরে। তাদের লক্ষ্য হচ্ছে আল্লাহর সাথে একাকার হওয়া ও আল্লাহর মাঝে বিলীন হয়ে যাওয়া। অথচ আল্লাহ তাদের বিশেষণ থেকে পবিত্র। হিজরি দ্বিতীয় শতাব্দীর পূর্বে ইসলামে এ পরিভাষা — অর্থাৎ সুফিয়াহ পরিভাষা—শুনা যায় নি, সে সময়ে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন কতক ব্যক্তির জন্য এ শব্দটি ব্যবহার করা হত, যারা নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার সাহাবিদের আদর্শের বিপরীত ইবাদতের ময়দানে বৈরাগ্যতা গ্রহণ করেছিল।

রাবিদের মান নির্ণয়কারী (জারহ ও তাদিলের) আলেমগণ ও বিভিন্ন ফেরকার উপর লেখকগণ তাদেরকে যিন্দিক বলতেন। তাদের কতিপয়ের ইসলামের সাথে বিন্দুমাত্র সম্পর্কে ছিল না। তারা ছিল অখ্যাত, অপরিচিত সন্ন্যাসী, জমিনে ঘুরে বেড়াত এবং গুহা ও জন-মানবহীন স্থানে বাস করত। তৃতীয় ও চতুর্থ শতাব্দীতে সূফীবাদ ব্যাপক বিস্তার লাভ করে, তখনো তার অনুসারীদের যিন্দিক বলা হত, এ জন্য তাদেরকে বহুবার বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়, যাদের বিচার হয় তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, জুনাইদ, নুরী, জুন্নুন মিসরি, আবার তাদের কাউকে হত্যাও করা হয়েছে যেমন হাল্লাজ। পঞ্চম হিজরিতে আবু হামিদ আল-গায়ালির প্রকাশ ঘটে (ম্.৫০৫ হি.), তিনি ইসলামী বিশ্বে সূফীবাদ বিস্তার ও তাকে

ইসলামি পোশাক দান করেন। গায়ালি ছিলেন সুখ্যাতিসম্পন্ন ও প্রসিদ্ধির অধিকারী ফকীহ ও মুতাকাল্লিম বা কালাম শাস্ত্রবিদ। তিনি স্বীয় লেখনীতে ফিকহ, কালামশাস্ত্র ও তার পূর্বের সুফীদের কুসংস্কারের সংমিশ্রণ ঘটান, যেমন মুহাসিবি ও আবু তালিব মক্কী। তার সাথে নিজস্ব মত ও দর্শন যুক্ত করেন, এভাবে তাসাউফ বিস্তার লাভ করে এবং মানুষও তা গ্রহণ করে নেয়। আমরা এই বিষয়ে অবশ্যই আরও বিস্তারিত জেনে নিব যে, আল-সুফিয়াহ (সুফিবাদ) শব্দটি দ্বারা ওলের তৈরি পোশাক পরিধান করাকে (আরবী শব্দ ‘সুফ’ মানে ‘উল’) বুঝায় এবং এছাড়া কিছু নয়।

সুফী শব্দটি صوف (পশম) থেকে উদ্ভূত হয়েছে। কারণ, সুফীরা সহজ সাধারণ জীবন যাপনের অংশ হিসাবে পশমী কাপড় পরিধান করতেন। এ প্রসঙ্গে মোল্লা জামী বলেন, শব্দটি صفاء (পবিত্রতা ও স্বচ্ছতা) থেকে নির্গত হয়েছে। কেননা তারা পূতপবিত্র ও স্বচ্ছ জীবন যাপন করতেন সুফীর সংজ্ঞায় বর্ণিত এই কথাটি ঠিক নয়। কারণ সুফীরা নিজেদেরকে صوفي বলে উল্লেখ করেন।

صفاء শব্দ থেকে সুফীর উৎপত্তি হয়ে থাকলে তারা নিজেদেরকে صفائي সাফায়ী বলতেন। অথচ এই মতবাদে বিশ্বাসী কোন লোক নিজেকে সাফায়ী বলেন না বরং সুফী বলেন। এ থেকে আমরা বুঝতে পারি, সুফী হচ্ছেন ঐ ব্যক্তি, যিনি পশমী ও মোটা কাপড় পরিধান করেন এবং দুনিয়ার ভোগ-বিলাস পরিহার করে সরল সোজা ও সাদামাটা জীবন যাপন করেন। এ প্রসঙ্গে শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ বলেন, ‘আল-সুফিয়াহ’

(সুফিবাদ) শব্দটি দ্বারা ওলের তৈরি পোশাক পরিধান করাকে নির্দেশ করে, এটাই সঠিক অর্থ। বলা হয়ে থাকে, এটি এসেছে ‘সাফওয়াত আল-ফুকাহা’ (ফুকাহাদের মধ্যে বিশিষ্ট) শব্দটি থেকে অথবা ‘সূফা ইবন আদ ইবন তানিয়া’ নামক আরব গোত্র থেকে, যারা তাদের আত্মবিস্মৃতি’র (asceticism) জন্য বিখ্যাত ছিল। আরও বলা হয়ে থাকে এটি এসেছে ‘আহল আল-সুফফা’ (রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সময়কার মদীনার দরিদ্র মুসলিমগণ, যারা মসজিদে থাকতেন) থেকে, অথবা ‘আল-সাফা’ (মক্কার সাফা পর্বত), অথবা ‘আল-সাফওয়া’ (মানে বিশিষ্ট) অথবা ‘আল-সাফ আল-মুরাদ্দাম বায়না ইদায় আল্লাহ’ (আল্লাহর কাছে সম্মানিত দল) নামক শব্দ থেকে। এই সমস্ত মতগুলো হল দইফ বা দুর্বল; যদি এর একটিও সঠিক হতো তাহলে শব্দটি হতো ‘সাফফি’ অথবা ‘সাফা’য়ি’, সুফি নয় (মাজমু আল ফাতাওয়া ১১/১৯৫)। সুফিবাদ তথা তাসাওউফ এই উম্মতের প্রথম তিন প্রজন্মের মধ্যে সৃষ্টি হয়নি, যেই তিন প্রজন্মের প্রশংসা করে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “মানব জাতির শ্রেষ্ঠতম প্রজন্ম হল আমার প্রজন্ম, এরপরে আছে যারা তাদের পরে আসবে, এরপর তাদের পরবর্তী যারা আসবে...” (বুখারী, ২৬৫২, ২৫৩৩)। শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ বলেন, সুফিয়াহ (সুফিবাদ) শব্দটি প্রথম তিন প্রজন্মের নিকট পরিচিত ছিল না, বরং এটি এর পরবর্তীতে আবিষ্কৃত হয়েছে। (মাজমু আল ফাতাওয়া, ১১/৫)। এই তরিকাগুলো সেই নব আবিষ্কৃত পথ (বিদআত) যা কুরআন-সুন্নাহ

এবং শেষ্ঠ প্রজন্মের সালফে সালেহীনদের পথের বিপরীতে যায়। এই তরিকাগুলোর সকল শায়খগণ তাদের নিজস্ব জিকির-আযকার, হিজব (দুয়া'র বই, যা তাদের অনুসারীরা দৈনিক পড়ে) এবং ইবাদতের বিশিষ্ট ধরণ তৈরি করেছে যা দেখে তাদের তরিকাগুলো শনাক্ত করা যায়, এটি শরীয়াতের বিরুদ্ধে যায় এবং উম্মাহকে বিভক্ত করেছে। আল্লাহ এই উম্মাহর দ্বীন কে পূর্ণতা দান করে দয়া করেছেন এবং আমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ পূর্ণ করেছেন। কাজেই, নতুন করে যদি কেউ কোন ইবাদতের পদ্ধতি নিয়ে আসে যা শরীয়াতে নেই তার মানে হল সে আল্লাহ তায়াল্লা যা বলেছেন তাকে প্রত্যাখান করল এবং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি আমানতের খিয়ানতের অভিযোগ করল। উপরন্তু, তাদের এই বিদ'আতের সাথে তারা মিথ্যাবাদীতার দোষেও দুষ্ট, কারণ তারা দাবী করেছে তারা এই তরিকাগুলো রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট হতে গ্রহণ করেছে এবং বলছে যে তারা নাকি খুলাফায়ে রাশেদীনের পথ অনুসরণ করেছে।

স্ট্যান্ডিং কমিটির সম্মানিত আলেমগণের নিকট এই প্রশ্নটি জানতে চাওয়া হয়েছিল; ইসলামে শাখিলইয়াহ, খালওয়াতিয়াহ ইত্যাদি অসংখ্য তরিকাসমূহের ন্যায় কিছু কি রয়েছে? যদি থেকে থাকে, তাহলে তার দলীল-প্রমাণাদি কোথায়? এই আয়াতগুলোর অর্থ কি যেখানে আল্লাহ বলেছেন, “তোমাদেরকে এ নির্দেশ দিয়েছেন, যেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর। নিশ্চিত এটি আমার সরল পথ। অতএব, এ পথে চল এবং অন্যান্য পথে চলো না। তা হলে সেসব পথ তোমাদেরকে তাঁর

পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিবে। তোমাদেরকে এ নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে তোমরা সংযত হও”^{৪৫৫}। “সরল পথ আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছে এবং পথগুলোর মধ্যে কিছু বক্র পথও রয়েছে। তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদের সবাইকে সৎপথে পরিচালিত করতে পারতেন”। [সূরা নাহল ১৬-৯]। সেই পথগুলো কোনটি যা মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়, এবং আল্লাহর পথ কোনটি? আর ইবন মাসউদ বর্ণিত এই হাদীসটির অর্থ কি, যেখানে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি দাগ টেনে বলছেন, “এটিই হেদায়াতের পথ” এরপর এর ডানে বামে অনেকগুলো দাগ টেনে বলেন, “এগুলো অন্যান্য পথ এবং প্রত্যেক পথে একটি করে শয়তান উপস্থিত যে মানুষকে সেই পথের দিকে ডাকছে?”

উত্তরঃ আপনি যে সকল তরিকাসমূহ উল্লেখ করেছেন এ ধরনের কিছু ইসলামে নেই, অথবা এর কাছাকাছিও কিছু নেই। ইসলামে যা আছে তা হচ্ছে আপনি যে দুটি আয়াত এবং হাদীসটি উল্লেখ করেছেন এবং অন্য আরেকটি হাদীস যেখানে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন, “ইহুদীরা একাত্তর ফিরকাহ’য় বিভক্ত হয়েছে এবং খৃষ্টানেরা হয়েছে বাহাত্তর ফিরকাহ’য়। আমার উম্মাহ বিভক্ত হবে তিহাত্তর ফিরকাহ’য়; আর এদের প্রত্যেকটি হবে জাহান্নামী একটি ব্যতীত”। জানতে চাওয়া হল, “তারা কারা, হে আল্লাহর রাসূল?” এবং তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, “আমার উম্মাহর একটি দল সত্যের

^{৪৫৫} সূরা আনআম ৬-১৫৩

অনুসরণ করতে থাকবে এবং বিজয়ী হবে, এবং তাদের যারা অভিশাপ দেয় কিংবা বিরোধিতা করে তারা সেই দলটির কোন ক্ষতি করতে পারবে না, যতক্ষণ না আল্লাহর ফরমান নাযিল হয়...’ সত্য আছে কুর’আন এবং সহীহ হাদীস অনুসরণের মধ্যে। এটাই আল্লাহর পথ, এবং সরল পথ। এটিই ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদীসে বর্ণিত সরল পথ, আর এই পথ অনুসরণ করেছেন সাহাবাগণ (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) এবং তাদের পরবর্তী সালফে সালেহীনগণ, এবং তাদের যারা অনুসরণ করেছেন তাঁরা। অন্য সকল তরিকা বা দল হল আয়াতে উল্লেখিত সেই দল যাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, “... এবং অন্যান্য পথে চলো না। তা হলে সেসব পথ তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিবে...” [আল-আন্বাম ৬-১৫৩] - ফাতাওয়া আল-লাযনাহ আল-দা’ইয়িমাহ ২/২৮৩, ২৮৪। আল্লাহ সবচেয়ে ভালো জানেন। - - শাইখ সালিহ আল মুনায্জিদ তথ্য থেকে সংগ্রহীত।

পাঁচিশ তম পরিচ্ছেদ - অলী আওলিয়াদের অসীলা গ্রহণ:

ইসলামী দৃষ্টিকোণ

বর্তমান সময়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি ইসলাম সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান না থাকার কারণে বা ইসলাম সম্পর্কে উদাসীনতার কারণে ইসলাম ধর্মের নামে অনেক অনাচার, কুসংস্কৃতি, শিরক ও বিদ’আত প্রচলিত আছে ও প্রচলন ঘটছে। এর মধ্যে একটি হল, অলী আওলিয়াদের অসীলা দিয়ে দুআ-প্রার্থনা করা, তাদের কাছে সাহায্য চাওয়া, তারা ভাল-মন্দ কিছু করতে পারে বলে বিশ্বাস রাখা, তাদের

সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যমে আল্লাহর রহমত লাভ করা যাবে বলে বিশ্বাস করা। এ উদ্দেশ্যে তাদের কবর যিয়ারত করা, তাদের কবর তওয়াফ করা, কবরে উরস উৎসব আয়োজন করা ইত্যাদি। অনেক মুসলিম এ সকল কাজ এ ধারনার ভিত্তিতেই করে যে, এই কবরে শায়িত অলী আওলিয়ারা আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হলে আল্লাহর রহমত লাভ করা যাবে। অথবা তাদেরকে অসীলা বা মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করলে আল্লাহ আমাদের উপর সন্তুষ্ট হবেন। তাদেরকে অসীলা হিসাবে গ্রহণ করতে যেয়ে তারা তার মাধ্যমে বা তার নামে বিপদ থেকে মুক্তি কামনা করে আল্লাহর কাছে। অনেকে সরাসরি তাদের কাছেই নিজেদের প্রয়োজন ও অভাব পূরণের জন্য প্রার্থনা করে। বিপদ থেকে উদ্ধার কামনা করে। তারা মনে করে এ ধরনের অসীলা গ্রহণ করতে ইসলামে নিষেধ নয়। বরং এদের অনেকে মনে করে এ ধরনের অসীলা গ্রহণ ইসলামে একটি ভাল কাজ।

ছাব্বিশ তম পরিচ্ছেদ - আসলে অসীলা গ্রহণ কী? এর বৈধতা কতটুকু?

এ বইটিতে আমি এ বিষয়টি নিয়েই আলোচনা করার প্রয়াস পাবো ইনশাআল্লাহ।

সত্যিকার অসীলা হল, আল্লাহ তাআলার আনুগত্য ও রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অনুসরণের মাধ্যমে সৎকর্ম করা আর নিষিদ্ধ ও হারাম কথা-কর্ম থেকে বেঁচে থাকা। আর নেক আমল সম্পাদন করার মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করা হল সত্যিকার অসীলা। তা ছাড়া আল্লাহর সুন্দর নামসমূহ ও গুণাবলির

মাধ্যমে অসীলা গ্রহণের কথা আল্লাহ তাআলা নিজেই বলেছেন। কিন্তু মৃত অলী আওলিয়াদের কবরের কাছে যাওয়া, কবর তওয়াফ করা, কবরে-মাজারে মানত করা, কবরে শায়িত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করা, তার কাছে নিজের অভাব অভিযোগের কথা বলা ইত্যাদি কাজ-কর্মের মাধ্যমে অসীলা গ্রহণ শুধু নিষিদ্ধই নয় বরং এগুলো শিরক ও কুফরী। এগুলোতে কেহ লিপ্ত হলে তার ঈমান নষ্ট হয়ে যায়। নাউজুবিল্লাহ! এ গেল মৃত অলী আওলিয়াদের অসীলা গ্রহণ সম্পর্কে। আবার অনেকে জীবিত ব্যক্তিদের মাধ্যমে নাজায়েয অসীলা গ্রহণ করে থাকে। তাদের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করে থাকে। যেমন গরু, ছাগল, মুরগী জবেহ করার সময় বলে থাকে: আমাদের পীর সাবের নামে বা আমার বাবার নামে জবেহ করলাম। অথবা নিজের পীর বা পীরের পরিবারের লোকদের সম্মানের জন্য সেজদা করে থাকে। এগুলো সবই শিরক এবং শিরকে আকবর বা বড় শিরক। অনেকে নিজের জীবিত পীর ফকীরদের সম্পর্কে ধারণা করে থাকে যে, আল্লাহ তাআলার সাথে তার বিশেষ যোগাযোগ বা সম্পর্ক আছে, তাই তার মাধ্যমে আল্লাহকে পাওয়া যাবে, এটাও শিরক। যারা একদিন লাত উজ্জা প্রভৃতি দেব-দেবীর পূজা করতো, তারা কিন্তু এ বিশ্বাস করতো না যে এগুলো হল তাদের প্রভু বা সৃষ্টিকর্তা। বরং তারা বিশ্বাস করতো এগুলোর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের মাধ্যমে বা তাদেরকে অসীলা হিসাবে গ্রহণ করে তারা আল্লাহ নৈকট্য অর্জন করবে। তারা এটাও বিশ্বাস করতো না যে, এ সকল দেব-দেবী বৃষ্টি দান করে বা রিয়ক দান করে। তারা বলতো :

مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ

আমরা তো তাদের ইবাদত করি এ জন্য যে তারা আমাদের আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেবে। (সূরা যুমার, আয়াত ৩)। তারা এ সম্পর্কে আরো বলতো :

هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ

এরা (দেব-দেবী) আমাদের জন্য আল্লাহর কাছে শুপারিশ করবে। (সূরা ইউনূস, আয়াত ১৮)।

দেখা গেল তারা এ অসীল গ্রহণের কারণেই শিরকে লিপ্ত হয়ে পড়লো। আর এ শিরকের বিরুদ্ধে তাওহীদের দাওয়াতের জন্যই আল্লাহ তাআলা রাসূলগণকে পাঠালেন যুগে যুগে, প্রতিটি জনপদে। এ সকল দেব-দেবীর কাছে যেমন প্রার্থনামূলক দুআ করা শিরক তেমনি সাহায্য প্রার্থনা করে দুআ করাও শিরক। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا.
(الإسراء : ৫৬)

বল, তাদেরকে ডাক, আল্লাহ ছাড়া তোমরা যাদেরকে (উপাস্য) মনে কর। তারা তো তোমাদের দুঃখ-দুর্দশা দূর করার ও পরিবর্তন করার ক্ষমতা রাখে না। (সূরা ইসরা, আয়াত ৫৬)। আল্লাহ তাআলা আরো বলেনঃ

قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍَ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ ﴿২২﴾ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ. (سبأ : ২২-২৩)

বল, তোমরা আল্লাহ ছাড়া যাদেরকে ইলাহ মনে করতে তাদেরকে আহ্বান কর। তারা আসমানসমূহ ও যমীনের মধ্যে অণু পরিমাণ কোন কিছুর মালিক নয়। আর এ দুয়ের মধ্যে তাদের কোন অংশীদারিত্ব নেই এবং তাদের মধ্য থেকে কেউ তাঁর সাহায্যকারীও নয়। আর আল্লাহ যাকে অনুমতি দেবেন সে ছাড়া তাঁর কাছে কোন সুপারিশ কোন কাজে আসবে না। (সূরা সাবা, আয়াত ২২-২৩)

এ সকল আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বললেন: আল্লাহ ব্যতীত যাদেরকে ডাকা হয়, যাদের কাছে দুআ-প্রার্থনা করা হয় তারা অনু পরিমাণ বস্তু সৃষ্টি করতে পারে না। তারা কোন সৃষ্টি জীবের সামান্য কল্যাণ করার ক্ষমতা রাখে না। তারা আশ্রয় প্রার্থনাকারীকে কোন আশ্রয় দেয়ার সামর্থ রাখে না। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কবরকে মসজিদ বানাতে নিষেধ করেছেন। কবরের কাছে নামাজ পড়তে নিষেধ করেছেন। কবরকে সেজদা দিতে নিষেধ করেছেন। তিনি ওফাতের সময়ও বলেছেন: আল্লাহ তাআলা ইহুদী ও খৃষ্টানদের অভিসম্পাত করুন। তারা নবীদের কবরকে ইবাদতের স্থান হিসাবে গ্রহণ করেছে। আর ইবাদত-বন্দেগীর দ্বারা কবরকে সম্মান করা হল শিরকে লিপ্ত হওয়ার একটি রাস্তা। এভাবে কবরকে পূজা করার মাধ্যমেই মানুষ মূর্তি পূজার দিকে ধাবিত হয়।

ওমর (রা.) দুআর সময় আব্বাস (রা.) কে অসীলা হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন, এ বিষয়টি দিয়ে অনেকে মৃত ব্যক্তির অসীলা গ্রহণ করার বৈধতা দেয়ার প্রয়াস পান। কিন্তু ওমর (রা.) আব্বাস (রা.) এর দুআকে অসীলা হিসাবে গ্রহণ করেছেন তার ব্যক্তিত্বকে নয়।

আর আব্বাস (রা.) তখন জীবিত ছিলেন। যে কোন জীবিত ব্যক্তির দুআকে অসীলা হিসাবে গ্রহণ করা যায়। ওমর (রা.) তা-ই করেছেন। তিনি বলেছেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জীবিত থাকাকালে আমরা তার অসীলা দিয়ে দুআ করতাম। এখন তিনি নেই তাই আমরা তার চাচা আব্বাসকে দুআ করার ক্ষেত্রে অসীলা হিসাবে নিলাম। ওমর (রা.) এর এ বক্তব্যে স্পষ্ট হল যে, তিনি কোন মৃত ব্যক্তিকে দুআর সময় অসীলা হিসাবে গ্রহণ বৈধ মনে করতেন না। তিনি নবী হলেও না। বিষয়টা এমন, যেমন আমরা কোন সৎ-নেককার ব্যক্তিকে বলে থাকি, আমার জন্য দুআ করবেন। কোন আলেম বা বুযুর্গ ব্যক্তির মাধ্যমে আমরা নিজেদের জন্য দুআ করিয়ে থাকি। এটাও এক ধরনের অসীলা গ্রহণ। এটা বৈধ। কিন্তু কোন বুযুর্গ ব্যক্তি মারা যাওয়ার পর তাকে অসীলা করে দুআ করা, দুআর সময় তার রুহের প্রতি মনোনিবেশ করা (যেমন অনেকে বলে থাকে আমি আমার দাদাপীর অমুকের দিকে মুতাওয়াজ্জুহ হলাম), তার থেকে ফয়েজ-বরকত লাভের ধারণা করা, এগুলো নিষিদ্ধ ও শিরক। মৃত ব্যক্তি যত মর্যাদাবান বুযুর্গ হোক সে কারো ভাল-মন্দ করার ক্ষমতা রাখে না। যখন সে মৃত্যুর পর নিজের জন্য ভাল মন্দ কিছু করতে পারে না, তখন অন্যের জন্য কিছু করতে পারার প্রশ্নই আসে না। সে কারো দুআ কবুলের ব্যাপারে কোন ভূমিকা রাখতে পারে না। কাউকে উপকার করার বা বিপদ থেকে উদ্ধার করার ক্ষমতা তার থাকে না। নবী কারীম

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্পষ্টভাবে বলেছেন : মৃত ব্যক্তি নিজের কোন উপকার করতে পারে না। তিনি বলেছেনঃ

إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له . رواه مسلم

মানুষ যখন মৃত্যুবরণ করে তখন তার আমল বন্ধ হয়ে যায় কিন্তু তিনটি কাজের ফল সে পেতে থাকে।

১. সদকায়ে জারিয়াহ (এমন দান যা থেকে মানুষ অব্যাহতভাবে উপকৃত হয়ে থাকে)

২. মানুষের উপকারে আসে এমন ইলম (বিদ্যা)

৩. সৎ সন্তান যে তাঁর জন্য দুআ করে। বর্ণনায়: মুসলিম

হাদীসটির মাধ্যমে স্পষ্টভাবে জানা গেল মৃত ব্যক্তি জীবিত ব্যক্তিদের দুআ, ক্ষমা প্রার্থনার ফলে উপকার পেতে পারে। কিন্তু জীবিত ব্যক্তির মৃতদের থেকে এরূপ কিছু আশা করতে পারেনা।

যখন হাদীস থেকে প্রমাণিত হল যে, কোন আদম সন্তান যখন মৃত্যুবরণ করে তখন তার সকল আমল বন্ধ হয়ে যায়। তার আমল দিয়ে সে কোন উপকার লাভ করতে পারে না, তখন আমরা কিভাবে বিশ্বাস করি যে, অমুক ব্যক্তি কবরে জীবিত আছেন? তার সাথে আমাদের যোগাযোগ হয়? তিনি আমাদের উপকার করতে পারেন? আমাদের প্রার্থনা শুনেন ও আল্লাহর কাছে গুপারিশ করেন? এগুলো সব অসার বিশ্বাস। এগুলো যে শিরক তাতে কোন সন্দেহ নেই।

মৃত ব্যক্তির যে কবরে শুনতে পায় না, কেহ তাদেরকে কিছু শুনতে পারে না এটা আল্লাহ রাসুল আলামীন আল কুরআনে ইরশাদ করেছেন। তিনি নবীকে সম্বোধন করে বলেছেন:

إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ.

নিশ্চয় তুমি মৃতকে শোনাতে পারবে না, আর তুমি বধিরকে আহ্বান শোনাতে পারবে না। (সূরা নামল, আয়াত ৮০)

যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন মৃতকে কিছু শোনাতে পারেন না, তখন সাধারণ মানুষ কিভাবে এ অসাধ্য সাধন করতে পারে? কাজেই আমরা মৃতদের কবরে যেয়ে যা কিছু বলি, যা কিছু প্রার্থনা করি তা তারা কিছুই শুনতে পায় না। যখন তারা শুনতেই পায় না, তখন তারা প্রার্থনাকারীর প্রার্থনা কিভাবে কবুল করবে? কিভাবে তাদের হাজত-আকাংখা পূরণ করবে? আল্লাহ তাআলা ব্যতীত যা কিছুর উপাসনা করা হয়, তা সবই বাতিল। আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿١٠٦﴾ وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ (يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿١٠٩﴾) (يونس)

আর আল্লাহ ছাড়া এমন কিছুকে ডেকো না, যা তোমার উপকার করতে পারে না এবং তোমার ক্ষতিও করতে পারে না। অতএব তুমি যদি কর, তাহলে নিশ্চয় তুমি যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হবে। আর আল্লাহ যদি তোমাকে কোন ক্ষতি পৌঁছান, তবে তিনি ছাড়া তা দূর করার কেউ নেই। আর তিনি যদি তোমার কল্যাণ চান, তবে তাঁর

অনুগ্রহের কোন প্রতিরোধকারী নেই। তিনি তার বান্দাদের যাকে ইচ্ছা তাকে তা দেন। আর তিনি পরম ক্ষমাশীল, অতি দয়ালু (সূরা ইউনুস, আয়াত ১০৬-১০৭)। এ আয়াত থেকে স্পষ্ট বুঝা গেল আল্লাহ ব্যতীত যাদেরকে ডাকা হয়, যাদের কাছে দুআ-প্রার্থনা করা হয় তা সবই বাতিল। আরো স্পষ্ট হল যে, এগুলো কাউকে উপকার করতে পারে না বা ক্ষতি করতে পারে না। যখন তারা সবই বাতিল, তাদের কাছে দুআ-প্রার্থনা করলে যখন কোন উপকার হয় না তখন কেন তাদের স্মরণাপন্ন হবে? কেন তাদেরকে অসীলা গ্রহণ করা হবে? কেন তাদের কবরে যেয়ে দুআ করা হবে? অনেক বিভ্রান্ত লোককে বলতে শুনা যায়, অমুক অলীর মাজার যিয়ারত করতে গিয়েছিলাম। সেখানে যেয়ে এই দুআ করেছিলাম। দুআ কবুল হয়েছে, যা চেয়েছিলাম তা পেয়ে গেছি ইত্যাদি। এ ধরনের কথা-বার্তা আল্লাহ তাআলার প্রতি মিথ্যারোপের শামিল। হ্যাঁ, হতে পারে অলী আওলিয়াদের মাজারে গিয়ে কিছু চাইলে তা যেন অর্জন হবে না এ কথা বলা যায় না। তবে অর্জন হলে সেটা দু কারণে হতে পারে:

এক. অলীর মাজারে যেয়ে যা চাওয়া হয়েছে তা পূরণ করা কোন সৃষ্টিজীবের পক্ষে সম্ভব হবে অথবা হবে না। যদি সম্ভব হয়, তাহলে হতে পারে শয়তান প্রার্থীত বিষয়গুলোকে অর্জন করিয়ে দিয়েছে। যাতে শিরকের প্রতি আসক্তি সৃষ্টি হয়। যা চেয়েছে শয়তান সেগুলো তাকে দিয়েছে। কেননা যে সকল স্থানে আল্লাহ তাআলা ব্যতীত অন্যের ইবাদত করা হয় সে সকল স্থানে শয়তান বিচরণ করে।

যখন শয়তান দেখল কোন ব্যক্তি কবর পূজা করছে, তখন সে তাকে সাহায্য করে থাকে।

যেমন সে সাহায্য করে মূর্তিপূজারীদের। সে তাদের এ সকল শিরকি কাজগুলোকে তাদের কাছে সুশোভিত করে উপস্থাপন করে থাকে বলে আল্লাহ তাআলা আল কুরআনে বহু স্থানে উল্লেখ করেছেন। এমনিভাবে শয়তান গণক ও জোতিষীদের সাহায্য করে থাকে তাদের কাজ-কর্মে। তাই অনেক সময় এ সকল গণকদের কথা ও ভবিষ্যতবাণী সত্যে পরিণত হতে দেখা যায়। এমনিভাবে শয়তান মানুষের আকৃতি ধারণ করে বিপদগ্রস্ত মানুষকে বলে থাকে অমুক মাজারে যাও, তাহলে কাজ হবে। পরে সে যখন মাজারে যায় তখন শয়তান মানুষের রূপ ধারণ করে তার সাহায্যে এগিয়ে আসে। ফলে বিপদে পড়া মানুষটি মনে করে মাজারে শায়িত অলী তাকে সাহায্য করেছে। এমনিভাবে শয়তান মানব সমাজে শিরকের প্রচলন ঘটিয়েছে ও শিরকের প্রসার করে যাচ্ছে।

দুই. আর যদি প্রার্থীত বিষয়টি এমন হয় যা পূরণ করা শুধু আল্লাহ তাআলার পক্ষেই সম্ভব, তাহলে বুঝতে হবে এ বিষয়টি অর্জনের কথা তাকদীরে আগেই লেখা ছিল। কবরে শায়িত ব্যক্তির বরকতে এটির অর্জন হয়নি। তাই সকল বিবেকসম্পন্ন মানুষকে বুঝতে হবে যে মাজারে যেয়ে দুআ করলে কবুল হয় বলে বিশ্বাস করা সর্বাবস্থায়ই কুসংস্কার। কেহ যদি মাজারে যেয়ে দুআ প্রার্থনা করে, মাজার পূজা করে মানুষ থেকে ফেরেশতাতে পরিণত হয় তাহলেও বিশ্বাস করা যাবে না যে, এটা মাজারে শায়িত অলীর কারণে

হয়েছে। এর নামই হল ঈমান। এর নামই হল নির্ভেজাল তাওহীদ। তাওহীদের বিশ্বাস যদি শিরকমিশ্রিত হয়, কু সংস্কারাচ্ছন্ন হয় তা হলে ব্যক্তির মুক্তি নেই।

সাতাশ তম পরিচ্ছেদ - কাল্পনিক কারামত

অনেক মানুষই মুজিয়া আর কারামতের পার্থক্য জানে না। মুজিয়া আর কারামত কি তা বুঝে না। মুজিয়া হল এমন অলৌকিক বিষয় যা নবীদের থেকে প্রকাশ পায়। আর কারামত হল এমন অলৌকিক বিষয় যা আল্লাহ তাআলার প্রিয় বান্দাদের থেকে প্রকাশ পায়। মুজিয়া প্রকাশের শর্ত হল নবী বা রাসূল হওয়া। আর কারামত প্রকাশের শর্ত হল নেককার ও মুত্তাকী হওয়া। অতএব যদি কোন বিদআতী পীর-ফকির বা শিরকে লিপ্ত ব্যক্তিদের থেকে অলৌকিক কিছু প্রকাশ পায় সেটা মুজিয়াও নয়, কারামতও নয়। সেটা হল দাজ্জালী ধোকা-বাজি বা প্রতারণা। অনেক অজ্ঞ লোক ধারণা করে থাকে মুজিয়া বা কারামত, সাধনা বা চেষ্টা-প্রচেষ্টা করে অর্জন করা যায়। বা মানুষ ইচ্ছা করলেই তা করতে পারে। তাই এ সকল অজ্ঞ লোকেরা ধারণা করে অলী আউলিয়াগণ ইচ্ছা করলে কারামতের মাধ্যমে অনেক কিছু ঘটাতে পারেন, বিপদ থেকে মানুষকে উদ্ধার করতে পারেন। কিন্তু আসল ব্যাপার হল, কারামত কোন ব্যক্তির ইচ্ছাধীন নয়। এটি একমাত্র আল্লাহর ইচ্ছাধীন। মানুষ ইচ্ছা করলে কখনো কারামত সংঘটিত করতে পারে না, সে যত বড় অলী বা পীর হোক না কেন। কোন বিবেকমান মানুষ বিশ্বাস করে না যে, একজন মানুষের প্রাণ চলে যাওয়ার পর তার কিছু করার ক্ষমতা

থাকে। আবার যদি সে কবরে চলে যায় তাহলে কিভাবে সে কিছু করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করে? এ ধরনের কথা তারাই বিশ্বাস করতে পারে অজ্ঞতার ক্ষেত্রে যাদের কোন নজীর নেই। অলী তো দূরের কথা কোন নবীর কবরও পূজা করা জায়েয নেই। নবীর কবরতো পরের কথা, জীবিত থাকা কালে কোন নবীর ইবাদত করা, বা তাকে দেবতা জ্ঞান করে পূজা করা যায় না। এটা ইসলামে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। আল্লাহ তাআলা বলেন :

مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ ﴿٩٥﴾ وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا (الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿٧٠﴾). (آل عمران)

কোন মানুষের জন্য সংগত নয় যে, আল্লাহ তাকে কিতাব, হিকমত ও নবুওয়াত দান করার পর সে মানুষকে বলবে, তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে আমার ইবাদতকারী হয়ে যাও। বরং সে বলবে, তোমরা রব্বানী (আল্লাহ ভক্ত) হও। যেহেতু তোমরা কিতাব শিক্ষা দিতে এবং তা অধ্যয়ন করতে। আর তিনি তোমাদেরকে নির্দেশ করেন না যে, তোমরা ফেরেশতা ও নবীদেরকে প্রভু রূপে গ্রহণ কর। তোমরা মুসলিম হওয়ার পর তিনি কি তোমাদেরকে কুফরীর নির্দেশ দেবেন? (সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৭৯-৮০)

আঠাশ তম পরিচ্ছেদ - দুআ-মুনাজাতে নবী রাসূলের অসীলা দেয়া: একটি পর্যালোচনা

বিভিন্ন দুআ মুনাজাতের সময় দেখা যায়, ইমাম সাহেব বা আলেম সাহেব দুআ-মুনাজাতের মধ্যে বলছেন, 'হে আল্লাহ! মুহাম্মাদুর

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তোফায়েলে আমাদের দুআ কবুল করুন।' অনেকে বলে থাকেন, 'হে আল্লাহ আপনার নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অসীলায় আমাদের দুআ কবুল করুন।' একটি মসজিদে মাঝে মধ্যে জুমুআর সালাত আদায় করতাম। দেখতাম, ইমাম সাহেব দ্বিতীয় খুতবায় দুআ করার সময় বলছেন:

اللَّهُمَّ إِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِجَاهِ نَبِيِّكَ الْمَيْمُونِ

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমরা আপনার বরকতময় নবীর অসীলায় নিচ্ছি।

একটি দুআ অনুষ্ঠানে শুনলাম, দুআকারী আলেম সাহেব বলছেনঃ

سهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار

‘হে আমার মাবুদ! নেককারদের মহান নেতার মর্যাদায় সকল মুশকিল আসান করে দিন।’

হজের সফরে বিমানে এক ব্যক্তিকে দেখলাম, আমার পাশে বসে দুআ করছে, ‘ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার রওজা যিয়ারত করার জন্য হজে রওয়ানা দিলাম। আপনি আল্লাহর কাছে শাফায়াত করে আমার হজ কবুল করিয়ে দিন।’ অনেক দিন পূর্বে একটি জিকিরের জলছায় বসেছিলাম। দেখলাম, জলছার পরিচালক বলছেন, ‘সকলে বলুন, আমার কলব অমুকের কলবের দিকে মুতাওয়াজ্জুহ আছে। তার কলব দাদাপীর অমুকের দিকে মুতাওয়াজ্জুহ আছে। তার কলব অমুকের দিকে মুতাওয়াজ্জুহ আছে। তার কলব মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে মুতাওয়াজ্জুহ আছে, হে মাবুদ তার অসীলায় আমাদের তওবা কবুল করুন।'

সুবহানাল্লাহ! তারা যা বলছে, মহান আল্লাহ তা থেকে পবিত্র ও মুক্ত। এগুলো সবই হল অসীলা। অবশ্যই ভ্রান্ত অসীলা। নিশ্চয় এগুলো বিদআতী অসীলা। সন্দেহ নেই- এগুলো শিরকী অসীলা। এ সকল অসীলার স্বপক্ষে আল্লাহ তাআলা কোন প্রমাণ নাযিল করেননি। তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ সকল অসীলার কথা বলে যাননি।

নবী আদম আলাইহিস সালাম কি মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অসীলা দিয়ে দুআ করেছিলেন?

আমাদের সমাজে এ কথা প্রচলিত আছে যে, নবী আদম আলাইহিস সালাম নিষিদ্ধ ফল খাওয়ার পর নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অসীলা দিয়ে দুআ করেছেন। ফলে আল্লাহ তাআলা তার তওবা কবুল করে তাকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। তাই দুআ-মুনাজাতের মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অসীলা দেয়া একটি প্রমাণিত ও অনুমোদিত বিষয়। বরং এটি একটি সুন্নাত। প্রচলিত এ কথার ভিত্তি হল একটি দুর্বল ও মুনকার হাদীস। যা আল কুরআনের আয়াতের বিরোধী হওয়ার কারণে মুনকার বা প্রত্যাখ্যাত হাদীস বলে গণ্য হয়েছে। সেই হাদীসটি হল :

أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ فِي "الْمُسْتَدْرَكِ" (٦١٥/٢) مِنْ طَرِيقِ أَبِي الْحَارِثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
مُسْلِمٍ الْفَهْرِيِّ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمَةَ: أَنَّ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ
أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مَرْفُوعاً: لَمَّا اقْتَرَفَ آدَمُ الْخَطِيئَةَ قَالَ: يَا رَبِّ أَسْأَلُكَ

يا رب لما: بحق محمد لما غفرت لي، فقال: يا آدم! وكيف عرفت محمداً ولم أخلقه؟ قال
 خلقتني بيدك، ونفخت في من روحك رفعت رأسي، فرأيت على قوائم العرش
 مكتوباً: لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعلمت أنك لم تضيف إلى اسمك إلا أحب
 الخلق إليك، فقال: غفرت لك، ولولا محمد ما خلقتك.

হাকেম তার মুস্তাদরাক কিতাবে (৬১৫/২ নম্বরে) আবু হারিস
 আব্দুল্লাহ বিন মুসলিম আল ফাহরীর সূত্রে বর্ণনা করেন যে,
 ইসমাইল ইবনে মুসলিমাহ আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন এই সূত্রে
 যে, আব্দুর রহমান ইবনে যায়েদ বিন আসলাম তার পিতা থেকে,
 পিতা তার দাদা থেকে, দাদা উমার ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু
 থেকে বর্ণনা করেন যে, যখন আদম আলাইহিস সালাম ভুল
 করলেন, তখন বললেন, 'হে আমার প্রভূ! আমি মুহাম্মাদ এর হকের
 অসীলায় আপনার কাছে প্রার্থনা করছি যেন আপনি আমাকে ক্ষমা
 করে দেন।' তিনি বললেন, 'হে আদম! তুমি কিভাবে চিনলে
 মুহাম্মাদকে, অথচ আমি তো তাকে এখনো সৃষ্টি করিনি?' আদম
 বললেন, 'হে আমার প্রভূ! আপনি যখন আমাকে নিজ হাতে সৃষ্টি
 করলেন, আপনার রুহ আমার মধ্যে ফুঁকে দিলেন তখন আমি মাথা
 উঠালাম। দেখলাম, আপনার আরশের খুটির উপর লেখা আছে, লা-
 ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। আমি বুঝে নিলাম, এটা
 আপনার সৃষ্টির সর্বোত্তম নাম না হলে আপনি নিজের নামের সাথে
 লিখতেন না।' তখন আল্লাহ তাআলা বললেন : 'আমি তোমাকে ক্ষমা
 করে দিলাম। যদি মুহাম্মাদ না হত, তা হলে আমি তোমাকে সৃষ্টি
 করতাম না।' যে কারণে এ হাদীসটি দুর্বল : এ হাদীসের সনদে দু

জন বর্ণনাকারী : আব্দুর রহমান ইবনে যায়েদ বিন আসলাম ও মুসলিম আল ফাহরী। আব্দুর রহমান বিন যায়েদ সম্পর্কে ইমাম হাকেম লিখেছেন: ইমাম বুখারী ও মুসলিম তার হাদীস গ্রহণ করতেন না। তিনি দুর্বল। ইমাম ইবনু তাইমিয়া (রহ.) বলেছেন, আব্দুর রহমান ইবনে যায়েদ হাদীস জাল করত ও মিথ্যা হাদীস রচনা করত। ইমাম জাহাবী (রহ.) আল মিয়ান কিতাবে লিখেন, মুসলিম আল ফাহরী বাতিল হাদীস বর্ণনাকারী। ইবনে হিব্বান তাকে মিথ্যা হাদীস বর্ণনাকারী বলে উল্লেখ করেছেন। এ সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানতে হলে যুগের শীর্ষস্থানীয় হাদীস বিশারদ শায়খ আলবানী (রহ.) সংকলিত কিতাব - التوسل : أنواعه وأحكامه للشيخ - الألباني - দেখা যেতে পারে। এই কিতাবে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে অসীলা করার হাদীসগুলো বিশ্লেষণ করেছেন স্পষ্টভাবে। এ হাদীসটি কেন প্রত্যাখ্যান করতে হবে? যদি কোন হাদীসে সরাসরি আল কুরআনের বিপরীত কথা বলা হয়, তাহলে হাদীসটি প্রত্যাখ্যান করা হবে। মুস্তাদরাক হাকমে বর্ণিত, আদম (আ.) এর অসীলা গ্রহণের এ হাদীসটি আল কুরআনে আল্লাহ তাআলা যা বলেছেন, তার বিরোধী। এ হাদীসে বলা হয়েছে, 'নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামের অসীলা দেয়ার কারণে আদম আলাইহিস সালাম আল্লাহ তাআলার ক্ষমা লাভ করেছিলেন।' কিন্তু আল কুরআন বলছে অন্য কথা। দেখুন আল্লাহ তাআলা বলেন : অতপর আদম তার রবের পক্ষ থেকে কিছু বাণী পেল। ফলে তখনই আল্লাহ তার তাওবা কবুল করলেন। নিশ্চয়

তিনি তাওবা কবুলকারী অতি দয়ালু। (সূরা বাকারা, আয়াত ৩৭)।
এ আয়াত থেকে আমরা জানলাম, আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তাওবা ও ইস্তেগফার করার কিছু বাক্য আদম আলাইহিস সালামের অন্তরে ঢেলে দেয়া হল। তিনি এ কথাগুলো বলার সাথে সাথে আল্লাহ তাআলা তার তাওবা কবুল করে নিলেন। সেই কথাগুলো কি ছিল? অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা তা বলে দিয়েছেন।

ইরশাদ হচ্ছেঃ তারা উভয়ে বলল, হে আমাদের প্রভু! আমরা নিজেদের উপর জুলুম করেছি। আর যদি আপনি আমাদের ক্ষমা না করেন এবং আমাদের উপর দয়া না করেন তাহলে অবশ্যই আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হব। (সূরা আল আরাফ, আয়াত ২৩)

সকল মুফাসসিরে কুরআন এ বিষয়ে একমত, তাওবা করার জন্য আল্লাহ যে বাণী আদম আলাইহিস সালামকে শিখিয়েছিলেন তা হল সূরা আরাফে বর্ণিত উপরোল্লিখিত দুআ। অতএব এখন যদি কেউ বলে নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অসীলা দেয়ার কারণে তার তাওবা কবুল হয়েছে, তাহলে সে আল কুরআনের বিপরীত কথা বিশ্বাস করল ও প্রচার করল। এটা কুরআন প্রত্যাখ্যান অর্থাৎ হিজরুল কুরআনের অপরাধ বলে গণ্য হবে। আর কুরআন প্রত্যাখ্যান করা যে কবীরা গুনাহ তাতে চুল পরিমাণ সন্দেহ নেই।

দুআ-মুনাজাতে অসীলা দেয়া কতখানি গুরুত্বপূর্ণ?

শরীয়ত সম্মত অসীলা তিন প্রকার। আল্লাহর নাম ও গুণাবলী। নিজের নেক আমল ও জীবিত নেককার মুত্তাকী মানুষের দুআ। আল্লাহ তাআলার নাম ও গুণাবলী দিয়ে নফল দুআ-মুনাজাতে

অসীলা দেয়া সুন্নাত। কারণ আল্লাহ তাআলাও আদেশ দিয়েছেন আর তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আমল করেছেন। নফল বললাম এ জন্য যে, অনেক বিধিবদ্ধ দুআ-প্রার্থনায় আমরা নিয়ম মাসিক আল্লাহ তাআলার বিভিন্ন নামের অসীলা নিয়ে থাকি। যেমন সূরা ফাতেহাতে আমরা তার কয়েকটি নাম উল্লেখ করে দুআ করি; ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকীম। দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রকার অসীলা দিয়ে দুআ করার অনুমতি দেয়া হয়েছে মাত্র। কেউ যদি জীবনে একবারও আল্লাহর নামসমূহ ও গুণাবলি ব্যতীত অন্য কোন অসীলা দিয়ে দুআ না করে তাহলে তার কোন পাপ হবে না। তার ঈমান ইসলাম অপূর্ণ থাকবে না। তার তাকওয়া পরহেযগারীর কোন ক্ষতি হবে না। যখন শরীয়ত অনুমোদিত অসীলা গ্রহণের হুকুম হল এ রকম তখন যে সকল অসীলা নেয়ার সমর্থনে শরীয়তে কোন প্রমাণ নেই সে সকল অসীলা নেয়ার মর্যাদা কী হতে পারে? কতটুকু প্রয়োজন ও গুরুত্ব রাখে এ সকল অসীলা? যারা বিভিন্ন কথা-বার্তায় ইনিয়ে বিনিয়ে, এখান-সেখান থেকে বিভিন্ন বাজে প্রমাণাদি, দুর্বল কথা-বার্তা দিয়ে ঐ সকল অসীলা প্রতিষ্ঠিত করতে চান, তাদের তাকওয়া-পরহেযগারী, দীনি সচেতনতা আর আওলাবিয়্যাত বা অগ্রাধিকার নীতিজ্ঞান কতটুকু আছে আমরা তা ভেবে দেখতে পারি। দুআ কবুল হওয়ার জন্য আল্লাহ তাআলার নাম ও গুণাবলী ব্যতীত অন্য কিছুর অসীলা দেয়ার কোন প্রয়োজন নেই। আল্লাহ তাআলা বলেন : আর যখন আমার বান্দারা তোমাকে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবে, আমি তো নিশ্চয় নিকটবর্তী। আমি প্রার্থনাকারীর

ডাকে সাড়া দেই, যখন সে আমাকে ডাকে। সুতরাং তারা যেন আমার ডাকে সাড়া দেয় এবং আমার প্রতি ঈমান আনে। আশা করা যায় তারা সঠিক পথে চলবে। (সূরা বাকারা, আয়াত ১৮৬)

যখন আল্লাহ তাআলা বান্দার নিকটবর্তী তখন তাঁর নৈকট্য অর্জনের জন্য ভিন্ন কোন অসীলা বা মাধ্যম গ্রহণ করার কোন প্রয়োজন নেই, তখন মানুষ সরাসরি আল্লাহ তাআলার কাছে তার সকল প্রার্থনা নিবেদন করবে কোন মাধ্যম বা অসীলা ব্যতীত। এটাই ইসলামের একটি বৈশিষ্ট্য ও মহান শিক্ষা। আল্লাহ তাআলার কাছে দুআ-প্রার্থনায় কোন অনুনোমোদিত মাধ্যম গ্রহণ করার দরকার নেই মোটেই। বরং অসীলার ধারণাগুলো মানুষকে শিরক বিদআতের দিকেই নিয়ে যায়।

দুআ-প্রার্থনায় মাধ্যম বা অসীলা গ্রহণ একটি বিজাতীয় বিষয়। হিন্দু, বৌদ্ধ খৃষ্টানসহ অন্যান্য ধর্মের লোকেরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতে মূর্তি, পাদ্রী ও ধর্ম যাজকদের মাধ্যম বা অসীলা হিসাবে গ্রহণ করে থাকে। এ দিকের বিবেচনায় এটি একটি কুফরী সংস্কৃতি। যা কোন মুসলমান অনুসরণ করতে পারে না। তারা অসীলার ভাবনা থেকেই পৌত্তলিকতার প্রবর্তন করেছে। নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম, মর্তবা, সম্মান-মর্যাদার অসীলা দিয়ে দুআ করা সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা কোন প্রমাণ নাযিল করেননি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো তার নাম, মর্যাদা, সম্মান দিয়ে দুআ করতে বলেননি। অপরদিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর পর কোন সাহাবী বা তাবেয়ীন তার

নাম, মর্যাদার অসীলা দিয়ে দুআ করেননি। সাহাবায়ে কেরাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে আমাদের চেয়ে অনেক বেশী ভালোবাসতেন। অনেক বেশী সম্মান করতেন। তাকে অনেক বেশী জেনেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে কখনো তার নাম বা মর্যাদার অসীলা দিয়ে দুআ করেননি। যদি তার নাম বা মর্যাদার অসীলা দিয়ে দুআ করাটা শরীয়ত সম্মত হত, ভাল কাজ হত, তাহলে তিনি অবশ্যই তা আমাদের বলে যেতেন। তিনি ইসলাম শিক্ষা দিতে, দাওয়াত ও তাবলীগের দায়িত্ব পালনে কোন অলসতা করেননি। অতি সামান্য বিষয়ও তিনি তার উম্মতকে শিক্ষা দিয়েছেন।

দুআ-মুনাজাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অসীলা গ্রহণ যদি কোন নেক আমল হত, তাহলে তিনি তার সাহাবীদের বলে যেতেন। তাঁর মৃত্যুর পর তার কোন সাহাবী এ রকম অসীলা দিয়ে দুআ করেননি। বরং তারা এটাকে জায়েয মনে করার কোন প্রয়োজনও অনুভব করেননি। কেয়ামতের সময় বা শেষ বিচারে আল্লাহ আমাদের প্রশ্ন করবেন, আল্লাহ তাআলার রাসূল যা কিছু নিয়ে এসেছিল তোমাদের কাছে, তা তোমরা কতটুকু গ্রহণ করেছ? আল্লাহ তাআলা বলেন : আর সেদিন আল্লাহ তাদের ডেকে বলবেন, তোমরা রাসূলদের কী উত্তর দিয়েছিলে? (সূরা কাসাস : ৬৫)। অন্যত্র আল্লাহ তাআলা আরো বলেন : সুতরাং আমি অবশ্যই তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করব যাদের নিকট রাসূল পাঠানো হয়েছিল। এবং অবশ্যই আমি রাসূলদের জিজ্ঞাসাবাদ করব। (সূরা আরাফ,

আয়াত ৬)। অতএব, আল্লাহ তাআলা আমাদের কখনো প্রশ্ন করবেন না, তোমরা অমুক ইমাম, পীর, মুরব্বী, আকাবির বা উস্তাদের কথা মেনে নিয়েছিলে কি না। বা অমান্য করেছ কি না? তাই কুরআন ও সহীহ হাদীস মানা আমাদের ঈমানী দায়িত্ব। এর বাইরে তৃতীয় কোন সূত্র দিয়ে দীনি বিষয় প্রমাণিত হবে না। আল্লাহ তাআলা যুগে যুগে নবী ও রাসূলদের পাঠিয়েছেন তাদের অনুসরণের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার তাওহীদকে ধারণ করার জন্য। তিনি তাদের নামের অসীলা দিয়ে দুআ-মুনাজাত করে শিরকের পথ খোলার জন্য কখনো নবী রাসূল প্রেরণ করেননি। আমাদের পক্ষ থেকে কেয়ামত পর্যন্ত তাঁর রাসূল মুহাম্মাদের উপর, তাঁর পরিবার পরিজন ও সাহাবীদের উপর হৃদয় নিংড়ানো হাজার হাজার সালাত ও সালাম নিবেদিত হোক। আল্লাহ আমাদের সকলকে বিশুদ্ধ তাওহীদ গ্রহণ করে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ ও সুন্নাহ আঁকড়ে ধরে দীনে ইসলামে অটল থাকার তাওফীক দিন এবং সকল প্রকার শিরক ও বিদ'আতমুক্ত আমল করার তৌফিক দান করুন, আমীন।

উনত্রিশ তম পরিচ্ছেদ - আল্লাহকে পেতে মাধ্যম গ্রহণ ও বরকত হাসিল

স্রষ্টা ও সৃষ্টির মাঝে মাধ্যম মানার ব্যাপারটা অত্যন্ত বিপজ্জনক বিষয়। পরিতাপের বিষয় যে, অনেক মুসলমানই এ সম্পর্কে পরিষ্কার কোন ধারণা রাখেনা। ফলে আমরা আল্লাহর সাহায্য সহযোগিতা থেকে বঞ্চিত হতে চলেছি, যে সাহায্য করার কথা তিনি

কুরআনে তাঁর কাছে আশ্রয় কামনা এবং তাঁর শরীয়তের অনুসরণ করার শর্তে ঘোষণা করেছেন। আল্লাহ বলেন : “আর মু'মিনদের সাহায্য করা আমার দায়িত্ব। {সূরা আর-রুম: ৪৭}। অন্যদিকে আল্লাহ আরও বলেন, “যদি তোমরা আল্লাহকে সাহায্য কর তবে তিনিও তোমাদের সাহায্য করবেন, এবং তোমাদের পদযুগলে স্থিতি দিবেন। {সূরা মুহাম্মাদ: ৭}

“আল্লাহর জন্যই যাবতীয় সম্মান, আর তাঁর রাসূলের জন্য, এবং মু'মিনদের জন্য”। {সূরা আল-মুনাফিকুন: ৮}। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, “তোমরা দুর্বল হইয়োনা, এবং তোমরা চিন্তা করোনা, তোমরাই বিজয়ী হবে যদি তোমরা ঈমানদার হও”। {সূরা আলে-ইমরান: ১৩৯}

সৃষ্টি ও স্রষ্টার মাঝে মাধ্যম বলতে কি বুঝায়, এ ব্যাপারে মানুষ তিনটি দলে বিভক্তঃ একঃ একদল হচ্ছে তারা যারা শরীয়ত প্রণেতা হিসাবে প্রেরিত একমাত্র মাধ্যম রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কেও মানতে নারাজ, বরং তারা দাবী করছে, - আর কত জঘন্যই না তাদের এ দাবী - যে, শরীয়ত শুধুমাত্র সাধারণ মানুষের জন্য, উপরন্তু তারা এ শরীয়ত কে “ইলমে জাহীর” বা প্রকাশ্য বিদ্যা হিসাবে নামকরণ করেছে, তারা তাদের ইবাদতের ক্ষেত্রে কতক বাজে চিন্তা-ধারণা ও কুসংস্কারকে গ্রহণ করে “ইলমে বাতেন” বা গোপন বিদ্যা নামে চালু করেছে, আর এর দ্বারা যা অর্জিত হয় তার নাম দিয়েছে (কাশফ)। মূলত তাদের এই কাশফ ইবলীশি কুমন্ত্রণা আর শয়তানী মাধ্যম ছাড়া কিছুই নয়, কারণ এটা ইসলামের

সাধারণ মূলনীতির পরিপন্থী, এ ব্যাপারে তাদের দলগত শ্লোগান হলোঃ এ কথা (আমার মন আমার রব থেকে সরাসরি বর্ণনা করেছে)। এতে করে তারা শরীয়তের আলেমদের সাথে ঠাট্টা করছে, এবং এ বলে দোষ দিচ্ছে যে, তোমরা তোমাদের বিদ্যা অর্জন করছ ধারাবাহিক ভাবে মৃতদের থেকে আর তারা তাদের বিদ্যা সরাসরি চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী রব এর কাছ থেকে অর্জন করছে। এ সমস্ত কথা দ্বারা তারা অনেক সাধারণ মানুষকে আকৃষ্ট করে তাদের পথভ্রষ্ট করছে। আর শরীয়ত নিষিদ্ধ অনেক কাজ তারা এভাবে জায়েয করেছে যার বিবরণ তাদের কুসংস্কারপূর্ণ বই গুলিতে বিশদভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। ফলে এ ব্যবস্থার অবসান কল্পে আলেমগণ তাদেরকে কাফের এবং ধর্ম বিচ্যুতির কারণে তাদের হত্যা করার নির্দেশ দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। কারণ তারা জানতনা বা জেনেও না জানার ভান করত যে, ইসলামের প্রথম মূলনীতি হলোঃ মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর অবতীর্ণ পদ্ধতির বাইরে কেউ আল্লাহর ইবাদাত করলে সে কাফের হিসাবে গণ্য হবে; কেননা আল্লাহ বলেন: (সুতরাং তারা যা বলছে তা নয় বরং আপনার রবের শপথ, তারা যতক্ষণ পর্যন্ত আপনাকে তাদের মধ্যকার ঝগড়ার মাঝে বিচারক মানবেনা অতঃপর তাদের অন্তরে আপনার ফয়সালার ব্যাপারে কোন প্রকার দ্বিধা দ্বন্দ্বের অস্তিত্ব থাকবেনা, এবং পরিপূর্ণভাবে তা মেনে নিবেনা ততক্ষণ পর্যন্ত তারা ঈমানদার হতে পারবেনা)। {সূরা আন্-নিসা: ৬৫}। আর এভাবেই শরীয়তের ইলমের বিরোধীতা ও তার আলোকে নির্বাপিত করার

কাজ শয়তান তাদের মনে সৌন্দর্য মন্ডিত করে দেখায়। ফলে তারা নিশ্চিহ্ন অন্ধকারে ঘুরতে থাকে এবং তাদের খেয়াল খুশি মোতাবেক আল্লাহর ইবাদত করতে থাকে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা তাদের যে চিত্র অংকন করেছেন তা তাদের ক্ষেত্রে সঠিক বলে প্রতীয়মান হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন : (বলুন: আমি কি তোমাদেরকে আমলের দিক থেকে সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্তদের সংবাদ দেব? (তারা হলো ঐ সব লোক) যাদের দুনিয়ার জীবনের সমস্ত প্রচেষ্টা পলু হয়ে গেছে, অথচ তারা মনে করত কত সুন্দর কাজই না তারা করছে, তারাই সে সব লোক যারা তাদের রবের আয়াতসমূহ ও তার সাথে সাক্ষাৎকে অস্বীকার করেছে, ফলে তাদের সমস্ত আমল বিনষ্ট হয়ে গেছে, সুতরাং কিয়ামতের দিন তাদের জন্য কোন ওজন স্থাপন করবোনা)। {সূরা আল-কাহ্ফ: ১০৩-১০৫}।

এ গ্রুপ শতধা বিভক্ত হয়ে একে অপরের বিরুদ্ধে লেগেছে, কারণ তারা সহজ সরল পথ থেকে দূরে সরে গেছে, যে পথ ছিল আল্লাহর নেয়ামতপ্রাপ্তদের পথ, অভিশপ্ত বা পথহারাদের পথ নয়। তাদের সমস্ত গ্রুপই জাহান্নামে যাবে, কারণ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: (আমার উম্মত তিয়াত্তর ফেরকা বা গ্রুপে বিভক্ত হবে, বাহাত্তরটি জাহান্নামে আর একটি জান্নাতে যাবে - যারা আমি এবং আমার সাহাবাগণ যে পথে আছি, তার উপর থাকবে)। হাদীসটি আবু দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ, তিরমিযি সবাই আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আন্হু) থেকে সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন। দুইঃ যারা মাধ্যম সাব্যস্ত করতে গিয়ে সীমালংঘন করেছে, আর

মাধ্যমের ভুল ব্যাখ্যা করে এর উপর এমন কিছু জিনিস চাপিয়েছে, যা চাপানো কক্ষনো জায়েয নয়। তারা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং অন্যান্য নবী ও নেক্কার ব্যক্তিবর্গকে এমনভাবে মাধ্যম মানতে শুরু করেছে যে তাদের বিশ্বাস আল্লাহ তা'আলা কারো কোন আমল এদের মাধ্যম হয়ে না আসলে কবুল করবেননা; কারণ এরাই হচ্ছে তার কাছে যাওয়ার অসীলা। (নাউজুবিল্লাহ)। এতে করে তারা আল্লাহ তা'আলাকে এমন সব অত্যাচারী বাদশাহদের বিশেষণে বিশেষিত করেছে যারা তাদের প্রাসাদে প্রচুর দারোয়ান নিযুক্ত করে রেখেছে যাতে করে কোন শক্তিশালী মাধ্যম ছাড়া তাদের কাছে পৌঁছা কক্ষনো সম্ভব হয়ে উঠেনা। অথচ আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে বলেন: (যখন আপনাকে আমার বান্দাগণ আমার সম্পর্কে প্রশ্ন করে তখন (বলুন) আমি নিকটে, আহবানকারী যখন আমাকে আহবান করে আমি তার ডাকে সাড়া দেই, সুতরাং তারা যেন আমার হুকুম মেনে নেয় এবং আমার উপরই ঈমান আনে যাতে করে তারা সৎপথ লাভ করে) - আল্লাহ তা'আলার এ বাণীর সাথে পূর্ব বর্ণিত লোকদের বিশ্বাসের সংগতি কতটুকু? এ আয়াত ইঙ্গিত করছে যে, আল্লাহর কাছে পৌঁছার একমাত্র মাধ্যম হচ্ছে তার উপর সঠিকভাবে ঈমান আনা এবং তার প্রদর্শিত পথে ইবাদাত করা এবং শিরক ও বিদ'আতমুক্ত অবস্থায় আমল করা।

দৃশ্যনীয় যে, এ আয়াতে ইবাদতের কথা ঈমানের পূর্বে উল্লেখ করে নেক আমল বা সৎকাজের গুরুত্ব সম্পর্কে সাবধান করা হয়েছে;

কেননা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ও তার জান্নাত হাসিলের জন্য এটা প্রধান শর্ত।

আল্লাহ তা'আলা কুরআনে অসীলা শব্দের উল্লেখ করেছেন এবং তা দ্বারা পূর্ণ আনুগত্য করাকেই বুঝিয়েছেন কারণ এটা (অর্থাৎ আল্লাহ ও তার রাসূলের পূর্ণ আনুগত্যই) একমাত্র মাধ্যম যা তাঁর নৈকট্য দিতে পারে এবং তার রহমতের দরজা খুলতে ও জান্নাতে প্রবেশ করাতে সক্ষম। তাই বলছেনঃ (হে ঈমানদারগণ তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং তার কাছে অসীলা (পূর্ণ আনুগত্যের মাধ্যমে নৈকট্য) অন্বেষণ কর আর তার রাস্তায় জিহাদ কর যাতে করে তোমরা সফলকাম হতে পার)। {সূরা আল-মায়িদাহ: ৩৫}। নেককার বান্দাদেরকে যারা অসীলা হিসাবে গ্রহণ করে এমন মুর্থ, চেতনাহীন লোকদেরকে আল্লাহ তা'আলা পরিহাস করেছেন কারণ তারা নেককার বান্দাদেরকে অসীলা বানাচ্ছে, অথচ নেককার বান্দারা নিজেরাই এই অসীলা তথা আল্লাহর আনুগত্য দ্বারা নৈকট্য হাসিলের অধিক মুখাপেক্ষী। আর এ ছাড়া আল্লাহর নৈকট্য লাভের দ্বিতীয় কোন পথ নেই, যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন: (তারা যাদের আহবান করছে তারা নিজেরাই তাদের প্রভুর নৈকট্য লাভের জন্য অসীলা খুঁজছে। তারা তার রহমতের আশা করছে, তার শাস্তির ভয় করছে, নিশ্চয়ই আপনার প্রভুর শাস্তি ভীতিপ্রদ)। {সূরা আল-ইসরা: ৫৭}। বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, এ সমস্ত অমনযোগী লোকেরা যাদেরকে মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করেছে তাদের সত্তার উপর ভরসা করে থাকার ফলে নেক আমল করা থেকে বিরত থাকছে, খারাপ

কাজে অভ্যস্ত হয়ে পড়ছে। যা মুসলমানদের অধঃপতনের কারণ হয়েছে। তারা ভুলে গেছে বা ভুলে থাকার ভান করছে যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলকে - যিনি সমস্ত মানব সন্তানের নেতা - তাঁকে সম্বোধন করে বলেছেনঃ (বলুনঃ আমি আমার নিজের কোন উপকার বা ক্ষতি করার ক্ষমতা রাখিনা)। {সূরা আল-আ'রাফ: ১৮৮} অনুরূপভাবে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর কলিজার টুকরা কন্যাকে সম্বোধন করে বলেছেনঃ (হে ফাতিমা ! আমার কাছে যত সম্পদ আছে তার থেকে যা ইচ্ছা হয় চেয়ে নাও, আমি আল্লাহর কাছে তোমার কোন কাজে আসবনা)। {বুখারী ও মুসলিম}। তিনি আরো বলেন : (যখন কোন মানুষ মারা যায় তখন তার সমস্ত আমল বন্ধ হয়ে যায়, কেবলমাত্র তিনটি আমল ব্যতীত...)। {মুসলিম}। যদি নবীগণ ও নেক্কার লোকদের ব্যক্তিসত্তার অসীলা গ্রহণ জায়েয না হওয়ার ব্যাপারে কোন দলীল না থাকত, বরং আমাদের সামনে উমর (রাতিয়াল্লাহু আন্হু) এর সেই ঘটনাটিই শুধু থাকত, যাতে তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মৃত্যুর পর তাঁর অসীলা বাদ দিয়ে তার চাচা আব্বাসের দুআ'র শরণাপন্ন হয়েছিলেন, তবে অসীলাবাদী এ দলের মুলোৎপাটনে তাই যথেষ্ট হত।

ইমাম আবু হানীফা (রাহমাতুল্লাহু আলাইহি) কতই না সুন্দর বলেছেন: "আমি আল্লাহর কাছে আল্লাহ ব্যতীত অপর কিছু মাধ্যমে কিছু চাওয়াকে হারাম মনে করি" দুররে মুখতার ও হানাফীদের অন্যান্য কিতাবে তা ইমাম সাহেব থেকে বর্ণিত আছে। যদি ব্যক্তি

স্বত্ত্বা দ্বারা অসীলা দেয়া জায়েজ হতো, তবে কুরআন ও হাদীসের যাবতীয় দুআ' যার সংখ্যা অগণিত তা ব্যক্তি সত্তার অসীলা দিয়েই আসত। (কিন্তু তার একটিও সেভাবে আসেনি)।

তিনঃ যারা স্রষ্টা ও সৃষ্টির মাঝে মাধ্যম বলতে বুঝেছেন সেই রিসালাতকে যার মানে হলো দ্বীন প্রচার, শিক্ষাদান ও দ্বীনের প্রশিক্ষণ। তারা এই রিসালাতের উচ্চ মর্যাদা এবং এর প্রতি মানব জাতির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছেন। ফলে তারা শরয়ী বিধান লাভের উদ্দেশ্যে এবং ঐশী বাণী বা ওহীর আলোকে আলোকিত হওয়ার জন্য রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বড় মাধ্যম এবং বৃহৎ অসীলা হিসাবে গ্রহণ করেছেন। যেমনিভাবে তারা কুরআন অধ্যয়ন করছেন তেমনিভাবে তারা রাসূলের পবিত্র জীবনী ও তার সুন্নাত অধ্যয়ন করছেন। এতে তাদের শ্লোগান হচ্ছে আল্লাহর বাণীঃ (নিশ্চয়ই তোমাদের কাছে আল্লাহর কাছ থেকে নূর এবং সুস্পষ্ট গ্রন্থ এসেছে, এর দ্বারা যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির পিছনে ধাবিত হয় আল্লাহ তাদেরকে হিদায়াত প্রদান করেন, আর তাদেরকে তাঁর ইচ্ছা মোতাবেক অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে যান, এবং সরল সোজা পথে পরিচালিত করেন)। {সূরা আল-মায়িদাহ্: ১৫, ১৬}। এরাই হলো মুক্তি প্রাপ্ত দল যাদের কথা পূর্বোক্ত হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, এবং তাদেরকেই জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়: এ গ্রুপের পথ বিপদসংকুল, কন্টকাকীর্ণ। কেননা সত্যিকার ইসলাম আজ অপরিচিত হয়ে পড়েছে। অধিকাংশ মুসলমান এর থেকে অনেক দূরে সরে গেছে।

তারা এ দ্বীনকে বিদআত ও মনগড়া রসম রেওয়াজে পরিবর্তন করেছে। এই রোগ অতি পুরাতন, এ ব্যাপারে সংস্কারকদের ভূমিকা খুব ভয়াবহ ও কষ্টসাধ্য। উমর বিন আব্দুল আজীজ (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেছেন (আমরা এমন কাজ সংস্কার করতে চেষ্টা করছি যাতে আল্লাহ ছাড়া আমাদের আর কোন সাহায্যকারী নেই, যে কাজ করতে গিয়ে বৃদ্ধরা তাদের জীবন শেষ করেছে, আর ছোট ছোট ছেলেরা যুবক হতে চলেছে, বেদুঈনগণ তাদের বাস্তু ত্যাগ করে চলে গেছে। তারা এটাকে দ্বীন (ধর্ম) মনে করেছে অথচ এটা আল্লাহর কাছে দ্বীন বলে সাব্যস্ত নয়)। অবশ্য এটা নতুন কিছু নয়, কারণ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দ্বীনের এ করুণ দৃশ্যের কথা বর্ণনা করতে যেয়ে বলেছেন, (ইসলাম অপরিচিত হিসাবে শুরু হয়েছে। যেভাবে তা শুরু হয়েছিল সেভাবে আবার (অপরিচিত) অবস্থায় ফিরে আসবে। সুতরাং গরীব (এই অপরিচিত) দের জন্যই সুসংবাদ) হাদীসটি মুসলিম শরীফে আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আন্হু) থেকে বর্ণিত। অপর বর্ণনায় এসেছে, (বলা হলঃ হে আল্লাহর রাসূল এই গরীব (অপরিচিত) রা কারা? বললেনঃ বিভিন্ন গোত্র থেকে উত্থিত বিক্ষিপ্ত কতক ব্যক্তিবর্গ) আহমাদ, ইবনে মাজা। তিরমিযীর এক (হাসান) বর্ণনায় এসেছে, (এই গরীবদের জন্য সুখবর যারা আমার সুন্নাতের যে অংশ মানুষ নষ্ট করেছে তা পূর্ণঃ সংস্কার করে চালু করেছে)। মুসনাদে আহমাদে অপর এক সহীহ বর্ণনায় এসেছে, (এই গরীব (অপরিচিত) গণ হলোঃ অনেক

খারাপ লোকের মাঝখানে এমন কিছু ভাল লোক, যাদের অনুসারীর চেয়ে বিরোধীরাই হবে বেশী)।

সুতরাং এ গ্রুপকেই সংস্কার কাজে এগিয়ে যেতে হবে, সংস্কারের আলোতে মুসলমানদের জাগিয়ে পুনরায় সঠিক ইসলামের দিকে ফিরিয়ে নিতে হবে। আর বিরোধীতা ও বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের আমরা তাই বলব যা আল্লাহ তা'আলা তাদের পূর্বসূরীদেরকে বলেছেনঃ (আমাদের কি হলো যে, আমরা আল্লাহর উপর ভরসা করবনা অথচ তিনি আমাদেরকে যাবতীয় পথের দিশা দিয়েছেন? আর আমরা তোমাদের শত আঘাতের বিপরীতে ধৈর্য্য ধারণ করবো, ভরসাকারীগণ যেন শুধু আল্লাহর উপরই ভরসা করেন)। {সূরা ইব্রাহীম: ১২} [লেখকঃ ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া, সূত্র : ইসলাম প্রচার ব্যুরো, রাবওয়াহ, রিয়াদ, সৌদিআরব]

বরকত হাসিল - আত -তাবাররুক

আত-তাবাররুক অর্থ বরকত চাওয়া বা শুভ কামনা করা। কোন জিনিস দ্বারা বরকত চাওয়ার অর্থ ঐ জিনিসের মাধ্যমে শুভ কামনা করা। নিঃসন্দেহে যাবতীয় কল্যাণ ও বরকত আল্লাহ তা'আলার হাতে। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় ইচ্ছা অনুযায়ী কিছু সৃষ্টির মধ্যে অনুগ্রহ ও বরকত রেখে দিয়েছেন। বরকতের প্রকৃত অর্থ হচ্ছেঃ স্থায়ীত্ব ও প্রয়োজনীয়তা। আবার বৃদ্ধি এবং দুআ অর্থেও আসে। যেমন- বলা হয়ে থাকে بَرَكَ عَلَيْهِ অর্থঃ তার জন্য বরকতের দুআ করা হয়েছে। বলা হয় بَارَكَ اللَّهُ الْمُنِيِّءُ، بَارَكَ فِيهِ أَوْ بَارَكَ عَلَيْهِ অর্থঃ আল্লাহ তা'আলা

ঐ জিনিসে বরকত প্রদান করেছেন। আর **تبارك** (বরকতময় হওয়া) শব্দটি শুধুমাত্র আল্লাহ্ তাআলার জন্য নির্দিষ্ট।

এটা বলা যাবে না যে অমুক ব্যক্তি বরকতময়। কেননা বরকত শব্দের অর্থ বড় ও মহান। অতএব এ গুণ আল্লাহ্ তাআলা ব্যতীত অন্য কারো জন্য হতে পারে না। কুরআনুল কারীমে বরকত শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যথাঃ

১. চিরস্থায়ী কল্যাণ প্রতিষ্ঠিত হওয়া।
 ২. কল্যাণ অধিক হারে হওয়া ও ধারাবাহিকতা বজায় থাকা।
 ৩. তাবারাকা শব্দটি শুধুমাত্র আল্লাহ্ তাআলার জন্যই নির্দিষ্ট। তিনি ব্যতীত অন্য কারো জন্য এ শব্দ ব্যবহার করা যাবে না।
- ইবনে কাইয়িম (রহ.) বলেন, আল্লাহ্ সুবহানাহ্ ওয়া তাআলা বরকতময়, তাঁর দান স্থায়ী, তাঁর দেয়া কল্যাণ অফুরন্ত, তাঁর মর্যাদা সুউচ্চ, তিনি অতি মহান, পূত-পবিত্র এবং যাবতীয় কল্যাণ একমাত্র তাঁর পক্ষ থেকেই আসে। তিনি তাঁর সৃষ্টির মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা কল্যাণ দান করেন এটাই হচ্ছে তাবারাকা এর প্রকৃত অর্থ যা কুরআনে রয়েছে।

বিভিন্ন শ্রেণীর কল্যাণকর বিষয়

১. কুরআনুল কারীম কল্যাণময়। এতে দুনিয়া ও আখিরাতের অনেক কল্যাণ নিহিত রয়েছে। আর এ বরকত বা কল্যাণ অর্জন করা যায় বিশুদ্ধভাবে তিলাওয়াত এবং কুরআনের বিধান অনুযায়ী আমল করার মধ্য দিয়ে। যা একমাত্র আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য হতে হবে।

২. মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কল্যাণময়। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর মধ্যে অনেক কল্যাণ বা বরকত রেখেছেন।

এ বরকত দু'প্রকারের।

(ক) পরোক্ষ বরকতঃ আর এটা অর্জিত হয় ইহকাল ও পরকালে তাঁর রেসালাতের বরকতের মধ্য দিয়ে। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে জগৎবাসীর জন্য রহমত স্বরূপ প্রেরণ করেছেন। তিনি মানব জাতিকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে এসেছেন। মানুষের জন্য পবিত্র জিনিস হালাল করেছেন এবং অপবিত্র জিনিস হারাম করেছেন। তাঁকে দিয়ে নবুয়্যতের ইতি টানা হয়েছে এবং তাঁর আনীত দ্বীন হচ্ছে সহজ, সরল, মহানুভব এবং উদার।

(খ) প্রত্যক্ষ বরকত বা কল্যাণ দু'প্রকার

১. তাঁর কর্মের মধ্যে বরকত। তা হলো আল্লাহ তা'আলা তাঁকে উজ্জ্বল সুস্পষ্ট মুজিয়া দিয়ে সত্যায়িত করেছেন।

২. তিনি সত্ত্বাগত ভাবেই বরকতময়। যা অনুভব করা যায়। এ জন্য সাহাবায়ে কেরাম তাঁর জীবদ্দশাতেই তাঁর থেকে বরকত হাসিল করেছেন ও তাঁর মৃত্যুর পর তার দেহে ব্যবহৃত অবশিষ্ট বস্তুর মাধ্যমে বরকত হাসিল করেছেন। আল্লাহর নবীর জীবদ্দশাতে সাহাবায়ে কেরাম তাঁর থেকে বরকত হাসিল করেছেন, তাঁর উপর কিয়াস করে অন্য কারো থেকে এমন বরকত হাসিল করা যাবে না।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে আল্লাহ তাআলা সকল নবী (আ) এর মাঝে অফুরন্ত বরকত রেখেছেন^{৪৫৬}।

অনুরূপভাবে আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদের মাঝে এবং নেককার বান্দাদের মাঝেও বরকত রেখেছেন। কিন্তু তাদের ব্যাপারে কোন প্রমাণ না থাকায় তাদের থেকে বরকত হাসিল করা বৈধ নয়। অনুরূপভাবে এমন কিছু স্থান আছে যা বরকতময়। যথা

১. মসজিদে হারাম,

২. মসজিদে নববী ও

৩. মসজিদে আক্কা। অতঃপর বিশ্বের সকল মসজিদ। এভাবে তিনি অনেক সময়কেও বরকতময় করেছেন। যথা-রমযান মাস, লাইলাতুল কদর, জিল হজ্জের প্রথম ১০দিন, আশহরে হুরম বা সম্মানিত মাস সমূহ, সোমবার, বৃহস্পতিবার, শুক্রবার, প্রতি রাতের দুই তৃতীয়াংশে আল্লাহ তাআলার প্রথম আকাশে নেমে আসার মুহূর্ত ইত্যাদি। এ সময়গুলো বরকতময়। কিন্তু দুঃখের বিষয় মুসলিমগণ এ থেকে বরকত হাসিল করে না। অথচ এ সময়গুলোতে শরীয়ত সমর্থিত নেক আমল দ্বারা কল্যাণ অর্জন করা উচিত।

৩. আবার কিছু জিনিস রয়েছে যা বরকতময়। যথাঃ যমযমের পানি, বৃষ্টির পানি ইত্যাদি। এগুলোর মধ্যে বরকতের অর্থ হল, মানুষ পান করবে, গবাদি পশু পান করবে এবং তা দ্বারা জমিনে ফসল উৎপন্ন করবে। অনুরূপ ফল-মূল, যাইতুন, খেজুর, দুধ, ঘোড়া, ছাগল, উট ইত্যাদিও বরকতময়। মানুষ এগুলো দ্বারা অনেক কল্যাণ অর্জন

^{৪৫৬} আত-তাবাররক ওয়া আনওয়াউহ, ওয়া আহকামুহ, ড. নাছির আলজাদী: ২১-৬৯ পৃ

করবে। শরীয়তসম্মত যে সকল জিনিসের মাধ্যমে বরকত অর্জন করা যায় তার কিছু উদাহরণ নিম্নে পেশ করা হলঃ

১. আল্লাহর যিকির ও কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে বরকত হাসিল করা

আল্লাহর যিকির ও কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে বরকত হাসিল করা যায়, তবে শর্ত হল তা শরীয়ত সম্মত হতে হবে। মনে মনে জিকির করা, মুখে জিকির করা এবং কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী সৎকাজ করা। কেননা এ সকল বরকত দ্বারা আত্মা প্রশান্তি লাভ করে। সৎকাজের জন্য আত্মা শক্তি সঞ্চয় করে, বিপদ-আপদে মুক্তি পাওয়া যায়, দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ সাধিত হয়, গুণাহ মাফ হয় ও প্রশান্তি অবতীর্ণ হয়। কুরআন কিয়ামতের দিন তার জন্য সুপারিশ করবে। কুরআন ঘরে এবং গাড়িতে টানিয়ে বা ঝুলিয়ে রাখার মধ্যে কোন বরকত নেই, বরং বরকত হচ্ছে তা তিলাওয়াত করা ও সে অনুযায়ী আমল করার মাধ্যমে^{৪৫৭}।

২. রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর জীবদ্দশায় তাঁর সত্ত্বা থেকে বরকত লাভ করা। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর জীবদ্দশায় তাঁর সত্ত্বা থেকে বরকত লাভ করা শরীয়তসম্মত। কেননা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সত্ত্বাগতভাবে বরকতময় ছিলেন। এজন্য সাহাবায়ে কেরাম তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর থেকে অনেক বরকত অর্জন করেছেন। আবু জুহাইফা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)

^{৪৫৭} আত-তাবাররুক ওয়া আনওয়াউহ, ওয়া আহকামুহ, ড. নাছির আলজাদী: ২০১-২৪১ পৃ

একদিন দ্বি-প্রহরে এক সমতল ভূমিতে বের হলেন, অতঃপর অযু করে যোহরের দু'রাকাত ও আসরের দু'রাকাত সালাত আদায় করলেন। এর পর লোকজন এসে তাঁর হাত মুবারক স্পর্শ করে নিজ নিজ মুখ-মন্ডলে মাসেহ করে নিলেন।

আবু জুহাইফা (রা:) বলেন, অতঃপর আমি তাঁর হাত ধরলাম এবং আমার মুখ মন্ডলেও মাসেহ করে নিলাম। তখন তা আমার নিকট বরফ থেকে শীতল এবং মিশকের ঘ্রাণ থেকেও সুগন্ধিময় অনুভূত হল^{৪৫৮}। হাদীসে রয়েছে :

وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى مِنِّي فَأَتَى
الْجُمُرَةَ فَرَمَاهَا ثُمَّ أَتَى مَنْزِلَهُ يَمِينِي وَتَحَرَّثُ ثُمَّ قَالَ لِلْحَلَّاقِ خُذْ وَأَشَارَ إِلَى جَانِبِهِ
الْأَيْمَنِ ثُمَّ الْأَيْسَرَ ثُمَّ جَعَلَ يُعْطِيهِ النَّاسَ، وَفِي رِوَايَةٍ: ثُمَّ دَعَا أَبَا طَلْحَةَ
الْأَنْصَارِيَّ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ ثُمَّ نَازَلَهُ الشِّقُّ الْأَيْسَرَ فَقَالَ احْلِقْ فَحَلَقَهُ فَأَعْطَاهُ أَبَا
طَلْحَةَ فَقَالَ أَقْسِمُ بِهِ بَيْنَ النَّاسِ. (مسلم)

অর্থঃ আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, (হজ্বের সময়) রাসূল মিনায় এলেন ও জামরায় এসে পাথর নিক্ষেপ করলেন। এরপর মিনায় এসে কুরবানী করলেন এবং নাপিতকে নিজের মাথার ডান ও বাম পাশের চুল কাটতে ইশারা করলেন। চুল কাটার পর কর্তিত চুল উপস্থিত সাহাবাগণের মাঝে বিলিয়ে দিলেন। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, অতঃপর রাসূল আবু তালহা আল-আনসারীকে ডাকলেন এবং তাকে ডানপার্শ্বের চুলগুলো দিয়ে দিলেন। তারপর নাপিত বাম দিকের চুলগুলো কাটলে সে চুলগুলোও আবু তালহা (রাঃ) কে দিয়ে

^{৪৫৮} বুখারী : ৩৫৫৩

বললেন, এগুলো মানুষের মাঝে বন্টন করে দাও^{৪৫৯}। সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর জামা, অযুর অতিরিক্ত পানি, যে স্থানে তাঁর হাতের আঙ্গুল থেকে পানি প্রবাহিত হয়েছে সে স্থান, তাঁর পানকৃত পানির অবশিষ্টাংশ ইত্যাদি থেকে বরকত হাসিল করতেন। যেমন, তাঁর ব্যবহৃত জামা, জুতা ইত্যাদি যা তাঁর শরীরের সাথে মিশে থাকত^{৪৬০}।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে অন্য কাউকে তুলনা করা যাবে না। কেননা তিনি ব্যতীত কোন সাহাবী বা অন্য কারো থেকে বরকত হাসিল প্রসঙ্গে তাঁর কোন নির্দেশনা পাওয়া যায়নি। সাহাবায়ে কেরাম থেকেও এমন কোন বর্ণনা পাওয়া যায়নি যে, তারা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ব্যতীত অন্য কোন অলী বা সাহাবায়ে কেরামের জীবদ্দশায় বা মৃত্যুর পর তার কোন কিছু দ্বারা বরকত হাসিল করেছেন। মুহাজির ও আনসার সাহাবীগণের কেউ এমনটি করেননি। খোলাফায়ে রাশেদীনের সাথেও কেউ এমন করেননি, দুনিয়াতে জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত ১০জন সাহাবীর সাথেও কেউ এমনটি করেননি। ইমাম শাতেবী (রহ.) বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ওফাতের পর তার অনুপস্থিতিতে এমন কাজে কোন সাহাবী লিপ্ত হননি। এমনকি তাঁর পরে আবু বকর (রাঃ) কে তাঁর উম্মতের মধ্যে সর্বোত্তম বলে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে। তাঁর দ্বারাও কেউ বরকত হাসিল

^{৪৫৯} মুসলিম :১৩০৫

^{৪৬০} আত-তাবাররুক ওয়া আনওয়াউহ, ওয়া আহকামুহু, ড. নাছির আলজাদী: ২৪৮-২৫০ পৃ

করেননি। অথচ তিনি মুসলিমদের খলিফা ছিলেন। অনুরূপ উমর (রাঃ) এর দ্বারাও কেউ বরকত হাসিল করেননি। অথচ তিনি আবু বকরের (রাঃ) পর উম্মতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন। অনুরূপ উসমান (রাঃ) এবং আলী (রাঃ) দ্বারাও কেউ বরকত হাসিল করেননি। এভাবে অন্য কোন সাহাবী থেকেও বরকত হাসিল করা হয়নি। অথচ তাঁরা ছিলেন উম্মতের মধ্যে শ্রেষ্ঠতর মানুষ। কোন সহীহ বর্ণনাতে এ কথা নেই যে, এভাবে তারা একে অপর থেকে বরকত হাসিল করেছেন^{৪৬১}। নিঃসন্দেহে আলেমদের ইলম, তাদের ওয়াজ-নসিহত শ্রবণ ও দুআ দ্বারা বরকত হাসিল করা যাবে। তাদের সাথে কোন জিকিরের মজলিসে অংশগ্রহণের মাধ্যমে বরকত লাভ করা যাবে, তাতে কল্যাণ, বরকত ও উপকার রয়েছে। কিন্তু কোন ব্যক্তির সত্ত্বা দ্বারা কোন বরকত হাসিল করা যাবে না বরং তাদের বিশুদ্ধ ইলম অনুযায়ী আমল করা যাবে ও আহলুস্ সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের অনুসরণ করা যাবে^{৪৬২}।

৩. যমযমের পানি দ্বারা বরকত হাসিল করা। যমযমের পানি দ্বারা বরকত হাসিল করা বৈধ। কেননা পৃথিবীতে এটাই সর্বোত্তম বরকতময় পানি, যা পান করলে পিপাসা দূর হয় এবং ক্ষুধা নিবারণ হয়। বিশুদ্ধ নিয়তে পান করলে যে কোন রোগের জন্য ঔষধ হিসেবে কাজ করে। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যমযম পানি সম্পর্কে বলেনঃ

^{৪৬১} আত-তাবাররুক ওয়া আনওয়াউছ, ওয়া আহকামুহু, ড. নাছির আলজাদী: ২৬১-২৬৯ পৃ

^{৪৬২} আত-তাবাররুক ওয়া আনওয়াউছ, ওয়া আহকামুহু, ড. নাছির আলজাদী: ২৬৯-২৭৮ পৃ

(قَالَ إِنَّهَا مُبَارَكَةٌ إِنَّهَا طَعَامٌ طَعْمٌ وَشِفَاءٌ سَقِيمٌ). (مسلم)

অর্থঃ এ পানি অত্যন্ত বরকতময়, এ পানি হচ্ছে ক্ষুধার্তের খাদ্য এবং রোগীর চিকিৎসা^{৪৬৩}। জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ

(مَاءٌ زَمْزَمٌ لِمَا شُرِبَ لَهُ). (ابن ماجه)

অর্থঃ যমযমের পানি যে নিয়তে পান করবে তা পূরণ হবে^{৪৬৪}। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যমযমের পানি চিকিৎসা ও আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভের জন্য ব্যবহার করতেন। তিনি তা রোগীর গায়ে ছিটিয়ে দিতেন এবং পান করাতেন^{৪৬৫}।

৪. বৃষ্টির পানি দ্বারা বরকত হাসিল করা

বৃষ্টির পানি দ্বারা বরকত হাসিল করা যাবে। বৃষ্টির পানি বরকতময়, আল্লাহ তা'আলা এতে অফুরন্ত বরকত রেখেছেন। মানুষ, পশু-পাখি, কীট-পতঙ্গ এ পানি পান করে থাকে এবং উদ্ভিদ, গাছ-পালা, ফল-ফলাদি ইত্যাদি এ পানির মাধ্যমেই উৎপন্ন হয়ে থাকে। এর দ্বারা আল্লাহ তা'আলা সকল জিনিসকে জীবিত করে থাকেন। আনাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আমরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে ছিলাম।

এমন সময় আমাদের বৃষ্টিতে পেয়ে গেল। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজ শরীরের কিয়দংশ উন্মুক্ত করে দিলে তা বৃষ্টিতে ভিজে গেল। তখন আমরা

^{৪৬৩} মুসলিম :২৪৭৩

^{৪৬৪} ইবনে মাজা :৩০৬২

^{৪৬৫} তিরমিযী :৯৬৩

বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! এমনটি করলেন কেন? উত্তরে তিনি বললেন, "এটা হচ্ছে তার রবের নতুন বরকত"^{৪৬৬}।

ইমাম নববী (রহ.) বলেন, হাদীসে বর্ণিত শব্দের অর্থ হল, তার রবের পক্ষ থেকে নতুন নিয়ামত ও বরকত। অর্থাৎ এ বৃষ্টি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে মানুষের জন্য অনুগ্রহ। মানুষ এর দ্বারা অনেক বরকত হাসিল করে থাকে^{৪৬৭}।

যা দ্বারা বরকত হাসিল নিষিদ্ধ

(১) রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ইন্তেকালের পর তাঁর দ্বারা বরকত লাভ করা

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ইন্তেকালের পর তাঁর দ্বারা দু'ভাবে বরকত হাসিল করা যাবে। অন্য কোন উপায়ে তাঁর থেকে বরকত হাসিল করা নিষিদ্ধ।

প্রথমঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উপর ঈমান আনা, তাঁর আনুগত্য এবং অনুসরণ করা। যে ব্যক্তি উক্ত কাজগুলো করবে সে অফুরন্ত কল্যাণ এবং দুনিয়া ও আখিরাতের সৌভাগ্য লাভ করবে।

দ্বিতীয়ঃ তাঁর ইন্তেকালের পর যে সকল জিনিস অবশিষ্ট রয়েছে তার থেকে বরকত হাসিল করা। যথা-তাঁর জামা অথবা চুল অথবা তাঁর ব্যবহৃত পানি ইত্যাদি। এ ছাড়া অন্য কোন ভাবে তাঁর থেকে বরকত হাসিল করা শরীয়ত সম্মত নয়। তাঁর কবর দ্বারা বরকত হাসিল

^{৪৬৬} মুসলিম :৮৯৮

^{৪৬৭} শরহে মুসলিম - ইমাম নববী (র) :৬/৪৪৮

করা যাবে না। কেবল মাত্র তাঁর কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করা যাবে না। বরং তিনটি মসজিদের যে কোন একটির উদ্দেশ্যে সফর করা যাবে -

১. মসজিদে হারাম,

২. মসজিদে নববী ও

৩. মসজিদে আকসা।

এ ছাড়া সব সময় যে মদীনায় বসবাস করে আসছে তার জন্য নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কবর যিয়ারত করা মুস্তাহাব। অথবা কেউ মসজিদে নববী যিয়ারতের উদ্দেশ্যে এলে তার জন্যও কবর যিয়ারত করা মুস্তাহাব।

রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কবর যিয়ারতের সহীহ নিয়ম

মসজিদে নববীতে প্রবেশ করে প্রথমে দু'রাকাত তাহিয়্যাতুল মাসজিদ সালাত আদায় করা। অতঃপর কবরের দিকে গিয়ে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে হুজরার দিকে মুখ করে ক্ষীণ আওয়াজে আদবের সাথে বলা "আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলান্নাহ"। আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) এর চেয়ে অতিরিক্ত কিছু বলতেন না। কখনও অতিরিক্ত কিছু বলতে চাইলে বলতেনঃ

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، يَا خَيْرَ اللَّهِ مِنْ خَلْقِهِ، أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ حَقًّا،
وَأَنَّكَ قَدْ بَلَغْتَ الرِّسَالَةَ، وَأَدَّيْتَ الْأَمَانَةَ، وَجَاهَدْتَ فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، وَ
(نَصَحْتَ الْأُمَّةَ). (فتاوى ابن باز في الحج والعمرة)

অর্থঃ হে আল্লাহর রাসূল। আপনার প্রতি সালাম, হে আল্লাহর সৃষ্টির সর্বোত্তম ব্যক্তি! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয়ই আপনি আল্লাহর সত্য নবী, নিশ্চয়ই আপনি আপনার রেসালাত পৌঁছে দিয়েছেন, আল্লাহর বিধান বাস্তবায়নে আপনার সর্বশক্তি ব্যয় করেছেন এবং আপনি জাতিকে সত্যের উপদেশ দিয়েছেন। এগুলো বলতে কোন দোষ নেই। কেননা এগুলো তাঁর বৈশিষ্ট্যাবলী^{৪৬৮}।

তাঁর কবরের কাছে এ ধারণা করে দুআ করা যাবে না যে, তাঁর কাছে দুআ করলে কবুল হয়, তাঁর কবরের কাছে গিয়ে তাঁর নিকট সুপারিশ প্রার্থনা করা যাবে না। (বরকততের জন্য) তাঁর কবর, কবরের ধূলো-বালি শরীরে মাসেহ করা বা তাঁর কবরে অথবা কবরের পার্শ্বের কোন জিনিস (ইট, পাথর, দেয়াল ইত্যাদি) চুমু দেয়া যাবে না। এছাড়া রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যে যায়গায় বসেছেন, যেখানে সালাত আদায় করেছেন, যে পথ দিয়ে চলাচল করেছেন, যে স্থানে তার নিকট অহী এসেছে, যে স্থানে তিনি জন্ম গ্রহণ করেছেন, যে রাতে জন্ম গ্রহণ করেছেন, যে রাতে মিরাজ হয়েছে এবং তাঁর হিজরতের রাস্তা ইত্যাদি দ্বারা বরকত গ্রহণ করা যাবে না। এক কথায় যে সকল জিনিস দ্বারা বরকত গ্রহণ করা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে অনুমোদিত নয় তা দ্বারা বরকত হাসিল করা যাবে না^{৪৬৯}।

^{৪৬৮} মাজমুয়ায়ে ফতোয়ায়ে ইবনে বায র.: ৫/২৮৯

^{৪৬৯} আত-তাবাররুক ওয়া আনওয়াউহ, ওয়া আহকামুহ, ড. নাছির আল-জাদী: ৩১৫-৩৮০ পৃ

২. কোন নেককার লোক দ্বারা বরকত হাসিল : কোন নেককার বা বুয়ুর্গের ব্যক্তিস্বত্ত্বা, তাদের কোন নিদর্শন, ইবাদতের স্থান থেকে, বাসস্থান এবং তাদের কবর দ্বারা বরকত হাসিল করা যাবে না। তাদের মাজার জিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করাও যাবে না। তাদের কবরের পাশে সালাত আদায় করা যাবে না। তাদের কবরের কাছে গিয়ে নিজের প্রয়োজন পূরণের জন্য কিছু প্রার্থনা করা, কবর স্পর্শ করা ও কবরের পাশে ইতেকাফ করা যাবে না। তাদের জন্ম বার্ষিকী, ওরস ইত্যাদি পালন করা যাবে না।

কেউ যদি এ বিশ্বাস নিয়ে বুয়ুর্গদের নৈকট্য লাভের জন্য উপরোক্ত কোন কাজ করে যে, বুয়ুর্গগণ তাদের উপকার করতে পারে বা তাদের ক্ষতি করতে পারে অথবা তাদের কোন জিনিস দিতে পারে বা কোন জিনিস থেকে বঞ্চিত করতে পারে, তাহলে সে আল্লাহর সাথে বড় ধরনের শিরক করল। যে ব্যক্তি এ সকল বুয়ুর্গ দ্বারা বরকত হাসিলের মাধ্যমে আল্লাহর নিকট থেকে বরকত হাসিল করতে চায় সে বিদআতে লিপ্ত হল এবং অত্যন্ত ঘৃণিত কাজে লিপ্ত হল^{৪৭০}।

৩. পাহাড় বা কোন স্থান দ্বারা বরকত হাসিল করা: পাহাড় বা কোন স্থান দ্বারা বরকত হাসিল করা নিষিদ্ধ। কেননা এটা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর শরীয়ত পরিপন্থী। এগুলো দ্বারা বরকত হাসিলের মাধ্যমে এসবের সম্মান বাড়িয়ে দেয়া হয়। এগুলোকে হাজরে আসওয়াদ ও বায়তুল্লাহর তাওয়াফের উপর

^{৪৭০} আত-তাবাররুক ওয়া আনওয়াউছ, ওয়া আহকামুহু, ড. নাছির আলজাদী: ৩৮১-৪১৮ পৃ

কিয়াস করা বৈধ নয়। কেননা এ দু'টো আল্লাহর ইবাদত। হাজরে আসওয়াদ ও রোকনে ইয়ামানী ব্যতীত অন্য কোন পাথর স্পর্শ করা যাবে না। কেননা সকল আলেম ঐকমত্য হয়েছেন যে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রোকনে ইয়ামানী ব্যতীত অন্য কোন রোকন স্পর্শ করেননি^{৪৭১}।

ইমাম ইবনুল কাইয়িম (রহ.) বলেন, দুনিয়াতে হাজরে আসওয়াদ ও রোকনে ইয়ামানী ব্যতীত এমন কোন পাথর বা স্থান নেই যা চুম্বন করা শরীয়ত সিদ্ধ এবং তা গুনাহ মার্জনাকারী^{৪৭২}। তিনি মক্কার বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, পৃথিবীতে মক্কা নগরী ব্যতীত অন্য কোন স্থান এমন নেই যেখানে তাওয়াফ বা সাযী করা জায়েয^{৪৭৩}।

শায়খুল ইসলাম (রহ.) কাবা ব্যতীত অন্য কোন ঘরের তাওয়াফ সম্পর্কে লিখেন, এ ধরনের তাওয়াফ হারাম ও বিদআত। এ কাজটি দ্বীন হিসেবে গ্রহণ করলে তাকে তওবা করতে বলা হবে নতুবা তাকে হত্যা করা হবে^{৪৭৪}।

এমনিভাবে মাকামে ইব্রাহীম, অন্য কোন পাথর, মসজিদে হারামের কোন দেয়াল বা হেরা গুহা বা জাবালে নূরকে চুমু দেয়া বা বরকতের জন্য স্পর্শ করা বৈধ নয়। এগুলো জিয়ারত করার উদ্দেশ্যে যাওয়া, তাতে চড়া, তাতে সালাত আদায় করা ঠিক নয়। সাওর পর্বতের দ্বারা বরকত হাসিল করা বা তা জিয়ারতের উদ্দেশ্যে

^{৪৭১} ইকতিয়াউস সিরাতিল মুসতাকীম- ইবনে তাইমিয়াহ (র) :২/৭৯৯

^{৪৭২} যাদুল মায়াদ : ১/৪৮

^{৪৭৩} যাদুল মায়াদ : ১/৪৮

^{৪৭৪} আত-তাবাররুক ওয়া আনওয়াউহ, ওয়া আহকামুহ, ড. নাছির আলজাদী:৪১৯-৪৬৪ পৃ

যাওয়া শরীয়তসিদ্ধ নয়। অনুরূপভাবে জাবালে রহমত ও জাবালে আবি কুবাইস দ্বারাও বরকত গ্রহণ করা ঠিক নয়। এমনভাবে দারুল আরকাম বা অন্য কোন ঘর দ্বারা বরকত হাসিল করা বৈধ নয়। জাবালে তুর জিয়ারত করা বা তা জিয়ারতের উদ্দেশ্যে ভ্রমণ করা বৈধ নয়। মোট কথা কোন পাথর বা গাছ দ্বারা বরকত হাসিল করা যাবে না^{৪৭৫}।

নিষিদ্ধ জিনিস থেকে বরকত হাসিলের কারণ

নিষিদ্ধ জিনিস থেকে বরকত হাসিলের অন্যতম কারণ হল, দ্বীন সম্পর্কে অজ্ঞতা, বুয়ুর্গদের ব্যাপারে অতিরঞ্জন, কাফিরদের সাদৃশ্যতা ও কোন ঐতিহাসিক স্থানের প্রতি সম্মান প্রদর্শন^{৪৭৬}। নিষিদ্ধ জিনিস থেকে বরকত হাসিলের প্রভাব বা প্রতিক্রিয়া অনেক। যেমনঃ শিরকে আকবার : যদি বরকত হাসিল করার পদ্ধতি মৌলিকভাবেই শিরক হয়, তাহলে তার প্রতিক্রিয়া খুবই ভয়ংকর। আর যদি বরকত হাসিলের পদ্ধতি মৌলিকভাবে শিরক না হয় বরং শিরক পর্যন্ত পৌঁছায়, তাহলে তা বড় শিরকের মাধ্যম রূপে গণ্য হবে।

নিষিদ্ধ বিষয় দ্বারা বরকত অর্জনের প্রভাব হলঃ দ্বীনের মধ্যে বিদআত প্রতিষ্ঠা, গুনাহর দিকে ধাবিত হওয়া, মিথ্যার গহ্বর পতিত হওয়া, শরয়ী দলিল বিকৃতি, সুন্নাত বিনষ্টকরণ, মূর্থদের দ্বারা ধোকা খাওয়া, পরবর্তী প্রজন্ম ধ্বংস করণ। আর এসব কিছুই ঘটে হারাম ও ঘৃণিত জিনিস দ্বারা বরকত হাসিলের মাধ্যমে।

^{৪৭৫} আত-তাবাররুক ওয়া আনওয়াউহ, ওয়া আহকামুহ, ড. নাছির আল-জাদী: ৪১৯-৪৬৪ পৃ

^{৪৭৬} আত-তাবাররুক ওয়া আনওয়াউহ, ওয়া আহকামুহ, ড. নাছির আল-জাদী: ৪১৯-৪৬৪ পৃ

নিষিদ্ধ পন্থায় বরকত হাসিল প্রতিরোধের উপায়

ধর্মীয় জ্ঞানের প্রসার, কুরআন ও হাদীসের দাওয়াত, অতিরঞ্জন পরিহার ও বরকত হাসিলের দিকসমূহের স্পষ্ট বর্ণনা। মোট কথা এ সকল বিষয়ের চর্চার মাধ্যমে নিষিদ্ধ পন্থায় বরকত হাসিলের প্রতিরোধ সম্ভব^{৪৭৭}।

আল্লামা সা'দী (রহ.) কিতাবুত তাওহীদে গাছ, পাথর ইত্যাদি দ্বারা বরকত লাভ অধ্যায়ে উল্লেখ করেন যে, এসব শিরকের অন্তর্ভুক্ত এবং এগুলো মুশরিকদের কাজ। কেননা সকল আলেম ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, গাছ, পাথর ও স্থান ইত্যাদি দ্বারা বরকত হাসিল বৈধ নয়। এগুলো বরকতময় মনে করাও বৈধ নয়।

এ সবার কাছে দুআ করা, ইবাদত করা শিরকে আকবার বা বড় শিক। চাই তা মাকামে ইব্রাহিম, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর হুজরা, বায়তুল মুকাদ্দাসের পাথর ইত্যাদি হোক না কেন। তবে হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ ও চুম্বন করা এবং রোকনে ইয়ামেনীতে চুম্বন করা ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত। তাতে রবের বড়ত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। আর এ দু'টি স্থান ছাড়া অন্য সবগুলোতে মাখলুকের বড়ত্ব ফুটে উঠে। প্রথমটিতে আল্লাহর তা'জীম আর দ্বিতীয়টিতে মাখলুকের তা'জীম। এতদুভয়ের মাঝে পার্থক্য হল, আল্লাহর কাছে দুআ করা একত্ববাদ। আর মাখলুকের কাছে দুআ করা শিক^{৪৭৮}।

^{৪৭৭} আত-তাবাররুক ওয়া আনওয়াউছ, ওয়া আহকামুহু, ড. নাছির আল-জাদী: ৪৮৩-৫০৬ পৃ

^{৪৭৮} আল-কাউলুস সাদীদ: ৫১ পৃ

ত্রিশ তম পরিচ্ছেদ - পীর ব্যবসা বা পীরের মুরিদ হওয়া সর্ব
নিকৃষ্ট বিদ'আত এবং তাসাউফ ও তাসাউফ বিস্তারের কারন
এবং বিশদ আলোচনা

নিকৃষ্ট বিদ'আতের সর্ব উৎকৃষ্ট উদাহরণটি হল - পীর ব্যবসা।
কারন এদের কিছু কিছু কাজ বিদ'আত তো বটেই সরাসরি শিরক
এর পর্যায়ে পরে। যেমন এরা নিজেরাই কিছু সামা সংগীত, গজল,
যিকর ইত্যাদি তৈরি করে যার কথাগুলো পুরাপুরি শিরক। আবার
এরা মাজারে গিয়ে দোয়া প্রার্থনা করে এসবও শিরক।

তাসাউফ

তাসাউফ অর্জন এর নাম করেও এরা দ্বীনের ভেতর নতুন জিনিসের
উদ্ভাবন করেছে। যেমনঃ আশিয়া, আউলিয়া, পীর-দরবেশসহ সকল
মৃত মুসলমানের আত্মার মাগফিরাত কামনা করা, তাদের জন্য দুআ
করা। এ মাহফিলে জীবিত-মৃত আউলিয়া-বুজুর্গ, পীর-দরবেশ ও
তাদের খাদেম ভক্তদের কেরামত বয়ান করা হয়। ওয়াজ নসিহতের
মাধ্যমে মানুষকে আয়োজক দরবারের দিকে আকৃষ্ট করা হয়।
আল্লাহর কাছে এ দরবার ছাড়া আর কোন প্রিয় দরবার যে নেই
এটা জোর-জবরদস্তি করে বুঝানো হয় সাধারণ মানুষকে। মীলাদ
পড়া হয়। দরবারে অবস্থিত মাদরাসা, মসজিদ ও খানকাহর জন্য
চাঁদা তোলা হয়।

তাসাউফ বিস্তারের কারণ

তাসাউফ বিস্তারে ভূমিকা রাখে: ইলমে কালামের প্রচার, কারণ
তাতে ছিল গুরুতা, দুর্বোধ্যতা, বিবেক ও বুদ্ধিকে বিচারক মানা ও

গবেষণায় মগ্ন হওয়া, তখন মানুষেরা দেখল তাসাউফে তার থেকে নিষ্কৃতি রয়েছে, কারণ তাতে রয়েছে দার্শনিক জটিলতাহীন কাশফ, স্বপ্ন ও ইলহামের উপর নির্ভরতা ... এভাবে তারা তাসাউফকে ইলমে কালাম ও তার ধারকদের থেকে মুক্তি হিসেবে গ্রহণ করে।

তাসাউফ কি শুধু মুসলিমদের মাঝে সীমাবদ্ধ? ধর্ম ও মাযহাবের উপর গবেষণা পরিচালনাকারীগণ এ বিষয়ে একমত যে, তাসাউফ বিশ্বজনীন দর্শন ও সাধারণ মানবিক মনোবৃত্তি। যা সকল ধর্ম ও সকল জায়গায় পাওয়া যায়। উদ্দেশ্য, উপকরণ, দলেদলে ভাগ ও বিপরীতমুখী আকিদা বিবেচনায় তাসাউফের সবচেয়ে বেশি মিল হিন্দু ধর্মের সাথে। সূফীবাদ বিভিন্ন নাম ও বিভিন্ন তরিকায় ইউরোপ, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য জায়গায় বিস্তার লাভ করেছে, এখনো করছে। ইসলামের সাথে সম্পৃক্ত তাসাউফও বিভিন্ন তরিকা ও বিপরীতমুখী বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত, পাঠকদের সুবিধার্থে আমরা তা দু'ভাগে ভাগ করছি:

তাসাউফের প্রকারসমূহ:

প্রথমত: কটুরপন্থী তাসাউফ

কটুরপন্থী তাসাউফের অনুসারী সূফীরা বাড়াবাড়ির কারণে ইসলাম থেকে বের হয়ে গিয়েছে, (অথবা ইসলামেই প্রবেশ করেনি, তবে ইসলামি পোশাক পরেছে ইসলামকে ধ্বংস করার নিমিত্তে অথবা মুসলিমদের শাস্তি থেকে মুক্তি পাওয়ার উদ্দেশ্যে), এ প্রকার তাসাউফের দু'টি ধারা রয়েছে:

১. দার্শনিক তাসাউফ: দার্শনিক তাসাউফ গ্রীক ও হিন্দু দর্শন শাস্ত্রের উপর নির্ভরশীল, তার ধারকেরা বাতেনিদের নিকটবর্তী, তারা দর্শন শাস্ত্রের ভিত্তিতে ইলাহ ও পৃথিবী সংক্রান্ত বিষয়ে সাধনা করে, এ জন্য দেখি তাদের লেখনী দর্শন শাস্ত্রের পরিভাষায় পরিপূর্ণ, যেমন: (আকল কুললি, নাফসুল কুল্লিয়াহ, 'আরদ, জাওহার, সূরাহ ও হায়উলি)^{৪৭৯}। তারা ইত্তেহাদ (সৃষ্টির সাথে স্রষ্টার একাকার হওয়া) ও ওয়াহদাতুল ওজুদে (সর্বেশ্বরবাদে) বিশ্বাসী। ইসলামের সাথে সম্পৃক্ত তাদের প্রসিদ্ধ ব্যক্তিত্ব হচ্ছে: ইবনে আরাবি ও ইবনুল ফারিদ।

২. বৈরাগী তাসাউফ: বৈরাগ্যতার সাথে সম্পৃক্ত করে বৈরাগী তাসাউফ বলা হয়, এ তাসাউফকে বৌদ্ধিশ তাসাউফও বলা হয়। এ প্রকার তাসাউফ শারীরিক ব্যায়াম, নির্জনতা, পরিশ্রম ও ধ্যানের উপর নির্ভরশীল। বৈরাগী সূফীরা বৌদ্ধদের সাথে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ। কুমন্ত্রণা, হৃদয়ে জাগ্রত ভাবনা ও প্রবৃত্তিকে দমন করার জন্য তারা জমিনে বিচরণ করে ও নির্জনে একান্ত হয়ে সাধনা করে। তারা নেচে-গেয়ে কবিতা আবৃত্তি, গল্প-কাহিনী ও জিকির চর্চা করে। অনুরূপ তারা গুরুত্বারোপ করে অস্বাভাবিক ঘটনা ও কারামতের প্রতি, এসবের জন্য তারা জাদু ও জিনদের ব্যবহার করে।

এ গোষ্ঠীর আকিদা অনেক, যেমন: হুলুল (আল্লাহ কারও শরীরে প্রবেশ করা), ইত্তেহাদ (আল্লাহ তার সৃষ্টির সাথে একীভূত হওয়া বা সৃষ্টি তার স্রষ্টার সাথে একীভূত হওয়া), ওহদাতুল ওজুদ (সর্বেশ্বরবাদ বা সবকিছুতে আল্লাহ আছেন বিশ্বাস করা) ও

^{৪৭৯} সূরাহ হচ্ছে বাহ্যিক দৃশ্য, হায়উলি হচ্ছে উপাদান ধাতু, যেমন চেয়ার হচ্ছে সূরাহ আর তার কাঠ হচ্ছে হায়উলি।

তাফউয়িদ। তাফউয়িদ অর্থ, আল্লাহ তা‘আলা পৃথিবী পরিচালনার দায়িত্ব তথাকথিত কুতুব ও আউলিয়াদের সোপর্দ করেন। ইসলামী বিশ্বের অধিকাংশ সূফীবাদী মতাদর্শে বিশ্বাসী বিভিন্ন তরীকার সূফীরা এ মতাদর্শে বিশ্বাসী, তবে তাদের মাঝে কিছু ভিন্নতা রয়েছে, তাদের কারো সাথে প্রথম প্রকার তাসাউফের অনেক মিল দেখা যায়। অতএব তাসাউফ এক চিন্তা ও মতাদর্শে সীমাবদ্ধ নয়, বরং এক ব্যাপক আদর্শ ও বিপরীতমুখী বিভিন্ন তরীকার সমন্বয়। সূফীরা একই সময়ে বিপরীতমুখী বিভিন্ন আকিদায় বিশ্বাস করে।

দ্বিতীয়ত: বিদ‘আতি তাসাউফ: বর্তমান ও পূর্বের যুগে অনেক মুসলিম ভালো নিয়তে তাসাউফের সাথে সম্পৃক্ত হয়, তাদের ধারণা এটা এক পরিভাষা, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার সাহাবিদের আদর্শের উপর তার ব্যবহার হয়, যেমন মুরাকাবাহ (আত্মপর্যবেক্ষণ), মুহাসাবাহ (আত্মসমালোচনা), আখিরাতের প্রতি উৎসাহ ও দুনিয়ার প্রতি নির্মোহ। তবে তাসাউফের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তির পক্ষে ছোট কিংবা বড় বিদ‘আত থেকে মুক্ত থেকে তা চর্চা করা প্রায় অসম্ভব। তাদের অধিকাংশের আকিদা আল্লাহর সিফাত ও তাকদীর সম্পর্কে সঠিক নয়, দুনিয়া ও অন্যান্য বিষয়ে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি যথাযথ নয়। তাই উম্মতের আকিদা, ইলম ও সভ্যতা বিনষ্ট হওয়ার পেছনে এর প্রভাব সুস্পষ্ট। যে মুসলিম বিশুদ্ধ আকিদা ও ইবাদতের অধিকারী, তার পক্ষে বৈধ নয় তাসাউফ কিংবা অন্য কোনো দলের সাথে সম্পৃক্ত হওয়া, তার সম্পর্ক হবে ইসলাম ও সুন্নতের সাথে, যেমন আমরা পূর্বে বলেছি।

বিভিন্ন ফিরকার সাথে তাসাউফের সম্পর্ক

তাসাউফের সাথে শিয়াদের সম্পর্ক অধিক। শিয়া ও তাসাউফ ওতপ্রোতভাবে জড়িত, তাসাউফের খুব কম শায়খই রয়েছে যার সম্পর্ক আহলে বাইতের সাথে নেই। সূফীরা তাই দাবি করে শিয়ারা যা দাবি করে, যেমন ইলমে বাতিন, দুনিয়ায় কর্তৃত্ব করা ইত্যাদি। শিয়ারা যেমন তাদের ইমামদের ইবাদত করে অনুরূপ সূফীরাও তাদের পীরদের ইবাদত করে।

বাস্তব কথা হচ্ছে, বর্তমান ও অতীতকালের পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের গবেষকগণ ঘোষণা করেছেন, কউরপন্থী তাসাউফ, কউরপন্থী শিয়া ও বাতেনি সম্প্রদায় মূলত এক বস্তুর তিনটি শাখা, অথবা একই বস্তুর তিনটি বাহ্যিক রূপ, যার উদ্দেশ্যও এক, অর্থাৎ ভেতর থেকে ইসলামকে ধ্বংস করা।

সর্বশেষে, আখেরি মুনাজাত ও তাবারুকের ব্যবস্থা থাকে। শুধু তাই নয় এরা যে গান বাজনার আসর বসায়, গানের মাহফিলে নর্তন-কুন্দন, নাচতে নাচতে অজ্ঞান হয়ে যায়, কাপড় ছিঁড়ে ফেলে দুনিয়ার কেউ প্রমান করতে পারবে না রসুলুল্লাহ (সাঃ) বা সাহাবীদের জামানায় এমন কিছু ছিল। অতএব নিসন্দেহে এসব বিদ'আত এবং সম্পূর্ণ বিদ'আতী কাজ।

উম্মতে মুসলিমার উপর তাসাউফের প্রভাব

উম্মতে মুসলিমার আকিদা ও জীবনে তাসাউফের ব্যাপক প্রভাব পড়েছে, তন্মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে:

১. সূফীরা যে শির্ক ও মৃত ব্যক্তির ইবাদত ইসলামে দাখিল করেয়েছে তার দ্বারা তাওহিদুল ইবাদাহ ব্যাপকভাবে ধ্বংস ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এগুলো শিয়া ও সূফীরা ইসলামে প্রবেশ করিয়েছে মূলত বৌদ্ধদের থেকে, যা উবাইদি (তথাকথিত ফাতেমী) শাসনামলে মিসর, মরক্কো ও প্রাচ্যে রাফেদি রাজ্যসমূহে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল।

২. তারা হুলাল, ইত্তেহাদ ও আল্লাহকে মখলুকের সাথে তুলনা করে তাওহিদুর রুবুবিয়াহ এবং তাওহিদুল আসমান ও সিফাতকে ব্যাপকভাবে ধ্বংস করে, যেমন: তাদের বড়দের কতক বাণী: (আমি আল্লাহ), (আমার পবিত্রতা, আমার পবিত্রতা, আমার শান কি মহান), (জুব্বার ভিতরে আল্লাহ ব্যতীত কেউ নেই)।

তাছাড়া সুন্দর চেহারা ও সুন্দর আকৃতির প্রতি তাদের প্রেম সর্বজন বিদিত, তাদের ধারণা আল্লাহ তাতে প্রবেশ করে, অথবা এটা আল্লাহর সৌন্দর্যের প্রকাশ, অথচ আল্লাহ তাদের এসব বিশেষণ থেকে কতই না পবিত্র!

৩. উম্মতে ইসলামিয়াকে বিভক্ত ও বিভিন্ন ফেরকার সাথে সম্পৃক্ত করা।

বস্তুত সূফীদের পরস্পর বিরোধী অনেক তরিকা রয়েছে, তার সাথে অনেক মুসলিম সম্পৃক্ত হয়ে নিজেরা শতধা বিভক্ত হয়ে পড়ে, যেমন কাদেরিয়া, রিফাঈয়াহ, তিজানিয়াহ, সায়েলিয়াহ, নকশেবন্দিয়াহ, মিরগানিয়াহ, আহমাদিয়া — আহমদ বাদাওয়ীর সাথে সম্পৃক্ত —, প্রত্যেক তরিকার রয়েছে পৃথক ওযিফা, জিকির,

ইবাদত ও বিশেষ দরুদ। প্রত্যেক তরিকা দাবি করে তারা একাই সত্য ও সঠিক পথের উপর, বরং প্রত্যেক তরিকা আবার বিভিন্ন ফেরকা ও অনেক তরিকায় বিভক্ত।

৪. জিহাদ ত্যাগ করা: বরং সাধারণভাবে আমল পরিত্যাগ করা: সূফীরা জিহাদ ও আমল ত্যাগ করার ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা রাখে, ইতিহাস সাক্ষী, কতক সূফী তাতারিদের বাগদাদে প্রবেশ করার সময় সাহায্য করেছিল, বর্তমান ইউরোপীয় উপনিবেশদের সাহায্য করেছে তারাই।

৫. ইলমী জীবনকে ধ্বংস করা: শারীরিক সাধনা, নির্জনতা, ওযিফা ও নানা ওরসে সূফীদের মনোযোগ সীমাবদ্ধ। এসব কারণে তারা ইলম থেকে দূরে থাকে, অধিকন্তু ইলমের প্রতি তাদের তচ্ছিল্য তো আছেই, যেমন তারা ইলমকে বলে: ইলমে জাহির, ইলমুল ওরাক, অথবা ইলমুর রুসুম ইত্যাদি। তাছাড়া সূফীরা কাশফ ও ইলহামের প্রতি গুরুত্বারোপ করে চিন্তা শক্তি, ইজতিহাদ ও বিবেকের ক্রিয়াশীলতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে ব্যাপকভাবে।

৬. ইসলামী সভ্যতার পতন ঘটানো: পূর্বে উল্লেখিত কর্মকাণ্ডের সাথে সূফীরা তাদের নিঃস্বতা, ভিক্ষাবৃত্তি ও কল্পনাপ্রসূত কতক উসিলা যোগ করে ইসলামি সভ্যতাকে নিম্নমুখী ও পতনের দিকে ঠেলে দেয়, যার নামকরণ করে তারা: হুজুব, তাবিজ ও হুসুন ইত্যাদি। যাতে তারা কল্যাণ আহরণ ও অকল্যাণ প্রতিহত করার বিশ্বাস করে থাকে।

৭. সূফীরা কতক আকিদা ও শারয়ী পরিভাষার অর্থ পরিবর্তন করে, যেমন: তাওয়াক্কুল, যুহুদ, কাদর। তাদের নিকট এগুলো পরিবর্তিত হয়ে রূপান্তরিত হয় পরনির্ভরতা, ভিক্ষাবৃত্তি ও অক্ষমতায়। অতএব, ইসলাম শরীয়ত এ কাজ সমর্থন করে না। আল্লাহ আমাদের এসব বিদ'আতী কাজ থেকে হেফাযতে রাখুন, আমীন।

একত্রিশ তম পরিচ্ছেদ - ওরস

“ওরস” শব্দের আভিধানিক অর্থ “ওলীমা বা বিবাহের খানা, জিয়ারত, বিবাহের দাওয়াত, বাসর যাপন” ইত্যাদি। পারিভাষিক ও রূপক অর্থ “কোন আউলিয়া-ই-কিরাম ও বুযুর্গানে দ্বীনের ইন্তকালের দিন ফাতিহা পাঠ উপলক্ষ্যে খাওয়া, ওয়াজ-মাহ্ফিল, মীলাদ-ক্বিয়াম ইত্যাদির ব্যবস্থা করা”।

পূর্ববর্তী যামানায় ওরস শব্দ ব্যবহার করাকে ওলামায়ে হক্কানী-রব্বানীগণ দোষণীয় মনে করেননি। কিন্তু পরবর্তী যামানায় ওরসের নাম দিয়ে বেপর্দা, বেহায়াপনা, গান-বাজনা, মেলা ইত্যাদি বেশরীয়তী কাজ করার কারণে পরবর্তী যামানার হক্কানী-রব্বানী আলিমগণ ফতওয়া দিয়েছেন যে, কোন নেক বা দ্বীনী কাজে ওরস শব্দ ব্যবহার করা না করে “ঈসালে সাওয়াব” বা “সাওয়াব রেসানী” শব্দ ব্যবহার করতে হবে।

(১) পবিত্র কুরআনের আলোকে ওরসের ব্যাখ্যা নিম্নরূপঃ

আল্লাহ সুবহানাছ ওয়াতা'আলা পবিত্র কুর'আনে বলেন, "বলুন, আমার প্রতিপালক আমাকে একটি সরল পথে পরিচালিত করেছেন, যা বক্রতা হতে মুক্ত দ্বীন, ইবরাহীমের দ্বীন, যিনি একনিষ্ঠভাবে

নিজেকে আল্লাহ-অভিমুখী করে রেখেছিলেন। আর তিনি ছিলেন না শিরককারীদের অন্তর্ভুক্ত^{৪৮০}।"

(২) হাদীসের আলোকে ওরসের ব্যাখ্যা নিম্নরূপঃ

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "আর সর্বোত্তম আদর্শ হচ্ছে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদর্শ। আর ধর্মের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ হচ্ছে ধর্মে নতুন সৃষ্টি। (এটা বিদ'আত) আর সব বিদ'আত ই পথভ্রষ্টতা।" [মুসলিম]

"আমি তোমাদেরকে এমন কোন কিছু নির্দেশ দিতে ছাড়িনি যা তোমাদেরকে জান্নাতের নিকটবর্তী করবে আর জাহান্নাম থেকে দূরে রাখবে।" [বুখারী ও মুসলিম]।

"যে ব্যক্তি এমন কোন কাজ করবে যার প্রতি আমাদের নির্দেশ নেই তা প্রত্যাখ্যাত।" [বুখারী ও মুসলিম]। অতীব দুঃখের বিষয় হচ্ছে এই উপমহাদেশের একশ্রেণীর মানুষ অজ্ঞতা ও শয়তানের ধোঁকায় পরে সরাসরি আল্লাহ'র সাহায্য না চেয়ে বিভিন্ন বুয়ুর্গের কবরকে সাহায্য গ্রহণের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেছে। কবর পাকাকরণ নিষিদ্ধ হলেও উনার কবরকে ইট-বালি-সিমেন্টে বার্ষিক্যে মাযারে রূপান্তর করেছে যাকে ঘিরে ইসলামের নামে গড়ে উঠেছে বিভিন্ন বিদ'আহ-শিরক ও কুফরী কার্যকলাপ যার সাথে ইসলামের দূরতম সম্পর্কও নেই। গান-বাজনা-মদ-গাঁজার উৎসবে ছেয়ে গেছে মাযারগুলো যা কিনা সুস্পষ্ট হারাম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "তোমরা নিজেদের ঘরকে কবর বানিয়ে না। (অর্থাত্

^{৪৮০} সূরা আনআম: ১৬১

কবরের মতো ইবাদত-বন্দেগী শূন্য করো না) এবং আমার কবরকে উৎসবের স্থান বানিয়ে না।" [সুনানে আবু দাউদ]। এছাড়াও রাসূল-সাহাবী-তাবেঈ-তাবেঈন দ্বারা সিদ্ধ নয় এমন প্রচুর কাজই সেখানে যুগ যুগ ধরে প্রচলিত হয়ে এসেছে। এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে 'ওরস'। উল্লেখ্য, এভাবে কারোও ইন্তেকালের দিন উদযাপন করা, সেদিন অনেকে একসাথে সূরা ফাতিহা পাঠ করা, খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করা, মীলাদ-কিয়াম করা সুস্পষ্ট বিদ'আহ। কোন সাহাবী-তাবেঈ বা তাবেঈনদের দ্বারা এমন কাজের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। বস্তুতঃ আমাদের এই উপমহাদেশে মাযার সংশ্লিষ্ট অনেক শিরক-বিদ'আত চালু আছে যার অন্যতম হল মাযারে 'ওরস' পালন করা। কুরআন ও সুন্নাহবিরোধী অনেক বিষয় 'ওরস'-এর সাথে জড়িত। এমন কয়েকটি বিষয় আমরা আজকে আলোচনা করবো।

দূর-দূরান্ত থেকে কবর যিয়ারতের জন্য আসা

'ওরসে' অংশগ্রহণের জন্য মানুষ দূর-দূরান্তে যায়। কিন্তু কোন মাযার যিয়ারতের জন্য দূরবর্তী স্থানে সফর করা হারাম। রাসূল (সাঃ) বলেনঃ "(আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে) তিন মসজিদ ব্যতীত অন্য স্থানে সফর করা যাবে নাঃ (মসজিদগুলো হল) মসজিদে হারাম, আমার এই মসজিদ (মসজিদে নববী) ও মসজিদে আকসা" (সহীহ বুখারী)।

কবরে সমবেত হয়ে উৎসব পালন করা

কবরে 'ওরস' পালনের মাধ্যমে সেখানে উৎসব করা বা আনন্দ প্রকাশ করা হারাম। এই বিষয়ে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) বলেনঃ

“তোমরা আমার কবরকে ঈদ তথা উৎসবের স্থানে পরিণত কর না”(আবু দাউদ)। তাই, কবরে সমবেত হয়ে ওরসের নামে উৎসব পালন করা নিষিদ্ধ।

ওরসের জন্য কবরে দান করা

কবরে উৎসব করা হারাম, তাই এই উৎসবের জন্য টাকা আদায় করা বা দান করাও হারাম। তাছাড়া, ওরস ব্যতীতও কবরে দান করা শরীয়ত সম্মত নয়, বরং একটি বিদ'আত।

মাযারে পশু যবাই করা

ওরসের সময় বিভিন্ন মাযারে পশু কুরবানি করা হয়। প্রথমত, এ কুরবানী যদি হয় মাযারস্থ অলিকে খুশি করার জন্য, তবে তা নিঃসন্দেহে শিরক। এসব মাযারে পশু জবাইয়ের সময় আল্লাহ্র নামের বদলে উচ্চারিত হয় ‘জয় বাবা অমুক’, ‘জয় অমুক মঞ্জিল’, ইত্যাদি। এই পশুর গোশতকে আল্লাহ্ হারাম ঘোষণা দিয়ে বলেনঃ “নিশ্চয়ই তিনি (আল্লাহ্) তোমাদের জন্য মৃত জন্তু, রক্ত, শুয়োরের গোশত ও আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের নামে যবাইকৃত পশু হারাম করেছেন” (সূরা বাক্বারাহঃ আয়াত নং - ১৭৩)।

অনেকেই দাবি করেন, তারা মাযারে আল্লাহ্র জন্যই কুরবানি করেন। কিন্তু কবরে আল্লাহ্র উদ্দেশেও পশু যবাই করা বৈধ নয়, কারণ রাসুল(সাঃ) বলেনঃ “ইসলামে কোন ‘আকর (কবরের পাশে গরু-ছাগল যবাই করার জাহেলি প্রথা) নেই” (আবু দাউদ)। সুতরাং, মাযারে যে কোন পশু যবাই করা বা সে পশুর গোশত খাওয়া দুটোই হারাম।

মহিলাদের মাযার যিয়ারত করা

ওরসের সময় নারীরা মাযারে আসেন। কিন্তু নারীদের জন্য কবর যিয়ারত করা হারাম। হাদীসে আছেঃ“রাসুল (সাঃ) কবর যিয়ারতকারিনীদের অভিশাপ দিয়েছেন” [সুনানে তিরমীযী]। এ সব বিষয়ের সম্মিলিত রূপ হল ‘ওরস’।

এই আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট কবরে ওরস পালন করা হারাম ও বিদ’আত। আল্লাহ্ আমাদের সবাইকে সব ধরনের ইসলাম পরিপন্থী বিষয় থেকে দূরে থাকার তওফিক দান করুন, আমীন!!!

সুতরাং "ওরস" উৎসব হচ্ছে ইসলামের মধ্যে নতুন সৃষ্ট বস্তু অর্থাৎ 'বিদ'আহ' এবং এটি পালন করা 'হারাম' এবং কুর'আন ও হাদীস বিরোধী বক্তব্য যা অবশ্যই পরিতাজ্য। আল্লাহ আমাদের সকল বিদ'আত হতে হেফযত করুন আমিন।

বত্রিশ তম পরিচ্ছদ - উচ্ছে কঠে বা চিৎকার করে যিকির করা বা হালকায়ে যিকিরের অনুষ্ঠান করা

সূফীদের যত জিকির রয়েছে তার সবই বানোয়াট ও বিদআতী যিকির। কেননা এগুলো সবই হাদীসে বর্ণিত শরীয়ত সম্মত জিকিরের পরিপন্থী। তাছাড়া দলবদ্ধ হয়ে উচ্ছে কঠে বা চিৎকার করে যিকির করা বা হালকায়ে যিকির করা যেমনঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর জিকির, আল্লাহ্ আল্লাহ্ বলে জিকির করা, জিকিরে যলী, জিকিরে খফী, জিকিরে রুহী, জিকিরে কলবী ইত্যাদি সবই ইবাদতের নামে নতুন সৃষ্টি তথা বিদ’আত বা ইসলাম বহির্ভূত কাজ।

তেরিশ তম পরিচ্ছেদ - রাসূলের তাবলীগ বনাম প্রচলিত তাবলীগ

বর্তমানে মুসলিম সমাজ বিদআতের সর্দিতে ভুগছে। সস্তা ফযীলতের ধোঁকায় পড়ে মুসলিম জাতি আজ দিশেহারা। তারা খুঁজে ফিরছে সত্যের সন্ধানে। কোথায় পাওয়া যাবে সঠিক পথের দিশা, কোথায় পাওয়া যাবে সত্যিকারের আদর্শ? কেননা পৃথিবীর সকল মানুষ কোন না কোন আদর্শের সাথে সংযুক্ত। যেমনঃ তাবলীগ জামায়াতের আদর্শ হচ্ছেন মাওলানা ইলিয়াস! পক্ষান্তরে মাযার, খানকা ও তরীকা পূজারী মুরীদদের আদর্শ স্ব স্ব পীর-ফকীর। যার যার নেতা-আমীরদের আদর্শ নিয়ে তারা উৎফুল্ল! তাহলে কোথায় আমাদের রাসূল মুহাম্মাদ (সাঃ) - এর আদর্শ? ইসলাম কারো মনগড়া ধর্ম ও জীবন ব্যবস্থা নয়। এটা বিশ্ব প্রতিপালক মহান আল্লাহ প্রদত্ত পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। আর এ দ্বীন প্রচারিত হয়েছিল নবী মুহাম্মাদ (সাঃ) - এর মাধ্যমে। এ প্রসঙ্গে রাসূল (সাঃ) এর একটি হাদীস উল্লেখযোগ্য। হাদীসটি নিম্নরূপঃ

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مِسْعَرٍ، وَغَيْرِهِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شَهَابٍ، قَالَ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ لِعُمَرَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَوْ أَنَّ عَلَيْنَا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ { الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا } لَاتَّخَذْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ عِيدًا. فَقَالَ عُمَرُ إِنِّي لَأَعْلَمُ أَيَّ يَوْمٍ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ، نَزَلَتْ يَوْمَ عَرَفَةَ فِي يَوْمٍ جُمُعَةٍ. سَمِعَ سُفْيَانُ مِنْ مِسْعَرٍ وَمِسْعَرٌ قَيْسًا وَقَيْسٌ طَارِقًا.

হুমায়দী (রহঃ) তারিক ইবন শিহাব (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ইহুদী উমর (রা.)-কে বলল, হে আমীরুল মু'মিনীন! আমাদের উপর যদি এই আয়াতঃ “আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দীন কে পূর্ণাঙ্গ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দীন মনোনীত করলামচ (৫:৩) অবতীর্ণ হত, তাহলে সে দিনটিকে আমরা ঈদ (উৎসবের) দিন হিসাবে গণ্য করতাম। উমর (রাঃ) বললেন, আমি অবশ্যই জানি এ আয়াতটি কোন্ দিন অবতীর্ণ হয়েছিল। আরাফার দিন জুমু'আ দিবসে এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছিল। হাদীসটি সুফিয়ান (রহঃ) মিসআর (রহঃ) থেকে, মিসআর কায়স থেকে, কায়স (রহঃ) তারিক থেকে শুনেছেন।^{৪৮১}

অতএব, রাসূল (সাঃ) এর উপরোক্ত হাদীস থেকে প্রমানিত হয় যে, এই দীন তথা ইসলাম পরিপূর্ণ এবং এই দীন তথা ইসলামের মূল দর্শন হল তাওহীদের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা দান। মানব সমাজে আল্লাহর দ্বীনের বার্তা ছড়িয়ে দেয়ার জন্য কুরআন ও হাদীসে মুসলিম উম্মাহকে বহুবার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। এমনকি যদি একটি আয়াতও কেউ জানে, তা প্রচার করার জন্য রাসূল (সাঃ) নির্দেশ দিয়েছেন।^{৪৮২} সুতরাং দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ থেকে কারো পিছিয়ে থাকার কোন সুযোগ নেই। বর্তমানে ফেৎনার যে ব্যাপক বিস্তার ঘটেছে এবং সঠিক দীন প্রচারকের সংখ্যাও যেহেতু খুবই

^{৪৮১} সহীহ বুখারী :: অধ্যায় :: কুরআন ও সুন্নাহকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করা অধ্যায়, খন্ড ৯ :: অধ্যায় ৯২ :: হাদীস ৩৭৩

^{৪৮২} বুখারী, মিশকাত হা/১৯৮।

কম, সে কারণে দ্বীনের দাওয়াত প্রদান করা এখন ‘ফরযে আইন’ হয়ে পড়েছে। সুতরাং কেউ যদি শারঈ ওযর ব্যতীত দৈনন্দিন ব্যস্ততার অজুহাতে বা অলসতাবশতঃ তাবলীগ বা দ্বীনের প্রচার না করে, তাহলে সে নিঃসন্দেহে গোনাহগার হবে। তাবলীগ মুসলিম মিল্লাতের অতি পরিচিত একটি শব্দ। যার অর্থ প্রচার ও প্রসার। ক্রিয়ামত পর্যন্ত আগত সকল বিশ্ব মানবতার দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছাবার যে গুরু দায়িত্ব মুহাম্মাদ (সাঃ) কর্তৃক সকল উম্মাতে মুহাম্মাদীর উপর অর্পিত হয়েছে, সেটিকেই তাবলীগ বলে। মূলতঃ রাসূল (সাঃ) বিশ্ব মানুষের কাছে দ্বীনের এ দাওয়াত পৌঁছাবার ও প্রচার-প্রসারের মহান দায়িত্ব নিয়েই পৃথিবীতে আগমন করেছিলেন। যেমন আগমন করেছিলেন রাসূল (সাঃ) - এর পূর্বে অগণিত নবী ও রাসূল। রাসূল (সাঃ) - কে তাবলীগ করার নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ তা‘আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন, হে রাসূল! আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আপনার উপর যা অবতীর্ণ হয়েছে তা আপনি প্রচার করুন। যদি আপনি তা না করেন তাহলে আপনি আল্লাহর বার্তা প্রচার করলেন না (মায়েদা ৬৭)। রাসূল (সাঃ) হলেন সর্বশেষ নবী। তারপর পৃথিবীতে আর কোন নবী আসবে না। তাই বিদায় হজ্জের সময় রাসূল (সাঃ) বজ্র কণ্ঠে ঘোষণা, **فليبلغ الشاهد الغائب** উপস্থিত লোকেরা যেন দ্বীনের এ দাওয়াত অনুপস্থিত লোকদের কাছে পৌঁছে দেয়’। এর মাধ্যমে সমস্ত উম্মাতে মুহাম্মাদীই তাবলীগ তথা দ্বীন প্রচারের ব্যাপারে দায়িত্বশীল হয়ে যায়। রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেন, **بلغوا عني ولو آية** আমার পক্ষ থেকে একটি

বাণী হলেও (মানুষের নিকট) পৌঁছে দাও'। মূলতঃ এ কারনেই তাবলীগের অন্যতম জনপ্রিয় একটা গ্রুপ হল তাবলীগ জামায়াত। এই জামায়াত বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে আছে। এমনকি শুনা যায় যে, বিশ্বের যেখানে সত্যিকারের মুসলিমের প্রবেশ নিষেধ সেখানেও এই জামায়াতের অবাধ বিচরণ। এই জামা'আতের দাওয়াতের মূল উৎস হল ফাযায়েলে 'আমাল বা তাবলীগী নিসাব। এই বইটি আমাদের দেশে খুব পরিচিত। অথচ রাসূল (সাঃ) এর তাবলীগের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই বললেই চলে এবং দ্বীনের ভিতরে নব উদ্ভাবিত বিদ'আত। কেন বিদ'আত তা নিম্নে আলোচনা করা হলোঃ

টোত্রিশ তম পরিচ্ছেদ - প্রচলিত তাবলীগ জামা'আতের প্রচলন বা আবিষ্কারের কাহিনী

তাবলীগ জামা'আতের প্রতিষ্ঠাতার পরিচিতিঃ ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের একটি রাজ্যের বর্তমান নাম হরিয়ানা এবং সাবেক নাম পাঞ্জাব। ভারতের রাজধানী দিল্লীর দক্ষিণে হরিয়ানার একটি এলাকার নাম মেওয়াত। যার পরিধি দিল্লীর সীমান্ত থেকে রাজস্থান রাজ্যের জয়পুরহাট যেলা পর্যন্ত বিস্তৃত। এই মেওয়াতে ১৩০৩ হিজরীতে এক হানাফী ব্যক্তির জন্ম হয়। তাঁর নাম ছিল আখতার ইলিয়াস। কিন্তু পরে তিনি শুধু ইলিয়াস নামে পরিচিত হন। ইনি ১৩২৬ হিজরীতে দেওবন্দ মাদরাসার শাইখুল হাদীস মাওলানা মাহমুদুল হাসানের কাছে বুখারী ও তিরমিযীর দারস গ্রহণ করেন। এর দু'বছর পরে ১৩২৮ হিজরীতে তিনি সাহারানপুরের মাযা-হিরুল 'উলূমের শিক্ষক হন। ১৩৪৪ হিজরীতে তিনি দ্বিতীয়বারে হজ্জে গমন

করেন। এই সময় মদীনায় থাকাকালীন অবস্থায় তিনি (গায়েবী) নির্দেশ পান যে, আমি তোমার দ্বারা কাজ নেব। ফলে ১৩৪৫ হিজরীতে তিনি দেশে ফিরে এসে মেওয়াতের একটি গ্রাম নওহে তাবলীগী কাজ শুরু করেন। পরিশেষে ১৩৬৩ হিজরীর ২১ রজব মোতাবেক ১৩ জুলাই ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দে তিনি ইন্তেকাল করেন^{৪৩}।

ইলায়াসী তাবলীগ বনাম রাসূলের তাবলীগ এর পার্থক্য

পার্থক্যগুলো নিম্নে আলোচনা করা হলোঃ-

(ক) তারা নিজেরা কুরআন বুঝে না অন্যদেরকেও বুঝাতে দেয় না। কিন্তু রাসূল (সাঃ) নিজে কুরআন শিখিয়েছেন এবং তার প্রচারকও ছিলেন।

(খ) তাদের দাওয়াতী নিয়ম স্বপ্নে প্রাপ্ত। রাসূলের দাওয়াতী নিয়ম স্বয়ং আল্লাহ প্রদত্ত (মায়েদা ৬৭)।

(গ) তাদের দাওয়াতের মধ্যে সপ্তাহে ১ দিন, মাসে ৩ দিন, বছরে ১ চিল্লা, কমপক্ষে জীবনে ৩ চিল্লা লাগিয়ে দ্বীনি কাজ শিখতে হবে। পক্ষান্তরে রাসূলের দাওয়াতী কাজ এগুলোর কোন অস্তিত্ব নেই।

(ঘ) তাদের দাওয়াতের মধ্যে ইসলামের একটি অপরিহার্য বিধান ও আল্লাহর প্রিয় জিহাদ নেই। কিন্তু রাসূলের দাওয়াতে জিহাদ একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

(ঙ) তাদের দাওয়াতে কাফের মুশরিকদের কোন বাধা নেই। রাসূল (সাঃ) যখন দাওয়াত দিতেন তখন কাফের মুশরিক বাধা দিত।

^{৪৩} মাওলানা আবুল হাসান আলী রচিত মাওলানা ইলয়াস রাহমাতুল্লাহি 'আলাইহি আওর উনকি দ্বীনী দাওয়াত- ৪৮, ৫৭, ৬১, ১৯৩ পৃষ্ঠা এবং রববানী বুক ডিপো প্রকাশিত তাবলীগী নিসাব - এর ভূমিকা পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(ঢ) তাদের দাওয়াতী কাজ শেখার মূল উৎস হল ‘ফাযায়েলে আমাল’। কুরআনের চেয়েও তারা ফাযায়িলে আমাল-এর গুরুত্ব বেশী দেয়। অথচ রাসূলের দাওয়াত শেখার মূল উৎস হচ্ছে কুরআন ও সহীহ হাদীস। আর কুরআনের মর্যাদা হচ্ছে সবকিছুর উর্ধ্বে।

(ছ) তারা রাষ্ট্রপ্রধান বা ক্ষমতামালীদের বিরুদ্ধে কোন কথা বলে না যদিও তারা শিরক করে ও ইসলামের বিরুদ্ধে বলে। রাসূল তৎকালীন রাষ্ট্রপ্রধান ও ক্ষমতামালীদের বিরুদ্ধে কথা বলেছিলেন, শিরক ও ইসলাম বিরোধী কাজে বাধা দিয়েছেন।

(জ) তারা কোন দাওয়াতী কাজ করার সময় কুরআন হাদীসের দলীল পেশ করে না, নিজেদের মনগড়া কথা বলে। রাসূল নিজে কোন কিছু বলার বা দাওয়াত দেবার আগে দলীল পেশ করতেন।

(ঝ) তারা কোন মতেই কারো সাথে যুদ্ধ করতে চায় না। রাসূল যুদ্ধ করতে গিয়ে নিজের দাঁতকে শহীদ করেছেন।

(ঞ) তারা শুধু দাওয়াত কিভাবে দিবে তা শেখায় যদিও তা ইসলামী পদ্ধতিতে নয়; অন্য কোন কিছু তারা শিখায় না। রাসূল জীবনের প্রতি মুহূর্তে কি করতে হবে, কার সাথে কিভাবে চলতে হবে সবকিছু শিখিয়েছেন।

(ট) ইলিয়াসী তাবলীগ বুয়ুর্গদের সন্তুষ্টির জন্য করা হয়। রাসূলের তাবলীগ একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য (সূরা আন‘আম ১৬; সূরা বাইয়েনা ৫)।

(ঠ) ইলিয়াসী তাবলীগের অলিরা গায়েব জানেন। অথচ রাসূল (সাঃ) গায়েব জানতেন না (সূরা আন‘আম ৫০; সূরা আরাফ ১৮৮)।

(ড) ইলিয়াস সাহেবের আক্বীদায় রাসূল (সাঃ) জীবিত। কিন্তু নবী (সাঃ) ইন্তেকাল করেছেন (সূরা যুমার ৩০)।

(ঢ) বুয়ুর্গরা জান্নাত-জাহান্নাম দুনিয়াতে দেখেন। জান্নাত এমন যে, না কোন চোখ দেখেছে, না কোন কান শুনেছে এবং না কোন হৃদয় কল্পনা করেছে।

(ণ) ইলিয়াসী তাবলীগে বুয়ুর্গদের মৃত্যুকে অস্বীকার করা হয়েছে। রাসূল (সাঃ) - এর তাবলীগের প্রত্যেকের মৃত্যু সত্য (সূরা আল-ইমরান ১৮৫)।

(ত) পর্যবেক্ষক ফেরেশতারা আল্লাহ ও বান্দার গোপন যিকির সম্পর্কে জানতে পারে না। ফেরেশতাগণ পর্যবেক্ষণ হিসাবে রয়েছেন এবং আমরা যা করি তারা সে সব জানেন (সূরা ইনফিতার ১০ ও ১২)।

(থ) ইলিয়াসী তাবলীগের কেন্দ্রস্থল ভারতের নিয়ামুদ্দীন মসজিদের ভিতরে মাওলানা ইলিয়াস সাহেব ও তার পুত্রের কবর রয়েছে। নাবী (সাঃ) কবরের দিকে সালাত পড়তে ও কবরকে পাকা নিষেধ করেছেন।

(দ) মাওলানা মুহাম্মাদ ইলিয়াস সাহেবের ইন্তিকালের পর আল্লাহর সাথে মিশে গেছেন। নাবী করীম (সাঃ) বলেন, আল্লাহর সমতুল্য কেউ নেই, তার সাথে কেউ মিশতে পারে না (সূরা ইখলাস ৪; সূরা শূরা ১১)।

তাবলীগ জামাত এর গ্রন্থ (ফাযায়েল আমল)

তাবলীগ জামাত এর গ্রন্থটি বিদআতী উদাহরনে ভুরপুর। যেমনঃ ‘ফাযাযয়েলে আমাল’ নামক বইটিতে অধিকংশ আলোচনাই শিরক-বিদআত, মিথ্যা কিচছা-কাহিনী, কুসংস্কার, সূত্রহীন, বানোয়াট জাল ও যঈফ হাদীছে পরিপূর্ণ। যেমন, (এক) তাবলীগ জামা‘য়াতের প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা ইলিয়াস (রহঃ)-এর নির্দেশে মাওলানা যাকারিয়াহ্ ফাযায়েলে তাবলীগ বইটি লেখেন। ঐ বইয়ের ভূমিকায় তিনি বলেন, ইসলামী মুজাদ্দিদের এক উজ্জ্বল রত্ন এবং উলামা ও মাশায়েখদের এক চাকচিক্যময় মুক্তার নির্দেশ যে, তাবলীগে দ্বীনের প্রয়োজন সংক্ষিপ্তভাবে কতিপয় আয়াত ও হাদীস লিখে পেশ করি। আমার মত গুনাহগারের জন্য এরূপ ব্যক্তিদের সন্তুষ্টিই নাজাতের ওয়াসিলা বইটি পেশ করলাম। অথচ আল্লাহ তায়ালা বলেন, আপনি বলুন! আমার সালাত, আমার কুরবাণী এবং আমার জীবন ও মরণ বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহরই জন্য। অর্থাৎ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য^{৪৮৪}। এবার বুঝুন পাঠক ও পাঠিকা বৃন্দ! এরা আল্লাহর সন্তুষ্টি বাদ দিয়ে মাওলানা যাকারিয়াহ্ ইলিয়াস সাহেবের সন্তুষ্টির অর্জন করতে চাইছেন। আল্লাহ আমাদেরকে সঠিক পথে চলার তৌফিক দান করুন, আমীন। মূলকথা তাবলীগে রাসূল তথা সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন, তাবে তাবেঈন, আইন্মায়ে মুজতাহিদ্বীন, মুহাদ্দিসীন, মুফাসসিরীন ও হক্কানী উলামায়ে কেরামগণ যে তাবলীগ করেছেন সে তাবলীগের মূলভিত্তি নীতি আদর্শ, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য আক্বিদা ও বিশ্বাসের সাথে ইলিয়াছ মেওয়াতী ও তার প্রবর্তিত ইলিয়াছী

^{৪৮৪} সূরা আনআম, আয়াত নং - ১৬২

তাবলীগ জামাতের আক্বিদাগত কোন মিল নেই। তাদের আক্বিদা স্বপ্নেপ্রাপ্ত মনগড়া এ তাবলীগ ইসলামে নব্য আবিষ্কার তথা বিদ'আত। মূলতঃ এই তাবলীগ কিভাবে আবিষ্কার হল এবং এর লক্ষ্য উদ্দেশ্য কি এ ব্যাপারে তাবলীগের প্রতিষ্ঠাতা মৌলভী ইলিয়াছ মেওয়াতী তার মলফুজাত নামক কিতাবের ৫০ নং বাণীতে বলেন-

پھر فرمایا۔ آج کل خواب میں مجھ پر علوم صحیحہ کا القا ہوتا ہے اس لئے
کوشش کرو مجھے نیند

زیادہ ائے (خشکی کی وجہ سے نیند کم ہونے لگی تو میں نے حکم
صاحب اور ڈکٹر کے مشورے

سے سر میں تیل کی مالش کرائی جس سے نیند میں ترقی ہو گئی) اپ نے
فرمایا کہ اس تبلیغ کا

طریقہ بھی مجھ پر خواب میں منکشف ہوا

(উক্ত এবারতের অনুবাদ করেছেন তাবলীগীপন্থী ডক্টর ছানাউল্লাহ,
পি.এইচ.ডি, লন্ডন, বাংলা মলফুজাত ৪৪ পৃষ্ঠা) অনুবাদ: 'তৎপর
বলেন (ইলিয়াছ ছাহেব বলেন) আজকাল স্বপ্নে আমার উপর
সত্যিকার এলম এলকা করা হয় (ঢালিয়া দেয়া হয়) এই জন্য
কোশেশ কর যেন আমার ঘুম বেশি হয় (খুশকির জন্য ঘুম কম
হইতে ছিল। তৎপর আমি হেকিম ও ডাক্তারের পরামর্শ মত মাথায়
তৈল মালিশ করাতে ঘুম বেশি হতে ছিল।) তিনি বলেন (ইলিয়াস
সাহেব বলেন) এই তাবলীগের তরিকাও স্বপ্নেই আমার উপর
উদঘাটিত 'কাশফ' হয়েছিল।' (অনুরূপ অপর তাবলীগীপন্থী
মাওলানা সাখাওয়াত উল্লাহ মলফুজাতের উপরোক্ত এবারতের বাংলা

অনুবাদ করেছেন (যা তাবলীগী কুতুবখানা ৬০নং চক সার্কুলার রোড, চক্কাজার, ঢাকা - ১২১১ থেকে প্রকাশিত)।

অনুবাদঃ ‘তারপর তিনি বলেন- আজকাল খাবের মধ্যে আমার অন্তরে সহী এলেম দেয়া হয়, কাজেই আমার যেন ঘুম বেশি বেশি হয় সেই জন্য তোমাদের চেষ্টা করা উচিত। (হজরতজী বলেন খুশকীর দরুণ আমি অনিদ্রায় ভুগতে ছিলাম, ডাক্তারের পরামর্শানুসারে মাথায় তৈল ব্যবহার করাতে এখন কিছুটা নিদ্রা হইতেছে) তিনি আরও বলেন এই তাবলীগের তরীকা স্বপ্নের মাধ্যমেই আমার উপর খোলা হইয়াছে।’ অনুরূপ ইলিয়াসী তাবলীগীপন্থী মোং বাছির উদ্দিন ‘তাবলীগের পথে’ নামক পুস্তকের ২৪ পৃষ্ঠায় ‘হযরত ইলিয়াছ এর প্রবর্তিত তাবলীগের নিয়ম’ শিরোনামে লিখেন: হযরত ইলিয়াস তাঁহার কৃত মালফুজাত কিতাবে বলেন- ‘এই তাবলীগের নিয়ম আমার উপর স্বপ্নে প্রদত্ত হইয়াছে। আল্লাহ তা’য়ালার এরশাদ *كنتم خير امة* এর পরিপ্রেক্ষিতে আমার প্রতি হুকুম হইল যে ইলিয়াস, তুমি পয়গম্বরদের মতই লোকদিগের জন্য প্রেরিত হইয়াছ, আর- *اخرجت للناس* দ্বারা ইহাই ইশারা করা হইল যে, তোমরা এক জায়গায় বসে তবলীগ করা চলিবে না বরং বাড়ি-বাড়ি, দেশ-বিদেশ এই কাজ লইয়া ঘুরাফেরা করিতে হইবে। ইহার উপর ভিত্তি করিয়াই হযরত ইলিয়াস তবলীগের কাজ আরম্ভ করেন।’ তাবলীগী জামাতের প্রবর্তক মৌলভী ইলিয়াস মেওয়াতীর বক্তব্য এবং তার অনুসারীদের অনুবাদ থেকে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো যে, মৌলভী ইলিয়াছ সাহেব মাথায় তৈল মালিশ করিয়ে

শান্তির ঘুমে স্বপ্ন দ্বারা তার তাবলীগের তরিকা বা নিয়ম পদ্ধতি পেয়েছেন। এ স্বপ্নের উপর জোড় দিয়ে বলেন-

اس تبليغ کا طريقہ مجھ پر خواب میں منکشف ہوا

‘এই তাবলীগের তরিকা আমার উপর স্বপ্নে প্রদত্ত করা হয়েছে।’ ইলিয়াস সাহেবের এ বক্তব্য দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, তার তাবলীগ (ইলিয়াছী তাবলীগ) তাবলীগে রাসূল থেকে সম্পূর্ণ পৃথক।

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ, দেখলেন তো মৌলভী ইলিয়াস মেওয়াতী সাহেব, শরিয়তে মুহাম্মদীর চারটি দলিল ছেড়ে দিয়ে স্বপ্নের উপর ভিত্তি করে শরিয়তবিরোধী মনগড়া নিয়মে এর নতুন মতবাদ বের করেছেন এবং সরলপ্রাণ মুসলমানগণকে ধোঁকা দেয়ার মানসে তাবলীগ নাম রেখেছেন। প্রকৃতপক্ষে ইহা একান্তই তার নিজের মনগড়া নব আবিষ্কার।

স্বপ্ন কি দলিল?

একমাত্র নবীগণ আলাইহিমুস সালাম এর স্বপ্নই সঠিক নির্ভুল ও শরিয়তের দলিলরূপে গণ্য। তাফসিরে রুহুল মায়ানী ২৩ পারা ১২৮ পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে-

وروي الانبياء وحى كالوحى فى اليقظة

অর্থাৎ ‘নবীগণ আলাইহিমুস সালামের উপর নাজিলকৃত ওহী জাগ্রত অবস্থায় যেরূপ নির্ভুল সঠিক সত্য তদ্রূপ তাঁদের ঘুমন্ত অবস্থার স্বপ্ন ও ওহী শরীয়তের দলিলরূপে পরিগণিত।’ অনুরূপ: ‘তাফসিরে জালালাইনশরীফ’ ৩৭৭ পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে -

روي الانبياء حق وافعالهم بامر الله تعالى

অর্থাৎ ‘নবীগণ আলাইহিমুস সালামের স্বপ্ন সত্য এবং তাঁদের কাজসমূহ আল্লাহতা’য়ালার নির্দেশেই সম্পাদিত হয়ে থাকে।’ পক্ষান্তরে, ওলির স্বপ্ন কেন? ওলির এলহামও নির্ভরযোগ্য সত্য হয় না বরং সত্য ও অসত্য উভয়েরই সম্ভাবনা থাকে। কেননা ওলির এলহাম ও স্বপ্ন সন্দেহজনক এবং সন্দেহ কোন দিক দিয়ে দলিল হতে পারে না। ‘নূরুল আনওয়ার’ নামক কিতাবে ‘আফয়ালুন্নবী’ শীর্ষক আলোচনায় ২১৪ পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে-

وهذا هو المسمى بالالهام ويشترك فيه الاولياء ايضا وان كان الهامهم
يحتمل الخطاء والصواب والهامه
لا يحتمل الا الصواب

অর্থাৎ ‘একমাত্র নবীর এলহামই সঠিক এবং সত্য। পক্ষান্তরে ওলিগণের এলহাম সন্দেহজনক অর্থাৎ সত্য ও অসত্য উভয়েরই সম্ভাবনা রয়েছে।

উল্লেখ্য যে, সন্দেহজনক কোন কিছু শরিয়তের নির্ভরযোগ্য দলিল হতে পারে না। এজন্যই প্রখ্যাত উসূলবীদ মুল্লা জিউন রাদিয়াল্লাহু আনহু ‘নূরুল আনওয়ার’ কিতাবের ২১৫ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন-

والهام الاولياء حجة في حق انفسهم ان وافق الشريعة ولم يتعد الى غيرهم
الا اذا اخذنا بقولهم يطريق الادب

অর্থাৎ ‘ওলিগণের স্বপ্ন যদি শরিয়তের অনুকূলে হয়, তা হলে তাঁদের স্বপ্ন শুধুমাত্র তাঁদের নিজেদের জন্যই দলিল হতে পারে অন্য কারো জন্য দলিল হতে পারে না। তবে আমরা আদব রক্ষার্থে তাদের

কথাগুলোকে নিয়ে থাকি শরিয়তসম্মত হবার কারণে।’ ‘নূরুল আনওয়ার’ কিতাবের ২১নং হাশিয়া (পার্শ্ব টিকায়) উল্লেখ রয়েছে-

ان وافق الشريعة الخ فيه ايماء اى ان الهام الولي ان خالف الشريعة

المحمدية فهو ليس بحجة لافى

حق نفسه ولا فى حق غيره انما هو من الشيطان الضال المضل

অর্থাৎ (যদি ইলহাম শরিয়তসম্মত হয়) এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, ওলির ইলহাম যদি শরিয়তে মুহাম্মদীর পরিপন্থী হয়, তাহলে অপরের জন্যতো দূরের কথা নিজের জন্যও দলিল হতে পারে না, বরং নিঃসন্দেহে ইহা পথভ্রষ্ট ও পথভ্রষ্টকারী শয়তানের ওয়াসওয়াসা বা কুমন্ত্রণা মাত্র।’ মুদ্বাকথা হলো একমাত্র সম্মানিত নবীগণের স্বপ্নই সঠিক ও শরিয়তের দলিল হিসাবে গণ্য, অন্য কারো স্বপ্ন শরিয়তের দলিল হিসেবে গণ্য হতে পারে না।

স্বপ্নযোগে নবী করীম (স) কে দেখলেও এবং তার নিকট হতে কোনো নির্দেশ পেলেও তা পালন করার কোনো দায়িত্ব স্বপ্নদ্রষ্টারও নেই, নেই উম্মতের কোনো লোকেরও তথা পীর ফকিরেরও। কারন দ্বীন ইসলাম পরিপূর্ণ - স্বপ্নের ফয়সালা মেনে নেয়া কি যাবে - না কি এটা স্পষ্ট একটা বিদয়াত?

পীর সাহেবদের দরবারের সবচাইতে বড় বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, এখানে সব সময় স্বপ্নের রাজত্ব কায়েম হয়ে থাকে। কে কত বেশি এবং ভালো স্বপ্ন দেখতে পারে, মুরীদ-মুসাহিবদের মাঝে তা নিয়ে প্রবল প্রতিযোগিতা চলে। ফলে তাদের কেউ কেউ যে বানানো স্বপ্নও না বলে, এমন কথা জোর করে বলা যায়না। কেননা যে যত

ভালো স্বপ্ন দেখবে এবং স্বপ্নযোগে হুজুর কিবলার বেলায়েত ও উচ্চ মর্যাদা প্রমাণ করতে পারবে, হুজুরের দোয়া ফায়েজ এবং স্নেহাশীষ সেই পাবে সবচাইতে বেশি। কাজেই এ দরবারে স্বপ্ন দেখতেই হবে;-স্বপ্ন না দেখে কোনো উপায় আছে? এ দরবারের লোকেরা চোখ বুঝলেই স্বপ্ন দেখতে পায়, স্বপ্ন যেন এদের জন্য এমন পাগল হয়ে বসে থাকে যে, যে কোনো সময়ই তা এদের চোখের সামনে ভেসে ওঠার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। তারা জেগে জেগেও স্বপ্ন দেখে অনেক সময় এবং তা হুজুর কিবলাকে খুশি করার জন্য সুন্দরভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে দরবারে পেশ করে। শুধু তা-ই নয়, শরীয়তের দৃষ্টিতে ভালো-মন্দ জায়েয নাজায়েয সম্পর্কেও এখানে স্বপ্ন দ্বারাই ফয়সালা গ্রহণ করা হয়। একজন হয়তো বললোঃ আমি অমুক হুজুরকে স্বপ্নে দেখেছি, তিনি এই কাজটি করতে নিষেধ করেছেন; অমনি সে কাজটি পরিত্যাগ করা হলো। কিংবা তিনি অমুক কাজ করতে বলেছেন। অতএব সঙ্গে সঙ্গে সে কাজ করতে শুরু করা হলো। কেউ বললোঃ আমি নবী করীম (স) কে স্বপ্নে দেখেছি, তিনি আমাকে এ কাজটি করতে আদেশ করেছেন, আর অমনি সে কাজ করতে শুরু করে দেয়া হলো। কিংবা কোনো কাজ করতে নিষেধ করেছেন বলে তা বন্ধ করা হলো। এ ব্যাপারে শরীয়তের ফয়সালা যে কি, সে দিকে আদৌ তাকিয়েও দেখা হয়না; শরীয়ত কি বলে সে কথা জিজ্ঞেস করার কোনো প্রয়োজন তারা বোধ করেনা।

এভাবে স্বপ্নের ওপর নির্ভরতা, স্বপ্ন দ্বারা পরিচালিত হওয়া, স্বপ্নের ভিত্তিতে কোনো কাজ করা বা না করা পীর-পূজকদের নীতি, কোনো

শরীয়তপন্থীর এ নীতি নয়। কেননা সাধারণ মানুষের স্বপ্ন-সত্যিকারভাবে যদি কেউ দেখেই –কোনো শরীয়তের বিধান হতে পারেনা। স্বপ্ন সত্য হতে পারে। কোনো স্বপ্ন যদি কেউ সত্যিই দেখে থাকে তবে তা থেকে সে নিজে কোনো আগাম সুখবর লাভ করবে, না হয় কোনো বিষয়ে সতর্কবলম্বনের ইঙ্গিত পাবে। সে জন্যে তার উচিত আল্লাহর শোকর করা। কিন্তু এ স্বপ্ন দ্বারা ফরয-ওয়াজিব, হালাল হারাম ও জায়েয নাজায়েয কিংবা করণীয় কি, না করণীয় কি, তা প্রমাণিত হতে পারেনা। স্বপ্ন থেকে শরীয়তের অনুকূল কোনো কথা জানতে পারলে সে তো ভালোই; কিন্তু শরীয়তের বিপরীতে যদি কিছু জানা যায় তবে তা কিছুতেই অনুসরণ করা যাবেনা। করা যাবেনা এজন্য যে, শরীয়তের বিপরীত কারো কোনো হুকুম দেয়ার অধিকার নেই, স্বপ্নের কি দাম থাকতে পারে শরীয়তের মুকাবিলায়?

অবশ্য স্বপ্ন ইসলামের দৃষ্টিতে একেবারে ফেলবার বিষয় নয়- এ কথা ঠিক। স্বপ্নযোগে নবী করীম (স) এর দর্শন লাভ করা যায়, তাও হাদীস থেকে প্রমাণিত। কিন্তু প্রথম কথা হলো, স্বপ্নযোগে শয়তান যদি নবী করীমের নিজের বেশ নয়- যে কোনো একটি বেশ ধারণ করে তাকেই ‘নবী করীম’ বলে জাহির করে, তবে স্বপ্ন দ্রষ্টা কি করে বুঝতে পারবে যে এ প্রকৃত রাসূল নয়?

এ পর্যায়ে রাসূলে (স) এর হাদীসের ভাষা ও তাতে ব্যবহৃত শব্দগুলো লক্ষণীয়। হযরত আবদুল্লাহ(রা) নবী করীম (স) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেনঃ -যে লোক স্বপ্নযোগে আমাকে

দেখলো, সে ঠিক আমাকেই দেখলো। কেননা শয়তান আমার রূপ ও প্রতিকৃতি ধারণ করতে পারেনা। (তিরমিযী)।

শয়তান রাসূলের রূপ ও প্রতিকৃতি ধারণ করতে পারবেনা-বলে যদি কেউ স্বপ্নযোগে রাসূলে করীম (স) কে দেখল, তবে বিশ্বাস করতে হবে যে, সে ঠিক রাসূলকেই দেখেছে, অন্য কাউকে নয়-হাদীসের শব্দ ও ভাষা থেকে একথাই স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়। কিন্তু এ শব্দ ও ভাষার ভিত্তিতেই দু'টো দিক এমন থেকে যায়-যার স্পষ্ট মীমাংসা হওয়ার প্রয়োজন। একটি হলো রাসূলে করীম (স) বলেছেনঃ যে লোক আমাকে দেখল, সে আমাকেই দেখল, কিন্তু যদি কেউ অন্য কাউকে দেখে এবং তার মনে ভ্রম হয় শয়তান ভ্রম জাগিয়ে দেয় যে, ইনি রাসূল (স) তাহলে কি হবে? এরূপ হওয়ার অবকাশ কি এ হাদীসের ভাষা থেকে বের হয়না?

দ্বিতীয় রাসূলে করীম (স) বলেছেনঃ শয়তান আমার রূপ ও প্রতিকৃতি ধারণ করতে পারেনা, কিন্তু শয়তান যদি অন্য কারো রূপ প্রতিকৃতি ধারণ করে স্বপ্ন দ্রষ্টার মনে এই ভ্রম জাগিয়ে দেয় যে, ইনি রাসূলে করীম তাহলে কি হবে?

এরূপ হওয়া সম্ভব কিনা এ হাদীসের স্পষ্ট ভাষার পরিপ্রেক্ষিতে? আমার মনে হয়, হাদীসে এই দুটো সম্ভাবনার পথ বন্ধ করে দেয়নি। এখানে এ সম্ভাবনাকে সামনে রেখেই কথা বলা হচ্ছে। আল মাজেরী ও কাযী ইয়াজ প্রমুখ হাদীস বিশারদ এ হাদীসের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তাতেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। (তিরমিযীর শরাহ'তুহফাতুল আল ওয়াযী, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৫৫৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

কাজেই স্বপ্ন দেখলেই তদনুযায়ী কাজ করতে হবে, ইসলামে এমন কথা অচল। আর দ্বিতীয় কথা হলো, নবী করীম (স) এর যা কিছু বলবার ছিল তা তো তাঁর জীবিত থাকাকালে সম্পূর্ণই বলে দিয়ে গেছেন, তাঁর জীবদ্দশায়ইতো দ্বীন পূর্ণতা লাভ করেছে। এখন নতুন করে তাঁর কিছুই বলবার থাকতে পারেনা। হালাল-হারাম, জায়েয-না জায়েয বলে দেয়া নবীর দায়িত্ব। আর নবীর এ দায়িত্ব নবীর জীবন পশ্চাৎই সীমাবদ্ধ।

নবীর জীবন শেষ হয়ে যাওয়ার পর এ পর্যায়ের কোনো দায়িত্বই থাকতে পারেনা তাঁর ওপর। আর শেষ নবীতো তাঁর জীবদ্দশাতেই ‘খাতামুল্লাবীযীন’ ছিলেন। নবীর জীবন শেষ হয়ে গেছে, তার পূর্বেই নবুয়্যতের দায়িত্ব পূর্ণরূপে পালিত হয়ে গেছে। অতঃপর স্বপ্নযোগে শরীয়তের কোনো নতুন বিধান দেয়ার প্রয়োজনই নেই। তাই স্বপ্নযোগে নবী করীম (স) কে দেখলেও এবং তার নিকট হতে কোনো নির্দেশ পেলেও তা পালন করার কোনো দায়িত্ব স্বপ্নদ্রষ্টারও নেই, নেই উম্মতের কোনো লোকেরও। দ্বীন ইসলাম পরিপূর্ণ। এখন বিশ্ব মানবের জন্য তা-ই একমাত্র চূড়ান্ত বিধান। সবকিছু তা থেকেই জানতে হবে, তা থেকেই গ্রহণ করতে হবে, চলতে হবে তাকে অনুসরণ করেই।

শরীয়তে স্বপ্নের যে মর্যাদা দেয়া হয়েছে, তা নিম্নোক্ত হাদীস থেকেই প্রমাণিত। এ পর্যায়ে দুটো হাদীস উল্লেখ করা যেতে পারে। একটি হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ - নবী করীম (স) বলেছেন, নবুয়্যতের কোনো কিছুই বাকী নেই- সবই শেষ হয়ে

গেছে। এখন আছে শুধু-‘সুসংবাদ দাতাসমূহ’। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন - সুসংবাদ দাতাসমূহ বলতে কি বোঝায়? নবী করীম (স) বললেনঃ তা হলো ভালো স্বপ্ন।

দ্বিতীয় হাদীস হলো হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ ভালো স্বপ্ন নবুয়্যতের ছিচল্লিশ ভাগের একভাগ মাত্র।

প্রথম হাদীস থেকে এতটুকু জানা যায় যে, ভালো স্বপ্ন বান্দার জন্য সুসংবাদ লাভের একটি মাধ্যম মাত্র। আর দ্বিতীয় হাদীস থেকে জানা যায় যে, নবুয়্যতের ছিচল্লিশ ভাগের এক ভাগ মর্যাদার অধিকারী হলো এই ‘শুভ স্বপ্ন’। তা হলে বাকি পঁয়তাল্লিশ ভাগ কি? তা হলো নবুয়্যতের মাধ্যমে লব্ধ কুরআন ও সুন্নাহ। [এ হাদীসে শুভ স্বপ্নকে নবুয়্যতের ছিচল্লিশ ভাগের এক ভাগ বলা হয়েছে। মুসলিম শরীফে হযরত আবু হুরায়রা (রা) বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছেঃ ‘শুভ স্বপ্ন’ নবুয়্যতের পঁয়তাল্লিশ ভাগের এক ভাগ, ইবনে আমর বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে সত্তর ভাগের এক ভাগ।

কাজেই এসব কথা কোনো নির্দিষ্ট জিনিস নয়। দ্বিতীয়, শুভ স্বপ্নকে নবুয়্যতের অংশ বলার মানে এ নয় যে, শুভ স্বপ্নও বুঝি ঠিক নবুয়্যতের মতোই নির্ভুল বিধানকারী জিনিস। এখানে নবুয়্যতের সঙ্গে শুভ স্বপ্নের শুধু সাদৃশ্য দেখানোর জন্যই এ কথা বলা হয়েছে। অন্যথায় শুভ স্বপ্ন কখনো নবুয়্যতের সমান হতে পারে না। (জুরকানী লিখিত মুয়াত্তার শরাহ, চতুর্থ খন্ড. ৩৫১ পৃ.)]

অতএব এই কুরআন ও সুন্নাহই হলো দ্বীনের আসল ও মূল ভিত্তি। তা-ই বাস্তব জিনিস, তার মুকাবিলায় স্বপ্নকে পেশ করা কল্পনা

বিলাসী লোকদেরই কাজ। যারা বাস্তব জীবনের ব্যাপারগুলোকে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে ইচ্ছুক, তাদের কর্তব্য হলো স্বপ্নের পেছনে না ছুটে কুরআন ও সুন্নাহকে ভিত্তি ধরে অগ্রসর হওয়া। যারা কুরআন-হাদীসের বাস্তব বিধানকে ভিত্তি করে কাজ করেনা, তা থেকে গ্রহণ করেনা জীবন পথের নির্দেশ ও ফয়সালা; বরং যারা স্বপ্নের ভিত্তিতেই সব বিষয়ে ফয়সালা গ্রহণ করে, তারা আসলেই ঈমানদার নয়, ঈমানদার নয় আল্লাহর কুরআন ও রাসূলের সুন্নাহের প্রতি। অতএব তারা বিদয়াতপস্থী, বিদয়াতী লোক।

সুতরাং, উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, বর্তমান প্রচলিত তাবলীগী জামাতের প্রবর্তক মৌলভী ইলিয়াস মেওয়াতী যদি নিজেকে উম্মতে মুহাম্মদী বলে দাবি করে থাকেন, তাহলে, তার এ উদ্ভট স্বপ্ন দলিল হতে পারে না বরং কথিত এ স্বপ্ন প্রদত্ত তাবলীগ বাতিল ও ভিত্তিহীন বলে গণ্য হবে। যদি কোন মুসলমান কথিত পীর ফকিরের ন্যায় এ ইলিয়াছী তাবলীগী জামাতে যোগদান করে তাহলে সে পথভ্রষ্ট হবার সমূহ সম্ভবনা রয়েছে।

অপরদিকে যদি তিনি নবুয়তের দাবিদার হন, তাহলে তার এ স্বপ্ন দলিল হতে পারে বটে কিন্তু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বশেষ নবী, কিয়ামত পর্যন্ত আর কোন নবী আসবেন না, আসতেও পারেন না।

সুতরাং যদি কেহ নবুওতের দাবি করে তবে সে সকল উম্মতের ঐকমত্যে কাফের হিসেবে গণ্য হবে। সর্বশেষে, আল্লাহ আমাদেরকে সঠিক পথে চলার তৌফিক দান করুন, আমীন।

চিল্লা প্রথা

চল্লিশ দিনের জন্য নিজস্ব খরচে তাবলীগে বের হওয়াকে ‘চিল্লা’ বলে। চিল্লা হলো তাবলীগীদের ভিত্তিমূলক রুকন। যে ব্যক্তি চিল্লায় বের হয়, তাকে তারা মহব্বত করে, সম্মান করে ও তার অপরাধসমূহ ক্ষমা করে। আর যারা বিরোধিতা করে তারা তাকে গ্রহণ করে না যদিও সে ইসলামের ফরয-ওয়াজিব সমূহ পালন করে। প্রচলিত তাবলীগের চিল্লা প্রথাকে শরীয়ত সিদ্ধ প্রমাণ করার জন্য তারা সূরা আল ইমরানের ১১০ নং আয়াতে বর্ণীত (أُخْرِجَتِ لِلنَّاسِ) এর অপব্যখ্যা করে এটাকে চিল্লার পক্ষে কুরআনী নির্দেশ বলতে চেয়েছেন যা ইসলাম শরীয়ত সম্মত নয়।^{৪৮৫}

অতএব, এসব বিদআতী চিল্লা প্রথা থেকে আমাদের দূরে থাকতে হবে এবং কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর সঠিক জ্ঞান অনুসন্ধানের মাধ্যমে আমরা আমাদের আমলকে সমৃদ্ধ করতে পারি। আল্লাহ আমাদের সেই তৌফিক দান করুন, আমীন।

বিশ্ব ইজতেমা প্রসঙ্গ

ইজতেমা’ শব্দের অর্থ সমাবেশ করা, সভা-সমাবেশ বা সম্মেলন। ধর্মীয় কোন কাজের জন্য বহু সংখ্যক মানুষকে একত্র করা, কাজের গুরুত্ব বোঝানো, কাজটি যথাযথভাবে সম্পন্ন করার জন্য সিদ্ধান্ত নেয়া এবং ব্যাপকভাবে এর প্রচার-প্রসারের জন্য বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করা ইত্যাদি বিষয়কে ইসলামের পরিভাষায় ইজতেমা বলা হয়। তাবলীগ জামা‘আতের বড় সম্মেলন হচ্ছে ‘বিশ্ব ইজতেমা’।

^{৪৮৫} হাদীসের প্রামাণিকতা – মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, পৃষ্ঠা নং ৬৭-৬৮।

১৯৪৪ সালে প্রথম বিশ্ব ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয় ঢাকার কাকরাইল মসজিদে। ১৯৪৮ সালে ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয় চট্টগ্রামের হাজি ক্যাম্পে এবং ১৯৫০ সালে নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জে। ১৯৬৫ সালে টঙ্গীর পাগার নামক স্থানে ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। এগুলো অনুষ্ঠিত হয়েছিল খুব ছোট পরিসরে। এরই মধ্যে তাবলীগের কার্যক্রম বাংলাদেশের গ্রামে-গঞ্জে, শহর-বন্দরে, ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। ইজতেমায় দেশি-বিদেশী বহু মানুষের উপস্থিতি বেড়ে যায়। ১৯৬৭ সালে টঙ্গীর তুরাগ নদীর তীরে বিশ্ব ইজতেমার স্থান নির্ধারণ করা হয়। তখন থেকেই বিশ্ব ইজতেমা সর্ববৃহৎ ধর্মীয় সমাবেশের পরিণত হয়! ১৯৭২ সালে সরকার টঙ্গীর ইজতেমাস্থলের জন্য সরকারী জমি প্রদান করেন এবং তখন থেকে বিশ্ব ইজতেমার পরিধি আরো বড় হয়ে উঠে। ১৯৯৬ সালে তৎকালীন সরকার এ জায়গায় ১৬০ একর জমি স্থায়ীভাবে ইজতেমার জন্য বরাদ্দ দেয় এবং অবকাঠামোগত কিছু উন্নয়ন ঘটায়। উক্ত ইজতেমার বিশেষ আকর্ষণ হল এই আখেরী মুনাজাত! মানুষ এখন ফরয সালাত আদায়ের চাইতে আখেরী মুনাজাতে যোগদান করাকেই অধিক গুরুত্ব দেয়। আখেরী মুনাজাতে শরীক হবার জন্য নামাজী, বে-নামাজী, ঘুষখোর, সন্ত্রাসী, বিদআতী, দুষ্কৃতিকারী দলে দলে ময়দানের দিকে ধাবিত হয়। কেউ ট্রেনের ছাদে, কেউ বাসের হ্যান্ডেল ধরে, নৌকা, পিকআপ প্রভৃতির মাধ্যমে ইজতেমায় যোগদান করে। তারা মনে করে সকল প্রাপ্তির সেই ময়দান বুঝি টঙ্গির তুরাগ নদীর পাড়ে। মানুষ পায়খানা-পেসাব পরিষ্কার করেও সেখানে

ছওয়াবের আশায় থাকেন। এ যেন সওয়াবের ছড়া ছড়ি, যে যতো কুড়িয়ে থলে ভরতে পারবে তার ততোই লাভ। ট্রেনের ছাদের উপর মানুষের ঢল দেখে টিভিতে সাংবাদিক ভাইবোনগণ মাথায় কাপড় দিয়ে বার বার বলেন ধর্মপ্রাণ মুসলমানগণ আজ তাদের পাপের প্রাশ্চিত্ত করতে ছুটে চলছেন তুরাগের পাড়ে! পরের দিন বড় হেডিং দেখে যারা এবার যেতে পারেননি তারা মনে মনে ওয়াদা করে বসবেন যে আগামীতে যেতেই হবে। তা না হলে পাপীদের তালিকায় নাম থেকেই যাবে! এভাবে পঙ্গোপালের মতো এদের বাহিনী বড়তে থাকবে। এদের আর রুখা যাবে না। কেননা স্বয়ং রাষ্ট্রপতি বঙ্গভবনে, প্রধানমন্ত্রী গণভবনে, বিরোধীদলীয় নেত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রীগণও সেখানে গিয়ে আঁচল পেতে প্রার্থনা করেন। টিভিতে সরাসরি মুনাজাত সম্প্রচার করা হয়। রেডিও শুনে রাস্তার ট্রাফিকগণও হাত তুলে আমিন! আমিন! বলতে থাকে। কি সর্বনাশা বিদ'আত আমাদের কুড়ে কুড়ে গ্রাস করছে তা আমরাও জানি না! আরারফার মাঠে হজ্জ এর সময় লক্ষ লক্ষ লোক সমাগম হয়। সেখানে কেন সম্মিলিত মুনাজাত হয় না? যেখানে আব্বাহ নিজে হাযির হতে বলেছেন, যেখানে তিনি অগণিত মানুষকে ক্ষমা করে দেন। এই প্রশ্নের জবাব যারা বুঝতে চেষ্টা করেছে তারাই বুঝতে পারবে কেন বিশ্ব ইজতেমা বিদ'আত? সম্মিলিত মুনাজাত এর কারণেই বিশ্ব ইজতেমা বিদ'আত। যদি আখেরী মুনাজাত না হত তবে অন্তত বলা যেত ইসলামিক আলোচনার জন্য বিশ্ব ইজতেমা। তাছাড়া এই ইজতেমা বিদ'আতী কিতাব থেকে বয়ান করা হয়।

অনেকে আবার এই ইজতেমাকে ২য় হজ্জ বলে উল্লেখ করেন! (নাউযুবিল্লাহ)^{৪৮৬}। এমনকি ‘চ্যানেল আই’ সহ অন্যান্য গণমাধ্যমগুলোতেও এটিকে হজ্জের সাথে তুলনা করেছে! আল্লাহ তা‘আলা কাবা ঘর ছাড়া অন্য কোথাও ২য় হজ্জ করতে বলেন নি। এমন কাজ সওয়াবের আশায় করলে আল্লাহর দেয়া নির্ধারিত বিধানের সীমালঙ্ঘন করা হবে। আর আল্লাহর দেয়া সীমালঙ্ঘন করলে তার পরিণাম হবে ভয়াবহ। আল্লাহ তায়ালা বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও রাসূলের অবাধ্য হয়ে আল্লাহর সীমালঙ্ঘন করে, আল্লাহ তাকে জাহান্নামে ঢুকাবেন, সেখানে সে চিরকাল থাকবে আর তার জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি^{৪৮৭}। ইসলামের সঠিক ব্যাখ্যা প্রদান ও প্রচার করার লক্ষ্যে যেকোন মাহফিল বা ইজতেমার আয়োজন করা ও সেখানে যোগদান করা যায়। কিন্তু যদি ইসলামের নামে জাল, যঈফ ও বানোয়াট হাদীসের এবং ভিত্তিহীন ফাযায়েল ও কেচ্ছা-কাহিনী শোনার দাওয়াত দেয়া হয়, বিদ‘আতী আক্বীদা ও আমল প্রচার করা হয়, তাহলে সেখানে যোগদান করা যাবেনা। চাই সেটা বিশ্ব ইজতেমা হোক বা অন্য কোন ইজতেমা হোক। কারণ বিদ‘আতীদের সঙ্গ দিতে নিষেধ করা হয়েছে। বিদ‘আতী লোকেরা ক্রিয়ামতের দিন হাউয কাওছারের পানি পান করতে পারবে না^{৪৮৮}। অতএব, মুসলিম সমাজে ক্রমশঃ আল্লাহ প্রদত্ত পবিত্র কুরআন ও সুন্নাতে নববীর নির্ধারিত দ্বীনের পরিবর্তে কিছু মনগড়া নবাবিস্কৃত

^{৪৮৬} তাবলীগ জামায়াত ও বিশ্ব ইজতেমা - একটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ - আকরাম হোসাইন

^{৪৮৭} সূরা নিসা, আয়াত নং - ১৪

^{৪৮৮} মুসলিম, হা/৪২৪৩।

আদর্শ ও নীতি অনুপ্রবেশ করছে। ফলশ্রুতিতে আমরা প্রকৃত ইসলাম থেকে দূরে সরে যাচ্ছি। আমাদের মধ্যে তাওহীদ ও সুন্নাহর পরিবর্তে শিরক বিদ'আতের প্রাদুর্ভাব ঘটছে। তাবলীগপন্থীদের টুপি, পাগরী, লম্বা পোশাকের বাহ্যিক রূপ দেখে অনেকে মনে করেন এরাই সঠিক পথে আছে। বহু মসজিদে তাদেরকে দেখতে পাবেন, 'বাকি নামাজ বাদ ঈমান ও আমলের কথা হবে আমরা সবাই বসি বহুত ফায়দা হবে'। আসলে প্রকৃতপক্ষেই এসব শিরক-বিদ'আতীদের মজলিসে আপনি বসলে ঈমান ও আমলে ফায়দা তো দূরের কথা বরং ঈমান ও আমল দু'টিই হারাবেন। তাই আল্লাহ তা'আলার কাছে আমাদের ফরিয়াদ হচ্ছেঃ হে আল্লাহ আমাদেরকে প্রচলিত তাবলীগী বিদ'আতী প্রথা থেকে হেফযত করুন এবং সঠিক কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ অনুযায়ী আমল করতে পারি এবং দ্বীনের খেদমত করতে পারি সেই তৌফিক দান করুন, আমীন।

বিশ্ব বরেণ্য আলিমগণের দৃষ্টিতে তাবলীগ জামা'আত ও তার নিসাব

সম্মানিত মুসলিম ভ্রাতাগণ! আমি আপনাদের খেদমতে সামান্য একটু আলোচনা করব বিশ্বের সকল মুসলিমদের নিকট সমাদৃত আলিম উলামাদের মতামত, বিশেষ করে আরব বিশ্বের আলিমগণের অভিমত। কারন আমি কয়েকেটি বই পড়ে জানতে পারলাম যে, এতদিন ধরে আমরা যে সাওয়াবের আশায় তাবলীগী কাজ করছি এবং পিপিলিকার স্রোতের মতো তুরাগনদীর পাড়ে জমায়েত হয়ে ফজিলতের বয়ান শুনে কান ঝালাপালা করে সমস্ত পাপ মুক্ত হয়ে

যার যার ঘরে ফিরছি তা সম্পূর্ণই ভিত্তিহীন, বানোয়াট এবং বিদ'আতী কার্যকলাপ। দ্বীনের মধ্যে সওয়াবের আশায় নতুন কোন পন্থা আবিষ্কার করাই হল বিদ'আত। আরব বিশ্বের উলামায়ে কিরাম তাবলীগী জামা'আত ও তার নিসাবকে বাতিল বলে প্রত্যাখ্যান করেছেন। তারই প্রমান স্বরূপ বর্তমান শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ কিছু আলিমের মতামত সংক্ষেপে তুলে ধরছি।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাতা'আলা শারী'আতের বিভিন্ন বিষয়ে এ সমস্ত আলিমদের অভিমত গ্রহণ করার জন্য আল কুরআনে বলেন, "তোমরা জ্ঞানবানদের জিজ্ঞেস কর, যদি তোমরা তা না জান।" (সূরা আশ্বিয়া, ৭)

০১। শাইখ মুহাম্মদ বিন ইবরাহীম আল শাইখ (রহঃ)- সাবেক গ্রান্ড মুফতী, সৌদী আরব তাঁর রাজকীয় তথ্য মন্ত্রণালয়ের প্রধানকে লেখা পত্রে তাবলীগ জামা'আত সম্পর্কে বলেন, আমি মহোদয়ের নিকট এ প্রতিবেদন পেশ করছি যে, এই জামা'আতের কোনই ফায়দা নেই, এটি একটি বিদ'আতী এবং গোমরা সংগঠন। তাদের নিসাব গ্রন্থ পড়ে দেখলাম, তাতে গোমরাহী এবং বিদ'আত ভরপুর। এতে কবর পূজা এবং শিরকের দিকে আহ্বান করা হয়েছে। বিষয়টি এমনই যে, এ ব্যাপারে চুপ থাকা যায় না। এজন্য অবশ্যই আল্লাহ চাহেন তো আমি এর প্রতিবাদ লিপি পাঠাব যেন এর বিভ্রান্তি ও বাতিল প্রকাশ হয়ে পড়ে। আল্লাহর নিকট দু'আ করি তিনি যেন, তাঁর দ্বীনকে সাহায্য করেন এবং কালিমাকে সুউচ্চে রাখেন- আমীন!

তারিখঃ ২৯/০১/১৩৮২ হিঃ (তথ্য সূত্রঃ ফতওয়া ও চিঠিপত্র, শাইখ মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম আলে শাইখ, খন্ড ১ পৃঃ ২৬৭-২৬৮)

০২। শাইখ আবদুল আযীয বিন বায (রহঃ)'র নিকট তাবলীগ জামা'আত এর সঙ্গে চিল্লায় বের হওয়া সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে জবাবে তিনি বলেন, "আল্লাহর নামে শুরু করছি এবং সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য। অতঃপর তাবলীগ জামা'আতের নিকট আক্বীদাহর ক্ষেত্রে স্বচ্ছ ধারণা নেই। সুতরাং তাদের সাথে বের হওয়া উচিত নয়। একমাত্র যার আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামা'তের আক্বীদা সম্পর্কে জ্ঞান ও স্বচ্ছ ধারণা রয়েছে সে বের হতে পারে, এজন্য যে তাদেরকে সঠিক পথের দিশা দিতে এবং প্রয়োজনীয় নাসীহাত করতে পারে এবং তাদেরকে কল্যাণমূলক কাজে সহায়তা করতে পারে। কেননা, তারা তাদের কাজের ব্যাপারে খুবই তৎপর। কিন্তু তারা আরো অধিক জ্ঞানের মুখাপেক্ষী এবং আলিম-উলাময়ে কিরামের প্রতি মুখাপেক্ষী, যারা তাদেরকে তাওহীদ ও সুন্নাহর জ্ঞানে আলোকিত করবে। আল্লাহ তা'আলা সকলকে দ্বীনের জ্ঞান দান করুন এবং এর উপর সাবিত রাখুন। আমীন!

০৩। শাইখ মুহাম্মাদ বিন সালাহ আল উসাইমীনকে প্রশ্ন করা হয়েছিল তাবলীগ জামা'আত ও এর সাথে সংশ্রব রাখার ব্যাপারে এবং তাদের নির্দিষ্ট তরীকার যিকর ও ছয় উসূল সম্পর্কে। উত্তরে বলেন, "ইবাদাত হল 'তাওকিফী' অর্থাৎ শারীয়াত নির্ধারিত। এজন্য কোন মুসলিমই কোন ইবাদাত করতে পারবে না যা আল্লাহ ও তাঁর রসূল (সাঃ) নির্দিষ্ট করেননি। কেননা আল্লাহ তা'আলা অস্বীকার

করেছেন তাদেরকে যারা আল্লাহ তাঁর রসূল (সাঃ) ব্যতীত অন্য কারো তৈরী করা ইবাদাত করবে।

আল্লাহ তা'আলা এ প্রসঙ্গে তাই বলেছেন, "তাদের কি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য রয়েছে, তাদের জন্য যারা বিধান তৈরী করেছে যার অনুমতি আল্লাহ দেননি? যদি চূড়ান্ত ফায়সালা না থাকত তবে তাদের মাঝে এখই দফারফা করে দেয়া হত।" (সূরা আশ-শূরা ২১)।

ইবাদত হল তাওকিফী' তার ধরণ, পরিমাণ, গুণাবলী, সময় এবং স্থানের দিক দিয়ে। সুতরাং ইবাদত অবশ্যই শারী'আত মোতাবেক হতে হবে। প্রশ্নকারীরা যা উল্লেখ করেছে, এভাবে ক্রমাধারায় বিদ'আতী তরীকায় আল্লাহর যিকর ও তাদের ছয় উসূল দেখতে হবে যে, শারীয়াতের এভাবে সাব্যস্ত রয়েছে কি না? যদি রাসূল (সাঃ) থেকে এভাবে সাব্যস্ত হয়ে থাকে তাহলে মাথা পেতে নিতে হবে। আর যদি সাব্যস্ত না থাকে তাহলে যা রসূল (সাঃ) থেকে সাব্যস্ত রয়েছে তাই যথেষ্ট। আমি জানি না যে, রসূল (সাঃ) থেকে এভাবে যিকর তিলাওয়াত ও উসূল সাব্যস্ত রয়েছে কিনা। এজন্য আমার ভাইদের অনুরোধ করছি যারা এর সাথে জড়িত তারা যেন তা পরিত্যাগ করেন এবং রাসূল (সাঃ) থেকে প্রমাণিত ও সাব্যস্ত সে অনুযায়ী আমল করেন। সেটাই তাদের জন্য উত্তম এবং প্রতিফলও ভাল হবে।

০৪। শাইখ নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ)'র নিকট প্রশ্ন করা হয়ঃ তাবলীগ জামা'আত সম্পর্কে আপনার অভিমত কি? এদের সাথে

কোন তালিমে 'ইলম বা অন্য কেউ আল্লাহর পথে দাওয়াত দিতে বের হতে পারে কি?

উত্তরে তিনি বলেন, তাবলীগ জামা'আত আল্লাহর কুরআন এবং রসূলের হাদীসের তরীকার উপর প্রতিষ্ঠিত নয় এবং আমাদের সালফে সালিহীনদের পন্থার উপর নয়। অবস্থা যখন এই, তখন তাদের সাথে বের হওয়া জায়য হবে না। কেননা এটা আমাদের সালফে সালিহীনদের তাবলীগের পন্থার পরিপন্থী। দা'ওয়াতের কাজে বের হবেন আলিম বা বিদ্বান ব্যক্তি। আর এরা যারা বের হচ্ছে তাদের উপর অবশ্য করণীয় হল নিজের দেশে জ্ঞান শিক্ষা করা, মাসজিদে মাসজিদে জ্ঞানার্জনের ব্যবস্থা করা, যারা দা'ওয়াতের কাজ করবে তারা যেন আলিম তৈরী হয়। এ অবস্থায় তালিবে ইলমদের উচিত যেন এদেরকে তাদের দেশেই কুরআন-হাদীস শিক্ষার জন্য আহ্বান জানায়। মানুষকে আল্লাহর পথে দা'ওয়াত তাবলীগীরা কুরআন ও সুন্নাহকে তাদের মূলনীতি হিসাবে গণ্য করে না। বরং তারা এই দা'ওয়াতকে বিভক্ত করে ফেলেছে। এরা যদিও মুখে বলে যে, তাদের দা'ওয়াত কুরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক তা নিছক মুখের কথা, এদের কোন একক আকীদা বিশ্বাস নেই যা তাদেরকে একত্রিত করতে পারে। এজন্যই দেখা যায়- এরা হল সূফী ও মাতুরিদী, আশায়িরীর আর এরা তো কোন মাযহাবেই নেই। আর এর কারণ হল তাদের আকীদাহ-বিশ্বাস জটপাকানো। এদের নিকট স্বচ্ছ জ্ঞানের অভাব। এদের জামা'আত প্রতিষ্ঠার প্রায় অর্ধশত বছর পার হয়ে গেল কিন্তু এত লম্বা সময়ের পরও তাদের মাঝে কোন

আলিম তৈরী হলো না। আমরা এজন্যই বলি আগে জ্ঞানার্জন কর, তারপর একত্রিত হও যেন একত্রিত হওয়া যায় নির্দিষ্ট ভিত্তির উপর, যাতে কোন মতভেদ থাকবে না।

তাবলীগ জামা'আত বর্তমান সূফী মতবাদের ধারক বাহক জামা'আত। এরা চরিত্র সংশোধনের ডাক দেয় কিন্তু আক্বীদা-বিশ্বাসের সংস্কার ও সংশোধনের ডাক দেয় না। এ ব্যাপারে তারা সম্পূর্ণ নিশ্চূপ। কেননা তাদের ধারণা মতে এর দ্বারা বিভক্তি সৃষ্টি হবে। জনাব সা'দ আল হুসাইন এবং ভারত-পাকিস্তানের তাবলীগের মুরব্বীদের সাথে বেশ কিছু পত্র যোগাযোগ হয়। এর দ্বারা এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, তারা ওয়াসীলা, উদ্ধারকারী (ইস্তিগাসা) এবং এ ধরনের অনেক ধারণাই সমর্থন করে। প্রত্যেক তাবলীগীকে এই চার তরীকার ভিত্তিতে বাই'আত গ্রহণ করতে হবে। কেউ হয়তো প্রশ্ন করতে পারেন যে এদের প্রচেষ্টায় অনেক মানুষই আল্লাহর পথে ফিরে এসেছে বরং এদের সাথে বের হবার জন্য কেউ কেউ ইসলাম গ্রহণ করেছে তাদের কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করার জন্য কি এটা যথেষ্ট নয়? এ ব্যাপারে বলছি যে, এটাও আমরা অনেক শুনেছি এবং জানি, সূফীদের কাছে থেকে অনেক ঘটনাই জানি। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, যদি শাইখের আক্বীদাহ ফাসিদ হয়, হাদীস জানে না বরং লোকজনের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করে এতদ্বসত্ত্বেও অনেক ফাসিক লোক তার হাতে তাওবাহ করে। যে দলই ভাল বা কল্যাণের দিকে ডাকবে অবশ্যই তার অনুসারী পাওয়া যাবে। কিন্তু আমরা দৃষ্টি দিবো যে, সে কিসের দিকে আহ্বান করছে? সে কি

কুরআন হাদীস এবং সালফে সালিহীনের আক্বীদার দিকে ডাকছে এবং কোন মাযহাবের ব্যাপারে কোন রকম গোঁড়ামী করে না এবং যেখানেই পায় সুন্নাহের অনুসরণ করে। তাবলীগ জামা'আতের কোন ইলমী তরীকা বা পন্থা নেই। তাদের পন্থা হল স্থানের পরিপ্রেক্ষিতে যেখানে তার জন্ম হয়েছে। এরা সব রঙেই রঙ্গীন হয়। (ইমারতী ফতওয়া, আলবানী, পৃঃ ৩৮)

আল্লাহ আমাদের সকল প্রকার ধোকাবাজী হতে রক্ষা করুন।
আমীন!

চৌত্রিশ তম পরিচ্ছেদ - জন্মদিন পালন করা বিদ'আত

বর্তমানে জন্মদিন পালন বলতে বুঝায় মাসের যে তারিখটিতে কোন ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেছে বছর ঘুরে সে তারিখটি আবার ফিরে আসলে সেটাই তার জন্মের দিন তথা জন্মদিন। সেদিনে আত্মীয়-সজন বন্ধু-বান্ধব নিয়ে আনন্দ উল্লাস করা হয়, আয়োজন করা হয় বিশেষ অনুষ্ঠান বা উৎসবের। এতে আমন্ত্রিত মেহমানদের আপ্যায়ন করা হয়ে থাকে। মেহমানরা তাকে জন্মদিনের শুভকামনা জানান এবং তার ভবিষ্যত জীবন যেন আরো সুন্দর ও বর্ণীল হয় এ দোয়া করেন। সেই সাথে তারজন্য উপহার সামগ্রীও দিয়ে থাকেন। মোটকথা জন্মদিন উপলক্ষে অনুষ্ঠান পালন ও আনন্দ-উৎসব উৎযাপন করাকে জন্মদিন বলে আখ্যায়িত করা হয়। বস্তুতঃ জন্মদিন পালন/সেলিব্রেশন সত্যিকথা বলতে মুসলিমদের কালচার নয়। এটি এসেছে অমুসলিমদের কাছ থেকে যা মুসলিমদের উপর গভীরভাবে

প্রভাব ফেলেছে। যার জন্য আমরা বুঝে কিংবা না বুঝে এই কালচারের দ্বারা প্রভাবিত। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাই বলেনঃ-

১। সূরা হাশর এর ১৮নং আয়াতে আল্লাহ বলেন, মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহ তা'আলাকে ভয় কর। প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত, আগামী কালের জন্যে সে কি প্রেরণ করে, তা চিন্তা করা। আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করতে থাক। তোমরা যা কর, আল্লাহ তা'আলা সে সম্পর্কে খবর রাখেন। [আল-হাশরঃ ১৮]

২। সূরা হা-মীম সেজদা এর ৪০ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন, নিশ্চয় যারা আমার আয়াতসমূহ বিকৃত করে তারা আমার অগোচরে নয়। যে অগ্নিতে নিষ্কিণ্ত হবে সে কি উত্তম, না যে কিয়ামত দিবসে নিরাপদভাবে উপস্থিত হবে? তোমাদের যা ইচ্ছা আমল কর। নিশ্চয় তোমরা যা আমল কর তিনি তার সম্যক দ্রষ্টা। [হা-মীম সেজদাঃ ৪০]। সুতরাং, বছরের যে দিনটিতে কেউ জন্ম গ্রহণ করেছে, সেই দিনকে তার জন্য বিশেষ কোন দিন মনে করা বা এই উপলক্ষ্যে আনন্দ-ফুর্তি করা অথবা কোন আমল করার বিষয়ে কুরআন-সুন্নায কোন ভিত্তি পাওয়া যায়না। খাইরুল কুরানেও (সাহাবী ও তাবেরঈন রাযি. এর স্বর্ণযুগ) জন্মদিন পালনের কোন অস্তিত্ব ছিল না। যদি জন্মদিন বলতে ইসলামে কোন কিছু থাকত তাহলে হাদীস ও ইতিহাসের কিতাব গুলোতে সাহাবী ও তাবেরঈন রাযি. এর জন্মদিন পালনের কোন না কোন ঘটনা থাকত। অথচ তাদের জন্মদিন পালনের কোন প্রমাণ কোন সূত্রেই পাওয়া যায়না। এমন কি জন্মদিনের বিশেষ কোন গুরুত্বই তাদের কাছে ছিল না। এর প্রমাণ

মেলে তাদের জীবনের দিকে দৃষ্টিপাত করলে। সাহাবা ও তাবেরঈন রাযি.এর জীবনের দিকে লক্ষ্য করলে স্পষ্ট হয় যে, তারা কোন সনে জন্মগ্রহণ করেছেন তা কারো কারোটা জানা গেলেও কোন মাসের কোন তারিখে জন্ম করেছেন তা জানা খুবই দুস্কর। এমনকি আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রবিউল আওয়াল মাসের কত তারিখে জন্মগ্রহণ করেছেন এটা নিশ্চিত ভাবে জানা না থাকায় সীরাত প্রণেতাদের মধ্যে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। আমাদের মাঝে অতি প্রাসিদ্ধ বারই রবিউল আউয়ালও সর্ব সম্মত মত নয়। ইসলামে জন্মদিন পালন গুরুত্ববহন করলে কমপক্ষে সে সময় সাহাবিদের সন্তান সন্ততি জন্মগ্রহণ করেছেন তাদের জন্মতারিখ সংরক্ষিত থাকত। তারা জন্মদিন ঘটা করে পালন করতেন। অথচ জন্মদিন পালন তো দূরের কথা তাদের জন্মতারিখই সংরক্ষণ করা হয়নি। এটা যতি পালনীয় বিষয় হতো বা গুরুত্ব বহন করত তাহলে অবশ্যই তারা তদাদের সন্তানদের জন্ম তারিখ সংরক্ষণ করতেন। এর মাধ্যমে এ কথা প্রমাণিত হয় জন্মদিন বলতে বর্তমানে যা বুঝায় ইসলামে এর কোন অস্তিত্বই ছিল না।

জন্মদিন পালন এর সূচনা কাদের থেকে সৃষ্ট

আসুন এবার দেখা যাক জন্মদিন পালনের বিষয়টি কিভাবে বা কাদের থেকে এসেছে। আমাদের দেশে যেভাবে কেক কেটে জন্মদিন পালন করা হচ্ছে। এর উৎপত্তি আমাদের দেশে না, পশ্চিমাদেশে। ধারণা কারা হয়, খ্রিস্টের জন্মের বছ পূর্ব থেকে জন্মদিন উৎসব হিসেবে পালন কারা হত। পেরগান সংস্কৃতির লোকেরা

অদৃশ্য আত্মাকে ভয় পেত-বিশেষভাবে জন্ম দিনে। তাদের প্রায় সকলেরই বিশ্বাস ছিল যে, এই অদৃশ্য আত্মারা আরো বেশি ভয়ঙ্কর হয়ে উঠে যখন কোন ব্যক্তি তাদের দৈনন্দিন জীবনে কোন পরিবর্তন আসে। যেমন, বছর বয়স বাড়া। তাই ছিল ধর্মীয় অনুষ্ঠান হিসেবে পরিবার ও বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে উৎসাপন, যারা হাঁসি-তামাশা করে সে ব্যক্তির চার পাশ ঘিরে রাখত যাতে খারাপ আত্মা তার কোন ক্ষতি করতে না পারে। উপহারের পরিবর্তে, পরের বারের জন্মদিনটা যেন শুভ ও মঙ্গলময় হয় সকলে সেই কামনাই করতেন। আর জন্মদিন সম্পর্কে যতটুকু জানা যায় এর সূচনা কোনো মুসলিম থেকে হয়নি। বরং হয়েছে ফেরাউন থেকে। বাইবেলের বুক অব জেনেসিসে এসেছে, “ তৃতীয় দিনটা ছিল ফেরাউনের জন্ম দিন। ফেরাউন তার সব দাসদের জন্য ভোজের আয়োজন করলেন। সেই সময়ে ফেরাউন রুটিওয়ালা ও দ্রাক্ষারস পরিবেশককে কারাগার থেকে মুক্তি দিলেন”। (আদি পুস্তক, ৪০:২০) আনুমানিক খৃষ্টপূর্ব তিন হাজার পঞ্চাশ থেকে চার হাজার বছর পূর্বের এ ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে।

বিভিন্ন ধর্মে জন্মদিন পালনের বিধান প্রসঙ্গে

১। ইহুদি ধর্মে জন্মদিন - ইহুদি ধর্মে মানুষকে উৎসাহিত করা হয়েছে বন্ধু-বান্ধব আত্মীয় সজনদের জমায়েত করে ধর্মীয়ভাবে আনন্দ উদযাপনের সাথে জন্মদিন পালনের জন্য। ইহুদিদের অনেক রাবায়ি(আলেম) মনে করেন কোন ব্যক্তির জন্য তার জন্মদিনটি তার জন্য দোয়া কবুলের একটি বিশেষ দিন। আধুনিক জন্মদিনে

ধর্মনিরপেক্ষ অনেক বিষয় থাকলেও এটা ধর্মীয় আচারেরই সার নির্যাস।

২। হিন্দু ধর্মে জন্মদিন - হিন্দু ধর্মের শাস্ত্রীয় বিবরণ ও জ্যোতিষ গণনার ভিত্তিতে লোক বিশ্বাস অনুযায়ী শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হয়েছিল ৩২২৮ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের ১৮ অথবা ২১ জুলাই। এ দিনটি জন্মাষ্টমী নামে পরিচিত। হিন্দু পঞ্জিকা মতে, সৌর ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিতে যখন রোহিণী নক্ষত্রের প্রাধান্য হয়, তখন জন্মাষ্টমী পালিত হয়। উৎসবটি গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার অনুসারে, প্রতি বছর মধ্য-আগস্ট থেকে মধ্য-সেপ্টেম্বরের মধ্যে কোনো এক সময়ে পড়ে। ভাদ্র ও মাঘ মাসের শুক্লা চতুর্থীকে গণেশ চতুর্থী বলা হয়। গণেশ চতুর্থী বা গণেশোৎসব যা হিন্দু দেবতা গণেশের বাৎসরিক পূজা-উৎসব। হিন্দু বিশ্বাসে এই দিনটি গণেশের জন্মদিন। হিন্দু ধর্মে দ্বাদশ অথবা ত্রয়োদশ বছরে জন্মদিন পালিত হয় ত্রৈপৈত পরিধান উৎসব হিসেবে। বয়স পূর্তিতে শিশু একটি বড় সূতার কুণ্ডলী কাঁধের একপার্শ্বে ঝুলিয়ে রেখে পরিধান করে। এছাড়াও, এ উৎসবটি উপনয়ণ নামে স্বীকৃত। হিন্দুদের বর্ণপ্রথায় উচ্চতর বর্ণ হিসেবে ব্রাহ্মণ পরিবারের সংস্কৃতিতে এ উৎসবটি মূলতঃ বালকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

৩। বুদ্ধ ধর্মে জন্মদিন - আমরা সবাই বুদ্ধ পূর্ণিমার কথা জানি। বুদ্ধ পূর্ণিমা বা বৈশাখী পূর্ণিমা হল বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের পবিত্রতম উৎসব। এই পুণ্যোৎসব বৈশাখ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে উদযাপিত হয়। বৌদ্ধধর্ম মতে এই পবিত্র তিথিতে বুদ্ধজন্মগ্রহণ করেছিল, বোধি বা

সিদ্ধিলাভ করেছিল এবং মহাপরিনির্বাণ লাভ করেছিল। এই দিনে বৌদ্ধধর্মাবলম্বীরা স্নান করে, শুচিবস্ত্র পরিধান করে মন্দিরে বুদ্ধের বন্দনায় রত থাকে। ভক্তরা প্রতিটি মন্দিরে বহু প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করে, ফুলের মালা দিয়ে মন্দিরগৃহ সুশোভিত করে বুদ্ধের আরাধনায় নিমগ্ন হয়। এছাড়া বুদ্ধরা এই দিনে বুদ্ধ পূজার পাশাপাশি পঞ্চশীল, অষ্টশীল, সূত্রপাঠ, সূত্রশ্রবণ, সমবেদ প্রার্থণাও করে থাকে।

৪। খ্রিস্টান ধর্মে জন্মদিন - ক্রিস্টমাস খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্মীয় উৎসব। প্রতিবছর ২৫ ডিসেম্বর রোমান ক্যাথলিক ও প্রটেস্ট্যান্ট চার্চের অনুসারীরা যিশুখ্রিস্টের জন্মদিন উপলক্ষে এ উৎসব পালন করে। খ্রিস্টীয় ২০০ সাল থেকে এ উৎসব পালন শুরু হয়। ৩৫৪ সালে দিনটিকে যিশুর জন্মদিবস হিসেবে ঘোষণা করা হয় এবং এ ঘোষণা ৪৪০ সালে পোপ স্বীকার করেন। মূলত পৌত্তলিক রোমানদের উৎসবের বিপরীতে ক্রিস্টমাস পালন শুরু হয়। মূলকথা বলতে গেলে জন্মদিনের ব্যাপক প্রচলন খৃষ্টানদের মাধ্যমেই ছড়িয়েছে। এখন দেখা যাচ্ছে, জন্মদিন পালন শুধু বিধর্মীদের সংস্কৃতিই নয় বরং ধর্মীয়ভাবেও এর বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে।

ইসলামের ধর্মের দৃষ্টিতে জন্মদিন পালন শরীয়তসম্মত কি না?

উপরোক্ত বিভিন্ন ধর্মের আলোচনা থেকে এটাই লক্ষণীয়, যে, মানুষ অন্যের অনুকরণ করে থাকে তার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ও ভালোবাসা থেকে। জন্মদিন পালন যদি ইহুদি ও খৃষ্টানদের কৃষ্টিকালচারের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ কিংবা ভালোবাসা থেকে হয় তাহলে সেটা শুধু হারামের

মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকবে না বরং কুফরি পর্যন্ত পৌঁছে দিবে। (ইমদাদুল আহকাম)। অন্যকোন পন্থায় জন্মদিন পালনের মূল বিষয়টি যেহেতু বিধর্মীদের থেকে এসেছে তাই বলা যায় এর মূল জিনিসটিই ইসলামে প্রত্যাখ্যাত। তা যে কোন পদ্ধতিতেই হোক। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ { [الأعراف : ৩]

তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তার অনুসরণ কর। তাঁকে বাদ দিয়ে অন্য সাথীদের অনুসরণ করনা। তোমরা খুব অল্পই উপদেশ গ্রহণ কর। (সূরা আ'রাফঃ আয়াত নং - ৩)

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ { [الحج : ১৮]

এরপর আমি আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করেছি দ্বীনের বিশেষ বিধানের উপরঃ সুতরাং আপনি এর অনুসরণ করুন, মূর্খদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করবেননা। (সূরা যাসিয়াঃ আয়াত নং - ১৮)।

এখন কেউ যদি বলে আমি জন্মদিন হিসেবে শুকরিয়া স্বরূপ কিছু আমল করবো তাহলে এই ব্যাপারে কথা হলো, ইসলামে যে বিষয়টি নেই তা ইসলামের অন্তর্ভুক্ত করা বিদ'আত যা প্রত্যাখ্যাত। হাদীসও এসেছে

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد

হযরত আয়েশা রাযি. হতে বর্ণিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কেউ আমাদের এ শরীয়তে সংগত নয় এমন কিছুর অনুপ্রবেশ ঘটালে তা প্রত্যাখ্যান করা হবে। (সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৫৫০, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৪৫৮৯)।

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته يحمد الله ويثني عليه بما هو أهله ثم يقول من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار

হযরত যাবের ইবন আব্দুল্লাহ (রাযি.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুতবার মাঝে বলতেন, যাকে আল্লাহ হেদায়াত দেন তাকে ভ্রষ্টকারী কেউ নেই। আর যাকে পথভ্রষ্টকরেন তার জন্য হেদায়াত কারী কেউ নাই। নিশ্চয়ই সবচেয়ে খাটি কথা হল আল্লাহর কিতাব ও সর্বোত্তম দিশারী হল মুহাম্মাদ সা এর সুন্নাহ এবং সর্ব নিকৃষ্ট কর্মহল (দ্বীনের মাঝে) নতুন কিছু উদ্ভাবন করা। প্রত্যেক নতুন উদ্ভাবিত বিষয়ই বিদ'আত ; প্রত্যেক বিদ'আত ই ভ্রষ্টতা আর প্রত্যেক ভ্রষ্টতাই জাহান্নামী। (সুনানে নাসাঈঃ হাদীস নং - ১৫৭৭)

কেউ আমল করার জন্য এক বছর অপেক্ষা করুক এটা ইসলাম কামনা করে না। নির্দিষ্ট কোন দিনের জন্য আমলকে বাচিয়ে রাখা ইসলামের কর্মপন্থার বিরোধী। বরং নিয়মিত আমল স্বল্প হলেও আল্লাহর কাছে অধিক পছন্দ। এ ব্যাপারে হাদীসেও এসেছে -

عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله تعالى أدومها وإن قل

হযরত আয়েশা রাযি. হতে বর্ণিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা নিকট পছন্দনীয় আমল হচ্ছে নিয়মিত আমল, চাই তা কম হোকনা কেন। (সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬০৯৯, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৭৮৩)। সুতরাং, উপরোক্ত কুরআন ও হাদীসের আলোকে বলা যায় যে, ইসলামে যেহেতু জন্মদিনের কোন ভিত্তি পাওয়া যায়নি পক্ষান্তরে এটা বিধর্মীদের সংস্কৃতি ও ধর্মীয় আচার হওয়ায় এটি পালন করা সম্পূর্ণরূপে হারাম ও নাজায়েজ। হাদীসে এসেছে,

عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم “من تشبه بقوم فهو منهم”
 হযরত ইবনে উমার রাযি. হতে বর্ণিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি যে সম্প্রদায়ের অনুরূপ অবলম্বন করে, সে তাঁদেরই দলভুক্ত। (সুনানে আবু দাউদঃ হাদীস নং - ৪০৩১)। অতএব, আলোচনার সারাংশে বলা যায় যে, কেউ যদি কারো জন্মের দিনটিকে তার বিশেষ দিন মনে করে তাহলে তা ইহুদি ও মুশরেকদের বিশ্বাসের সাথে মিলে যায়। কেননা তাদের কাছেও কারো জন্ম গ্রহণের দিনটি তার জন্য বিশেষ একটি দিন। আর রাসূল সা. ইহুদী ও মুশরেকদের সাথে সাদৃশ্য পছন্দ করতেন না তাই কখনো তাদের বিপরিত আমল করার নির্দেশ দিয়েছেন। তাই কোন মুসলিমের জন্য উচিত হবেনা জন্মদিনের মত অহেতুক একটি কাজ করে ইহুদি ও মুশরেকদের সাদৃশ্য অবলম্বন করে তাদের দলভুক্ত হওয়া। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে দ্বীনের উপর চলা সহজ করে দেন। আমীন।

ছত্রিশ তম পরিচ্ছেদ - দু'আকে অবহেলা করা ও আনুষ্ঠানিকতাকে উত্তম মনে করা

বস্তুতঃ মৃত বুজুর্গ বা আপনজনের জন্য ব্যক্তিগতভাবে সর্বদা দু'আ করাই ছিল তাঁদের একমাত্র নিয়মিত সুন্নাত। অপরদিকে আমরা অনেক সময় “দু'আ” করাকে তত গুরুত্ব প্রদান করি না। চিন্তা করি দু'আতে আর কি হবে, নিজে কিছু নেক কাজ করে সেই কাজের সাওয়াব তাঁদেরকে প্রদান করতে হবে। চিন্তাটি সঠিক নয়। মৃত মুসলিমের জন্য অন্য মুসলিমের দু'আই সবচেয়ে বড় দান। দু'আর বিনিময়ে আল্লাহ তাঁদেরকে অফুরন্ত সাওয়াব ও রহমত প্রদান করেন।

মৃতদের জন্য কুরআনে অনেক দু'আ উল্লেখিত হয়েছে। এক্ষেত্রে দু'আর জন্য তাঁরা কখনো কোনো প্রকার অনুষ্ঠান করেন নি। আমরা অনুষ্ঠানহীন ব্যক্তিগত দু'আর কোনো গুরুত্ব আছে বলে মনে করি না। অন্তত ব্যক্তিগত দু'আর চেয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু আলেম ও বুজুর্গকে ডেকে মৃতের জন্য দু'আ করাকে উত্তম মনে করি। অথচ সাহাবীগণকে দেখুন।

সাইয়্যেদুল মুরসালীন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদের মধ্যে রয়েছেন। অথচ ২৩ বৎসরের নবুয়তী জিন্দেগিতে একদিন একজন সাহাবীও এসে বললেন না, হুজুর আমার পিতামাতা বা কোনো বুজুর্গের জন্য দু'আর মাজলিস করেছি, আপনি যেয়ে একটু দু'আ করে দেবেন।

অথবা মসজিদে নববীতেই আজ নামাযের পরে সবাইকে নিয়ে আপনি একটু দু'আ করে দেবেন। এরূপ একটি ঘটনাও দেখতে পাবেন না। অনুরূপভাবে পরবর্তী প্রায় ২ শত বৎসরে সাহাবী, তাবয়ী ও তাবৈ-তাবয়ীগণের যুগেও এই ধরনের কোনো ঘটনা দেখা যায় না।

সাইত্রিশ তম পরিচ্ছেদ - দানের ক্ষেত্রে সুন্নাত পদ্ধতির চেয়ে প্রচলিত আনুষ্ঠানিকতাকে গুরুত্ব প্রদান

দানের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও সাহাবীগণের সুন্নাত হলো অনানুষ্ঠানিক দান। জমি ওয়াকফ, কূপ খনন ইত্যাদি। কিন্তু আমরা কখনোই এই প্রকার দানে তৃপ্ত হতে পারি না। আপনি যতই বুঝান-না কেন, যত সুন্নাতের কথাই বলুন-না কেন, মনের চিন্তা একটিই - কিছু একটু না-করলে কিভাবে হয়! শ্রদ্ধা জাতীয় একটা অনুষ্ঠান করাই দরকার। সমাজের মানুষেরও একই কথা : বাপটা মরে গেল, কিছুই করল না! কিছু অর্থ “শ্রদ্ধা”। অনেক মানুষকে বুঝিয়েছি, আপনারা খানাপিনা করানোর টাকা দিয়ে পিতামাতার বা বুজুর্গের জন্য একটি মসজিদ, মাদ্রাসা, দাতব্য হাসপাতাল, চিকিৎসা কেন্দ্র বা এতিমখানা তৈরি করুন বা শরীক হোন। খাবার পানি বা সেচের জন্য গভীর বা অগভীর নলকূপ স্থাপন করে জনগণ বা চাষীদের জন্য ওয়াকফ করুন। না হলে টাকাগুলি কোনো দরিদ্র, বিধবা, এতিম, কন্যাদায়গ্রস্থ, অসুস্থ বা অনুরূপ কাউকে দান করুন। এভাবে আপনি সুন্নাতের মধ্যে থাকবেন, আপনি ও আপনার মৃত আপনজন বা ওলী-বুজুর্গ অফুরন্ত সাওয়াব

ও রহমত লাভ করবেন। কেউ বুঝতে চান না। কেউ এসকল খাতে কিছু ব্যয় করলেও “কিছু একটা” না করে পারেন না। অথচ এই “কিছু” বা খানাপিনা শুধু সুন্নাত বিরোধীই নয়, এতে নিয়্যাত, পরিবেশনা, সামাজিকতা ইত্যাদি কারণে সাওয়াবের চেয়ে গোনাহই বেশি হয়। সামাজিক আচার কিভাবে আমাদের মনমগজকে কজা করেছে এবং এক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবীগণের সুন্নাতকে মেরে ফেলেছে তা চিন্তা করুন।

আটত্রিশ তম পরিচ্ছেদ - কোনো দিন বা মৃত্যু দিনকে নির্ধারণ করা

মৃত স্বজন বা বুজুর্গের জন্য দু‘আ ও সাওয়াব প্রেরণ অর্থাৎ ঈসালে সাওয়াব বা সাওয়াব রেসানীর জন্য হিন্দু, খ্রিষ্টান ও অন্যান্য অমুসলিম সম্প্রদায়ের অনুকরণে আরেকটি বিষয় আমাদের মধ্যে প্রবেশ করেছে, তা হলো এসকল কাজের জন্য দিন নির্ধারণ। মৃত্যুর পরে প্রথমত ৩য়, ৭ম, ৪০তম বা এই জাতীয় দিনে অনুষ্ঠান করা। পরে মৃত্যু দিনে অনুষ্ঠান করা।

আগেই বলেছি, নেককার বা বদকার, স্বজন বা বুজুর্গ কারো জানাযা ও দাফনের পরে দু‘আ বা খানাপিনার জন্য কোনো প্রকার অনুষ্ঠান করাই সুন্নাত বিরোধী কাজ। আর এ সকল অনুষ্ঠানের জন্য এভাবে দিন নির্ধারণ অতিরিক্ত একধাপ সুন্নাত বিরোধিতা তথা বিদআত^{৪৮৯}।

এ প্রসঙ্গে সাইয়েদ আহমদ ব্রেলভী (রহ.) এর নসীহত

^{৪৮৯} লেখক: আ.শ.ম শোয়াইব আহমাদ, সম্পাদনা: ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া, সূত্র: ইসলাম প্রচার বুরো, রাবওয়াহ, রিয়াদ, সৌদিআরব।

সুতরাং, কুলখানী, দু‘আর মাহফিল, খতম, ঈসালে সাওয়াব, সাওয়াব রেসানী, ওরস ইত্যাদি যে নামেই তা করা হোক সবই সুন্নাত বিরোধী কর্ম। এগুলি করার অর্থ হলো এ সকল বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবীগণের সুন্নাতকে অপছন্দ করা। বস্তুতঃ সমাজের অপ্রতিরোধ্য চাপের কাছে নতি স্বীকার করে উপরের সকল খেলাফে-সুন্নাত কর্মকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে, বিভিন্ন ওজরখাহি করে, পূর্বে আলোচিত বিভিন্ন প্রকারে অপ্রাসঙ্গিক আয়াত ও হাদীসকে “অকাট্য দলিল” হিসাবে পেশ করে “জায়েয” বলেছেন কেউ কেউ। তবে কেউ বলেন নি যে, এগুলি সুন্নাত বা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণ কখনো এগুলি করেছেন। অপরদিকে অনেক আলেম সমাজের কাছে নতি স্বীকার করতে চান নি। তাঁরা চেষ্টা করেছেন যেন আমাদের সমাজ অন্য সকল বিষয়ের মতো এ বিষয়েও অবিকল সুন্নাত অনুযায়ী চলেন। যাতে সুন্নাত জীবিত হয় এবং মুসলিমগণ নিশ্চিতরূপে সাওয়াব ও বরকত লাভ করেন। এ সকল আলেম ও বুজুর্গগণের একজন সাইয়েদ আহমদ ব্রেলভী (রহ.)। তিনি এ বিষয়ে আলোচনা কালে বলেন: এখন কেউ যদি প্রচলিত রুসুম অনুযায়ী এ সকল ফাতেহা, ঈসালে সাওয়াব, কুলখানী, ওরস ইত্যাদি পালন না-করেন তাহলে সুন্নাত বিষয়ে অজ্ঞ মানুষেরা বলবে যে, তিনি আল্লাহর ওলী ও বুজুর্গগণের ভক্তি করেন না, তাঁদের হুকুম আদায় করেন না বা তাঁদের প্রতি আদব রক্ষা করেন না। তার এই চিন্তার মাধ্যমে তিনি বলতে চান যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর

আহলে বাইত, সাহাবীগণ, তাবেয়ী, তাবে-তাবেয়ী ও অন্যান্য নেককার বুজুর্গগণ, যাঁরা এ সকল রেওয়াজ সমাজে প্রচলিত হওয়ার আগে চলে গিয়েছেন তাঁরা সবাই তাঁদের পূর্ববর্তী বুজুর্গ ও আউলিয়াগণের প্রতি বেয়াদবী করেছেন। উপরন্তু আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পূর্বপুরুষ ও আল্লাহর খলীল ইবরাহীম এর প্রতিও একই রকম বেআদবী করেছেন বলে দাবি করা হবে। নাউযু বিল্লাহ!! নাউযু বিল্লাহ!!!

এ বিষয়ে তিনি আরও কিছু মূল্যবান নসীহত করেছেন

প্রথমত, সকল মৃত বুজুর্গ ও আপনজনের ক্ষেত্রেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবীগণের সুন্নাত হুবহু পালন করা ও প্রতিষ্ঠা করাই সর্বোত্তম। এজন্য কাফন, দাফন, জানাযা ও মাসনুন তিন দিনের শোক প্রকাশের বাইরে কোনো প্রকারের রুসুম না-মানা প্রয়োজন। বিবাহের ওলীমা ছাড়া সকল প্রকার খানাপিনার আয়োজন ও রুসুম রেওয়াজ পরিত্যাগ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে শুধুমাত্র রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কেই পেশওয়া, মুরব্বী ও আদর্শ মানতে হবে। তাঁর আদর্শকে সামনে রেখে পারসিক, রোমীয়, মধ্য এশিয়, ভারতীয় ইত্যাদি সকল রুসুম রেওয়াজ পরিত্যাগ করতে হবে। কারণ এগুলি সবই তাঁর ও তাঁর সাহাবীগণের প্রচলিত রীতি ও তাঁদের তরীকার অতিরিক্ত কর্ম। এগুলি বর্জন করতে হবে এবং এগুলির প্রতি নিজের ঘৃণা ও না-রাজি প্রকাশ করতে হবে।

দ্বিতীয়ত, এ সকল রুসূমাতের মধ্যে নিয়্যাতগত ও কর্মগত অনেক গোনাহের কাজ রয়েছে, যার ফলে কেয়ামতের দিন এ সকল রুসূমাত পালনকারীকে কঠিন বিপদে পড়তে হবে। কেউ যদি একান্তই খালেস নিয়্যাতে, খালেসভাবে কোনোরকম দিনতারিখ স্থান বা পদ্ধতি নির্ধারণ না-করে কিছু খাওয়া দাওয়া করান তাহলে হয়ত তিনি সাওয়াব পাবেন। তবে তাকে মনে রাখতে হবে যে, মৃতকে সাওয়াব পাঠানো খানাপিনা করানোর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। দু'আ ও দানই মৃতের সাওয়াব পাঠানোর সুন্নাত-সম্মত পদ্ধতি। খানাপিনা করানো দানের একটি প্রকরণ মাত্র। সাহাবীগণ এক্ষেত্রে এই প্রকরণ ব্যবহার করেন নি, বরং কূপ খনন, জমি বা বাগান ওয়াকফ করা ইত্যাদি কাজের মাধ্যমে দানের সাওয়াব প্রেরণ করেছেন। আমাদেরও এ সকল পদ্ধতিতে দান করা উচিত।

তৃতীয়ত, যদি আমরা এ সকল খেলাফে-সুন্নাত ও বিদআত রুসূম রেওয়াজ পরিত্যাগ করতে না-পারি, তাহলে অন্তত সুন্নাতকে পূর্ণাঙ্গ মনে করতে হবে। কেউ যদি অবিকল সুন্নাত পদ্ধতিতে হুবহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণের মতো দু'আ ও দানে রত থাকেন এবং সকল প্রকার কুলখানী, ইসালে সাওয়াব, ওরশ ইত্যাদি অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করেন, তাহলে তাঁকে উত্তম ও পরিপূর্ণ সুন্নাতের অনুসারী বলে মহববত করতে হবে। এভাবে সকল বিষয়ে সুন্নাতকে পরিপূর্ণ ও আমাদের রুসূমকে

খেলাফে সুন্নাহ ও বিশেষ প্রয়োজনে বা বাধ্য হয়ে করছি বলে মনে করতে হবে^{৪৯০}।

উনচল্লিশ তম পরিচ্ছেদ - “সাদাকাল্লাহুল আযীম” (صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ) পড়া কি শরীয়তসম্মত?

“সাদাকাল্লাহুল আযীম” পড়া শরীয়তসম্মত না উপর্যুক্ত কারণে তা বিদআত। (লাজনাহ দায়েমাহ) শরীয়তে এ কাজের কোন ভিত্তি নেই। একদা মহানবী (সাঃ) ইবনে মাসউদ (রাঃ) এর নিকট ফিরাতাত গুনলেন। পরিশেষে তিনি তাকে ‘হাসবুক’ বলে থামতে বললেন। (সহীহুল বুখারী, হাদীস নং - ৫০৫০) তখন তিনিও “সাদাকাল্লাহুল আযীম” বলেননি এবং ইবনে মাসউদও বলেননি।

‘সাদাকাল্লাহুল আযীম’ বলার বিধান

কতিপয় তিলাওয়াতকারী কুরআনুল কারিম তিলাওয়াত শেষে বলেনঃ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ ‘সাদাকাল্লাহুল আজিম’, যার অর্থ ‘মহান আল্লাহ সত্য বলেছেন’। তাদের এরূপ বলার কোনো ভিত্তি নেই। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, আল্লাহ তা‘আলা সত্যবাদী, তার কালাম চিরসত্য^{৪৯১}। ইমাম নাসাঈ রাহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেনঃ

(إِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ)

^{৪৯০} সিরাতে মুত্তাকীম (উদ্দু তরজমা), পৃ: ৫০-৭৫

^{৪৯১} সাদাকাল্লাহুল আযীম (صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ) বলার বিধান - সানাউল্লাহ নজির আহমেদ, পৃষ্ঠা নং - ৩ - ১২ নং পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

“নিশ্চয় আল্লাহ তা‘আলার কিতাব সবচেয়ে সত্যবাণী এবং সর্বোত্তম আদর্শ হচ্ছে মুহাম্মদের আদর্শ” [তথ্যসূত্রঃ নাসাঈ আস-সুগরা: (১৫৭৮)]।

আল্লাহ তা‘আলা সত্যবাদী এবং তার বাণী সত্য এ কথা বিশ্বাস করা প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরয, যে আল্লাহকে মিথ্যারোপ করল অথবা তার কথায় সন্দেহ পোষণ করল সে কাফের ও দ্বীন থেকে বহিস্কৃত। ড. বকর আবু যায়েদ (রহঃ) বলেন, “আল্লাহ তা‘আলা বলেছেনঃ

﴿قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا﴾ [আল عمران:

৯০] وقال تعالى: ﴿وَمَنْ أَضْذَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا﴾ [النساء: ৮৭]

وقال تعالى: ﴿وَمَنْ أَضْذَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا﴾ [النساء: ১২২]

“বল, আল্লাহ সত্য বলেছেন, সুতরাং তোমরা ইবরাহীমের মিল্লাতের অনুসরণ কর একনিষ্ঠভাবে”। [সূরা আলে-ইমরানঃ (৯৫)]। অপর আয়াতে তিনি বলেন: “আর কথায় আল্লাহর চেয়ে অধিক সত্যবাদী কে?” [সূরা নিসা: (৮৭)] অপর আয়াতে তিনি বলেন: “আর কথায় আল্লাহ অপেক্ষা অধিক সত্যবাদী কে?” [সূরা নিসা: (১২২)]। এসব আয়াতের অর্থ হচ্ছে আল্লাহ তা‘আলা তার মহান কিতাব যেমন তাওরাত ও অন্যান্য গ্রন্থে যা বর্ণনা করেছেন তা সত্য, অনুরূপ কুরআনুল কারিমে তিনি বান্দাদের যে সংবাদ দিয়েছেন তাও সত্য; কিন্তু এ থেকে কুরআনুল কারিম তিলাওয়াত শেষে ‘সাদাকালাহুল আজিম’ বলার বৈধতা প্রমাণিত হয় না। সমকালীন কতক ভাই বলেছেন, الجامع لشعب الإيمان للبيهقي গ্রন্থে তার পক্ষে দলিল

রয়েছে, এটা তাদের ভুল। আমাদের জানা মতে গ্রহণযোগ্য কোনো আলেম এরূপ বলা বৈধ বলেননি, না-প্রসিদ্ধ কোনো ইমাম; বরং কুরআনুল কারিম তিলাওয়াত শেষে ‘সাদাকাল্লাহুল আজিম’ বলা মানুষের বানানো প্রথা। এ প্রথা নতুন আবিষ্কৃত, শরিয়তের পরিভাষায় এর নাম বিদ’আত। আল্লাহ ভালো জানেন”। [দেখুনঃ বিদাউল কুররা গ্রন্থ]। হ্যাঁ, কেউ যদি বিশেষ কোনো উপলক্ষ্যকে কেন্দ্র করে **صَدَقَ اللَّهُ** বলে, তাহলে সমস্যা নেই; কারণ এরূপ বলা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। বুরাইদাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত,

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبنا إذ جاء الحسن والحسين - عليهما السلام - عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنبر فحملهما ووضعهما بين يديه، ثم قال: صدق الله أموالكم وأولادكم فتنة - فنظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران فلم ((أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে খুতবা দিচ্ছিলেন, এমতাবস্থায় হাসান ও হুসাইন চলে আসল। তাদের গায়ে ছিল দু’টি লাল জামা, তারা হোঁচট খেতে খেতে চলছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিস্বার থেকে নেমে তাদের উঠালেন ও সামনে রাখলেন। অতঃপর বললেন: আল্লাহ সত্য বলেছেনঃ

﴿إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فَتَنَةٌ لِّدِكُمْ فَتَنَةٌ ۖ ۝ ١٥﴾ [التغابن: ১৫]

‘নিশ্চয় তোমাদের সম্পদ ও সন্তান ফিতনা’। [সূরা তাগাবুন: (১৫)] এ দু’টি বাচ্চাকে আমি দেখলাম হাঁটছে ও হোঁচট খাচ্ছে, আমি ধৈর্য ধরতে পারলাম না, কথা বন্ধ করে তাদেরকে উঠিয়ে নিলাম”।

[তিরমিযী ও হাকিম, হাকিম বলেনঃ হাদীসটি মুসলিমের শর্ত মোতাবেক সহি, তবে বুখারী-মুসলিম কেউ হাদীসটি বর্ণনা করেননি, ইমাম যাহাবী (রহঃ) তার সমর্থন করেছেন। আলবানী (রহঃ) হাদীসটি সহী বলেছেন]। অনুরূপ কোনো ষড়যন্ত্রকারীকে নিজ ষড়যন্ত্রে ফাঁসতে দেখে যদি কেউ বলে, আল্লাহ সত্যি বলেছেনঃ

﴿وَلَا يَحِيقُ آلَ مَكٍّ رُؤْسُ السَّيِّئِ إِلَّا بِأَهْلِهِ﴾ [فاطر: ৬৩]

“কিন্তু কুটচক্রান্ত কেবল তার ধারককেই পরিবেষ্টন করবে”। [সূরা ফাতিরঃ (৪৩)] এরূপ বলা বৈধ। শায়খ আব্দুল্লাহ ইবনে বায রাহিমাহুল্লাহ বলেনঃ “কেউ যদি আল্লাহর কিতাব তিলাওয়াত করার সময় আশ্চর্য কোনো বিষয় দেখে অবাক হয়, তার বরকত অনুধাবন করে, অতঃপর কুরআনের মহত্ত্বকে স্মরণ করে বলে, **صدق الله العظيم** সুবহানাল্লাহ কি চমৎকার! তাহলে সমস্যা নেই; তবে প্রত্যেকবার তিলাওয়াত শেষে ‘সাদাকাল্লাহুল আজিম’ বলার কোনো প্রমাণ অনেক অনুসন্ধান ও আহলে ইলমের সাথে আলোচনা করেও আমরা পাইনি”। [দেখুনঃ শায়খ আব্দুল্লাহ বিন বায (রহঃ), ফতোয়া ইসলামিয়াহ]। সন্দেহ নেই, ‘সাদাকাল্লাহ’ বলা একটি যিকর, তবে এ যিকরকে নির্দিষ্ট সময়, অথবা নির্দিষ্ট স্থান, অথবা নির্দিষ্ট অবস্থার সাথে সম্পৃক্ত করার জন্য অবশ্যই দলিল প্রয়োজন, বিনা দলিলে কুরআনুল কারিম তিলাওয়াত শেষে বলা যাবে না। কারণ, ফিকহের নীতি হচ্ছেঃ “ইবাদতের প্রকৃতি নিষিদ্ধ ও হারাম থাকা আর আল্লাহর সৃষ্ট-বস্তুর প্রকৃতি বৈধ ও হালাল থাকা”। অর্থাৎ কোনো ইবাদত অস্বীকার বা প্রত্যাখ্যান করার জন্য দলীলের প্রয়োজন নেই,

তবে প্রমাণ করার জন্য অবশ্যই দলীলের প্রয়োজন। ইবাদত প্রমাণ হওয়ার পর অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই; অতএব কোনো আমল সম্পর্কে যদি কেউ বলে, এটা নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেন নি ঠিক, কিন্তু এ আমলকে তিনি নিষেধও করেননি, তাই এতে সমস্যা নেই। এটা তার কুরআন-হাদীস সম্পর্কে চরম মূর্থতা ও দ্বীন সম্পর্কে নিরেট অজ্ঞতার প্রমাণ। কারণ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেন নি এটাই তার নিষেধাজ্ঞার বড় প্রমাণ, যেহেতু এটা ইবাদত। নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে, তার সাহাবীদের যুগে ও তাদের অনুসারী তাবয়ীদের যুগে সাদাকাল্লাহু বলার কোনো প্রচলন ছিল না। যদি তিলাওয়াত শেষে সাদাকাল্লাহু বলা বৈধ হত অবশ্যই নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার উম্মতকে বলে দিতেন। একদা নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুকে বলেনঃ

اقْرَأْ عَلَى الْقُرْآنِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقْرَأْ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أَنْزَلَ؟ قَالَ: إِنِّي أَحِبُّ أَنْ أَسْمِعَهُ مِنْ غَيْرِي، فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ سُورَةَ النِّسَاءِ حَتَّى جِئْتُ إِلَى هَذِهِ الْآيَةِ: فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيداً - قَالَ: حَسْبُكَ الْآنَ، فَالتَفْتُ إِلَيْهِ فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ)). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

“আমাকে কুরআন পড়ে শোনাও, তিনি বলেনঃ হে আল্লাহর রাসূল, আমি আপনাকে কুরআন পড়ে শোনাব, অথচ আপনার উপর কুরআন নাযিল হয়েছে! তিনি বললেন: আমি অপর থেকে কুরআন শোনা পছন্দ করি। অতঃপর আমি তাকে সূরা নিসা পাঠ করে

শোনাই, যখন এ আয়াতের নিকট পৌঁছিঃ ‘অতএব কেমন হবে যখন আমি প্রত্যেক উম্মত থেকে একজন সাক্ষী উপস্থিত করব এবং তোমাকে উপস্থিত করব তাদের উপর স্বাক্ষীরূপে?’ [সূরা নিসা, আয়াত নং – ৪১]। তিনি বললেন, ‘হাসবুকা’ তুমি এখন যথেষ্ট কর। আমি তার দিকে তাকিয়ে দেখি, তার দু’চোখ অশ্রু ঝরাচ্ছে”^{৪৯২}। শায়খ আব্দুল্লাহ ইবনে বায রাহিমাহুল্লাহ বলেন: “আমাদের জানা-মতে কোনো আহলে ইলম ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণনা করেননি যে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের **حَسْبُكَ** বলার পর **صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ** বলে কুরআন খতম করেছেন। অর্থাৎ ‘সাদাকাল্লাহুল আজিম’ বলে কুরআন খতম করার কোনো ভিত্তি পবিত্র শরীয়তে নেই, তবে কোনো উপলক্ষ্যকে কেন্দ্র করে বলা যায়, হোক সেটা তিলাওয়াতের মুহূর্ত কিংবা তার বাইরের মুহূর্ত, স্বাভাবিক হালতে তিলাওয়াত শেষে নয়”। [মাজমু ফতোয়া ও মাকালাত:(খ.৭)]।

শায়খ উসাইমীন রাহিমাহুল্লাহ বলেন: ‘সাদাকাল্লাহ বলে কুরআন তিলাওয়াত শেষ করা বিদ’আত, কারণ নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার সাহাবীদের থেকে প্রমাণিত নেই যে, তারা ‘সাদাকাল্লাহুল আজিম’ বলে তিলাওয়াত শেষ করেছেন। নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ

^{৪৯২} বুখারীঃ (৫০৪৯), মুসলিমঃ (৮০২)

عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها)
وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل
(بدعة ضلالة)

“আমার পর তোমাদের উপর অবধারিত আমার সুন্নত ও খোলাফায়ে রাশেদার সুন্নত, তোমরা তা আঁকড়ে ধর ও মাড়ির দাঁত দ্বারা কামড়ে ধর। খবরদার! তোমরা নব-আবিষ্কৃত বস্তু (বিদ’আত) থেকে সাবধান থাক। কারণ প্রত্যেক নব-আবিষ্কার বিদ’আত , প্রত্যেক বিদ’আত গোমরাহী। সুতরাং তিলাওয়াতকারী সর্বশেষ আয়াত পাঠ করেই তিলাওয়াত শেষ করবে, তার সাথে কোনো বাক্য যোগ করবে না”। [ফতোয়া নুরুন আলাদ-দারব: (খ.৫, পৃ.২)]

সাদাকাল্লাহুল বলার প্রচলন

এ সংক্রান্ত এক প্রশ্নের উত্তরে ‘কাতারে’র ওয়াকফ মন্ত্রনালয় কর্তৃক পরিচালিত ‘ইসলাম ওয়েব’ islamweb.net সাইটের 139452 নং ফতোয়ায় বলা হয়েছেঃ “কিতাবে ও কবে থেকে সাদাকাল্লাহুল আজিম বলার প্রচলন ঘটেছে জানা যায়নি। পূর্ববর্তী কতক নেককার লোক ‘সাদাকাল্লাহুল আজিম’ উল্লেখ করেছেন, কিন্তু তার পশ্চাতে কোনো দলিল পেশ করেননি; যেমন হাফেয ইবনুল জাযারি ‘আন-নাশর’ কিতাবে বলেনঃ আমার কতক শায়েখকে দেখেছি, তারা কুরআন খতম করে বলতেনঃ

صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم، وهذا تنزيل من رب العالمين، ربنا آمنا
بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين

ইমাম কুরতুবি রাহিমাহুল্লাহ তার তাফসীরে বলেন: হাকিম তিরমিযি আবু আব্দুল্লাহ ‘নাওয়াদিরুল উসুল’ কিতাবে বলেন: কুরআনুল কারিমকে সম্মান প্রদর্শনের একটি দিক হচ্ছে, তিলাওয়াত শেষে আল্লাহকে সত্যারোপ করা এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে আমাদের নিকট দীন পৌঁছিয়েছেন তার সাক্ষ্য প্রদান করা; কুরআন হক এ কথারও সাক্ষ্য প্রদান করা, যেমন বলাঃ

صدق رب وبلغت رسلك، ونحن على ذلك من الشاهدين، اللهم اجعلنا من
شهداء الحق، القائمين بالقسط، ثم يدعو بدعوات

এ থেকে আমাদের ধারণা চতুর্থ হিজরিতে এ বাক্যটির প্রচলন ঘটেছে, কারণ তিরমিযি আলহাকিম চতুর্থ শতাব্দির আলেম ছিলেন, তবে তার পূর্বেও এর প্রচলন ঘটার সম্ভাবনা রয়েছে। আল্লাহ ভালো জানেন”।

সৌদী আরবের উলামা পরিষদের ফতোয়া

কুরআনুল কারিম তিলাওয়াত শেষে সাদাকাল্লাহুল আজিম বলা বিদআত, কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, খোলাফায়ে রাশেদা ও অন্যান্য কোনো সাহাবী থেকে এরূপ প্রমাণিত নেই, তাদের পরবর্তী কোনো ইমাম থেকেও নয়। অথচ তারা কুরআন তিলাওয়াত করতেন, কুরআনের প্রতি আমাদের অপেক্ষা তাদের গুরুত্ব বেশী ছিল এবং তারা কুরআন সম্পর্কে বেশী জানতেন। তাই তিলাওয়াত শেষে ‘সাদাকাল্লাহুল আজিম’ বলা বিদআত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ

مَنْ أَخَذَتْ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ)). رواه البخاريو مسلم وقال (رواه مسلم). (صلى الله عليه وسلم ((مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ “যে আমাদের দীনে নতুন কিছু সৃষ্টি করল, যা তার অন্তর্ভুক্ত নয়, তা পরিত্যক্ত”। [সহীহুল বুখারীঃ (২৬৯৭)]। ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন: “যে ব্যক্তি এমন আমল করল, যার উপর আমাদের দ্বীন নেই, তা পরিত্যক্ত”। [মুসলিমঃ (১৭২১)]। [দেখুনঃ লাজনায়ে দায়েমাঃ (খ. ৪, পৃ.১১৮)]।

চল্লিশ তম পরিচ্ছেদ - তাসবীহ গুনতে তাসবীহ-মালা ব্যবহার করা কি বিদ’আত

সমাজে তাসবীহ দানা দিয়ে যিকির করার প্রচলন ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। ফরয ছালাতের পর, হাটে-বাজারে, রাস্তায়, বাসে-ট্রেনে, অফিস-আদালতে সর্বত্র একশ্রেণীর মানুষকে তাসবীহ গণনা করতে দেখা যায়। এতে যে রিয়া সৃষ্টি হয় তাতে কোন সন্দেহ নেই। অনেক মসজিদের কাতারে কাতারে রেখে দেয়া হয় কিংবা দেওয়ালে ও জালানায় ঝুলিয়ে রাখা হয়। তাসবীহই যেন মূল ইবাদত। অথচ এর ছহীহ কোন ভিত্তি নেই। উক্ত মর্মে যে সমস্ত বর্ণনা রয়েছে তার সবই জাল কিংবা যঈফ।

عَلَى امْرَأَةٍ وَبَيْنَ يَدَيْهَا أ) عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهَا أَنَّه دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ نَوَى أَوْ حَصَى تُسَبِّحُ بِهِ فَقَالَ أَخْبِرْكِ بِمَا هُوَ أَيْسَرُ عَلَيْكِ مِنْ هَذَا أَوْ أَفْضَلُ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي السَّمَاءِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي الْأَرْضِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ بَيْنَ ذَلِكَ وَسُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا هُوَ خَالِقٌ وَاللَّهُ أَكْبَرُ

مِثْلُ ذَلِكَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ مِثْلُ ذَلِكَ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مِثْلُ ذَلِكَ. وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا
بِاللَّهِ مِثْلُ ذَلِكَ

ক) আয়েশা বিনতে সা'দ তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, তার পিতা রাসূল (সাঃ)-এর সাথে এক মহিলার নিকটে যান। তখন স্ত্রীলোকটির সম্মুখে কিছু খেজুরের বিচি অথবা কংকর ছিল, যার দ্বারা সে তাসবীহ গণনা করছিল।

রাসূল (সাঃ) বললেন, আমি কি তোমাকে এমন কথা বলে দিব না, যা এটা অপেক্ষা অধিক সহজ বা উত্তম হবে? তা হচ্ছে - 'সুবহা-নাল্লাহ' অর্থাৎ, আল্লাহর পবিত্রতা যে পরিমাণ তিনি আসমানে মাখলুক সৃষ্টি করেছেন, 'সুবহা-নাল্লাহ' যে পরিমাণ তিনি যমীনে মাখলুক সৃষ্টি করেছেন, 'সুবহা-নাল্লাহ' যে পরিমাণ উভয়ের মাঝে রয়েছে এবং 'সুবহা-নাল্লাহ' যে পরিমাণ তিনি ভবিষ্যতে সৃষ্টি করবেন। 'আল্লাহু আকবার' উহার অনুরূপ, 'আলহামদু লিল্লাহ' উহার অনুরূপ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লা-হু' উহার অনুরূপ এবং লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' অনুরূপ^{৪৯৩}।

তাহকীক : যঈফ। উক্ত হাদীছের সনদে খুযায়মাহ ও সাঈদ ইবনু আবী হেলাল নামে দুইজন ঋটিপূর্ণ রাবী আছে^{৪৯৪}। তাছাড়া এটি সহীহ হাদীসের বিরোধী। কারণ রাসূল (সাঃ) ডান হাতের আঙ্গুলে তাসবীহ গণনা করতেন^{৪৯৫}।

^{৪৯৩} তিরমিযী হা/৩৫৬৮, ২/১৯৭ পৃঃ ও হা/৩৫৫৪; আবুদাউদ হা/১৫০০, ১/২১০ পৃঃ; মিশকাত হা/২৩১১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২২০৩, ৫/৯০ পৃঃ।

^{৪৯৪} যঈফ তিরমিযী হা/৩৫৬৮, ২/১৯৭ পৃঃ, 'দু'আ সমূহ' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১৩০; যঈফ আবুদাউদ হা/১৫০০, ১/২১০ পৃঃ; যঈফ আত-তারগীব হা/৯৫৯; সিলসিলা যঈফাহ হা/৮৩।

^{৪৯৫} আবুদাউদ হা/১৫০২, ১/২১০ পৃঃ; বায়হাকী, আস-সুনানুল কুবরা হা/৩১৪৮; ছহীহ ইবনে হিব্বান হা/৮৪৩; তিরমিযী

نَعْمَ الْمَذْكُورُ السُّبْحَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ

আলী (রাঃ) বলেন, রাসূল (সাঃ) বলেছেন, যে দানা দ্বারা যিকির করে সে কতইনা উত্তম! তাহকীক : বর্ণনাটি জাল। উক্ত বর্ণনার প্রত্যেক রাবীই ত্রুটিপূর্ণ^{৪৯৬}। আলবানী (রহঃ) বলেন,

إِنَّ السُّبْحَةَ بِذَعَةٍ لَمْ تَكُنْ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا حَدَّثَتْ بَعْدَهُ
'নিশ্চয় তাসবীহ দানা বিদ'আত। এটি রাসূল (সাঃ)-এর যুগে ছিল না। বরং তাঁর পরে সৃষ্টি হয়েছে'^{৪৯৭}।

يُسَبِّحُ بِأَلْحَاصٍ P عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ كَانَ النَّبِيُّ

৩) আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম (সাঃ) কংকর দ্বারা তাসবীহ গণনা করতেন^{৪৯৮}।

তাহকীক : বর্ণনাটি জাল। এর সনদে কুদামা বিন মাযউন এবং সালেহ ইবনু আলী নামে অভিযুক্ত রাবী আছে^{৪৯৯}।

সুতরাং, উপরোক্ত আলোচনার আলোকে বলা যায় যে, তাসবীহ দানা প্রসঙ্গে বহু আলেম একে বিদ'আত বলেছেন আর তা না হলেও তাসবীহ দানা ব্যবহার না করাই উত্তম। কারণঃ

১। মহানবী (সঃ) আঙ্গুল দ্বারা তাসবীহ গণনা করেছেন এবং বলেছেন,

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، عَنْ هَانِيٍّ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ مُحَيْصَةَ
بِنْتِ يَاسِرٍ، عَنْ يُسَيْرَةَ، أَخْبَرَتْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُنَّ أَنْ

হা/৩৪৮৬। উল্লেখ্য যে, ভারতীয় ছাপা ত্রিমাষীতে উক্ত অংশ নেই দ্রঃ ২/১৮৬ পৃঃ।

^{৪৯৬} সিলসিলা যঈফাহ হা/৮৩।

^{৪৯৭} সিলসিলা যঈফাহ হা/৮৩-এর আলোচনা দ্রঃ।

^{৪৯৮} আবুল কাসেম জুরজানী, তারীখে জুরজান হা/৬৮।

^{৪৯৯} সিলসিলা যঈফাহ হা/১০০২।

يُرَاعَيْنَ بِالتَّكْبِيرِ وَالْتَّقْدِيسِ وَالتَّهْلِيلِ وَأَنْ يَعْقِدْنَ بِالْأَنَامِلِ فَإِنَّهُنَّ مَسْئُولَاتٌ
مُسْتَنْطَقَاتٌ.

“আঙ্গুলগুলোকে (তাঁর দ্বারা কৃত কর্মের ব্যপারে) জিজ্ঞাসা করা হবে, কথা বলানো হবে। (আহমাদ ৬/৩৭১, আবু দাউদ ১৫০১, তিরমিযী হাদীস নং - ৩৫৮৩)। সুতরাং কিয়ামতে আঙ্গুলগুলো তাসবীহ পড়ার সাক্ষ্য দেবে, মালা সাক্ষ্য দেবে না।

২। মালা ব্যবহার করে তাসবীহ পড়লে সাধারনতঃ মনোযোগ ও একাগ্রতা বিচ্ছিন্ন হতে পারে। আঙ্গুল গুনলে তা হয় না।

৩। তাসবীহ - মালা ব্যবহার লোক-দেখানি বা ‘রিয়া’ হওয়ার আশঙ্কা থাকে। রং-বেরঙের মালা ও তাঁর খটখট শব্দ মানুষের দৃষ্টি ও মন আকর্ষণ করে। আর আমলে ‘রিয়া’ ঢুকলে সওয়াবের জায়গায় শিরক ঘটে বসবে। বলা বাহুল্য, তাসবীহ-দানার চাইতে আঙ্গুল গোনাই শরীয়ত সম্মত।

একচল্লিশ তম পরিচ্ছেদ - হজ্জের বিদআতসমূহ

হজ্জ্ব আরবী (حج) হজ্জ্ব ইসলাম ধর্মাবলম্বী অর্থাৎ মুসলমানদের জন্য একটি আবশ্যকীয় ইবাদত। এটি ইসলাম ধর্মের পঞ্চম স্তম্ভ। শারীরিক ও আর্থিকভাবে সক্ষম প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর জন্য জীবনে একবার হজ্জ সম্পাদন করা ফরজ বা আবশ্যিক^{৫০০}।

আরবী জিলহজ মাসের ৮ থেকে ১২ তারিখ হজ্জের জন্য নির্ধারিত সময়। হজ্জ পালনের জন্য বর্তমান সৌদী আরবের মক্কা নগরী এবং সন্নিহিত মিনা, আরাফাত, মুযদালফা প্রভৃতি স্থানে গমন এবং

^{৫০০} Dalia Salah-El-Deen, Significance of Pilgrimage (Hajj)

অবস্থান আবশ্যক^{৫০১}। যিনি হজ্জ সম্পাদনের জন্য গমন করেন তাঁকে বলা হয় হাজী। রাসূল (সাঃ) বলেছেনঃ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ((بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، وَصَوْمَ رَمَضَانَ وَحَجَّ بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

এই হাদীসে ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের আলোচনা করা হয়েছে^{৫০২}।

হজ্জ ফরয হওয়ার প্রমাণঃ হজ্জ হলো ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভেও সর্বশেষ তথা পঞ্চম স্তম্ভ। এটি দৈহিক ও আর্থিক ত্যাগের সমন্বয়ে বিরাট ফযীলত পূর্ণ ইবাদত এবং হজ্জ নবম হিজরীতে ফজর হয়। মক্কা যাতায়াত ও হজ্জ পালন কালে অবস্থানের খরচের অর্থ এবং ফিরে আসা পর্যন্ত পরিবারের প্রয়োজনীয় খরচাদি সমপরিমাণ অর্থের যে কোন মালিকের উপর জীবনে একবার হজ্জ পালন করা ফরজ।

১। কুরআন থেকে আল্লাহ তা‘আলা বলেনঃ

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مِنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

অর্থঃ আল্লাহর উদ্দেশ্যে মানুষের উপর বায়তুল্লাহর হজ্জ পালন করা ফরয, যারা সেখানে পৌঁছার ক্ষমতা রাখে। আর যে ব্যক্তি উহা আদায়ের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও পালন করতে অস্বীকার করবে, তবে (জেনে রেখ) আল্লাহ সমগ্র জগৎ থেকে মুখাপেক্ষীহীন। (সূরা আলে ইমরানঃ আয়াত নং - ৯৭)।

অতএব, ইসলামী ইবাদতসমূহের মধ্যে হজ্জের গুরুত্ব অপরিসীম। এক হাদীস অনুযায়ী হজ্জকে বরং সর্বোত্তম ইবাদত বলা হয়েছে।

^{৫০১} অষ্টমধং ডাভ ঐডুয়ু চষধপবং, চ. ২৯

^{৫০২} সহীহ মুসলিম :: খন্ড ১ :: হাদীস ১

তাই হজ্জের গুরুত্ব সম্বন্ধে বলতে গিয়ে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বলেছেনঃ

من حج لله فلم يرفث ولم يفسق، رجع كيوم ولدته أمه : رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ
যে হজ্জ করল ও শরীয়ত অনুমতি দেয় না এমন কাজ থেকে বিরত
রইল, যৌন-স্পর্শ রয়েছে এমন কাজ ও কথা থেকে বিরত থাকল,
সে তার মাতৃ-গর্ভ হতে ভূমিষ্ট 'হওয়ার দিনের মতো পবিত্র হয়ে
ফিরে এল। অর্থাৎ বৎসরের নির্ধারিত সময়ে হেরেম শরীফ যিয়ারত
ও আনুষঙ্গিক আনুষ্ঠানিকতা পালনই হচ্ছে হজ্জ। অথচ এই হজ্জব্রত
পালনের মধ্যেও আমাদের মাঝে প্রচলন করে দেয়া হয়েছে অসংখ্য
বিদ'আত এবং যা হজ্জের ইবাদতের সাথে এর তথা শরীয়তের
কোন ভিত্তি নেই বললেই চলে। নিম্নে তাঁর কতিপয় বিদ'আত
সমূহের বিবরণ আলোচনা হলোঃ-

(১) হজ্জের নিয়তঃ হুমায়দী (রহ) 'আলকামা ইবন ওয়াক্কাস
আল-লায়সী (রহঃ) থেকে বর্ণিত, আমি উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) -
কে মিসরের ওপর দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছিঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)
কে বলতে শুনেছিঃ

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ
سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ
وَقَاصٍ اللَّيْثِيَّ، يَقُولُ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ " إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا
لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا
فَهِيَ حِرَّتُهَا إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ "

প্রত্যেক কাজ নিয়তের সাথে সম্পর্কিত। আর মানুষ তার নিয়ত অনুযায়ী ফল পাবে। তাই যার হিজরত হবে দুনিয়া লাভের অথবা নারীকে বিয়ে করার উদ্দেশ্যে- সেই উদ্দেশ্যেই হবে তার হিজরতের প্রাপ্য^{৫০০}। সুতরাং, উপরোক্ত হাদীসের আলোকে বলা যায় যে, নিয়ত অর্থ - মনন করা বা সংকল্প করা। অতএব সালাত, সিয়াম, হজ্জ, যাকাত সহ প্রত্যেকটি ইবাদত সম্পাদনের জন্য অন্তরে সংকল্পের মাধ্যমেই নিয়ত করতে হবে। মুখে প্রকাশ করলে তা বিদ'আতে পরিণত হবে। সুতরাং, হজ্জ সম্পাদনের জন্য অন্তরে সংকল্পের মাধ্যমে হজ্জ অথবা ওমরার নিয়ত করে 'লাববাইক আল্লাহুমা হাজ্জান' অথবা 'লাববাইক আল্লাহুমা ওমরাতান' বলে হজ্জ অথবা ওমরায় প্রবেশ করবে। সালাত আদায়ের জন্য যেমন 'নাওয়াইতু আন উছল্লি...' পড়া বিদ'আত, হজ্জ সম্পাদনের জন্য তেমনি 'নাওয়াইতু আন আহ্জ্জা...' পড়াও বিদ'আত। শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ), নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ), শায়খ বিন বায (রহঃ), মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন (রহঃ) সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ওলামায়ে কেরাম অনুরূপ মত প্রকাশ করেছেন।

(২) দলবদ্ধভাবে তালবিয়া পাঠ করাঃ বর্তমানে দলবদ্ধভাবে হজ্জের তালবিয়া পাঠের প্রচলন অধিক হারে লক্ষ্য করা যায়। রাসূল (সাঃ) এবং সাহাবায়ে কেরামের যামানায় কেউ কখনো দলবদ্ধভাবে

^{৫০০} সহিহ বুখারী :: খন্ড ১ :: অধ্যায় ১ :: হাদীস ১

তালবিয়া পাঠ করেননি। সকলেই নিজ নিজ গতিতে তালবিয়া পাঠ করতেন^{৫০৪}।

(৩) তাওয়াফের মধ্যে দলক্কাভাবে দো'আ করাঃ রাসূল (সাঃ) বলেছেন, الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ 'দো'আ হ'ল ইবাদত'। পূর্ণ হাদীসটি নিম্নরূপ উল্লেখ করা হলো:-

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ ذَرٍّ، عَنْ يُسَيْعٍ
الْحَضْرَمِيِّ، عَنِ الثُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "الدُّعَاءُ هُوَ
الْعِبَادَةُ { قَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ }"

Narrated An-Nu'man ibn Bashir: The Prophet (sallallahu 'alaihi wa sallam) said: Supplication (du'a') is itself the worship. (He then recited :) "And your Lord said: Call on Me, I will answer you"^{৫০৫}.

(৪) মহিলাদের ছাফা-মারওয়ার মাঝখানে সবুজ লাইট চিহ্নিত স্থানে দ্রুত চলাঃ মহিলাদের অনেককেই দেখা যায় ছাফা-মারওয়ার মাঝখানে সবুজ লাইট দ্বারা চিহ্নিত স্থানে দ্রুত চলেন বা দৌড়ান। অথচ এটা শুধুমাত্র পুরুষদের জন্য খাস, নারীদের জন্য নয়। ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন,

لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ رَمْلٌ بِالْبَيْتِ وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ

‘নারীদের জন্য তাওয়াফ ও সাফা-মারওয়ার মাঝখানে রমল তথা দ্রুত চলতে হবে না’। (তথ্যসূত্রঃ দারাকুত্বনী হা/২৭৯৯; মুহান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ হা/১৩১১০)।

^{৫০৪} মুত্তাদারাক হাকেম হা/৯১৪; সহীহুল জামে' হা/৬৮৩০

^{৫০৫} আবু দাউদ হা/১৪৭৯; তিরমিযী হা/২৯৬৯; ইবনু মাজাহ হা/৩৮২৮; মিশকাত হা/২২৩০; সনদ সহীহ, ছহীহুল জামে' হা/৩৪০৭ [সুনান আবু দাউদ :: বিতর সম্পর্কীয় অধ্যায় ৮, হাদীস ১৪৭৯]

সুতরাং, উপরোক্ত হাদীস অনুযায়ী বলা যায় যে, ইবাদত কবুলের অন্যতম শর্ত হ'ল, রাসূল (সাঃ) - এর সুন্নাহ অনুযায়ী হওয়া। তিনি যে পদ্ধতিতে দো'আ করেছেন ঠিক সে পদ্ধতিতেই আমাদের দো'আ করতে হবে। রাসূল (সাঃ) ও সাহাবায়ে কেরামের কেউ কখনো তাওয়াফ ও সাঈতে দলবদ্ধভাবে উচ্চৈঃস্বরে দো'আ করেছেন মর্মে কোন দলীল পাওয়া যায় না। অতএব এরূপ বিদ'আতী পদ্ধতি পরিত্যাগ করে সুন্নাহী পদ্ধতিতে দো'আ করা অপরিহার্য। আর তা হ'ল, নিম্নস্বরে বিনম্রচিত্তে একাকী দো'আ করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

‘তোমরা বিনীতভাবে ও গোপনে তোমাদের প্রতিপালককে ডাক। তিনি যালিমদেরকে পছন্দ করেন না’ (সূরা আ'রাফ, ৭/৫৫)। তিনি অন্যত্র বলেন,

وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً وَذُؤْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ
وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ-

‘তোমার প্রতিপালককে মনে মনে বিনম্রচিত্তে ও গোপনে অনুচ্চৈঃস্বরে প্রত্যুষে ও সন্ধ্যায় স্মরণ করবে এবং তুমি উদাসীনদের অন্তর্ভুক্ত হবে না’ (সূরা আ'রাফ ৭/২০৫)।

(৫) অন্যান্য হজ্জ সম্পৃক্ত বিদ'আতসমূহঃ অন্যান্য হজ্জ সম্পৃক্ত বিদ'আত সমূহ উল্লেখ করা হলোঃ-

১। ঢাকার হাজী কাম্পে ইহরাম বেঁধে দুই রাকআত সলাত আদায় করে তালবিয়া পাঠ করা

- ২। কাবা ঘর তাওয়াফ এর সময় হানাফি মাজহাবে প্রচলিত বিভিন্ন বানোয়াট দুআ পাঠ করা
- ৩। হাযরে আসওয়াদ এর দিকে ইশারা করে হাতে চুমু খেয়ে আবার হাযরে আসওয়াদ এর দিকে ইশারা করা
- ৪। সাফা মারওয়া সাঈ এর সময় হানাফি মাজহাবে প্রচলিত বিভিন্ন বানোয়াট দুআ পাঠ করা
- ৫। মক্কা থাকাকালীন সময়ে আয়েশা মসজিদে গিয়ে ২ বার উমরা করা
- ৬। মক্কা থেকে মদিনা যাওয়ার সময় সলাত জমা করে না পড়া
- ৭। মদিনায় গিয়ে হানাফি মাজহাবে প্রচলিত ৪০ ওয়াক্ত সলাত জামাতে পড়া
- ৮। সওয়াব লাভের আশায় রিয়াজুল জান্নাতে গিয়ে অধিক সময় ধরে সলাত পড়া
- ৯। রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কবরের সামনে গিয়ে বানোয়াট দুয়া পড়া
- ১০। বাকি কবরস্থানে গিয়ে বানোয়াট দুয়া পাঠ করা
- ১১। মক্কা ফেরার পথে মসজিদে নববী থেকে ইহরাম বাঁধা
- ১২। হজের জন্য ইহরাম বেঁধে ফজরের আগে রাতের বেলা মিনাতে যাওয়া
- ১৩। আরাফাত ময়দানে ফজরের আগে রাতের বেলা পৌছানো
- ১৪। মিনা ও আরাফাতে সলাত কসর ও জমা করে না পড়া
- ১৫। মুজদালিফা থেকে পাথর কুড়ান

১৬। কাবা ঘর তাওয়াফ এর সময় হানাফি মাজহাবে প্রচলিত বিভিন্ন বানোয়াট দুআ পাঠ করা

১৭। হাযরে আসওয়াদ এর দিকে ইশারা করে হাতে চুমু খেয়ে আবার হাযরে আসওয়াদ এর দিকে ইশারা করা

১৮। সাফা মারওয়া সাঈ এর সময় হানাফি মাজহাবে প্রচলিত বিভিন্ন বানোয়াট দুআ পাঠ করা

১৯। মক্কাতে আসার পর টাক হওয়া

২০। বিদ'আতী পদ্ধতিতে সলাত আদায় করা। এছাড়াও আরও অসংখ্য বিদ'আত পরিলক্ষিত হয়।

সুতরাং, উপরোক্ত আলোচনার সারাংশে বলা যায় যে, আরও অসংখ্য বিদ'আত রয়েছে যা উপরে কম বেশি উল্লেখ করা হয়েছে।

অতএব, মৌলভী নামের আলেম সমাজের নিজস্ব পদ্ধতিতে বানানো এসব দোআ - দরুদ, কেচ্ছা - কাহিনী হজ্জকে শুধু নষ্টই করবে না বরং বিদ'আত অনুসরণের জন্য কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে।

সুতরাং, হজ্জ করতে যাওয়ার আগে প্রতিটি মুসল্লীর উচিত হবে নাবী করিম (সাঃ) এবং তাঁর সাহাবীরা কিভাবে হজ্জ পালন করেছেন তা সঠিক ভাবে একজন হক্কপন্থী আলেম থেকে জেনে নেয়া উচিত। তা না হলে আমাদের সমস্ত আমল বিনষ্ট হয়ে যাবে তাতে কোন সন্দেহ নেই বললেই চলে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদের সবাইকে সঠিক পথে চলার তৌফিক দান করুন, আমীন।

বেআল্লিশ তম পরিচ্ছেদ - তম পরিচ্ছেদ - বিভিন্ন প্রকার প্রচলিত খতমে (ختم) বিদ'আত

খতম (ختم) শব্দের অর্থ ও প্রয়োগঃ ‘খতম’ (ختم) শব্দটি মূলত আরবী (ختم) শব্দের বাংলা ব্যবহার। যার মূল অর্থ হচ্ছে : কোনো বস্তুতে মোহর লাগানো বা তাকে সিলযুক্ত করা। কর্ম যুগে শব্দটির অর্থ হয়, কাজটি শেষ করা। এভাবে বিভিন্ন শব্দযোগে তার বিভিন্ন অর্থ হয় যেমন, মাটি দ্বারা মুখ বন্ধ করা, এড়িয়ে যাওয়া, হৃদয়ে মোহর এঁটে দেওয়া তথা অবুঝ করে দেওয়া, কোনো বস্তুর শেষে পৌঁছা ইত্যাদি। কিতাব বা কুরআন শব্দযোগে তার অর্থ হয়: সম্পূর্ণটুকু পড়ে শেষ করা।^{৫০৬} কুরআনে শব্দটি ক্রিয়ামূলে শুধুমাত্র হৃদয়ে মোহর এঁটে দেওয়ার অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। যেমনঃ “আল্লাহ তাদের হৃদয়ে ও কানে মোহর এঁটে দিয়েছেন, আর তাদের চোখের উপর রয়েছে আবরণ রয়েছে”।^{৫০৭} তবে বিভিন্ন হাদীসে (ختم) শেষ করা অর্থে ব্যবহার হয়েছে। যেমন আয়াতটি শেষ পর্যন্ত পড়া, সূরাটি শেষ পর্যন্ত পড়া ইত্যাদি শব্দ হাদীসে ব্যবহার হয়েছে। শেষ পর্যন্ত পড়া বলতে যেমন পুরোটা পড়া বুঝায়, তেমনি যে কোনো জায়গা থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত পৌঁছলেও এ শব্দ ব্যবহার হয়। এ ক্ষেত্রে পুরো সূরা পড়া উদ্দেশ্য নয়। যেমন, ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা থেকে বর্ণিত হাদীসে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ঘুম থেকে উঠে মিসওয়াক ও ওযু

^{৫০৬} ইবনু মানযুর, লিসানুল আরব, মাদ্দাহ: ‘ ختم ’ ১২/১৬৩

^{৫০৭} সূরা বাক্বার, ৭

করার পর সূরা আলে ইমরানের ১৯০ নং আয়াত থেকে পড়তে শুনে, অতঃপর ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা বলেনঃ

"فقرأ هؤلاء الآيات حتى ختم السورة...". (صحيح مسلم، باب الدعاء في صلاة

الليل وقيامه، رقم: ১৮৩৫)

“অতঃপর তিনি রাসূল (সাঃ) এই আয়াতগুলো পড়েন, এমনকি সূরা শেষ করেন”।^{৫০৮}

এখানে সূরা খতম বলতে পুরো সূরা পড়া নয়, বরং ১৯০ নং আয়াত থেকে শুরু করে সূরার শেষ পর্যন্ত পড়া। কুরআন সম্পূর্ণতা পড়ার ক্ষেত্রে খতম শব্দের ব্যবহার সাহাবীদের মধ্যে ছিল। তবে ‘হাদীস খতম’ বা ‘হাদীসটি খতম’ এমন কোনো ব্যবহার বা প্রয়োগ তাদের মাঝে ছিল বলে জানতে পারি নি। ‘খতমে বুখারী’র আলোচনায় এমন ব্যবহার না থাকার কারণ আমরা বুঝতে পারব ইন-শাআল্লাহ। তবে হাদীসটি খতম বলতে তা পুরোটা পড়া বুঝাবে। তাই কেউ একটি হাদীস পড়ে হাদীসটি খতম করেছি বলতে কোনো বাধা নেই।

এভাবে খতমে দো‘আ ইউনুস বললে পুরো দো‘আটা পড়া বুঝাবে, যদিও এমন বলার প্রচলন ছিল না। কিন্তু খতমে ইউনুস বললে: এতবার পড়া, অমুক খতম বললে: এতবার পড়া, তমুক খতম বললে এতবার পড়া, এসব ব্যবহার সম্পূর্ণ নতুন মনগড়া বানানো। খতম শব্দটি শেষ পর্যন্ত পৌঁছা বা পুরোটা পড়ার অর্থে ব্যবহার হলেও ‘খতম করানো’ বা ‘খতম পড়ানো’, এমন কোনো ব্যবহার বা

^{৫০৮} সহীহ মুসলিম, সালাত অধ্যায়, রাতের সালাতে দু‘আ ও রাতে জাগা অনুচ্ছেদ, নং: ১৮৩৫

প্রয়োগ না সাহাবিদের যুগে ছিল, না খাইরুল কুরুনে ছিল। কেননা কুরআন, হাদীস, দো‘আ, দুর্বাদ, যিকর ইত্যাদির আমলের এই সিস্টেম বা পদ্ধতিটি একেবারেই নতুন। তাই ‘খতম’ শব্দের শাব্দিক অর্থ অভিধানে পেলেও আমাদের সিস্টেমের তার পারিভাষিক কোনো অর্থ আহলে ইলমদের কোনো কিতাবে পাবেন না। আমরা ‘খতম’ বলতে যা বুঝি এ সবকিছু সোনালীযুগ দূরের কথা, মুহাক্কীক কোনো আলেম থেকে এ গুলোর আবিষ্কার হয়নি বলে পরিস্কার বুঝা যায়।

আমাদের জানামতে প্রচলিত যে খতমগুলো রয়েছে সেগুলোর আলোচনায় আমরা এগুলোর তাৎপর্য, যথার্থতা, গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে জানতে চেষ্টা করব। মহাগ্রন্থ আলকুরআন আল্লাহর কালাম এবং প্রতিটি মানুষের জীবন বিধান। এর গুরুত্ব কারো কাছে অজানা নয়।

তাই সর্বপ্রথম আমাদের সমাজে অধিকহারে প্রচলিত এই মহাগ্রন্থ আল কুরআনের খতম দিয়েই শুরু করছি। নিজে কুরআন না পড়ে, কুরআনের শিক্ষা নিজে গ্রহণ না করে, যে কোনো কারণে অন্যকে ভাড়া করে কুরআন পড়িয়ে নেওয়ার যথার্থতা কতটুকু তা আলোচনা করলে বুঝতে পারব ইনশাআল্লাহ। আল্লাহর তওফিক কাম্য।

খতমে কুরআন

কুরআন প্রতিটি মুসলিমের জীবন বিধান। এই কুরআন তাকে নিয়মিত তেলাওয়াত করতে হবে এবং এর মর্ম বুঝে তদনুযায়ী জীবন পরিচালনা করতে হবে। কুরআন শিক্ষা ও তেলাওয়াতের

ফযিলত বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন,

«خيركم من تعلم القرآن وعلمه» (صحيح البخاري، كتاب فضائل القرآن،
باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه)

“তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তি সর্বোত্তম, যে নিজে কুরআন শিক্ষা করে এবং অপরকে শিক্ষা দেয়”।^{৫০৯} এভাবে কুরআন তেলাওয়াতের বেলায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন,

"مثل الذي يقرأ القرآن كالأترجة طعمها طيب وريحها طيب . والذي لا يقرأ القرآن كالتمر طعمها طيب ولا ريح لها ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر . ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها". (صحيح البخاري، باب فضل القرآن على سائر الكلام)

“কুরআন পাঠকারী (মুমিনের) উদাহরণ সুস্বাদু সুগন্ধযুক্ত লেবুর ন্যায়। আর যে (মুমিন) কুরআন পাঠ করে না তার উদাহরণ এমন খেজুরের মত যা সুগন্ধহীন তবে খেতে সুস্বাদু। আর যে ফাসিক কুরআন পাঠ করে তার উদাহরণ রায়হান জাতীয় গুল্মের মত যার সুগন্ধ আছে কিন্তু খেতে বিষাদযুক্ত। আর যে ফাসেক কুরআন তেলাওয়াত করে না তার উদাহরণ ঐ মাকাল ফলের মত যা খেতেও বিষাদ (তিক্ত) আবার কোনো সুস্থানও নেই।^{৫১০} রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো এরশাদ করেন,

^{৫০৯} সহীহুল বুখারী, কুরআনের ফযিলত সমূহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ: তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তি উত্তম যে নিজে কুরআন শিখে এবং অপরকে শিখায়, নং:৪৭৩৯।

^{৫১০} সহীহুল বুখারী, কুরআনের ফযিলতসমূহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ: সব কালামের উপর কুরআনের শ্রেষ্ঠত্ব, নং:৪৭৩৯, সহীহ মুসলিম, কুরআনের ফযিলতসমূহ অধ্যায়, হাফিজে কুরআনের মর্যাদা অনুচ্ছেদ, নং:১৮৯৬।

"من قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول آلم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف". (سنن الترمذي، باب فيمن قرأ حرفاً من القرآن ما له من الأجر)

“যে ব্যক্তি কুরআনের একটি অক্ষর তিলাওয়াত করবে আল্লাহ তার আমলনামায় একটি নেকী প্রদান করেন, আর এই নেকীটি দশটি নেকীর সমান। আমি বলি না, “ الم ” একটি অক্ষর, বরং “ ا ” একটি অক্ষর, “ ل ” একটি অক্ষর, “ ء ” একটি অক্ষর”।^{৩৩}

কুরআন তেলাওয়াতের এত মর্যাদা, গুরুত্ব, সওয়াব কুরআন হাদীস থেকে প্রমাণিত থাকা সত্ত্বেও প্রচলিত খতমের রূপরেখায় নবী আদর্শ ও সাহাবা আদর্শের বৈপরিত্য থাকার কারণে এই কুরআন খতমের হুকুম যদি না বাচক হয় তবে যার কোনো অস্তিত্ব নবী জীবনে, নবীর শিক্ষা প্রাপ্ত সাহাবিদের জীবনে নেই তার হুকুম কী হবে তা সহজেই অনুমেয়। রূপরেখায় বৈপরিত্য বলতে যেমন, সাহাবায়ে কেরাম কুরআন নিজে শিখতেন, নিজে পড়তেন। যিনি জানেন না তিনি শিখতেন। এই শিক্ষাই তাদেরকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিয়েছেন। অনেক সময় কেউ কুরআন অপরের কাছে শুনতে চাইতেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও কোনো কোনো সাহাবী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে শুনার আগ্রহ প্রকাশ করতেন, শুনতেন। তবে অন্যকে এনে বাড়ীতে খতম করানোর কোনো রেওয়াজ তাদের

^{৩৩} সুনানুত তিরমিযি, হাদীস সহীহ, কুরআনের ফযিলত সমূহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ: যে কুরআনের একটি অক্ষর পড়ল তার কতটুকু ছওয়াব রয়েছে, নং: ২৯১০।

মাঝে ছিল না। কেউ মারা গেলে তাদের যা করণীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিখিয়েছেন তারা শুধু তাই করতেন। কেউ অসুস্থ হলে, বিপদে পড়লে কী করণীয় তাও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে দিয়েছেন। কেউ মারা গেলে বা অন্য কোনো সমস্যায় পড়লে কুরআন খতম করা বা খতম করানোর কথা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবনে একটিবার কাউকে বলেন নি নিজেও করেন নি।

তাই সাহাবীরা এমন কর্ম কখনো করেন নি। এখন আমরা জানতে চেষ্টা করব প্রচলিত খতমের হুকুম সম্পর্কে আদর্শবান আলেমদের কী মত। এ ব্যাপারে আমাদের আলেম সমাজে অত্যন্ত সুপরিচিত কিতাব “আহসানুল ফাতওয়া” এর লিখক প্রসিদ্ধ ফক্বিহ রশিদ আহমদ (রহঃ) তার কিতাবে প্রচলিত কুরআন খতম সম্পর্কে এক প্রশ্নের উত্তরে যে দলীলভিত্তিক আলোচনা করেছেন, অসংখ্য আলেমের বক্তব্যের উদ্ধৃতি পেশ করেছেন তার এই লেখাটির অনুবাদ তুলে দেওয়াই যথেষ্ট মনে করছি।

তার এ বক্তব্যের পর এ ব্যাপারে আর কিছু লেখার কোনো প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে করি না। এতে আমরা প্রচলিত খতমের তাৎপর্য যেমন বুঝতে পারব তেমনি অগণিত আলেমের মতামত পেয়ে যাব। তার আলোচনা পড়ার পর সত্য সন্ধানী মানুষের মনে আর কোনো দ্বিধা থাকবে না বলে আশা করি। নিম্নে তার কিতাবের প্রশ্ন ও উত্তর ছবছ তুলে ধরছি।

প্রশ্ন: বর্তমানে কুরআন খতমের প্রচলন ব্যাপক হয়ে গেছে। যেমন, নতুন ঘর ত্রয় করা হলে কুরআন খতম করা হয়। দোকান উদ্বোধন করা হলে খতম করা হয়। কারো চল্লিশা হলে কুরআন খতম করা হয়, কারো মৃত্যুর তৃতীয় দিনে কুরআন খতম করা হয়; যাতে মৃত ব্যক্তির কাছে সওয়াব পৌঁছে।

কোনো সময় এর ঘোষণা পত্রিকায় দেওয়া হয় এবং মানুষ দূর-দুরান্ত থেকে শুধুমাত্র কুরআন খতমের জন্য আসে। এমন কুরআন খতমের আমলের হুকুম কী? কুরআন হাদীসের আলোকে এর কোনো প্রমাণ আছে কি? এতে আমাদের বন্ধু-বান্ধব বা পরিবারের লোক শরীক হতে পারবে কি? আমরা নিজে কি এমন কর্মে শরীক হয়ে গোনাহগার হচ্ছি না?

بينوا توجروا - -

সুমতি দানকারীর নামে উত্তর

قال الإمام محمد إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: "حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد قال : دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد فإذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما جالس إلى حجرة عائشة وإذا ناس يصلون في المسجد صلاة الضحى قال فسألناه عن صلاتهم فقال بدعة".

صحيح البخاري ص: ২৩৮: ১)

(মুহাম্মদ ইসমাইল বুখারী রাহ. বলেন: মুজাহিদ (রঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি এবং উরওয়া ইবনু যুবাইর (রঃ) মসজিদে প্রবেশ করে দেখতে পেলাম, আব্দুল্লাহ ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা-আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা এর হাজার পাশে বসে

আছেন। ইতোমধ্যে কিছু লোক মসজিদে সালাতুদ্বোহা আদায় করতে লাগল। আমরা তাকে এদের সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, এটা বিদ'আত।^{৫১২}

وقال الإمام الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا جرير عن منصور عن مجاهد قال دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد فإذا عبد الله بن عمر جالس إلى حجرة عائشة والناس يصلون الضحى في المسجد فسألناه عن صلاتهم فقال بدعة.
(صحيح مسلم ص: 809 ج: 1)

(এবং ইমাম আবুল-হুসাইন মুসলিম ইবন হাজ্জাজ ইবন মুসলিম আল-কুশাইরী বলেন: মুজাহিদ (রঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি এবং উরওয়া ইবনু যুবাইর (রঃ) মাসজিদে প্রবেশ করে দেখতে পেলাম, আবদুল্লাহ ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা-আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা এর হুজরার পাশে বসে আছেন। আর কিছু লোক মসজিদে সালাতুদ্বোহা আদায় করছে। আমরা তাকে এদের সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, এটা বিদ'আত।^{৫১৩}

وقال الشيخ محي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: انهم سألوا ابن عمر عن صلاة الذين كانوا يصلون الضحى في المسجد فقال بدعة (هذا قد حملة القاضي وغيره على أن مراده أن اظهارها في المسجد والاجتماع لها

^{৫১২} সহীহুল বুখারী, উমরা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কতবার উমরা করেছেন।

^{৫১৩} সহীহ মুসলিম, অধ্যায়: উমরা, অনুচ্ছেদ: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উমরার সংখ্যার বর্ণনা।

هو البدعة لا أن أصل صلاة الضحى بدعة وقد سبقت المسألة في كتاب الصلاة.

(بالا) (شرح النووي على صحيح مسلم صفحه مندرجه
(এবং শাইখ মুহিউদ্দীন আবু যাকারিয়া ইয়াহইয়া ইবন শরফ নববী (রাহ). বলেন, তারা ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে যারা মসজিদে সালাতুদদ্বোহা আদায় করছিল তাদের সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছিল, তিনি বললেন বিদ'আত। এটা ক্বায়ী^{৫৪} এবং অন্যান্যরা এর অর্থ নিয়েছেন, তার উদ্দেশ্য হলো সালাতকে মসজিদে প্রকাশ করা এবং এর জন্য সমবেত হওয়াটাই হচ্ছে বিদ'আত। মূল সালাতুদদ্বোহা বিদ'আত নয়। সালাত অধ্যায়ে মাসআলাটির আলোচনা হয়েছে)^{৫৫}।

رحمه الله 8- وقال الامام محمد بن شهاب المعروف بابن البزار الكردي الحنفي وقد صح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سمع قوما اجتمعوا في مسجد تعالى: يهللون ويصلون عليه الصلاة والسلام جهرا، فراح إليهم فقال ما عهدنا ذلك على عهده عليه السلام وما أراكم إلا مبتدعين، فما زال يذكر ذلك حتى أخرجهم من المسجد.

(بزازية بهامش الهنديه، ج: ٦ ص: ٣٩٤)

(এবং ইমাম মুহাম্মদ ইবন শিহাব আল-কুরদুরী আল-হানাফী রাহ.^{৫৬} যিনি ইবনে বায্যার নামে পরিচিত, তিনি বলেন, ইবনে মাসউদ

^{৫৪} ক্বায়ী আয়ায, মালেকি মাযহাবের প্রখ্যাত আলেম মুহাদ্দীস, ফকীহ, আদীব, ঐতিহাসিক, একাধিক কিতাবের রচয়িতা। ৪৭৩-৫৪৪ হিজরী।

^{৫৫} ইমাম নববীর মুসলিমের ব্যাখ্যগ্রন্থ, প্রাপ্ত অধ্যায়। কিতাবুস-সালাত, (باب استحباب صلاة الضحى وأن أقلها ركعتان), এর অধীনে আলোচনা সালাতুদ দ্বোহার আলোচনা করেছেন।

^{৫৬} ফাতওয়া বায্যায়িয়ার মুসাম্মিফ, ইমাম মুহাম্মদ ইবন মুহাম্মদ ইবন শিহাব, ইবনে বায্যার আলকুরদুরী আল-হানাফী।

রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত যে, তিনি শুনতে পান একদল লোক মসজিদে সমবেত হয়ে উচ্চস্বরে তাহলীল এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দুরূদ পড়ছে। অতএব তিনি তাদের কাছে গেলেন এবং বললেন, আমরাতো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে এমনটি পাইনি। আমি তো তোমাদেরকে বিদআতি ছাড়া কিছু দেখছি না। তিনি একথা বলতে বলতে তাদেরকে মসজিদ হতে বের করে দেন)^{৫১৭}।

وقال في موضع آخر: ويكره اتخاذ الطعام في اليوم الأول والثالث وبعد الأسبوع والأعياد ونقل الطعام إلى القبر في المواسم واتخاذ الدعوة بقراءة القرآن وجمع الصلحاء والقراء للختم أو لقراءة سورة الأنعام أو الإخلاص. فالحاصل أن اتخاذ الطعام عند قراءة القرآن لأجل الأكل يكره. (بزازية بهامش الهندي، ج: 8 ص: ٤٥)

(এবং তিনি আরেক জায়গায় বলেন, আর মৃত্যুর প্রথম দিন, দ্বিতীয় দিন, সাপ্তাহ পর এবং অনুষ্ঠানে খাবারের আয়োজন করা, বিভিন্ন মৌসুমে কবরে খাবার নিয়ে যাওয়া, কুরআন পড়ার জন্য দাওয়াতের আয়োজন করা এবং সৎ লোক ও ক্বারীদেরকে খতমের জন্য বা সূরা আনআম অথবা সূরা ইখলাস পড়ার জন্য সমবেত করা মাকরুহ। মোটকথা, কুরআন পড়ার সময় খাওয়ার জন্য দাওয়াতের আয়োজন করা মাকরুহ)^{৫১৮}

মৃত্যু: ৮২৭ হিজরী।

^{৫১৭} বাযাযিয়া, হিন্দিয়ার টিকা, ৬/৩৭৮ (লেখকের দেওয়া তথ্য সূত্র মোতাবেক)।

^{৫১৮} বাযাযিয়া, হিন্দিয়ার টিকা, ৪/৮১ (লেখকের দেওয়া সূত্রে)

وقال الفقيه المخدم محمد جعفر بن العلامة عبد الكريم البوبكاني السندي رحمه الله تعالى في الصيرفية: قراءة القرآن لأجل المهمات والبأس مكروه. (وبعد صفحة) يكره للقوم أن يقرأ القرآن جملة لتضمنها ترك الاستماع والإنصات للأمور بهما. وقيل لا بأس به. في التتارخانية من المحيط: من المشايخ من قال: إن ختم القرآن بالجماعة جهرا ويسمى "سيباره خوانده" مكروه، (الى قوله) في عين العلم: ولا يختم في أقل من ثلاثة أيام (وبعد صفحة) في مفيد المستفيد من النصاب: قراءة القرآن في المجالس يكره، لأنه يقرأ طمعا في الدنيا، وكذلك في الأسواق، وكذلك على رأس القبر. قيل، ولو قرأ ولا يسأل والناس أعطوه من غير سؤال قال يكره أيضا، لأنه إذا لم يقصد السؤال لم يجلس في بيته يقرأ. (المتانة في المزمة عن الخزنة، ٦٣٢، ٦٣٣، ٦٣٨)

(এবং ফক্বীহ মুহাম্মদ জাফর^{১৯}.... সিন্দি বলেন, সাইরাফিয়াহ কিতাবে^{২০} “কঠিন বিষয় এবং অসুবিধার কারণে কুরআন পড়া মাকরুহ”। (এবং এক পৃষ্ঠা পর) মুফিদুল মুস্তাফিদ কিতাবে এসেছে, “দলবদ্ধ হয়ে বৈঠকে কুরআন পড়া মাকরুহ, কেননা এতে শ্রবণ করা এবং চুপ থেকে শোনা পরিত্যাগ করা হয় অথচ এ দুটি বিষয় নির্দেশিত।” কেউ কেউ বলেন, “এতে অসুবিধা নেই”। ‘মুহিত’^{২১} কিতাবের উদ্ধৃতিতে ‘তাতারখানিয়া’^{২২} কিতাবে রয়েছে, “মাশায়েখের

^{১৯} মুহাম্মদ জা'ফর ইবন আব্দুল করীম আল-বুবাকানী আস-সিন্দি আল-হানাফী। তার লিখিত কিতাব, ‘আল-মাতানাহ ফিল-মারাম্মাতে আনিল খিয়ানাহ’।

^{২০} আল-ফাতাওয়া আস-সাইরাফিয়াহ। লিখক, হানাফী ফক্বীহ আসআদ ইবন ইউসুফ ইবন আলী মাঈদুদ্দীন আস-সাইরাফী আল-বুখারী। মৃত: ১০৮৮ হিজরী। (আল-আ'লাম, ১/৩০২)

^{২১} দেখুন, বুরহানুদ্দীন ইবনু মাযাহ (৬১৬ হি.) রচিত কিতাব ‘আল-মুহিতুল বুরহানী, পৃষ্ঠা: ১৪৪, খ:-: ৫।

^{২২} ফিকহে হানাফী নিয়ে রচিত কিতাব ‘আল-ফাতাওয়া আত্তাতার খানিয়া’, লিখক, ইবনুল আলা আল-আনসারী আদ-দেহলবী আল-হিন্দি।

মধ্যে কেউ কেউ বলেন, নিশ্চয় দলবদ্ধ হয়ে উচ্চস্বরে কুরআন তেলাওয়াত করা যাকে বলা হয় ‘সীপারা পড়া’ তা মাকরুহ। (আরো বলেন) আইনুল ইলমে রয়েছে, তিন দিনের কমে খতম করবে না”। (আরো এক পৃষ্ঠা পর), “মুফিদুল মুসতাফিদে নেসাব^{২৩} থেকে বলা হয়েছে, সমাবেশ স্থলে কুরআন পড়া মাকরুহ, কেননা পাঠক তা দুনিয়ার লোভে পড়ছে। এভাবে বাজারে পড়া মাকরুহ। কবরের কাছে পড়াকেও এভাবে মাকরুহ বলা হয়েছে। যদি পড়ে কিন্তু (কারো কাছে কিছু) না চায়, আর মানুষ তাকে চাওয়া ব্যতীতই দান করে তবে তাও মাকরুহ বলেছেন, কেননা চাওয়ার ইচ্ছা না থাকলে সে কেন ঘরে বসে পড়ছে না”।^{২৪}

৭ - وقال العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى: (تتمة) أشار بقوله فرادى إلى ما ذكره بعد في متنه من قوله ويكره الاجتماع على إحياء ليلة من هذه الليالي في المساجد وتمامه في شرحه وصرح بكرهه ذلك في الحاوي القدسي قال وما روي من الصلوات في هذه الأوقات يصلي فرادى غير التراويح". قال في البحر: قال في البحر ومن هنا يعلم كراهة الاجتماع على صلاة الرغائب التي تفعل في رجب أو في أولى جمعة منه وأنها بدعة وما يحتاله أهل الروم من نذرها لتخرج وصرح بذلك في البزازية كما سيذكره. عن النفل والكراهة فباطل اه قلت الشارح آخر الباب وقد بسط الكلام عليها شارحا المنية وصرحا بأن ما روي وللعلامة نور الدين المقدسي فيها تصنيف حسن سماه (. فيها باطل موضوع

^{২৩} ‘আইনুল ইলম’ ‘মুফিদুল মুস্তাফিদ’ ‘কিতাবুন-নেসাব’ ফিকহে হানাফীতে রচিত বিভিন্ন কিতাবের নাম।

^{২৪} আল-মাতানাহ ফিল-মারাম্মাতে আনিল খিয়ানাহ, ৬৩৩, ৬৩৪, ৬৩৫ (লেখকের দেওয়া সূত্রে)।

ردع الراغب عن صلاة الرغائب) أحاط فيه بغالب كلام المتقدمين
(رد المحتار، ج ২ ص ২৫). والمتأخرين من علماء المذاهب الأربعة

(এবং আল্লামা ইবনে আবেদীন^{৫২৫} (রাহ.) বলেন, (পরিশিষ্ট) মুসান্নিফ^{৫২৬} তার কথা “একা একা” বলে তিনি সেদিকে ইঙ্গিত করেন যা একটু পরে তিনি তার মতনে (বইয়ের মূল অংশে) এই বলে উল্লেখ করেন, “আর এই রাতগুলো জাগ্রত থেকে কাটানোর জন্য মসজিদে সমবেত হওয়া মাকরুহ” পুরো আলোচনা তার ব্যাখ্যাগ্রন্থে রয়েছে। আল-হাবীল ক্বদসীতে^{৫২৭} তা মাকরুহ বলে স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন এবং বলেছেন, “এই রাতগুলোতে যে সালাতের কথার বর্ণনা রয়েছে তা একা একা পড়তে হবে, একমাত্র তারাবীহ ব্যতীত”। আল-বাহরে^{৫২৮} বলেন, “এথেকে জানা যায় যে, সালাতুর রাগাইব যা রজবের প্রথম জুমুআয় পড়া হয়, এর জন্য সমবেত হওয়া মাকরুহ এবং এটি বিদআত। এটাকে নফল ও মাকরুহ থেকে বের করার জন্য রোমবাসীরা এই সালাতের মান্নতের যে হীলা অবলম্বন করে তা বাতিল”। আমি বলি (ইবনে আবেদীন)

^{৫২৫} বিশিষ্ট হানাফী ফক্বীহ মুহাম্মদ আমীন ইবন উমর ইবন আব্দুল আযীয ইবন আবেদীন । ১১৯৮-১১২৫ হিজরী।

দামেশ্কে জন্ম এবং মৃত্যু। যাকে ইমামুল হানাফিয়াহ ফিশ্-শাম বলে ভূষিত করা হয়। আল্লামা ইবনে আবেদীন বা আল্লামা শামী নামে তিনি প্রসিদ্ধ। তার কিতাব ‘রাব্দুল মুহতার’ যা ফাতওয়া শামী হিসেবে পরিচিত তা ফিকহে হানাফীর মাসাঈলে আলাউদ্দীন হাসকাফী রচিত ‘আদুররুল-মুখতারের’ ব্যাখ্যাগ্রন্থ। (আল-আলাম: ৬/৪২)

^{৫২৬} মুসান্নিফ আর্থান ‘আদুররুল-মুখতারের’ রচয়িতা মুহাম্মদ ইবন আলী আলাউদ্দীন আল-হাসকাফী। দামেশ্কে একজন হানাফী মুফতী। ১০২৫-১০৮৮ হিজরী। (আল-আলাম: ৬/৪২)

^{৫২৭} ‘আল-হাবীল ক্বদসী ফিল ফুর’ লিখক, কাযী জামাল উদ্দীন আহমদ ইবন মুহাম্মদ আল-গায়নবী আল-হানাফী। (কাশফুয যুনুন : ১/৬২৭)

^{৫২৮} যাইনুদ্দীন ইবনে নুজাইম মিসরী আল-হানাফী ৯২৬-৯৭০ হিজরী রচিত কিতাব আল-বাহরুর রায়িহু। সালাত অধ্যায়। বিতর ও নফল অনুচ্ছেদ, ২/৫৬।

ব্যাখ্যায় তা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে, যেমন ব্যাখ্যাকার অধ্যায়ের শেষে উল্লেখ করবেন। আল-মুনইয়াহ এর দুই ব্যাখ্যাকার^{২৯} এর উপর দীর্ঘ আলোচনা করেছেন এবং তারা উভয়ে স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, “এ ব্যাপারে যা বর্ণনা করা হয় সব বাতিল মনগড়া। আল্লামা নুরুদ্দীন মাক্কাবিসী^{৩০} এ বিষয়ে একটি সুন্দর রচনা রয়েছে তিনি এর নাম দিয়েছেন ‘রাদ্‌উর রাগিব আন সালাতির রাগাইব’ তিনি এখানে চার মাযহাবের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী আলেমদের কথার অধিকাংশ সংকলন করেছেন।^{৩১}

وقال في موضع آخر: ويكره اتخاذ الضيافة من الطعام من أهل الميت لأنه
 شرع في السرور لا في الشرور وهي بدعة مستقبحة
 وروى الإمام أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح عن جرير بن عبد الله قال كنا
 نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعهم الطعام من النياحة اه وفي البزاية
 ويكره اتخاذ الطعام في اليوم الأول والثالث وبعد الأسبوع ونقل الطعام إلى
 القبر في المواسم واتخاذ الدعوة لقراءة القرآن وجمع الصلحاء والقراء للختم أو
 لقراءة سورة الأنعام أو الإخلاص والحاصل أن اتخاذ الطعام عند قراءة القرآن
 لأجل الأكل يكره وفيها من كتاب الاستحسان وإن اتخذ طعاما للفقراء كان
 حسنا اه وأطال في ذلك المعراج وقال وهذه الأفعال كلها للسمعة والرياء

^{২৯} ‘আল-মুনইয়াহ’ অর্থাৎ ‘মুনইয়াতুল মুসাল্লা’, এই কিতাবের দুই ব্যাখ্যাকার দ্বারা উদ্দেশ্য সম্ভবত, ‘মুনইয়াতুল মুতামাল্লা’ এবং ‘আল-কুনইয়াহ’ কিতাবদ্বয়ের রচয়িতা। দুটি কিতাবই ‘মুনইয়াতুল মুসাল্লা’র শরাহ। কিতাব দুটি দুর্লভ ও সম্মুখে না থাকায় এ ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারিনি। (সংকলক)

^{৩০} ইমাম নুরুদ্দীন আলী ইব্নু গানিম আল-মাক্কাবিসী আল-হানাফী। মৃত্যু: ১০০৪ হিজরী (কাশফুয যুনুন: ১/৮৪০)। সালাতুর রাগাইব নামে সালাতের বিদআত সম্পর্কে তার লিখিত কিতাবের নাম, ردع الراغب عن الجمع في صلاة الرغيب

^{৩১} রাদ্দুল মুহতার, কিতাবুস সালাত, বিতর ও নফল অধ্যায়, ২/২৬

(رد فيحترز عنها لأنهم لا يريدون بها وجه الله تعالى اه)

(المحترز: ج: ২: ص: ২৪০)

(এবং তিনি আরেক জায়গায় বলেন, আর মৃত ব্যক্তির পরিবারের পক্ষ থেকে যিয়াফত খাবারের আয়োজন করা মাকরুহ। কেননা তা আনন্দের বেলায় শরীয়ত সম্মত, অনিষ্টতার বেলায় নয়। আর এটা মন্দ বিদ'আত। ইমাম আহমদ এবং ইবনে মাজাহ বিশুদ্ধ সনদে জারীর ইবন আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেন,^{৫৩২} জারীর বলেন, “মৃত ব্যক্তির পরিবারের নিকট সমবেত হওয়া এবং তারা খাবারের আয়োজন করাকে আমরা নিয়াহাহ (বিলাপ) গণ্য করতাম”। বায়্যাযিয়ায় রয়েছে, “আর মৃত্যুর প্রথম দিন, দ্বিতীয় দিন, সপ্তাহ পর এবং অনুষ্ঠানে খাবারের আয়োজন করা, বিভিন্ন মৌসুমে কবরে খাবার নিয়ে যাওয়া, কুরআন পড়ার জন্য দাওয়াতের আয়োজন করা এবং সৎ লোক ও ক্বারীদেরকে খতমের জন্য বা সূরা আন'আম অথবা সূরা ইখলাস পড়ার জন্য সমবেত করা মাকরুহ।

মোটকথা, কুরআন পড়ার সময় খাওয়ার জন্য দাওয়াতের আয়োজন করা মাকরুহ” এবং উক্ত কিতাবের ইসতেহসান অধ্যায়ে রয়েছে, “যদি দরিদ্র মানুষের জন্য খাবারের আয়োজন করে তবে ভাল”। আর মি'রাজে^{৫৩৩} - এ বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন এবং

^{৫৩২} ইবনে মাজাহ, সনদ সহীহ, মৃত ব্যক্তির পরিবারে সমবেত হওয়া এবং খাবারের আয়োজন করা নিষেধ অনুচ্ছেদ, হাদীস নং ১৬১২, ইবনে মাজাহ এর হাদীসটির শব্দ হলো:

كُنَّا نَرَى الْجَمَاعَةَ إِلَى أَهْلِ الْمَيِّتِ وَصَنَعَةَ الطَّعَامِ مِنَ النَّيَاحَةِ

মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং: ৬৯০৫, মুসনাদে আহমদের শব্দ:

كُنَّا نَحْذَرُ الْجَمَاعَةَ إِلَى أَهْلِ الْمَيِّتِ وَصَنِيْعَةَ الطَّعَامِ بَعْدَ ذَفْنِهِ مِنَ النَّيَاحَةِ

^{৫৩৩} সম্ভবত আবুল কাসিম আল-কুশাইরী নাইসাবুরী রচিত 'কিতাবুল মি'রাজ' উদ্দেশ্য।

বলেছেন, “এই সবগুলো হচ্ছে লোক দেখানো ও লোক শুনানো। তাই এ সব থেকে বিরত থাকবে, কেননা তারা এগুলোর মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে না”^{৫০৪}।

وقال في موضع آخر: وقد أطنب في رده صاحب تبیین المحارم مستندا إلى النقول الصريحة فمن جملة كلامه قال تاج الشريعة في شرح الهداية إن القرآن بالأجرة لا يستحق الثواب لا للميت ولا للقارئ وقال العيني في شرح الهداية ويمنع القارئ للدنيا والآخذ والمعطي آثمان فالحاصل أن ما شاع في زماننا من قراءة الأجزاء بالأجرة لا يجوز لأن فيه الأمر بالقراءة وإعطاء الثواب للآمر والقراءة لأجل المال فإذا لم يكن للقارئ ثواب لعدم النية الصحيحة فأين يصل الثواب إلى المستأجر ولولا الأجرة ما قرأ أحد لأحد في هذا الزمان بل جعلوا القرآن العظيم مكسبا ووسيلة إلى جمع الدنيا إنا لله وإنا إليه راجعون (وبعد أسطر) كما صرح به في التاتارخانية حيث قال لا معنى لهذه الوصية ولصلة القارئ بقراءته لأن هذا بمنزلة الأجرة والإجارة في ذلك باطلة وهي بدعة ولم يفعلها أحد من الخلفاء (رد المحتار: ج: ٥: ص: ٥٦)

এবং তিনি আরেক জায়গায় বলেন, তাবয়িনুল-মাহারিমের লিখক^{৫০৫} স্পষ্ট উদ্ধৃতির মাধ্যমে এসব প্রত্যাখ্যান করার ক্ষেত্রে অনেক দীর্ঘ আলোচনা করেন। তার বক্তব্যের মধ্য থেকে রয়েছে, “তাজুশ-শরীয়াহ বলেন,^{৫০৬} পারিশ্রামিকের মাধ্যমে কুরআন পড়া ছওয়াবের

^{৫০৪} রাদ্দুল মুহতার, সালাত অধ্যায়, সালাতুল-জানাযা অনুচ্ছেদ, ২/২৪০।

^{৫০৫} সিনানুদ্দীন ইউসুফ আল-আমাসী আল-হানাফী, আল-মক্কী, মৃত্যু: ১০০০ হিজরীর পাশাপাশি।

^{৫০৬} আল-ইমাম তাজুশ-শরীয়াহ, আহমদ ইবন উবাইদুল্লাহ আল-মাহবুবী আল-হানাফী উমর ইবন সাদরুশ-শরীয়াহ আল-আওয়াল, মৃত্যু: ৬৭২ হিজরী। তার লিখিত হেদায়ার ব্যাখ্যাগ্রন্থ ‘নিহায়াতুল কিফায়াহ ফি দিরায়াতিল হিদায়াহ। (কাশফুয-যুনুন ২/২০২২)

উপযুক্ত হয় না, না মৃতব্যক্তির জন্য, না পাঠকের জন্য”। হেদায়ার ব্যাখ্যাগ্রন্থে আইনি^{৫৩৭} লিখেন, “দুনিয়ার জন্য কুরআন পাঠককে বাধা দেওয়া হবে, দাতা, গ্রহিতা উভয়ে গোনাহগার হবে”।

মোটকথা, আমাদের যুগে পারিশ্রমিকের মাধ্যমে কুরআনের অংশ পড়ার যে প্রচলন বিস্তার লাভ করেছে তা জায়েয নেই, কেননা এখানে পড়ার নির্দেশ এবং সওয়াব নির্দেশদাতাকে দেওয়া রয়েছে, আর পড়া হচ্ছে অর্থের কারণে। অতএব বিশুদ্ধ নিয়্যাত না থাকার কারণে পাঠকই যখন সওয়াব পাচ্ছে না তাহলে কী-ভাবে পাঠক নিয়োগকারীর কাছে সওয়াব পৌছবে। যদি পারিশ্রমিক না থাকত তবে আজকাল কেউ কারো জন্য পড়ত না। বরং কুরআনকে তারা উপার্জনের বস্তু ও দুনিয়া সংগ্রহের মাধ্যম বানিয়ে নিয়েছে। ইন্না লিল্লাহি ও ইন্না ইলাইহি রাজিউন। (কয়েক লাইন পর) যেমন তাতারখানিয়ায় স্পষ্টভাবে উল্লেখ করে বলেন, “এই (খতমের) অসিয়্যাতের এবং পড়ার কারণে পাঠককে দানের অসিয়্যাতের কোনো অর্থ নেই। কেননা এটা ভাড়া করার ন্যায়, আর এসবের বেলায় ভাড়া করা বাতিল এবং তা বিদ’আত। খুলাফাদের মধ্যে কেউই এমন কর্ম করেননি)।^{৫৩৮}

১০- وقال ايضا: ونقل العلامة الحلواني في حاشية المنتهى الحنبلي عن شيخ الإسلام تقي الدين ما نصه ولا يصح الاستئجار على القراءة وإهداؤها إلى الميت لأنه لم ينقل عن أحد من

^{৫৩৭} প্রখ্যাত হানাফী মুহাদ্দীস আবু মুহাম্মদ আল্লামা বদরুদ্দীন আল-আইনি। ৭৬২৮৫৫ - হিজরী ১৩৬১ - ১৪৫১ ঈসায়ী। তার লিখিত হেদায়ার ব্যাখ্যাগ্রন্থ ‘আল-বিনায়াহ’। দেখুন, বর্ণিত কিতাবের কারাহিয়াহ অধ্যায়, মাসাঈলু মুতাফারিকাহ, ১১/২৬৭।

^{৫৩৮} রাব্বুল-মুহতার, কিতাবুল ইজারাহ, মাতলাবুন ফিল-ইসতিজার আলাত-ত্বা’আত, : ৬/৫৬।

الأئمة الإذن في ذلك وقد قال العلماء إن القارئ إذا قرأ لأجل المال فلا ثواب له فأني شيء يهديه إلى الميت وإنما يصل إلى الميت العمل الصالح والاستئجار على مجرد التلاوة لم يقل به (وبعد اسطر) وحينئذ فقد ظهر لك بطلان ما أكب عليه أهل العصر من أحد من الأئمة الوصية بالختامات والتهاليل مع قطع النظر عما يحصل فيها من المنكرات التي لا ينكرها إلا من طمست بصيرته وقد جمعت فيها رسالة سميتها (شفاء العليل وبل الغليل في حكم رد المحتار: ج: ٥: ص: ٥٩) (الوصية بالختامات والتهاليل)

তিনি আরো বলেন, আল্লামা হুসাইনী ‘আল-মুনতাহাল হাম্বলী’^{৫৩০} এর টিকায় শায়খুল ইসলাম তাকী উদ্দীন থেকে বর্ণনা করেন যার ভাষ্য হলো, “পড়ার জন্য পারিশ্রমিকের উপর নিয়োগ দেওয়া এবং এর সওয়াব মৃতব্যক্তিকে পাঠানো শুদ্ধ নয়, কেননা কোনো ইমাম থেকে এর অনুমোদন পাওয়া যায় না। বরং আলেমগণ বলেন, নিশ্চয় ক্বারী যখন সম্পদের কারণে পড়বে তখন তার কোনো সওয়াব নেই, অতএব সে মৃতব্যক্তির কাছে কি জিনিস পাঠাবে, মৃত ব্যক্তির কাছে কেবল সৎকর্মই পৌঁছে। আর শুধুমাত্র তেলাওয়াতের উপর পারিশ্রমিক হিসেবে নিয়োগ দেওয়ার কথা কোনো ইমাম বলেননি”। (কয়েক লাইন পর) অতএব, এখন তোমার কাছে খতম এবং তাহালিলের অসিয়্যাত, যে দিকে মানুষ ঝুঁকেছে তার অন্যান্য খারাবীর দিকে দৃষ্টি দেওয়া ছাড়াই তা বাতিল হওয়ার বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে গেল। দৃষ্টিশক্তি লোপ করা হয়েছে এমন ব্যক্তি ছাড়া যার খারাবী কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। আমি এতে একটি পুস্তিকা

^{৫৩০} ফিকহে হাম্বলীতে রচিত কিতাব, মূল নাম ‘মুনতাহাল-ইরাদাত ফিল জাম’ঈ বাইনাল মুকাম্লা’ঈ ওয়াত্-তানকীহি ওয়ায্-যিয়াদাত’, লেখক, তাকীউদ্দীন মুহাম্মদ ইবন আহমদ ইবন আব্দুল আযিয ইবনুন-নাজ্জার আল-ফুতুহী আল-মিসরী, মৃত্যু: ৯৭২ হিজরী।

সংকলন করেছি যার নাম দিয়েছি ‘শিফাউল-আলীল ও বাল্লু-গালীল ফি লুকমিল-সিয়াতে বিল-খাতামাতে ওয়াত্তাহলীল’।^{৫৪০}

এ সমস্ত বর্ণনা থেকে প্রমাণিত হলো যে, প্রচলিত কুরআন খতম বিদআত এবং না-জায়েয। কুরআন, হাদীস এবং কল্যাণের সাক্ষ্যপ্রাপ্ত যুগে এর কোনো প্রমাণ নেই। এতে অংশ নেওয়া জায়েয নয়। এছাড়া প্রচলিত খতমে কুরআনে আরো অসংখ্য খারাবী রয়েছে যার কিছু নিম্নে তুলে ধরছিঃ

১. ঘোষণা এবং বলপূর্বক এতে লোকজনদের সমবেত করা হয়, যাকে শরীয়তের পরিভাষায় “তাদঈ” (ডাকাডাকি) বলা হয় যা নফল ইবাদতে নিষিদ্ধ।

যেমন আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এর সামনে কিছু মানুষ সালাতুদ্বোহা জামাতের আকারে পড়ছিল, যখন তার কাছে তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো তিনি তাদের আমলকে বিদআত আখ্যা দিলেন।

অথচ সালাতুদ্বোহা একাকি পড়া প্রমাণিত। এভাবে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু এক গোত্রের ব্যাপারে গুনলেন, তারা উচ্চস্বরে তাহলিল এবং দুরূদ পড়ছে, তখন তিনি তাদেরকে বিদআতি বলে মসজিদ থেকে বের করে দিলেন। অথচ একাকি তাসবীহ, তাহলীল এবং দুরূদ পড়া পূণ্য ও সওয়াবের কাজ।

^{৫৪০} রাদ্দুল মুহতার, প্রাপ্ত অধ্যায়: ৬/৫৭।

২. ডাকার পর যদি কিছু মানুষ কুরআন খতমে না আসে তাহলে তাকে বিভিন্নভাবে তিরস্কার করা হয়। অথচ মুস্তাহাব কাজ ছাড়ার উপর তিরস্কার জায়েয নেই।
৩. অনুপস্থিতদের ব্যাপারে মনে বিদ্বেষ, ঘৃণা, ক্রোধ বদ্ধমূল করা হয়।
৪. কুরআন খতমের আয়োজকরা বেশি লোকের উপস্থিতিতে গর্ব করে।
৫. প্রচলিত কুরআন খতম এত জরুরী মনে করা হয় যে, যদি কোনো মানুষ কুরআন খতম না করায় অথবা তার খতমের আয়োজনে মানুষ কম হয় তবে সে সমালোচনার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়।
৬. পুরো কুরআন খতম জরুরী মনে করা হয়, অথচ শরীয়তে বরকত এবং ছওয়াবের জন্য কোনো পরিমাণ নির্দিষ্ট নেই। কুরআন তেলাওয়াত ছাড়া যিকর আযকার, তাসবীহাত, নফল এবং সাদাকাতে ইত্যাদি অন্যান্য পদ্ধতিতেও এই উদ্দেশ্য অর্জন হয়।
৭. যদি পড়ার জন্য মানুষ কম জমা হয় তখন তার পুরো কুরআন খতমকে নিজের উপর চাপ এবং বিষের ঢোক মনে করে যে কোনভাবে তা গলা থেকে সরানোর চেষ্টা করা হয়। অথচ হাদীসে বর্ণিত হচ্ছে,

(صحيح) اقرؤوا القرآن ما ائتلفت قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه

بخاري: ج: ২: ৭৫৭

অর্থাৎ (ঐ সময় পর্যন্ত কুরআন পড় যতক্ষণ মনে বিরক্তিবোধ না হয় এবং যখন ক্লান্ত হয়ে পড় তখন ছেড়ে দাও)^{৪৯১}

৮. এই অবস্থায় তাজবীদের নিয়ম কানুন, হুর্ফের সিফাতের বিশুদ্ধ আদায়, গুন্নাহ, ইখফা, ইজহার এবং মদসমূহের প্রতি খেয়াল করা ব্যতীত শব্দ ও অক্ষর কেটে প্রাণ পরিত্রাণের চেষ্টা করা হয়।

৯. প্রচলিত কুরআন খতমে এমন লোক আসে যে কুরআন পড়া জানে না।

তখন সে কুরআন হাতে নিয়ে প্রত্যেক লাইনে বিসমিল্লাহ পড়ে অথবা শুধু আঙ্গুল ফিরিয়ে পারা রাখা দেয়। একে আঙ্গুল এবং বিসমিল্লাহ খতম বলা হয়, শরীয়তে যার কোনো প্রমাণ নেই। বরং এতে কুরআনের অবমাননা।

১০. খতমের শেষ পর্যন্ত বসাকে জরুরী মনে করা হয়। তাই কোনো ব্যক্তি নিজের পারা শেষ করে কঠিন প্রয়োজন সত্ত্বেও উঠার সাহস করে না। কেননা এটাকে অত্যন্ত দোষনীয় মনে করা হয়।

১১. কোনো কোনো মানুষের তেলাওয়াতে সেজদার জ্ঞান থাকে না, ফলে সে সেজদার আয়াত পড়ে এবং শোনে তেলাওয়াতে সেজদা না করার কারণে নেকীর পরিবর্তে ওয়াজিব ছাড়ার গোনাহ নিজের মাথায় বহন করে।

১২. কোনো কোনো জায়গায় কুরআন খতমের আয়োজক সবার পক্ষ থেকে চৌদ্দ সাজদা আদায় করে নেয়। এতে পাঠকদের দায়িত্ব

^{৪৯১} সহীহুল বুখারী, অধ্যায়: কুরআনের ফযিলত সমূহ, অনুচ্ছেদ: যতক্ষণ মন চায় ততক্ষণ কুরআন তেলাওয়াত করা। নং:

আদায় হয় না এবং শরীয়ত বিরোধী কাজের কারণে সাজদাকারী গোনাহগার হয়।

১৩. প্রচলিত কুরআন খতমে মিঠাইর ব্যবস্থা করা হয়।

“প্রচলিত নিয়ম শর্তের ন্যায়” মূলনীতির আলোকে এটা পাঠকদের পারিশ্রমিক, আর কুরআন পড়ার পারিশ্রমিকের দাতা, গ্রহিতা উভয় গোনাহগার। তাহলে এখানে নেকীর কী প্রত্যাশা করা যায়? আর যেখানে পাঠকের নিজের সওয়াব হচ্ছে না, সেখানে মৃত ব্যক্তির জন্য তার ঈসাল কিভাবে হতে পারে?

১৪. দাওয়াত বা মিঠাইকে এমন জরুরী করে রাখা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি এর ব্যবস্থা করে না তার উপর অভিশাপ ও তিরস্কারের বুড়ি পড়ে।

১৫. প্রচলিত কুরআন খতমের জন্য তিনদিন, চল্লিশা ইত্যাদি বিশেষ দিন নির্দিষ্ট করা হয়।

আর অনির্দিষ্ট ইবাদতের জন্য নিজের পক্ষ থেকে দিন নির্দিষ্ট করা মাকরুহ, না-জায়েয বরং বিদ'আত।

১৬. জারীর ইবন আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

كُنَّا نَعِدُ الْجَمَاعَةَ إِلَى أَهْلِ الْمَيِّتِ وَصَنَعَهُمُ الطَّعَامَ مِنَ النِّيَاحَةِ

“মৃতব্যক্তির পরিবারে সমবেত হওয়া এবং তারা খাবারের আয়োজন করাকে আমরা ‘নাওহা’^{৫৪২} (বিলাপ) গণ্য করতাম” আর বিলাপ করা হারাম।

^{৫৪২} ‘নাওহা’ বা ‘নিয়াহা’, অর্থাৎ বিলাপ করে মৃত ব্যক্তির উপর ক্রন্দন করা। ইসলাম পূর্ব জাহেলী যুগে কেউ মারা গেলে বিলাপ করে ক্রন্দনের প্রচলন ছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন কর্মকে জাহেলী কর্ম আখ্যা দেন

১৭. প্রচলিত কুরআন খতমে অংশগ্রহণকারী এবং যিনি অংশগ্রহণ করান সবার উদ্দেশ্য থাকে লোক দেখানো। লোক দেখানোর কারণে মানুষের বড় বড় আমল নষ্ট হয়ে যায়। হাদীসে রয়েছে লোক দেখানো আমলকারীর আমল এমন ধ্বংস হয় যেমন আগুন লাকড়ি খেয়ে ফেলে^{৫৪৩} এবং আল্লাহর কাছে এমন আমল প্রত্যাখ্যাত। অতএব যে আমলটি আল্লাহর জন্য করার ছিল, বরকত এবং সওয়াব পৌছা উদ্দেশ্য ছিল, লোকদেখানোর কারণে সমস্ত আমলে আগুন লেগে গেছে। সওয়াব কি মিলবে? উল্টো লোক দেখানোর আযাব মাথার উপর আসলো। এই সমস্ত খারাবী শরীয়ত এবং সুন্নাহ থেকে চেহারা ফিরিয়ে নেওয়ার ফলাফল। এর বিপরীত যদি শরীয়তের পদ্ধতি অবলম্বন করা হত তাহলে আরাম হত। এত কষ্ট উঠাতে হত না। ইখলাসের সহিত ও আল্লাহর জন্য হত। যার বদলে পাঠক সওয়াব পেত। মৃত ব্যক্তির কাছেও সওয়াব পৌছত। লোক দেখানো মারাত্মক গোনাহও মাথায় নিতে হত না।

ঈসালে সওয়াবে সঠিক পদ্ধতি

ঈসালে সওয়াবের সঠিক পদ্ধতি এই যে, মৌখিক এবং শারীরিক ইবাদতের মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ ঘরে একাকীভাবে যে ইবাদত

এবং তা হারাম ঘোষণা করেন। দেখুন, বুখারী, ‘মৃত ব্যক্তির উপর বিলাপ মাকরুহ অধ্যায়’। সহীহ মুসলিম, নিয়াহার উপর কঠোরতা অধ্যায়। বুখারীর একাধিক অধ্যায়ে এ বিষয় সংক্রান্ত হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

^{৫৪৩} লোকদেখানো আমলকে শরয়ী পরিভাষায় ‘রিয়া’ বলা হয়। কুরআন হাদীস উভয়ের মাধ্যমে ‘রিয়া’ হারাম প্রমাণিত। হাদীসে ‘রিয়া’কে শিরকে আসগর বা ছোট শিরক গণ্য করা হয়েছে। ‘রিয়া’ হারাম বা কবীরা গোনাহের অন্যতম এতে কোনো সন্দেহ নেই। তবে লেখক এখানে হাদীসে রয়েছে বলে যে কথা উল্লেখ করেছেন, অর্থাৎ “লোক দেখানো আমলকারীর আমল এমন ধ্বংস হয় যেমন আগুন লাকড়ি খেয়ে ফেলে” এই মর্মের কোনো হাদীস রয়েছে বলে অবগত হতে পারিনি। (সংকলক)

করে, নফল নামায পড়ে, নফল রোজা রাখে, তাসবীহ আদায় করে, তেলাওয়াত করে, নফল হজ্ব বা উমরা করে, তাওয়াফ করে এগুলোতে শুধু এই নিয়্যাত করে নিবে যে, এর সওয়াবটুকু আমাদের অমুক দোস্তের কাছে পৌঁছুক। তা পৌঁছে যাবে। এটাই হচ্ছে ঈসালে সওয়াব। যে সওয়াবটুকু তোমার নিজের পাবার কথা তা তোমার জন্য অর্জিত হয়ে যাবে এবং যে সমস্ত লোকদের নিয়্যাত করা হয়েছে তারাও এর পুরো সওয়াব পেয়ে যাবে।^{৫৪৪} আর্থিক সাদাকা খায়রাতের সবচেয়ে উত্তম পদ্ধতি হলো, নিজের সামর্থানুযায়ী নগদ অর্থ কোনো কল্যাণমূলক কাজে লাগিয়ে দিবে অথবা কোনো মিসকিনকে দিয়ে দিবে। এই পদ্ধতি এ জন্য উত্তম যে, এতে মিসকিন নিজের প্রয়োজন পূরা করতে পারে। যদি আজ তার কোনো প্রয়োজন না হয় তবে কালকের জন্য রাখতে পারে। তা

^{৫৪৪} আহলুস-সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের আলেমগণ ঈসালে ছওয়াবের বেলায় দুই ভাগে বিভক্ত। একদল কুরআনের আয়াত, "وَأَنْ لِّئِيسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَقَى" অর্থ: আর মানুষের জন্য তার চেষ্টা ব্যতীত কোনো কিছু নেই, (সূরা নাজম:৩৯) এই মর্মের আয়াত এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস,

"إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ وَعِلْمٌ يَنْتَفِعُ بِهِ وَوَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ"

“মানুষ যখন মারা যায় তখন তাঁর তিনটি আমল ব্যতীত সব আমল বন্ধ হয়ে যায়। সাদাকায় জারিয়াহ, যে ইলম দ্বারা মানুষ উপকৃত হয় এবং নেক সন্তান যে তার জন্য দু'আ করে।” (তিরমিযী, হাদীস সহীহ, ওয়াকুফ অনুচ্ছেদ, নং:১৩৭৬) এই হাদীসের আলোকে তারা বলেন: হাদীসে উল্লেখিত তিন বস্তু ব্যতীত অন্য কিছুই ঈসাল হয় না। কেননা; হাদীসে তিন বস্তু ছাড়া সব আমল বন্ধ হয়ে যাওয়ার কথা এসেছে। আর এ তিনটি মূলত তার নিজের চেষ্টার ফসল। সুতরাং এই হাদীস আর আয়াতে কোনো বিরোধ নেই। তবে সাদাকা যেহেতু শারীরিক ইবাদত নয়, জীবিত ব্যক্তিকে তা দেওয়া যায়, তার পক্ষ থেকে অন্যকে দেওয়া যায়, মৃত্যুর পরও তার পক্ষ থেকে দেওয়া যাবে। কিন্তু শারীরিক ইবাদত কাউকে দেওয়া যায় না তাই তার ঈসাল ও নেই। তবে শারীরিক কিছু ইবাদত যার ঈসাল হাদীস দ্বারা প্রমাণিত সেগুলো মানসুস হওয়ার কারণে তা এই কায়দা থেকে মুসতাসনা বা ব্যতিক্রম থাকবে। এই দল আলেমদের মতে কুরআন তেলাওয়াত যেহেতু একটি শারীরিক ইবাদত তাই তার ঈসালই হবে না, কেননা এব্যাপারে কোনো নস নেই। আর ইবাদতে বিষয় গাইরে মা'কুল, তাই আমরা তাকে অন্য ইবাদতের উপর ক্রিয়াস করতে পারি না। আহলুস-সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের অপরদল মনে করেন, যে কোনো ইবাদতের ঈসাল হতে পারে। আমাদের লেখক এমতের প্রবক্তা হিসেবে কুরআন তেলাওয়াতের ঈসালের সঠিক পদ্ধতির কথা উল্লেখ করেছেন।

ছাড়া এই ব্যবস্থাটি লোক দেখানো হতে মুক্ত। হাদীসে গোপনে সাদাকাকারীর এই ফযিলত বর্ণিত হয়েছে যে, এমন ব্যক্তিকে আল্লাহ কিয়ামত দিবসে নিজের রহমতের ছায়ায় জায়গা দিবেন, যখন আর কোনো ছায়া থাকবে না এবং গরমের কারণে মানুষ ঘামে ডুবে যাবে। ফযিলতের দিক থেকে দ্বিতীয় শ্রেণীর সাদাকা হচ্ছে, মিসকিনের প্রয়োজন অনুসারে তাকে সাদাকা করবে। অর্থাৎ প্রয়োজন দেখে তা পুরা করবে। ঘর ও দোকানের বরকতের জন্যও মালিক নিজে উপরোক্ত ব্যবস্থাগুলো অবলম্বন করবে।

والله سبحانه وتعالى أعلم

১৪ রবিউল আওয়াল ১৪১৭ হিজরী।

পাঠক, এই হলো ওনার বক্তব্য। আমরা লক্ষ্য করেছি যে, ওনার লেখায় অসংখ্য কিতাব ও ফকীহের বক্তব্য ও তথ্য রয়েছে। এই লেখা পড়ার পর আশা করি সত্যসন্ধানী আলেমের জন্য বিষয়টি বুঝতে কোনো সমস্যা পেতে হবে না। একমাত্র পেটপূজারী আলেম ছাড়া কেউই হিলার বাহানা তালাশ করে উনার লিখার বিরুদ্ধে কলম ধরবেন না। শরীয়তে বৈধ বা হালাল থাকা এক কথা, আর বৈধ বানানো আরেক কথা। কুরআন হাদীসে কোনো জিনিসের বৈধতা থাকা এক কথা, কুরআন হাদীস দিয়ে বৈধ বানানো আরেক কথা। তবে প্রথমটি আহলুস-সুন্নাহ ওয়াল জামাতের আলেমদের গুণ। আর দ্বিতীয়টি গুমরাহ পেটপূজারী আলেমদের গুণ। বিষয়টি সহজে বোঝার জন্য একটি উপমা পেশ করছি। যেমন ধরুন, রাসূল আলিমুল গাইব নন বিষয়টি কুরআন ও হাদীসে দ্ব্যর্থহীনভাবে উল্লেখ

করা হয়েছে। যিনি বলছেন রাসূল আলিমুল গাইব নন, তার দলীল কুরআন ও হাদীসের একাধিক জায়গায় রয়েছে। পক্ষান্তরে যে আলেম দাবী করছেন রাসূল আলিমুল গাইব, তিনি কুরআন হাদীস থেকেই তার মতের স্বপক্ষে দলীল দিচ্ছেন। তবে তার দাবীর পক্ষে কোনো দলীল কুরআন বা হাদীসে নেই। তিনি কিছু দ্ব্যর্থবোধক আয়াত ও হাদীসকে তার মতের পক্ষে দলীল বানাচ্ছেন। এই দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যের আলেম ছাড়া কেউই প্রচলিত খতমে কুরআনের স্বপক্ষে ওকালতি করতে পারেন না, কেননা এসবের অস্তিত্ব কুরআন, হাদীস, সাহাবা জীবনে নেই, এমনকি খাইরুল্ল কুরুন তথা সোনালী প্রজন্ম (রাসূল, সাহাবা ও তাবেঈঈ) এর কোনো যুগেও এর অস্তিত্ব খোঁজে পাবেন না। প্রচলিত খতমের অস্তিত্ব খাইরুল্ল কুরুনে না থাকায় বিষয়টি বিদআত হওয়ার সাথে সাথে লেখক আরো অনেক খারাবী তুলে ধরেছেন, যা ওনার অভিজ্ঞতার আলোকে। দীর্ঘ অভিজ্ঞতার আলোকে উল্লেখিত কারণ ছাড়াও আরো যে সমস্ত খারাবী রয়েছে তার কয়েকটি নিম্নে তুলে ধরছি। এই অভিজ্ঞতা সবার নাও থাকতে পারে। আমি অধমের কাছে যে বাস্তব অভিজ্ঞতা হয়েছে তার কয়েকটি উল্লেখ করব। পরস্পর হিংসা বিদ্বেষ সৃষ্টি। মনের হিংসার জ্বালা প্রকাশ্যে রূপ নিতে অনেকের বেলায় দেখা গেছে। যেমন, একজন কোথাও দশজন নিয়ে যাওয়ার কথা। বাস্তবতা হলো, দশজন হলে এক প্রতিষ্ঠানের সবাইকে খতমের তালিকায় রাখা সম্ভব নয়। এ থেকেই হিংসা ও সমালোচনার সুত্রপাত যা খতমের দু একদিন পর্যন্ত বা আরো বেশি চলতে থাকে।

অন্যের মনে জ্বালা সৃষ্টির জন্য অযথা ঠাট্টাস্বরূপ খতমের কথা বলা। অথচ হাদীসের দৃষ্টিতে মিথ্যা বলা কাজে হোক বা ঠাট্টায় হোক সর্বাবস্থায় হারাম। সাধারণ নিমণ শ্রেণীর উস্তাদ নয় বরং অনেক শ্রদ্ধাভাজন আলেম যারা দাওরায়ে হাদীসে পড়ান তাদের অনেকের কাছে থেকেও এ সব আচরণ পাওয়া যায়, যা অত্যন্ত লজ্জাজনক। মিথ্যার আশ্রয় নেওয়া। যেমন অনেক সময় খতম না করেই খতমের আয়োজককে মিথ্যা বলা। কুরআনের সাথে ব্যবসায়িক পণ্যের মত লেনদেনের আচরণ করা এবং কুরআন নিয়ে বেয়াদবীমূলক কথা বলা। যেমন, অহরহ একথা বলতে শুনা গেছে, সিলেটি ভাষায় ‘যেলা পয়সা ওলা খতম’ অর্থাৎ টাকা হিসেবে খতমের মান নির্ণয় করা হয়। অনেককে আগেই ‘কয়টেকি খতম’ অর্থাৎ কত টাকার খতম, একথা বলতে শুনা যায়। এভাবে টাকার উপর কুরআন পড়ার মান নির্ণয় করা কুরআনের সাথে কতটুকু বেয়াদবী? তা পাঠক নিজেই বলুন। অসতর্কতায় আমার মুখ থেকেও দু-একদিন এমন কথা বের হয়েছে। আল্লাহর কাছে তওবা করেছি। আবারো করছি, তিনি যেন আমাকে মাফ করেন। কুরআন সামনে নিয়ে হাসি, তামাশা, গল্পগুজবের মধ্য দিয়ে তেলাওয়াত করা। আয়োজক সামনে থাকলে তার ভয়ে একটু মনোযোগ দিয়ে পড়া। এ থেকে স্পষ্ট যে, টাকাই প্রচলিত খতমের মূল টার্গেট। টাকাই যে মূল টার্গেট তা সবার মনে জানা রয়েছে। সবার আচরণে একথা স্পষ্ট। মূল টার্গেট টাকা থাকাবস্থায় আল্লাহর কাছে এসব খতমের কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই, আলেম বলতেই একথা জানেন। একথা জানা থাকা সত্ত্বেও নিজের

পেট পালার তাগিদে দ্বীন সম্পর্কে অজ্ঞ ব্যক্তির অজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে তাকে ধোঁকা দেয়া। তাকে রাসূলের শিক্ষার আদেশ না দিয়ে খতমের কথা বলা, অথবা নিজ থেকে না বললেও তাকে তার অজ্ঞতার উপর রাখা। সঠিক সুন্নাহের দিশা না দেওয়া। অথচ সঠিক ইলম প্রকাশের সুযোগ থাকা সত্ত্বে তা গোপন রাখা অবৈধ। হাদীসে এর উপর ধমকি এসেছে। এছাড়া সমাজিকভাবে আরো অনেক বিষয় রয়েছে যা আলেমদের জন্য লজ্জাজনক ও তাদের মান সম্মানে আঘাত, এই খতমকে কেন্দ্র করে হয়ে থাকে। আহসানুল ফাতওয়ার লিখাটি অনুবাদ করার পর এ বিষয়ে নিজ থেকে কিছু লিখার প্রয়োজন ছিল না। যা নিজেই পূর্বে উল্লেখ করেছি, তথাপি দু-একটি কথা না লিখে পারলাম না। আল্লাহ প্রথমে আমাকে এবং আমাদের সবাইকে হেদায়াতের উপর পরিচালিত করুন। সহীহ সুন্নাহ মোতাবেক জীবন পরিচালনার তওফীক দান করুন। আমীন।

খতমে ইউনুস

ইউনুস আলাইহিস সালাম আল্লাহর প্রেরিত একজন নবী। আল্লাহর নির্দেশের পূর্বে তিনি তাঁর গোত্র থেকে হিজরত করে চলে যান। আল্লাহর কাছে তাঁর এ কাজ অপছন্দনীয় হলে ইউনুস আলাইহিস সালামকে মাছের পেটে যেতে হয়। যার বিবরণ কুরআন পাকে আল্লাহ উল্লেখ করেছেন।

কমবেশ আমাদের সবারই ঘটনাটি জানা আছে। বিপদে পড়ে যে কেউ নিজের গোনাহের স্বীকারোক্তি বা তওবা করে আন্তরিকভাবে আল্লাহকে ডাকলে আল্লাহ তাঁর ডাক শুনেন। ইউনুস আলাইহিস

সালামের মাছের পেটে পড়ার বিপদ থেকে উদ্ধারের এই কাহিনিটি থেকে আল্লাহ আমাদেরকে এই খবরটি দেন। উদ্ধারের কাহিনিটি আল্লাহ যেভাবে উল্লেখ করেন তাতে বিষয়টি একেবারে স্পষ্ট। যেমন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে লক্ষ্য করে আল্লাহ তা‘আলা কয়েকজন নবীর কথা স্মরণ করিয়ে দিতে গিয়ে বলেন,

وَدَا الثُّونَ إِذْ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ (سورة الأنبياء: ٨٧-٨٨)

“আর আপনি মাছওয়ালার কথা স্মরণ করুন, তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে চলে গিয়েছিলেন, অতঃপর মনে করেছিলেন যে, আমি তাকে আটকাবো না। অতঃপর তিনি অন্ধকারের মধ্যে আহ্বান করে বললেন, তুমি ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই। তুমি দোষমুক্ত, নিশ্চয় আমি গোনাহগার। অতঃপর আমি তার আহ্বানে সাড়া দিলাম। এবং তাকে দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি দিলাম। আমি এমনিভাবে মুমিনদের মুক্তি দিয়ে থাকি।”^{৪৫} এই ঘটনা থেকে আমরা কী শিক্ষা পাই? একটু চিন্তা করলেই যে কেউ বিষয়টি উপলব্ধি করতে পারবে। অর্থাৎ যে কোনো বিপদে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তনই একজন মুমিনের করণীয়। সকাতরে আল্লাহকে ডাকলে তিনি তাঁর ডাকে অবশ্যই সাড়া দিবেন। এবার আমরা দেখি হাদীসে এ দ্বেতার ব্যাপারে আমাদের জন্য কী দিকনির্দেশনা রয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ

^{৪৫} সূরা আশ্বিয়া, আয়াত: ৮৭-৮৮।

"دعوة ذي النون إذا دعا وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له".
سنن الترمذي، كتاب الدعوات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب 82،
رقم: 3505، مسند احمد، مسند سعد بن أبي وقاص، رقم: 1462)

“মাছওয়ালা যখন মাছের পেটে থাকাবস্থায় দো‘আ করেছিলেন তখন তার দো‘আ ছিল,

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ

(তুমি ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই। তুমি দোষমুক্ত, নিশ্চয় আমি গোনাহগার) অতএব যখনই কোনো মুসলিম ব্যক্তি কোনো বিষয়ে এর মাধ্যমে দো‘আ করেছে আল্লাহ তার ডাকে সাড়া দিয়েছেন।”^{৫৪৬}
কুরআন হাদীসের শিক্ষা থেকে যে বিষয়টি উপলব্ধি হয় তা অত্যন্ত স্পষ্ট। সাধারণ ব্যক্তিও চিন্তা করলে বিষয়টি বুঝতে পারবেন। কুরআন হাদীসের শিক্ষা থেকে আমরা বুঝলাম, যে কোনো ব্যক্তি যে কোনো বিপদে পড়লে এই দো‘আটি করতে পারে। এই দো‘আ করলে আল্লাহ তাকে বিপদ মুক্ত করবেন বলে আমরা পূর্ণ আশাবাদী হতে পারি। কিন্তু কে বা কারা প্রথমে কুরআন হাদীসের এই শিক্ষার পরিবর্তন ঘটিয়ে খতমে ইউনুস নামে খতম আবিষ্কার করেছে তার ইতিহাস আমাদের কাছে না থাকলেও অভিজ্ঞতার নামে আমরা কুরআন হাদীসের শিক্ষার বিপরীত চলছি। সাধারণ মানুষের অজ্ঞতাকে পূঁজি করে আমাদের স্বার্থ উদ্ধার করার জন্য রাসূল

^{৫৪৬} তিরমিযী, সুনান, হাদীস সহীহ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দু‘আ অধ্যায়, ৮২ নং অনুচ্ছেদ, হাদীস নং: ৩৫০৫, আলবানী, তিরমিযির সহীহ ও দয়ীফ, ৮/৫, মুসনাদে আহমদ, সা‘দ ইবন আবী ওয়াক্কাসের হাদীস, নং: ১৪৬২।

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষার প্রচার না করা কতটুকু আমানতদারী তা প্রশ্নযোগ্য। বিবেকের কাছে কি আমরা কখনো প্রশ্নের সম্মুখীন হই না? না কি পেটের তাগিদে আমাদের বিবেকই নষ্ট হয়ে গেছে? এই খতমের বিবরণ যেভাবে দেওয়া হয়েছে:

“কঠিন বিপদ মামলা-মোকাদ্দমা ও সঙ্কটের সময় এই দো‘আ সোয়া লক্ষ বার পড়িবে। প্রত্যেক একশতবার পড়া হইলে শরীর বা মুখে পানি দিবে। পাক অবস্থায় পাক বিছানায় বসিয়া কেবলামুখী হইয়া পড়িবে। ৩,৭ কিংবা ৪০ দিনে শেষ করিবে। মাছের পেটের ভিতর অন্ধকারের এই দোয়া জন্মলাভ করিয়াছে বলিয়া অন্ধকারে বসিয়া পড়িলে আরও সত্ত্বর ফল লাভ হয়। খতম শেষ হইলে একবার এই আয়াত পড়িবেঃ

{فَاسْتَجِبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنَجِّي الْمُؤْمِنِينَ (الانبیاء: ৮৮)}

উচ্চারণঃ ফাসতাজাবনা লাহু ওয়া নাজ্জাইনাহু মিনাল গাম্মি ওয়া কাযালিকা নুনজিল মুমিনীন। (১৭ পারা, সূরা আন্বিয়া, আয়াত:৮৮)

অর্থঃ “তৎপর আমি তাঁহার (হযরত ইউনুস নবীর) দোয়া কবুল করিয়াছিলাম এবং তাঁহাকে কঠিন বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়াছিলাম এবং এইরূপে আমি বিশ্বাসীগণকে উদ্ধার করিয়া থাকি।” এই তাদবীরকে খতমে ইউনুস বলা হয়। ইহা প্রত্যেক ক্ষেত্রে অত্যন্ত কার্যকরী ও অব্যর্থ ফলপদ বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।”^{৫৪৭} এখানে আমরা কুরআন হাদীসের শিক্ষার সাথে দুই ধরনের বৈপরীত্য দেখতে পাই।

^{৫৪৭} নেয়ামুল কুরআন, মৌলবী শামছুল হুদা, রহমানিয়া লাইব্রেরী, একাদশ সংস্করণ, পৃষ্ঠা: ১২০।

এক: নির্দিষ্ট সংখ্যার ব্যাপারটি। যা কুরআন হাদীসের শিক্ষার বিপরীত।

দুই: বিপদে যিনি পড়েন তিনি আল্লাহর কাছে প্রত্যাবর্তন করে দো‘আটি না পড়ে অন্যকে দিয়ে পড়ানো। যার কোনো শিক্ষা কুরআন বা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন থেকে আমরা পাই না।

সবচেয়ে হাসির ব্যাপার হলো, বিপদে পড়লাম আমি, আর আরেকজনকে এনে তাকে দিয়ে দো‘আ পড়াচ্ছি, সে তার দো‘আ বলছে ‘নিশ্চয় আমি গোনাহগার’ আমি বিপদে পড়ে অন্যকে গোনাহগার বলানোর মাধ্যমে আমার নিজের কী লাভ?

একটু ভেবে দেখলাম না। একদিন একজন সাধারণ মানুষ আমাকে কথটি বলে হাসিয়ে দিয়েছেন। আলেম না হয়েও তার এই উপলব্ধি দেখে অত্যন্ত আনন্দিত হলাম এবং নিজেকে ধিক্কার দিলাম এই বলে যে, বুঝেও কেন এতে জড়িত রয়েছি। আল্লাহ আমাকে মাফ করুন। এভাবে এসব খতমের মাধ্যমে সমাজে ‘পুরোহিততন্ত্র’ চালু হয়েছে। ইসলামের নির্দেশনা মোতাবেক বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি নিজে সুন্নাত সম্মত দো‘আ পড়ে মনের আবেগ নিয়ে আল্লাহর কাছে কাঁদবে এবং বিপদমুক্তি প্রার্থনা করবে। নেককার মানুষের কাছে দো‘আ চাওয়া যাবে। তিনি তার মত করে তার জন্য দো‘আ করবেন।

অভিজ্ঞতার দোহাই দিয়ে বৈধ করা

এসব খতম বৈধ করার স্বার্থে অভিজ্ঞতার কথা বলে ফতোয়া চালিয়ে দিতে দেখা যায়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষার

বিপরীত কার অভিজ্ঞতা বা কার কথার এত মূল্যায়ন যা রাসূলের শিক্ষাকেও হার মানায়? আর যিনি এ নির্দিষ্ট সংখ্যার অভিজ্ঞতার কথা বললেন, তিনি নিজে পড়ার কথা বললেন, না কি অন্যকে দিয়ে পড়ানোর? যাই হোক এর কোনটিই যেহেতু রাসূলের শিক্ষা নয় তাই আমরা এ সবার পিছনে পড়ার প্রয়োজন বোধ করি না। এ সব কথাবার্তা কখনোই গ্রহণযোগ্য নয়। এতে করে শরীয়ত পরিবর্তন হয় বলে আমরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। একটি সহজ উদাহরণ দিলে বিষয়টি বুঝতে সহজ হবে বলে আশা করছি। যেমন ধরুন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসের আলোকে আমরা জানি, সাদাকা বা দানের মাধ্যমে বালা মুসিবত দূর হয়। এবার মনে করুন কোনো ব্যক্তি কোনো এক তারিখের নির্দিষ্ট সময়ে, যেমন সে শাওয়াল মাসের ৬ তারিখ শনিবার বিকাল ৫টার সময় ১০ টাকা দান করল। আল্লাহর অনুগ্রহে তার একটি মুসিবত দূর হলো। আমরা বলতে পারি এই সাদাকার ওসীলায় হয়ত আল্লাহ তাঁর মুসিবত দূর করেছেন। কেননা সাদাকায় মুসিবত দূর হয় বলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস থেকে আমরা পেয়েছি। এমন কয়েকবার হলে সে বলতে পারে, অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা গেছে সাদাকায় মুসিবত দূর হয়। কিন্তু এ দানকারী লোকটি যদি বলে, অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা গেছে ১০ টাকা দান করলে মুসিবত দূর হয় তাই সবাই দশ টাকা দান করাকে আমল বানান। আরেকটু এগিয়ে যদি বলে, শাওয়াল মাসে দশ টাকা দান করলে মুসিবত দূর হয়, আরো বাড়িয়ে যেমন, শাওয়াল মাসের ৬

তারিখ দশ টাকা দান করলে মুসিবত দূর হয়, আরেকটু এগিয়ে যেমন, শাওয়াল মাসের ৬ তারিখ শনিবার বিকাল ৫টার সময় ১০ টাকা দান করলে মুসিবত দূর হয়। তাই সবাই এভাবে আমল করুন। তাঁর এই কথাগুলো একেবারে মুখ ছাড়া কেউ গ্রহণ করবেন বলে জানি না। যদিও সে তার আমলের ফলাফল এভাবে পেয়েছে। কিন্তু তার এই অনুভূতি রাসূলের শিক্ষা বিবর্জিত। এতে শরীয়তের মূল শিক্ষা পরিবর্তন হয়, তাই তার অনুভূতি কখনো গ্রহণ করা যায় না বা অভিজ্ঞতার নাম দিয়ে এ ধরনের আমল শুরু করা যায় না। এবার এর আলোকে আমরা ‘খতমে ইউনুস’ নামের খতমের কথাটি চিন্তা করি। আশাকরি এসবের অসারতা বুঝতে আর কারো কোনো দ্বিধা থাকবে না। এতো হলো খতমের নামে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষার পরিবর্তন। আর এই পরিবর্তন থেকেই খতমকে কেন্দ্র করে অন্যান্য খারাবী ও নাজায়েযের সুচনা। যে কোনো সুন্নাতকেই তার স্বাভাবিক অবস্থা তথা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আমলের রূপরেখা থেকে সরিয়ে দিলে সুন্নাত নিমজ্জিত হওয়ার সাথে সাথে আরো অনেক নাজায়েয যোগ হয়। যার অনেকটা আমরা ইতোপূর্বে খতমে কুরআনের শেষে উল্লেখ করেছি। অধিক সংখ্যক পড়া নিয়ে মিথ্যার আশ্রয় নেওয়া, খতম পাঠকারী হুজুর ও খতমের আয়োজকের মাঝে সন্দেহ, মন কষাকষির সৃষ্টি হওয়া, টাকার পরিমাণ হিসেবে খতমের সংখ্যায় কমবেশ করা, আলেমদের সাথে জাহেলের বেয়াদবীমূলক আচরণ ইত্যাদি। টাকার স্বার্থে বুঝে না বোঝার ভান করে অনেক শ্রদ্ধাভাজন

আলেমকে তাঁর সম্মান বা নিজ অবস্থানের অনেক নিচে নামতে দেখা যায়। আল্লাহ আমাদের সবাইকে এ সব থেকে পরিত্রাণ দান করুন এবং হুবহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরীক্কার উপর চলার তওফিক দান করুন।

খতমে বুখারী

মুমিন ব্যক্তির জীবনে হাদীসের গুরুত্ব অপরিসীম। হাদীস ছাড়া মুমিন তাঁর ইসলামী জীবন কল্পনা করতে পারে না। কুরআন হাদীস উভয় মিলেই তাঁর জীবন পরিচালিত। তাই কুরআনের মতই হাদীস শিক্ষা করা, হাদীস চর্চা করা মুমিনের জন্য অপরিহার্য। প্রতিটি মুমিনের জন্য জ্ঞান শিক্ষা করা ফরয। আর কুরআন ও হাদীসই হচ্ছে মুসলিমের মূল জ্ঞান ভাণ্ডার। এই হাদীস শিক্ষা, চর্চা, মুখস্থ রাখা, সংরক্ষণ করা ও প্রচার প্রসারে সাহায্যে কেবলম থেকে শুরু করে উম্মতের একদল আলেম তাদের জীবনের পুরো অংশটিই ব্যয় করে দিয়েছেন। যাদের মেহনত, শ্রমের বদৌলতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস সঠিকভাবে আমাদের পর্যন্ত পৌঁছেছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

« نضر الله امرأ سمع منا حديثاً فحفظه حتى يبلغه فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه ».

(سنن أبي داود، كتاب العلم، باب فضل نشر العلم، رقم: ৩৬৬২، سنن الترمذي، كتاب العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب الحث على تبليغ السماع، رقم: ৩৬৫৬)

“আল্লাহ তাঁর চেহারাকে উজ্জল করুন যে আমার কাছ থেকে কোনো হাদীস শুনল, অতঃপর সে তা সংরক্ষণ করল, এমনকি তা অন্যের কাছে পৌঁছাল। অনেক ফিকহ (হাদীস) এর ধারক এমন রয়েছে, সে যার কাছে পৌঁছায় সেই ব্যক্তি তাঁর চেয়ে অধিক ফকীহ। আর অনেক ফিকহের ধারক নিজে ফকীহ নয়।”^{৫৪৮}

হাদীসটির মর্ম হচ্ছে, অনেক সময় এমনও হয় যে, যার কাছে পৌঁছানো হয় সে হাদীসের মর্ম বা ভাব যিনি পৌঁছিয়েছেন তার চেয়ে বেশি বুঝেন। আবার এমনও অনেক রয়েছেন যিনি শুধুমাত্র হাদীসটি মুখস্থ রাখতে পেরেছেন কিন্তু তার তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারেন নি, হতে পারে যার কাছে পৌঁছাবেন তিনি এর তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারবেন, তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীসকে বেশি বেশি পৌঁছানো ও প্রচারের দিকে উৎসাহিত করেছেন। উলামায়ে কেরামের এই দল উক্ত হাদীসের পুরোপুরি হক্ক আদায় করার চেষ্টা করেছেন। এদিকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় তাঁর নামে মিথ্যা বানিয়ে বলার দু একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা পাওয়া গেলেও সাধারণত কেউই সে সময় তাঁর নামে মিথ্যা কথা বলার সাহস পেত না। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর মিথ্যা বানিয়ে বলা শুরু হয়। মুনাফেক, ফাসেক, স্বার্থান্বেষী তাদের উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য রাসূলের নামে মিথ্যা বানিয়ে বলত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন বলে সরলমনা মুসলিমদের ধোকা

^{৫৪৮} আবু দাউদ, সুনান, ইলম অধ্যায়, ইলম প্রচারের মর্যাদা পরিচ্ছেদ, নং: ৩৬৬২, তিরমিযী, সুনান, অধ্যায়: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত ইলম, পরিচ্ছেদ: শ্রবণকৃত প্রচারের উৎসাহ, নং: ৩৬৫৬, হাদীস সহীহ।

দেওয়া সহজ ছিল। কিন্তু হাদীস গ্রহণে সাহাবিদের সতর্কতা ও যাচাইয়ের কারণে তা তাদের মধ্যে খুব প্রসার লাভ করতে পারে নি। প্রখ্যাত তাবিয়ী মুজাহিদ (রহঃ)^{৫৪৯} বলেনঃ

"جاء بشير العدوى إلى ابن عباس فجعل يحدث ويقول قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فجعل ابن عباس لا يأذن لحديثه ولا ينظر إليه فقال يا ابن عباس ما لي لا أراك تسمع لحديثي أحدثك عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولا تسمع. فقال ابن عباس إنا كنا مرة إذا سمعنا رجلاً يقول قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ابتدرته أبصارنا وأصغينا إليه بأذاننا فلما ركب الناس الصعب والذلول لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف". (صحيح مسلم، مقدمة، باب النهي عن الرواية عن الضعفاء، ১-১০)

“(তাবিয়ী) বুশাইর আল-আদাবী ইবনে আব্বাসের (রাঃ) কাছে আগমন করেন এবং হাদীস বলতে শুরু করেন। তিনি বলতে থাকেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। কিন্তু ইবনে আব্বাস (রাঃ) তার দিকে কর্ণপাত করলেন না। তখন বুশাইর বলেন: হে ইবনু আব্বাস, আমার কি হলো! আমি আপনাকে আমার হাদীস শুনতে দেখছি না? আমি আপনার কাছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাদীস বর্ণনা করছি, অথচ আপনি কর্ণপাত করছেন না!?

^{৫৪৯} বিশিষ্ট মুফাসসির তাবিয়ী মুজাহিদ ইবন জাবর আবুল হাজ্জাজ মক্কী, ২১-১০৪ হিজরী। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে তাফসীর শিক্ষা লাভ করতেন। (আল-আ'লাম: ৫/২৭৮)

তখন ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন: এক সময় ছিল যখন আমরা যদি কাউকে বলতে শুনতাম: ‘রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন’, তখনই আমাদের দৃষ্টিগুলো তাদের দিকে আবদ্ধ হয়ে যেত এবং আমরা পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে তাঁর প্রতি কর্ণপাত করতাম। কিন্তু যখন মানুষ খানাখন্দক ভালমন্দ সব পথেই চলে গেল তখন থেকে আমরা আর শুধুমাত্র সুপরিচিত ও পরিজ্ঞাত বিষয় ব্যতীত মানুষদের থেকে কোনো কিছু গ্রহণ করি না।”^{৫৫০}

মুসলিম উম্মাহর ভিতরে মিথ্যাবাদী হাদীস বর্ণনাকারীর উদ্ভব হবে বলে নবী আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতকে এ ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক করেন। তার থেকে কিছু শুনেই যাচাই ছাড়া নির্বিচারে গ্রহণ করা, বর্ণনা করা থেকে উম্মতকে সর্বোচ্চ সতর্ক ও সাবধান করে দেন। মিথ্যা বা সন্দেহযুক্ত হাদীস বর্ণনা করতে নিষেধ আরোপ করেন। আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

« سَيَكُونُ فِي آخِرِ أُمَّتِي أَنْاسٌ يُحَدِّثُونَكُمْ مَا لَمْ تَسْمَعُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ
فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ » (صحيح مسلم، المرجع السابق)

“শেষ যুগে আমার উম্মতের কিছু মানুষ তোমাদেরকে এমন সব হাদীস বলবে যা তোমরা বা তোমাদের পিতামহগণ কখনো শুনে নি। খবরদার! তোমরা তাদের থেকে সাবধান থাকবে, তাদের থেকে

^{৫৫০} সহীহ মুসলিম, মুকাদ্দিমাহ, দুর্বলদের থেকে বর্ণনা গ্রহণ করা নিষেধ অনুচ্ছেদ, ১/১০।

দূরে থাকবে।”^{৫৫১} আবু হুরাইরা (রা.) থেকে আরেকটি হাদীসে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

« كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع »

“একজন মানুষের মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য এতটুকু যথেষ্ট যে, সে যা শুনে তাই বর্ণনা করবে।”^{৫৫২}

এভাবে অগণিত হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার থেকে হাদীস গ্রহণের ক্ষেত্রে উম্মতকে সর্বোচ্চ সতর্ক করেছেন। একদিকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সতর্কবাণী, অপরদিকে জালিয়াতদের জালিয়াতী উম্মতের এই শ্রেষ্ঠ জাতি উলামাদল তথা মুহাদ্দিসীনের শ্রমকে কয়েক গুণ বাড়িয়ে দেয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামে বর্ণিত অগণিত হাদীসের মধ্য হতে প্রকৃত হাদীসটি খোঁজে বের করতে তাদেরকে অনেক শ্রম দিতে হয়েছে। হাদীস মূলত কুরআনের ব্যাখ্যা বা প্রজ্ঞা হিসেবে কুরআনের মতই তার হেফাযত করতে আল্লাহ তা‘আলা এ ধরনের আলেমের এক ঝাঁক তৈরী করে দেন। যারা তাদের জীবনের সিংহভাগই হাদীস চর্চার পিছনে ব্যয় করে রাসূলের প্রকৃত বাণীটি উম্মতের হাতে তুলে দিতে সক্ষম হন। আর একেই আমরা সহীহ হাদীস বা বিশুদ্ধ হাদীস বলে জানি। উলামায়ে উম্মতের এই শ্রেণীর অন্যতম ছিলেন ইমাম বুখারী (রাহ.)।

^{৫৫১} সহীহ মুসলিম, প্রাগুক্ত।

^{৫৫২} সহীহ মুসলিম, মুকাদ্দিমাহ, যা কিছু শুনে তার সব বর্ণনা থেকে নিষেধাজ্ঞা অনুচ্ছেদ, ১/৮।

আরব রীতি অনুযায়ী বংশধারা সহ তার পুরো নাম হলো, মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল ইবন ইবরাহীম ইবন মুগীরাহ ইবন বারদিযবাহ। তার মূল নাম মুহাম্মদ। তিনি ১৯৪ হিজরীর শাওয়াল মাসের ১৩ তারিখ রোজ শুক্রবার (৮১০ খ্রিস্টাব্দ) খোরাসানের বুখারা এলাকায় (বর্তমানে উজবেকিস্তানের অংশ) জন্মগ্রহণ করেন। মাত্র ৯ বৎসর বয়সে কুরআন মুখস্থ শেষ করেই ১০ বৎসর বয়স থেকে হাদীস মুখস্থ, হাদীসের চর্চা, হাদীস সংরক্ষণ করতে বিভিন্ন মুহাদ্দিসের কাছে যাতায়াত শুরু করেন। তার মেধা ছিল বর্ণনাতীত। তার মেধা, হাদীস গ্রহণে সতর্কতার বিভিন্ন ঘটনা কিতাবাদিতে উল্লেখ রয়েছে। তার জীবনের শ্রেষ্ঠতম কর্ম ‘সহীহুল বুখারী’ নামে প্রসিদ্ধ হাদীসের এই গ্রন্থটির রচনা বলে উল্লেখ করেছেন উলামায়ে কেরাম। হাদীসের উপর পূর্ণ পাণ্ডিত্য অর্জনের পর ২১৭ হিজরী সনে তার বয়স যখন ২৩, তখন তিনি এই গ্রন্থটির রচনা শুরু করেন। গ্রন্থটিতে শুধুমাত্র সহীহ হাদীসকেই স্থান দেওয়ার লক্ষ্যে তিনি দীর্ঘ ষোল বছর সাধনার মধ্য দিয়ে ২৩৩ হিজরী সনে এর কাজ সমাপ্ত করেন। রচনাকালে তিনি সর্বদা সওম পালন করতেন এবং প্রতিটি হাদীস লিখতে গোসল করে দু রাক‘আত সালাত আদায় করতেন বলে জানা যায়। বিশুদ্ধতার উপর নিশ্চিত হওয়ার আগে কোনো হাদীস লিখতেন না। বর্ণনায় আরো জানা যায় যে, তিনি বিশুদ্ধ থেকে বিশুদ্ধতম হাদীসের সংকলনের ইচ্ছায় তার মুখস্থ অনুমানিক ছয় লক্ষ হাদীস থেকে বাছাই করে একেবারে সহীহ বা বিশুদ্ধ হাদীসটিকেই এই গ্রন্থে স্থান দেন। এত সংখ্যক হাদীস থেকে বিভিন্ন

হাদীস বারবার বর্ণনা সহকারে মাত্র ৭২৭৫ বা তার সামান্য কমবেশ^{৫৫৩} হাদীস তার কিতাবে স্থান পেয়েছে। সহীহুল বুখারী হিসেবে কিতাবটির নাম সর্বজনের কাছে পরিচিত। তবে তার মূল নাম হচ্ছে ‘আল-জামি‘উস-সহীহ’। ২৫৬ হিজরীর ১লা শাওয়াল, মোতাবেক ৩১ আগষ্ট ৮৭০ খ্রিস্টাব্দ শুক্রবার দিবাগত রাতে ৬২ বৎসর বয়সে এই মহান ব্যক্তিত্ব মারা যান।^{৫৫৪}

উলামায়ে উস্মতের মূল ধারার আলেম তথা আহলুস্সুন্নাহ ওয়াল জামাতের আলেমদেরকে সর্বদা সহীহ হাদীসকেই গ্রহণ করতে এবং অন্যান্য ভেজালযুক্ত হাদীসকে চিহ্নিত করে প্রত্যাখ্যান করতে দেখা গেছে। জানা অবস্থায় কেউই সহীহ হাদীস ছাড়া অন্য কোনো হাদীস গ্রহণ করতেন না।

সহীহ হাদীস ছাড়া শরীয়তের বিষয়াদি প্রমাণ করতেন না। ইমাম বুখারী তাঁর এই রচনায় সহীহ গ্রহণের প্রচেষ্টায় পূর্ণ সফল হয়েছেন বলে সমস্ত উলামায়ে মুহাদ্দিসীন যাচাই ও পরীক্ষা নিরীক্ষার পর স্বীকৃতি দিয়েছেন। তিনি তার চেষ্টায় সফল হওয়ায় সারা বিশ্বের আনাচে কানাচে তাঁর কিতাবের সুনাম, সুখ্যাতি ও মূল্যায়ন ছড়িয়ে পড়ে। তাঁর কিতাব দল মত নির্বিশেষে সর্বজনের কাছে ‘আসাসুল কুতুব বা ‘দা কিতাবিল্লাহ’ বা কুরআনের পর সর্বোচ্চ বিশুদ্ধ কিতাব হিসেবে ভূষিত হয়। এর মত আরেকটি কিতাব ‘সহীহ মুসলিম’ ছাড়া অন্য সব কিতাবের হাদীস যাচাই করে নেওয়াকে মুহাদ্দিসীনে

^{৫৫৩} ইবনু হাজার, ফাতহুল বারী, ১০ নং অনুচ্ছেদ জামে’ এর হাদীসের সংখ্যা, ১/৪৬৫।

^{৫৫৪} বিস্তারিত দেখুন, শায়খ আব্দুল্লাহ মুহসিন, আল ইমাম বুখারী ও কিতাবুহু আল-জামি‘উস সহীহ।

কেরাম জরুরী মনে করলেও তাঁর এ কিতাবের হাদীসগুলো নির্বিচারে গ্রহণের অনুমোদন দেন। এই হলো ‘সহীহুল বুখারী’ বা আমাদের মাঝে ‘বুখারী শরীফ’ হিসেবে পরিচিত কিতাবের অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত সারকথা। অত্যন্ত সংক্ষেপে আমরা যে সার কথাটি জানলাম তা হলো,

* ‘সহীহুল বুখারী’ মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল বুখারীর লিখিত একটি হাদীসের কিতাব।

* এতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিপুল সংখ্যক বিশুদ্ধ হাদীসের এক বিশাল ভাণ্ডার রয়েছে।

* তাঁর কিতাবের সমস্ত হাদীস বিশুদ্ধ বলে মুহাদ্দিসীনে কেরামের কাছে স্বীকৃতি পেয়েছে।

* যাচাই বা নিরীক্ষা ছাড়াও আমরা তাঁর কিতাবের হাদীস গ্রহণ করতে পারি। তাঁর কিতাবের হাদীসগুলো সহীহ জানার পর এখন আমাদের করণীয় কী? এই প্রশ্নের উত্তর আহলুস্‌সুন্নাহ ওয়াল জামাতের আলেমদের কাছে একটিই। আর তা হচ্ছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষা মোতাবেক আমাদের করণীয়ঃ

* হাদীসগুলো থেকে আমাদের জ্ঞান আহরণ করতে হবে।

* বেশি বেশি এই হাদীসগুলোর চর্চা করতে হবে।

* হাদীসগুলো নিজে বুঝা এবং অপরকে বুঝানোর চেষ্টা করতে হবে।

* হাদীসগুলো মুখস্থ করা, বর্ণনা করা, তার প্রচার প্রসার করতে হবে। হাদীসের ক্ষেত্রে এই হলো রাসূলের শিক্ষা। সাহাবায়ে কেরামের জীবন থেকেও আমরা এই শিক্ষাই দেখতে পাই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্বীকৃত খাইরুল কুরুনেও এই ছিল হাদীসের ক্ষেত্রে তাদের আচরণ।

এর বিপরীত ঈসালে সওয়াবের জন্য হাদীস তেলাওয়াত করা, অসুস্থ হলে বা যে কোনো বিপদে মুসিবতে পড়লে হাদীস পাঠ করে দো‘আ করার কোনো নজীর না রাসূলের শিক্ষায় রয়েছে, না সাহাবিদের জীবনে রয়েছে, না খাইরুল কুরুনে রয়েছে। কিন্তু কে বা কারা কুরআনের মত বিভিন্ন বাহানায় এই কিতাবের হাদীসকে তাদের অর্থ উপার্জনের জন্য ‘খতমে বুখারী’ নামে এই প্রসিদ্ধ ‘সহীহুল বুখারী’ কিতাবের খতম বের করেছে তার কোনো হাদীস না থাকলেও আমাদের মাঝে তা অত্যন্ত প্রসার লাভ করেছে। এই কিতাবের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পড়ে দো‘আ করলে নাকি দো‘আ কবুল হয়। রাসূলের বাণী ছাড়া এমন কথা বলার সাহস আমরা কী-ভাবে পাই তাতে অবাক লাগে। এর নাম আল্লাহ ও তার রাসূলের উপর মিথ্যা অপবাদ নয় কি? আমাদের বাস্তব জীবনে এই কিতাবের হাদীসের তেমন একটা গুরুত্ব না দেখা গেলেও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর শিক্ষার উল্টো বিষয়ে অত্যন্ত আগ্রহ এবং এই বিপরীতমুখি শিক্ষার দিকে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে দেখা যায়। পেটপূজারী বা আলেম নামে অজ্ঞ কোনো ব্যক্তি হয়তো এর সূচনা করেছিল। কিন্তু পরবর্তীতে খাইরুল কুরুনের বিপরীত কর্ম কী-ভাবে

বর্তমান আহলুসুন্নাহ ওয়াল জামাত দাবীদার আলেমদের মাঝে প্রচলন লাভ করে তা ভেবে পাওয়া মুশকিল। অর্থের লোভ ছাড়া বাহ্যত আর কোনো কারণ না দেখে গেলেও এতসব আলেমকে এদিকে সম্পৃক্ত করাটাও দুস্কর। আল্লাহই ভাল জানেন। কথিত রয়েছে, ইমাম বুখারী রাহ. না কি এই কিতাব শেষ করে দো‘আ করেছিলেন। এই বাহানায় এই কিতাবের খতমের দিকে উদ্বুদ্ধ করা হয়ে থাকে। পাঠক, এই কথাকে আপনি নিজের বিবেক খাটিয়ে একটু চিন্তা করে বুঝুন। ইমাম বুখারী রাহ. এত বছরের সাধনায় যে কর্ম করেছেন তা তাঁর একটি নেক আমল। কুরআন ও হাদীসের ভাষায় যা ‘আমলে সালেহ’। তাঁর কর্মটি যে ‘আমলে সালেহ’ এতে কোনো সন্দেহ নেই। হাদীসের মাধ্যমে আমরা তা প্রমাণ করেছি। ‘আমলে সালেহ’ বা নেক কর্মের মাধ্যমে বান্দা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করে। আমলে সালেহের পর দো‘আ কবুল হয় বলে হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি। তাই বুখারী রাহ. এর জন্য এটা করা স্বাভাবিক। তবে একথা মনে রাখতে হবে যে, ‘আমল’ কোনটি সালেহ আর কোনটি সালেহ নয় তা সম্পূর্ণ তাওকীফী বা নুসূস নির্ভর বিষয়। ওহির বাইরে যুক্তি দিয়ে এ বিষয়ে কিছু বলার সুযোগ নেই। ইমাম বুখারী রাহ. এর কর্মটি আমলে সালেহ হওয়ার বেলায় রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণী রয়েছে। কিন্তু আমাদের এই কর্ম কি তাই? তার কর্ম আর আমার কর্ম কি এক? রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো এমনটি করতে বলেছেন? সাহাবিরা কখনো এমনটি করেছেন? এসবের উত্তর যদি

‘না’ হয় তবে কোন বাহানায় আমরা এ ধরনের কর্মের বৈধতা দেই? না কি উপার্জনের স্বার্থে হালালকে হারাম করার মত পাণ্ডিত্য ও যোগ্যতা আমরা অর্জন করেছি? এই খতমের প্রতি উৎসাহিত করার জন্য আরো বলা হয়ে থাকে যে, ইমাম বুখারী রাহ. নাকি এই কিতাবের কাজ সমাপ্তির পরে আল্লাহর কাছে দো‘আ করেছিলেন যে, যে ব্যক্তি তাঁর এই কিতাবটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পড়ে দো‘আ করবে আল্লাহ যেন তাঁর দো‘আ কবুল করেন। এ থেকেই নাকি এই খতমের সুত্রপাত। পাঠক, এই কথাটি আপনি কী হিসেবে দেখেন? বুখারী রাহ. এর কিতাব রচনার প্রেক্ষাপটের নির্ভরযোগ্য কোনো কিতাবে আপনি এমন কোনো কথা পাবেন না। ‘সহীহুল বুখারী’ রচনার কয়েক শতাব্দী পর পর্যন্ত ইমাম বুখারী রচিত এ গ্রন্থের চর্চা, তার খেদমত অত্যন্ত ব্যাপক হারে হলেও খতমের নজীর দেখবেন না। এ থেকেই এসব কিছু যে বানানো গল্প তা অতি সহজে অনুমেয়। তা ছাড়া বুখারী রাহ. এর মত বিশুদ্ধ আকীদার ধারক ব্যক্তির দিকে এমন কথার অপবাদ দেওয়া কতটুকু গ্রহণযোগ্য তা বিবেকের কাছে প্রশ্ন। ইমাম বুখারী (রাহ.) তিনি কি শারি‘ তথা শরীয়ত প্রবর্তক? তিনি এমন কথা বললে তা অনুসরণযোগ্য হবে? নাকি তার আকীদা প্রশ্নবিদ্ধ হবে? যাই হোক আমরা অযথা অনির্ভরযোগ্য কোনো কথার উপর ভিত্তি করে ইমাম বুখারী (রাহ.) এর ব্যক্তিত্বকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে পারি না। আমরা এই কথাগুলোকেই অসার বলে ধরে নেই। বুখারী পড়ে দো‘আ কবুল হলে রাসূলের অন্য সব হাদীসের কি দোষ? নাকি আপনার অভিজ্ঞতায় অন্য হাদীস

পড়ে দো‘আ করলে তা কবুল হয় না, শুধু এই কিতাবের হাদীস পড়লে দো‘আ কবুল হয়? সাহাবিরে যে সব হাদীস জানতেন তা তাদের কাছে হাদীস বলে সন্দেহ ছিল নাকি? নাকি তারা এ ব্যাপারে অজ্ঞ ছিলেন? নাকি তাদের কারো জীবনে কোনদিন কোনো বিপদ মুসিবত আসে নি? তারা একটি দিনও একটি হাদীস পড়ে দো‘আ করলেন না তার কারণ কি? মোটকথা, অভিজ্ঞতার নামে রাসূলের শিক্ষার বাইরে আমাদের কিছু বলার অধিকার নেই। পাঠক, আশা করি আমরা এই বুখারী খতমের তাৎপর্য বুঝতে পেরেছি। এতো হলো শুধুমাত্র মূল খতমের বিষয়। অর্থাৎ এটি একটি রাসূলের শিক্ষা বিরোধী কর্ম। যার কোনো নজীর বা দৃষ্টান্ত সোনালী যুগে নেই। অপরদিকে খতমে কুরআনের বেলায় তা খেলাফে সুন্নাহ হওয়া ছাড়া আরো যে সমস্ত অতিরিক্ত খারাবী উল্লেখ করা হয়েছিল তার অনেকটা এই খতমে বুখারীতেও রয়েছে। কয়েকটি ক্ষেত্রে তা খতমে কুরআনের তুলনায় অধিক। যেমনঃ

* কুরআন খতম করা বুখারী খতমের তুলনায় অনেক সহজ। তাই কুরআন সাধারণত খতম তথা পড়ে শেষ করা হয়। খতম না করে মিথ্যা বলার ধোকা কুরআনের বেলায় কম হয়। পক্ষান্তরে বুখারী পুরো পড়া অনেক কঠিন। তাই এখানে খতমের আয়োজকের জিজ্ঞাসার উত্তরে খতম হয়ে গেছে বলে মিথ্যার ধোকা প্রায়ই অপরিহার্য বলে দেখা যায়।

* কুরআন সাধারণত আলেম বলতেই সবাই পড়তে পারে। তাই তাজবীদ, সিফাত, হক্ক আদায় করে তেলাওয়াত বা অতি দ্রুত

তেলাওয়াতের ত্রুটি ছাড়া সাধারণত শব্দ ভুলের ত্রুটি হয় না। পক্ষান্তরে বিজ্ঞ আলেম ছাড়া অনেকেই হাদীস পড়তে পারে না। টাকার স্বার্থে খতমে অংশ নিয়ে সে আল্লাহর রাসূলের বাণীকে তার মনমত ভুল উচ্চারণ করে। এমন ভুলকেও মুহাদ্দিসীনে কেরাম রাসূলের উপর মিথ্যা বলার অপরাধ বলে গণ্য করেছেন।

* ইতোপূর্বে বলেছি যে, বুখারী অধিকাংশ সময়ই খতম হয় না। একজনের অংশ শেষ হলেও আরেকজন তার নির্ধারিত অংশ শেষ করতে পারে না। এক্ষেত্রে মানুষের সাথে মিথ্যা বলা ধোকা দেওয়ার সাথে সাথে দো‘আর সময় আল্লাহর সাথে মিথ্যা বলতে অনেক দিন লক্ষ্য করা গেছে। যেমন. দো‘আয় বলা হয়, “আল্লাহ, এই আমাদের বুখারী খতমকে...” “যে খতম করা হয়েছে...” ইত্যাদি।

* হাদীসে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পড়া অবস্থায় অনর্থক গল্পগুজব, হাসিঠাট্টা, ঢং তামাশা থেকে সাধারণত কোনো মজলিসই খালি থাকে না। একমাত্র খতমের আয়োজক সামনে থাকলে তাঁর ভয় বা সম্মানে নিশ্চুপ পড়া হয়। হাদীসের সাথে বেয়াদবী ছাড়া এ সবেঁক নাম কি দেওয়া যায়?

* এই খতমে মাঝে মধ্যে সবচেয়ে বড় আপত্তিকর যে বিষয়টি সংঘটিত হয় তা হলো, আল্লাহ ছাড়া অন্যের নাম জপের মাধ্যমে বরকত গ্রহণ যা সম্পূর্ণরূপে শির্ক। কেননা বরকতের জন্য কারো নাম জপ করা তাঁর ইবাদত বা আর্চনার শামিল। বরকতের জন্য একমাত্র আল্লাহর নামই নেওয়া যায়। তাই বরকতের জন্য আল্লাহ ছাড়া কারো নাম এমনকি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

নিলেও শির্কের গোনাহ্ কাঁধে বহন করতে হবে। কিন্তু অনেক সময় খতমে বুখারীর অনুষ্ঠানের শেষদিকে আসহাবে বদরিয়্যিন অর্থাৎ বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবাগণ সম্বলিত হাদীসটি সবাইকে গুনিয়ে পুনরায় পড়া হয়। তাদের নাম নেওয়ার কারণ হিসেবে বরকতের কথা উল্লেখ করা হয় এবং পরবর্তীতে তাদের নামের দোহাই দিয়ে দো‘আ করা হয়। কারো দোহাই দিয়ে দ্বেআর ব্যাপারটি খতমে তাসমিয়াতে আমরা আরেকটু বিস্তারিত জানব ইনশাআল্লাহ। এখানে শুধু এটুকু বলতে চাই যে, বরকতের জন্য আল্লাহ ছাড়া কারো নাম নেওয়া শির্ক। সত্য সন্ধানী নিঃস্বার্থ ব্যক্তির জন্য এই খতমের তাৎপর্য বুঝতে আর কোনো বেগ পেতে হবে না বলে আশা করি। আল্লাহ সর্বপ্রথম আমাকে অসংখ্য এসব মজলিসে শরীক হওয়ার কারণে যে সব গুনাহ সংঘটিত হয়েছে তা থেকে ক্ষমা করুন এবং আমি সহ সবাইকে সঠিক বুঝ দান করুন। স্বার্থের জন্য দীন কে জলাঞ্জলি দেওয়া থেকে আমাকে এবং সবাইকে বিরত রাখুন। আমীন।

খতমে না-রী

খতমে নারী’ বা ‘দুরুদে নারীয়াহ’। মানুষের বানানো দুরূদের নামে নির্দিষ্ট কিছু বাক্য। এই বাক্যগুলো ৪৪৪৪ বার পড়লে এই খতম হয়। কথিত আছে এই খতম পড়লে নাকি আগুন যেমন কোনো বস্তুকে ভস্মীভূত করে দেয় ঠিক তদ্রূপ এই খতমও বিপদ আপদকে ভস্মীভূত করে দূরে সরিয়ে দেয়। তাই এই খতমের নাম আরবী শব্দ “نار” যার অর্থ আগুন, এই অর্থের দিকে সম্পৃক্ত করে এর নাম

‘খতমে নারী’ বা ‘দুরুদে নারী’ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই খতমের উৎপত্তি কোথা থেকে? এর প্রথম আবিষ্কারক কে? এতে যে দো‘আ পড়া হয় তার মর্ম কী? অনেকে একে দুরুদে নারী নাম দেন, একে দুরুদ নামে নামকরণ করা অদৌ বৈধ কি না? তা জানা না থাকলেও কারো কারো কথায় আমরা এমন কাজের পিছে দৌড়াই। এতে যেমন কান্না পায় আবার হাসিও পায়। অথচ দুনিয়ার সাধারণ একটি বিষয় হলেও আমরা অনেক যাচাই বাছাই করে অগ্রসর হই। ডাক্তারের কথা শুনলেই দৌড়াই না, বরং পূর্বে তার সম্পর্কে অবগত হওয়ার চেষ্টা করি। অথচ ধর্মীয় বিশ্বাসে বিশ্বাসী হয়ে একটি আমল করছি বা করাচ্ছি আর একবারও ভেবে দেখছি না। এসব হচ্ছে ঈমান আকীদার বিষয়ে আমাদের শৈথিল্য আচরণের বহিঃপ্রকাশ। প্রশ্ন হলো, যিনি আমাকে এই খতম পড়ানোর জন্য উৎসাহিত করলেন তিনি তার কতটি রোগ বালাই এই দুরুদ দ্বারা সমাধান করেছেন? নাকি হাসপাতাল আর ডাক্তারের শরণাপন্ন হয়েছেন? এই দুরুদের এত অ্যাকশন হলে তিনি নিজে বিভিন্ন সময়ে বিপদে জর্জরিত হয়ে তা দূর করার জন্য অন্য পথ খোঁজেন কেন? জানা দ্বেআটি পড়ে ফেললেই তো হয়। আফসোস, যার নিজের আস্থা এই দুরুদের উপর নেই, থাকার কথাও নয়, তিনি কীভাবে মানুষকে এটি পড়ানোর উপদেশ দেন? অপরদিকে আমাদের পাগলামী দেখে আফসোস হয় যে, আমরা কী-ভাবে এমন কথা গ্রহণ করি? ঔষধ মনে করলেও খাবে একজন আর ভাল হবে আরেকজন? এইটুকু বোঝার কি বিবেক আমাদের নেই? যাই হোক এবার আমরা মূল

বিষয়ে আসি এবং জানার চেষ্টা করি খতমে না-রী কী? এবং তা পড়া বা পড়ানো কতটুকু সমীচীন? প্রথমেই মানুষের বানানো দো‘আটি ও তার অর্থ উল্লেখ করছি। সত্যসন্ধানী ব্যক্তি অর্থের দিকে একটু মনোনিবেশ করলেই দো‘আটির তাৎপর্য এবং এমন দো‘আ পড়া কতটুকু সিদ্ধ তা বুঝে নিতে পারবেন। দুরূদের নামে আরবী যে বাক্যগুলো পড়া হয় তা নিম্নরূপঃ

"اللَّهُمَّ صَلِّ صَلَاةً كَامِلَةً وَسَلِّمْ سَلَامًا تَامًّا عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي تَنَحَّلَ بِهِ الْعُقْدُ، وَتَنْفَرِجُ بِهِ الْكَرْبُ وَتَقْضِي بِهِ الْحَوَائِجُ وَتُنَالُ بِهِ الرِّغَائِبُ وَحُسْنُ الْخَوَائِمِ وَتُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ فِي كُلِّ لَحْظَةٍ وَنَفْسٍ بَعْدَ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ".

“হে আল্লাহ পরিপূর্ণ রহমত ও পূর্ণ শান্তি বর্ষিত কর আমাদের সরদার মুহাম্মদের উপর যার মাধ্যমে সমস্যাসমূহ সমাধান হয়, দুঃখ দুর্দশা তিরোহিত হয়, প্রয়োজনাদি মিটিয়ে দেওয়া হয়, পূণ্যাবলী ও সুন্দর শেষ পরিণাম অর্জিত হয়, তার পবিত্র চেহারা/সত্তার মাধ্যমে বৃষ্টি কামনা করা হয়। আর রহমত বর্ষণ কর তার পরিবার ও তার সাহাবায়ে কেরামের উপর তোমার জানা সংখ্যানুযায়ী, প্রতিটি মুহুর্তে ও নিঃশ্বাসে” সচেতন ও সত্যসন্ধানী আলেমকে এ দুরূদের সমস্যা ব্যাখ্যা করে বুঝাবার প্রয়োজন নেই। জ্ঞানী ব্যক্তি মাত্র দুরূদটির শব্দ বা অর্থের প্রতি একটু খেয়াল দিলেই এর সমস্যা বুঝতে পারবেন। খতমটিতে যেহেতু অনেক আপত্তিকর শব্দ বা বাক্য রয়েছে তাই এর আপত্তিগুলো কোনো পর্যায়ে নিজ বিবেক দিয়ে একটু গভীরভাবে চিন্তা করলেই বুঝা যাবে। সবাই সহজে বোঝার জন্য প্রথমে

প্রাসঙ্গিক কিছু কথা বলার প্রয়োজন বোধ করছি, যাতে করে এর তাৎপর্য বুঝা আমাদের জন্য সহজ হয়। আল্লাহতে বিশ্বাসী মানুষ বলতেই একথা বিশ্বাস করেন যে, সবকিছুর মূল সমাধানকারী বা পরিচালনাকারী একমাত্র আল্লাহ তা'আলা। আল্লাহতে বিশ্বাসী মুসলিম অমুসলিম সকলেই এ বিশ্বাস পোষণ করেন। তবে মুসলিম ব্যক্তির বিশ্বাস আর আন্তিক বিধর্মীর বিশ্বাসের মাঝে পার্থক্য এই যে, মুসলিম মনে করেন আল্লাহ কোনো কিছুর সমাধান বা পরিচালনা করতে কারো মুখাপেক্ষী নন। তার কাছে কিছু চাইতে কোনো ব্যক্তিকে মিডিয়া বানাবার দরকার পড়ে না। পক্ষান্তরে অমুসলিমের বিশ্বাস হলো, বাদশা যেমন রাষ্ট্র পরিচালনায় বিভিন্ন ব্যক্তির মুখাপেক্ষী থাকেন আল্লাহও এরকম মুখাপেক্ষী। বিশেষ ব্যক্তি ছাড়া অন্য কেউ যেমন সরাসরি বাদশাহর কাছে কোনো কিছু চাইতে পারে না, মিডিয়ার প্রয়োজন হয়, ঠিক তদ্রূপ আল্লাহও সবাইকে চিনেন না, তাঁর কাছে সরাসরি পৌছা যায় না, তাই তাঁর কাছে কিছু চাইতে হলে বিশেষ ব্যক্তিকে মিডিয়া বানানো প্রয়োজন। কুরআনের অসংখ্য আয়াতে তাদের এসব বিশ্বাস বর্ণনা করা হয়েছে, যেগুলো থেকে তাদের এমন বিশ্বাসের প্রমাণ পাওয়া যায়। মক্কার সমস্ত কাকফের এ ধরনের বিশ্বাস পোষণ করত। মূল পরিচালনায় তারা আল্লাহকে বিশ্বাস করত বলে কুরআনের একাধিক আয়াতে এর প্রমাণ মিলে। মূর্তির পূজা করলেও মূর্তিকে তারা মূল পরিচালনাকারী বলে বিশ্বাস করত না। তাদের নিজের মুখের কথা ছিল,

﴿ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى ﴾ (الزمر: ১৮৮)

“আমরা তাদের ইবাদত কেবল এ জন্য করি যে, তারা আমাদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেয়”^{৫৫৫} সব কিছুর ক্ষমতা, রক্ষা, সৃষ্টি, রিযিক, পরিচালনা ইত্যাদির মূল কর্তৃত্ব আল্লাহর হাতে বলে তাদের বিশ্বাস ছিল।

কুরআনে অসংখ্য জায়গায় এর আলোচনা করা হয়েছে। মূল কর্তৃত্ব আল্লাহর হাতে স্বীকার করার পর অন্য কিছুর ইবাদত বা অন্যকিছুকে আল্লাহর অংশীদার করা অযৌক্তিক বলে কুরআনে বারবার দেখানো হয়েছে।

মোটকথা তারা যে সমস্ত মাখলুক বা নেক মানুষের ইবাদত করত ওসিলা হিসেবেই করত। কিন্তু যা ওসিলা হওয়ার যোগ্যতা রাখে না তাকে ওসিলা হিসেবে গ্রহণ বা বিশ্বাস করাকে আল্লাহ তা‘আলা কুরআনে শিরকের মাধ্যম বা শিরক বলেই আখ্যায়িত করেছেন। অপরদিকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিরকের সমস্ত পথকে বন্ধ করেছেন। রাসূলকেও যাতে কেউ কোনো বাহানায় আল্লাহ পর্যন্ত না পৌঁছায়, আল্লাহর কোনো গুণাবলীতে শরীক না করে, এ ব্যাপারে উম্মতকে সর্বোচ্চ সতর্ক করেছেন। উম্মতকে এ ব্যাপারে সতর্ক করার নির্দেশ স্বয়ং আল্লাহর পক্ষ থেকে ছিল। আল্লাহ বলেন,

﴿ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ... ﴾ (الاعراف: ১৮৮)

^{৫৫৫} সূরা আয-যুমার:৩

“হে নবী আপনি বলে দিন, আমি আমার নিজের কল্যাণ সাধনের
এবং অকল্যাণ সাধনের মালিক নই...”^{৫৫৬} অন্যত্র এরশাদ হয়েছে,

وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِذْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ...

(يونس: ১০৭)

“আর আল্লাহ যদি আপনার উপর কোনো কষ্ট আরোপ করেন তবে
তিনি ছাড়া কেউ তা খণ্ডাবার নেই, পক্ষান্তরে যদি তিনি আপনাকে
কিছু কল্যাণ দান করেন তবে তার মেহেরবানীকে রহিত করার
মতও কেউ নেই...”^{৫৫৭} এ মর্মের আয়াত কুরআনে অসংখ্য জায়গায়
রয়েছে। আমাদের নবী ছাড়া অন্যান্য নবী রাসূলেরও এই শিক্ষাই
ছিল বলে কুরআনের বিভিন্ন জায়গা থেকে আমরা জানতে পারি।
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার বিষয়ে বাড়াবাড়ি করতে
সর্বোচ্চ সতর্ক করেছেন। আল্লাহর সাথে শির্ক দূরের কথা, তার
প্রশংসায় পর্যন্ত বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করেছেন। সহীহ হাদীসে
বর্ণিত রয়েছে, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে
বলল, যা আল্লাহ চেয়েছেন এবং আপনি চেয়েছেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

"أجعلني لله عدلا بل ما شاء الله وحده". (مسند أحمد، حديث عبد الله بن

عباس، رقم: ১৮৩৯)

“তুমি কি আমাকে আল্লাহর সমতুল্য করেছ, বরং যা একমাত্র
আল্লাহ চেয়েছেন”^{৫৫৮} কোনো কোনো বর্ণনায়,

^{৫৫৬} সূরা আ'রাফ : ১৮৮।

^{৫৫৭} সূরা ইউনুস: ১০৭।

^{৫৫৮} মুসনাদে আহমদ, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) এর হাদীস, নং: ১৮৩৯।

"ويلك اجعلتني والله عدلا قل ما شاء الله وحده". (سنن النسائي، باب النهي أن يقال ما شاء الله وشاء فلان)

“তোমার ধ্বংস হউক, তুমি কি আমাকে আল্লাহর সাথে সমতুল্য করেছ? তুমি বল, যা শুধুমাত্র আল্লাহ চেয়েছেন”।^{৫৯}

এক হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন,
 "لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبده فقولوا عبد الله
 ورسوله". (صحيح البخاري، كتاب التفسير، باب: واذكر في الكتاب
 مريم...رقم: ৩২৬১)

“তোমরা আমার প্রশংসায় সীমালংঘন করো না, যেমনটি খৃষ্টানরা মারয়ামের পুত্র ঈসার ক্ষেত্রে করেছে, কেননা আমি তো আল্লাহর বান্দা, তাই তোমরা বল আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল”।^{৬০}

এভাবে শিকের আপনোদন করেছেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এবার আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু ওয়াসাল্লামের শিক্ষা ও ‘খতমে নারী’ নামক দো‘আটির বাক্যগুলো নিয়ে একটু বিবেচনা করি। আশা করি যিনি প্রকৃত সত্য জানার আগ্রহ রাখেন এবং সত্য প্রকাশিত হওয়ার পর সাথে সাথে গ্রহণের মানসিকতা রাখেন তার সামনে এই দো‘আর শিকী শব্দগুলো অতি সহজেই ধরা পড়বে। আর যার মূল লক্ষ্যই হচ্ছে, যা করছি আজীবন করেই যাব, আমি টলব তবে আমার বিশ্বাস টলবে না, তার সামনে কুরআনের স্পষ্ট আয়াত পেশ করলেও একটি না একটি অজুহাতে তিনি তার মতকে

^{৫৯} নাসাঈ, সুনান, হাদীস সহীহ, আল্লাহ এবং অমুক চেয়েছেন বলা নিষেধ অনুচ্ছেদ, নং: ১০৮২৪।

^{৬০} সহীহুল বুখারী, তাফসীর অধ্যায়, অনুচ্ছেদ: কিতাবে মারয়ামের কথা স্মরণ কর..., নং: ৩২৬১।

অটুট ও প্রতিষ্ঠিত রাখতে বর্ণিত দো‘আটি বা কুরআনের আয়াতের বিভিন্ন ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করবেন। অন্যদের ভ্রান্তির ক্ষেত্রে তিনি আয়াতের ব্যাখ্যা রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণী ও তাঁর আমল অথবা সাহাবিদের আমল দ্বারা করলেও এখানে এসে নিজের ভ্রান্ত মতকে অটুট রাখতে আহলুস-সুন্নাহ ওয়াল জামাতের আদর্শে আদর্শবান আকাবীর আসলাফদের এই উসূলটি ভুলে যাবেন। হানাফী হলেও আবু হানিফা (রাহ.) এর মানহাজ ভুলে যাবেন। কুরআনের আয়াত দলীল হিসেবে উপস্থাপনের কারণে সাধারণ মহিলার কথায় উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর মত খলীফার নিজ সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসার আদর্শ ভুলে যাবেন।

এখানে এসে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবিদের আদর্শের চেয়ে নিজ পীর বা নিজের মতের আলেমের কর্মই অগ্রাধিকার পাবে। যেমনটি রাসূল গাইব জানেন বা রাসূল হাজির-নাজির এজাতীয় শিকী বিশ্বাস পোষণকারীরা তাদের ভ্রান্ত আক্বীদা প্রতিষ্ঠিত রাখার বেলায় করে থাকে। যদিও এ সব বিষয় কুরআনে দ্ব্যর্থহীনভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। একেই আল্লাহ তা‘আলা প্রবৃত্তি ও আলেমকে প্রভু বানিয়ে তাদের পূজা বলে আখ্যা দিয়েছেন।

কুরআনের আয়াত ও হাদীসের আলোকে এজাতীয় কর্মকে ‘শিরক ফিল ইবাদত’ বা উপাসনাগত শিরক বলে আখ্যায়িত করেছেন আহলুস-সুন্নাহ ওয়াল-জামাতের আলেমগণ। আল্লাহ তা‘আলা এরশাদ করেন,

﴿أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ
الْجَانِثِيَّةَ (২৩) عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾

“আপনি কি তাঁর প্রতি লক্ষ্য করেছেন, যে তার প্রবৃত্তি তথা মনের খেয়াল খুশিকে স্থায়ী উপাস্য স্থির করে নিয়েছে। আল্লাহ জেনেশুনে তাকে পথভ্রষ্ট করেছেন, তার কানে ও অন্তরে মোহর এঁটে দিয়েছেন এবং তার চোখের উপর রেখেছেন পর্দা। আল্লাহ ছাড়া কে তাকে হেদায়াত করবে? তোমরা কি চিন্তা ভাবনা করো না?”^{৫১}

অন্যত্র এরশাদ করেন, “তারা আল্লাহ ব্যতীত তাদের পণ্ডিত ও সংসার-বিরাগীদের এবং মারয়াম তনয় ঈসাকে তাদের পালনকর্তারূপে গ্রহণ করেছে, অথচ তাদেরকে নির্দেশ করা হয়েছিল শুধুমাত্র এক প্রভুর ইবাদত করতে। একমাত্র তিনি ছাড়া কোনো মা‘বুদ নেই। তারা আল্লাহর যে সমস্ত শরীক সাব্যস্ত করে তা থেকে তিনি পবিত্র”^{৫২}। এই দুরূহে একমাত্র আল্লাহ করতে পারেন এমন যাবতীয় সিফাত বা গুণাবলীতে রাসূলকে শরীক করা হয়েছে। মাধ্যম হলে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মিডিয়া বা মাধ্যম হিসেবে আল্লাহর শরীক করা হয়েছে। তাই মাধ্যম হিসেবে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নাম উল্লেখ করায় শিরকের মাঝে কোনো তারতম্য সৃষ্টি হবে না। কুরআনের অসংখ্য আয়াত এবং অগণিত হাদীস এর প্রমাণ। আল্লাহ আমাদের সবাইকে বোঝার তওফিক দান করুন এবং হেদায়াতের উপর অবিচল রাখুন।

^{৫১} সূরা আল-জাসিয়াহ: ২৩।

^{৫২} সূরা তাওবা: ৩১।

অজুহাত ও তার পর্যালোচনা

একটি দো‘আ বা আরবী বাক্যকে দুরূদ বলতে উচিত ছিল এটা জানা যে, এই দুরূদটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পড়তেন কি না, জীবনে কোনো সাহাবীকে শিক্ষা দিয়েছিলেন কি না, অথবা কোনো সাহাবা দুরূদ হিসেবে এই বাক্যগুলো পড়তেন কি না তা দেখা। বিপদে আপদে তারা কোনোদিন এই দো‘আকে আমলে এনেছেন কি না লক্ষ্য করা। কোনো সাহাবা থেকে বিশুদ্ধ সুত্রে এই দুরূদ পেলে আমরা ধারণা করে নিতাম, নিশ্চয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে এটি শিক্ষা দিয়েছেন। কেননা আমরা বিশ্বাস করি যে, সাহাবায়ে কেরাম ইবাদতের ক্ষেত্রে নিজ থেকে কিছু বলেন না। এর কোনোটি না পেলে এই দো‘আ বর্জনের জন্য আমাদের অন্য কিছু দরকার পড়ে না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার উপর পড়ার জন্য আমাদেরকে বিভিন্ন দুরূদ ফযিলত সহ বর্ণনা করেছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিখানো দুরূদগুলো কি আমাদের জন্য যথেষ্ট নয়? মূলত যিনি ধর্মীয় বিশ্বাসের সকল ক্ষেত্রে রাসূলের শিক্ষাকে যথেষ্ট মনে করেন তার জন্য আর অন্য দুরূদের প্রয়োজন নেই। অন্য দুরূদ জায়েয করতে তার মাথা ঘামাবার সময় নেই। তার কথা হবে, আমার নবী করেন নি, নবীর হাতেগড়া ছাত্ররা করেন নি, আমি তা করব না। কিন্তু হুবহু সুন্নাতের উপর থাকার আসলাফের সেই জযবা আমাদের থেকে হারিয়ে যাওয়ার কারণে ইবাদতগত বা বিশ্বাসগত নতুন কিছু আসলেও আমাদেরকে জায়েয না-জায়েযের

বাহাসে লিপ্ত হতে হয়। আবু হানিফা রাহ. এর অনুসারী দাবী করলেও হানিফী মানসিকতা হারিয়ে যাওয়ার কারণে নতুন আলোচনার প্রয়াস পায়। বিভিন্ন ওজুহাতে আমরা নব উদ্ভাবিত আমলকে জায়েয করার চেষ্টা করি। খতমে না-রীও এর বিপরীত নয়। বিভিন্ন সময় এই দো‘আটির আপত্তিকর দিকগুলো নিয়ে আলোচনা করলে যে অজুহাতগুলো পেশ করতে দেখা গেছে শুধু সেগুলো নিয়ে একটু পর্যালোচনা করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। আল্লাহর তওফিক কাম্য। **প্রথমেই** যে অজুহাত পেশ করা হয় তা হলো, আমরা রাসূলকে কেবল মাধ্যম মনে করি মাত্র। এখানে শিরকের কোনো প্রশ্নই আসে না। মাধ্যমে মনে করলেই শিরক হতে পারে না একথা কতটুকু শুদ্ধ, তা আমরা ইতোপূর্বে জানতে পেরেছি। আমরা অবশ্যই বুঝতে পেরেছি যে, মাধ্যম মূলতই শিরক অথবা শিরকের পথ। কেননা কারো সমস্যা সমাধান করতে, দুঃখ দুর্দশা দূর করতে, প্রয়োজন মিটাতে, বৃষ্টি দিতে আল্লাহ কোনো মিডিয়ার মুখাপেক্ষী নন। এবার আমাদের দো‘আটির বিষয়ে আসা যাক। মোটকথা কর্মের যোগসূত্র যার সাথেই রয়েছে সেটিই মাধ্যম, যে কোনোভাবে এই যোগসূত্র থাকুক না কেন। যার সাথে কোনো যোগসূত্র নেই তাকে মাধ্যম বলা যায় না। উদাহরণস্বরূপ মনে করুন, আপনি একটি অ্যাক্সিডেন্টের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছেন। কোনো ব্যক্তি আপনাকে তাঁর হাত দ্বারা টান দিয়ে রক্ষা করেছে। আপনি বলতে পারেন, আল্লাহ আমাকে রক্ষা করেছেন। আবার এও বলতে পারেন যে, অমুক ব্যক্তির মাধ্যমে আল্লাহ আমাকে রক্ষা

করেছে। এ দ্বিতীয় বাক্যটির ক্ষেত্রে মুমিন ব্যক্তির বিশ্বাস হলো, মূলত আল্লাহই আমাকে রক্ষা করেছেন, অমুক ব্যক্তি মাধ্যম মাত্র। এখানে লোকটি বলতে পারে, আল্লাহর দ্বারা রক্ষা পেয়েছি। আবার এও বলতে পারে যে, অমুকের মাধ্যমে আল্লাহ রক্ষা করেছেন। এখানে তার কোনো কথাই শির্ক হবে না। কিন্তু লোকটি যদি বলে, রাসূল আমাকে রক্ষা করেছেন, অথবা রাসূলের মাধ্যমে আমি রক্ষা পেয়েছি, তবে তার উভয় কথাই শির্ক হবে। আহলুস-সুন্নাহ ওয়াল জামাতের কোনো আলেম এতে সংশয় বা দ্বিমত পোষণ করবেন না। এই একটি বিষয়ে রাসূলের মাধ্যম শির্ক হলে আপনার জীবনের যাবতীয় বিষয়ের মাধ্যম রাসূলকে বানিয়ে দিলে তা শির্ক হয় না এ কেমন কথা? এবার আহলুস-সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের আলেমগণের কাছে বিনীত আবেদন যে, আপনারা একটু চিন্তা করলেই সমাজ ধীরে ধীরে শির্কমুক্ত হতে থাকবে। তাই চলে আসা প্রথাকে জায়েয বানাবার চেষ্টা না করে সমাজকে শির্কমুক্ত করার দিকে একটু মনোনিবেশ করুন। জনৈক বিজ্ঞ আলেমের সাথে একবার এ বিষয়ে আলোচনা করলে তিনি আমাকে বালাগাতের কিতাবে উল্লেখিত উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি শির্ক নয় বলে বুঝাবার চেষ্টা করেন। পরে আরো অনেককে এই উপমা পেশ করতে দেখেছি। উপমাটি হচ্ছে, **أُنبت الربيع البقل** অর্থাৎ বসন্ত শস্য উৎপাদন করেছে। তারা বলে থাকেন, মুমিন ব্যক্তি এই বাক্যটি বললে শির্ক হয় না, কারণ সে এখানে রূপক অর্থ গ্রহণ করে। মুমিনের বিশ্বাস মূল শস্য দাতা আল্লাহ। বসন্তে তা উৎপাদিত হয়। তাই সে বলে, বসন্ত শস্য

উৎপাদন করেছে। বস্তুত তাদের এ কথাটি অগ্রহণযোগ্য আর এ ধরনের উপমাও আল্লাহর সাথে অসামঞ্জশীল। কারণ কোনো কাজকে কার্যকারনের দিকে সম্পর্কযুক্ত করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনে কিংবা সাহাবায়ে কিরাম থেকে কোনো হাদীস বা আছার পাওয়া যায় না। বরং এর বিপরীতটিই পাওয়া যায়, দেখুন সাহাবায়ে কিরাম বলেন,

«لولا الكلب لجاءنا اللص»

‘যদি কুকুর না থাকত তবে চোর আসত’ এ জাতীয় কথাকে শির্কে (আসগর) এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তাই *أُنبت الربيع البقل* অর্থাৎ ‘বসন্ত শস্য উৎপাদন করেছে’ এটা কোনোভাবেই কোনো মুমিনের কথা হতে পারে না। কারণ মুমিন জেনে বুঝে শির্কে আসগরে লিপ্ত হতে পারে না। এখন বলতে পারেন তাহলে এ কথাটি কোথেকে আসল? বস্তুত তা জানার জন্য আমাদেরকে তথাকথিত বালাগত বিদ্যার প্রবর্তকদের মন-মানষিকতা, আকীদা মাযহাব দেখতে হবে। তাদের অনেকেই মু‘তাযিলা, আশ‘আরিয়া ও মাতুরিদিয়া মাযহাবের লোক থাকার কারণে তাদের গ্রন্থে সেটার অনুরনন দেখতে পাওয়া যায়। তারা মাজায বা রূপক বলে অনেক শির্ককে বালাগাত বানাতেও সত্যনিষ্ঠ আলেমগণ এ জাতীয় কথাকে কখনও স্বীকৃতি দেন না। তাই এ জাতীয় কথা কোনো মুমিন বলতে পারে না। এ তো গেল বাস্তব কার্যকারণের দিকে সম্পর্কযুক্ত করে বলার মাসআলা। বাস্তব কার্যকারণের দিকে সম্পর্কযুক্ত করে কোনো কথা বলা যদি শির্কে আসগার হয়, তবে যেখানে বাস্তব কোনো কার্যকারণ

নেই সেখানে সেদিকে সম্পর্কযুক্ত করা নিঃসন্দেহে শির্কে আকবারে পরিণত হবে। যেমন, কেউ যদি বলে “রাসূল শয্য উৎপাদন করেছেন বা রাসূল ধান দেন” অথবা “রাসূলের মাধ্যমে শয্য উৎপাদন হয় বা রাসূলের মাধ্যমে ধান হয়” এর কোনটি বলার কোনো সুযোগ নেই, কারণ তা শির্কে আকবার হবে। আশা করি, আশেকে রাসূল নামে রাসূলকে আল্লাহর সাথে বিভিন্ন গুণাবলীতে সমতুল্যকারী ছাড়া সবাই এ ধরনের কথাটির মারাত্মক পরিণতি সম্পর্কে জানতে পারলেন। এবার আপনি নিজেই খতমে না-রীর ব্যাপারে ফায়সালা দিন।

এখন উপরোক্ত অজুহাতটির অসারতা নিশ্চয় বুঝতে পেরেছি। তবে এই অজুহাতটি যারা ব্যাকরণ বা ভাষার জ্ঞান রাখেন তারা পেশ করেন। আর যাদের ব্যাকরণের গভীরতা নেই তাদের সামনে এই অভিযোগ তুলে ধরলে তারা প্রথমে অন্য অজুহাত পেশ করেন। সেটি না টিকলে পরবর্তীতে আবার ঘুরিয়ে পেচিয়ে কথা বলেন। প্রশ্ন হলো, প্রথমে যখন নিজে শির্ক মেনে নিয়ে অন্য অজুহাত দেখালেন তবে সেই অজুহাত না টিকলে আবার পূর্ব কথাকে ব্যখ্যার মাধ্যমে টিকানোর চেষ্টার কী প্রয়োজন। অন্য অজুহাতের মধ্যে যেমন, একদিন জনৈক আলেমের সাথে আলোচনা করলে তিনি বলেন এখানে, “ہ” শব্দের “و” সর্বনামটি “وہ” শব্দের দিকে প্রত্যাবর্তিত। অতএব রাসূলের ওসিলায় নয় বরং এই দুরূদের ওসিলায়। কিন্তু তিনি এটি লক্ষ্য করেন নি যে, “وہ” শব্দের দিকে সর্বনাম প্রত্যাবর্তিত হলে এখানে পুংলিঙ্গের সর্বনাম “و”

ব্যবহার না হয়ে স্ত্রীলিঙ্গের সর্বনাম “হা” হত। আরেকদিন এ বিষয়ে এক সেমিনারে আলোচনায় এখানে সর্বনাম ‘সালাত’ শব্দের দিকে নেয়ার সুযোগ নেই বললে একজন বলে উঠলেন “صلاة” শব্দটি মাসদার। আর আরবী ব্যকরণ অনুযায়ী মাসদারের দিকে যে কোনো সর্বনাম ব্যবহার করা যায়, কেননা মাসদার পুংলিঙ্গও নয় আবার স্ত্রীলিঙ্গও নয়। একথা শুনে অত্যন্ত অবাক লাগল। নিজের মতকে অটুট রাখতে কোনদিকে খেয়াল না করে যারা কথা বলেন, তাদের কথায় যেমন হাসি পায় তেমনি তারা এ ধরনের কথা বলে নিজের আস্থা নষ্ট করেন। আরবী ভাষায় উনার জ্ঞানের পরিধি সম্পর্কে প্রশ্ন এসে যায়। কেননা, প্রথমত: এখানে “صلاة” স্ত্রীলিঙ্গ ধরেই “كلمة” শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ ব্যবহার করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত: “محمد” শব্দের পরেই “الذي” ইসমে মাউসুল নিয়ে আসা হয়েছে। জানা কথা ইসমে মাউসুলের পরে বাক্য থাকা এবং তার মধ্যে একটি সর্বনাম থাকা জরুরী যা মাউসুলের দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়। সুতরাং এখানে “হা” কে “الذي” এর দিকে না নিয়ে অন্য দিকে নেয়ার কথা বলা কতটুকু গাফলতির পরিচয় একটু ভেবে দেখুন। তৃতীয়ত: দো‘আটির শেষদিকে রয়েছে “بوجهه” তার চেহারা বা তার স্বত্বার মাধ্যমে। অতএব সর্বনামকে মুহাম্মদ ছাড়া অন্যদিকে নেওয়ার কোনো সুযোগ নেই। সুযোগ থাকাবস্থায় বক্তার কথা থেকে তার উদ্দেশ্যের বিপরীত অর্থ নেওয়াকে আরবী প্রবচনে বলা হয়, “توجيه القول بما لا يرض به” অর্থাৎ বক্তার কথার এমন ব্যাখ্যা দেওয়া যা বক্তার নিজের উদ্দেশ্য নয়। আর যেখানে কোনো সুযোগ নেই সেখানে এমনটি

নেওয়া কতটুকু অবান্তর ও হঠকারিতা একটু ভেবে দেখেছি কি? এবার ধরে নিন কেউ উপরোক্ত দুর্নদটিকে সমান্য পরিবর্তন করে সর্বনামগুলো দুর্নদের দিকে প্রত্যাবর্তন করে নতুন একটি দুর্নদ বানাল। যার মর্ম হল যেমন, “যে দুর্নদের মাধ্যমে সব সমস্যা সমাধান হয়”।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষা বা বলে দেওয়া ছাড়া কারো এধরণের কোনো কথা বলে বৈধ কি? বিভিন্ন দুর্নদ এবং তাতে কী লাভ, কী ফযিলত, কী উপকার সবই আমাদের নবী আমাদেরকে বলে গেছেন। ওহি ছাড়া এর বাইরে কিছু বলা বৈধ কি? ওহির বিষয়ে ওহি ছাড়া যুক্তি দিয়ে কিছু বলার নামইতো ভ্রষ্টতা বা গোমরাহী। মানুষের জ্ঞান যেখানে শেষ সেখান থেকে ওহীর সুচনা। ওহীর বিষয়ে যুক্তি দিয়ে বলার কারণেই বিভিন্ন বাতিল দল উপদলের জন্ম। এসব জানা থাকা সত্ত্বেও ওহির মুখাপেক্ষী বিষয়ে আমরা কী-ভাবে দখল দিতে পারি। এটি কি আল্লাহ ও তার রাসূলের উপর মিথ্যাচার নয়? আরেকটি অজুহাত কেউ কেউ পেশ করেন যে, আমাদের বিশ্বাস তো সবকিছু আল্লাহ করেন। রাসূল করেন বা মাধ্যম হন বলে আমাদের আক্বীদা নয়। তবে এটি শির্ক কী-ভাবে হয়? আর বেশিরভাগ লোক অর্থ না জেনেই পড়েন। আলহামদুলিল্লাহ, এই বিশ্বাস বলেইতো এই দুর্নদ পড়লেই আপনাকে কাফের বা মুশরিক বলা হচ্ছে না। আপনার বিশ্বাস এই দুর্নদের মর্মানুযায়ী হলে তো আপনি মুশরিক হয়ে যেতেন। বলা হচ্ছে এখানে শিকী কথাবার্তা রয়েছে। শিরকী আক্বীদা পোষণ ছাড়া

শিকী কথাবার্তা বলার হুকুম কী প্রশ্নটি আপনাদের কাছে রেখেই ইতি টানছি।

পরিশেষে আরেকটি কথা এই যে, অনেককেই বলতে শুনা যায়, খতমের বিপক্ষে এ সব কথা বলে আমাদের পেটে লাথি মারবেন না। আফসোস!! আপনি জাতির একজন কর্ণধার। আপনার মুখ থেকে এমন কথা বের হলে ঘুষখোর, সুদখোরের সামনে ঘুষ সুদের বয়ান করলে সে যখন বলে উঠে হুজুর, আমাদের পেটে লাথি মারবেন না। তার কথায় আর আপনার কথায় বেশ কম কী? সবার রিয়কের মালিক আল্লাহ। যে ব্যক্তি যে পথ অবলম্বন করে আল্লাহ তার জন্য সেই পথকেই সহজ করে দেন বলে আপনার আমার পূর্ণ বিশ্বাস। হালালের উপর থাকতে বন্ধপরিকর হলে আল্লাহ আপনার আমার রিয়কের ব্যবস্থা হালালের মধ্যে থেকেই করবেন বলে আমরা পূর্ণ আস্থাশীল ইনশা আল্লাহ। এর বিপরীত বিশ্বাসের পরিণাম কী তা আপনার আমার সবারই নিশ্চয় জানা আছে। আল্লাহ আমাদের সবাইকে বুঝা এবং হালালের উপর থাকার তওফিক দান করুন। আমীন।

খতমে ইয়াসিন

কুরআন করীমের মোট ১১৪ টি সূরার একটি সূরার নাম ইয়াসিন। সূরার ধারাবাহিক ক্রমানুসারে এটি কুরআনের ৩৬ নং সূরা। কুরআনের অন্যান্য আয়াত তেলাওয়াত করলে প্রতিটি অক্ষরে যে পরিমাণ সওয়াব পাওয়া যায় এই সূরা তেলাওয়াত করলেও তার প্রতিটি অক্ষরে সেই পরিমাণ সওয়াব পাওয়া যাবে। তবে কুরআনে

মাত্র কয়েকটি সূরা রয়েছে যেগুলোর অতিরিক্ত কিছু ফযিলত রয়েছে যা সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। সহীহ হাদীসে সূরা ইয়াসিনের অতিরিক্ত কোনো ফযিলত বর্ণিত হয় নি। দু একটি দুর্বল ও বিভিন্ন জাল বানোয়াট হাদীসে এ সূরার বিভিন্ন ফযিলত বর্ণনা করা হয়েছে। দুর্বল হাদীসের মধ্যে প্রসিদ্ধ হাদীসটি হচ্ছেঃ

"إن لكل شيء قلبا وقلب القرآن يس ومن قرأ يس كتب الله له بقراءتها قراءة القرآن عشر مرات". (سنن الترمذي، فضل يس، رقم: ২৮৮৭)

“প্রত্যেক বস্তুর একটি হৃদয় রয়েছে, আর কুরআনে হৃদয় হচ্ছে ‘ইয়াসিন’। যে ব্যক্তি ‘ইয়াসিন’ পড়বে আল্লাহ তার আমলনামায় দশবার পূর্ণ কুরআন পড়ার নেকী দান করবেন।”^{৫৬০}

ইমাম তিরমিযী হাদীসটি বর্ণনার পর নিজেই হাদীসটির সনদ গরীব ও দুর্বল বলে মন্তব্য বরং প্রমাণ করেছেন। তার মন্তব্য মতে হাদীসটি একেবারেই দুর্বল। অনেকে হাদীসটিকে বানোয়াট বলেও মন্তব্য করেছেন। তিরমিযির আলোচনা থেকেও এমন ইঙ্গিত পাওয়া যায়। মোটকথা ‘ইয়াসিন’ সূরার আলাদা ফযিলতে কোনো নির্ভরযোগ্য হাদীস নেই।^{৫৬১} হাদীসটির অবস্থা এমন অর্থাৎ বিশুদ্ধ না হলেও তা আমাদের সমাজে অত্যন্ত প্রচলিত। অপরদিকে এই হাদীস এবং আরো কিছু ভিত্তিহীন হাদীসের উপর নির্ভর করে চালু রয়েছে এই সূরার খতম। একবার পড়ার খতম, দশবার পড়ার খতম, চল্লিশবার পড়ার খতম। কুরআন বা সুন্নাহ যার কোনো ভিত্তি

^{৫৬০} তিরমিযী, সুনান, ইয়াসিনের মর্যাদা অনুচ্ছেদ, নং: ২৮৮৭।

^{৫৬১} আলী হাশীশ, সিলসিলাতুল আহাদীসিল ওয়াহিয়াহ, ১/৩৩৫, আলবানী, আস-সিলসিলাতুদ্-দয়ীফাহ, ১/৩১২।

নেই। যার মনে যা চেয়েছে ইচ্ছামত রাসূলের সুন্নাহ এর পরিবর্তন ঘটিয়েছে। কারো মৃত্যু নিকটবর্তী হলে তার নিকট এই সূরা খতম করার প্রচলন রয়েছে। এতে নাকি মুমূর্ষ ব্যক্তির কষ্ট হাক্কা হয়। এসবের কোনো কিছুই সহীহ হাদীস নির্ভর নয়। পক্ষান্তরে সহীহ হাদীসে মুমূর্ষ ব্যক্তির পাশে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ এর তালকীনের কথা এসেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«لَقْنُوا مَوْتَكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ». صحيح مسلم، باب تلقين الموتى لا اله الا

الله، رقم: ২১৬২

“মৃত্যু উপস্থিত ব্যক্তিকে তোমরা ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ এর তালকীন করো।”^{৫৬৫} এর বিপরীত মুমূর্ষ ব্যক্তির পাশে ‘ইয়াসিন’ পড়ার কোনো আমল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত নয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন শিক্ষা সাহাবিদের দেন নি। এ সম্পর্কে যা বলা সবই অনির্ভরযোগ্য, ভিত্তিহীন ও বানোয়াট।

‘ইয়াসিন’ খতমের একটি বানোয়াট পদ্ধতি

‘নস’ তথা কুরআন হাদীসের শিক্ষা একপাশে রেখে যুক্তি ও মনগড়া এবং সহীহ ছেড়ে ভিত্তিহিনের উপর দিয়ে নিজের মর্জি মোতাবেক শরী‘আত পরিবর্তনের কর্ম মূলত শিয়া, খাওয়ারিজ ইত্যাদি ভ্রান্ত সম্প্রদায় থেকেই শুরু হয়। পরবর্তীতে তাদের প্রভাব অনেক আহলুস-সুন্নাহ ওয়াল জামা‘আতের আলেমদের মাঝে বিস্তার লাভ করে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর থেকে এ পর্যন্ত

^{৫৬৫} সহীহ মুসলিম, মৃত্যু উপস্থিত ব্যক্তিকে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ এর তালকীন অনুচ্ছেদ, নং: ২১৬২। তালকীন অর্থাৎ মুমূর্ষ ব্যক্তি মুখোমুখি এই কালেমা উচ্চারণ করা, যাতে সে তা শিখে বা স্মরণ করে পড়তে পারে। এতে তার জীবনের শেষ বাক্য ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ হবে।

ইতিহাসের পাতায় একটু গভীর দৃষ্টি দিলেই বিষয়টি সবার কাছে ধরা পড়বে বলে আশা করি। এবার শিয়াদের বানানো একটি মনগড়া ‘খতমে ইয়াসিন’ দেখুন।

প্রয়োজন পূরণে ইয়াসিনের খতম যার পদ্ধতি নিম্নরূপ^{৫৬৬}

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 ﴿يَس وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ
 الرَّحِيمِ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنْذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ
 لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ وَجَعَلْنَا
 مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وَسَوَاءٌ
 عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ

إِنَّمَا تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ الْعَلِيمَ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ إِنَّا
 نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَرَهُمْ وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ﴾
 এরপর এই দো‘আ তিনবার পড়বে:

سُبْحَانَ الْمُفَرِّجِ عَنْ كُلِّ مَحْزُونٍ , سُبْحَانَ الْمَخْلِصِ عَنْ كُلِّ مَشْهُونٍ , سُبْحَانَ
 الْمُتَّقِيسِ عَنْ كُلِّ مَدْيُونٍ سُبْحَانَ الْعَالِمِ عَنْ كُلِّ مَكْنُونٍ , سُبْحَانَ مَنْ جَعَلَ
 سُبْحَانَ مَنْ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ , خَزَائِنُهُ بَيْنَ الْكَافِ وَالْثَوْنِ
 سُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

এরপর বল:

اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَأَبْوَابَ خَزَائِنِكَ بِحَقِّ سُورَةِ يَسْ وَبِقُضْلِكَ وَكَرَمِكَ
 يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

এরপর তুমি ১০০ বার বল

^{৫৬৬} মুনতাদাল-কফীল ওয়েব। আল-মুনতাদার-রাসমি, শায়খ আব্দুর রেযা মা‘আশ।

إِلَهِ يَحَقِّ سِرَّ هَذِهِ الْأَسْرَارِ وَيَحَقِّ كَرَمِكَ الْخَفِيِّ وَيَحَقِّ إِسْمِكَ الْعَظِيمِ أَنْ تَقْضِيَ
حَاجَاتِنَا يَا قَاضِيَ الْحَاجَاتِ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ
﴿وَأَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ
فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا
وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ
لَمُرْسَلُونَ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ﴾

এরপর একবার পড়বে

سُبْحَانَ الْمَفْرَجِ عَنْ كُلِّ مَحْزُونٍ , سُبْحَانَ الْمَخْلِصِ عَنْ كُلِّ مَشْحُونٍ , سُبْحَانَ
الْمُنْقِصِ عَنْ كُلِّ مَدْيُونٍ سُبْحَانَ الْعَالِمِ عَنْ كُلِّ مَكْنُونٍ , سُبْحَانَ مَنْ جَعَلَ
سُبْحَانَ مَنْ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ , خَزَائِنُهُ بَيْنَ الْكَافِ وَالنُّونِ
سُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

এরপর ১০০ বার বল (যা মফরজ অহম) এবং এই দোআ কর

الهي بحق سر هذه الاسرار وبحق كرمك الخفي وبحق اسمك العظيم
.ان تقضي حاجاتنا (وحاجات الحاضرين) يا قاضي الحاجات يا ارحم الراحمين
﴿قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ
قَالُوا طَائِرُكُم مَّعَكُمْ أَئِنْ ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ وَجَاء مِنْ أَقْصَى
الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَن لَّا يَسْأَلْكُمْ أَجْرًا وَهُمْ
مُهِتَدُونَ وَمَا لِي لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَأَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً إِنْ
يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بَضْرًا لَّا تَغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونِ إِنِّي إِذًا لَفِي ضَلَالٍ
مُّبِينٍ﴾

এরপর পড়বে

سُبْحَانَ الْمُفَرِّجِ عَنْ كُلِّ مَحْزُونٍ , سُبْحَانَ الْمَخْلِصِ عَنْ كُلِّ مَشْحُونٍ , سُبْحَانَ الْمُتَّقِيسِ عَنْ كُلِّ مَدْيُونٍ سُبْحَانَ الْعَالِمِ عَنْ كُلِّ مَكْنُونٍ , سُبْحَانَ مَنْ جَعَلَ سُبْحَانَ مَنْ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ , خَزَائِنُهُ بَيْنَ الْكَافِ وَالْثَوْنِ سُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

এরপর বল

اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي ابواب رحمتك وابواب خزائنك بحق سورة يس وبفضلك وكرمك .
يا ارحم الراحمين

এরপর ১০০ বার বল (يا مفرج الهم)

এবং এই দো'আ কর

الهي بحق سر هذه الاسرار وبحق كرمك الخفي وبحق اسمك العظيم ان تقضي حاجاتنا (وحاجات الحاضرين) يا قاضي الحاجات يا ارحم الراحمين
﴿ إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُندٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ يَا حَسْرَةَ عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ وَإِنْ كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَالْقَمَرَ قَدَرْنَا مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ

سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلِّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلِكِ الْمَشْحُونِ وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ وَإِنْ نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْطَعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿

এরপর পড়বে:

سُبْحَانَ الْمُفْرِجِ عَنْ كُلِّ حَزُونٍ , سُبْحَانَ الْمَخْلِصِ عَنْ كُلِّ مَشْحُونٍ , سُبْحَانَ الْمُنْقِصِ عَنْ كُلِّ مَدْيُونٍ سُبْحَانَ الْعَالِمِ عَنْ كُلِّ مَكْنُونٍ , سُبْحَانَ مَنْ جَعَلَ سُبْحَانَ مَنْ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ , خَزَائِنُهُ بَيْنَ الْكَافِ وَالنُّونِ سُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

এরপর বল

اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي ابواب رحمتك وابواب خزائنك بحق سورة يس وبفضلك وكرمك يا ارحم الراحمين

এরপর ১০০ বার বল

يا مفرج الهم

এবং এই দো'আ কর

الهي بحق سر هذه الاسرار وبحق كرمك الخفي وبحق اسمك العظيم ان تقضي حاجاتنا (وحاجات الحاضرين) يا قاضي الحاجات يا ارحم الراحمين ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّصُونَ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ

وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغْلٍ فَاكِهُونَ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَكِئُونَ لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدْعُونَ سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحِيمٍ وَامْتَاذُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿

এরপর পড়বে

سُبْحَانَ الْمَفْرَجِ عَنْ كُلِّ مُحْزُونٍ , سُبْحَانَ الْمَخْلَصِ عَنْ كُلِّ مَشْحُونٍ , سُبْحَانَ الْمُنْقِيسِ عَنْ كُلِّ مَدْيُونٍ سُبْحَانَ الْعَالِمِ عَنْ كُلِّ مَكْنُونٍ , سُبْحَانَ مَنْ جَعَلَ سُبْحَانَ مَنْ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ , خَزَائِنُهُ بَيْنَ الْكَافِ وَالنُّونِ سُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

এরপর বল

اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي ابواب رحمتك وابواب خزائنك بحق سورة يس وبفضلك وكرمك يا ارحم الراحمين

এরপর ১০০ বল: (يامفرج الهم) এবং এই দো'আ কর

الهي بحق سر هذه الاسرار وبحق كرمك الخفي وبحق اسمك العظيم ان تقضي حاجاتنا (وحاجات الحاضرين) يا قاضي الحاجات يا ارحم الراحمين ﴿وَأَنْ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّى يُبْصِرُونَ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ وَمَنْ نُعَمِّرْهُ

نُكِّسَهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشَّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ
وَقُرْآنٌ مُبِينٌ ﴿

এরপর পড়বে

سُبْحَانَ الْمُفَرِّجِ عَنْ كُلِّ مَحْزُونٍ , سُبْحَانَ الْمَخْلِصِ عَنْ كُلِّ مَشْحُونٍ , سُبْحَانَ
الْمُنْقِصِ عَنْ كُلِّ مَدْيُونٍ سُبْحَانَ الْعَالِمِ عَنْ كُلِّ مَكْنُونٍ , سُبْحَانَ مَنْ جَعَلَ
سُبْحَانَ مَنْ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ , خَزَائِنُهُ بَيْنَ الْكَافِ وَالْثَوْنِ
. سُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

এরপর বল

اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَأَبْوَابَ خَزَائِنِكَ بِحَقِّ سُورَةِ يَسٍ وَبِفَضْلِكَ وَكَرَمِكَ
يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

এরপর ১০০ বার বল (যামফরজ অহম) এবং এই দ্বৈত্ব কর:

الهي بحق سر هذه الاسرار وبحق كرمك الخفي وبحق اسمك العظيم ان تقضي
. حاجاتنا (وحاجات الحاضرين) يا قاضي الحاجات يا ارحم الراحمين
﴿ لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقِّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا
عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ
وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ
يُنْصَرُونَ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُنْصَرُونَ فَلَا يَحْزَنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا
نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ
خَصِيمٌ مُبِينٌ ﴿

এরপর পড়বে

سُبْحَانَ الْمُفَرِّجِ عَنْ كُلِّ مَحْزُونٍ , سُبْحَانَ الْمَخْلِصِ عَنْ كُلِّ مَشْحُونٍ , سُبْحَانَ
الْمُنْقِصِ عَنْ كُلِّ مَدْيُونٍ سُبْحَانَ الْعَالِمِ عَنْ كُلِّ مَكْنُونٍ , سُبْحَانَ مَنْ جَعَلَ

سُبْحَانَ مَنْ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ , خَزَائِنُهُ بَيْنَ الْكَافِ وَالنَّوِنِ
 . سُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

এরপর বল

اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَأَبْوَابَ خَزَائِنِكَ بِحَقِّ سُورَةِ يَسٍ وَبِفَضْلِكَ وَكَرَمِكَ
 يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

এরপর ১০০ বল (يا مفرج الهم) এবং এই দোআ পড়:

الهي بحق سر هذه الاسرار وبحق كرمك الخفي وبحق اسمك العظيم ان تقضي
 . حاجاتنا (وحاجات الحاضرين) يا قاضي الحاجات يا ارحم الراحمين
 وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي
 أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ
 نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِّنْهُ تُوقَدُونَ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ
 يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ إِنَّ مَا أَمَرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ
 فَيَكُونُ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

পাঠক, পদ্ধতিটি নমুনা স্বরূপ হুবহু উল্লেখ করতে গিয়ে একটু দীর্ঘ
 হয়েছে। বুঝার সুবিধার্থে শিয়া আলেমদের উল্লেখিত পদ্ধতিটি হুবহু
 তুলে ধরলাম। পদ্ধতিটির সাথে বানোয়াট অনেক ফযিলত উল্লেখ
 করা হয়েছে। অতিরিক্ত দীর্ঘ হয়ে যাবে বলে তা ছেড়ে দেয়েছি।
 নিশ্চয় আপনি ইয়াসিন খতমের এই পদ্ধতি দেখেই তা মনগড়া
 বানোয়াট এবং বানানো বলে উড়িয়ে দিবেন। কারণ হিসেবে রাসূল
 শিখান নি, সাহাবিরা করেন নি, খাইরুল কুররুনে এর কোনো নজীর
 নেই বলে উল্লেখ করবেন। এই যদি হয় এই পদ্ধতি বানোয়াট
 হওয়ার দলীল এবং বাস্তবেও তাই, তবে আমাদের মাঝে যে

পদ্ধতির প্রচলন আছে তার কি কোনো অস্তিত্ব কল্যাণের সাক্ষ্যপ্রাপ্ত যুগে আছে? যদি এর উত্তর ‘না’ হয় এবং আসলেও তাই, তবে উভর পদ্ধতিই মনগড়া ও বানোয়াট। সবকিছু থেকেই বিরত থাকা আমাদের জন্য অপরিহার্য। আর যদি বলেন, বুয়ুর্গদের থেকে এমন আমল পাওয়া গেছে, তবে অন্যদের বুয়ুর্গদের কি দোষ? আপনার আমার বুয়ুর্গের কথা গ্রহণযোগ্য, আর তাদের বুয়ুর্গদের কথা গ্রহণযোগ্য নয় এ কেমন ইনসাফ? আপনি নিজেই বিচার করুন। নিজের পক্ষের লোকের কথা নির্বিচারে গ্রহণ, অন্যের কথা শুদ্ধ হলেও প্রত্যাখ্যান এটি একমাত্র বিভ্রান্ত দলের বৈশিষ্ট্য। পক্ষান্তরে আহলুসুন্নাহ ওয়াল জামাতের আলেমদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, সবার কথা নিরীক্ষার মাধ্যমে গ্রহণ, সहीহ বা নির্ভুল হলে অন্যের কথাও গ্রহণ। ভুল হলে নিজ মতাদর্শের লোকের কথাও প্রত্যাখ্যান। এই আমানতদারীর সাথে তারা দ্বীনি ইলমের শিক্ষা দিয়ে গেছেন। যুক্তির আলোকে সুন্নাহ বিরোধী কর্ম সৃষ্টির সূচনা করতে পারলে আরেকজন তার যুক্তিতে বানানো জিনিসটিকে একটু মোডিফাই বা সুন্দর করতে সমস্যা কোথায়? বরং এটাইতো নিয়ম। যাই হোক, আমরা যারা সুন্নাহের উপর থাকতে চাই, সুন্নাহকে যুক্তি ও প্রচলনের উপর অগ্রাধিকার দেই ইবাদতের মধ্যে কম বেশ নতুন কোনো নিয়মই আমরা মানি না বা মানতে পারি না। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাহের বাইরে গেলেই বিদআতে লিপ্ত হওয়ার আশংকা সর্বদা আমাদের মনে কাজ করে। আল্লাহ যেন আমাদেরকে এই আদর্শের অবিচল রাখেন। সবাইকে সুন্নাহ বোঝার

তওফিক দান করেন। হুবহু সুন্নাহের উপর থাকা, বিদ্বাতকে সম্পূর্ণরূপে পরিহার করার তওফিকই তার কাছে আমাদের কাম্য। আমীন।

খতমে শিফা

‘শিফা’ শব্দের আরবী মূল শব্দ ‘شفاء’ যার অর্থ রোগমুক্ত করা বা রোগ নিরাময়। এভাবে ‘খতমে শিফা’ অর্থ: রোগ নিরাময় করার খতম। কেউ অসুস্থ হলে তার রোগমুক্তির আশায় এই খতম পড়ানো হয়। আমাদের দেশে প্রচলিত একটি বইয়ে এই খতমটি যেভাবে তুলে ধরা হয়েছেঃ

“খতমে শিফাঃ لا اله الا الله (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ)

এই পবিত্র কালেমা একলক্ষ পঁচিশ হাজার বার পাঠ করাকে “খতমে শিফা” বলে। একে খতমে তাহলীলও বলা হয়। এই খতম পাঠ করিয়া এর সোয়াব মৃত লোকের রুহের উদ্দেশ্যে বখশিশ করিয়া দিলে নিশ্চয় আল্লাহ তা‘আলা এর উসিলায় তাকে মাফ করিয়া দিবেন ও বেহেশত দান করবেন। যদি কোনো ব্যক্তি কোনো কঠিন বিপদের সম্মুখীন হয় অথবা কোনো কঠিন রোগে আক্রান্ত হইয়া দীর্ঘদিন ভুগিতে থাকে, তবে উক্ত কালাম তাহার নিকট বসিয়া সশব্দে পাঠ করিতে থাকিবে, যেন সেই রোগী উহা শুনিতে পায়। আল্লাহর ফযলে খতম শেষ হইবার পূর্বেই ইহার আশ্চর্য ফল বুঝিতে পারা যায়। কোনো মুমূর্ষু লোকের নিকট বসে এই খতম পাঠ করলে তাহার রোগ যন্ত্রনা লাঘব হয় এবং পরমায়ু শেষ হইয়া থাকিলে আছানির সহিত মৃত্যু হয়। এই খতম একজনে পাঠ করাই ভাল,

তবে জরুরী প্রয়োজনে ১০/১৫ জন একত্র বসিয়া একদিনেও খতম করা চলে।”^{৫৬৭}

ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। ওহী নির্ভর কথার উপর নিজ থেকে কিছু বলার কি দুঃসাহসিকতা!! রোগ আল্লাহ দেন এবং তিনিই মানুষকে রোগমুক্ত করেন। কারো রোগ দেখা দিলে রোগীর নিজের কী করণীয় এবং তার বেলায় অন্যদের কী করণীয় সবই বলে গেছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষার মাঝে “খতমে শিফা” নামের কিছু নেই। একবার সাহাবায়ে কেরাম আরয করলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমরা কি চিকিৎসা করব? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের প্রশ্নের উত্তরে বলেনঃ

« تداووا فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له دواء غير داء واحد اللهم ». سنن أبي داود، كتاب الطب، باب في الرجل يتداوى، رقم: ৩৮৫৭، سنن الترمذي، كتاب الطب، باب الدواء والحث عليه، رقم: ২০৩৮

“তোমরা চিকিৎসা গ্রহণ কর। কেননা মহান আল্লাহ তা‘আলা এমন কোনো রোগ দেননি যার ঔষধ দেননি, একমাত্র মৃত্যু ব্যতীত।”^{৫৬৮} আরেকটি হাদীসে এরশাদ করেন:

« لكل داء دواء فإذا أصيب الداء برأ بإذن الله عز وجل »
(صحيح مسلم، باب لكل داء دواء واستحباب التداوي، رقم: ৫৮৭১)

^{৫৬৭} মোকছুদুল মো‘মিনীন বা বেহেস্তের পুঞ্জী, আলহাজ্জ হযরত মাওলানা মোহাম্মদ নাজমুল হক, পঞ্চদশ খ-., ১৭৮ পৃষ্ঠা। সাদনান পাবলিকেশন।

^{৫৬৮} আবু দাউদ, সুনান, চিকিৎসা অধ্যায়, ব্যক্তির চিকিৎসা গ্রহণ অনুচ্ছেদ, নং: ৩৮৫৭, তিরমিযী, সুনান, চিকিৎসা অধ্যায়, ঔষধ ও তার প্রতি উৎসাহিত করা অনুচ্ছেদ, নং: ২০৩৮।

.... “প্রত্যেক রোগের ঔষধ রয়েছে। অতঃপর যখন ঔষধ রোগের সাথে ঠিকমত পড়ে আল্লাহর ইচ্ছায় ভালো হয়^{৫৬৯}।

এভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চিকিৎসা গ্রহণের আরো অনেক হাদীস রয়েছে। স্বয়ং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন ধরনের চিকিৎসা গ্রহণ করেছেন। হাদীসের পাতা খুললেই চিকিৎসা গ্রহণের ঘটনা পাওয়া যায়।

মুহাদ্দিসীনে কেরামের অনেকে তাদের কিতাবে ‘চিকিৎসা অধ্যায়’ নামে পৃথক অধ্যায় রচনা করেছেন। তবে মুমিন ব্যক্তি চিকিৎসাকে শুধুমাত্র মাধ্যম হিসেবেই গ্রহণ করেন। তার বিশ্বাস, রোগ নিবারণের মালিক একমাত্র আল্লাহ তা‘আলা। তবে আল্লাহ অমুক ঔষধ অমুক রোগের জন্য দিয়েছেন বলে গবেষণার মাধ্যমে এ বিষয়ের পণ্ডিতগণ জানতে পেরেছেন।

তাই ঔষধ ব্যবহার মূলত আল্লাহর নির্দেশ বলেই আমরা হাদীসের আলোকে জানতে পারি। বিধায় মুমিন ঔষধ ব্যবহার করেন। এতে তিনি নবীর সুন্নাত পালন করেন। তাই মুমিন ঔষধ ব্যবহার করলেও আল্লাহকে ভুলেন না।

ঔষধ যেন ঠিকমত কাজ করে তার জন্য তিনি সকাতরে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেন। ঔষধ তাকে আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল করে না। বরং আল্লাহ এই ঔষধের মাঝে রোগের শিফা রেখেছেন বলে সে ঔষধ ব্যবহার করে আরো বেশি আল্লাহর শুকরিয়া জ্ঞাপন করতঃ আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ করে। এ হলো একজন মুমিন

^{৫৬৯} সহীহ মুসলিম, প্রত্যেক রোগের ঔষধ রয়েছে এবং চিকিৎসা করা মুস্তাহাব অনুচ্ছেদ, নং: ৫৮৭১।

অসুস্থ হলে তার নিজের কাজ। অপরদিকে এক মুমিন আরেক মুমিনের ভাই বলে কুরআন ও হাদীসে ঘোষণা করা হয়েছে। তাই একজন মুমিন অসুস্থ হয়ে বিপদে পড়লে অপর মুমিনের অনেক দায়িত্ব রয়েছে।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সব মুমিনকে একই ব্যক্তির সাথে তুলনা করেছেন। একজন মানুষের একটি অঙ্গে ব্যথা হলে তার সমস্ত শরীর যেমন কষ্ট অনুভব করে তদ্রূপ একজন মুমিন ব্যথিত হলে প্রতিটি মুমিন তার ব্যথায় ব্যথিত হওয়া ঈমানের আলামত বলে আমাদেরকে বুঝিয়েছেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

« مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى ».

(صحيح مسلم، باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم، رقم: ৬৭৫১)

“মুমিনদের দৃষ্টান্ত পরস্পরের প্রতি দয়া, মমতা, আন্তরিকতার দিক দিয়ে একটি দেহের মত। তাদের দেহের একটি অংশ আক্রান্ত হলে, তার সমগ্র অঙ্গ ব্যথা, যন্ত্রনা ও অনিদ্রায় আক্রান্ত হয়।”^{৭০} এই হাদীস থেকেই কোনো মুমিন অসুস্থ হলে আরেক মুমিনের কি করণীয়, তার কতটুকু দায়িত্ব উপলব্ধি করা যায়। তথাপি এ হাদীস ছাড়া আরো অনেক হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুমিনের অনেক করণীয় স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন। একজন অসুস্থ

^{৭০} সহীহ মুসলিম, কিতাবুল বির ওয়াসসিলাহ, মুমিনদের প্রতি দয়া, মমতা সহযোগিতা পরিচ্ছেদ, নং: ৬৭৫১, সহীহুল বুখারী, কিতাবুল আদব, পরিচ্ছেদ: মানুষ ওউপর দয়া চতুস্পদ জন্তর করা, নং: ৫৬৬৫।

মুমিনের আরেক মুমিনের উপর তাকে দেখতে যাওয়াকে অধিকার সাব্যস্ত করেছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ

وَإِذَا مَرَضَ فَعُدُّهُ وَإِذَا قِيلَ مَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ « حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ ».
مَاتَ فَاتَّبِعْهُ. (صحيح مسلم، باب من حق المسلم على المسلم، رقم: ৫৭৭৮)

“এক মুসলিমের অপর মুসলিমের উপর ছয়টি প্রাপ্য রয়েছে। বলা হলো: হে আল্লাহর রাসূল: সেগুলো কী? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: আর যখন সে অসুস্থ হয় তাকে দেখতে যাও, আর যখন সে মারা যায় তার জানাযায় অংশ নাও।”^{৫৭১}

রোগীকে দেখতে যাওয়া বা তার সেবার ফযিলতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ

« من عاد مريضاً لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع ». (صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والأدب، باب فضل عيادة المريض، رقم: ৬৭১৭)

“যে ব্যক্তি রোগীকে দেখতে যায় ফিরে আসার পূর্ব পর্যন্ত সে জান্নাতের ফলের মাঝে থাকে।”^{৫৭২}

এভাবে রোগী দেখতে যাওয়া, তাঁর সেবা করা, এর ফযিলত সংক্রান্ত বিভিন্ন হাদীস বর্ণিত হয়েছে। দেখতে গিয়ে কী পড়বে এতেও নবীর সুন্নাত রয়েছে। হাদীসে রয়েছে:

« أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على رجل يعوده فقال: "لا بأس طهور إن شاء الله" ». (صحيح البخاري، باب علامات النبوة في الإسلام، رقم: ৫৩৩৮)

“রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তির কাছে তার রোগ দেখতে গেলেন। গিয়ে বললেন: কোনো অসুবিধা নেই, (ভাল হয়ে

^{৫৭১} সহীহ মুসলিম, মুসলিমের উপর অপর মুসলিমের হক পরিচ্ছেদ, নং: ৫৭৭৮।

^{৫৭২} সহীহ মুসলিম, কিতাবুল বির ওয়াসসিলাহ, রোগী দেখতে যাওয়ার মর্যাদা পরিচ্ছেদ, নং: ৬৭১৭।

যাবে) পবিত্র হবে (রোগ গোনাহের কাফ্ফারা হয়ে গোনাহ থেকে পবিত্র করবে) ইন-শা-আল্লাহ।”^{৫৭৩}

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এত দিক নির্দেশনা থাকতে এগুলো বাদ দিয়ে, বা এগুলো রেখে নতুন কিছু সংযোজন করে ‘খতমে শিফা’ নামে খতম বের করা হয়েছে যার কোনো ভিত্তি নেই। এর ফযিলতে যা বলা হয়েছে সবই মনগড়া। এই খতম রোগ নিবারণের খতম হলে আর অন্য কিছুর কি দরকার ছিল? রোগের জন্য কুরআন খতম, বুখারীর হাদীসের খতমকে অভিজ্ঞতার বাহানায় অর্থ উপার্জনের মাধ্যম বানানোর কি প্রয়োজন ছিল।

অসুস্থ ব্যক্তি অজ্ঞতার কারণে না বুঝলে তাকে সঠিক বিষয় বোঝানোই ছিল একজন আলেমের দায়িত্ব। তাকে দীনের দাওয়াত দেওয়ার এটি ছিল একটি সুবর্ণ সুযোগ। তাকে দীনের সঠিক একটি শিক্ষাদান আমার মৃত্যুর পরও কাজে আসতো। এই দায়িত্ব আদায় না করে বরং তার অজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে নিজের স্বার্থ উদ্ধারের চিন্তা করা কতটুকু অমানবিক কাজ তা ভেবে দেখা প্রয়োজন। এই অমানবিক কাজকেই তার থেকে কিছু অর্থ উদ্ধারের সুবর্ণ সুযোগ পাওয়া গেছে বলে মনে করা হয়। সবচেয়ে দুঃখজনক ব্যাপার এই যে, একজন অসুস্থ মানুষ মানেই সে যে কোনো দিক থেকে বিপদগ্রস্ত। এই বিপদে আমাকে আমার সামর্থানুযায়ী তার সাহায্যে এগিয়ে আসা প্রয়োজন ছিল। আজীবন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের এই শিক্ষাই দিয়ে গেলেন। আমরা রাসূলের

^{৫৭৩} সহীহুল বুখারী, ইসলামে নবুওয়াতের আলামত পরিচ্ছেদ, নং: ৫৩৩৮।

এই শিক্ষাতো গ্রহণ করছিই না, উপরন্তু বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিকে আরো বিপদ ও ঝামেলায় ফেলছি। তাকে সাহায্য না করে খতমের বাহানায় তার থেকেই আর্থিক সাহায্য নিচ্ছি। আল্লাহ আমাকে এবং সবাইকে হেদায়াত দান করুন। সাহায্য গ্রহণ না করে সাহায্য করার তওফিক ও মানসিকতা দান করুন। আমীন। উল্লেখ্য যে, ‘খতমে শিফা’ নামের খতমের বর্ণিত পদ্ধতি ছাড়া অন্য পদ্ধতিও বলা হয়ে থাকে। যেমন, ‘ইয়া সালামু’ নির্দিষ্ট সংখ্যায় পড়া। এর কোনো ভিত্তি নেই। টাকার পরিমাণে ছোট দো‘আ, বড় দো‘আ, কম সংখ্যা, বেশি সংখ্যা নির্ধারিত হয়ে থাকে। অনেক সময় পড়ার মাঝে কম বেশি করা আয়োজকের তদারিকের উপর নির্ভর করে। আল্লাহ আমাদেরকে এসব থেকে দূরে রাখুন। আমীন।

খতমে তাহলীল

খতমে তাহলীল বা " لا اله الا الله " (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ) এর খতম। খতমে শিফার সাথেই তা পড়ার নিয়ম ও এর ফযিলতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এ সবকিছুই মনগড়া, বানোয়াট ও ভিত্তিহীন। এই কালিমাটি হচ্ছে ইসলামে মূল।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ২৩ বছরের পুরো জীবনটাই এই কালেমার তাৎপর্য বুঝানো এবং এর তাৎপর্যের উপর সাহাবীদেরকে উঠানোর পিছনে ব্যয় করেছেন। সাহাবায়ে কেরাম থেকে বর্ণিত, তারা প্রথমে ঈমান অতঃপর কুরআন শিক্ষা করেছেন।^{৭৪} হাদীসে এই কালেমার যিকরকে সর্বোত্তম যিকর বলা

^{৭৪} ইবনে মাজাহ, হাদীস সহীহ, ঈমান অধ্যায়, ঈমানে একটি অনুচ্ছেদ, নং: ৬১।

হয়েছে। জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিতঃ “আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি: সর্বশ্রেষ্ঠ যিকর ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ দো‘আ ‘আলহামদুলিল্লাহ’”।^{৫৭৫} পক্ষান্তরে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জীবনে কখনো সাহাবীদেরকে খতম নামের এসব কোনো কথা বলেননি বা শিক্ষা দেন নি।

রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষার ভিত্তিতে সাহাবায়ে কেরাম তাদের জীবনে ঈমানের পিছনে অনেক মেহনত করে এই কালেমার তাৎপর্য তাদের অন্তরে বসালেও কখনোই তাদের থেকে এমন ধরনের কোনো শিক্ষা বা কথাবার্তা পাওয়া যায় না, এমনকি কল্যাণের সাক্ষ্যপ্রাপ্ত বা খাইরুল কুরূনের কোনো যুগেই এসবের কোনো অস্তিত্ব বিদ্যমান নেই। অন্য মানুষ এই কালেমার খতম করে মৃত ব্যক্তিকে জান্নাতে বা স্বর্গে পাঠিয়ে দেওয়ার ধারণা মূলত বিধর্মী, ব্রাহ্মণী, পুরোহিতবাদি শিক্ষা।

ইসলামের শিক্ষা যার সম্পূর্ণ বিপরীত। হিন্দুত্ববাদের হাওয়ায় কোনো অজ্ঞ সুফি সাধক থেকে এই খতমের সুচনা হওয়া অসম্ভবের কিছু নয়। আমাদের দেশের হিন্দু সমাজে এর বাস্তবতা পাওয়া যায়। আল্লাহই ভাল জানেন। তিনি আমাদেরকে এসব বুঝে এগুলোর খপ্পর থেকে নিরাপদ রাখুন। কালিমার সঠিক মর্ম বুঝে আমল করা এবং এর দা‘ওয়াত দেওয়ার তওফিক দান করুন। আমীন।

^{৫৭৫} তিরমিযী, সুনান, হাদীস হাসান, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দো‘আ অধ্যায়, মুসলিমের দো‘আ গৃহীত অনুচ্ছেদ, নং: ৩৩৮৩, সহীহ ইবনে হিব্বান, আযকার অধ্যায়, নং: ৮৪৬, সহীহ কুণুযিস্-সুন্নাতিন্-নাবাবিয়াহ, আল্লাহর যিকর অনুচ্ছেদ, ১/৯।

খতমে তাসমিয়া

‘তাসমিয়া’ শব্দের মূল অর্থ নামকরণ করা। মুসলিম ব্যক্তি যে কোনো কাজ আল্লাহর নাম নিয়েই শুরু করেন, তাই আল্লাহর নাম নেওয়া বা বিসমিল্লাহ বলার ক্ষেত্রেও শব্দটি প্রয়োগ হয়। এভাবে ‘খতমে তাসমিয়া’ বিসমিল্লাহ এর খতমকে বুঝানো হয়ে থাকে। একলক্ষ পঁচিশ হাজার বার “বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম” পাঠের মাধ্যমে এই খতম করতে হয়। এই খতমের বিবরণে লেখা হয়েছেঃ “এই পাক কালাম একলক্ষ পঁচিশ হাজার বার পাঠ করাকে “খতমে তাসমিয়া” বলে। কোনো কঠিন বিপদ হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য অথবা কোনো মনোবাসনা পূর্ণ হওয়ার জন্য এই খতম অত্যন্ত ফলপ্রদ। অনেক লোক একত্রিত হয়ে একই বৈঠকে এই খতম পাঠ করিয়া আল্লাহর দরবারে মোনাজাত করলে আল্লাহ তাআলা নিশ্চয় তাহাকে সেই বিপদ হইতে রক্ষা করেন বা তাহার বাসনা পূর্ণ করেন।”^{৫৭৬} যে কোনো কাজ আল্লাহর নামে শুরু করা ইসলামের মৌলিক শিক্ষার অন্যতম। “পড় তোমার রাব্ব এর নামে যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন”^{৫৭৭} বলে ওহির সুচনাতেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জীবনের সকল ক্ষেত্রে এই শিক্ষার বাস্তবায়ন করেছেন। ‘বিসমিল্লাহ’ ব্যবহারের মাধ্যমে এর বাস্তব প্রয়োগের সাথে সাথে সাহায্যে কেরামদেরকেও এর নির্দেশ

^{৫৭৬} মোকছুদুল মোমিনীন বা বেহেস্তের পুঞ্জী, আলহাজ্ব হযরত মাওলানা মোহাম্মদ নাজমুল হক, পঞ্চদশ খণ্ড, ১৭৮ পৃষ্ঠা। সাদনান পাবলিকেশন।

^{৫৭৭} সূরা আলাক, আয়াত: ১।

দিয়েছেন। সাহাবায়ে কেলাম তাদের জীবনের সর্বক্ষেত্রে এই শিক্ষার বাস্তবায়ন ঘটিয়েছেন। এছাড়া ‘বিসমিল্লাহ’ বলে রোগের ঝাড় ফুঁকের আমলও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে পাওয়া যায়। সাহাবী উসমান ইবন আবিদ ‘আস আস-সাক্বাফী একদা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে তাঁর শরীরের একটি ব্যথার অভিযোগ করলেন। ইসলাম গ্রহণের পর থেকেই তিনি তাঁর শরীরে এই ব্যথা অনুভব করছেন বলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আরয় করলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেনঃ

« ضع يدك على الذى تألم من جسدك وقل باسم الله. ثلاثا. وقل سبع مرات (صحيح مسلم، باب استحباب أَعُوذُ بِاللّٰهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ. وضع يده على موضع الألم مع الدعاء، رقم: ৫৮৬৭)

“তোমার শরীরের যে জায়গায় ব্যথা রয়েছে সেখানে হাত রাখ এবং তিনবার ‘بِسْمِ اللَّهِ’ বল। আরো সাতবার বলঃ

“أَعُوذُ بِاللّٰهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ”

(আমি যে ব্যথা অনুভব করছি এবং যে ভয় পাচ্ছি তা থেকে আল্লাহ ও তার কুদরতের আশ্রয় প্রার্থনা করছি)“^{৫৭৮}। এই হলো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন থেকে ‘বিসমিল্লাহ’ এর শিক্ষা। সাহাবা, খাইরুল কুরূন সবার জীবনেও এই একই শিক্ষা দেখতে পাবেন। এর বাইরে খতম নামে যা কিছু বলা হয়ে থাকে তা সম্পূর্ণ মনগড়া ও ভিত্তিহীন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বা

^{৫৭৮} সহীহ মুসলিম, সালাম অধ্যায়, ব্যথায় আক্রান্ত স্থানে দো‘আর সহিত হাত রাখা মুত্তাহাব পরিচ্ছেদ, নং: ৫৮৬৭।

সাহাবিদের জীবনে এই তাসমিয়া খতমের কোনো দৃষ্টান্ত নেই, কল্যাণের সাক্ষ্যপ্রাপ্ত কোনো যুগেই এর কোনো নজীর নেই। এ সবকিছু তাদের যুগের অনেক পরের উদ্ভাবন। এছাড়া এই খতমের ফযিলতে যা কিছু বলা হয় সবই মনগড়া বানানো। আল্লাহ আমাদেরকে এ সমস্ত মনগড়া কর্ম থেকে রক্ষা করুন। ‘বিসমিল্লাহ’ এর মৌলিক শিক্ষায় আমাদের জীবন গড়ার তওফিক দান করুন। আমীন।

খতমে খাজেগান

ফার্সী শব্দ ‘খাজা’ যার বহুবচন ‘খাজেগাঁ’। খতমের নাম থেকেই তা যে অনারব কোনো সুফি থেকে আবিষ্কৃত তা সহজেই অনুমেয়। এই নামকরণের কারণে বলা হয়, “পীর-পীরানগণের উপর দো‘আ করা হয় বলিয়া এই খতমের নাম খাজেগান বা পীরান^{৭৯} রাখা হইয়াছে”। খতমের নিয়মে লিখা হয়েছে:^{৮০}

১. সূরা ফাতেহা ৭০ বার।
২. দুর্রুদ শরীফ ১০০ বার।
৩. সূরা ‘আলাম নাশরাহ লাকা’ ৭০ বার।
৪. সূরা ইখলাস ১০০০ বার।
৫. পুনরায় সূরা ফাতেহা ৭ বার।
৬. পুনরায় দুর্রুদ শরীফ ১০০ বার।
৭. নিম্নোক্ত দো‘আ ১০০ বার:

^{৭৯} নেয়ামুল কুরআন, মৌলবী শামছুল হুদা, রহমানিয়া লাইব্রেরী, একাদশ সংস্করণ, পৃষ্ঠা: ২০০।

^{৮০} প্রাপ্ত, পৃষ্ঠা: ১৯৯।

"فسهل يا الهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل بفضلك يا عزيز"

(হে আল্লাহ নেক্কারগণের সরদারের [নবী সা.] সম্মানার্থে আমার প্রত্যেক কঠিন কাজ সহজ করিয়া দাও, হে ক্ষমাশীল, তোমার দয়ায় সহজ করিয়া দাও।

৮. يا قاضي الحاجات (হে প্রয়োজন পূর্ণকারী) ১০০ বার।

يا كافي المهمات (হে বৃহৎ কাজ সমাধানকারী) ১০০ বার।

يا دافع البليات (হে বিপদ প্রতিরোধকারী) ১০০ বার।

يا مجيب الدعوات (হে প্রার্থনা কবুলকারী) ১০০ বার।

يا رافع الدرجات (হে মর্যাদা বর্ধনকারী) ১০০ বার।

يا حلال المشكلات (হে বিপদ দূরকারী) ১০০ বার।

يا غوث أغثنني وامددني (হে সাহায্যকারী আমায় সাহায্য ও মদদ কর) ১০০ বার।

انا لله وانا اليه راجعون (নিশ্চয় আমরা আল্লাহর এবং তার নিকটই আমরা ফিরে যাব) ১০০ বার।

لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين (তুমি ছাড়া অন্য কোনো উপাস্য নেই। তুমি পবিত্র। নিশ্চয় আমি গোনাহ্কার) ১০০ বার।

৯. সর্বশেষ দুর্বাদ একশত বার।

এই খতমের এই পদ্ধতি লিখিত হলেও যে যার মত সময়ের দিকে লক্ষ্য রেখে, টাকা পয়সার কম বেশির দিকে বিবেচনা করে এদিক সেদিক যোগ বিয়োগ করে বানিয়ে খতম করেন। খতমকারীদের ভাষায় সটকার্ট খতম বা লং খতম। বানানো জিনিস একেকজন

একেক রকম বানাবেন এটাই স্বাভাবিক। এই খতমের ৭ নাম্বারে উল্লেখিত দো‘আটি আপত্তিকর। আপত্তির কারণ ও পর্যায় একটু পরেই আলোচনা করছি ইনশাআল্লাহ। এ ছাড়া বাকী অনেকটি যেমন সুরা, দুরুদ মানসুস, যার নির্দিষ্ট ফযিলত রয়েছে। কিছু বাক্য যেগুলোতে আল্লাহকে সম্বোধন করা হয়েছে এই বাক্যগুলো দ্বারা আল্লাহকে ডাকা এবং নিজের প্রয়োজন প্রার্থনা করা যাবে। ওযিফা হিসেবে তা পাঠ বা এতে সওয়াব আছে মনে করা যাবে না, কেননা ছওয়াবের বিষয়টি সম্পূর্ণ তাওকীফি বা ওহী নির্ভর। এর বাইরে খতমের যে ধারা উল্লেখ করা হয়েছে এবং এর নির্দিষ্ট যে ফযিলত বলা হয় তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

মানসুস বা রাসূল সাল্লাল্লাহু থেকে প্রমাণিত আমলগুলো তিনি যেভাবে করেছেন সেভাবেই করতে হবে এবং তিনি যে ফযিলত বলেছেন বিশ্বাসের ক্ষেত্রে এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতে হবে। আমলের ক্ষেত্রে এর বাইরে কিছু বলার কারো কোনো অধিকার নেই।

এই খতমের ফযিলতে বলা হয়ে থাকে, কঠিন পীড়া ও বিপদাপদ হতে উদ্ধার লাভের জন্য ও প্রত্যেক প্রকার মনের বাসনা, পরীক্ষা পাস ও চাকরী লাভ করিবার জন্য এই খতমটি অদ্বিতীয়।^{৫৮১} এ সব কথাই ভিত্তিহীন ও মনগড়া। এগুলো হচ্ছে বিভিন্ন দো‘আ বা ইবাদত। এর ফযিলত একমাত্র তিনি বলতে পারেন যিনি এগুলো দিয়েছেন। আল্লাহ ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে

^{৫৮১} প্রাপ্ত।

আমল যেভাবে করলে যে ফযিলত বলেছেন তা সেভাবে করেই উক্ত ফযিলতের আশা করতে হবে। রাসূল কর্তৃক প্রদানকৃত রূপকে পরিবর্তন করা এবং সাথে সাথে নতুন ফযিলতের বুলি আওড়ানোর অধিকার কাউকে তিনি দেননি। আর এগুলো হচ্ছে ধর্মীয় বিষয়। ধর্মীয় বিষয়ে অভিজ্ঞতার কথা বলা অনর্থক। ৭ নং দো‘আটি আপত্তিকর হওয়ার কারণ হলো, অন্যের মর্যাদার দোহাই দিয়ে পার পাওয়ার ধারণা মূলত মুশরিকদের। ঈসা আলাইহিস সালামের মর্যাদার দোহাই দিয়ে পার পাওয়া খ্রিস্টবাদী ধারণা। উযাইর আলাইহিস সালামের দোহাই দিয়ে পার পাওয়ার আশা ইয়াহুদীবাদী ধারণা। ফেরেশ্তাগণ আল্লাহর মেয়ে হওয়ার ধারণায় তাদের মর্যাদার দোহাই দিয়ে পার হওয়ার ধারণা মক্কার মুশরিকরা লালন করত। কুরআন করীমে এসবের বিবরণ ও তা প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। এভাবে বিভিন্ন জাতি আল্লাহতে বিশ্বাসী হওয়া সত্ত্বেও শিক্কে লিপ্ত হয়। ইসলাম এর মূলোৎপাটন করেছে। আল্লাহর বিধান রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিখানো পদ্ধতিতে পালনের মাধ্যমে একমাত্র আল্লাহরই দয়ায় পার পাওয়া যাবে বলে শিক্ষা দিয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতকে আজীবন এই শিক্ষাই দিয়ে গেছেন। কুরআন ও হাদীসের সাথে সম্পৃক্ততা বাড়িয়ে দিলেই বিষয়টি সবার কাছে ফুটে উঠবে। কুরআন বা হাদীসে বর্ণিত দো‘আগুলো এবং দো‘আর শিক্ষা থেকেও আমরা বিষয়টি উপলব্ধি করতে পারি। আল্লাহ তাঁর জ্ঞানের দিক থেকে

বান্দার শাহরগের চেয়েও অধিক নিকটে বলে ঘোষণা দিয়েছেন।^{৫৮২}

তাই আল্লাহর কাছে কিছু চাইতে কোনো ব্যক্তি মিডিয়া বা ব্যক্তির মর্যাদা মিডিয়া বানানোর প্রয়োজন ইসলাম বোধ করে না। আর এটাই ছিল সালাফে সালিহিনের আকীদা। ইমাম আবু হানিফা (রাহ.) এ প্রসঙ্গে তাই বলেছেনঃ

"لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به والدعاء المأذون فيه المأمور به ما استفيد من قوله
الدر المختار، كتاب الحظر والاباحة(بها) تعالى "ولله الأسماء الحسنى فادعوه

“কারো জন্য উচিত নয় আল্লাহর কাছে তারই মাধ্যম ছাড়া দো‘আ করা। আর তাঁর নাম নিয়ে দো‘আর অনুমোদন ও নির্দেশিত হওয়ার দলীল আল্লাহর বাণী: “আর আল্লাহর অনেক সুন্দর নাম রয়েছে, অতএব তোমরা তাকে এগুলোর মাধ্যমে ডাকো”।”^{৫৮৩} ‘তারই মাধ্যমে’ দো‘আর ব্যখ্যায় আল্লামা শামী লিখেনঃ

"قوله (إلا به) أي بذاته وصفاته وأسمائه)".

অর্থাৎ আল্লাহর সত্ত্বা, তার গুণাবলী এবং তার নামের মর্যাদার ওসিলাতেই কেবল দো‘আ করা যাবে। ফিকহে হানাফীতে আবু হানিফা (রাহ.) মাযহাব উল্লেখে বলা হয়েছেঃ

^{৫৮২} সূরা কাফ, আয়াত: ১৬।

এটি গ্রন্থকারের মত। আর এটা সত্য যে আল্লাহ তা‘আলা স্বয়ং আরশের উপর থাকা সত্ত্বেও জ্ঞানের দিক থেকে আমাদের সাথেই রয়েছেন। তবে বিপ্লবী তফসীর মতে আলোচ্য আয়াতে ‘আমরা’ বলে ফিরিশতাদের বুঝানো হয়েছে। [সম্পাদক]

^{৫৮৩} আল্লামা আলাউদ্দীন আল-হাসকাফী, আব্দুররল্ল-মুখতার, অবৈধ বৈধ অধ্যায়, বেচাকেনা অনুচ্ছেদ।

ড: আব্দুর রহমান আল-খুমাইছ, ইতিকাদুল আয়িম্মাতিল আরবা‘আহ, আকীদাতুল ইমাম আবু হানিফা। পৃষ্ঠা:৩।
শামসুদ্দীন আফগানী (১৩৭২-১৪২০ হি.), জুহুদুল উলামায়িল হানাফিয়াহ ফি ইব্তালি আক্বায়িদিল ক্ববুরিয়াহ (কবরপূজারীদের আক্বায়িদ বাতিল করতে হানাফী আলেমদের প্রচেষ্টা), ১/৩১, ২/১১২৪।

"(و) كره قوله (بحق رسلك وأنبياك وأوليائك) أو بحق البيت لأنه لا حق للخلق على الخالق تعالى".

“এবং বলা মাকরুহ^{৫৮৪}, তোমার রাসূলগণ, নবীগণ ও ওলীগণের অধিকারে অথবা বাইতুল্লাহর অধিকারে কেননা আল্লাহর উপর মাখলুকের কোনো অধিকার নেই।”^{৫৮৫}

আহলুস-সুন্নাহ ওয়াল জামা‘আত, বিশেষ করে ইমাম আবু হানিফা (রাহ.) ও তার দুই বিশিষ্ট ছাত্র ইমাম আবু ইউসুফ (রাহ.) এবং ইমাম মুহাম্মদ (রাহ.) এর আক্বীদা বর্ণনায় হানাফী মাযহাবের বিখ্যাত আলেম আবু জা‘ফর আত্ভাহাবী^{৫৮৬} রচিত আক্বীদার কিতাব ‘আল-আক্বীদাতুত্ভাহাবীয়াহ’ এর ব্যাখ্যা গ্রন্থে আল্লামা আবুল-ইয় আল-হানাফী^{৫৮৭} লিখেনঃ

" قال أبو حنيفة وصاحباہ رضي الله عنهم: يكره أن يقول الداعي: أسألك بحق فلان، أو بحق أنبيائك ورسلك، وبحق البيت الحرام، والمشعر الحرام، و[حو

^{৫৮৪} উল্লেখ্য যে, আমাদের পূর্বসূরীগণ ‘মাকরুহ’ শব্দ বলে হারাম বোঝাতেন। [সম্পাদক]

^{৫৮৫} আব্দুররুল মুখতার, প্রাণ্ডক্ত, জুহুদুল উলামায়িল হানাফিয়াহ ফি ইবতালি আক্বায়িদিল কুবুরিয়াহ, ১/৭, ২/১১২৬।

^{৫৮৬} হানাফী বিশিষ্ট ফক্বীহ আবু জা‘ফর আহমদ ইবন মুহাম্মদ সালামাহ আত্ভাহাবী। বলা হয়, মিশরে ফিক্কে হানাফীর নেতৃত্ব তাঁর কাছে এসে শেষ হয়েছে। তিনি প্রথমে ফিক্কে শাফি অর্জন করেন। পরবর্তীতে ফিক্কে হানাফী গ্রহণ এবং এতে নেতৃত্বের স্থান অধিকার করেন। জন্ম: ২৩৯, ওফাত: ৩২১ হিজরী, ৮৫৩-৯৩৩ ঈসায়ী। (আল-আ‘লাম ১/২০৬) তার রচিত বিভিন্ন গ্রন্থ যা ‘আরব ‘আজম সবখানে প্রসিদ্ধ। তাঁর লিখিত আক্বীদার কিতাব ‘আল-আক্বীদাতুত্ভাহাবীয়াহ’ আরব ‘আজম সবখানে প্রসিদ্ধ ও পাঠ্য সিলেবাসভুক্ত। অনেকেই তর এ কিতাবের শরাহ বা ব্যাখ্যাগ্রন্থ লিখেছেন। তিনি তার এ কিতাব ইমাম আবু হানিফা (রাহ.) ও সাহেবাইন অর্থাৎ ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ (রাহ.) এর আক্বীদা বর্ণনা করতে লিখেছেন বলে কিতাবের শুরুতেই নিজে উল্লেখ করেছেন। তার বক্তব্যটি এরূপ:

هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة : أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين وما يعتقدون من أصول الدين ودينون (به رب العالمين)". (العقيدة الطحاوية، مقدمة، 1-1)

^{৫৮৭} আলী ইবন আলী ইবন মুহাম্মদ ইবন আবীল-ইয়। ইবনু আবীল ‘ইয় নামে প্রসিদ্ধ। দামেশেকের বিশিষ্ট হানাফী ফক্বীহ। জন্ম: ৭৩১, ওফাত: ৭৯২ হিজরী, ১৩৩১-১৩৯০ ঈসায়ী। (আল-আ‘লাম ৪/৩১৩)

ذلك حتى كره أبو حنيفة ومحمد رضي الله عنهما أن يقول الرجل: اللهم إني أسألك بمعقد العز من عرشك".

“আবু হানীফা এবং তার দুই সঙ্গী (ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ) রাদিয়াল্লাহু আনহুম বলেন: দো‘আকারীর জন্য বলা মাকরুহ, “অমুকের অধিকারে তোমার কাছে প্রার্থনা করছি, অথবা তোমার নবী ও রাসূলগণের অধিকারে এবং বাইতুল হারামের অধিকারে এবং মাশ‘আরে হারামের^{৫৮৮} অধিকারে।” এ জাতীয় আরো যা রয়েছে। এমনকি ইমাম আবু হানিফা ও মুহাম্মদ রাদিয়াল্লাহু আনহুমা মাকরুহ মনে করেন যে, লোকটি বলবে: “হে আল্লাহ, তোমার আরশের সম্মানিত আসনের দোহাই দিয়ে তোমার কাছে প্রার্থনা করছি’।”^{৫৮৯} তিনি আরো লিখেন:

وتارة يقول: بجاه فلان عندك، يقول: نتوسل إليك بأبيائك ورسلك وأوليائك. ومراده أن فلانا عندك ذو وجهة وشرف ومنزلة فأجب دعاءنا. وهذا أيضا محذور، فإنه لو كان هذا هو التوسل الذي كان الصحابة يفعلونه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لفعلوه بعد موته، وإنما كانوا يتوسلون في حياته بدعائه، يطلبون منه أن يدعو لهم، وهم يؤمنون على دعائه، كما في الاستسقاء وغيره. فلما مات صلى الله عليه وسلم قال عمر رضي الله عنه - لما خرجوا يستسقون -: «اللَّهُمَّ إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك

^{৫৮৮} মাশ‘আরে হারাম অর্থ সম্মানী প্রতীক। বর্ণনার আলোকে কুরআনের মাশ‘আরে হারাম বলতে মুযদালিফার মাঠ উদ্দেশ্য নিয়েছেন উলামায়ে কেরাম। কেউ কেউ শুধুমাত্র মুযদালিফার শেষ প্রান্তে অবস্থিত ছোট পাহাড়টি উদ্দেশ্য নিয়ে থাকেন। দেখুন: সহীহুল বুখারী, হজ্জ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ: যারা পরিবারের দুর্বল লোকদের রাতে পাঠিয়ে দেয় (মুযদালিফা থেকে মিনায়) অতঃপর তারা রাতে মুযদালিফায় অবস্থান করে এবং দো‘আ করে..., নং: ১৫৯২, সহীহ মুসলিম, হজ্জ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ: পরিবারের দুর্বল লোক মহিলা ও অন্যদেরকে মানুষের ভিড়ের পূর্বে রাতের শেষভাগের দিকে মুযদালিফা থেকে মিনায় পাঠিয়ে দেওয়া এবং অন্যরা ফজরের সালাত আদায় পর্যন্ত মুযদালিফায় অবস্থান করে যিকরে লিগু থাকা মুত্তাহাব, নং: ৩১৯০, আল্লামা আলুসী, রুহুল মা‘আনী, সূরা বাক্বারা, আয়াত:১৯৮, তাফসীর ইবনে কাসীর, সূরা বাক্বারা, আয়াত:১৯৮।

^{৫৮৯} ইবনু আবীল ইয়, শরহুল আক্বীদাতুত্তাহাবীয়াহ, শাফা‘আত প্রসঙ্গ, ১/১৫৪।

بنينا فتسقيننا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا». معناه بدعائه هو ربه وشفاعته وسؤاله، ليس المراد أنا نقسم عليك به، أو نسألك بجاهه عندك، إذ لو كان ذلك مراداً لكان (شرح العقيدة جاه النبي صلى الله عليه وسلم أعظم وأعظم من جاه العباس. الطحاوية، بحث: الشفاعة، ١-٥٨٤)

“এবং অনেক সময় দো‘আ প্রার্থী বলে: ‘আপনার কাছে অমুকের যে সম্মান রয়েছে তার মাধ্যমে’ সে বলে ‘আমরা আপনার নিকট আপনার নবী, রাসূল ও ওলীগণকে মাধ্যম গ্রহণ করছি’, এর দ্বারা লোকটির উদ্দেশ্য, অমুক আপনার নিকট মান, সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী, তাই আপনি আমাদের দো‘আ কবুল করুন। এটাও নিষিদ্ধ। কেননা যদি সাহাবায়ে কেরাম নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবিত থাকাকালে এ ধরনের মাধ্যম গ্রহণ করতেন তবে তাঁর মৃত্যুর পরও অবশ্যই নিতেন। অথচ তিনি সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবিত থাকাকালে তারা তাঁর দো‘আর মাধ্যম নিতেন। তারা তাঁর কাছে তাদের জন্য দো‘আর প্রার্থনা করতেন। তারা তাঁর দো‘আর উপর ঈমান রাখতেন, যেমন বৃষ্টি কামনা ইত্যাদির বেলায়।

অতঃপর যখন নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম মারা গেলেন এবং তারা বৃষ্টি কামনার দো‘আর জন্য বের হলেন, তখন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেনঃ ‘হে আল্লাহ, যখন আমরা দুর্ভিক্ষের শিকার হতাম তোমার কাছে তোমার নবীর মাধ্যমে দো‘আ করতাম, ফলে তুমি আমাদের বৃষ্টি দিতে। এখন আমরা তোমার কাছে আমাদের নবীর চাচা (আব্বাস) এর (দো‘আর) মাধ্যম গ্রহণ করছি’।

এর অর্থ হলো, তিনি আল্লাহর কাছে যে দো‘আ করেন, সুপারিশ করেন এবং প্রার্থনা করেন এর মাধ্যমে। তোমার কাছে তার শপথ এ উদ্দেশ্য নয়, অথবা আমরা তোমার কাছে প্রার্থনা করছি তার সম্মানের মাধ্যমে যা তোমার কাছে রয়েছে এটাও উদ্দেশ্য নয়। কেননা যদি এ ধরনের মাধ্যম ধরা উদ্দেশ্য হত তবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মান সর্বাধিক এবং আব্বাসের সম্মান থেকে বেশি।”^{৫৯০}

কুরআন হাদীসের শিক্ষা অনুযায়ী এই ছিল আবু হানিফা (রাহ.) সহ সমস্ত আসলাফের আকীদা বা বিশ্বাস। সালফে সালিহিনের আকীদা, বিশ্বাস, আদর্শ থেকে দূরে সরে যাওয়ার ফলেই আজ আমাদের মাঝে এমন অনেক কিছু বিস্তার লাভ করেছে যা তাদের মাঝে ছিল না।

তাদের আদর্শ থেকে সরে যাওয়ার ফলেই আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাত থেকে সরে গেছি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবিদের আর আমাদের আমলের মধ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে তারতম্য সৃষ্টি হয়ে গেছে। আল্লাহ আমাদেরকে তাদের নমূনার উপর উঠার তওফিক দান করুন। সুন্নাতের বিপরীত যে কোনো ইবাদতের বেলায় জায়েয না-জায়েযের বাহাসে লিপ্ত না হয়ে চোখ বুঁজে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতকে সাহাবা ও সালফে সালিহিনের মত নেয়ার তওফিক দান করুন। হক্ক বোঝার

^{৫৯০} শরহুল আকীদাতুত্তাহাবীয়াহ, প্রাগুক্ত, জুহুদুল উলামায়িল হানাফিয়াহ ফি ইবতালি আক্বায়িদিল কুবুরিয়াহ, ৩/১৫১২।

জন্য প্রথমে আমার চক্ষু এবং আমাদের চক্ষু খোলে দিন। মুফতি ফয়জুল্লাহ (রাহ.) রচিত কবিতার দুটি পঙক্তি দিয়ে আলোচনাটি শেষ করছি। পঙক্তিদ্বয় এইঃ

از سلف منقول نے خوب داں ہم مروج این دعاے خواجگان

مثل طاعت بدعت امد لا کلام ان عبادت نیست بااں اهتمام

“প্রচলিত এই খাজেগাঁর দো‘আও, ভালভাবে জেনে রাখ এগুলো সালাফ থেকে প্রমাণিত নয়, এগুলো ইবাদত নয়, ইবাদতের মত এগুলোর গুরুত্ব দেওয়া নিশ্চিত বিদ‘আত।”^{৫৯১}

খতমে জালালী

আল্লাহর পবিত্র নামসমূহের মধ্যে তার মূল নাম ‘الله’। এই পবিত্র নাম বা ইসমে যাত নিয়ে তামাশার এক পদ্ধতির নাম খতমে জালালী। প্রথমেই দো‘আ করি, যে অজ্ঞ ব্যক্তি এই খতম আবিষ্কার করেছে আল্লাহ যেন তাকে মাফ করে দেন। খতমের পদ্ধতিটি দেখলেই সচেতন ব্যক্তি যিনি ইসলাম সম্পর্কে নূন্যতম ধারণা রাখেন তার কাছে এই খতমের খারাবী ধরা পড়বে। তবে যিনি ইলমের ধারক হওয়া সত্ত্বেও দুনিয়ার লালসায় হাবুডুবু খাচ্ছেন, তিনি ধর্মের রক্ষা নয় বরং ধর্মই তাকে রক্ষা করেছে এমন ব্যক্তির কথা ভিন্ন। খতমের পদ্ধতিটি যেভাবে তুলে ধরা হয়েছে: “নদী ভাঙ্গন বা ঐরূপ কঠিন বিপদ হইতে উদ্ধারকল্পে এই নাম সোয়া লক্ষ বার কাগজে লিখিবে ও সোয়া লক্ষ ময়দার আটার গুলী তৈয়ার করিবে, গুলী তৈয়ার করার সময় ‘আল্লাহ্’ এই নাম মুখে বলিবে, তৎপর আল্লাহর

^{৫৯১} মুফতি ফয়জুল্লাহ, পাদে নামাহ খাকী, দো‘আয়ে খাজেগাঁ অপ্রমাণিত, পৃষ্ঠা: ৩৪।

নাম লিখিয়া কাগজগুলি একটি করিয়া গুলীর মধ্যে ভরিবে, তৎপর গুলীগুলি নদী বা যে পুকুরে মাছ থাকে তাহাতে ফেলিয়া দিবে। সকলেই পাক সাফ অবস্থায় ওয়ুসহ এই আমল করিবে। নতুবা হিতে বিপরীত হইতে পারে। এই আমল দ্বারা বিপদ হইতে উদ্ধার হইবে ও মতলব পূর্ণ হইবে। ইহাতে কোনো সন্দেহ নাই। আল্লাহর নামসমূহ ২ ভাগে বিভক্ত- জালালী (তেজস্বী) ও জামালী (সৌন্দর্যময়)। ‘আল্লাহ’ নাম জালালীর অন্তর্ভুক্ত; এই জন্য ইহার খতমকে খতমে জালালী বলা হয়।”^{৫৯২}

পাঠক, এবার আপনি নিজেই এই খতমের ফায়সালা করুন। এই খতমের পদ্ধতিতে আল্লাহর যাতি নাম নিয়ে খেল তামাশা, নির্লজ্জ আচরণের সাথে সাথে এর ফায়েদায় যা কিছু বলা হয় তা সবই বানোয়াট ও ভিত্তিহীন। ওহী ছাড়া এসব কথা বিশ্বাসে মুমিনের আকীদায় স্পট পড়ে। আলহাম্দুলিল্লাহ এমন অনেক আলেম পেয়েছি যিনি এই খতমের নাম ও পদ্ধতি গুলার সাথে সাথে “লা হাওলা...” পড়েছেন। আবার অনেক এমন রয়েছেন যিনি একে অপছন্দ করেন তবে অংশ নেন। তাদেরকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় ভাই, আপনি জানা সত্ত্বেও কেন এসব খতমে উপস্থিত হন তাদের একই কথা, ভাই, আমার টাকার দরকার তাই যাই। আবার এমন অনেক আছেন যারা এটির পক্ষে সাফাই গান। বিভিন্ন যুক্তি ও হিলার মাধ্যমে এগুলোকে জায়েয রাখবার চেষ্টা করেন। স্বার্থের কারণে দ্বীনী বিষয়ের যে কোনো ব্যাখ্যা দেওয়া তাদের কাছে কোনো ব্যাপারই

^{৫৯২} নেয়ামুল কুরআন, পৃষ্ঠা নং - ১৯৮।

নয়। ব্যাখ্যা সঠিক নাকি ভুল এই বিষয় তাদের কাছে মূল্যহীন। এই কর্ম আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে সেটিও উপেক্ষিত। অর্থই যেন তাদের মূল লক্ষ্য উদ্দেশ্য। অথচ সম্পদের স্বার্থে ইলমের জোরে দীনের যে কোনো অপব্যখ্যা ইয়াহুদী আলেমদের গুণ ছিল বলে আমাদের সকলের জানা। ইলমের দ্বারা অপব্যখ্যার মাধ্যমে দো‘আ দুরূদের সুন্নাহ বহির্ভূত পদ্ধতি আবিষ্কার বা আবিষ্কৃত বিষয় জায়েয বানাবার অপচেষ্টা নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ভবিষ্যৎবাণীর প্রকাশ। নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ভবিষ্যৎ বাণী ছিল যার মর্ম হচ্ছে: তার উম্মত বনী ইসরাঈলের পূর্ণ অনুসরণ করবে। এমনকি এক জোড়া জুতার মাঝে যেমন কোনো বেশ কম হয় না তার উম্মত ও বনী ইসরাঈলের উম্মতের মাঝে কোনো বেশ কম হবে না।^{৭৯০} তাই আল্লাহর কাছে সর্বদা অশ্রয় প্রার্থনা করা উচিত যে, আল্লাহ যেন আমাদেরকে কখনো এই তৃতীয় স্তরের আলেমদের মাঝে শামেল না করেন। আমাদের ঈমানকে দুর্বল করে দ্বিতীয় স্তরের মধ্যে ও যেন না রাখেন। বরং এই তিন শ্রেণীর আলেমের মাঝে আল্লাহ আমাদেরকে প্রথম স্তরের আলেমদের অন্তর্ভুক্ত করুন এবং এই প্রথম শ্রেণীর মত আমাদেরকেও সঠিক দীন বোঝার তওফীক দিন। টাকার স্বার্থে বুঝে না বোঝার বাহানার মত মারাত্মক ব্যাধি থেকে আমাদেরকে রক্ষা করুন। আমীন।

^{৭৯০} তিরমিযী, সুনান, উম্মতের দলাদলি অনুচ্ছেদ, নং: ২৬৪১, হাকীম, আল-মুসতাদরাদক ‘আলাস-সহীহাইন, ফিতনা ও পরস্পর লড়াই অধ্যায়, নং: ৮৪৪৮, ৪/৫১৬।

খতমে দুরূদে মাহি

‘মাহি’ ফারসী শব্দ। যার অর্থ মাছ। বানানো একটি দুরূদকে ‘দুরূদে মাহি’ হিসেবে নামকরণের কারণ হিসেবে যে কাল্পনিক কাহিনীটি বলা হয়েছে তা নিম্নরূপ: “হযরত রসূল (সাঃ) এর সময় একজন কামেল ব্যক্তি নদীর তীরে বসিয়া সর্বদা এই দুরূদ শরীফ পড়িতেন। ঐ নদীর একটি রুগ্ন মৎস্য ইহা সর্বদা শুনিতে শুনিতে শিখিয়া ফেলিল ও পড়িতে লাগিল। ক্রমে মৎস্যটির রোগ আরোগ্য হইতে লাগিল ও তাহার শরীরের রং বদলাইয়া সোনার বর্ণ ধারণ করিল। দৈবাৎ একদিন এক ইহুদী জেলের জালে মৎস্যটি ধরা পড়িল। ইহুদীর স্ত্রী অনেক চেষ্টা করিয়া মৎস্যটি কাটিতে পারিল না। অবশেষে উহাকে ফুটন্ত তৈলের মধ্যে ছাড়িয়া দেওয়া হইল। কিন্তু মৎস্যটি নির্বিঘ্নে তৈলের মধ্যে ঘুরিয়া ঘুরিয়া এই দুরূদ শরীফ পড়িতে লাগিল। ইহা দেখিয়া ইহুদী অতিশয় আশ্চর্যাস্থিত হইয়া পড়িল ও মৎস্যটিকে লইয়া হযরত রসূল (সাঃ) এর নিকট উপস্থিত হইল। হযরত (সাঃ) এর দোয়ায় মৎস্যটি বাকশক্তি লাভ করিল ও সমস্ত বিষয় হযরত (সাঃ) এর নিকট বর্ণনা করিল। ইহা শুনামাত্র সেখানে উপস্থিত ৭০ জন ইহুদী তৎক্ষণাৎ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিলেন ও রসূল (সাঃ) এর নবুয়তের উপর ঈমান আনিলেন। তৎপর মৎস্যটিকে নদীতে ছাড়িয়া দেওয়া হইল। উপরোক্ত কারণে এই দুরূদ শরীফ ‘দুরূদে মাহি’ তথা মাছের দুরূদ বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছে। এটি পড়িলে অতি মধুর শুনা যায়।”^{৫৯৪}

^{৫৯৪} নেয়ামুল কুরআন, পৃষ্ঠা: ৪৩-৪৪।

দুরূদটি নিম্নরূপঃ

"اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ خَيْرِ الْخَلَائِقِ، أَفْضَلِ الْبَشَرِ، شَفِيعِ الْأُمَّةِ يَوْمَ الْحِشْرِ وَالنَّشْرِ
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ، وَصَلِّ عَلَى جَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَالْمَلَائِكَةِ
الْمُقَرَّبِينَ وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، وَارْحَمْنَا بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ."

এই খতমের নিয়মে বলা হয়ঃ ২১ দিনে বা ৪২ দিনে সোয়া লক্ষবার বর্ণিত দুরূদটি পড়া। এই নিয়মে এই খতম পড়লে নাকি হাতে হাতে ফল পাওয়া যায়। অথু সহকারে নদীর তীরে বসে পড়লে আরও বেশি দ্রুত ফল পাওয়া যায় বলে বর্ণনা করা হয়েছে^{৫৯৫}। এখানে কয়েকটি বিষয় লক্ষ্যণীয়। বর্ণিত দুরূদটি মাছুর তথা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত নয়। বরং এটি কারো বানানো একটি দো'আ। তাই একে ওয়িফা হিসেবে আমলে আনা যাবে না। তবে এতে কোনো আপত্তিকর শব্দ নেই। তাই কেউ ইচ্ছা করলে দো'আর উদ্দেশ্যেই তা পড়তে পারে। এর যে পদ্ধতি ও ফযিলত বলা হয়েছে তা সম্পূর্ণ মনগড়া বানানো বক্তব্য। তাই মুমিন এ সবার পিছে পড়েন না এবং তা বিশ্বাস করেন না। দুরূদে মাহি নামকরণের কারণে যে কাহিনীটি উল্লেখ করা হয়েছে তা জালিয়াতদের বানানো সম্পূর্ণ কাল্পনিক ও মনগড়া, এ কাহিনীর কোনো সত্যতা নেই।

সূরা ইখলাস দ্বারা কুরআন খতম

নির্দিষ্ট সংখ্যার মাধ্যমে সূরা ইখলাসের খতম প্রচলিত না থাকলেও সূরা ইখলাস তিনবার পড়ার মাধ্যমে কুরআন খতমের প্রচলন

^{৫৯৫} প্রাপ্ত।

রয়েছে। তিনবার সূরা ইখলাস পাঠ করলে পূর্ণ এক খতম কুরআন তেলাওয়াতের সওয়াব পাওয়া যায় বলে অনেকের ধারণা। তাই অনেক সময় কুরআন খতম করতে অপারগ হলে তিনবার এই সূরা পাঠ করা হয়। বলা হয় হাদীসে রয়েছে, তিনবার সূরা ইখলাস পাঠ করলে এক খতম কুরআনের সওয়াব পাওয়া যায়। অথচ এমন কোনো কথা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত হয় নি। রাসূলের হাদীসের সাথে যুক্তির মিশ্রণ ঘটিয়ে এমন কথা বলা হয়।

আর অনেক ক্ষেত্রে এভাবেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথার মর্ম পরিবর্তন হয়ে শরীয়তের বিকৃতি ঘটেছে। কুরআন আল্লাহর পবিত্র কালাম। তার প্রতিটি অক্ষর, প্রতিটি শব্দ, প্রতিটি বাক্য, প্রতিটি আয়াত, প্রতিটি সূরা বরকতময় ও মর্যাদাপূর্ণ। আল্লাহর কালাম হিসেবে মর্যাদার দিক থেকে পুরো কুরআন এক সমান। তবে ভাব বা মর্মের দিক থেকে কোনো কোন আয়াত বা সূরার ফযিলত অন্যটির তুলনায় বেশি বলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে জানিয়েছেন। এ রকম মর্যাদাপূর্ণ একটি সূরা হচ্ছে সূরা ইখলাস। সূরাটিতে আল্লাহ তাঁর পরিচয় অত্যন্ত অল্প বাক্যের মাধ্যমে পরিপূর্ণভাবে তুলে ধরেছেন। এই সূরার ফযিলতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেনঃ

"والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن". (صحيح البخاري، كتاب التفسير، باب فضل قل هو الله أحد، رقم: ৪৭২৬)

“ঐ সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ নিশ্চয় এটি (ইখলাস) কুরআনের এক তৃতীয়াংশের বরাবর।”^{৫৯৬} আরেকটি হাদীসে রয়েছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেনঃ

« أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن ». قالوا وكيف يقرأ ثلث القرآن قال « قل هو الله أحد » يعدل ثلث القرآن. (صحيح مسلم، كتاب التفسير، باب فضل قراءة قل هو الله أحد، رقم: ১৯২২)

“তোমাদের কেউ কি প্রতি রাতে কুরআনের এক তৃতীয়াংশ পড়তে অক্ষম? সাহাবিরা বললেন, এক তৃতীয়াংশ কীভাবে পড়বে? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, (قل هو الله أحد) এক তৃতীয়াংশের সমান।”^{৫৯৭} এবার দেখুন, এই হাদীসের অর্থটিকে কীভাবে পরিবর্তন করে তা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে, যার কোনো বিবরণ সহীহে হাদীসে নেই। এক তৃতীয়াংশের সমান হওয়া এবং তিনবার পড়লে পূর্ণ কুরআন পড়ার সওয়াব পাওয়া কি এক? উলামায়ে কেরাম এই হাদীসের মর্ম বর্ণনা করেন যে, কুরআনের বিষয়বস্তু মূলত তিনটিঃ আহকাম বা জীবন বিধান, আখবার বা সংবাদসমূহ, তাওহীদ তথা আল্লাহর একত্ববাদের বিবরণ। সূরা ইখলাসে তাওহীদের আলোচনা

^{৫৯৬} সহীহুল বুখারী, তাফসীর অধ্যায়, “قل هو الله أحد” এর ফযিলত পরিচ্ছেদ, নং: ৪৭২৬। উল্লেখ্য বুখারীর আরো একাধিক জায়গায় হাদীসটি রয়েছে।

^{৫৯৭} সহীহ মুসলিম, কুরআন ফযিলত সমূহ অধ্যায়, “قل هو الله أحد” পড়ার ফযিলত পরিচ্ছেদ, নং: ১৯২২,

সহীহুল বুখারী, তাফসীর অধ্যায়, “قل هو الله أحد” এর ফযিলত পরিচ্ছেদ, নং: ৪৭২৭। উল্লেখ্য বুখারীর বর্ণনাটি সামান্য ভিন্ন। বর্ণনাটি এইরূপ,

“ أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة فشق ذلك عليهم وقالوا أينا يطيق ذلك يا رسول الله ؟ فقال: الله الواحد الصمد ثلث القرآن ”.

বা আল্লাহর একত্ববাদকে সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়েছে। তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একে এক তৃতীয়াংশ বলেছেন।^{৫৯৮} একেই কেউ কেউ এভাবে বলেন যে, কুরআনের অর্থ তিন ভাগে বিভক্ত। ঘটনাবলী, আহকাম, আল্লাহর গুণাবলী। সূরা ইখলাসটি আল্লাহর গুণাবলীতে বিশেষিত^{৫৯৯}।

এভাবেও বলা যায় যে, পুরো কুরআনের আলোচনা তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাত নিয়ে। যে কোনো বিষয় এ তিনটির কোনোটির সাথে সম্পৃক্ত। আর সূরা ইখলাসে তাওহীদের আলোচনা অত্যন্ত নিপুণভাবে করা হয়েছে, তাই এ সূরাকে কুরআনের এক তৃতীয়াংশ বলা হয়েছে।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি হাদীস থেকেও এ অর্থেই এক তৃতীয়াংশ বলার কথাটি স্পষ্ট হয়ে যায়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ

« إن الله جزأ القرآن ثلاثة أجزاء فجعل قل هو الله أحد جزءاً من أجزاء

القرآن. (صحيح مسلم، المرجع السابق، رقم: ১৯২৩)

“আল্লাহ তা‘আলা কুরআনকে তিন অংশে বিভক্ত করেছেন। “ قل هو الله أحد ” (সূরা ইখলাস) কে কুরআনের তিন অংশের এক অংশ সাব্যস্ত করেছেন।”^{৬০০} এই হাদীস থেকে উপরোক্ত মর্মটি আরো স্পষ্ট হয়ে যায়। তবে কেউ কেউ এক তৃতীয়াংশের সমতুল্য বলতে এক তৃতীয়াংশ পড়লে যে সওয়াব হয় সূরা ইখলাস তেলাওয়াত

^{৫৯৮} ইবনু হাজার, ফাতহুল বারী, প্রাগুক্ত অধ্যায়, ৯/৫৯।

^{৫৯৯} ইমাম নাওয়াওয়ী, মুসলিমের ব্যাখ্যাগ্রন্থ, প্রাগুক্ত অধ্যায়।

^{৬০০} সহীহ মুসলিম, প্রাগুক্ত, নং: ১৯২৩।

করলে এই পরিমাণ সওয়াব হয় বলে বলেছেন। কিন্তু এই মর্মটির কোনো দলীল নেই। বুখারীর ব্যাখ্যাগ্রন্থ ‘ফাতহুল বারী’তে লিখেনঃ

"ومنهم من حمل المثلية على تحصيل الثواب فقال معنى كونها ثلث القرآن أن ثواب قراءتها يحصل للقارئ مثل ثواب من قرأ ثلث القرآن وقيل مثله بغير فتح الباري، كتاب التفسير، باب فضل قل تضعيف وهي دعوى بغير دليل." هو الله أحد، ৯-৬০)

“আলেমগণের মধ্যে কেউ সমতুল্য অর্থটি সওয়াব অর্জনের ক্ষেত্রে নেন এবং বলেন, এক তৃতীয়াংশ হওয়ার অর্থ এই সূরাটি পড়ার সওয়াব পাঠকের জন্য ঐ ব্যক্তির সমান হবে যে এক তৃতীয়াংশ কুরআন পড়েছে। এটাও বলা হয়ে থাকে, অতিরিক্ত সওয়াব ব্যতিরেকে^{৬০১} মূল সওয়াবের এক তৃতীয়াংশের সমান। তবে এই দাবীর সপক্ষে কোনো দলীল নেই।”^{৬০২}

এখানে লক্ষণীয় যে, একবার সূরা ইখলাস তেলাওয়াত করলে কুরআনের এক তৃতীয়াংশ পড়ার সওয়াব পাওয়ার ব্যাপারে কোনো সহীহ হাদীস নেই। একটি হাদীস থেকে এই মর্ম নেয়ার সামান্য সম্ভাবনা ছিল মাত্র, তবে সহীহ মুসলিম হাদীসের মাধ্যমে এই সম্ভাবনাটির অবকাশ দূর হয়ে গেছে। তথাপি দূরবর্তী সম্ভাবনা অনুযায়ী আমরা যদি মেনে নেই যে, একবার সূরা ইখলাস

^{৬০১} একবার মর্ম হল: যে কোনো নেক আমলের একটি মূল নেকী রয়েছে, তবে আল্লাহ অনুগ্রহে তার দয়ায় এই নেকী কয়েকগুণ বাড়িয়ে দেন বলে কুরআন ও হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি। এই হিসেবে পূর্ণ কুরআন একবার তেলাওয়াত করলে তার মূল এক ছওয়াব রয়েছে। তেলাওয়াতের মাঝে ইখলাস, গভীরতা ইত্যাদি অনুযায়ী ব্যক্তি বিশেষে আল্লাহ তা অনেকগুণ বাড়িয়ে দিতে পারেন। একবার সূরা ইখলাস পড়লে এক তৃতীয়াংশের মূল ছওয়াব পাওয়া যাবে। অতিরিক্তটুকু নয়।

^{৬০২} ফাতহুল বারী, প্রাপ্ত অধ্যায়, ৯/৬০।

তেলাওয়াত করলে কুরআনের এক তৃতীয়াংশ পরিমাণ পড়ার সওয়াব পাওয়া যায় তবে একথা অত্যন্ত স্পষ্ট যে, তিনবার সূরাটি তেলাওয়াত করলে এক তৃতীয়াংশ তিনবার পড়ার সওয়াব পাওয়া যাবে। পুরো কুরআন একবার পড়ার সওয়াব পাওয়া যাবে বলে কোনো ইঙ্গিত হাদীসে নেই। বিষয়টি সহজে বোঝার জন্য মনে করুন, আপনার একটি কাজ আছে। যে কাজের তিনটি অংশ রয়েছে। এই কাজটি পূর্ণ করার উপর আপনার ১০০ টাকার দেওয়ার প্রতিশ্রুতি রয়েছে। তবে একটি অংশ করলে ২০ টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি। এখন কেউ যদি একটি অংশ তিনবার করে এবং এমনটি করার সুযোগ থাকে তবে আপনার প্রতিশ্রুতি মোতাবেক সে ৬০ টাকা পাওয়ার কথা। এখন যদি সে দাবী করে যে, মোট অংশ তিনটি, আমি একটি অংশ তিনবার করেছি, সুতরাং আমি কাজটি পূর্ণ করেছি, তাই যুক্তির দাবী হলো আমাকে ১০০ টাকা দেওয়া হোক, এখানে আপনি তার এই যুক্তিকে কীভাবে দেখবেন? ঠিক তদ্রূপ একবার সূরা ইখলাস তেলাওয়াত করলে এক তৃতীয়াংশের সওয়াব মেনে নিলেও একবার পড়লে এক খতম কুরআনের সওয়াব পাওয়া যাবে এমন কথা যেমন নির্ভরযোগ্য হাদীস বহির্ভূত, তেমন যুক্তি বহির্ভূত। কোনো ইবাদত বা তার সওয়াবের ক্ষেত্রে যুক্তি দিয়ে কিছু বলার সুযোগ নেই, তথাপি অনেক দূরবর্তী একটি যুক্তির আলোকে আমাদের মাঝে সূরা ইখলাস তিনবার পড়ে কুরআন খতমের সওয়াব অর্জনের কথা ও আমল অত্যন্ত ব্যাপকভাবে প্রচারিত ও প্রচলিত। এমনকি অনেকে পুরো

কুরআন পড়ার পর তিনবার সূরা ইখলাস পড়েন যাতে করে ভুলভ্রান্তি কিছু হলে এর মাধ্যমে তার ঘাটতি পূর্ণ হয়ে যায়, তারাবীর সালাতে অনেকে এই সূরা তিনবার পড়ে ঘাটতি পূর্ণ করেন, অথচ শরীয়তে এ সবার কোনো ভিত্তি নেই। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হলো, অন্যের জন্য খতম পড়তে গিয়ে ঘটনাক্রমে পড়া শেষ না হলে এই সূরা তিনবার পড়ে বেঁচে যাওয়ার বাহানা তাল্লাশ করা হয়। খতমের আয়োজকের প্রশ্নের জবাব দেওয়ার জন্য এই সূরা তিনবার পড়ে নিলেই কাম সারে। এভাবে বিভিন্ন সুন্নাহ বিরোধী কর্মের অনুপ্রবেশ ঘটে। কেউ বলতে পারেন সূরা ইখলাসের বর্ণিত ফযিলতের ব্যাপারে হাদীস রয়েছে, যেমন একটি হাদীসে এসেছে:

ثلاث مرات فكأنما قرأ القرآن أجمع." (من قرأ قل هو الله أحد

“যে ব্যক্তি قل هو الله أحد তিনবার পড়ল সে যেন পুরো কুরআন পাঠ করল।”^{৬০০} এ হাদীসটি অনির্ভরযোগ্য। এর কোনো নির্ভরযোগ্য সনদ নেই।^{৬০৪} এ হাদীস ছাড়াও উক্ত সূরা সংক্রান্ত নির্দিষ্ট সংখ্যা ও বিশাল ফযিলতের কথা সহ আরো কিছু হাদীস রয়েছে যার নির্ভরযোগ্য কোনো সনদ বা ভিত্তি নেই। হাদীসের সাথে যাদের গভীর সম্পর্ক রয়েছে তারা জানেন যে, অন্যের কথা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামে নিসবত বা সম্পূক্তের একটি দিক হচ্ছে, অনেক সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের

^{৬০০} আব্দুল্লাহ জালাল উদ্দীন সুয়ুতী, (৮৪৯-৯১১ হিজরী, ১৪৪৫-১৫০৫ ঈসাব্দী) জাম’উল জাওয়ামি’য়, মিম হরফের হাদীস, নং ৬২০১, আলাউদ্দীন আলী ইবন হুসামুদ্দীন আল-মুত্তাকী, (৮৮৮-৯৭৫ হিজরী, ১৪৮৩-১৫৬৭ ঈসাব্দী) কানযুল উম্মাল, ১/৫৯৮।

^{৬০৪} নুরুদ্দীন আলী ইবন আবু বাকর আল-হাইসামী, মাজমা’উয়াওয়ায়িদ, সূরা “قل هو الله أحد” এবং এবিসয়ে যা বর্ণিত হয়েছে, নং: ১১৫৪০, আলবানী, সিলসিলাতুল আহাদীসিদ্দাযীফাহ, ১০/১৩৬, নং: ৪৬৩৪।

হাদীসের বিভিন্ন মর্ম বা ব্যাখ্যা মানুষ তাদের জ্ঞান বা মেধা থেকে বর্ণনা করে থাকেন। পরবর্তীতে ব্যাখ্যাকারী নিজে অথবা অন্য কেউ উক্ত ব্যাখ্যা বা মর্মকেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে সম্পৃক্ত করে হাদীস বলে চালিয়ে দিয়েছেন। অনেক জাল হাদীসের অনুপ্রবেশ এভাবেই ঘটেছে। আল্লামা সুয়ুতী মনে করেন জাল হাদীসের এই প্রকারটি সর্বাধিক।^{৬০৫} নির্ভরযোগ্য বা গ্রহণযোগ্য কোনো সনদ না থাকায় বর্ণিত হাদীসটিও এই ধরনের বলে সহজেই অনুমেয়। আল্লাহ আমাদেরকে সঠিক বুঝ দান করুন এবং সহীহ সুন্নাহ মোতাবেক আমাদের জীবন পরিচালনার তওফীক দান করুন। আমীন।

তেতাল্লিশ তম পরিচ্ছেদ - মুহাররম মাসের সুন্নাহ ও বিদআত

আল্লাহ তা‘আলা বার মাসের মধ্যে মুহাররম, রজব, যুলক্বাদাহ ও যুলহিজ্জাহ এই চারটি মাসকে বিশেষ মর্যাদা দান করেছেন। এই মাসগুলো ‘হারাম’ বা সম্মানিত মাস হিসাবে পরিগণিত। ঝগড়া-বিবাদ, লড়াই, খুন-খারাবী ইত্যাদি অন্যায-অপকর্ম হ’তে দূরে থেকে এর মর্যাদার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য। যেমন আল্লাহ বলেন,

فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ

‘এই মাসগুলিতে তোমরা পরস্পরের উপরে অত্যাচার কর না’ (সূরা তওবা ৯/৩৬)।

^{৬০৫} সুয়ুতী, তাদরীবুর-রাবী, জালিয়াতের প্রকার, ১/২৮৭।

রাসূল (সাঃ) কর্তৃক আশুরার সিয়াম পালন ও এর ফযীলত বর্ণনার মাধ্যমে স্বাভাবিকভাবেই এ মাসের মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে দুঃখের বিষয় হ'ল, রাসূল (সাঃ) যে উদ্দেশ্যে আশুরার সিয়াম পালন করেছেন, আমরা তাঁর উদ্দেশ্যের কথা ভুলে গিয়ে এমন উদ্দেশ্যে সিয়াম পালন করছি যা কুরআন ও সুন্নাতের সম্পূর্ণ বিরোধী। সাথে সাথে এমন সব বিদ'আতে লিপ্ত হয়েছি যা থেকে বেঁচে থাকা একান্ত যরুরী। নিম্নে মুহাররম মাসের সুন্নাত ও বিদ'আত সম্পর্কে আলোকপাত করা হ'ল।-

মুহাররম মাসের সুন্নাতি আমল

মুহাররম মাসের সুন্নাতি আমল সম্পর্কে সহীহ হাদীস সমূহে যা বর্ণিত হয়েছে তা হ'ল আশুরার সিয়াম পালন করা। রাসূল (সাঃ) ১০ই মুহাররমে ছিয়াম পালন করেছেন।

ইহুদী ও নাছারারা শুধুমাত্র ১০ই মুহাররমকে সম্মান করত এবং ছিয়াম পালন করত। তাই রাসূল (সাঃ) তাদের বিরোধিতা করার জন্য ঐ দিন সহ তার পূর্বের অথবা পরের দিন সহ ছিয়াম পালনের নির্দেশ দিয়েছেন। অতএব সুন্নাত হ'ল, ৯ ও ১০ই মুহাররম অথবা ১০ ও ১১ই মুহাররমে ছিয়াম পালন করা। আব্দুল্লাহ ইবনু আববাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন,

حِينَ صَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ يَوْمٌ تُعَظَّمُهُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ قَالَ فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبِلُ حَتَّى تُوَفِّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন আশুরার সিয়াম পালন করলেন এবং সিয়াম পালনের নির্দেশ দিলেন, তখন সাহাবায়ে কেলাম রাসূল (সাঃ)-কে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! ইহুদী ও নাছারাগণ এই দিনটিকে (১০ই মুহাররম) সম্মান করে। তখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, ‘আগামী বছর বেঁচে থাকলে ইনশাআল্লাহ আমরা ৯ই মুহাররম সহ ছিয়াম রাখব’। রাবী বলেন, কিন্তু পরের বছর মুহাররম আসার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়ে যায়। (মুসলিম হা/১১৩৪)। অন্য হাদীসে এসেছে, ইবনু আববাস (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সাঃ) বলেছেন,

صُومُوا يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَخَالِفُوا فِيهِ الْيَهُودَ صُومُوا قَبْلَهُ يَوْمًا أَوْ بَعْدَهُ يَوْمًا-

‘তোমরা আশুরার দিন সিয়াম রাখ এবং ইহুদীদের বিরোধিতা কর। তোমরা আশুরার সাথে তার পূর্বে একদিন বা পরে একদিন ছিয়াম পালন কর’। (বায়হাকী ৪র্থ খন্ড, পৃঃ ২৮৭। অত্র রেওয়ায়াতটি ‘মারফু’ হিসাবে সহীহ নয়, তবে ‘মওকুফ’ হিসাবে ‘সহীহ’। দ্রঃ হাশিয়া সহীহ ইবনু খুযায়মা হা/২০৯৫, ২/২৯০ পৃঃ। ৯, ১০ বা ১০ ও ১১ দু’দিন সিয়াম রাখা উচিত। তবে ৯ ও ১০ দু’দিন রাখাই সর্বোত্তম)।

আশুরার সিয়ামের ফযীলত

ফযীলতের দিক থেকে রামাযানের ছিয়ামের পরেই আশুরার ছিয়ামের অবস্থান। এটা পূর্ববর্তী এক বছরের গুনাহের কাফফারা স্বরূপ। অর্থাৎ এর মাধ্যমে পূর্ববর্তী এক বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়। আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন,

-أَفْضَلُ الصَّيَّامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمُ وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ

‘রামাযানের পরে সর্বোত্তম সিয়াম হ’ল মুহাররম মাসের ছিয়াম (অর্থাৎ আশুরার ছিয়াম) এবং ফরয সালাতের পরে সর্বোত্তম সালাত হ’ল রাতের নফল সালাত’ (অর্থাৎ তাহাজ্জুদের সালাত)। (মুসলিম হা/১১৬৩, মিশকাত হা/২০৩৯ ‘নফল ছিয়াম’ অনুচ্ছেদ; ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/১৯৪১)। অন্য হাদীসে এসেছে, আবু ক্বাতাদাহ (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেন,

-وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ

‘আমি আশা করি আশুরা বা ১০ই মুহাররমের ছিয়াম আল্লাহর নিকটে বান্দার বিগত এক বছরের (ছগীরা) গোনাহের কাফফারা হিসাবে গণ্য হবে’ (মুসলিম হা/১১৬২, মিশকাত হা/২০৪৪; ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/১৯৪৬)।

আশুরার সিয়াম পালনের উদ্দেশ্য

১০ই মুহাররম তারিখে অত্যাচারী পাপিষ্ঠ ফেরাউন ও তার কওম আল্লাহর প্রিয় নবী মূসা (আঃ)-কে হত্যার ঘণিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হ’লে ফেরাউনের সাগরডুবি হয় এবং মূসা (আঃ) ও তাঁর সম্প্রদায় বনু ইস্রাঈল আল্লাহ তা‘আলার বিশেষ রহমতে অত্যাচারী ফেরাউনের হাত থেকে মুক্তিলাভ করে। তার শুকরিয়া হিসাবে মূসা (আঃ) এ দিন নফল ছিয়াম রাখেন। মূসা (আঃ)-এর তাওহীদী আদর্শের সনিষ্ঠ অনুসারী হিসাবে স্বয়ং মুহাম্মাদ (সাঃ) এ দিনে নফল ছিয়াম পালন করেছেন এবং তাঁর উম্মতকে পালন করতে বলেছেন। ইহুদীরা কেবল ১০ তারিখে ছিয়াম রাখত। তাই তাদের বিরোধিতার লক্ষ্যে

তার আগের অথবা পরের দিনকে যোগ করার কথা রাসূল (সাঃ) বলেছেন।

হাদীসে এসেছে, আব্দুল্লাহ বিন আববাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মদীনায় হিজরত করে ইহুদীদেরকে আশুরার সিয়াম রাখতে দেখে কারণ জিজ্ঞেস করলে তারা বলেন,

هَذَا يَوْمٌ عَظِيمٌ أَتَى فِيهِ مُوسَى وَقَوْمَهُ وَغَرَّقَ فِرْعَوْنُ وَقَوْمَهُ فَصَامَهُ مُوسَى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَى . شُكْرًا فَتَحْنُ نَصُومُهُ بِمُوسَى مِنْكُمْ . فَصَامَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ

‘এটি একটি মহান দিন। এদিনে আল্লাহ মূসা (আঃ) ও তাঁর কওমকে নাজাত দিয়েছিলেন এবং ফেরাউন ও তার লোকদের ডুবিয়ে মেরেছিলেন। তাঁর শুকরিয়া হিসাবে মূসা (আঃ) এ দিন সিয়াম পালন করেন। তাই আমরাও এ দিন সিয়াম পালন করি। তখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, তোমাদের চাইতে আমরাই মূসা (আঃ)-এর (আদর্শের) অধিক হকদার ও অধিক দাবীদার। অতঃপর তিনি ছিয়াম রাখেন ও সকলকে রাখতে বলেন’^{৬০৬}।

উল্লেখ্য যে, আশুরায় মুহাররম উপলক্ষে ৯ ও ১০ই মুহাররম অথবা ১০ ও ১১ই মুহাররম এই দু’টি ছিয়াম পালন করা সুন্নাত।

এছাড়া অন্য কোন ইবাদত সুন্নাত নয়। আর তাও হ’তে হবে একমাত্র ফেরাউনের কবল থেকে মূসা (আঃ)-এর নাজাতের শুকরিয়া স্বরূপ। শাহাদতে হুসাইনের শোক বা মাতম স্বরূপ কখনোই নয়।

মুহাররম মাসের বিদ'আত সমূহ

(১) শাহাদতে হুসাইনের শোক পালনের উদ্দেশ্যে সিয়াম পালন করাঃ উপরোক্ত আলোচনায় মুহাররম মাসের সুন্নাতী আমল এবং তা পালনের উদ্দেশ্য সহীহ হাদীস দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হ'ল। আর তা হ'ল, অত্যাচারী শাসক ফেরাউনের কবল থেকে মূসা (আঃ)-এর নাজাতের শুকরিয়া স্বরূপ ৯ ও ১০ই মুহাররম অথবা ১০ ও ১১ই মুহাররম সিয়াম পালন করা। বর্তমান সমাজে উক্ত দু'টি ছিয়াম পালনের প্রচলন রয়েছে। তবে তা শাহাদতে হুসাইনের শোক পালনের উদ্দেশ্যেই পালিত হয়ে থাকে যা সম্পূর্ণরূপে সহীহ হাদীস বিরোধী এবং স্পষ্ট বিদ'আত। কেননা এই ছিয়ামের সূচনা হয়েছে মূসা (আঃ)-এর সময় থেকে।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর জীবদ্দশাতেই মুহাররমের ছিয়াম পালন করেছেন। আর কারবালার ঘটনা ঘটেছে রাসূল (সাঃ)-এর মৃত্যুর ৫০ বছর পরে ৬১ হিজরীতে। তাহ'লে কি করে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) হুসাইন (রাঃ)-এর শাহাদতের কারণে এই সিয়াম পালন করলেন? অতএব এসব নিছক ভিত্তিহীন কথা মাত্র। রাসূল (সাঃ) আশুরার ছিয়াম পালন করেছিলেন অত্যাচারী শাসক ফেরাউনের কবল থেকে মূসা (আঃ)-এর নাজাতের আনন্দে আল্লাহর শুকরিয়া স্বরূপ। পক্ষান্তরে আমরা আজ তা পালন করছি হুসাইন (রাঃ)-এর শাহাদতের শোক স্বরূপ। অথচ ওমর (রাঃ), ওসমান (রাঃ) সহ আরো অনেক সাহাবী শাহাদত বরণ করেছেন। আমরা তাঁদের স্মরণে কিছুই করি না। যদি হুসাইন (রাঃ) - এর শাহাদতের কারণে

শোক দিবস পালন করা হয়, তাহ'লে ওমর ও ওসমান (রাঃ)-এর শোক দিবস পালনের অধিক হক রাখে। বিদ'আতীদের নিকট এ সমস্ত সাহায্যে কেরামের শাহাদত বরণে শোক তো দূরের কথা; বরং আনন্দ দিবসে পরিণত হয়। যেমন- আববাসীয় খলীফা মুত্বী' বিন মুক্কতাদিরের সময়ে (৩৩৪-৩৬৩হিঃ/৯৪৬-৯৭৪ খৃঃ) তাঁর কউর শী'আ আমীর আহমাদ বিন বৃইয়া দায়লামী ওরফে মুইযযুদৌলা ৩৫১ হিজরীর ১৮ই যিলহজ্জ তারিখে বাগদাদে ওছমান (রাঃ)-এর শাহাদত বরণের তারিখকে তাদের হিসাবে খুশীর দিন মনে করে 'ঈদের দিন' (عيد غدير خم) হিসাবে ঘোষণা করেন।

শী'আদের নিকটে এই দিনটি পরবর্তীতে ঈদুল আযহার চাইতেও গুরুত্ব পায়। অতঃপর ৩৫২ হিজরীর শুরুতে ১০ই মুহাররমকে তিনি হুসাইন (রাঃ)-এর শাহাদত বরণের 'শোক দিবস' ঘোষণা করেন এবং সকল দোকান-পাট, ব্যবসা-বাণিজ্য, অফিস-আদালত বন্ধ করে দেন এবং মহিলাদেরকে শোকে চুল ছিঁড়তে, চেহারা কালো করতে, রাস্তায় নেমে শোকগাথা গেয়ে চলতে বাধ্য করেন। শহর ও গ্রামের সর্বত্র সকলকে শোক মিছিলে যোগদান করতে নির্দেশ দেন। শী'আরা খুশী মনে এই নির্দেশ পালন করে। কিন্তু সুন্নীরা নিষ্ক্রিয় থাকেন। পরে সুন্নীদের উপরে এই ফরমান জারি করা হ'লে ৩৫৩ হিজরীতে উভয় দলে ব্যাপক সংঘর্ষ বেধে যায়। এতে বাগদাদে তীব্র নাগরিক অসন্তোষ ও সামাজিক অশান্তির সৃষ্টি হয়। (ইবনুল আছীর, তারীখ ৮/১৮৪ পৃঃ; মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, আশূরায়ে

মুহররম ও আমাদের করণীয়, পৃঃ ৬-৭)^{৬০৭}। আমরা বর্তমানে যে উদ্দেশ্যে আশুরার ছিয়াম পালন করছি তা শী'আদের থেকে গৃহীত; যা অবশ্যই বর্জনীয়।

(২) ১০ই মুহররমকে আনন্দ উৎসবে পরিণত করাঃ রাফেযীরা (কউর শী'আ) হুসাইন (রাঃ) - এর শাহাদতের শোক স্বরূপ শোক দিবস পালন করে। পক্ষান্তরে একটি গোষ্ঠী রাফেযীদের বিরোধিতা করার লক্ষ্যে এ দিনটিকে আনন্দ উৎসবে পরিণত করে। এ দিনে রাফেযীদের শোক দিবস যেমন বিদ'আত; তেমনি তাদের বিরোধিতার লক্ষ্যে এ দিনে আনন্দ উৎসব করাও বিদ'আত। এটা যেন বিদ'আত দিয়ে বিদ'আত এবং মিথ্যা দিয়ে মিথ্যা প্রতিহত করার চেষ্টা। অথচ উচিত ছিল সুন্নাত দিয়ে বিদ'আত প্রতিহত করা। সত্য দিয়ে মিথ্যা প্রতিহত করা। রাসূল (সাঃ) ও সাহাবায়ে কেলাম এ দিনটিকে শোক দিবস হিসাবেও পালন করেননি। আবার আনন্দ উৎসবেও পরিণত করেননি। তাঁরা শুধুমাত্র ফেরাউনের কবল থেকে মূসা (আঃ)-এর নাজাতের শুকরিয়া স্বরূপ ছিয়াম পালন করেছেন^{৬০৮}।

(৩) তা'যিয়াঃ তা'যিয়া অর্থ বিপদে সাহায্য দেওয়া। যেটা বর্তমানে শাহাদাতে হোসাইনের শোক মিছিলে রূপ নিয়েছে। অথচ ইসলামে কারো মৃত্যুতে তিন দিনের অধিক শোক পালন করা নিষেধ^{৬০৯}।

^{৬০৭} ইবনুল আছীর, তারীখ ৮/১৮৪ পৃঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, আশুরায়ে মুহররম ও আমাদের করণীয়, পৃঃ ৬-৭

^{৬০৮} ড. সুলাইমান ইবনে সালাম আস-সুহাইমী, আল-আ'ইয়াদ ওয়া আছারুহা, পৃঃ ২৭৩

^{৬০৯} আবু দাউদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/৪৪৬৩ 'চুল আঁচড়ানো' অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য

কিন্তু বাগদাদের গোঁড়া শী‘আ আমীর মু‘ইযযুদ্দৌলা ৩৫২ হিজরীর ১০ই মুহাররমকে জাতীয় শোক দিবস ঘোষণা করেন এবং শহর ও গ্রামের সকলকে তা‘যিয়া মিছিলে যোগদানের নির্দেশ দেন। সেদিন থেকেই এই বিদ‘আতী প্রথা চালু হয়েছে। শী‘আদের উদ্ভাবিত এই বিদ‘আতী প্রথার অনুসরণেই বাংলাদেশের বিদ‘আতীরা ১০ই মুহাররমে মিছিল বের করে থাকে। প্রত্যেক আল্লাহভীরু মুসলমানের এই সব বিদ‘আত হ’তে দূরে থাকা আবশ্যিক।

(৪) ১০ই মুহাররমে চোখে সুরমা লাগানোঃ অনেকেই আশুরার দিন বা ১০ই মুহাররমে বিশেষ ফযীলতের আশায় চোখে সুরমা লাগিয়ে থাকে; যা সুস্পষ্ট বিদ‘আত। কেননা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ও সাহাবায়ে কেরাম আশুরার দিনে চোখে সুরমা লাগাননি এবং এর কোন ফযীলত বর্ণনা করেননি। ‘আশুরার দিনে চোখে ইছমিদ সুরমা লাগালে কখনোই চোখে রোগ হবে না’ মর্মে প্রচলিত হাদীসটি মাওযু বা জাল (ইবনুল জাওয়ী, আল-মাওযু‘আত পৃঃ ২/২০৩; মোল্লা আলী ক্বারী, আসরারুল মারফু‘আহ, পৃঃ ৪৪)^{৬১০}।

(৫) ১০ই মুহাররমে বিশেষ ফযীলতের আশায় বিশেষ পদ্ধতিতে সালাত আদায় করাঃ ১০ই মুহাররমে বিশেষ ফযীলতের আশায় বিশেষ পদ্ধতিতে সালাত আদায় করা হয়ে থাকে; যা সুস্পষ্ট বিদ‘আত। কেননা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম এ দিনে বিশেষ কোন সালাত আদায় করেছেন মর্মে কোন সহীহ দলীল

^{৬১০} ইবনুল জাওয়ী, আল-মাওযু‘আত পৃঃ ২/২০৩; মোল্লা আলী ক্বারী, আসরারুল মারফু‘আহ, পৃঃ ৪৪

পাওয়া যায় না। এ সম্পর্কে যা পাওয়া যায় তার সবগুলিই জাল বা বানোয়াট। যেমন-

(ক) আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (সাঃ) বলেছেন, 'আশুরার দিনে যে ব্যক্তি চার রাক'আত সালাত আদায় করবে এবং প্রত্যেক রাক'আতে একবার সূরা ফাতিহা ও পঞ্চাশবার সূরা ইখলাছ তেলাওয়াত করবে, আল্লাহ তা'আলা তার অতীতের পঞ্চাশ বছরের গুনাহ এবং ভবিষ্যতের পঞ্চাশ বছরের গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন'। উল্লিখিত হাদীসটি জাল বা বানোয়াট। (আল-মাওযু'আত পৃঃ ২/১২২)^{৬১১}।

(খ) রাসূল (সাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি আশুরার দিনে যোহর ও আছরের সালাতের মাঝখানে চল্লিশ রাক'আত সালাত আদায় করবে। প্রত্যেক রাক'আতে একবার সূরা ফাতিহা, দশবার আয়াতুল কুরসী, দশবার সূরা ইখলাস, পাঁচবার সূরা ফালাক এবং পাঁচবার সূরা নাস তেলাওয়াত করবে আল্লাহ তা'আলা তাকে জান্নাতুল ফিরদাউস দান করবেন'। অত্র হাদীসটিও জাল বা বানোয়াট (আল-মাওযু'আত পৃষ্ঠা নং - ২/১২২-১২৩; শাওকানী, আল-ফাওয়াইদুল মাজমূ'আহ পৃঃ ৪৮)^{৬১২}। শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন,

ليس في حديث عاصم بن عاصم حديث صحيح غير الصوم، وما يروي في فضل صلاة معينة فيه فهذا كله كذب موضوع باتفاق أهل المعرفة، ولم ينقل هذه الأحاديث أحد من أئمة أهل العلم في كتبهم

^{৬১১} আল-মাওযু'আত পৃঃ ২/১২২

^{৬১২} আল-মাওযু'আত পৃঃ ২/১২২-১২৩; শাওকানী, আল-ফাওয়াইদুল মাজমূ'আহ পৃঃ ৪৮

‘সিয়াম ব্যতীত আশূরা সম্পর্কিত কোন সহীহ হাদীস নেই। এই দিনে নির্দিষ্ট সালাতের ফযীলত সম্পর্কে যে বর্ণনা এসেছে প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিসগণের ঐক্যমতে তার সবগুলিই মিথ্যা ও বানোয়াট। মুহাক্কিক আলেমদের কেউই তাদের কিতাব সমূহে এ সমস্ত হাদীস সংকলন করেননি (শায়খুল ইসলাম ইবনে তায়মিয়াহ, মিনহাজুস সুন্নাহ ৪/১১৬)^{৬৩৩}।

অতএব এ উপলক্ষে আশূরার দু’টি সিয়াম ব্যতীত অন্য কোন ইবাদত রাসূলুল্লাহ (সাঃ), সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈনে ইযাম, ইমাম চতুষ্টয়ের কেউ কখনোই করেননি। আর তাঁরা সিয়াম দু’টি পালন করেছেন কেবল ফেরাউনের কবল থেকে মুসা (আঃ)-এর নাজাতের শুকরিয়া স্বরূপ; শাহাদতে হুসাইনের শোক স্বরূপ নয়। সুতরাং বর্তমানে আশূরা উপলক্ষে যা হচ্ছে তার সবগুলিই পরবর্তী যুগের বিদআতীদের আবিষ্কার; যা অবশ্যই বর্জনীয়^{৬৩৪}।

(৬) তাবেঈ ইয়াযীদ বিন মু‘আবিয়া-কে ‘মালউন’ বা অভিশপ্ত বলে গালি দেওয়াঃ ইয়াযীদ বিন মু‘আবিয়াকে ‘মালউন’ বা অভিশপ্ত বলে গালি দেওয়া আদৌ ঠিক নয়। বরং সকল মুসলমানের ন্যায় তার মাগফেরাতের জন্য দো‘আ করা উচিত। কেননা মানুষ হিসাবে তার কিছু ভুল-ত্রুটি থাকলেও কারবালার মর্মান্তিক ঘটনার জন্য তিনি দায়ী নন। এজন্য মূলতঃ দায়ী বিশ্বাসঘাতক কূফাবাসী ও নিষ্ঠুর গভর্ণর ওবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদ। কেননা ইয়াযীদ কেবল হুসাইন

^{৬৩৩} শায়খুল ইসলাম ইবনে তায়মিয়াহ, মিনহাজুস সুন্নাহ ৪/১১৬

^{৬৩৪} মুহাররম মাসের সুন্নাহ ও বিদআত - মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম, লিসাঙ্গ, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সউদী আরব; দাঈ, আল-ফুরকান ইসলামিক সেন্টার, মানামা, বাহারাইন। **উৎস:** মাসিক আত তাহরীক

(রাঃ)-এর আনুগত্য চেয়েছিলেন, তাঁর খুন চাননি। হুসাইন (রাঃ) সে আনুগত্য দিতেও প্রস্তুত ছিলেন। ইয়াযীদ স্বীয় পিতার অছিয়ত অনুযায়ী হুসাইনকে সর্বদা সম্মান করেছেন এবং তখনও করতেন। হুসাইন (রাঃ)-এর ছিন্ন মস্তক ইয়াযীদের সামনে রাখা হ'লে তিনি কেঁদে বলে ওঠেন, ‘ওবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদের উপর আল্লাহ লা'নত করুন। আল্লাহর কসম! যদি হুসাইনের সাথে ওর রক্তের সম্পর্ক থাকত, তাহ'লে সে কিছুতেই তাঁকে হত্যা করত না। তিনি আরো বলেন, হুসাইনের খুন ছাড়াও আমি ইরাকীদেরকে আমার আনুগত্যে রাখী করাতে পারতাম’^{৬১৫}।

কূফার নেতাদের লিখিত ১৫০টি পত্র পেয়ে হুসাইন (রাঃ) কূফায় আসলে বছরার গভর্ণর ওবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদ কূফার গভর্ণর মুসলিম বিন আকীলকে থেফতার করে হত্যা করে। এদিকে হুসাইন (রাঃ) প্রদত্ত তিনটি প্রস্তাবের কোনটি গ্রহণ না করায় দুষ্টমতি ওবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদের সাথে সংঘর্ষ অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। এতে হুসাইন (রাঃ) সপরিবারে নিহত হন^{৬১৬}।

সম্মানিত পাঠক! পরিপূর্ণভাবে ইসলামের উপর টিকে থাকতে হ'লে ফিরে যেতে হবে একমাত্র পবিত্র কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর দিকে। মুসলিম জাতি আজ কুরআন-সুন্নাহ থেকে ছিটকে পড়েছে। ফলে বিদ'আতের কাল মেঘে আচ্ছাদিত হয়েছে ইসলামী শরী'আতের স্বচ্ছ আকাশ। এ থেকে বেরিয়ে আসার জন্য শারঈ জ্ঞানার্জন অপরিহার্য।

^{৬১৫} ইবনু তায়মিয়া, মুখতাছার মিনহাজুস সুন্নাহ, ১/৩৫০; আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ৮/১৭৩; আশু'রায়ে মুহাররম ও আমাদের করণীয়, পৃঃ ৭-১০

^{৬১৬} ইবনু হাজার, আল-ইছাবাহ ২/২৫২; ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ৮/১৫৪, ১৭১

মুহররম মাসে রাসূল (সাঃ) কি করেছেন আর আমরা কি করছি তা মিলিয়ে দেখতে হবে পবিত্র কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর সাথে। কারবালার ঘটনা সম্পর্কে সকল প্রকার আবেগ ও বাড়াবাড়ি হ'তে দূরে থাকতে হবে এবং আশূরা উপলক্ষে প্রচলিত শিরক ও বিদ'আতী আকীদা-বিশ্বাস ও রসম-রেওয়াজ পরিহার করতে হবে। আল্লাহ আমাদেরকে বিদ'আত মুক্ত জীবন-যাপন করার তওফীক দান করুন- আমীন!

চৌআল্লিশ তম পরিচ্ছেদ - পোশাক পরিচ্ছেদের বিদ'আত

আমাদের দেশে বর্তমানে 'সুন্নাতী লেবাস' বলে এক ধরনের বিশেষ কাটিং ও বিশেষ পরিমাণের লম্বা কোর্তা পরিধান করা হচ্ছে। প্রচার করা হচ্ছে যে, এই হচ্ছে সুন্নাতী পোশাক। আর এ সুন্নাতী পোশাক যে না পরবে সে ফাসিক বলে বিবেচিত হবে এবং এমন লোক যদি আলিম হয়, তাহলে তার পিছনে নামায পড়া জায়েয হবেনা। এ কারণে সমাজের এক বিশেষ শ্রেণীর লোক-আলিম ও পীরগণ এ ধরনের কোর্তা পরাকেই সুন্নাত মনে করেন, 'সুন্নাতী পোশাক' বলেই তারা এর প্রচারও করেন। শুধু নিজেরাই তা পরিধান করেননা, তাঁদের ছাত্র ও মুরীদানকেও অনুরূপ কাটিং ও লম্বা মাপের কল্লিদার কোর্তা পরিধান করতে বাধ্য করে থাকেন। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, সুন্নাতী পোশাক বলতে কি বোঝায়, কোনো বিশেষ কাটিং বা বিশেষ লম্বা মাপের জামা পরা কি সত্যিই সুন্নাত? সে সুন্নাত কোন দলীলের ভিত্তিতে প্রমাণিত হলো? কুরআন থেকে?

হাদীস থেকে? কুরআন ও হাদীসের আলোকে আমরা বিষয়টিকে বুঝতে চেষ্টা করবো।

পোশাক কেমন হবে

কুরআনের আলোকে বিশ্লেষণঃ

পোশাক কি রকম হতে হবে সে সম্পর্কে কুরআন মজীদে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আয়াত হলো এই।

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوَآتِكُمْ وَرِيشًا ۖ وَلِبَاسُ
[التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ۚ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ] [৭:৩১]

- হে আদম সন্তান! নিশ্চয়ই আমরা তোমাদের জন্য এমন পোশাক (পরিধানের বিধান) নাযিল করেছি, যা তোমাদের লজ্জাস্থানকে ঢেকে রাখবে এবং যা হবে ভূষণ। আর তাকওয়ার পোশাক, তা-ই কল্যাণময়। এ হচ্ছে আল্লাহর আয়াতসমূহের অন্যতম; এবং বলা হচ্ছে এই আশায় যে, তারা নসীহত কবুল করবে। (আল আরাফঃ আয়াত নং - ২৬)

উপরোক্ত আয়াত থেকে কয়েকটি মৌলিক কথা জানতে পারা যায়।

১। প্রথম এই যে, পোশাক মানুষের জন্য আল্লাহ তা'আলার এক বিশেষ দান।

অতএব পোশাক সম্পর্কে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। সে পোশাক কি রকমের হতে হবে; সে বিষয়ে এ আয়াত থেকে দু'টো কথা জানতে পারা যায়। একটি হলো, পোশাক এমন হতে হবে যা অবশ্যই মানুষের লজ্জাস্থানকে আবৃত করে রাখবে। যে পোশাক

মানুষের লজ্জাস্থানকে আবৃত করেনা, তা মানুষের পোশাক হতে পারেনা।

২। আর দ্বিতীয় কথা হলো, সে পোশাককে ‘ভূষণ’ হতে হবে। ریش শব্দের মানে হলো উজ্জ্বল্য, চাকচিক্য, শোভাবর্ধক। আভিধানিকদের মতে ریش শব্দের আসল অর্থ হলো পাখির পালক যা চাকচিক্যময় ও শোভাবর্ধক হয়ে থাকে। আর মানুষের পোশাকও যেহেতু পাখির পক্ষ ও পালকের মতোই, এ কারণে মানুষের পোশাক বাহ্যত কেমন হবে তা বোঝাতে ریش শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং, পোশাক পরলে যেন দেখতে মানুষকে ভালো দেখায়, বদসুরত যেন না হয়, সেদিকে খেয়াল করতে হবে।

পরিচ্ছন্ন পোশাকই মানুষের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে

বস্ত্রত পোশাকই মানুষের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে, পোশাকের মাধ্যমে মানুষের সৌন্দর্য বোধ, ভদ্রতা, শালীনতা ও রুচি-সুস্থতা প্রমাণিত হয়। আর পোশাক যদি সে রকম না হয়, তা হলে আল্লাহর দেয়া এক সুন্দর ব্যবস্থাকে অবজ্ঞা করা হবে, হবে আল্লাহর নাশোকরী।

নুতন পোশাক পরিধান করে দোয়া করার বিধান

নতুন পোশাক পরে যে দো‘আটি পড়তে রাসূলে করীম (স) বলেছেন তা হলোঃ ‘প্রশংসা সেই আল্লাহর যিনি আমাকে এমন পোশাক পরিয়েছেন, যা দ্বারা আমি লজ্জাস্থান আবৃত করি এবং আমার জীবনে শোভা ও সৌন্দর্য লাভ করি।’ এ দো‘আতে ও সেই ছতার ঢাকা এবং প্রশংসা লাভের লক্ষ্যের কথাই বলা হয়েছে, পোশাক পড়ার মূলে অন্য কোনো উদ্দেশ্য নাই। এ ঠিক কুরআনের

আয়াতেরই ব্যাখ্যা যেন। এর সঙ্গে এ কথাও মনে রাখতে হবে যে, ভূষণ ও শোভার ব্যাপারে মানুষের রুচি পরিবর্তনশীল এবং স্থান, কাল ও মানসিক অবস্থার দৃষ্টিতে রুচির ক্ষেত্রে অনেক পার্থক্য ও পরিবর্তন সূচিত হতে পারে। অতএব কুরআনের মতে পোশাকের ধরণ ও কাটিং পরিবর্তনশীল। কোনো ধরাবাঁধা কাটিং এর পোশাক ইসলামী পোশাক বলে অভিহিত হতে পারেনা।

তাকওয়া লেবাস সম্বন্ধে সাহাবীদের মন্তব্য

এ আয়াতের তৃতীয় কথা হলোঃ তাকওয়ার লেবাস। তাকওয়ার লেবাস কাকে বলে এ বিষয়ে বিভিন্ন মত দেখা যায়। যেমন -

১। কাতাদাহ বলেছেন, ‘লেবাসুত-তাকওয়া’ বলে এখানে ঈমান বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ পূর্বোক্ত দুটি পরিচয়সহ পোশাক পরতে হবে, কিন্তু এ ব্যাপারে সর্বাধিক কল্যাণময় ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে ঈমানকে তাজা রাখা, সঠিকরূপে বহাল রাখা।

২। হাসান বসরী এর মানে বলেছেনঃ লজ্জা, লজ্জাশীলতা, শালীনতা। কেননা, এই লজ্জাশীলতা ও শালীনতাই মানুষকে তাকওয়া অবলম্বন করতে উদ্বুদ্ধ করে।

৩। ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন - তা হলো, নেক আমল।

৪। ওসমান ইবনে আফফান (রা) বলেছেন, তা হলো নৈতিক পবিত্রতা।

আর উক্ত আয়াতের মানে হলোঃ তাকওয়ার পোশাক ভালো-কল্যাণময়, যদি তা গ্রহণ করা হয় আল্লাহর সৃষ্ট পোশাক ও সৌন্দর্য ব্যবস্থা থেকে।

নারী ও পুরুষের পোশাকের পার্থক্য পর্যালোচনা

মোটকথা, পোশাককে প্রথমে লজ্জাস্থান আবরণকারী হতে হবে। এজন্যে নারী ও পুরুষের পোশাকে মৌলিকভাবে পার্থক্য হতে বাধ্য এ কারণে যে, পুরুষের লজ্জাস্থান এবং নারী দেহের লজ্জাস্থানের পরিধির দিক দিয়ে পার্থক্য রয়েছে।

আর দ্বিতীয় হচ্ছে, তা অবশ্যই ভূষণ বা শোভাবর্ধক ও সৌন্দর্য প্রকাশক হতে হবে। যে পোশাক মানুষের আকার-আকৃতিকে কিস্তৃতকিমাকার বা বীভৎস করে দেয়, চেহারা বিকৃত করে দেয়, সে পোশাক কুরআন সমর্থিত পোশাক নয়, কোনো মুসলমানের পক্ষেই তা ব্যবহারযোগ্য হতে পারেনা।

এই পর্যায়ে কুরআন মজীদ থেকে দ্বিতীয় যে আয়াতটি উদ্ধৃত করা যায় তা হলো এইঃ

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ

- তোমাদের সৌন্দর্য বৃদ্ধিকারী জিনিস - পোশাক - তোমরা তা গ্রহণ করো প্রতি নামাযের সময়।

এ আয়াতেও সেই পোশাক গ্রহণের কথাই বলা হয়েছে যা হবে জিনাত, শোভামন্ডিত, সৌন্দর্য বৃদ্ধিকারী।

পোশাক নির্ধারনে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে

অতএব পোশাক গ্রহণের ব্যাপারে কুরআনের নির্দেশ অনুযায়ী মূলগতভাবে তিনটি জিনিসের দিকেই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবেঃ

ক। প্রথমত লজ্জাস্থান আবরণকারী,

খ। দ্বিতীয় ভূষণ, শোভাবর্ধনকারী এবং

গ। তৃতীয় সে পোশাক শালীনতাপূর্ণ হতে হবে, লজ্জাশীলতার অনুভূতির প্রতীক হতে হবে, নির্লজ্জতাব্যঞ্জক হবে না তা।

সুতরাং, উপরোক্ত আলোচনা থেকে বলা যায় যে, কুরআন মজীদে পোশাক সম্পর্কে যে হেদায়াত পাওয়া যায়, তা এতটুকুই। এছাড়া কুরআন থেকে পোশাক পর্যায়ে আর কিছু জানা যায়না। কুরআন থেকে যা জানা গেল, তাতে কিন্তু পোশাকের কাটিং, ধরন, আকার ও পরিমাণ দৈর্ঘ্য প্রস্থ সম্পর্কে কিছুই বলা হয়নি।

হাদীস থেকে পোশাকের পর্যালোচনা

অতঃপর দেখতে হবে, এ বিষয়ে হাদীস থেকে কি জানা যায়। সর্বপ্রথম বুখারী শরীফের ‘কিতাবুল লিবাস’ এ উদ্ধৃত হাদীস লক্ষ্যণীয়। নবী করীম (স) বলেছেনঃ - তোমরা খাও, পান করো, পোশাক পরো এবং দান-খয়রাত করো। (আর এসব কাজ করবে দুটো শর্তে) না বেহুদা খরচ করবে, না অহংকারের দরুণ করবে।

খাওয়া, পান করা, পোশাক পর এবং দান খয়রাত করা সম্পর্কে রাসূলে করীমের এ নির্দেশ। এ কাজ অবাধ ও উন্মুক্ত-কেবলমাত্র দুটো শর্তের অধীন।

একটি হলো, এর কোনোটিই বেহুদা বাড়াবাড়ি ও সীমালংঘনকারী হবেনা। আর দ্বিতীয় হচ্ছে অহংকারের বশবর্তী হয়ে একাজগুলো করবেনা। বাঞ্ছনীয় নয় এমন এমন পরিমাণ অতিরিক্ত ব্যয় করাই হলো ‘ইসরাফ’। আর অহংকার করা, খুব বেশী দামী পোশাক এবং বাহদুরী ও বড়মানুষী প্রকাশ হয় যে পোশাকে তা নিষিদ্ধ। আর পোশাক পর্যায়ে আমাদের জন্য হেদায়াত এই যে, প্রথম বেহুদা খরচ

হয় যে পোশাকে, যে ধরনের যে পরিমাপের পোশাক, তা পরিধান করা সুন্নাহের খেলাফ। পোশাককে অবশ্যই এ থেকে মুক্ত হতে হবে।

আর দ্বিতীয়ত গৌরব অহংকারবশত কোনো পোশাক পরা এবং যে ধরনের, যে আকারের ও যে পরিমাপের পোশাক পরলে গৌরব-অহংকার, বড় মানুষী ও বাহাদুরী প্রকাশ পায়, যা মানুষকে সাধারণ মানুষ থেকে স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট করে দেয়, তা পরা যাবেনা। তা পরলে হবে সুন্নাহের বিপরীত কাজ।

অতএব ব্যয় বাহুল্য ও অহংকার বিবর্জিত যে কোনো আকারের, প্রকারের ধরনের, কাটিং এর এবং পরিমাপের পোশাকই সুন্নাহ অনুমোদিত পোশাক। সুন্নাহী লেবাস তাই, যা হবে এরূপ। যেমনঃ- হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেনঃ - তুমি খাও, যা-ই চাও, তুমি পরো যাই তোমার ইচ্ছা, যতক্ষণ পর্যন্ত দুটো জিনিস থেকে তুমি ভুলে থাকবেঃ ব্যয় বাহুল্য বেহুদা খরচ ও গর্ব অহংকার প্রকাশক বস্ত্র। অর্থাৎ এ দুটো বিকার থেকে মুক্ত যে কোনো পোশাকই হাদীস মোতাবিক পোশাক এবং তা পরা সম্পূর্ণ জায়েয। আকার, ধরন, কাটিং ও লম্বা খাটোর ব্যাপারে হাদীস কোনো বিশেষ নির্দেশ দেয়নি, আরোপ করেনি কোনো বাধ্যবাধকতা।

বুখারী শরীফেই এরপর যে হাদীসটি উদ্ধৃত হয়েছে, তা হলো এইঃ - নবী করীম (স) বলেছেনঃ আল্লাহ এমন কোনো ব্যক্তির দিকে রহমতের দৃষ্টি দিবেননা, সে আল্লাহর রহমত থেকে হবে বঞ্চিত।

আমাদের দেশের বিশেষ কোন কাটিং সম্বন্ধে ইসলামী শরীয়তে কোথাও পর্যালোচনা করা হয় নি

মনে রাখতে হবে, উপরোক্ত হাদীস থেকে জানা গেল যে, জামা কাপড়ের আকার, কাটিং বা দৈর্ঘ্য সম্পর্কে কোনো হেদায়াত পাওয়া যাচ্ছেনা। শুধু মানসিক ব্যাপারেই নির্দেশ করা হয়েছে। কাপড় পরার বাহ্যিক ধরণ কি হবে, কি না হবে তা-ই বলা হয়েছে। আর অহংকারের ভাব নিয়ে যাই করা হবে, যেভাবেই অহংকার প্রকাশ পাবে, তা-ই নিষিদ্ধ হবে।

১। বুখারী হাদীস এর ভাষ্য - অতঃপর বুখারী শরীফের সব কয়টি হাদীসই আপনি পড়ে যান, কোনো একটি হাদীসেও পোশাক সম্পর্কে বিশেষ কোনো কাটিং বা পরিমাপ গ্রহণের নির্দেশ পাবেননা। তবে হাদীস থেকে এ কথা জানা যায় যে, নবী করীমের কোর্তার আস্তিন বা হাত ছিল খুবই সংকীর্ণ। তা থেকে এখানকার চুরিদার আস্তিনের জামা পরা জায়েয প্রমাণিত হয়। নবী করীম (স) যে কামীস পরতেন তা কতখানি লম্বা ছিল? একটি হাদীস থেকে স্পষ্ট জানা যায় যে, তা খুব লম্বা ছিলনা। হাদীসটির ভাষা এইঃ - নবী করীমের কামীস সাধারণত সূতীর কাপড় দিয়ে তৈরী হতো এবং তার ঝুল খুব কম হতো ও আস্তিন চুরিদার হতো। এ থেকে অকাট্যভাবে জানা গেল যে, যারা বলে বেড়ায় যে, নবী করীম (স) অর্ধেক নলা পর্যন্ত ঝুল কোর্তা পরেছেন, তারা বানানো মিথ্যা কথা বলেছেন। সত্য কথা হলো তিনি লুংগী পরলে খাটো কোর্তা পরিধান করতেন।

২। তিরমিযী হাদীসের ভাষ্য - তিরমিযী শরীফে পোশাক পর্যায়ে যে হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে, তার মধ্যে ও প্রথম হাদীস হলো এইঃ - নবী করীম (স) বলেছেনঃ আমার উম্মতের পুরুষ লোকদের জন্য রেশমের পোশাক ও স্বর্ণ হারাম করা হয়েছে, আর মেয়েদের জন্য হালাল করা হয়েছে। অর্থাৎ পুরুষদের জন্য রেশমী পোশাক হারাম। এছাড়া মুসনাদে আহমদ এর একটি হাদীস থেকে পরিধেয় বস্ত্রের ঝুল কতখানি হওয়া উচিত সে বিষয়ে একটা সুস্পষ্ট ধারণা মেলে। হযরত আবু হুরায়রা(রা) বর্ণনা করেনঃ - ঈমানদার লোকদের ইজার পায়ে দুই নলার মাঝ বরাবর ঝুলতে পারে। এর নীচে যেতে পারে পায়ে গিরা ওপর পশ্ত। এর নীচে গেলে তা হবে জাহান্নামে যাওয়ার কাজ।

হাদীসে ইজার শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর মানে পরিধেয় বস্ত্র, যা কোমরের নীচের দিক ঢাকার জন্য ব্যবহৃত হয়। তা লুঙ্গি হতে পারে, পাজামা হতে পারে, হতে পারে আজকালকার পোশাক প্যান্ট বা অন্য কিছু। এগুলো ঝুল হাঁটু হতে গিরা পশ্তকার মাঝ বরাবর 'নিসফে সাক' পশ্ত হতে পারে। 'নিসফে সাক' এর নীচে পায়ে গিরা পশ্ত ও ঝুলতে পারে; কিন্তু এর নীচে গেলে তা জায়েয হতে পারেনা।

নবী করীম (স) এর এ পর্যায়ের হাদীসসমূহকে ভিত্তি করে হযরত ইবনে উমর (রা) বলেনঃ - রাসূলে করীম (স) ইজারকে পায়ে গিরার নীচে ঝুলবার ব্যাপারে যে আযাবের কথা বলেছেন, তা-ই তিনি বলেছেন কামীস এর ব্যাপারেও। 'কামীস' হলো গাত্রাবরণ,

শরীরের ঊর্ধ্বভাগ ঢাকার জন্য যাই পরিধান করা হয়, তাই কামীস তার কাটিং বা ধরন যাই হোকনা কেন। তা এখনকার পাঞ্জাবী, শার্ট, কোর্ট বা কল্লিদার জামা-যে কোনোটাই হতে পারে। তার কাটিং কি হবে, সে বিষয়ে হাদীস কিছুই বলছেন। বলছে শুধু এ কথা যে, তা যেনো এতদূর লম্বা না হয় যে, তদারা পায়ের গিরাও ঢেকে যায়। হযরত ইবনে উমরের কথা থেকে স্পষ্ট জানা গেল যে, পায়ের গিরার নিচে ইজার বা কামীস যাই বুলবে, তাই হারাম হবে। মনে রাখতে হবে যে, তদানীন্তন আরব সমাজে সাধারণত একখানা কাপড় দিয়ে শরীরের ওপরভাগ হতে হাটুর নীচের ভাগ পর্যন্ত ঢেকে ফেলত। এমনকি বর্তমানেও আরবদের পোশাক এরকমই। নীচে ছোটো-খাটো একটা পরে, আর তার ওপর দিয়ে পায়ের গিরা পর্যন্ত লম্বা একটা জামা পরে-এই হলো এখনকার আরবদের সাধারণ পোশাক। এর কোনোটিকেই যে নীচের দিকে বুলিয়ে দিয়ে পায়ের গিরা ঢেকে ফেলা যাবেনা তাই বলা হচ্ছে এইসব হাদীসে।

বস্তুত ‘নিসফে সাক’ বলতে কোনো কিছুর উল্লেখ বা থাকলে তা হলো এই। কিন্তু একটা লুঙ্গি বা পাজামা পরা সত্ত্বেও ‘নিসফে সাক’-নলার মাঝ বরাবর পর্যন্ত একটি কোর্তাও ওপর থেকে বুলে পড়তে হবে এবং এরূপ কোর্তা পরা সুন্নাত হবে-একথা কোথেকে জানা গেল? কুরআন থেকে নয়, হাদীস থেকেও নয়। আর কুরআনও হাদীস থেকে যা প্রমাণিত নয়, তা ফিকাহর কিতাব থেকেও প্রমাণিত হতে পারেনা। বর্তমান আরবদের রেওয়াজ থেকেও তা প্রমাণিত নয়।

বর্তমান এক শ্রেণীর আলিম ও পীরদের সুন্নাতি লেবাস সম্বন্ধে আলোচনা কুরআন ও হাদীসের আলোকে কতটুকু শরীয়ত সম্মত তার পর্যালোচনা

অতএব বর্তমানে এক শ্রেণীর আলিম ও পীর সাহেবানদের ‘সুন্নাতি লেবাস’ বলে চালিয়ে দেয়া ‘নলার অর্ধেক পয়ত্ত’ লম্বা কল্লিদার কোর্তা শরীয়তের মূল দলীল থেকে প্রমাণিত জিনিস নয়। এ হলো সম্পূর্ণ মনগড়া এক জিনিস। আর শরীয়তের সুন্নাতি রূপে প্রমাণিত নয়- এমন একটি পোশাককে ‘সুন্নাতি লেবাস’ বলে চালিয়ে দেয়া এক অতি বড় বিদয়াত (এ দেশের এক শ্রেণীর আলিম ও পীর সাহেবান যে পাজামা বা লুঙ্গির ওপর কল্লিদার নিসফে সাফ কোর্তা পরেন, তাকে ‘সুন্নাতি লেবাস’ বলা একটা মনগড়া কথা। এ পোশাককে বড়জোর এতদেশীয় পরহেযগার আলিম ও পীর সাহেবানদের পছন্দনীয় পোশাক-লিবালাস ওলামা-বলা যেতে পারে মাত্র)। তা বিদয়াত এজন্যেও যে, তাতে প্রয়োজনের অতিরিক্ত খরচ হয়। আর বেহুদা খরচ থেকে দূরে থাকা পোশাকের ব্যাপারে প্রথম শর্ত। বর্তমানে এই বিদয়াত চালু হয়ে রয়েছে সমাজের একশ্রেণীর জনগণের মাঝে। তারা মনে করছে ‘সুন্নাতি পোশাক পরছি আমরা; রাসূলের পায়বরী করছি আমরা, সে কথা এই লোকদের খেয়ালেই আসেনা। বস্তুত এ চরম অন্ধত্ব ছাড়া আর কিছুই নয়^{৬১}। সুতরাং, আমার এ দলীলভিত্তিক আলোচনায় এ পোশাকের প্রতি কোনো

^{৬১} সুন্নাতি ও বিদয়াত – মাওলানা আব্দুর রহীম (রহঃ), পৃষ্ঠা নং – ২৬২, খায়রুন প্রকাশনী, ঢাকা

বিদ্বেষ প্রচার করা হয়নি, তা পরতে নিষেধও করা হয়নি। আমার বক্তব্য শুধু এতটুকু যে, শুধুমাত্র এ ধরনের পোশাককেই ‘সুন্নাতী পোশাক’ বলাটাই বিদয়াত। আল্লাহ আমাদেরকে সঠিক পথে চলার তৌফিক দান করুন, আমীন।

পরিতাল্লিশতম পরিচ্ছেদ - তওহীদি আকীদায় শিরক এর বিদআত

একথা কেবল মুসলমানেরই নয়, দুনিয়ায় কারো অজানা থাকার কথা নয় যে, ইসলামের বুনিয়াদী আকীদা হচ্ছে তওহীদ। ‘তওহীদ’ মানে আল্লাহ একত্ব। আল্লাহ এর একত্ব সার্বিক, পূর্ণাঙ্গ ও সর্বাঙ্গিক। এ দৃষ্টিতে আল্লাহ শুধু সৃষ্টিকর্তাই নন তিনি একমাত্র পালনকর্তা, মালিক, রিয়িকদাতা, রক্ষাকর্তা ও আইন বিধানদাতাও।

অতএব মানুষ ভয় করবে কেবল আল্লাহ কে, ইবাদত বন্দেগী ও দাসত্ব করবে একমাত্র আল্লাহ। সৃষ্টিকর্তা, রিয়িকদাতা ও লালন পালনকারী হিসেবে মানবে একমাত্র আল্লাহকে। এসব দিক দিয়ে তিনিই একমাত্র ‘ইলাহ’। তিনি ছাড়া কেউ ইলাহ নেই, কেউ ইলাহ নয় এবং কেউ ইলাহ হতে পারেনা এবং তিনিই একমাত্র রব, তিনি ছাড়া লালনপালনকারী ও ক্রমবিকাশদাতা, রক্ষাকর্তা ও প্রয়োজন পূরণকারী আর কেউ নেই। মাবুদ ও একমাত্র তিনি-ই। তিনি ছাড়া আর কেউ ইবাদাত-বন্দেগী আনুগত্য পাবার অধিকারী নয়। অতএব মানুষের উপর আইন-বিধান কেবল আল্লাহরই চলবে। সংক্ষেপে কথায়ঃ রব্ব হওয়ার দিক দিয়েও তিনি এক, একক, অনন্য; আর ইলাহ হওয়ার দিক দিয়েও তিনি এক, লা-শরীক। রবুবীয়তের দিক

দিয়েও আল্লাহ এক, উলুহিয়াতের দিক দিয়েও তিনি এক। এর কোনো একটি দিক দিয়েও তাঁর শরীক কেউ নেই, জুড়ি কেউ নেই, সমতুল্য কেউ নেই।

শুধু এখানেই শেষ নয়। তিনি তাঁর যাত - মূল সত্তায় এক, অনন্য। তাঁর গুণাবলীতেও তিনি একক-শরীকহীন। মাখলুকাতের ওপর-অতএব মানুষের ওপর-হক বা অধিকার তাঁরই অপ্রতিদ্বন্দ্বী। এ হক - হকুকের দিক দিয়েও তাঁর শরীক কেউ নেই এবং ক্ষমতা ইখতিয়ারও একমাত্র তাঁরই রয়েছে, সৃষ্টির ওপর, এই মানুষের ওপর। আর এসব ক্ষেত্রেও তাঁর শরীক কেউ নেই, কিছু নেই। কাউকেই তাঁর শরীক হওয়ার মর্যাদা দেয়া যেতে পারেনা।

ইসলামের এই তওহীদী আকীদা কুরআন হতে প্রমাণিত; প্রমাণিত হাদীস থেকেও। রাসূলে করীম (স) সর্বশেষ নবী ও রাসূল হিসেবে এই আকীদা-ই পেশ করেছেন বিশ্ববাসীর সামনে। দাওয়াত দিয়েছেন মৌলিক আকীদা হিসেবে এ তওহীদকে গ্রহণ করার। যারাই সেদিন ইসলাম কবুল করেছিলেন, তাঁরা সকলে ইসলামের এ ধারণার প্রতি ঈমান এনেই হয়েছিলেন মুসলমান। অতএব রাসূলের সাহাবীরাও ছিলেন এই আকীদায় বিশ্বাসী। এই ব্যাপারে তাঁরা কখনো দুর্বলতা দেখাননি, এক্ষেত্রে কারো সাথে তাঁরা রাজি হননি কোনোরূপ আপোস বা সমঝোতা করতে। অতএব, এ-ই হচ্ছে সুন্নাতের তওহীদী আকীদা। আকীদার সুন্নাত এ-ই। কিন্তু ইসলামের এই সুন্নাতী আকীদায় কিংবা বলা যায়-আকীদার এই সুন্নাতে বর্তমানে দেখা দিয়েছে নানা শির্ক এর বিদয়াত। মুসলিম সমাজে

আল্লাহকে এক ও অনন্য বলে সাধারণভাবে স্বীকার করা হয় বটে। কিন্তু কার্যত দেখা যায়, আল্লাহ্ উলুহিয়াতী তওহীদের প্রতি যদিও বিশ্বাস রয়েছে; কিন্তু তাঁর রবুবিয়াতের তওহীদ স্বীকার করা হচ্ছেনা। মুখে স্বীকার করা হলেও কার্যত অস্বীকারই করা হচ্ছে। রব্ব হিসেবে মেনে নেয়া হচ্ছে আরো অনেক শক্তিকে; মুখে নয়-বাস্তব কাজের ক্ষেত্রে। আর এই হচ্ছে শির্ক। শব্দগত আকীদা হিসেবে যদিও আল্লাহকে-ই রিযিকদাতা, জীবনদাতা, মৃত্যুদাতা, সৃষ্টিকর্তা, প্রভাবশালী, কর্তৃত্ব সম্পন্ন, বিশ্ব ব্যবস্থাপক এবং রব্ব বলে স্বীকার করা হয়, কিন্তু এ শ্রেণীর লোকেরাই মৃত ‘বুয়ুর্গ’ লোকদের নিকট প্রার্থনা করে, আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদেরই ভয় করে চলে, তাদেরই নিকট হতে কোনো কিছু পেতে আশা পোষণ করে। বিপদে পড়লে তাদের নিকটই নিষ্কৃতি চায়, উন্নতি তাদের নিকট থেকেই চায় লাভ করতে। মনে করেঃ এর অলৌকিকভাবে মানুষের দোয়া শুনতে ও কবুল করতে পারে, সাহায্য করতে পারে, ফয়েজ করতে পারে। ভালো মন্দ করাতে ও ঘটাতে পারে। এই উদ্দেশ্যে তাদের সন্তোষ কামনা করে। আর তাদের সন্তোষ বিধানের জন্যেই তাদের উদ্দেশ্যে মানত করে, জন্তু জবাই করে, মরার পর তাঁদের কবরের উপর সিজদায় মাথা লুটিয়ে দেয়, নিজেদের ধন-সম্পদের একটা অংশ তাদের জন্য ব্যয় করা কর্তব্য মনে করে। আর এসব কারণেই দেখা যায়, এ শ্রেণীর লোকদের কবরকে নানাভাবে ইজ্জত ও তাজীম করা হচ্ছে, বহু অর্থ খরচ করে কবরের ওপর পাকা-পোখত কুর্বা নির্মাণ করা হচ্ছে। ধীরে ধীরে কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে

দেশ-দেশান্তর সফর করা হয়। এক নির্দিষ্ট দিনে ও সময়ে চারিদিক হতে ভক্তরা এসে জমায়েত হয়। ঠিক যেমন মুশরিক জাতিগুলো গমন করে তাদের জাতীয় তীর্থভূমে।

ইসলামের তওহীদী আকীদার দৃষ্টিতে আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো নিকট-আর কাউকে সম্বোধন করে দো‘আ করা সুস্পষ্ট শিরক। ইসলামে তা স্পষ্ট ভাষায় নিষিদ্ধ। কুরআন মজীদে এ সংক্রান্ত অসংখ্য আয়াত তার অকাট্য প্রমাণ। কুরআনের কোনো কোনো আয়াতে মুশরিকদের লক্ষ্য করে, কোনো কোনো আয়াতে সাধারণভাবে এবং অনেক আয়াতে তওহীদবাদী মুসলিমদের লক্ষ্য করেই এই নিষেধ বাণী উচ্চারিত হয়েছে। এ পর্যায়ে কুরআনের কয়েকটি আয়াত পেশ করা হচ্ছে। একটি আয়াতে বলা হয়েছেঃ

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنِ
[دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ] ৫:৬৬

আল্লাহকে বাদ দিয়ে(বা আল্লাহ ছাড়াও) যারা এমন সবকে ডাকে - দো‘আ করে, যারা তাদের জন্যে কিয়ামত পর্যন্তও জবাব দিতে পারবেনা আর তারা তাদের দো‘আ সম্পর্কে কিছুই জানেনা, এই শ্রেণীর লোকদের চেয়ে অধিক গোমরাহ আর কে হতে পারে। (আল আহকাফ)। অপর এক আয়াতের ভাষা হলো এইঃ

وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا [১৮:২৫]

সব মসজিদ-ই আল্লাহর। অতএব, আল্লাহ ছাড়া অপর কাউকেই ডাকবেনা। (সূরা জ্বীনঃ আয়াত নং - ১৭)

উপরোক্ত আয়াতটিতে স্বয়ং রাসূলে করীম ও মুসলমানদের সম্বোধন করা হয়েছে। এ আয়াতের তফসীরে আল্লামা ইবনে কাসীর লিখেছেনঃ আল্লাহ তাঁর বান্দাদের নির্দেশ দিচ্ছেন, তারা যেন তাঁর ইবাদাতের জন্য নির্দিষ্ট জায়গাগুলোতে একমাত্র তাঁকেই ডাকে, তাঁরই একত্বকে প্রতিষ্ঠিত রাখে এবং তাঁর সাথে অপর কাউকেই যেন ডাকা না হয়, তাঁর সাথে যেন কোনোরূপ শিরক করা না হয়। একটি আয়াতে খোদ নবী করীম (স) কে লক্ষ্য করে বলা হয়েছেঃ তুমি আল্লাহর সাথে অপর কোনো ইলাহ্ কে একত্র করে ডেকোনা- একত্রিত করোনা। যদি তা করে, তাহলে তুমি আযাবপ্রাপ্ত লোকদের মধ্যে গণ্য হবে। আয়াতে ‘তুমি’ বলে সম্বোধন করা হয়েছে স্বয়ং নবী করীম (স) কে। ‘তফসীরে ফতহুল বয়ান’ এ লেখা হয়েছেঃ আল্লাহতা‘আলা যখন কুরআনের সত্যতা প্রতিষ্ঠিত করলেন, প্রমাণ করে দিলেন যে, কুরআন তাঁর নিকট হতে অবতীর্ণ কিতাব, তখন তিনি তাঁর নবী মুহাম্মদ (স) কে নির্দেশ দিলেন এককভাবে কেবলমাত্র তাঁকেই ডাকবার, কেবল তাঁরই নিকট দো‘আ করার। আর আয়াতের শেষাংশের ব্যাখ্যা উক্ত তফসীরে লেখা হয়েছে এভাবে - রাসূলে করীমকে বলা হয়েছে যে, যদি তুমি তাই করো, তাহলে তোমাকে আযাব দেয়া হবে। এখানে মুহাম্মদ (স) কে সম্বোধন করে একথা বলা হয়েছে। তিনি নিজে যদিও শিরকের গুনাহ হতে সম্পূর্ণ নিষ্পাপ পবিত্র, তবুও তাঁকে লক্ষ্য করে একথা বলা হয়েছে তওহীদ সম্পর্কে মুমিন বান্দাগণকে উদ্বুদ্ধ করার ও সর্ব প্রকার শিরক - এর স্পর্শ হতে দূরে রাখার উদ্দেশ্যে। তাহলে

কথাটি এই দাঁড়াল যে, আল্লাহ বললেনঃ তুমি তো সৃষ্টিলোকের মধ্যে সর্বাধিক সম্মানিত, আমার নিকট সবচাইতে মর্যাদাবান, সবচেয়ে বেশি প্রিয়; কিন্তু এতদসত্ত্বেও তুমি যদি আমি ছাড়া অন্য কোনো ইলাহ আছে বলে বিশ্বাস করো, তাহলে আমি তোমাকেও আযাব দেবো। অতএব ভেবে দেখো, অন্যান্য বান্দারা এরূপ করলে তাদের পরিণতি কি হবে?

আল্লাহকে ছাড়া অন্য কাউকেই ডাকা শির্ক, অন্য কারো নিকট দো‘আ করা শির্ক - অতএব সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ, তা কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত কয়টি থেকেও প্রমাণিত হয়।

وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ ۚ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِنْ
[الظَّالِمِينَ ১০:১০]

আল্লাহকে বাদ দিয়ে এমন কাউকে ডাকবেনা, যা তোমাকে কোনো উপকার দিতে পারেনা, তোমার কোনো ক্ষতি সাধনও করতে পারেনা। তুমিও যদি তা-ই করো, তাহলে তুমিও জালিমদের মধ্যে গণ্য হবে। সূরা মুমিন এর এ আয়াতটি এ পর্যায়ে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। দো‘আ সম্পর্কে ইতিবাচকভাবে পথনির্দেশ করেছে এ আয়াত। আল্লাহতা‘আলাই ইরাশাদ করেছেনঃ

هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۚ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ
[الْعَالَمِينَ ১০:৬০]

তিনি চিরঞ্জীব, তিনি ছাড়া মাবুদ নেই। অতএব তোমরা ডাকো কেবল তাঁকেই একনিষ্ঠভাবে তাঁরই আনুগত্য সহকারে। আর সমস্ত প্রশংসাই আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট, যিনি সারাজাহানের রব্ব। আল্লাহকে

জীবন্ত ও চিরঞ্জীব বলার মানে-ই হলো এই যে, তিনি ছাড়া আর যত মা'বুদ-যাদের তোমরা মা'বুদ বলে স্বীকার করো, বাস্তবভাবে যাদের তোমরা বন্দেগী ও দাসত্ব করো-তারা সবাই আসলে মৃত। জীবনের কোনো সন্ধানই সেখানে পাওয়া যাবে না। আর যারা মৃত, জীবনহীন, তাদের ডাকার-তাদের নিকট কাতর স্বরে দো'আর প্রার্থনা করার কি সার্থকতা থাকতে পারে। কেননা মৃতদের না দো'আ শুনবার ক্ষমতা আছে, না শুনে তা কবুল করার ও দো'আ অনুযায়ী কোনো কাজ করে দেবার আছে সামর্থ্য।

জীবন্ত ও চিরঞ্জীবতো একমাত্র আল্লাহ; তাঁর কোনো লয়, ক্ষয় বা কোনোরূপ অক্ষমতা নেই। অতএব কেবলমাত্র তাঁকেই ডাকা উচিত, তাঁরই নিকট দো'আ ও প্রার্থনা করা বাধ্যনীয়-সব সময়, সকল অবস্থায়। এর ব্যতিক্রম কিছু হতে পারেনা। এ আয়াত থেকে আরো স্পষ্টভাবে জানা গেল যে, যিনি প্রকৃত ইলাহ, দো'আ কেবল তাঁরই নিকট করা যেতে পারে এবং যাঁর নিকট দো'আ করা হবে, ঐকান্তিক নিষ্ঠার সাথে বাস্তব আনুগত্য ও করতে হবে একমাত্র তাঁরই। আর দো'আ কবুল হওয়ার জন্য প্রয়োজন আল্লাহর জন্য সব তায়ীফ ও প্রশংসা উৎসর্গ করা। আন্তরিকভাবে আল্লাহর আনুগত্য বাস্তব জীবনে না করলে এবং মুখে অকৃত্রিমভাবে তাঁর প্রশংসা না করলে তাঁর নিকট দো'আর করার কোনো অর্থ হয়না। তুমি যাঁর আনুগত্য করে চলতে রাজি নও, যার প্রশংসা ও শোকর তোমার মুখে ধ্বনিত হয়না, তাঁর নিকট তোমার দো'আ করারও কোনো অধিকার থাকতে পারেনা। আর তিনিই বা সে দো'আ কবুল করবেন

কেন? তাই সুরা আল আরাফে সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন
আল্লাহতা'আলাঃ

الْمُعْتَدِينَ لِيُحِبُّ لِيِنَّهُ وَخُفْيَةً تَضُرُّكُمْ ادْعُوا ۚ الْعَالَمِينَ رَبُّ اللّٰهُ تَبَارَكَ
وَالْأَمْرُ الْخَلْقُ لَهُ أَلَا

সাবধান, মনে রেখ, সৃষ্টি তাঁরই, বিধানও তাঁরই চলবে। মহান বরকতওয়ালা আল্লাহতা'আলা যিনি সারা জাহানের রব্ব। তোমরা ডাকো তোমাদের এই রব্বকে কাঁদ কাঁদ স্বরে, চুপে চুপে। নিশ্চয়ই তিনি সীমালঙ্ঘনকারীদের ভালোবাসেন না। (সূরা আরাফঃ আয়াত নং - ৫৫)। এ আয়াত স্পষ্টভাবে আমাদের সামনে যে গভীর তত্ত্ব উদ্ঘাটিত করে, তা হলো এই সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ, অতএব দুনিয়া জাহানে আইন ও বিধান চলবে একমাত্র তাঁরই। এই সৃষ্টিকর্তা ও বিধানদাতা আল্লাহ বড় মহান, অসীম বরকতের মালিক। তোমাদের এই রব্বকেই তোমরা ডাকবে। ডাকবে কাঁদ কাঁদ স্বরে-বিনীত অবনত মস্তকে কাতর কণ্ঠে। এবং ডাকবে গোপনে, অনুচ্চ স্বরে। আর শেষ কথাটি বলা হচ্ছে যে, যে লোক আল্লাহকেই একমাত্র সৃষ্টিকর্তা বিধানদাতা বলে মানেনা, মানেনা বরকতওয়ালা মহান আল্লাহরূপে এবং তাঁরই নিকট যে লোক দো'আর করেনা, বিপদে আপদে একমাত্র তাঁকেই ডাকেনা, তারাই সীমালঙ্ঘনকারী। আর সীমালঙ্ঘনকারীরা আল্লাহর ভালোবাসা পায়না।

কোনো কোনো মহল মনে করে যে, কুরআনে এসব আয়াতে যে 'দো'আ' শব্দ উল্লিখিত হয়েছে, তার মানে হচ্ছে ইবাদত আর এ আয়াত কয়টির মানে হলোঃ আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত

করোনা, তা করা শিরক। অতএব আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নিকট দো‘আ করা নিষিদ্ধ নয়, শিরক-ও নয়। কিন্তু এ কথা যে কতখানি ভুল ও প্রকৃত সত্যের বিপরীত, তা বলাই বাহুল্য। আসল কথা হলো, কুরআন মজীদে এসব আয়াতে যে দো‘আ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে এর প্রকৃত অর্থঃ ধ্বনি দেয়া, আওয়াজ দেয়া এবং এমনভাবে কারো কাছে প্রার্থনা করা যার নিকট দো‘আ কবুল হতে বা প্রার্থিত জিনিস পাওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ বা সংশয় নেই। ইবাদত এ শব্দের প্রকৃত অর্থ নয়। তা হচ্ছে এর ‘মাজাজী’ বা পরোক্ষ অর্থ। আরবী অভিধানে বা শরীয়তে কোনো দিক দিয়েই এর অর্থ ‘ইবাদত’ নয়। আরবী ভাষার কোনো অভিধানেই এর অর্থ ইবাদত লেখা হয়নি। এমনকি জাহিলিয়াতের যুগের কোনো কবি-সাহিত্যিকের লেখায়ও এ শব্দের ব্যবহার এ অর্থে হতে দেখা যাবেনা। এখানে আমরা কয়েকটি আরবী প্রাচীণ ও প্রমাণিক অভিধান হতে কিছু উদ্ধৃতি করছি।

আল জাওহীরি তাঁর অভিধানে লিখেছেনঃ আমি অমুক ব্যক্তিকে ডেকেছি, মানেঃ তার নাম করে আওয়াজ দিয়েছি, তাকে আহবান জানিয়েছি। তার জন্যে আল্লাহর নিকট দো‘আ করেছি। আর তার উপর বদদো‘আ করেছি। দাওয়াত মানে একবার ডাকা। আর দো‘আ হলো এক বচন শব্দ। এর বহুবচন দাওয়াত বা দো‘আসমূহ। এখানে ‘দো‘আ’ শব্দের ভিন্ন রূপ ও প্রয়োগ দেখানো হয়েছে। সবক্ষেত্রেই অর্থ হলো প্রার্থনা, ডাকা, আহবান করা।

আর আলকেমিস এ বলা হয়েছে- দো‘আ মানে আল্লাহর দিকে নিষ্ঠাপূর্ণ আহবান, ঝোঁক প্রবণতা। তাঁকে ডাকো যেমন ডাকা দরকার। অপরের ওপর তাদের জন্য দাওয়াত অর্থাৎ দো‘আ তাদের থেকেই শুরু করা হবে। তাদের ডাকো, মানেঃ তাদের একত্রিত করো। নবী করীম (স) আল্লাহর (দিকে) আহবানকারী। মুয়াযযিনকেও আহবানকারী বলা হয়।

মোটকথা আরবী অভিধানের কোনো কিতাবেই দো‘আ মানে ইবাদত লিখিত হয়নি। অবশ্য আল্লামা ইবনুল হাজার বলেছেনঃ দো‘আ শব্দটি ইবাদত অর্থেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কিন্তু তা নিশ্চয়ই এ শব্দের প্রত্যক্ষ ও প্রকৃত অর্থ নয়, পরোক্ষ অর্থ হবে।

শায়খ আবুল কাশেম আল কুশাইরী লিখেছেনঃ কুরআনে দো‘আ শব্দটি কয়েকটি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যথাঃ ইবাদত, কাতর ফরিয়াদ, প্রার্থনা, কথা, আওয়াজ, ধ্বনি, প্রশংসা ইত্যাদি। এ প্রসঙ্গে আল্লামা তাকীউদ্দীন আসসুবকী লিখেছেনঃ তা সত্ত্বেও এ আয়াতে ‘দো‘আ’ শব্দের বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করাই উত্তম। কেননা দো‘আ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে যত আয়াতে তার কোথাও এমন কোনো কারণ দেখা যায়না, যার দরুণ শব্দটির আসল ও বাহ্যিক অর্থ গ্রহণের পরিবর্তে পরোক্ষ অর্থ গ্রহণ করা দরকারী হতে পারে। কুরআনের সব তাফসীরকারকই এই মত পোষণ করেছেন। কাজেই কুরআনের ব্যবহৃত ‘দো‘আ’ শব্দের ইবাদত অর্থ করা এবং এই সুযোগে আল্লাহ ছাড়া অন্য শক্তির নিকট দো‘আ করাকে জায়েয মনে করা চরম বাতুলতা এবং সুস্পষ্ট বিদয়াত ছাড়া আর কিছুই

নয়। কুরআনের আয়াতঃ - ওয়ালা তাদয়ু মিন দুনিয়াহী মালা ইয়ান ফায়ুকা ওয়ালা ইয়া দুররুকা ফায়ীন ফায়ালতা ফা ইল্লাকা ইজা লামিনাজ্জালিমীন। এ আয়াতের তাফসীরে ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী লিখেছেনঃ আয়াতের দো‘আ শব্দের অর্থ হলো উপকার পেতে চাওয়া, ক্ষতি থেকে বাঁচতে চাওয়া। আর আয়াতের অর্থ হলোঃ তুমি যদি আল্লাহ ছাড়া অপর কারো নিকট উপকার বা ক্ষতির জন্য প্রার্থনায় মনোনিবেশ করো, তাহলে তুমি জুলুমকারী হবে। কেননা জুলুম বলা হয় কোনো জিনিসকে তার আসল জায়গা ছাড়া অন্য জায়গায় স্থাপন করা। আর আল্লাহ ছাড়া যখন কারোই কোনো ক্ষমতা নেই, তখন কোনো প্রকার ক্ষমতা চালানাকে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো প্রতি অর্পণ করা অন্য কারো ক্ষমতা চালাবার শক্তি আছে বলে মনে করা নিঃসন্দেহে জুলুম।

আর এই ‘দো‘আ’ শব্দের প্রকৃত অর্থ ‘ইবাদত’ না হলেও দো‘আ ও এক প্রকারের ইবাদত। অতএব তা আল্লাহ ছাড়া আর কারোরই নিকট করা যেতে পারেনা। তাহলে আল্লাহ ছাড়া নানাভাবে নানা শক্তি ব্যক্তির নিকট যে দো‘আ করা হয়, বিপদ মুক্তি ও দুনিয়ার উন্নতির জন্য প্রার্থনা করা হয়, নিরাময়তা চাওয়া হয়, সেগুলো কি হবে? সেগুলো যে সুস্পষ্ট শিরক হবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এবং এ শিরক হচ্ছে ইসলামের তওহীদী সুন্নাতের এক মহা বিদয়াত। কেননা একজন যে অপরজনকে ডাকে, অপর একজনের নিকট দো‘আ করে এমন এক কাজের জন্যে, যা করার ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কারোই নেই-থাকতে পারেনা। এভাবে ডাকার

মানেই এই যে, সে তাকে অলৌকিক ক্ষমতার মালিক মনে করে, বিশ্বাস করে তার কিছু একটা করার ক্ষমতা আছে। তা মনে না করলে সে কিছুতেই তাকে ডাকত না, তার নিকট দো'আর করতো না। ফলে তার মনে তার নিকট কেবল দো'আ করেই ক্ষান্ত হয়না; শান্ত হয়না, বরং তার ইবাদত করতেও আগ্রহান্বিত হয়ে পড়ে। আর এরূপ হচ্ছে সুস্পষ্ট শিরক। কুরআনের স্পষ্ট ঘোষণা হলোঃ

وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ۚ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ [১৭:৬]

- কোনো দুঃখ বা বিপদ যদি তোমাকে গ্রাস করে থাকে তা(আল্লাহর মর্জিতেই হয়েছে বলে মনে করতে হবে এবং তা)দূর করার কেউ নেই একমাত্র আল্লাহ ছাড়া। এমনিভাবে তুমি যদি কল্যাণ লাভ করে থাকো তবে তিনিই তো সর্বশক্তিমান। (আল আনআমঃ ১৫)

অর্থাৎ এ কল্যাণ দান করার ক্ষমতাও তাঁরই রয়েছে এবং তাঁরই অনুগ্রহে তুমি এ কল্যাণ লাভ করেছো। তিনি ছাড়া এ কল্যাণ তোমাকে আর কেউই দিতে পারেনি। কেননা অন্য কারোই কিছু করার ক্ষমতা নেই, সামর্থ্য নেই। অপর আয়াতে বলা হয়েছেঃ

وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ۚ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ ۚ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ [১০:১০]

আল্লাহ যদি তোমাকে কোনো ক্ষতি বা বিপদ দেন, তবে তা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ-ই দূর করতে পারবেনা। আর তিনিই যদি তোমার প্রতি কোনো কল্যাণ দান করতে ইচ্ছে করেন, তাহলে তাঁর এই কল্যাণ দানকে প্রত্যাহার করতে পারে এমন কেউ নেই। তবে তাঁর

বান্দাদের মধ্যে যাকে চান কল্যাণ দেন, তিনিই ক্ষমা দানকারী, করুণাময়। (সূরা ইউনুসঃ আয়াত নং - ১০৭)

এ আয়াত দুটো-এমনিভাবে কুরআনের আরো ভুরি ভুরি আয়াত এবং রাসূলে করীম (স) এর হাদীস স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছে যে, আল্লাহ ছাড়া কেউ বিপদ দিতে পারেনা, কেউ সে বিপদ দূরও করতে সক্ষম নয় আল্লাহ ছাড়া। অনুরূপভাবে আল্লাহ ছাড়া কেউ কল্যাণ করতে পারেনা কারো। তিনি কারো কল্যাণ করতে চাইলে তা ফেরাতেও এবং সেই কল্যাণ হতে তাকে বঞ্চিত রাখতেও পারেনা কেউই। সব শক্তির একচ্ছত্র মালিকতো তিনিই। অতএব দো‘আ একমাত্র আল্লাহর নিকটই করা কর্তব্য। কর্তব্য সব রকমের বিপদ হতে উদ্ধার পাওয়ার জন্য দো‘আ করা, কর্তব্য সব ধরনের কল্যাণ লাভের জন্য দো‘আ করা এবং সেই দো‘আ হবে সরাসরি আল্লাহর নিকট, অন্য কারো অসীলা দিয়ে বা দোহাই দিয়ে নয়, অন্য কারো মাধ্যমেও নয়। তওহীদ বিশ্বাসের ঐকান্তিক দাবিও হলো এই। কেননা আল্লাহ ছাড়া অপর কারো নিকট দো‘আ করার কোনো ফল নেই, নেই কোনো সার্থকতা। আল্লাহতা‘আলা এই পর্যায়ে আরো স্পষ্ট ও বলিষ্ঠ ভাষায় ঘোষণা করেছেনঃ

[وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ ۝ ১৩:৩০]

[إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ ۝ ১৬:৩০]

আল্লাহকে বাদ দিয়ে তোমরা আর যার নিকটই দো‘আ করো, তাদের কেউ একবিন্দু জিনিসের মালিক নয়। তা সত্ত্বেও যদি তোমরা তাদেরই ডাকো- তাদের নিকটই দো‘আ করো, তবে তারা

তো তোমাদের ডাকও শুনতে পারেনা। (সূরা আল ফাতীরঃ আয়াত
নং - ১৩-১৪)

তোমাদের দো‘আ আর যদি শুনতে পায়ও, তবু এ কথা চূড়ান্ত যে,
তারা না দিবে তোমাদের ডাকের জবাব, না পারবে কবুল করতে
তোমাদের দো‘আ।

বস্তুতঃ দো‘আ যে কেবলমাত্র আল্লাহর নিকটই করতে হবে
খালেসভাবে অপর কারো দোহাই দিয়ে নয়, কাউকে তাঁর নিকট
অসীলা বানিয়ে নয়, একথা কুরআন মজীদে উদ্ধৃত অসংখ্য দো‘আ
থেকেও আমাদের শেখানো হয়েছে।

কুরআনে উল্লেখীত যে কোনো দো‘আ-ই তার দলীল হিসেবে পেশ
করা যেতে পারে। এখানে দৃষ্টান্তস্বরূপ কুরআনের বিশেষ কয়েকটি
দো‘আ উদ্ধৃত করা হচ্ছে। কুরআনের প্রথম সূরা আল ফাতিহায়
উদ্ধৃত হয়েছে এই দো‘আঃ

[اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ] ১:৬

হে আল্লাহ তুমিই আমাদের সরল সঠিক দৃঢ় পথ দেখাও-পরিচালিত
করো সে পথে। এরূপ দো‘আ করতে শেখানো হয়নিঃ হে আল্লাহ!
অমুক পীরের অসীলায় আমাদের সরল সঠিক সুদৃঢ় পথ দেখাও।

সূরা আল বাকারার শেষ আয়াত কয়টিও আল্লাহর শিখিয়ে দেয়া
দো‘আ। তাতে কোনো একটি কথা সরাসরিভাবে আল্লাহ ছাড়া অন্য
কারো নিকট কিংবা কারো অসীলা ধরে আল্লাহর নিকট দো‘আ
করার শিক্ষা দেয়া হয়নি। এই পর্যায়ে হযরত ইবরাহীম (আ) এর

দো‘আ ও উল্লেখযোগ্য। কাবা ঘর নির্মাণের সময় তিনি এবং হযরত ঈসমাইল (আ) দো‘আ করেছিলেনঃ

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ۖ إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ [১৭:২]
 رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ
 عَلَيْنَا ۖ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ [১৮:২]

হে আল্লাহ! তুমি আমাদের দো‘আ কবুল করো। তুমি সব-ই শোনো, সব-ই জানো। হে আমাদের আল্লাহ তুমি আমাদের দুজনকে মুসলিম - তোমার অনুগত বানাও। আর আমাদের বংশধরদের মধ্য থেকে এমন এক উম্মত জাগ্রত করো, যা হবে তোমার অনুগত। হে আল্লাহ, তুমি আমাদের যাবতীয় ইবাদত বন্দেগীর-হজ্জ ও কুরবানীর নিয়ম-নীতি জানিয়ে দাও, আমাদের তওবা কবুল করো। কেননা তুমি তওবা কবুলকারী।

বস্তুত বান্দার মনে দুঃখ ও ব্যথা বেদনার কথা কেবল আল্লাহর নিকটই বলা যেতে পারে, বলতে হবে কেবলমাত্র তাঁরই সমীপে। কেননা সে দুঃখ বেদনার সৃষ্টিও যেমন হয়েছে আল্লাহর মঞ্জুরীতে, তা দূর করার ক্ষমতাও একমাত্র তাঁরই রয়েছে। হযরত ইয়াকুব (আ) পুত্রহারা হয়ে তাঁর মর্মবেদনা পেশ করেছিলেন দুনিয়ার অপর কারো নিকট নয়, নয় কোনো পীর বা গদীনশীনের নিকট; বলেছিলেন কেবলমাত্র আল্লাহর নিকট। তাঁর তখনকার কথা উদ্ধৃত হয়েছে কুরআন মজীদে এ ভাষায়ঃ - আমি আমার দুঃখ-বেদনা এবং চিন্তা-ভাবনার কথা কেবল আল্লাহর নিকটই প্রকাশ করছি, পেশ করছি। হযরত মূসা (আ) এর দো‘আ ছিল নিম্নোক্ত ভাষায়ঃ - হে

আল্লাহ! তোমার জন্যেই সব প্রশংসা, সব অভিযোগ তোমারই নিকট, কেবল তোমার নিকটই সাহায্য প্রার্থনা, কেবল তোমার নিকটই ফরিয়াদ। কেবল তোমার উপরই ভরসা। কেননা কোনো কিছু করার সামর্থ্য এবং ক্ষমতা ও শক্তি তুমি ছাড়া আর কারো নিকটই নাই।

আল্লাহ নিজেই হযরত জাকারিয়া এবং তাঁর স্ত্রীর প্রশংসা করে ইরশাদ করেছেনঃ- তারা ছিল সব কল্যাণময় কাজে উৎসাহী, প্রতিযোগী ও তৎপর। তারা কেবল আমাকে ডাকত-আমারই নিকট দো‘আ করতো আগ্রহ উৎসাহ এবং ভয় আতংক সহকারে। আসলে তারা সব সময় আমার জন্যেই ভীত হয়ে থাকত। স্বয়ং আখেরী নবী হযরত মুহাম্মদ (স) - এর নীতিও ছিল তাই। কোনো ব্যতিক্রম ছিলনা এ থেকে। বদরের যুদ্ধে তাঁর সঙ্গী সাথীদের সংখ্যালঘুতা দেখে তিনি আল্লাহর দিকে মুখ করে দু’হাত তুলে দো‘আ করেছিলেনঃ - হে আল্লাহ! তুমি আমার কাছে যে ওয়াদা করেছ তা আজ পূর্ণ করো। হে আল্লাহ! ইসলামের ধারক এ মুষ্টিমেয় বাহিনীকে যদি তুমি ধ্বংস করে দাও তাহলে যে দুনিয়ায় তোমার বন্দেগী করা হবেনা। এর-ই পর আল্লাহর আয়াত নাযিল হলোঃ

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِآلِفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ
[مُرْدِفِينَ] ٩:٨

তোমরা যখন তোমাদের আল্লাহর নিকট-ই ফরিয়াদ করলে, তখন তিনি তোমাদের জবাব দিলেন, তোমাদের দো‘আ ও ফরিয়াদ কবুল করে নিলেন। এবং বলেছিলেন, হ্যাঁ, আমি তোমাদের পর পর এক

হাজার ফেরেশতা পাঠিয়ে সাহায্য করবো। (সূরা আনফালঃ আয়াত নং - ৯)

এ আয়াত থেকে এ কথাও প্রমাণিত হয় যে, ফরিয়াদ যদি একান্তভাবে আল্লাহর নিকট করা হয়, কোনো মাধ্যম, অসীলা আর ওয়াস্তা ছাড়াই, তাহলেই তিনি দো‘আ কবুল করেন, অন্যথায় তাঁর কোনো ঠেকা নেই কারো দো‘আ কবুল করার। কেউ তাঁকে সেজন্য বাধ্যও করতে পারেনা। দো‘আ কার কাছে করতে হবে সে কথা অধিক স্পষ্ট করে তোলবার জন্য নবী করীম(স) ঘোষণা করেছেনঃ তোমাদের প্রত্যেকেই যেন নিজের যাবতীয় প্রয়োজন কেবল আল্লাহর নিকট চায়। এমনকি কারো জুতার ফিতাও যদি ছিঁড়ে যায়, তবুও তাঁর নিকটই চাইবে। তিনি যদি না-ই দেন, তবে তা কেউ-ই দিতে পারবেনা।

আল্লাহর শিক্ষা ও রাসূলের শিক্ষাও এই যে, ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত বিপদের কালে ফরিয়াদ করতে হবে একমাত্র আল্লাহর নিকট এবং তাতে অন্য কাউকে অসীলা ধরা কিংবা কারো দোহাই দেয়ার এই শিক্ষা-ইসলামের এই সুন্নাতের সম্পূর্ণ বিপরীত। নবী-রাসূলগণই যদি নিজেদের সব ব্যাপারে কেবলমাত্র আল্লাহরই নিকট ফরিয়াদ করে থাকেন এবং এ ব্যাপারে আর কারো নিকট কোনো ইন্তেমদাদ (সাহায্য প্রার্থনা) না করে থাকেন, তাহলে আমরা সাধারণ মুসলমানরাই বা কেনো অন্য কারো প্রতি মুখাপেক্ষী হবো, নির্ভরশীল হবো, কেন অন্য কাউকে অসীলা ধরবো? অথচ এই নবী-রাসূলগণই তো আমাদের চিরন্তন আদর্শ। তাঁদের কাজও যেমন আমাদের কাছে

অনুসরণীয় তেমনি অনুসরণীয় তাঁদের কর্মনীতি ও কর্মপদ্ধতিও। বিশেষত আল্লাহ এসব দো‘আ শিক্ষা দিয়ে আমাদেরকেও অনুরূপ আল্লাহ মুখী হতে, কেবলমাত্র আল্লাহর নিকটই দো‘আ করতে নির্দেশ দিয়েছেন।

অবশ্য এ কথা অস্বীকার করা যাচ্ছেনা যে, নবী করীমের (স) জীবদ্দশায় তাঁকে অসীলা বানিয়ে বিপদ থেকে উদ্ধার পাবার জন্যে আল্লাহর কাছে দো‘আ করেছেন তদানীন্তন মুসলমানেরা। হাদীসে তার সুস্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু তা হলো রাসূলের জীবদ্দশায়, রাসূল নিজে একজন প্রার্থনাকারী হিসেবে লোকদের মাঝে উপস্থিত থাকা অবস্থায়। আর তা থেকে অতটুকুই প্রমাণিত হয়, রাসূলের জীবদ্দশায় তাঁকে অসীলা বানিয়ে দো‘আ করা জায়েয ছিল। কিন্তু রাসূলে করীমের ইতিকালের পর আর কোনো দিন সাহাবায়ে কিরাম তাঁকে দো‘আ প্রার্থনায় অসীলা বানাননি। ‘অসীলা’ বানানো হয়নি এমন কোনো ব্যক্তিকে যে মরে গেছে এবং যে নিজে দো‘আর অনুষ্ঠানে শরীক নেই। এ পর্যায়ে কুরআন মজীদে আরো দু’টি আয়াত বিবেচ্য। সূরা সেজদায় আল্লাহ নেক বান্দাদের পরিচয় দান প্রসঙ্গে বলেছেনঃ

تَتَجَاوَى جُنُوبَهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ
[يُنْفِقُونَ] ১৬:৩২

তাদের পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশ সুখশয্যা হতে বিচ্ছিন্ন হয়েই থাকে, তারা (তাদের আল্লাহর প্রতি) ভয় ও আশা পোষণ করেই ডাকতে থাকে তাদের আল্লাহকে। তদুপরি আমি তাদের যা দান করেছি তা থেকে

(আমার পথে) ব্যয় করে। এ আয়াতে ‘ইয়াদযুদা রাব্বাহুম খাওফান ওয়া তামআন’ বাক্যাংশ বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। এখানে স্পষ্ট বলা হয়েছে যে, আল্লাহর আয়াতের প্রতি প্রকৃত যারা ঈমানদার তারা ভয় পায় কেবলমাত্র আল্লাহকে, আশা পোষণ করে একমাত্র আল্লাহর প্রতিই, যিনি তাদের রব্ব। বিপরীত অর্থে তারা আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয়ও করেনা, কারো প্রতি কিছু আশাও পোষণ করেনা। আর ভয়ের কারণ হলেও তাঁরা ডাকে কেবল আল্লাহকে, আল্লাহর-ই নিকট দো‘আ প্রার্থনা করে, আল্লাহ ছাড়া আর কারো নিকটই প্রার্থনা করেনা। অনুরূপভাবে কোনো কিছু পাওয়ার আশাও করে কেবলমাত্র আল্লাহর নিকট থেকে, সে জন্যেও দো‘আ করে তাঁরই নিকট। আল্লাহর নিকট ছাড়া আর কারো নিকট হতে কিছুই পাওয়ার আশা করেনা তারা এবং কোনো কিছু পাওয়ার প্রয়োজন হলে একমাত্র আল্লাহর নিকটই সেজন্য দো‘আ করে, প্রার্থনা করে। তাছাড়া প্রথমাংশে বলা হয়েছে নামায পড়ার কথা, শেষাংশে বলা হয়েছে দো‘আ করার কথা। ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী লিখেছেনঃ দো‘আ ও নামায প্রকৃত অর্থের দিক দিয়ে একই জিনিস।

অর্থাৎ নামায যেমন আল্লাহ ছাড়া আর কারো জন্যে, কারো উদ্দেশ্যে পড়া হয়না, দো‘আ ও তেমনি আল্লাহ ছাড়া আর কারো নিকট করা যায়না। আর একটি আয়াত হলোঃ - যে লোক আল্লাহর অনুগত-আল্লাহর-ই হুকুম পালনকারী, রাতের বেলা আল্লাহকে সেজদা করে, পরকালকে ভয় করে এবং কেবলমাত্র আল্লাহর রহমতেরই আশা করে, তার পরিণতি কি মুশরিক ব্যক্তিদের মতো হতে পারে?

তার মানে এসব গুণ যার আছে সে মুশরিক নয়, সে তওহীদবাদী। আর যার এসব গুণ নেই, নেই এর কোনো একটি গুণও, সে-ই মুশরিক হয়ে যাবে প্রকৃত ব্যাপারের দিক দিয়ে। যেমন কেউ যদি আল্লাহর অনুগত না হয়ে অনুগত হয় আল্লাহর সৃষ্ট কোনো শক্তির-যে লোক পরকালকে ভয় করেনা কিংবা যে লোক তার আল্লাহর রহমতের আশা করেনা বা আল্লাহর পরিবর্তে অন্য কারো রহমত ও অনুগ্রহ দৃষ্টি লাভের আশা পোষণ করে-কুরআনের এ আয়াতের ঘোষণা অনুযায়ী সে-ই মুশরিক হবে। অতএব আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা কুরআনের দৃষ্টিতে কিছুতেই জায়েয হতে পারেনা।

এ আলোচনার শেষ পর্যায়ে শায়খ আবদুল কাদের জিলানী (রহ) এর দু-তিনটি কথা এখানে প্রমাণ হিসেবে উদ্ধৃত করা জরুরী মনে করছি। তিনি তাঁর গ্রন্থ..... এর শুরুতেই লিখেছেনঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর-ই জন্য, যাঁর প্রশংসা সহকারে সব কিতাবই শুরু করা হয় এবং যাঁর জিকির করে সব কথা শুরু করতে হয়। তাঁরই প্রশংসার দৌলতে জান্নাতী লোকেরা জান্নাত পাবে, তিনিই এমন সত্তা যে তাঁর নাম উচ্চারণ করলে সব রোগ নিরাময় হয়, তাঁরই নামে সব চিন্তা দুঃখ ও বিপদ দূর হয়ে যায়। সুখ-দুঃখ, আনন্দ-নিরানন্দকালে তাঁরই দরবারে কাতর কণ্ঠে কাঁদ কাঁদ স্বরে দো‘আ করা হয়। তাঁর জাত-ই এমন যে, নানা বুলি ও নানা ভাষা হওয়া সত্ত্বেও সমস্ত দো‘আ প্রার্থনাকারীর ডাক তিনি শুনে, বিপদগ্রস্ত কাতর মানুষের দো‘আ তিনিই কবুল করেন। তিনি তাঁর গ্রন্থ ‘ফাতাউল গায়েব’ এ

লিখেছেনঃ আমাদের কান্না-কাটা, আমাদের দো‘আ এবং সব অবস্থায় আমাদের রুজু হতে হবে একমাত্র আল্লাহর-ই নিকট, যিনি আমাদের পরোয়ারদিগার, আমাদের সৃষ্টিকর্তা, আমাদের রিযিকদাতা। তিনি খাওয়ান, তিনিই পান করান, তিনিই উপকার দেন, তিনিই মুহাফিজ, তিনিই নিগাহবান। আমাদের জীবন তাঁরই হাতে।

“অতএব তোমার প্রার্থনা হবে এবং নিজের প্রয়োজন পূরণের জন্য ডাকবে একমাত্র আল্লাহকেই, আল্লাহরই নিকটে, তিনি একাই তোমার দাতা, তিনি-ই তোমার লক্ষ্য হবেন।”

“যে লোক নিজেরই মতো কোনো মাখলুকের ওপর ভরসা করে, সে অভিশপ্ত।” শায়খ জিলানী মৃত্যুশয্যায় শায়িত অবস্থায় তাঁর পুত্র আবদুল ওহাব তাঁকে বললেনঃ “আমাকে এমন কিছু অসীয়াত করুন, আপনার পরে যা অনুসরণ করে আমি চলবো, আমল করবো”।

তখন তিনি বললেনঃ আল্লাহকে ভয় করে চলাই তোমাদের কর্তব্য; আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ভয় করবেনা, আল্লাহ ছাড়া আর কারো নিকট কিছু চাইবেনা-কারো কাছ থেকে কিছু পাওয়ার আশা করবেনা। সব প্রয়োজনকেই এক আল্লাহর ওপরই সোপর্দ করে দেবে। সেই এক আল্লাহ ছাড়া আর কারো নিকট কিছুমাত্র ভরসা করবেনা, নির্ভরতা গ্রহণ করবেনা। সব কিছু কেবল তাঁরই নিকট হতে পেতে চাইবে। আল্লাহ ছাড়া কারো প্রতি আস্থা স্থাপন করবেনা। তওহীদকেই ধারণ করবে, তওহীদকেই ধারণ করবে, তওহীদকেই ধারণ করবে। সকলেই এই ব্যাপারে সম্পূর্ণ একমত।

এ পর্যায়ে শেষ কথা এই যে, দো‘আ কবুলকারী যদি কেবলমাত্র আল্লাহ তা‘আলা ই হয়ে থাকেন, আর তিনি-ই যদি সরাসরি তাঁরই নিকট দো‘আ করতে বলে থাকেন, তাহলে অন্য কারো নিকট দো‘আ করা, দো‘আয় অন্য কাউকে অসীলা বানানো আল্লাহর ওপর খোদকারী ছাড়া আর কিছু নয়। যারা তা করতে বলে তারা শুধু বিদয়াতী-ই নয়, তারা সুস্পষ্টরূপে শিরক- এ লিগু-শিরক প্রচারকারী তারা। ইসলামের তওহীদি আকীদায় শিরক-এর আমদানি করে।

বস্তুত ইসলামের ঐকান্তিক দাবি হলো, আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে মা‘বুদ ও (অলৌকিকভাবে) প্রয়োজন পূরণকারী বলে মেনে নিতে সুস্পষ্ট ভাষায় অস্বীকার করবে এবং কোনোরূপ শরীকদারী ছাড়াই একমাত্র আল্লাহ তা‘আলারই অনন্য মা‘বুদ হওয়ার দৃঢ় প্রত্যয় গ্রহণ করবে। এই হচ্ছে প্রকৃত তওহীদী আকীদা এবং কালেমায়ে তাইয়েবার প্রথম অংশ ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্’ এর তাৎপর্য। অতঃপর হযরত মুহাম্মদ (স) কে আল্লাহ তা‘আলার রাসূল মানবে। অর্থাৎ জীবন যাপনে আল্লাহ তা‘আলার সন্তুষ্টি, তা জানবার সর্বশেষ একমাত্র ব্যক্তি হচ্ছে হযরত মুহাম্মদ (স)। তাই জীবন যাপনের অপরাপর নিয়ম ও পদ্ধতিকে-যা হযরত মুহাম্মদ (স) কর্তৃক প্রচারিত নয় তা-ও মেনে নিতে অস্বীকার করতে হবে। কালেমার দ্বিতীয় অংশের এই হচ্ছে তাৎপর্য।

পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণও তাঁদের উম্মতদের এই শিক্ষাই দিয়েছেন। কিন্তু এ কথা নিঃসন্দেহ যে উত্তরকালে তারা গোমরাহ হয়ে শিরকে নিমজ্জিত হয়েছে। এই পর্যায়ে হযরত মুহাম্মদ (স) কালেমার এই

উভয় পর্যায়ে বৈপরীত্য শিরক ও বিদয়াতের গোমরাহীতে নিমজ্জিত হওয়ার ব্যাপারে খুব বেশি সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন। কেননা তার কোনো একটি দিক দিয়েও শিরকে নিমজ্জিত হলে নিঃসন্দেহে জাহান্নামে যেতে হবে^{১৮}।

ছেচল্লিশতম পরিচ্ছেদ - কদমবুসির বিদয়াত

বর্তমানকালের পীর ও আলিমদের দরবারে কদমবুসির বড় ছড়াছড়ি দেখা যায়। মুরীদ হলেই পীরের কদমবুসি করতে হয়, মাদ্রাসার ছাত্র হলেই ওস্তাদ ছয়ুরের কদমবুসি করতে বাধ্য। তা না করলে না মুরীদ ফায়েজ পেতে পারে পীরের, না ছাত্র ওস্তাদের কাছ হতে লাভ করতে পারে ইলম। বরং উভয় দরবারেই সে বেয়াদব বলে দোষী সাব্যস্ত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গেই ‘বড় কুরআনের (?) দলীল পেশ করে বলা হয়ঃ বেয়াদব লোক আল্লাহর অনুগ্রহ হতে বঞ্চিত হয়ে যায়। কদমবুসি করলে আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত হয় কিনা- তা আল্লাহই জানেন। কিন্তু এ ধরনের মুরীদ আর ছাত্র যে পীর ও ওস্তাদের স্নেহ দৃষ্টি থেকে মাহরুম হয়ে যায় তা বাস্তব সত্য। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, এই কদমবুসি করা কি সত্যই শরীয়ত মোতাবিক কাজ? এ জিনিস মুসলিম সমাজে কোথেকে এসে প্রবেশ করলো? এর ফলাফলই বা কি?

সাহাবায়ে কিরামের সামনে নবী করীম (স) এর যে সম্মান ও মর্যাদা এবং নবী করীম (স) কে সাহাবায়ে কিরাম যতদূর ভক্তি শ্রদ্ধা করতেন, তার তুলনা অন্য কোথাও হতে পারেনা এবং সেই রকম

^{১৮} সুন্নাহ ও বিদয়াত - মাওলানা আব্দুর রহীম (রহঃ), পৃষ্ঠা নং - ৭৪, খায়রুন প্রকাশনী, ঢাকা

সম্মান শ্রদ্ধা অন্য কাউকেই কেউ দিতে পারেনা। কিন্তু সেই সাহাবীগণ বাহ্যত নবী করীমের প্রতি কিরূপ সম্মান দেখাতেন? এ পর্যায়ে হাদীসে শুধু এতটুকুরই উল্লেখ পাওয়া যায় যে, সাহাবীদের কেউ কেউ নবী করীমের হাতে ও কপালে হালকা ভাবে চুমু দিয়েছেন। এই চুমু'য় ভক্তির চাইতে ভালোবাসাই প্রকাশ পেতো সমধিক। তাঁদের কেউ কোনোদিন রাসূলে করীমের পা হাত দিয়ে স্পর্শ করে সে হাত দ্বারা মুখমন্ডল মুছে দেয়ার যে কদমবুসি, তা করেছেন বলে কোনো উল্লেখযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যাবেনা হাদীসের বা জীবন চরিতের কিতাবে।

এ পর্যায়ে হাদীসে শুধু এতটুকুরই উল্লেখ পাওয়া যায় যে, কোনো কোনো সাহাবী ভালোবাসার আতিশয্যে কখনো কখনো নবী করীম (স) এর হাত পা চুম্বন করেছেন। কিন্তু নির্বিশেষে সব সাহাবীর মধ্যে এ জিনিসের কোনো প্রচলন ছিলনা। তাবীয়ীন ও তাবো-তাবীয়ীন এর যুগেও মুসলিম সমাজে এর কোনো রেওয়াজ দেখা যায়নি। এ কদমবুসির কোনো নাম নিশানাই পাওয়া যায়না ইসলামের এ সোনালী যুগের ইতিহাসে। তাহলে এ কাজটি যে ইজমা ও মুতাওয়াতির ঐতিহ্যের সম্পূর্ণ বিপরীত তা অনস্বীকার্য।

তা ছাড়া ইসলামী শরীয়তের একটি মূলনীতি হলো, কোনো মুবাহ বা সুন্নাত মোতাবিক কাজও যদি আকীদা বা আমলের ক্ষেত্রে খারাবী পয়দার কারণ হয়ে পড়ে, তাহলে তা করার পরিবর্তে বরং না করাই ওয়াজিব। এ কারণেই হযরত ওমর ফারুক (রা) সে গাছটি কেটে ফেলেছিলেন, যার পাদদেশে বসে নবী করীম (স) ঐতিহাসিক

‘বায়’আতে রেজওয়ান’গ্রহণ করেছিলেন। কেননা তাঁর সময়কার লোকেরা এ গাছের নিকট সমবেত হওয়াকে সুন্নাতী কাজ বলে মনে করতো এবং তার নিকট রীতিমত হাজিরা দেওয়াকে একান্ত জরুরী ও সওয়াবের কাজ বলে মনে করতে শুরু করেছিল। অথচ এ জামানা ছিল ইসলামের উজ্জ্বলতম যুগ। এ জন্যে ইলমে ফিকহর মূলনীতি দাঁড়িয়েছেঃ যে মুবাহ কাজ ওয়াজিবের পর্যায়ে পৌঁছে যায়, তা করা মাকরুহ। তা ছাড়া কদমবুসি করার সময় মানুষ ঠিক সে অবস্থায় পৌঁছে যায়, যে অবস্থায় পৌঁছে নামাযের রুকু ও সেজদার সময়ে, আর ইচ্ছে করে কারো জন্যে এরূপ করা সম্পূর্ণ নাজায়েয। কাযী ইয়াজ লিখেছেনঃ (আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে) সেজদা করা যেমন নিষিদ্ধ, তেমনি রুকুর ধরনে কারো সামনে মাথা নত করাও নিষিদ্ধ। আল মুজাদ্দিদে আল ফেসানী (রহ) লিখেছেনঃ কারো সামনে মাথা নত করা কুফরীর কাছাকাছি।

আর ফিকাহবিদদের মত হলোঃ রাজা বাদশাহ বা অন্য কারো জন্যে মাথা নোয়ানো মাকরুহ। আর মাকরুহ মানে মাকরুহ তাহরীম।

এ সব কথা থেকে অকাট্যভাবে প্রমাণিত হলো যে, পীর, ওস্তাদ বা অন্য কোনো মুরুন্সী - তিনি যেই হোননা কেন, তার যে কদমবুসি করতে হবে ইসলামী শরীয়তে তার কোনো নিয়ম নেই। আর এ কাজ রাসূলে করীমের সুন্নাতের সম্পূর্ণ পরিপন্থী-অতি বড় বিদয়াত। কদমবুসি সম্পর্কে আর একটি কথা হলো, এর রেওয়াজ কেবল পাক ভারতের আলিম ও পীরের দরবারেই দেখা যায়। অন্যান্য মুসলিম সমাজে এর নাম নিশানাও নেই। এ কারণে এ কথা

সহজেই মনে করা যেতে পারে যে, কদমবুসির এ কাজটি এতদেশীয় হিন্দু সমাজ থেকে মুসলিম সমাজে এসে তা মুসলমানী রূপ পরিগ্রহ করেছে। মুসলিম সমাজের বর্তমান কদমবুসি ছিল আসলে 'ব্রাহ্মণের পদপ্রান্তে প্রণিপাত। এখনো তা দেখা যায় এখানে সেখানে। যজমান ব্রাহ্মণের সামনে আসলেই ব্রাহ্মণ তার বাঁ পায়ে বড়ো অঙ্গুলী উঁচু করে ধরবে, আর যজমান তার কপাল সে অঙ্গুলির অগ্রভাগে স্থাপন করবে। অতঃপর যখন ইচ্ছা ব্রাহ্মণ তার পা টেনে নেবে। ব্রাহ্মণ্য ধর্মে এ রীতি আদিম। কেননা ব্রাহ্মণ্য ধর্ম দর্শনে ব্রাহ্মণরাই মানুষ আর অন্যান্যরা ব্রাহ্মণের দাসানুদাস। অতএব ব্রাহ্মণের পদপ্রান্তে প্রণিপাত করাই তাদের কর্তব্য।

পরবর্তীকালে এ দেশের হিন্দুরা মুসলমান হয়ে এ হিন্দুয়ানী ব্রাহ্মণ্য প্রথাকেই - এ 'পদপ্রান্তে প্রণিপাতকে'ই 'মুসলমান' বানিয়ে কদমবুসিতে পরিণত করে দিয়েছে। এক কথায় সম্পূর্ণ হিন্দুয়ানী ব্রাহ্মণ্য প্রথাকে মুসলিম সমাজে-বিশেষ করে পীর সাহেবান ও আলিম ওস্তাদ সাহেবানের দরবারে বড় সওয়াবের কাজ হিসেবে চালু করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এর কুফল, যা মুসলিম সমাজে প্রতিফলিত হয়েছে, তওহীদের দৃষ্টিতে তা খুবই ভয়াবহ। পীর মুরীদী আর ওস্তাদ শাগরিদীর পরিবেশে এ কদমবুসি রীতিমত শিরকী ভাবধারা বিস্তার করে দিয়েছে। মুরীদ আর ছাত্র মনে করে এ কাজ অপরিহার্য। অন্যথায় হুজুরের নেক নজর পাওয়া যাবেনা, হুজুর খুশি হবেননা। দ্বিতীয়ত, হুজুর তো এমন উঁচু মর্যাদার যে, তিনি যা-ই বলবেন, অথবা যাতে তাঁর দিল খুশি হবে, তাই করা

তাঁর কর্তব্য। তার উপর টু শব্দ করাও চরম বেয়াদবী। আর তাতে আল্লাহ বেজার হবেন। অথচ ইসলামের তওহিদী আকীদায় বিশ্বাসের ক্ষেত্রে আল্লাহর এবং বাস্তব আমলের ক্ষেত্রে রাসূল (স) ছাড়া এ মর্যাদা আর কারোই হতে পারেনা। অপরদিকে ‘হযরত পীর কেবলা’ ও ওস্তাদ হযুরের মনে এ বাসনা স্পষ্টত মনে থাকে- তারা তো ফেরেশতা নয়, মানুষই-যে, মুরীদ বা ছাত্র আমার কদমবুসি করবেই। অনেক হুজুরকে এমনভাবে প্রস্তুত হয়েই আসন গ্রহণ করতে দেখা যায় যে, মুরীদ বা ছাত্রের পক্ষে পায়ে হাত দিতে যেন কোনো অসুবিধা না হয়। বরং অনায়াসেই যেন একাজ সম্পাদিত হতে পারে। তাই বলে তাঁরা মুখে কাউকে কদমবুসি করতে বলেন, এমন নয়; বরং তাঁরা নিষেধই করে থাকেন। আর সে নিষেধ বাণীটা উচ্চারিত হয় কদমবুসির কাজটা যথারীতি সম্পন্ন হয়ে যাবার পর, তার আগে নয়। আর সে নিষেধও ঠিক আদেশেরই অনুরূপ।

সবচেয়ে বড় কথা, কদমবুসির যে রূপটি তা সেজদার মতোই। আল্লামা শামী তাঁর সময়কার অবস্থা অনুযায়ী এ ধরনের কাজকে ‘সেজদা’ বলেই অভিহিত করেছেন।

তিনি লিখেছেনঃ এমনিভাবে লোকেরা যে আলিম ও বড় লোকদের জমিনবুসি করে, এ কাজ সম্পূর্ণ হারাম। আর যে একাজ করে এবং যে তাতে রাজি থাকে- খুশি হয়, উভয়ই গোনাহগার হয়। কেননা একাজ ঠিক মূর্তি পূজা সদৃশ্য।

দেওবন্দের মুফতী মাওলানা রশীদ আহমাদ লুধিয়ানভী-ও এরূপই ফতোয়া দিয়েছেন। (আহসানুল ফতোয়া দ্রষ্টব্য)।

বস্তুত কুরআন হাদীসে কদমবুসির কোনো উল্লেখ নেই, ইসলামী তাহযীব ও তমদুনের ক্ষেত্রে এর কোনো স্থান নেই। এর পরিবর্তে কুরআন-হাদীসে সালাম দেয়ার ও মুসাফাহা করার উল্লেখ এবং সুস্পষ্ট নির্দেশ পাওয়া যায়।

কুরআন মজীদে সালাম সম্পর্কে বলা হয়েছেঃ

وَإِذَا حُيِّئْتُمْ بِهِ فَاَحْسِنُوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ
[حَسِيبًا] ٤:৮৬

তোমাদেরকে যখন কোনো প্রকার সম্ভাষণে সম্ভাষিত করা হবে, তখন তোমরা তার অপেক্ষা উত্তম সম্ভাষণে সম্ভাষিত করো অথবা ততোটুকুই ফিরিয়ে দাও। মনে রেখো, আল্লাহ সর্ব বিষয়ে নিশ্চিত হিসাব গ্রহণকারী। (সূরা আন নিসাঃ আয়াত নং - ৪৬)

এ থেকে সুস্পষ্ট বোঝা গেল, মুসলমানদের পরস্পরের যখন দেখা সাক্ষাত হবে, তখন পরস্পরের সম্ভাষণের আদান প্রদান করবে। এ সম্ভাষণ মৌখিক হতে হবে এবং এ সম্ভাষণের ব্যাপারে পরস্পরে ঐকান্তিক নিষ্ঠা পোষণ করতে হবে এবং কোনোরূপ কৃপণতা পোষণ করা চলবে না। বরং প্রত্যেককে অপরের তুলনায় উত্তম সম্ভাষণ দানে প্রস্তুত থাকতে হবে অকুণ্ঠিতভাবে। আয়াতের শেষ অংশ এ সম্ভাষণের গুরুত্ব এবং তা যথারীতি আদান প্রদানের জন্য সতর্কতা অবলম্বন করার নির্দেশ দিচ্ছে।

হাদীসে নবী করীম (স) বারবার নানাভাবে পারস্পরিক সালাম আদান প্রদানের জন্য তাগিদ দিয়েছেন। হযরত আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (স) ইরশাদ করেছেনঃ আমার প্রাণ যে

আল্লাহর মুষ্টিবদ্ধ তাঁর কসম করে বলছিঃ তোমরা জান্নাতে যেতে পারবেনা, যতক্ষণ না তোমরা ঈমান আনবে, আর তোমরা ঈমান আনতে পারবেনা যতক্ষণ না তোমরা পরস্পরকে ভালোবাসবে। অতঃপর বললেনঃ আমি কি তোমাদের এমন একটা কাজের পথ দেখাব, যা করলে তোমরা পরস্পরকে ভালোবাসতে পারবে? তা হলো এই যে, তোমরা তোমাদের পরস্পরের মাঝে সালাম দেয়ার প্রচলনকে চালু করবে।

নবী করীম (স) হিজরত করে মদীনায় উপস্থিত হলে মদীনার মুসলমানগণে তাঁকে সাদর সম্বর্ধনা জানিয়েছিলেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম এ সম্বর্ধনার বিবরণ দান প্রসঙ্গে বলেছেনঃ নবী করীম (স) যখন মদীনায় উপস্থিত হলেন, তখন জনগণ তাকে সম্বর্ধনা করার উদ্দেশ্যে দ্রুততা সহকারে এগিয়ে এল। যারা এই সময় সামনে এগিয়ে গিয়েছিল, আমিও তাদের মধ্যে একজন। ... এই সময় আমি যে কথা তাঁকে যে কথা সর্বপ্রথম বলতে শুনেছিলাম তা হলোঃ তোমরা পরস্পরের প্রতি সালাম আদান প্রদান করো।

কুরআনের আয়াত থেকে পারস্পরিক সম্ভাষণের যে হেদায়াত পাওয়া যায়, সে সম্ভাষণ যে কি এবং কিভাবে, কি কথা দিয়ে তা করতে হবে, তার সঠিক সুস্পষ্ট নির্দেশ পাওয়া যায় এ হাদীস থেকে। অতএব নতুন সাক্ষাতকালে একজন মুসলমানের অপর মুসলমানের প্রতি প্রথম জরুরী কর্তব্য হচ্ছে সালাম দেয়া, বলা আসসালামু আলাইকুম। আর অপর পক্ষ জবাবে বলবেঃ ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। বুখারী শরীফের একটি হাদীস থেকে

জানা যায়, হযরত আদম (আ) সৃষ্ট হওয়ার পরই আল্লাহর নির্দেশক্রমে ফেরেশতাদের সাথে এই সালামের আদান প্রদান করেছিলেন।

শেষোক্ত হাদীস থেকে একজন নবাগত মহাসম্মানিত মেহমানকে সম্বর্ধনা জানানোর সঠিক নিয়ম সম্পর্কে সুস্পষ্ট পথ নির্দেশ জানতে পারা যায়। এই পর্যায়ে অপর হাদীস থেকে জানা যায়, এ সালাম করার সময় কি ধরনের আচরণ অবলম্বন করা উচিত এবং কি ধরনের অনুচিত। এই পর্যায়ে যত হাদীসই বর্ণিত হয়েছে, তা সব সামনে রেখে চিন্তা করলে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, ‘সালাম’ মুখে উচ্চারণ করার-কথার মাধ্যমে বলে দেবার ব্যাপার। এজন্যে কোনোরূপ অঙ্গভঙ্গি করা জরুরী নয়, তা হাদীস থেকেও প্রমাণিত নয়।

দ্বিতীয় যে কাজ নবাগত মুসলিমের সাথে করার কথা হাদীস থেকে সুন্যাত বলে প্রমাণিত, তা হলো মুসাফাহা করা। বুখারীর একটি হাদীস থেকে জানা যায়, হযরত কাব ইবনে মালিক (রা) বলেনঃ আমি মসজিদে নববীতে প্রবেশ করলাম। হঠাৎ দেখতে পেলাম সেখানে নবী করীম (স) রয়েছেন। আমাকে দেখেই তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ দাঁড়িয়ে আমার দিকে দ্রুত এগিয়ে আসলেন। আমার সাথে মুসাফাহা করলেন এবং আমাকে সাদর সম্ভাষণ জানিয়ে গেলেন।

বুখারীর অপর হাদীস থেকে জানা যায়, তাবেরী কাতাদাহ হযরত আনাস (রা) কে জিজ্ঞেস করলেনঃ নবী করীমের (স) সাহাবীদের

পরস্পর মুসাফাহা করার রীতি বহুল প্রচলিত ছিল কি? হযরত আনাস (রা) জবাবে বললেন, হ্যাঁ, তা চালু ছিল।

আবদুল্লাহ হিশাম বলেন, আমরা নবী করীমের সঙ্গে ছিলাম। আর তিনি হযরত উমরের হাত ধরে ছিলেন। এ পর্যায়ের হাদীস থেকে নবাগতের সাথে সালামের পর মুসাফাহার সুস্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায় এবং তা রাসূলে করীম (স) এর সাহাবীদের সমাজে পুরা মাত্রায় চালু ছিল বলে অকাট্যভাবে জানা যায়।

এই সম্পর্কে তিরমিযী শরীফে বর্ণিত একটি হাদীস সর্বাধিক স্পষ্টভাষী। হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলে করীম (স) কে জিজ্ঞেস করলেনঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমাদের একজন তার ভাই বা বন্ধুর সাথে যখন সাক্ষাত করে, তখন কি সে তার জন্য মাথা নুইয়ে দিবে? রাসূল (স) বললেনঃ না। জিজ্ঞেস করলো, তবে কি তাকে জড়িয়ে ধরবে ও তার মুখমন্ডলে চুমু খাবে? রাসূল (স) বললেনঃ না। জিজ্ঞেস করলোঃ তবে কি তার হাত ধরে মুসাফাহা করবে? রাসূল (স) বললেনঃ হ্যাঁ।

এ হাদীস সম্পর্কে ইমাম তিরমিযী বলেছেন-‘মুসাফাহা’ হাতে হাত ধরা ও পরস্পরের জন্য দো‘আ করা ‘আল্লাহ আমাদের ও তোমাদের মাফ করে দিন’-বলবে। এর ফযীলত বর্ণনা সম্পর্কে রাসূলে করীম (স) ইরশাদ করেছেনঃ দু’জন মুসলমান পরস্পরের সাক্ষাতকালে যদি মুসাফাহা করে, তাহলে দু’খানি হাত বিচ্ছিন্ন করার আগেই সে দু’জনকে ক্ষমা করে দেয়া হয়। হাদীসে তৃতীয় যে জিনিসের উল্লেখ পাওয়া যায়, তা হচ্ছে ‘মুয়ানাকা’-কোলাকুলি। তিরমিযী শরীফে এ

সম্পর্কে যে একমাত্র হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে তাহলো হযরত আয়েশা (রা) বলেনঃ যায়দ ইবনে হারিসা [রাসূল (স) এর পালিত পুত্র] মদীনায় উপস্থিত হলো। তখন নবী করীম (স) আমার ঘরে এলেন। যায়দ তাঁর সাথে দেখা করার জন্য এলো এবং দরজায় ধাক্কা দিলো। নবী করীম (স) তার কাছে উঠে গেলেন এবং তিনি তার সাথে গলাগলি করলেন, একজন আরেকজন এর গলা জড়িয়ে ধরলেন এবং তাকে ম্লেহের চুম্বন দিলেন। এ পর্যায়ে আরো কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করে আল্লামা আহমাদুল বান্না লিখেছেনঃ এসব হাদীস প্রমাণ করে যে, মুয়ানাকা (গলাগলি বা কোলাকুলি) শরীয়তে জায়েয। বিশেষ করে যে আসবে তার সাথে।

নবী করীম (স) এর সাহাবীদের तरीকা ছিলো এই যে, যখন তাঁরা পরস্পরের সাথে দেখা করতেন, পরস্পরের মুসাফাহা করতেন। আর যখন বিদেশ সফর করে ফিরে আসতেন, তখন তাঁরা পরস্পরে গলাগলি করতেন।

এ আলোচনা থেকে জানা গেল, ইসলামের সুন্নাহ হচ্ছে এই যে, দু'জন মুসলমান যখন পরস্পর সাক্ষাত করবে তখন সালাম করবে, মুসাফাহা করবে এবং গলাগলিও করবে-বিশেষ করে বিদেশাগত ব্যক্তির সাথে। এসব কয়টি কথাই সুস্পষ্ট হাদীস থেকে প্রমাণিত। রাসূল করীম (স) তাই করেছেন, সাহাবাদের সমাজে এই ছিল স্থায়ী রীতি, বস্তুত এই হচ্ছে সুন্নাহ। কিন্তু এই কদমবুসি এল কোথেকে? কে কদমবুসি করতে বলেছে? কে তা রেওয়াজ করেছে

ইসলামী সমাজে? কুরআন নয়, হাদীস নয়, রাসূল নয়, রাসূলের গড়া সমাজ নয়।

অতএব এটি বিদয়াত ও মুশরিকী রীতি হওয়ার কোনোই সন্দেহ নেই। অথচ আমাদের সমাজের তথাকথিত পীরবাদি আহলে সুন্নাত (?) দের সমাজে কদমবুসি একটি অপরিহার্য রীতি। আর তা হবেই না বা কেন? এখানে ইসলাম ও সুন্নাত কুরআন, হাদীস, রাসূল ও সাহাবাদের আমল থেকে গ্রহণ করা হয়না, গ্রহণ করা হয় মরভূম বা বর্তমান পীর সাহেবানদের কাছ থেকে। আর এ ধরনের পীর মুরীদী যেহেতু বেদান্তবাদী ব্রাহ্মণ্যবাদী থেকে গৃহীত, তাই কদমবুসির ব্রাহ্মণ্য রীতিও এখানে চালু হতে বাধ্য। কেউ যদি বলেন যে, ওস্তাদ, পীর ও মুরুব্বীদের তাজীম করার জন্যই এ রীতি চালু করা হয়েছে, তাহলে বলবো-ওস্তাদ, পীর ও মুরুব্বীদের তাজীমের তরীকা সুন্নাত থেকে যা প্রমাণিত তাই দিয়ে তাজীম করতে হবে। নিজেদের মনগড়া একটা রীতিকে চালু করার বিশেষ করে তাতে যদি শরীয়তের দৃষ্টিতে ভয়ানক খারাবী থাকে-কারো অধিকার থাকতে পারেনা। করলে তাই তো হবে বিদয়াত। যারা চলতি প্রথার দোহাই দিয়ে শরীয়তের বাইরের জিনিসকে শরীয়তসম্মত বলে চালু করতে চাইবে, তারাইতো বিদয়াতী। আল্লাহ এই বিদয়াতীদের প্রভাব থেকে বাঁচান ঈমানদার ও তওহীদবাদী মুসলিম সমাজকে।

কদমবুসি পর্যায়ে আলোচনার শেষভাগে একটি কথার উল্লেখ করে তার জবাব না দিলে এ দীর্ঘ আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। কোনো কোনো পীরের অনুমোদনক্রমে প্রকাশিত তাসাউফ সংক্রান্ত

কদমবুসি- বিশেষ করে পীর ওস্তাদের কদমবুসি-করা জায়েয বলে ফতোয়া দেয়া হয়েছে। এ ফতোয়ার দলীল হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে দুটো হাদীস। একটি হাদীস তিরমিযী থেকে, অপরটি আবু দাউদ থেকে। প্রথম হাদীসটিতে দু' জন ইয়াহুদীর কথা বলা হয়েছেঃ তারা রাসূলে করীমের নিকট দ্বীন ইসলামের ব্যাখ্যা শ্রবণ করে। অতঃপর তারা রাসূলে করীমের দু' হাত ও দু' পা চুম্বন করলো এবং বললোঃ আমরা স্বাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনি নবী।

এ সম্পর্কে আমাদের প্রথম কথা হলো, ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে উত্তম বিশুদ্ধ বলে আখ্যায়িত করেছেন বটে, কিন্তু ইমাম নাসায়ী হাদীস সম্পর্কে বলেছেন-অগ্রাহ্য হাদীস। আর মুনযেরী বলেছেন, হাদীসটি আবদুল্লাহ ইবনে সালামার কারণেই যযীফ। কেননা হাদীস বর্ণনাকারী হিসেবে তাঁর দোষ বের করা হয়েছে। তাছাড়া হাদীসের সুস্পষ্ট কথা হলো-হাত ও পা চুম্বনের কাজটি দু' জন ইয়াহুদী করেছে। ইয়াহুদীদের কাজ মুসলমানদের জন্য অনুসরণীয় হতে পারেনা। আবু দাউদ বর্ণিত অপর হাদীসে উমামাত ইবনে শরীক (রা) এর কথা উদ্ধৃত হয়েছেঃ আবু দাউদে উদ্ধৃত হাদীসে রাসূলে করীম (স) এর হাত বা পা নয়, কটিদেশ চুম্বনের কথা বলা হয়েছে। [হযরত উসাইদ ইবনে উজাইর (রা) হতে হাদীসটি বর্ণিত। একজন আনসারের কথায় রাসূলে করীম (স) তাঁর পরিহিত জামা পিছনের দিক দিয়ে তুলে ধরলে তিনি তাঁকে আলিঙ্গন করলেন এবং তার কটিদেশে চুম্বন করতে লাগলেন]।

দ্বিতীয় কথা, এ পর্যায়ের সব কটি হাদীসকে একত্রিত করে বিচার করলে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, এসবের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় সব হাদীসে একই রকম নয়। কোনোটিতে শুধু দু'হাত চুম্বনের কথা বলা হয়েছে, কোনোটিতে এক হাত, এক পা চুম্বনের কথা বলা হয়েছে। এমন কি হযরত ইবনে উমর (রা) হতে বর্ণিত হাদীসে শুধু হাত চুম্বনের কথা উল্লিখিত হয়েছে। বলা হয়েছেঃ অতঃপর আমরা তাঁর হাত চুম্বন করলাম। তিনি বললেনঃ এবং আবু লুকাবা ও কাব ইবনে মালিক এবং তাঁর দু'জন সঙ্গীও নবী করীম (স) এর হাত চুম্বন করলেন, যখন আল্লাহ তাদের তওবা কবুল করলেন। এ কথা আবরাহীও উল্লেখ করেছেন।

ইবনে উমর বর্ণিত এ হাদীসটি ইমাম বুখারী ও আদাবুল মুফরাদ' নামক কিতাবে উল্লেখ করেছেন। হযরত বুরাইদা ইবনে বর্ণিত একটি হাদীসে উদ্ধৃত হয়েছে, জনৈক বুদ্ধ লোক রাসূলের মস্তক ও দু' পা চুম্বনের অনুমতি প্রার্থনা করলে রাসূলে করীম (স) তাকে অনুমতি দেন। আবদুর রহমান ইবনে রুজাইন বলেছেন, সালেমা ইবনুল আকওয়া তাঁর উটের হাতের মতো হাত বের করলেন, আমরা তা চুম্বন করলাম। সাবিত হতে বর্ণিত, তিনি হযরত আনাসের হাত চুম্বন করলেন। আর হযরত 'আলী নাকি' হযরত আব্বাসের হাত ও পা চুম্বন করেছিলেন। এভাবে বর্ণিত হাদীসসমূহ হতে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়না। মূলত হাত পা দু'টোই চুম্বন করার কথা ঠিক, না শুধু হাত চুম্বনের কথাই ঠিক। কাজেই এসব হাদীসের ভিত্তিতে কদমবুসি করা জায়েয কিছুতেই বলা যায়না।

আবু মালিক আল আশযায়ী বলেনঃ আমি আবু আওফ (রা) কে বললাম, আপনি যে হাত দিয়ে রাসূলের বায়' আত করেছেন, তা বের করুন। তিনি সে হাত বের করেন। অতঃপর আমরা তা চুম্বন করি। এ ধরনের হাদীস হতে কোনো আবিদ জাহিদ ব্যক্তির হাত ভক্তিভরে চুম্বন করা জায়েয প্রমাণিত হয় বটে; কিন্তু কদমবুসি প্রমাণিত হয়না। ইমাম নববীও এ মত প্রকাশ করেছেন। আরো কথা হলো, কোনো নওমুসলিম যদি ভক্তি শ্রদ্ধায় ভারাক্রান্ত হয়ে রাসূলে করীমের হাত ও পা উভয়ই চুম্বন করে থাকেন, তবে তার ভিত্তিতে আজকের পীর ওস্তাদেরো ভক্ত মুরীদ ও ছাত্রদের দ্বারা নিজেদের হাত পা চুম্বন করাতে পারেননা। তাঁরা কি নিজেদের রাসূলের মর্যাদাভিষিক্ত মনে করে নিয়েছেন? বস্তুত কদমবুসির বর্তমান রেওয়াজ রাসূলের সুন্নাহের বিপরীত; মানবতার পক্ষে চরম অবমাননাকর। অনতিবিলম্বে এ প্রথা বন্ধ হওয়া বাঞ্ছনীয়।

সাতচল্লিশতম পরিচ্ছেদ – শরীয়তের উৎস কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ এবং প্রচলিত ইজমা ও কিয়াস নব উদ্ভাবিত তথা বিদ'আত

ইজমা ও কিয়াস নিয়ে আমাদের সমাজে ব্যাপক ভুল ধারণা বিদ্যমান। আমরা জানিই না ইজমা কি আর কিয়াস কি! কেননা শরীয়তের উৎস দুটি যথা কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ এবং শরীয়তের নামে প্রচলিত ইজমা ও কিয়াস দুটো নব আবিষ্কৃত বিধান যা স্পষ্ট বিদ'আত। মূলতঃ এ কারনেই মানুষ ইজমা কিয়াস সম্পর্কে মারাত্মক ভুল জ্ঞান রাখার কারণে প্রতিনিয়ত নতুন নতুন বিষয়

ধর্মের মধ্যে ইজমা কিয়াসের নাম দিয়ে ঢুকিয়ে দিচ্ছে। বিশেষ করে বিদ'আতী খুবই অল্প জ্ঞানী সুফিবাদী আলেম নাম ধারী লোকেরা প্রতিনিয়ত সাধারণ মানুষের কাছে নতুন নতুন বিষয় উপস্থাপন করে বলেন এটা ইজমা হয়ে গিয়েছে ওটা কিয়াস হয়ে গিয়েছে। আর সাধারণ মানুষও না বুঝেই সেগুলো গ্রহণ করেছে এবং সহিহ বিষয় উপস্থাপন হলে উনারা সেটা মানতে অস্বীকৃতি জানিয়ে ইজমা কিয়াসের যুক্তি দাড়া করান অথচ তিনি জানেনই না ইজমা কি বা কিয়াস কি!

এছাড়াও এভাবেই তারা বিভিন্ন যুক্তি প্রদর্শন করেও যখন মুসলিমদের বৃহত্তর অংশকে বিচ্যুত করতে পারলো না, তখন আবারো আঘাত হানলো এ কথা বলে যে, “শরীয়াহ্ আইনের উৎস কুরআন ও হাদীস নয় বরং ইজমা ও কিয়াস ও এর সাথে সংযুক্ত”। এ গ্রন্থে তাই আমি শরীয়াহ্ এর পরিচয়, উৎস এবং শরীয়াহ্ আইন যে কুরআনেরই বিধান এবং কুরআন থেকে উৎসারিত সে বিষয়টি তুলে ধরার পাশাপাশি শরীয়াহ্ যে প্রগতিশীল, আধুনিক ও উন্নয়নধর্মী সেটিও তুলে ধরা হবে ইনশাআল্লাহ।

শরীয়াহ্ কি :

‘শরীয়াহ্’ একটি আরবী শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ দীন, জীবন-পদ্ধতি, ধর্ম, জীবনাচার, নিয়ম-নীতি ইত্যাদি^{১৯}। তবে আরবী ভাষায় শব্দটির বুৎপত্তিগত অর্থ হল - পানির উৎসস্থল বা যে স্থান থেকে পানি উৎসারিত হয়ে গড়িয়ে পড়ে এবং মানুষ সেখানে এসে পানি

^{১৯} আস-সিহাহ্, ইসমাইল ইবনু হাম্মাদ আল-জাওহারী, ৩/১২৩৬, লিসানুল আরব, ইবনু মানযূর, ৮/১৭৪

পান করে পিপাসা নিবারণ করে^{৬২০}। শরীয়াহ্ যে জীবন পদ্ধতির অর্থে ব্যবহৃত হয়, কুরআনে সে ঘোষণা রয়েছে :

(لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا) [المائدة: ৪৮]

“তোমাদের প্রত্যেকের জন্য শরীয়াহ্ ও জীবন-পদ্ধতি নির্ধারণ করেছি।” [সূরা আল-মায়িদাহ : ৪৮]

Wikipedia, the free Encyclopedia তে শরীয়াহ্ সম্পর্কে এভাবে সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে- Sharia (Arabic: شريعة transliteration: Šarī'ah) is the body of Islamic religious law. The term means "way" or "path to the water source"; it is the legal framework within which the public and some private aspects of life are regulated for those living in a legal system based on Islamic principles of jurisprudence and for Muslims living outside the domain. Sharia deals with many aspects of day-to-day life, including politics, economics, banking, business, contracts, family, sexuality, hygiene, and social issues.

পরিভাষায় ‘শরীয়াহ্’ এর সংজ্ঞায় প্রখ্যাত তাবেয়ী ক্বাতাদাহ রহ. বলেন, “শরীয়াহ্ হচ্ছে আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ থেকে আরোপিত নির্দেশ, নিষেধাজ্ঞা, সীমারেখা ও ফারায়েয।”^{৬২১}

^{৬২০} লিসানুল আরব, ৮/১৭৪

^{৬২১} আল-জামি’ লিআহকামিল কুরআন ৬/২১১

ইমাম ইবনু তাইমিইয়াহ রহ. বলেন, “আল্লাহ তা‘আলা যে সব আকীদা ও আমল মানুষের জন্য প্রণয়ন করেছেন, তা-ই শারীয়াহ”^{৬২২}। অন্যত্র তিনি বলেছেন, “শরীয়াহ হচ্ছে আল্লাহ তা‘আলা, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও উলুল আমর (তথা মুসলিম প্রশাসক ও আমীর) এর আনুগত্য করা”^{৬২৩}। ইসলামী শরীয়াহ এর সংজ্ঞা আরো সহজভাবে আমরা এভাবে দিতে পারি, “মহান আল্লাহ তা‘আলা জীবন ও জগত পরিচালনার জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে স্বীয় বান্দাদেরকে যে সার্বিক হুকুম ও বিধান প্রদান করেছেন, তা-ই হল ইসলামী শরীয়াহ”। উপরোক্ত সংজ্ঞার আলোকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলার যাবতীয় আদেশ-নিষেধ ও এতদুভয়ের ভিত্তিতে ফরয-ওয়াজিব, সুন্নাত, মাকরুহ ও হারাম ইত্যাদি যে সকল বিধান প্রণয়ন করা হয় তা হচ্ছে শরীয়াহ। ‘আশ-শরীয়াহ’ বলতে সাধারণত ‘আদ-দীন’ তথা সার্বিক ইসলামী জীবন-বিধানকে বুঝানো হয়। তবে ‘শরীয়াহ’ বলতে কখনো ইসলামের আইনগত দিককেও বুঝানো হয়। সেটি হচ্ছে শরীয়াহ-এর খাস বা বিশেষ অর্থ।

ইসলামী শরীয়াহ এর দলীল ও উৎসসমূহ

শারী‘আহর মূল উৎস হচ্ছে ওয়াহী। ওয়াহী দু’ প্রকার। ওয়াহী মাতলু (আল-কুরআন) ও ওয়াহী গাইরে মাতলু (সুন্নাহ ও হাদীস)। এবং দ্বীনে ইলাহীর ভিত্তি শুধুমাত্র দু’টি জিনিসের উপর প্রতিষ্ঠিত।

^{৬২২} মাজমু‘ আল-ফাতাওয়া, ইবনু তাইমিইয়াহ, ১৯/৩০৬

^{৬২৩} প্রাপ্ত, ১৯/৩০৯

ইজমা ও কিয়াস কোন শারঈ দলীল নয়। বরং যে কিয়াস এবং ইজমা ওয়াহীর পক্ষে অর্থাৎ কুরআন ও সুন্নাহ মুতাবিক হবে তা গ্রহণযোগ্য এবং যেটা বিপক্ষে যাবে সেটা পরিত্যাজ্য ও অগ্রহণযোগ্য। ইসলামী শরীয়াহ এর প্রধান উৎস ও দলীল দুটি। সেগুলো নিম্নে যথাক্রমে ব্যাখ্যা করে উপস্থাপন করা হলো:-

আল-কুরআন

ইসলামী শরীয়াহ এর সর্বপ্রথম ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ উৎস হচ্ছে আল-কুরআনুল কারীম। এ ব্যাপারে সকল সাহাবায়ে কিরাম (রাদিয়াল্লাহু আনহুম আজমায়ীন), সকল যুগের ইমামগণ, মুফাসসিরীন, মুহাদ্দিসীন, ফুকাহা ও সকল উলামায়ে কিরামের ঐকমত্য ও ইজমা রয়েছে। ইসলামী শরীয়াহ এর সকল বিধানই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে পবিত্র কুরআন কারীম থেকে উৎসারিত। ইতোপূর্বে উল্লেখিত দু'টো আয়াতে [সূরা আল-জাসিয়া : ১৮ ও সূরা আল-মায়িদাহ : ৪৮] বলা হয়েছে যে, আল্লাহ সুবহানাহ ওয়া তাআলা নিজেই শরীয়াহ প্রণয়নকারী।

আস-সুন্নাহ

রাসূলুল্লাহ (সা.) এর কথা, কাজ, সম্মতি ও অনুমোদনকে বলা হয় আস-সুন্নাহ। আস-সুন্নাহ মূলত কুরআনেরই ব্যাখ্যা। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَأَنزَلَ نَارًا إِلَىٰ آلِكَ لِيُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ

يَتَّقُونَ﴾ [النحل: ১১]

“আর আমি তোমার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করেছি, মানুষকে সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেবার জন্য যা তাদের প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছিল, যাতে তারা চিন্তা করে।” [সূরা আন-নাহল : ৪৪]

তিনি আরো বলেন, “সে মনগড়া কথা বলে না। এতো অহী যা তার প্রতি প্রত্যাদেশ হয়।” [সূরা আন-নাজম : ৩-৪]

আল-কুরআন ও সুন্নাহ দু’টোই যে অহী, এ ব্যাপারে আলেমগণের ঐকমত্য রয়েছে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, হাদীস শাস্ত্রের উসূল অনুযায়ী সুন্নাহ-এর যে সকল হাদীস Authentic ও সহীহ শুধু সেগুলোই ইসলামী শরীয়ায় দলীল হিসেবে গৃহীত।

অথচ বাতিল ফিকরার লোকেরা ইজমা ও কিয়াসকে ওয়াহীর আসনে বসিয়েছে এবং বলে থাকেঃ শারী‘আহর ভিত্তি চারটি বিষয়ের উপর। কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস। বড় আশ্চর্যের বিষয় এই যে, সহাবায়ে কেরাম যাদের উপর আল্লাহ তা‘আলা তার সন্তুষ্টির ঘোষণা দিয়েছেন, তাদেরকে সত্যবাদী বলে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে এবং মুসলিম উম্মাহ এ ব্যাপারে সকলেই একমত অথচ তারা সহাবায়ে কেরামকে দু’ভাগে ভাগ করেছেন। (১) ফকীহ (২) গাইরে ফকীহ। আর বলেছেন যে সকল সহাবী ফকীহ ছিলেন তারা যদি কিয়াসের বিপরীতে হাদীস বর্ণনা করেন তবে তা গ্রহণযোগ্য কিন্তু যে সকল সহাবী গাইরে ফকীহ অর্থাৎ ফকীহ নন তাঁরা যদি কিয়াসের খেলাফ হাদীস বর্ণনা করেন তাহলে তা গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে না। প্রকৃতপক্ষে এটা উম্মাতে মুহাম্মাদিয়াহকে সিরাতে মুস্তাকীমের পথ হতে সরিয়ে দেয়ার একটা বড় অস্ত্র এবং পরিকল্পনা। কেননা তাঁরা

কিয়াসকে মূল এবং হাদীসকে দ্বিতীয় স্থানে রেখেছেন। সকল সহাবীর উপর আল্লাহ তা‘আলা সন্তুষ্ট কিন্তু তারা খুশী নন। সকল সহাবীর ব্যাপারে উম্মাতের ঐকমত্য রয়েছে। কিন্তু তাদের নিকট গাইরে ফকীহ সহাবীগণ ‘আদিল নন। ধোঁকাবাজীর কিছু নমুনাঃ তারা বলেন, ফকীহ সহাবীগণ কিয়াসের খেলাফ হাদীস বর্ণনা করলে তা গ্রহণীয় হবে। কিন্তু গাইরে ফকীহ সহাবীগণ কিয়াসের খেলাফ হাদীস বর্ণনা করলে তা বাতিল হয়ে যাবে এবং কিয়াসের উপর ‘আমল করতে হবে। বাই‘য়ি মুসারাহ এর হাদীস আবু হুরাইরাহ (রাযি.) হতে বর্ণিত এবং তা কিয়াসের খেলাফ। এই জন্য তা বাতিল এবং কিয়াসের উপর ‘আমালযোগ্য। অথচ এই হাদীস ‘আবদুল্লাহ ইবনু মাস‘উদ (রাযি.) হতেও বর্ণিত হয়েছে। (দেখুন সহীহ বুখারী ২৮৮ পৃষ্ঠা রশিদিয়া ছাপা) হাদীসের মানঃ সহিহ (সহীহ)।

শরীয়াহ্ ও ইজতিহাদ

তবে ইজমা ও কিয়াস ব্যতীত ইসলামী শরীয়াহ-এর উজ্জ্বলতম দিক হল ইজতিহাদের অনুমোদন, যার দ্বার কিয়ামত পর্যন্ত উন্মুক্ত। শরীয়াহ্-কে গতিশীল রাখার ক্ষেত্রে ইজতিহাদের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তবে শরীয়াহ এর সকল বিধানের ক্ষেত্রে ইজতিহাদের প্রয়োজন পড়ে না। শরীয়াহ-এর যে সব বিধান অত্যন্ত সুস্পষ্ট যেমন তাওহীদ ও রিসালাতের Concept এবং তার প্রতি ঈমান পোষণ করার ফরযিয়াত, যা কুরআন ও হাদীসে বহুবার আলোচিত হয়েছে, সেখানে ইজতিহাদ করার প্রয়োজন পড়ে না। অনুরূপভাবে শরীয়াহ-এর যে সব বিষয় অপরিবর্তনীয় সেগুলোকেও ইজতিহাদ ও গবেষণা

করে পরিবর্তন করা যায় না। যেমন তাওহীদের সকল বিষয়, শির্ক ও কুফরীসহ ঈমানের রুকনসমূহ, মূল্যবোধ সংক্রান্ত বিষয়গুলো ও চিরতরে হারাম ঘোষিত মন্দকাজসমূহ। অতএব তাওহীদের যে চিরন্তন ধারণা কুরআনে ও সুন্নায়ে এসেছে, তাতে বিন্দুমাত্র পরিবর্তন আসবে না। যে কাজ করা রাসূল (সা.) এর যুগে শির্ক ও কুফরি বলে বিবেচিত হতো তা আজো শির্ক ও কুফরি বলে গণ্য হবে। যেনা-ব্যভিচার, মদ্যপান, চুরি-ডাকাতি, সূদ, মানবহত্যা ইত্যাদি যা আগে হারাম ছিল, আজো তা হারাম বলে গণ্য হবে। সুন্দর গুণাবলী, সততা, সত্যবাদিতা আগে যেমন প্রশংসিত ছিল আজো তেমনি প্রশংসিত, অন্যদিকে মিথ্যা, ধোকা, প্রতারণা সব যুগেই ঘৃণ্য ও হারাম। তবে শরীয়াহ্-এর এমন অনেক বিষয় রয়েছে যার বিধান স্থান-কাল-পাত্র ভেদে পরিবর্তিত হতে পারে। এ কারণেই শরীয়াহ্-তে বিভিন্ন রোখসাত দেয়া হয়েছে। তাছাড়া দ্বরুরতের কারণে শরীয়াহ্ ইতো পূর্বেকার নিষিদ্ধ বিধানকে অনুমোদন দান করে। এসব মূলনীতির দলীল কুরআনে রয়েছে। এছাড়া সার্বিক মূল্যবোধ ও আকীদা ঠিক রেখে মু'আমালাতের বিষয়গুলো আঞ্জাম দেয়ার বিষয়টিও স্থান-কাল-পাত্র ভেদে পরিবর্তিত হতে পারে। এগুলোর Implementation কিভাবে হবে সেটা হচ্ছে ইজতিহাদের অন্যতম একটি বিষয়। তবে যে কেউ ইচ্ছে করলেই নিজের মত করে ইজতিহাদ করে নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করাকে ইসলাম সমর্থন করে না। মুজতাহিদ ব্যক্তিকে কুরআন, হাদীস ও আরবী ভাষায় যথেষ্ট

পাণ্ডিত্যের অধিকারী হওয়ার পাশাপাশি আরো বেশ কিছু গুণের অধিকারী হতে হবে।

মোদ্দাকথা হল, শরীয়াহ্ এর অপরিবর্তনীয় বিষয়গুলো বাদে অন্যান্য ক্ষেত্রে সহীহ ও Authentic ইজতিহাদের মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহর কল্যাণের জন্য ইতিবাচক পরিবর্তন ও উন্নয়ন সাধনের প্রতি আল-কুরআন আমাদেরকে উদ্বুদ্ধ করছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

(إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَفْسِهِمْ) [الرعد: ১১]

“আল্লাহ কোন জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ না তারা নিজেরা নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে।” [সূরা রাদ : ১১]

কিয়াস, ইস্তেহসান, মাসালিহ মুরসালাহ্ ও শরীয়াহ্-এর এ জাতীয় দলীলসমূহ ইজতিহাদী প্রক্রিয়ারই অংশ। শরীয়াহ্ যে প্রগতিশীল এবং সব যুগের জন্য উপযোগী ইজতিহাদ মূলতঃ সে প্রমাণকে শক্তিশালী করেছে।

বস্তুত আজকাল সমাজে এ কারনেই ইজতিহাদের বিষয় জ্ঞান না থাকার কারনে অনেকেই বলে থাকেন কুরআন হাদীসে সমাধান না পাওয়া গেলে কি করব? অথচ স্বয়ং আল্লাহ বলছেন মতানৈক্য হলে রাসুল (সাঃ) ও কুরআনের দিকে ফিরে আসতে! যা সূরা নিসা, আয়াত ৫৯নং এ স্পষ্ট বলেছেন। যেমনঃ আল্লাহ এ প্রসঙ্গে বলেছেনঃ-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ
ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

- হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহর ও রাসূলের অনুগত হও এবং তোমাদের জন্য যারা বিচারক তাদের; অতঃপর যদি তোমাদের মধ্যে কোন বিষয়ে কোন মতবিরোধ হয় তাহলে আল্লাহ ও রাসূলের দিকে প্রত্যাবর্তিত হও, যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস করে থাক; এটাই কল্যাণকর ও শ্রেষ্ঠতর পরিসমাপ্তি।

শরীয়াহ্ কি উন্নয়ন ও আধুনিকতা বিরোধী?

সং ও ন্যায়ভিত্তিক মূল্যবোধের আলোকে যাবতীয় উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালনা করতে ইসলামী শরীয়াহ্ উদ্বুদ্ধ করে। আল-কুরআনে আখিরাতের পাশাপাশি দুনিয়ার উন্নতি চেয়ে দু'আ করার প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন,

﴿وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً ۚ وَقَدْ آتَيْنَا لَكُمُ الْكِتَابَ فِيهِ كَلَامٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ۚ وَإِنَّ ظَهْرَهُ لَتُتَذَكَّرُ ۚ﴾ [البقرة: ২০১, ২০২]

“তাদের মধ্যে এমন লোক আছে যারা বলে, হে আমাদের রব! আমাদেরকে দুনিয়ায় কল্যাণ দাও এবং আখিরাতেও কল্যাণ দাও। আর জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা কর। এরা যা করেছে তার অংশ তাদের জন্য রয়েছে”। [সূরা আল-বাকারাহ : ২০১-২০২]

শরীয়াহ্-এর দৃষ্টিতে উন্নয়ন বলতে বুঝায় সে সব উন্নয়নকে যার দ্বারা ব্যক্তি দুনিয়াতে উপকৃত হয়, ভাল ও সং মানুষে পরিণত হয়, দেশ, সমাজ ও জাতির কল্যাণে কাজ করে এবং আখিরাতে নিজেকে জাহান্নাম থেকে বাঁচানোর ব্যবস্থা করে এবং প্রয়োজনীয় আমলে সালেহ করে জান্নাত লাভের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে। অতএব শুধুমাত্র বৈষয়িক উন্নতিই ইসলামের দৃষ্টিতে একমাত্র উন্নয়ন নয়।

আমরা লক্ষ্য করি - ইসলামী শরীয়াহ্-এর বিধানগুলো আল্লাহ সুবহানাহ্ মানবজাতির জন্য এমনভাবে প্রণয়ন করেছেন যার মাধ্যমে তাদের আধ্যাত্মিক উন্নয়ন, চারিত্রিক উন্নয়ন এবং যাবতীয় বৈষয়িক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়।

ইবাদাত পালনের নির্দেশ মূলতঃ মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নয়ন সাধন করে। মদ-যেনা, জুয়া, মিথ্যাকথা বলা, অন্যায় ও অশ্লীলতায় লিপ্ত হওয়া থেকে নিষেধাজ্ঞা আরোপ তাকে চারিত্রিক উন্নয়ন দান করে। সুদ পরিহারের নির্দেশ, যাকাত-সদকা প্রদানের আদেশ এবং নানাবিধ ব্যবসায় কর্মকাণ্ড পরিচালনা করার অনুমতি উৎপাদন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নকে বেগবান করে। অতএব ইসলামী শরীয়াহ্ প্রচলিত আর সব মতবাদ থেকে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডকে গতিশীল করার ক্ষেত্রে অনেক বেশী কার্যকর ভূমিকা পালন করে থাকে।

আমরা জানি যা গতিশীল, তা-ই যুগের সাথে সঙ্গতি রেখে চলতে পারে এবং যা যুগোপযোগী তা-ই আধুনিক। অতএব ইসলামী শরীয়াহ্ও আধুনিক। ইসলামী শরীয়াহ্ আধুনিক সমাজের সর্বস্তরের লোকদের ন্যায্য অধিকার যেমন সফলভাবে প্রতিষ্ঠা করেছে, তেমনি মৌলিক মূল্যবোধ ঠিক রেখে যুগের চাহিদা ও দাবীর সাথেও সঙ্গতি বিধান করেছে। যে কোন নতুন কিছু যদি ভাল ও মানুষের জন্য কল্যাণকর হয়, শরীয়াহ্ তাকে গ্রহণ করেছে। আধুনিকতা বলতে যদি ঈমান ও মূল্যবোধ ঠিক রেখে যুগোপযোগিতা বুঝায়, যদি অন্যায়-অশ্লীলতা ও বেহায়পনা আধুনিকতার সংজ্ঞায় না পড়ে, তাহলে ইসলামী শরীয়াহ্ চির-আধুনিক।

কতিপয় সংশয়ের অপনোদন

খুবই সাম্প্রতিককালে পাশ্চাত্যের ইসলাম বিদ্বেষী মহল এবং তাদের তল্লাবাহক কিছু বুদ্ধিজীবী মুসলিমদেরকে Confused করার জন্য ইসলামী শরীয়াহ্ ও কুরআনের মধ্যে পার্থক্য আবিষ্কার করেছেন এবং এ ব্যাপারে তারা পত্র-পত্রিকায় ও ইন্টারনেটে লেখালেখি করছেন। তাদের যুক্তিগুলো খুবই অপরিপক্ক। এগুলোকে যুক্তি না বলে সংশয় বলাই ভালো।^{৬২৪} কেউ যাতে এসব সংশয় দ্বারা প্রভাবিত না হন সেজন্য প্রধান কয়েকটি উল্লেখ করে সেগুলোর সন্তোষজনক উত্তর দেবার চেষ্টা করছি।

বলা হয়েছে, ‘রাসূল সা. এর যুগে এবং ইসলামের প্রাথমিক যুগে শরীয়াহ্ আইন বলে কিছু ছিল না। কেননা শরীয়া আইন প্রবর্তন করেছেন ফকীহগণ’। উত্তরে বলব, এ প্রবন্ধের শুরুতে আমরা সূরা আল-জাসিয়াহ এর ১৮ নং আয়াতে লক্ষ্য করেছি মহান আল্লাহ সুবহানাহ্ ‘শরীয়াহ্’ অনুসরণের নির্দেশ দিয়েছেন। এ আয়াতটি রাসূল সা. এর উপর অবতীর্ণ হয়েছে এবং আয়াতের নির্দেশ তাঁকে ও তাঁর সাহাবাগণকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। অতএব ‘ফকীহগণ শরীয়া আইন প্রবর্তন করেছেন’ - কথাটি মোটেই শুদ্ধ নয়। কেননা আয়াতটিতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, শরীয়াহ্ আইন প্রবর্তন করেছেন স্বয়ং আল্লাহ সুবহানাহ্ ওয়া তা‘আলা। তারা দাবী করেছেন যে, ‘শরীয়াহ্ আইনের অনেক কিছু জাল হাদীসের উপর ভিত্তি করে

^{৬২৪} আল-কুরআন ইসলামী শরীয়াহ্-এর অন্যতম উৎস - ড. মোহাম্মদ মানজুরে ইলাহী, সম্পাদনায়ঃ ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া [প্রবন্ধ - ইসলাম হাউস থেকে সংগ্রহীত]

রচিত হয়েছে'। আমরা বলব, শরীয়াহ্ আইন প্রণয়ন সম্পর্কে নিতান্ত অজ্ঞ লোকেরাই এ দাবী করতে পারেন। জাল হাদীস সর্বযুগে সকল আলেম, মুহাদ্দিস ও এমন কি সাধারণ মুসলিমদের কাছেও সর্বাঙ্গীনভাবে পরিত্যাজ্য। তাছাড়া শরীয়াহ্ আইন যদি জাল হাদীস তৈরীর যুগে রচিত হত তাহলে এমন প্রশ্নের উদ্বেক হওয়া অসম্ভব ছিল না। একটু আগেই বলা হয়েছে, শরীয়াহ্ প্রণীত হয়েছে রাসূল সা. এর যুগে এবং প্রণেতা স্বয়ং আল্লাহ সুবহানহু।

তারা আরো বলেছেন, ইসলাম ধর্মের বিশ্বাস অপরিবর্তনীয়, যা কুরআন দ্বারা প্রমাণিত। কিন্তু দেখা যায় শরীয়াহ্ আইনের অনেক বিধান কখনো পাল্টে যায়।

এর উত্তরে বলব, শরীয়াহ্ ও ইসলামের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। ইসলামী শরীয়াহ্ এর অনেক বিধান অপরিবর্তনীয় এবং কিছু বিধান স্থান-কাল-পাত্র ভেদে পরিবর্তিত হতে পারে- তা ইতোপূর্বে বলা হয়েছে। অতএব এ যুক্তি দাঁড় করিয়ে শরীয়াহ্, কুরআন ও ইসলামের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করা বড় ধরনের অজ্ঞতা কিংবা নিতান্তই গোঁড়ামী।

অতএব, উপরোক্ত আলোচনার সারাংশে বলা যায় যে, কুরআন ও হাদীসের মধ্যেই সমাধান অবশ্যই আছে। তারপরেও যদি বলেন কুরআনে ও হাদীসে তো নাই! তাহলে তো আরো সহজ যা কুরআন ও হাদীসে নাই তা ইসলামেও নাই! কেননা হাদীসেও এর প্রমাণ পাওয়া যায়, যেমনঃ- “নিশ্চয়ই সর্বোত্তম বাণী আল্লাহ্‌র কিতাব এবং সর্বোত্তম আদর্শ মুহাম্মদের আদর্শ। আর সবচেয়ে নিকৃষ্ট বিষয় হল

(দ্বীনের মধ্যে) নব উদ্ভাবিত বিষয়। আর নব উদ্ভাবিত প্রত্যেক বিষয় বিদআত এবং প্রত্যেক বিদআত হল ভ্রষ্টতা এবং প্রত্যেক ভ্রষ্টতার পরিণাম জাহান্নাম।’ [সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৫৩৫ ও সুনান আন-নাসায়ী, হাদীস নং ১৫৬০, হাদীসের শব্দ চয়ন নাসায়ী থেকে]। দ্বীন ইসলাম পরিপূর্ণ। এখন ইজমা কিয়াসের নামে দ্বীন ইসলামে নতুন নতুন সংযোজন কি আদৌ সম্ভব?

ইসলামী শরীয়তের (আইনের) তৃতীয় উৎস হলো ইজমাঃ ইজমা হলো এ উম্মতের দীনি জ্ঞানসম্পন্ন মুজতাহিদদের ঐকমত্য পোষণ। আর এর ভিত্তি হলো রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহীহ হাদীস- “আমার উম্মত কখনও ভ্রষ্ট পথে একমত হবে না”। মুস্তাদরাকে হাকিম (১/২০০-২০১) হাদীস নং- ৩৯৪, ৩৯৬, ৩৯৭, ৩৯৯, ৪০০। আরো দেখুন: আবুদাউদ (৪/৯৮) হাদীস নং- ৪২৫৩; তিরমিজি (৪/৪৬৬) হাদীস নং- ২১৬৭; ইবনে মাজা (২/১৩০৩) হাদীস নং- ৩৯৫০।

সুতরাং উম্মতের সবাই যদি কোনো ব্যাপারে একমত হয়, তাহলে তাও আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুমতিক্রমেই হবে। আর তা হবে গ্রহণযোগ্য। পূর্ববর্তী কোনো দ্বীনের ক্ষেত্রে তাদের নবীর মুখ থেকে এরকম কোনো অভয়বাণী শোনানো হয় নি। ফলে তাদের সবাই একমত হলেই সে মতটি সঠিক হওয়ার গ্যারান্টি নেই। অথচ অল্প জ্ঞানী লোকজন ইজমার বয়ান করে চলেছেন সমাজে!

আজকে সমাজের দিকে লক্ষ্য করলে সহজে বুঝা যায় যে আহলে সুন্নাত জামায়াতের স্ফলারগণ অন্যান্য প্রচলিত বিভিন্ন ফেরকার

নিজস্ব মতামত গ্রহণ করছেন না। তারা কুরআন ও সহিহ হাদীসের বাইরে কোনো মতামত গ্রহণ করেন না। ব্যক্তিগত কোনো মতামত তারা গ্রহণ করেন না।

অতএব ইজমা ইজমা করে যারা নতুন বিষয় দ্বীনে প্রবেশ করাচ্ছেন তারা মূলত ইজমা নিয়ে মানুষকে বোকা বানাচ্ছেন। আজকে সমাজে কিছু সংখ্যক আলেম ইজমা ইজমা করছেন অথচ সালাফি স্কলারগণ রীতিমত তাদের বিরোধিতা করছেন! তাহলে ইজমা হলো কিভাবে?

“যে আমাদের এ ধর্মে এমন কোন নতুন বিষয় উদ্ভাবন করবে যা ধর্মে অন্তর্ভুক্ত ছিল না তা প্রত্যাখ্যাত হবে”। (বুখারী ও মুসলিম)

অনেক স্কলারদের মতে চার খলিফার পরে উম্মতের মধ্যে ইজমা হওয়ার আর কোনো সুযোগ নাই!

ইজমার উদাহরণ হচ্ছে যেমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য পাচ ওয়াক্ত ১৭ রাকাত সালাত ফরজ। এই ফরজ কম করা যাবে না বা বেশিও করা যাবে না। এটাই হচ্ছে ইজমা। কেউ যদি বলে ১৭ রাকাত না ১৮ রাকাত বা ১৯ রাকাত তবে তা গ্রহণ যোগ্য হবে না!

এটাই ইজমা যে ১৭ রাকাত ফরজ সালাত। এটা ১৪৫০ বছর আগে থেকেই প্রকাশিত একটা বিষয় এবং তা কোন নতুন বিষয় নয়। কেউ যদি বলে বিতর সালাত ফরজ এটা ইজমা তাহলে এটা ভুল! ফরজ তো অবশ্যই নয়। বিতর সালাত সুন্নাতে মুয়াক্কাদা অর্থাৎ খুব গুরুত্ব পূর্ণ ঠিক যেমন ফজরের সুন্নত সালাত খুব গুরুত্ব পূর্ণ, যদিও কেউ কেউ ওয়াজিব বলেছেন! তবে অধিকাংশ স্কলারদের মতে এটা সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ। লক্ষণীয় বিষয় কেউ যদি বলে বিতর ফরজ বা

ওয়াজিব এটা ইজমা তাহলে ভুল! উপরের হাদীস লক্ষ্য করেন "একমত হবে না" অর্থাৎ অধিকাংশ স্কলার সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ বলেছেন যদিও কেউ কেউ ওয়াজিব বলেছেন। কিন্তু সবাই একমত দৈনিক পাচ ওয়াক্ত সালাত ফরজ। চার ওয়াক্ত নয় আবার ছয় ওয়াক্তও নয়। এটাই ইজমা।

যাকাত ফরজ এটা ইজমা। সিয়াম ফরজ এটা ইজমা। ইসলামী শরীয়তের (আইনের) চতুর্থ উৎস হলো কিয়াসঃ যা নির্ভর করে পূর্ববর্তী তিনটি উৎসের উপর। সুতরাং এটাও মনগড়া কিছু নয়।

কিয়াস হচ্ছে কুরআন ও হাদীসকে কেয়ামত পর্যন্ত সংযোগ স্থাপন করা। এটা নতুন কোনো বানানো বিষয় নয়। এর ছোট্ট একটা উদাহরণ হলো এই কাগজে কুরআন লেখা কি নিষেধ? এখানে কিয়াস হচ্ছে অবশ্যই না। কারণ তৎকালীন সময়ে চামড়ায় গাছের পাতায় বাকলে লেখা হত, যদি কাগজ থাকত তবে কাগজেও লেখা হত। এই যে ১৪৫০ বছর আগে নাজিল হওয়া কুরআনের বিধান বর্তমান সময়ে সমন্বয় করা এটাই কিয়াস।

বিব্লাল (রাঃ) কে উচ্চ স্বরে আজান দিতে বলা হত যাতে বেশি দূর পর্যন্ত লোকে আজান শুনতে পায়!। এবং এক অন্ধ লোককে আজান শুনতে পেলে মসজিদে হাজির হওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। আজান যত বেশি দূর পর্যন্ত পৌছবে তত সয়াব অর্জনের কথা হাদীসে এসেছে। ইসলাম জীবনের প্রয়োজনে নতুন টেকনোলজি ব্যবহার নিষেধ করে না। অতএব বুঝা যাচ্ছে যদি তখন মাইক

থাকত তাহলে মাইক ব্যবহার করা হত। মাইক ব্যবহার দ্বীন ইসলামের বিধান পরিবর্তন করে না। এ বিষয়ে কুরআনের আয়াতেও তার প্রমাণ বহন করে। যেমনঃ সূরা আসসাফফাতের ৯৬নং আয়াতে বলা হয়েছে যে,

وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ

অথচ আল্লাহই তোমাদেরকে এবং তোমরা যা কর তা সৃষ্টি করেছেন? সুতরাং, এই আয়াতের আলোকে বলা যায় যে, “যে ইসলামে কোন ভাল পদ্ধতি প্রচলন করল সে উহার সওয়াব পাবে এবং সেই পদ্ধতি অনুযায়ী যারা কাজ করবে তাদের সওয়াবও সে পাবে, তাতে তাদের সওয়াবে কোন কমতি হবে না। আর যে ব্যক্তি ইসলামে কোন খারাপ পদ্ধতি প্রবর্তন করবে সে উহার পাপ বহন করবে, এবং যারা সেই পদ্ধতি অনুসরণ করবে তাদের পাপও সে বহন করবে, তাতে তাদের পাপের কোন কমতি হবে না”। (সহীহ মুসলিম)।

উপরোক্ত কুরআন ও হাদীসের আলোকে এই যে সংযোজন অর্থাৎ কানেক্টিভিটি ১৪৫০ বছর আগের কুরআন ও হাদীসের বাণীর সাথে এটাই হচ্ছে কিয়াস। যেমন - নতুন বিষয় সৃষ্টি করা যেমনঃ টেলিভিশন, ইন্টারনেট, কম্পিউটার ইত্যাদি সৃষ্টি করার নামই হলো কিয়াস যা কুরআন ও হাদীসেই বহু আগে উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ সমাজে দ্বীনের নাম নতুন বিষয় সংযোজন করে বলা হচ্ছে এটা কিয়াস! কিন্তু দ্বীনের মধ্যে প্রত্যেক নতুন সংযোজন বিদ’আত বলে কুরআন ও হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে যা গোমরাহী এবং যার

পরিণাম জাহান্নাম। বিষয়টিকে আরও পরিষ্কার ভাবে বলা যায় যে,-

প্রশ্ন - টেলিভিশন স্ক্রিনে ইসলামিক লেকচার শুনা জায়েজ কিনা?

রাসুল (সাঃ) কে দেয়ালে দৃশ্য পটে জান্নাত ও জাহান্নাম দেখিয়েছেন আল্লাহ! আবার আল্লাহ বায়তুল মুকাদ্দাস রাসুল (সাঃ) কে চোখের সামনে তুলে ধরেছেন স্ক্রিনের মত করে !

এখন কিয়াস হচ্ছে কানেক্টিভিটি। এর প্রেক্ষিতে স্ক্রিনে ইসলামিক প্রোগ্রাম জায়েজ। সংবাদ পরিবেশন জায়েজ। এটাই কিয়াস। একইভাবে স্ক্রিন নাজায়েজ কাজে ব্যবহার নিষেধ যেমন নাটক, নাচ, গান !

ওপেন হার্ট সার্জারীর জন্য বুকি নেয়া কি জায়েজ? কুরআন সুন্নাহ এর উদাহরণ আছে কিনা? রাসুল (সাঃ) কে প্রায় তিনবার বুক চিরে হার্ট পরিষ্কার করা হয়েছে। এখন কিয়াস হচ্ছে কানেক্টিভিটি। ১৪৫০ বছর আগের কুরআন ও সুন্নাহ অনুসারে বর্তমান সময়ের সমস্যার সমন্বয় ভিত্তিক সমাধান। কিয়াস হচ্ছে ওপেন হার্ট সার্জারী করা যাবে! রাসুল (সাঃ) এর জীবনে আমাদের জন্য রয়েছে আদর্শ। এটাই হচ্ছে কিয়াস। অর্থাৎ কুরআন ও হাদীসের বাইরে নয়। অতএব কিয়াসের নামে কুরআন ও সুন্নাহের বিপরীত কোনো বিষয় গ্রহণ করা কিভাবে সমীচীন হবে?

“যে আমাদের এ ধর্মে এমন কোন নতুন বিষয় উদ্ভাবন করবে যা ধর্মে অন্তর্ভুক্ত ছিল না তা প্রত্যাখ্যাত হবে”। (বুখারী ও মুসলিম)

একই ভাবে বাসে চড়া বিমানে চড়া, মেশিনে কাপড় সেলাই জায়েজ কিনা, মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা জায়েজ কিনা এগুলো সম্পর্কে মাসাআলা

কিয়াসের ভিত্তিতে হয়। কিন্তু দ্বীন ইসলামের কোনো বিষয়ই হের ফের করার সুযোগ নেই। অতএব আমরা বুঝতে পারছি যে, ইসলাম এমন একটি দ্বীনের নাম, যা সম্পূর্ণভাবে অবিকৃত রয়েছে। আর তার বিধানসমূহে বাইরের কোনো প্রভাব সেখানে পড়ে নি। যেহেতু আল্লাহ তা‘আলাই এ বিধান দিয়েছেন, আর জ্ঞান-বিজ্ঞানও তাঁর পক্ষ থেকেই দেয়া নেয়ামত বিশেষ, সেহেতু এ দু’টি কখনও পরস্পর বিরোধী হতে পারে না। বাস্তবেও তা ঘটে নি।

আল্লাহর কুরআনের কোনো আয়াত, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কোনো সহিহ হাদীস বিজ্ঞানে-পরীক্ষিত কোনো ধ্রুবসত্যের বিরোধী হয়েছে— এমন কোনো প্রমাণ আজও কেউ দিতে পারে নি। যদিও কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের কোনো কোনো থিওরি প্রাথমিকভাবে আল-কুরআন ও সহিহ হাদীসের সাথে বিরোধী হয়েছে এমন মনে হয়ে থাকে, তথাপি সেখানে আল্লাহর কুরআন ও সহিহ হাদীসই মূলত গ্রহণযোগ্য হবে, কারণ এ সমস্ত প্রাথমিক থিওরি (যা পরীক্ষিত সত্য বলে প্রমাণিত হয় নি তা) পরিবর্তনশীল। আল্লাহর কুরআনের কোনো আয়াত, আর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোনো সহিহ হাদীস পরিবর্তনশীল নয়। হাঁ, কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাড়াহুড়া করে অনেকেই সঠিক অর্থ ও ব্যাখ্যা অনুধাবন করতে পারেন না। সে ক্ষেত্রে দরকার প্রকৃত জ্ঞানীর কাছে ফিরে যাওয়া।

আর ইসলাম জ্ঞান-বিজ্ঞানকে উৎসাহিত করেছে, জ্ঞান অর্জনকে ফরয করেছে। অন্যান্য ধর্মের মত নিরুৎসাহিত করে নি। ইসলামে

বিজ্ঞানীদের যে কদর আছে, অন্যান্য ধর্মের সাথে এর কোনো তুলনাই চলতে পারে না।

সুতরাং দীন (ইসলাম) এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান পরস্পর বিরোধী বলা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। আর তাই ইসলামী বিধান বাস্তবায়নে এ সন্দেহের অবতারণা করা বাতুলতা মাত্র।

রাসুল (সাঃ) নির্দেশ দিয়েছেন কুরআন ও সুন্নাহ কে আকড়ে ধরতে। ইজমা ও কিয়াস কুরআন ও সুন্নাহেরই অংশ। বাইরের কিছু নয়। দ্বীন ইসলাম পরিপূর্ণ।

নতুন সংযোজন বা বিয়োজনের কোনো সুযোগ নাই। তাহলে কিভাবে ইজমার নামে কিয়াসের নামে নতুন বিষয় ইসলামে প্রবেশ করানো সম্ভব?

উল্লেখ্য যে ইজমা কিয়াস নিয়ে মুয়াজ ইবনে জাবাল (রাঃ) এর যে একটি হাদীস প্রচলিত আছে সেটা জাল! হাদীসটি কেন জাল তার উদাহরন দিলেই এর স্পষ্টতা প্রমানিত হবে ইনশা আল্লাহ।

মুআয (রাঃ) এর সঙ্গীগণ থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (সাঃ) মুআয (রাঃ) কে ইয়েমেনে পাঠানোর সময় প্রশ্ন করলেন, তুমি কিভাবে বিচার করবে? তিনি বললেন, আমি আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী বিচার করব। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, যদি আল্লাহর কিতাবে না পাওয়া যায়? তিনি বললেন, তাহলে রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর সুন্নাহ (হাদীস) অনুযায়ী বিচার করব।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, যদি সুন্নাহতেও না পাও? তিনি বললেন, আমি আমার জ্ঞান বুদ্ধি দিয়ে ইজতিহাদ (গবেষণা) করব। তিনি

(সাঃ) বললেন, সকল প্রশংসা সেই আল্লাহর যিনি আল্লাহর রসূলের প্রতিনিধিকে এরূপ যোগ্যতা দান করেছেন। (তথ্যসূত্রঃ তিরমিযী, অধ্যায়ঃ ১৩, কিতাবুল আহকাম, অনুচ্ছেদঃ ৩, বিচার কিভাবে ফায়সালা করবে, হাদীস নং ১৩২৭)

সুতরাং, উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, আলহামদুলিল্লাহ আমাদের মুসলিমদের সত্য মিথ্যা যাচাই করার ক্ষমতা আছে। আসল বিষয় হচ্ছে, এই হাদীসটি যইফ। যইফ ৩টি কারনে যা নিম্নে আলোচনা করা হলো:-

- ১) বর্ণনাকারী মুআয (রাঃ) এর সঙ্গীগণ মাজহুল,
- ২) সনদে হারেস ইবনুল আমর মাজহুল (অপরিচিত) এবং
- ৩) হাদীসটি মুরসাল।

ইমাম বুখারী (রাঃ) বলেন, হাদীসটি সহীহ নয়। ইবনু হাযম বলেন, এ হাদীসটি বাতিল, এর কোন ভিত্তি নেই (তথ্যসূত্রঃ আত-তালখীস, পৃষ্ঠা নং - ৪০১)^{৬২৫}।

এজন্যই আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা'আলা মানবজাতির প্রতি রহমত স্বরূপ নাযিল করেছেন এক মহান শরীয়াহ্ তথা সার্বিক আইন ও বিধান যার ভিত্তিতে হতে পারে মানুষের যাবতীয় সমস্যার সার্থক সমাধান ও তাদের পারস্পরিক বিবাদ-বিসম্বাদের সুষ্ঠু মীমাংসা ও নিষ্পত্তি। তাঁর অবতারিত শরীয়ত তাঁর অগণিত অন্য সব নিয়ামতের মতই বিশ্বমানবতার প্রতি এক বিরাট রহমত হয়ে দেখা দিয়েছে। আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা'আলা বলেন,

^{৬২৫} আত-তালখীস, পৃষ্ঠা নং - ৪০১

﴿ثُمَّ جَعَلَ لَكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنْ أَلَمِ أَمِ رَفَاتٍ هَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوََاءَ
الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۝ ١٨﴾ [الجاثية : ١٨]

“এরপর আমি তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করেছি দীনের অন্তর্গত ‘শরীয়াহ্’
এর উপর, সুতরাং তুমি তার অনুসরণ কর। আর অজ্ঞদের খেয়াল-
খুশীর অনুসরণ করো না”। [আল-জাসিয়াহ : ১৮]

অতএব, উপরোক্ত আলোচনার সারাংশে বলতে পারি যে, আমাদের
মুসলিমদের অবশ্যই এ বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে কেউ যেন
ইজমা কিয়াসের নাম করে আমাদের ধোকা দিতে না পারে। আল্লাহ
সুবহানাহু ওয়া তা’আলা আমাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করুন,
আমীন।

অধ্যায় ছয় – প্রচলিত কুসংস্কার
অধ্যায় সাত – বিদ'আত প্রসঙ্গে ব্রেলভী এর নসিহত, বিদ'আতের ভয়াবহতা ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক আলোচনা
প্রথম পরিচ্ছেদ – বিদ'আত প্রসঙ্গে সাইয়েদ আহমদ ব্রেলভী (রহঃ) এর নসীহত
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ – বিদ'আতীর পরিচয়, বিদ'আতী চেনার উপায়, বিদ'আতী কাজের পরিণতি সম্বন্ধে শরীয়তের ফয়সালা কি, বিদ'আতের ভয়াবহতা এবং দ্বীনের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করা
তৃতীয় পরিচ্ছেদ – বিদ'আত প্রচলনে শয়তানের চক্রান্ত
চতুর্থ পরিচ্ছেদ – বিদ'আতের নিন্দা, তিরস্কার ও তা থেকে সতর্কতা প্রদর্শন
পঞ্চম পরিচ্ছেদ – বিদ'আত আবিষ্কারকের তাওবা
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ – বিদ'আত চেনার ব্যাপারে একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি
সপ্তম পরিচ্ছেদ – বিদ'আতের ভয়াবহতা
অষ্টম পরিচ্ছেদ – দ্বীনের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করা
নবম পরিচ্ছেদ – বিদ'আতের ব্যাপারে সাহাবীগণের অবস্থান
দশম তম পরিচ্ছেদ – সালাফ ও সালাফিয়াতের অনুসরণ এবং বিদ'আত বর্জন
এগার তম পরিচ্ছেদ – বিদ'আতের প্রভাবে জাতি কী হারিয়েছে?
বার তম পরিচ্ছেদ – বিদ'আতের সর্বগ্রাসী ছোবল থেকে মুসলিম উম্মাহকে রক্ষা করতে হবে
উপসংহার

অধ্যায় ছয় - প্রচলিত কুসংস্কার

আমাদের সমাজে অনেক বিদ'আতীয় প্রচলিত কুসংস্কার বিদ্যমান রয়েছে তার কয়েকটি নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ-

- ১) পরীক্ষা দিতে যাওয়ার পূর্বে ডিম খাওয়া যাবে না। তাহলে পরীক্ষায় ডিম (গোল্লা) পাবে।
- ২) খাবার সময় সালাম দিতে নেই।
- ৩) দোকানের প্রথম কাস্টমর ফেরত দিতে নাই।
- ৪) নতুন স্ত্রীকে নরম স্থানে বসতে দিলে মেজাজ নরম থাকবে।
- ৫) বিড়াল মারলে আড়াই কেজি লবণ দিতে হবে।
- ৬) ঔষধ খাওয়ার সময় 'বিসমিল্লাহ বললে' রোগ বেড়ে যাবে।
- ৭) জোড়া কলা খেলে জোড়া সন্তান জন্ম নিবে।
- ৮) রাতে নখ, চুল ইত্যাদি কাটতে নাই।
- ৯) চোখে কোন গোটা হলে ছোট বাচ্চাদের গোপনাঙ্গে লাগালে সুস্থ হয়ে যাবে।
- ১০) ভাই-বোন মিলে মুরগী জবেহ করা যাবে না।
- ১১) ঘরের ময়লা পানি রাতে বাইরে ফেলা যাবে না।
- ১২) ঘর থেকে কোন উদ্দেশ্যে বের হওয়ার পর পেছন থেকে ডাক দিলে যাত্রা অশুভ হবে।
- ১৩) ব্যাঙ ডাকলে বৃষ্টি হবে।
- ১৪) কুরআন মাজীদ হাত থেকে পড়ে গেলে আড়াই কেজি চাল দিতে হবে।

১৫) ছোট বাচ্চাদের দাঁত পড়লে ইঁদুরের গর্তে দাঁত ফেলতে বলা হয়, দাঁত ফেলার সময় বলতে শিখানো হয়, “ইঁদুর ভাই, ইঁদুর ভাই, তোর চিকন দাঁত টা দে, আমার মোটা দাঁত টা নে।”

১৬) মুরগীর মাথা খেলে মা-বাবার মৃত্যু দেখবে না।

১৭) বলা হয়, কেউ ঘর থেকে বের হলে পিছন দিকে ফিরে তাকানো নিষেধ। তাতে নাকি যাত্রা ভঙ্গ হয় বা অশুভ হয়।

১৮) ঘরের ভিতরে প্রবেশ কৃত রোদে অর্ধেক শরীর রেখে বসা যাবে না। (অর্থাৎ শরীরের কিছু অংশ রৌদ্রে আর কিছু অংশ বাহিরে) তাহলে জ্বর হবে।

১৯) রাতে বাঁশ কাটা যাবে না।

২০) রাতে গাছের পাতা ছিঁড়া যাবে না।

২১) ঘর থেকে বের হয়ে বিধবা নারী চোখে পড়লে যাত্রা অশুভ হবে।

২২) ঘরের চৌকাঠে বসা যাবে না।

২৩) মহিলাদের মাসিক অবস্থায় সবুজ কাপড় পরিধান করতে হবে। তার হাতের কিছু খাওয়া যাবে না।

২৪) বিধবা নারীকে সাদা কাপড় পরিধান করতে হবে।

২৫) ভাঙ্গা আয়না দিয়ে চেহারা দেখা যাবে না। তাতে চেহারা নষ্ট হয়ে যাবে।

২৬) ডান হাতের তালু চুলকালে টাকা আসবে। আর বাম হাতের তালু চুলকালে বিপদ আসবে।

- ২৭) নতুন কাপড় পরিধান করার পূর্বে আগুনে ছেক দিয়ে পড়তে হবে।
- ২৮) নতুন কাপড় পরিধান করার পর পিছনে তাকাতে নেই।
- ২৯) বৃষ্টির সময় রোদ দেখা দিলে বলা হয় শিয়ালের বিয়ে।
- ৩০) আশ্বিন মাসে নারী বিধবা হলে আর কোন দিন বিবাহ হবে না।
- ৩১) খানার পর যদি কেউ গা মোচড় দেয়, তবে বলা হয় খানা না কি কুকুরের পেটে চলে যায়।
- ৩২) রাতের বেলা কাউকে সুই-সূতা দিতে নাই।
- ৩৩) গেঞ্জি ও গামছা ছিঁড়ে গেলে সেলাই করতে নাই।
- ৩৪) খালি ঘরে সন্ধ্যার সময় বাতি দিতে হয়। না হলে ঘরে বিপদ আসে।
- ৩৫) গোছলের পর শরীরে তেল মাখার পূর্বে কোন কিছু খেতে নেই।
- ৩৬) মহিলার পেটে বাচ্চা থাকলে কিছু কাটা-কাটি বা জবেহ করা যাবে না।
- ৩৭) পাতিলের মধ্যে খানা থাকা অবস্থায় তা খেলে পেট বড় হয়ে যাবে।
- ৩৮) কোন ব্যক্তি বাড়ি হতে বাহির হলে যদি তার সামনে খালি কলস পড়ে যায় বা কেউ খালি কলস নিয়ে তার সামনে দিয়ে অতিক্রম করে তখন সে যাত্রা বন্ধ করে দেয়, বলে আমার যাত্রা আজ শুভ হবে না।
- ৩৯) ছোট বাচ্চাদের হাতে লোহা পরিধান করাতে হবে।

৪০) রুমাল, ছাতা, হাত ঘড়ি ইত্যাদি কাউকে ধার স্বরূপ দেয়া যাবে না।

৪১) হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলে ভাগ্যে দুর্ভোগ আছে।

৪২) হাত থেকে প্লেট পড়ে গেলে মেহমান আসবে।

৪৩) নতুন স্ত্রী কোন ভাল কাজ করলে শুভ লক্ষণ।

৪৪) পাখি ডাকলে বলা হয় ইষ্টি কুটুম (আত্মীয়) আসবে।

৪৫) কাচা মরিচ হাতে দিতে নাই।

৪৬) তিন রাস্তার মোড়ে বসতে নাই।

৪৭) খানার সময় যদি কারো ঢেকুর আসে বা মাথার তালুতে উঠে যায়, তখন একজন আরেকজনকে বলে, দোস্তু তাকে যেন কেউ স্মরণ করছে বা বলা হয় তাকে গালি দিচ্ছে।

৪৮) কাক ডাকলে বিপদ আসবে।

৪৯) শুঁকুন ডাকলে মানুষ মারা যাবে।

৫০) পেঁচা ডাকলে বিপদ আসবে।

৫১) তিনজন একই সাথে চলা যাবে না।

৫২) দুজনে ঘরে বসে কোথাও কথা বলতে লাগলে হঠাৎ টিকটিকির আওয়াজ শুনা যায়, তখন একজন অন্যজনকে বলে উঠে ‘দোস্তু তোর কথা সত্য, কারণ দেখছস না, টিকটিকি ঠিক ঠিক বলেছে।’

৫৩) একজন অন্য জনের মাথায় টোকা খেলে দ্বিতীয় বার টোকা দিতে হবে, একবার টোকা খাওয়া যাবে না। নতুবা মাথায় ব্যথা হবে/শিং উঠবে।

৫৪) ভাত প্লেটে নেওয়ার সময় একবার নিতে নাই।

৫৫) নতুন জামাই বাজার না করা পর্যন্ত একই খানা খাওয়াতে হবে।

৫৬) নতুন স্ত্রীকে স্বামীর বাড়িতে প্রথম পর্যায়ে আড়াই দিন অবস্থান করতে হবে।

৫৭) পাতিলের মধ্যে খানা খেলে মেয়ে সন্তান জন্ম নিবে।

৫৮) পোড়া খানা খেলে সাতার শিখবে।

৫৯) পিপড়া বা জল পোকা খেলে সাতার শিখবে।

৬০) দাঁত উঠতে বিলম্ব হলে সাত ঘরের চাউল উঠিয়ে তা পাক করে কাককে খাওয়াতে হবে এবং নিজেকেও খেতে হবে।

৬১) সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠেই ঘর ঝাড়ু দেয়ার পূর্বে কাউকে কোন কিছু দেয়া যাবে না।

৬২) রাতের বেলা কোন কিছু লেন-দেন করা যাবে না।

৬৩) সকাল বেলা দোকান খুলে যাত্রা (নগদ বিক্রি) না করে কাউকে বাকী দেয়া যাবে না। তাহলে সারা দিন বাকীই যাবে।

৬৪) দাঁড়ী-পাল্লা, মাপার জিনিস পায়ে লাগলে বা হাত থেকে নিচে পড়ে গেলে সালাম করতে হবে, না হলে লক্ষ্মী চলে যাবে।

৬৫) শুকরের নাম মুখে নিলে ৪০দিন মুখ নাপাক থাকে।

৬৬) রাতের বেলা কাউকে চুন ধার দিলে চুন না বলে ধই বলতে হয়।

৬৭) বাড়ি থেকে বের হলে রাস্তায় যদি হোঁচট খেয়ে পড়ে যায় তাহলে যাত্রা অশুভ হবে।

- ৬৮) কোন ফসলের জমিতে বা ফল গাছে যাতে নয়র না লাগে সে জন্য মাটির পাতিল সাদা-কালো রং করে ঝুলিয়ে রাখতে হবে।
- ৬৯) বিনা ওয়ুতে বড় পীর (!!) আবদুল কাদের জিলানীর নাম নিলে আড়াইটা পশম পড়ে যাবে।
- ৭০) নখ চুল কেটে মাটিতে দাফন করতে হবে, কেননা বলা হয় কিয়ামতের দিন এগুলো খুঁজে বের করতে হবে।
- ৭১) নতুন স্ত্রীকে দুলা ভাই কোলে করে ঘরে আনতে হবে।
- ৭২) মহিলাগণ হাতে বালা বা চুড়ি না পড়লে স্বামীর অমঙ্গল হবে।
- ৭৩) স্ত্রীগণ তাদের নাকে নাক ফুল না রাখলে স্বামীর বেঁচে না থাকার প্রমাণ।
- ৭৪) দা, কাচি বা ছুরি ডিঙ্গিয়ে গেলে হাত-পা কেটে যাবে।
- ৭৫) গলায় কাটা বিঁধলে বিড়ালের পা ধরে মাপ চাইতে হবে।
- ৭৬) বেঁচা কেনার সময় জোড় সংখ্যা রাখা যাবে না। যেমন, এক লক্ষ টাকা হলে তদস্থলে এক লক্ষ এক টাকা দিতে হবে। যেমন, দেন মোহর (কাবীন) এর সময় করে থাকে, একলক্ষ এক টাকা ধার্য করা হয়।
- ৭৭) বন্ধু মহলে কয়েকজন বসে গল্প-গুজব করছে, তখন তাদের মধ্যে অনুপস্থিত কাউকে নিয়ে কথা চলছে, এমনতাবস্থায় সে উপস্থিত হলে, কেউ কেউ বলে উঠে “দোস্তু তোর হায়াত আছে।” কারণ একটু আগেই তোর কথা বলছিলাম।
- ৭৮) হঠাৎ বাম চোখ কাঁপলে দুঃখ আসে।

৭৯) বাড়ী থেকে কোথাও জাওয়ার উদ্দেশে বেড় হলে সে সময় বাড়ির কেউ পেছন থেকে ডাক লে অমঙ্গল হয়।

৮০) স্বামীর নাম বলা জাবে না এতে অমঙ্গল হয়।

৮১) বাছুর এর গলায় জুতার টুকরা ঝুলালে কারো কু দৃষ্টি থেকে বাচা যায়। (তথ্যসূত্রঃ সংকলনেঃ জাহিদুল ইসলাম - সম্পাদনায়ঃ আব্দুল্লাহিল হাদী)।

৮২) স্ত্রী তার স্বামীর নাম ধরে ডাকতে পারবে না। অথচ হাদীসে স্পষ্টতা রয়েছে যে, স্ত্রী তার স্বামীকে নাম ধরে ডাকতে পারবে। যেমন - স্ত্রীর নিকট স্বামী হ'লেন সবচেয়ে সম্মানের পাত্র। অতএব যেভাবে ডাকলে স্বামী খুশি হবেন সেভাবে ডাকা উচিত। তবে স্বামী অসন্তুষ্ট না হলে স্ত্রী স্বামীর নাম ধরে ডাকতে পারে। যেমন যয়নব রাসূল (ছাঃ)-এর সামনে তার স্বামী আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ)-এর নাম ধরে কথা বলেছিলেন (বুখারী হা/১৪৬২)।

এছাড়াও অসংখ্য দৃশ্য, কথা ও কর্মে মানুষের অশুভ ধারণা হয়। যেমন রাস্তায় বের হয়ে নারীদের সাথে দেখা হ'লে উদ্দেশ্য হাছিল হয় না। বাড়ি থেকে বের হওয়ার পর পুনরায় ফিরে গেলে উদ্দেশ্য পূরণ হয় না। পিছন হ'তে ডাকলে যাত্রা শুভ হয় না। রাতে ঘরের আবর্জনা ঝাড়ু দিয়ে বাইরে ফেলা যায় না। রাতে মানুষকে টাকা ধার দেয়া যায় না। রাতে ও সকালে বাকী বিক্রি করা যায় না। রাতে গাছের ফল পাড়া যায় না, রাতে লোহা নিয়ে বের না হ'লে বাচ্চাকে চোরা চুন্নি পাখিতে ধরে নেয়। জময় কলা খেলে জময় সন্তান হয়। গরুকে লাথি মারা যায় না। জুতা পায়ে দিয়ে শস্য ক্ষেতে বা শস্যের

উপর যাওয়া যায় না। ঘরের উপর কাক ডাকলে মেহমান আসে। হাত হ'তে গ্লাস পড়লে মেহমান আসে। ছেলের মাথায় ঝাড়ু লাগানো যায় না, ছেলের মাথায় মায়ের আচল লাগানো যায় না। ইত্যাদি অগণিত কুসংস্কার আমাদের সমাজে চালু আছে। সেগুলোর বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষকে সচেতন করে তোলা ইমামের দায়িত্ব। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

‘মনে রেখ, আল্লাহর কাছেই রয়েছে তাদের কুলক্ষণসমূহের চাবিকাঠি। কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোকই তা বুঝে না’ (সূরা আ'রাফ ৭/১৩১)। তিনি অন্যত্র বলেন,

قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِن لَّمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ
قَالُوا طَائِرُكُم مَّعَكُمْ

‘জনগণ রাসূলগণকে বলল, আমরা তোমাদের অশুভ কুলক্ষণে মনে করছি। যদি তোমরা বিরত না হও, তবে অবশ্যই তোমাদের পাথর দ্বারা হত্যা করব এবং আমাদের পক্ষ থেকে তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি স্পর্শ করবে। তখন রাসূলগণ বললেন, তোমাদের অশুভ কুলক্ষণ তোমাদের সাথে রয়েছে’ (সূরা ইয়াসীন ১৮-১৯)।

অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মুসলিম জাতিকে সর্বপ্রকার কুলক্ষণকে পরিহার করতে বলেছেন। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন,

لَا عَذْوَى وَلَا هَامَةٌ وَلَا صَفَرٌ فِي رَوَايَةٍ وَلَا نَوْءٌ وَلَا صَفَرٌ وَلَا غَوْلٌ

‘দ্বীন ইসলামে সংক্রামক ব্যাধি, কুলক্ষণ, পেঁচা পাখির ডাকের মন্দ প্রতিক্রিয়া, পেটে পীড়াদায়ক সাপ, নক্ষত্রের প্রভাবে বৃষ্টিপাত ও ভূত বা দৈত বলে কিছু নেই’^{৬২৬}।

ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, ‘কুলক্ষণ বা অশুভ ধারণা যে ব্যক্তিকে তার স্বীয় প্রয়োজন, দায়িত্ব ও কর্তব্য থেকে দূরে রাখল, সে মূলতঃ শিরক করল। ছাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, এর কাঙ্ক্ষারা কী?

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, এ কথা বল যে, ‘হে আল্লাহ! তোমার মঙ্গল ব্যতীত কোন মঙ্গল নেই। তোমার অশুভ ছাড়া কোন অশুভ নেই এবং তুমি ছাড়া কোন মা’বুদ নেই’^{৬২৭}। এভাবে কুরআন ও সহীহ হাদীস ভিত্তিক আলোচনার মাধ্যমে সমাজে প্রচলিত নানাবিধ কুসংস্কার হতে মুছল্লীদের মুক্ত রাখতে ইমামগণ সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাবেন।

বিভিন্ন দিবস পালন, বর্ষবরণ ও বিদায়, কবর ও মাযারে নযর-নেওয়ায পেশ, শহীদ মিনার ও স্মৃতিস্তম্ভে পুষ্পস্তবক অর্পণ, মৃতব্যক্তির স্মরণে দাঁড়িয়ে ১ মিনিট নীরবতা পালন, শিখা অনির্বাণ, শিখা চিরন্তন, প্রসিদ্ধ ব্যক্তির স্মৃতির জন্য মূর্তি ও ভাস্কর্য নির্মাণ, অফিস-আদালত ও শিক্ষা পতিষ্ঠানে ছবি ঝুলানো ইত্যাদির বিরুদ্ধে ইমামগণ আলোচনা করে মানুষকে সচেতন করতে পারেন। এছাড়া বিবাহে যৌতুক প্রথা, বর-কনেকে গোসল করানো, ক্ষির খাওয়ানো

^{৬২৬} বুখারী হা/৫৭১৭; মুসলিম হা/৫৯৩০; মিশকাত হা/৪৫৭৮-৪৫৭৯

^{৬২৭} আহমাদ হা/৭০৪৫; সিলসিলা [হীহা হা/১০৬৫, সনদ হাসান।

ইত্যাদি কুসংস্কার চালু আছে। এসব উৎখাতে ইমামগণ বিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারেন।

উপরোক্ত আলোচনার সারাংশে বলা যায় যে, এভাবে অসংখ্য বিদ'আত ও প্রচলিত কুসংস্কার আমাদের সমাজে জেঁকে বসে আছে যেগুলোর প্রতিবাদ করতে গেলেও হয়ত প্রতিবাদকারীকে উল্টো বিদআতী উপাধী নিয়ে ফিরে আসতে হবে। তবে বর্তমানে জ্ঞান চর্চার অবাধ সুযোগে আমাদের নতুন প্রজন্ম, যুব সমাজ, তরুন আলেম সমাজ সবাই যদি উন্মুক্ত হৃদয়ে দ্বীনে ইসলামের বুক থেকে বিদআতের পাথরকে সরানোর জন্য তৎপর হয় তবে অদূর ভবিষ্যতে ইসলাম তার আগের মহিমায় ভাস্বর হবে। ইসলামের প্রকৃত সৌন্দর্য্যে ভরে উঠবে আমাদের সপ্নিল বসুন্ধরা। আল্লাহ আমাদের সাহায্য করুন। আমীন।

উল্লেখিত কাজ সমূহ নাবী (ﷺ) বা সাহাবায়ে কেরাম দ্বারা প্রমানিত নয় বা তারা কখনও এসব বিদাতী আমল করে নি বরং আমাদের উচিত রাসূল (ﷺ) ও তার হিদায়েতপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদীনের সুনতের অনুসরণ করা। আর এসব বিদ'আতী মূলক কাজ পরিহার করা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর সুন্যাহকে আঁকড়ে ধরতে উৎসাহিত করেছেন। তিনি আরও বলেছেনঃ

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ مَعْدَانَ، قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرِو السَّلْمِيِّ، وَحُجْرُ بْنُ حُجْرٍ، قَالَا أَتَيْنَا الْعِرْبَاضَ بْنَ سَارِيَةَ وَهُوَ مِمَّنْ نَزَلَ فِيهِ { وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا

أَتَوَكَّ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتُ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ { فَسَلَّمْنَا وَقُلْنَا أَتَيْنَاكَ زَائِرِينَ وَعَائِدِينَ وَمُقْتَبِسِينَ . فَقَالَ الْعُرَبَاءُ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا فَوَعظَنَا مَوْعِظَةً بَلِيغَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ فَقَالَ قَائِلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَأَنَّ هَذِهِ مَوْعِظَةٌ مُودِّعٌ فَمَاذَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا فَقَالَ " أَوْصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بِعَدِي فَسَبْرِي اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعِصُوا عَنْهَا بِالتَّوَّاجِدِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحَدَّثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحَدَّثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ "

আহমদ ইবন হাম্বল (رحيمه الله) ... হাজার ইবন হাজার (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ একদা আমরা ইরবায় ইবন সারিয়া (رضي الله عنه) - এর নিকট গমন করি, যার শানে এ আয়াত নাযিল হয়ঃ তাদের জন্য কোন অসুবিধা নেই, যারা আপনার নিকট এ জন্য আসে যে, আপনি তাদের জন্য বাহনের ব্যবস্থা করবেন। আপনি বলেনঃ আমি তো তোমাদের জন্য কোন বাহন পাই না। রাবী বলেনঃ আমরা তাঁর কাছে উপস্থিত হয়ে তাঁকে সালাম করি এবং বলি, “আমরা আপনাকে দেখার জন্য, আপনার খিদ্মতের জন্য এবং আপনার কাছ থেকে কিছু সংগ্রহের জন্য এসেছি।” তখন তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাদের সঙ্গে সালাত আদায়ের পর, আমাদের দিকে ফিরে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দেন, যাতে আমাদের চোখ অশ্রু ভারাক্রান্ত হয় এবং অন্তর ভীত-সন্ত্রস্ত হয়। আমাদের মধ্যে একজন বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ (ﷺ)! মনে হচ্ছে এ আপনার বিদায়ী ভাষণ, কাজেই আপনি আমাদের আরো কিছু

অছীয়ত করুন। তখন তিনি (ﷺ) বলেন, আমি তোমাদের তাকওয়া অবলম্বনের জন্য বলছি এবং শোনা ও মানার জন্যও, যদিও তোমাদের আমীর হাবশী গোলাম হয়। কেননা, তোমাদের মাঝে যারা আমার পরে জীবিত থাকবে, তারা বহু মতভেদ দেখতে পাবে। এমতাবস্থায় তোমাদের উচিত হবে আমার ও আমার খুলাফায়ে-রাশেদার সুন্নাহের অনুসরণ করা, যারা সত্য ও ন্যায়ের অনুসারী। তোমরা তাদের দৃঢ়ভাবে অনুসরণ করবে। তোমরা বিদ'আতের অনুসরণ ও অনুকরণ করা হতে দূরে থাকবে। কেননা, প্রত্যেক নতুন কথাই বিদ'আত এবং প্রত্যেক বিদ'আতই গুমরাহী^{৬২৮}। অতএব উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, যতটুকু ইবাদত কুরআন ও সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত ততটুকুই আল্লাহর নিকট গ্রহণীয়। কুরআন ও সহীহ হাদীস বহির্ভূত আমল মানুষের নিকট যত ভাল কাজ হিসাবে বিবেচিত হোক না কেন তা অবশ্যই বর্জনীয় এবং বিদ'আত হিসাবে পরিগণিত হবে তাতে কোন প্রকার সন্দেহ নেই। অথচ আজ বর্তমান মুসলিম বিশ্বে তথা বাংলাদেশ মুসলিম দেশসহ সকল মানব জাতি বিভিন্নভাবে আল্লাহর নৈকট্য হাছিলের চেষ্টায় ব্যস্ত। কেউ মূর্তি পূজার মাধ্যমে, কেউ কবর পূজার মাধ্যমে, কেউ পীর পূজার মাধ্যমে, আবার কেউবা ভাল কাজের দোহাই দিয়ে বিদ'আতের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য হাছিলে সচেষ্ট। অথচ আল্লাহ তা'আলা মানব জাতিকে তাঁর নাযিলকৃত বিধানের যথাযথ অনুসরণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। মানুষ প্রত্যেকটি ইবাদত

৬২৮ সুন্নাহ আবু দাউদ :: কিতাব আস-সুন্নাহ অধ্যায় ৪২, হাদীস ৪৬০৭

কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে সম্পাদন করবে। আর এর মাধ্যমেই কেবল তাঁর নৈকট্য হাসিল করা সম্ভব। আল্লাহ সুবহানু তা‘আলা তাই পবিত্র কুরআনে বলেছেনঃ

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِيعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا
-وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا-

‘হে নবী! আল্লাহ্ কে ভয় কর এবং কাফের ও মুনাফিকদের আনুগত্য করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সম্যক জ্ঞানী, মহা প্রজ্ঞাময়। আর তোমার রবের কাছ থেকে তোমার প্রতি যা অহী করা হয়, তুমি তার অনুসরণ কর। নিশ্চয়ই তোমরা যা কর সে সম্পর্কে আল্লাহ সম্যক অবহিত’^{৬২৯}। তিনি অন্যত্র বলেনঃ

اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ

‘তুমি তার অনুসরণ কর, যা তোমার প্রতি অহী করা হয়েছে তোমার রবের পক্ষ থেকে। তিনি ব্যতীত কোন সত্য ইলাহ নেই। আর মুশরিকদের থেকে বিমুখ থাক’ (আন‘আম ৬/১০৬)। তিনি অন্যত্র বলেন,

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

‘অতঃপর আমি তোমাকে দ্বীনের এক বিশেষ বিধানের উপর প্রতিষ্ঠিত করেছি। সুতরাং তুমি তার অনুসরণ কর এবং যারা জানে না তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ কর না’^{৬৩০} অতএব একমাত্র অহি-র বিধানের অনুসরণ করতে হবে। অহি-র বিধান বহির্ভূত

৬২৯ সূরা আহযাব, আয়াত - ১-২

৬৩০ সূরা জাসিয়া ৪৫/১৮

আমল করলে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত হ'তে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ

‘এটাই আমার সরল-সঠিক পথ। সুতরাং তোমরা এরই অনুসরণ করবে এবং ভিন্ন পথ অনুসরণ করবে না, করলে তা তোমাদেরকে তাঁর পথ হ'তে বিচ্ছিন্ন করে দিবে’ (সূরা আন‘আম ৬/১৫৩)^{৬৩১}। অত্র আয়াতে আল্লাহ তা'আলা যেমনভাবে তাঁর সরল-সঠিক পথ তথা সুন্নাহের পথের অনুসরণের নির্দেশ দিয়েছেন, তেমনিভাবে তাকে ধ্বংসকারী পথ তথা বিদ‘আতের পথ থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি অন্যত্র বলেন,

فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

‘যে ব্যক্তি ত্বাগূতকে অস্বীকার করবে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে সে এমন এক মযবূত হাতল ধরবে যা কখনো ভাঙবে না। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, প্রজ্ঞাময়’^{৬৩২}। তিনি অন্যত্র বলেন,

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ

‘আল্লাহর ইবাদত করার ও ত্বাগূতকে বর্জন করার নির্দেশ দেওয়ার জন্য আমি তো প্রত্যেক জাতির মধ্যেই রাসূল পাঠিয়েছি’^{৬৩৩}। তিনি অন্যত্র বলেন,

وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فَبَشِّرْ عِبَادِ

৬৩১ সূরা আনআম, আয়াত নং - ১৫৩

৬৩২ সূরা বাক্বারাহ ২/২৫৬

৬৩৩ সূরা নহল ১৬/৩৬

‘যারা ত্রাগূতের পূজা হতে দূরে থাকে এবং আল্লাহ অভিমুখী হয়, তাদের জন্য রয়েছে সুসংবাদ। অতএব আমার বান্দাদেরকে সুসংবাদ দাও’^{৬৩৪}। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন,

مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَرَّمَ اللَّهُ مَالَهُ وَدَمَهُ وَحَسَابُهُ عَلَى اللَّهِ
‘যে ব্যক্তি বলল, আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্য ইলাহ নেই এবং আল্লাহকে ছাড়া যাদের ইবাদত করা হয় তাদেরকে অস্বীকার করল, তার রক্ত ও সম্পদ (মুসলমানদের জন্য) হারাম এবং তার প্রতিদান আল্লাহর নিকটে রয়েছে। অতএব, মানুষ কিভাবে ইবাদত করবে তার বাস্তব রূপ মুহাম্মাদ (ﷺ) দেখিয়ে দিয়েছেন। তাই সঠিকভাবে আল্লাহর ইবাদত করার জন্য রাসূলুল্লাহ (ﷺ) - এর সুন্নাতের যথাযথ অনুসরণ করা আমাদের প্রত্যেক মুসলিম নর ও নারীর জন্য ওয়াজিব। সাথে সাথে তাঁর সুন্নাতকে ধ্বংসকারী বিদ'আত সম্পর্কে জানাও ওয়াজিব। প্রসিদ্ধ তাবে-তাঁবেই সুফিয়ান সাওরী (রহঃ) [১৬১ হিঃ] বলেন, “ইবলিসের কাছে গোনাহ ও পাপাচারের চেয়ে বিদ'আত বেশি প্রিয়। কারন গোনাহে লিপ্ত ব্যক্তির তাওবা করার সম্ভাবনা আছে কিন্তু বিদ'আতে লিপ্ত ব্যক্তির তাওবা করার সম্ভাবনা থাকে না”। সুতরাং, যারা বিদ'আত এর অপসারণ করে সুন্নতকে ফিরিয়ে আনবে তাঁদের সম্পর্কে বলা হয়েছে - “বান্ধবহীন স্বজনহীন ইসলামের অনুসারীদের জন্য সুসংবাদ যারা আমার পরে মানুষেরা আমার যেসকল সুন্নত নষ্ট করবে তা ঠিক করবে”। প্রকৃত হাদীসটি হচ্ছেঃ আবদুল্লাহ ইবন আবদুর রহমান (রঃ) কাছীর ইবন

আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবন আওফ ইবন কায়েস ইবন মিলহা তৎপিতা আবদুল্লাহ সূত্রে তৎপিতামহ আমর ইবন আওফ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ،
عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ " إِنَّ الْإِسْلَامَ بَدَأَ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَأَ فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ ". وَفِي
الْبَابِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُمَرَ وَجَابِرٍ وَأَنَسٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو. قَالَ أَبُو عِيسَى
هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ
حَدِيثِ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنِ الْأَعْمَشِ وَأَبُو الْأَحْوَصِ اسْمُهُ عَوْفُ بْنُ مَالِكِ بْنِ
نُضْلَةَ الْجُشَمِيِّ تَفَرَّدَ بِهِ حَفْصٌ.

সাপ যেমন সংকুচিত হয়ে আপন গর্তের দিকে প্রত্যাবর্তন করে তদ্রূপ দ্বীন ইসলামও একদিন সংকুচিত হয়ে হিজায়ে ফিরে আসবে এবং পাহাড়ী বকরী যেমন পাহাড়ের চুড়ায় মজবুত আশ্রয় গ্রহণ করে তেমনি দ্বীন ও হিজায়ে তার মজবুত আশ্রয় নিবে। দ্বীন শুরম্মতে ছিল অপরিচিত। অচিরেই তা আবার অপরিচিত অবস্থায় ফিরে আসবে। সুতরাং সে অবস্থায় ইসলামে আঁকড়ে ধরে থাকা সেসব লোকদের জন্য সুসংবাদ যারা আমার পরে মানুষদের দ্বারা বিকৃত হওয়া আমার সুন্নতকে পুনরুজ্জীবিত করে^{৬৩৫}। এই হাদীস দ্বারা স্পষ্ট সুসংবাদ দেয়া হয়েছে তাঁদের যারা নবীজীর হারিয়ে যাওয়া সুন্নতকে পুনরুজ্জীবিত করবে। তাই আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার সাথে সাথে তাকে ধ্বংসকারী বিদ'আত সম্পর্কে জানা

ওয়াজিব। কেননা বিদ'আত সম্পর্কে জানা না থাকলে সে কখন কিভাবে বিদ'আতে লিপ্ত হয়ে আল্লাহর সরল-সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হবে তা উপলব্ধি করতে পারবে না। সুতরাং, সঠিকভাবে জেনে বুঝে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করতে পারি আল্লাহ তা'আলা আমাদের সেই তৌফিক দান করুন, আমীন।

অধ্যায় সাত - বিদ'আত প্রসঙ্গে ব্রেলভী এর নসিহত,
বিদ'আতের ভয়াবহতা ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক আলোচনা
প্রথম পরিচ্ছেদ - বিদ'আত প্রসঙ্গে সাইয়েদ আহমদ ব্রেলভী
(রহঃ) এর নসীহত

সমাজের অপ্রতিরোধ্য চাপের কাছে নতি স্বীকার করে উপরের সকল খেলাফে-সুন্নাত কর্মকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে, বিভিন্ন ওজরখাহী করে, পূর্বে আলোচিত বিভিন্ন প্রকারে অপ্রাসঙ্গিক আয়াত ও হাদীসকে “অকাট্য দলিল” হিসাবে পেশ করে “জায়েয” বলেছেন কেউ কেউ। তবে কেউ বলেননি যে, এগুলি সুন্নাত বা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণ কখনো এগুলি করেছেন। অপরদিকে অনেক আলেম সমাজের কাছে নতি স্বীকার করতে চান নি। তাঁরা চেষ্টা করেছেন যেন আমাদের সমাজ অন্য সকল বিষয়ের মতো এ বিষয়েও অবিকল সুন্নাত অনুযায়ী চলেন। যাতে সুন্নাত জীবিত হয় এবং মুসলিমগণ নিশ্চিতরূপে সাওয়াব ও বরকত লাভ করেন। এ সকল আলেম ও বুজুর্গগণের একজন সাইয়েদ আহমদ ব্রেলভী (রহঃ)। তাঁর কিছু মূল্যবান নসহীহ রয়েছে বিদ'আত সম্বন্ধে। নিম্নে তা আলোচনা করা হলো:-

প্রথমত, সকল মৃত বুজুর্গ ও আপনজনের ক্ষেত্রেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবীগণের সুন্নাত হুবহু পালন করা ও প্রতিষ্ঠা করাই সর্বোত্তম। এজন্য কাফন, দাফন, জানাযা ও মাসনূন তিন দিনের শোক প্রকাশের বাইরে কোনো প্রকারের রুসূম না-মানা প্রয়োজন। বিবাহের ওলীমা ছাড়া সকল প্রকার খানাপিনার

আয়োজন ও রুসুম রেওয়াজ পরিত্যাগ করতে হবে। এক্ষেত্রে শুধুমাত্র রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কেই পেশওয়া, মুরব্বী ও আদর্শ মানতে হবে। তাঁর আদর্শকে সামনে রেখে পারসিক, রোমীয়, মধ্য এশিয়, ভারতীয় ইত্যাদি সকল রুসুম রেওয়াজ পরিত্যাগ করতে হবে। কারণ এগুলি সবই তাঁর ও তাঁর সাহাবীগণের প্রচলিত রীতি ও তাঁদের তরীকার অতিরিক্ত কর্ম। এগুলি বর্জন করতে হবে এবং এগুলির প্রতি নিজের ঘৃণা ও না-রাজি প্রকাশ করতে হবে।

দ্বিতীয়ত, এ সকল রুসুমাতের মধ্যে নিয়্যাতগত ও কর্মগত অনেক গোনাহের কাজ রয়েছে যার ফলে কেয়ামতের দিন এ সকল রুসুমাত পালনকারীকে কঠিন বিপদে পড়তে হবে। কেউ যদি একান্তই খালেস নিয়্যাতে, খালেসভাবে কোনোরকম দিনতারিখ স্থান বা পদ্ধতি নির্ধারণ না-করে কিছু খাওয়া দাওয়া করান তাহলে হয়ত তিনি সাওয়াব পাবেন। তবে তাকে মনে রাখতে হবে যে, মৃতকে সাওয়াব পাঠানো খানাপিনা করানোর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। দু'আ ও দানই মৃতের সাওয়াব পাঠানোর সুন্নাত-সম্মত পদ্ধতি। খানাপিনা করানো দানের একটি প্রকরণ মাত্র। সাহাবীগণ এক্ষেত্রে এই প্রকরণ ব্যবহার করেন নি বরং কূপ খনন, জমি বা বাগান ওয়াকফ করা ইত্যাদি কাজের মাধ্যমে দানের সাওয়াব প্রেরণ করেছেন। আমাদেরও এ সকল পদ্ধতিতে দান করা উচিত।

তৃতীয়ত, যদি আমরা এ সকল খেলাফে-সুন্নাত ও বিদ'আত রুসুম রেওয়াজ পরিত্যাগ করতে না-পারি, তাহলে অন্তত সুন্নাতকে পূর্ণাঙ্গ

মনে করতে হবে। কেউ যদি অবিকল সুন্নাহ পদ্ধতিতে হুবুহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণের মতো দু‘আ ও দানে রত থাকেন এবং সকল প্রকার কুলখানী, ইসালে সাওয়াব, ওরশ ইত্যাদি অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করেন, তাহলে তাঁকে উত্তম ও পরিপূর্ণ সুন্নাহের অনুসারী বলে মহববত করতে হবে। এভাবে সকল বিষয়ে সুন্নাহকে পরিপূর্ণ ও আমাদের রুসূমকে খেলাফে সুন্নাহ ও বিশেষ প্রয়োজনে বা বাধ্য হয়ে করছি বলে মনে করতে হবে^{৬৩৬}।

আল্লাহ তা‘আলা আমাদেরকে সকল বিষয়ে সুন্নাহ তরীকা অবলম্বনের তাওফীক দান করুন। আমীন!!

এ প্রসঙ্গে ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া আরো উল্লেখ করেন যে, মৃত ব্যক্তির জন্য করণীয় কাজসমূহের দ্বারা তার কাছে কী সাওয়াব পৌঁছে না কি সেটার অসীলা দ্বারা দো‘আ করা হলে সেটা কাজে লাগে এ ব্যাপারে আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামা‘আতের ইমামগণের মধ্যে দু’টি মত পাওয়া যায়।

এক. শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়া, ইবনুল কাইয়েম (রহঃ) সহ একদল আলেম মনে করেন যে তাদের কাছে সাওয়াব পৌঁছে। এ ব্যাপারে তারা তাদের গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

দুই. পক্ষান্তরে অধিকাংশ আলেম মনে করেন, সাওয়াব কেউ কাউকে দিতে পারে না, বরং উচিত হবে সৎকাজ করে সেটার অসীলা দিয়ে দো‘আ করা। শাইখুল আলবানী (রহঃ) সহ অনেক বিদগ্ধ আলেম

৬৩৬ সিরাতে মুস্তাকীম (উর্দু তরজমা), পৃ: ৫০-৭৫

এমতটিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। এ দ্বিতীয় মতটিকে আমি প্রাধান্য দিয়ে থাকি। কিন্তু আমাদের লেখককে মনে হচ্ছে প্রথম মতের প্রবক্তা। এ ব্যাপারে আমি তার মতামতের উপর হস্তক্ষেপ না করে বিষয়টি বর্ণনা করে দেওয়া যুক্তিযুক্ত মনে করেছি। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের মতভেদটি দ্বান্দ্বিক নয় বরং প্রকারান্তিক। কারণ, সবাই মনে করেন যে শরী'আতে অনুমোদিত নয় এমন কোনো কাজ করলে সেটা বিদ'আত হবে। যেমন ওরস, চল্লিশা (চেহলাম), পঞ্চ দিনের অনুষ্ঠান, কিংবা খতমে তাহলীল, খতমে খাজেগান, নির্দিষ্ট দিনে দো'আ অনুষ্ঠান, কুলখানি ইত্যাদি সকল বিষয় বিদ'আত ও পথভ্রষ্টতা। এ ব্যাপারে কারও কোনো দ্বিমত নেই। আল্লাহ আমাদেরকে সুন্নাতের উপর পরিপূর্ণভাবে আমল করার তৌফিক দিন^{৬৩৭}।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ - বিদাতীর পরিচয়, বিদআতী চেনার উপায়, বিদাতীর কাজের পরিণতি সম্বন্ধে শরীয়তের ফয়সালা কি এবং বিদ'আতের ভয়াবহতা

সাধারণ ভাবে সুন্নতের বিপরীত বিষয়কে বিদাত বলে। আর শার'ঈ ভাবে বিদ'আত হলো “আল্লাহর নৈকট্য হাসিলের উদ্দেশ্যে ধর্ম এর নামে নতুন কোন প্রথা বা ইবাদতের প্রচলন করা যা শরীয়াতের কোন সহীহ দলীল-প্রমানের উপর ভিত্তিশীল নয়”^{৪১}।

বস্তুতঃ বিদ'আত মানেই ক্রমান্বয়ে দীনের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে যাওয়া। কেননা দ্বীন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক

৬৩৭ খুতবাহ খানা ড. আ. ন. ম. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীরের অমর গ্রন্থ ‘এহুইয়াউস-সুন্নান’ অবলম্বনে লিখিত

অনুমোদিত জীবন পদ্ধতির নাম। তাঁর পদ্ধতি থেকে বিভিন্ন যুক্তির আলোকে যে ব্যক্তি বেরিয়ে পড়ে, সে মূলত দ্বীন থেকেই বেরিয়ে পড়ে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পদ্ধতি থেকে যে যতটুকু বের হয়, সে মূলত ততটুকু দ্বীন থেকে বের হয়। তাই এ ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতকে পূর্ব থেকে সতর্ক করে গেছেন, যাতে করে যুক্তির আলোকে কেউ তাঁর দেখানো আদর্শ ও পদ্ধতি থেকে সরে না যায়। ইরবায় ইবন সারিয়া আস্সুলামি রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ

"وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بعد صلاة الغداة موعظة بليغة

ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال رجل : إن هذه موعظة مودع

فماذا تعهد إلينا يا رسول الله ؟ قال : أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة

وإن عبد حبشي فإنه من يعش منكم يرى اختلافا كثيرا وإياكم ومحدثات

الأمر فإنها ضلالة فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء

". (سنن الترمذي، كتاب العلم عن الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ

رسول الله، باب ما جاء في الاخذ بالسنة واجتناب البدعة، رقم: ২৬৭৬)

“একদিন ফজরের সালাতের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী নসীহত করলেন, এতে সবার চোখে অশ্রু বয়ে গেল, হৃদয়গুলো ভীত শঙ্কিত হলো। এক লোক বলে উঠল: নিশ্চয় এটি বিদায়ী নসীহত, অতএব আপনি আমাদের থেকে কী অঙ্গীকার নিবেন হে আল্লাহর রাসূল? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: আমি তোমাদেরকে আল্লাহভীতি অর্জনের ওসিয়্যত (অঙ্গীকার, গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ)

করছি, নেতার কথা মান্য ও তাঁর আনুগত্যের নির্দেশ দিচ্ছি, যদিও সে হাবশী দাস হয়। কেননা তোমাদের মধ্যে যে জীবিত থাকবে সে অনেক মতবিরোধ দেখতে পাবে। আর তোমরা সব নব অবিস্কৃত বিষয় থেকে বেঁচে থাকবে, কেননা এগুলো পথভ্রষ্টতা। তোমাদের মধ্যে যে এই অবস্থা পাবে সে যেন আমার সুন্নাত এবং খুলাফায়ে রাশিদিনের সুন্নাত আকড়ে ধরে। তোমরা সুন্নাতকে মাড়ির দাঁত দিয়ে আকড়ে ধর।”^{৬৩৮}

বিদআত কাকে বলে বুঝতে এবং তা থেকে সতর্ক থাকতে সুন্নাত প্রেমিকদের জন্য এই একটি হাদীসই যথেষ্ট। আল্লাহর রহমতে সর্বদা একদল এর উপর ছিলেন বলেই সুন্নাত সংরক্ষিত হয়ে আমাদের পর্যন্ত পৌঁছেছে। জান্নাতে পৌঁছতে, তায়কিয়ার চূড়ান্তে উপনীত হতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাতই আমাদের জন্য যথেষ্ট।

সুন্নাতের বাইরে কোনো কিছুকে যে কোনো ক্ষেত্রে মনে স্থান দেওয়া মানেই গোমরাহীর পথ খুলে দেওয়া, যা উপরোক্ত হাদীসে স্পষ্ট। এভাবে বিভিন্ন হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দীনের মধ্যে পরিবর্তন পরিবর্ধন করার কঠিন পরিণতি সম্পর্কে আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন। সাহল ইবনে সা‘দ, আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত একটি হাদীস দেখুন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ

^{৬৩৮} তিরমিযী, সুনান, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত ইলম অধ্যায়, সুন্নাতকে আকড়ে ধরা এবং বিদআত পরিহার করা অনুচ্ছেদ, নং: ২৬৭৬, হাদীস সহীহ।

"إني فرطكم على الحوض من مر علي شرب ومن شرب لم يظماً أبداً ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفونني ثم يحال بيني وبينهم، فأقول إنهم مني فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول سحقاً سحقاً لمن غير بعدي". (صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب في الحوض، رقم: ৬২১২، كتاب الفتن، باب ما جاء في قول الله تعالى { واتقوا فتنة... } رقم: ৬৬৪৩)

“আমি তোমাদের আগে হাওযে গিয়ে তোমাদের জন্য অপেক্ষা করব। যে আমার কাছে যাবে সে (হাউয থেকে) পান করবে, আর যে পান করবে সে কখনো পিপাসার্ত হবে না। অনেক মানুষ আমার কাছে (হাওযে পানি পানের জন্য) আসবে, যাদেরকে আমি চিনব, তারাও আমাকে চিনবে, তবে তাদের এবং আমার মাঝে বাঁধা সৃষ্টি করা হবে, (আমার কাছে আসতে দেওয়া হবে না) আমি বলব এরা আমার উম্মত। তখন (প্রতি উত্তরে) বলা হবেঃ আপনি জানেন না, এরা আপনার পরে কী সব নব উদ্ভাবন করেছিল। একথা শুনে আমি বলবঃ যারা আমার পর পরিবর্তন করেছেন তারা দূর হয়ে যাক, তারা দূর হয়ে যাক!”^{৬৩৯} ইবাদতের যে কোনো নবআবিষ্কৃত পদ্ধতি বিদ’আত। এতে জড়িত হওয়ার কী করুণ পরিণতি তা আমরা লক্ষ্য করতে পেরেছি। তেলাওয়াত, যিকর, দো‘আ, দুরুদ ইত্যাদির নতুন পদ্ধতি আবিষ্কারের কারণে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে তাড়িয়ে দিলে আমাদের মত হতভাগা আর কে আছে? আরো লক্ষ্যণীয় যে, নবীজী সবচেয়ে বেশি যে জিনিস থেকে বারণ করতেন তা হচ্ছে বিদ’আত। সর্বদা বারণের কারণ

৬৩৯ সহীহুল বুখারী, কিতাবুর রিকাক, হাউয অনুচ্ছেদ, নং: ৬২১২, কিতাবুল-ফিতান, নং: ৬৬৪৩।

আশাকরি স্পষ্ট হয়েছে। এবার নবীজীর খুতবার সিফাত বর্ণনার হাদীসটি দেখিঃ

"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته : يحمد الله ويثني عليه بما هو له أهل ثم يقول : من يهد الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها و كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار". (صحيح ابن ، رقم: ১৭৮৫) خزيمة، باب صفة خطبة النبي

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর খুতবায় প্রথমে আল্লাহর প্রশংসা ও তার যথাযথ গুণাবলী বর্ণনা করতেন, এরপর বলতেন: যাকে আল্লাহ হেদায়াত প্রদান করেন তাকে কেউ গোমরাহ করতে পারে না, আর যাকে আল্লাহ গোমরাহ করেন তাকে কেউ হেদায়াত প্রদান করতে পারে না। নিশ্চয় সর্বাধিক সত্য কথা আল্লাহর কিতাব এবং সর্বাধিক সুন্দর আদর্শ মুহাম্মদের আদর্শ, নব উদ্ভাবিত বিষয় সর্বাধিক নিকৃষ্ট, প্রত্যেক নব উদ্ভাবিত বিষয় বিদ’আত, প্রত্যেক বিদ’আত ভ্রষ্টতা এবং এবং প্রত্যেক ভ্রষ্টতা জাহান্নামে নিক্ষেপ্ত।”^{৬৪০}

উপরোক্ত হাদীসটির দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জীবনে আমাদের যত কথা বলে গেছেন সবই হাদীস। তিনি যা বলেছেন, যা করতে নির্দেশ দিয়েছেন তা কতবার বলেছেন? নিশ্চয় একবার, দুইবার, তিনবার,

৬৪০ মুহাম্মদ ইবন ইসহাক ইবনু খুযায়মাহ আস-সুলামী, ২২৩-৩১১ হিজরী, সহীহ ইবনু খুযায়মাহ, নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খুতবার গুণাবলী অনুচ্ছেদ, নং ১৮৭৫।

একাধিক বার, ক্ষেত্র বিশেষে অনেক বার। কিন্তু উপরোক্ত হাদীসে বর্ণিত কথাগুলো তিনি কতবার বলেছেন? নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জীবনে কতটি খুতবা দিয়েছেন? একটি? দুইটি? একাধিক? অনেক? অগণিত? যতবারই তিনি খুতবা দিয়েছেন, উপরের বিষয়গুলো আলোচনা করতেন বলে আমরা জানতে পারলাম। এখান থেকে একটি ধারণা নেই যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবনে কতবার বলেছেন: “একমাত্র আদর্শ তাঁরই আদর্শ, তাঁর আদর্শের বাইরের সবকিছুই নব উদ্ভাবিত, সব নব উদ্ভাবিত কর্ম বিদ’আত, সব বিদ’আতই গোমরাহী এবং প্রত্যেক ভ্রষ্টতা জাহান্নামে নিক্ষেপ্ত।” এছাড়া অন্যান্য হাদীসতো আছেই। নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আদর্শ বহির্ভূত কোনো আমল গ্রহণযোগ্য নয়, চাই তা যে কোনো উদ্দেশ্যেই হোক না কেন। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত হাদীসটি দেখুন:

"من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رد". (صحيح البخاري، كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، رقم: ২৫৫০، صحيح مسلم، كتاب الأفضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور، رقم: ৪৫৮৯)

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ আমাদের এই দীনে যে ব্যক্তি নতুন কিছু উদ্ভাবন করবে তা প্রত্যাখ্যাত।”^{৬৪১} এই হলো বিদ’আতের অবস্থা। আমলের ক্ষেত্রে সুন্নাতের বিপরীত চিন্তা

৬৪১ সহীহুল বুখারী, সন্ধি অধ্যায়, অনুচ্ছেদ: অন্যায়ের উপর লোকেরা সন্ধিবদ্ধ হলে তা প্রত্যাখ্যানযোগ্য, নং: ২৫৫০, সহীহ মুসলিম, বিচার সংক্রান্ত অধ্যায়, অনুচ্ছেদ: বাতিল সিদ্ধান্ত খণ্ডন এবং বিদ’আতি কার্যকলাপ প্রত্যাখ্যান, নং: ৪৫৮৯।

মানেই বিদ'আতে লিপ্ত হওয়ার প্রক্রিয়া, আর বিদ'আত মানেই দ্বীন ধ্বংসের প্রক্রিয়া। তাই সাহাবায়ে কেরাম ও কল্যাণপ্রাপ্ত যুগ তথা খাইরুল কুর'নের আলেমদেরকে এব্যাপারে সর্বাধিক সতর্ক থাকতে দেখা গেছে। বিদ'আত দূরের কথা, বিদ'আতের সন্দেহযুক্ত বিষয়কেও তারা প্রত্যাখ্যান করে চলেছেন। এ ব্যাপারে ইমাম আবু হানিফা (রাহ.) কে এতই সতর্ক থাকতে দেখা যায় যে, প্রমাণিত সুন্নাতের মাঝেও সমান্যতম হেরফের হলেই তিনি তা বিদ'আত বলে আখ্যায়িত করতেন এবং এ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিতেন।

ফিকহে হানাফিতে বিদ্যমান অসংখ্য মাস'আলা এর জলন্ত প্রমাণ। এ থেকেই হানাফী মাযহাবের সিদ্ধান্ত হলোঃ কোনো বিষয় সুন্নাত ও বিদ'আতের মাঝে সংশয়যুক্ত হলে তা বিদ'আত বলে গণ্য করে পরিহার করতে হবে। কারণ কাজটি যদি বাস্তবেই সুন্নাত হয়ে থাকে তবে ছেড়ে দিলে গোনাহ্কার হবে না, শুধুমাত্র সওয়াব থেকে বঞ্চিত হবে, কিন্তু বিদ'আত হয়ে থাকলে গোনাহ্ হবে। তাই ইমাম আবু হানিফা রাহ. এমন কাজ ঝুঁকিপূর্ণ বলে মনে করতেন। আর ঝুঁকিপূর্ণ বিষয় এড়িয়ে চলাই জ্ঞানির কাজ। আল্লামা সারাখসী^{৬৪২} লিখেনঃ

"وما تردد بين البدعة والسنة يتركه لأن ترك البدعة لازم وأداء السنة غير لازم (المبسوط، ২-১৪৬)."

“আর যে বিষয়টি বিদ'আতও হতে পারে আবার সুন্নাতও হতে পারে বলে উভয় সম্ভাবনা রয়েছে এমন বিষয় পরিত্যাগ করবে, কেননা

৬৪২ শামসুল আয়িম্মাহ মুহাম্মদ ইবন আহমদ ইবন সাহাল আস্-সার্বাসি, হানাফী মাযহাবের অন্যতম মুজতাহিদ আলেম। ওফাত: ৪৮৩ হিজরী, মোতাবেক ১০৮০ ঈসাব্দী। (আল-আ'লাম: ৫/৩১৫)

বিদ'আত পরিত্যাগ করা অপরিহার্য জরুরী, আর সুন্নাত পালন করা অপরিহার্য নয়।”^{৬৪৩} তিনি অন্যত্র লিখেনঃ

"وما تردد بين المباح والبدعة لا يؤتى به فإن التحرز عن البدعة واجب... وما

تردد بين السنة والبدعة لا يؤتى به". (৩৫৭-৩)

“যে বিষয়টি বৈধও হতে পারে আবার বিদ'আত হতে পারে বলে উভয় সম্ভাবনা রয়েছে এমন বিষয়ের উপর আমল করা যাবে না, কেননা বিদ'আত পরিহার করে চলা ওয়াজিব ... এবং যে কাজ সুন্নাতও হতে পারে আবার বিদ'আতও হতে পারে বলে উভয় সম্ভাবনা রয়েছে এমন কাজ করা যাবে না।”^{৬৪৪} এই ছিল খাইরুল কুর'ন থেকে নিয়ে হানাফী মাযহাবের মূলধারার আলেমদের আদর্শ। তাই বিভিন্ন দো'আ দুর্কদ ইত্যাদির মাঝে নতুন যে কোনো সংযোজনের সবই তাদের যুগের অনেক পরের সৃষ্ট বলে দেখতে পাবেন।

সুতরাং, উপরোক্ত আলোচনায় বলা যায় যে, বিভিন্ন আমল, আমলের বিভিন্ন পদ্ধতি, দুর্কদের বিভিন্ন পদ্ধতি, যিকরের বিভিন্ন পস্থা, সংযোজন বিয়োজন। দো'আ, যিকর, তাসবীহ, তাহলীল ইত্যাদির নতুন সংখ্যা ও তার লাভ নির্ধারণ। ইবাদতের নতুন নতুন উদ্দেশ্যের প্রণয়ন করে যদি বলি তা বিদ'আত নয় তবে, আমি আমার নিজেকে সম্বোধন করে বলব: তুমি পৃথিবীর কাউকে বিদ'আতি বলে আখ্যায়িত করো না। রাসূলের আদর্শ ও উদ্দেশ্য বর্জিত হয়ে তোমার

৬৪৩ সার্বাসী, আল-মাবসূত, ২/১৪৬।

৬৪৪ প্রাগুভ, ৩/৩৫৭।

কাজ যদি বিদ'আত না হয়, তবে যাকে তুমি বিদ'আতি বলছ তাঁর কাজ বিদ'আত হবে কেন? তোমার বানানো পদ্ধতি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পন্থায় না হলেও তুমি তোমার ইলম, কুরআন, হাদীস, যুক্তি ইত্যাদির অকাট্য (?) দলীল দ্বারা জায়েয প্রমাণ করতে পার। তবে তুমি যাকে বিদ'আতি বলছ তাঁর কাছেও তোমার মত হাজারো দলীল রয়েছে। আলোচনা আর দীর্ঘ না করে আমাদের মূল বিষয়ে চলে যাচ্ছি। আল্লাহ আমাদেরকে সঠিকভাবে বিদ'আত বুঝা ও তা এড়িয়ে চলার তওফিক দিন। আমীন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ - বিদ'আত প্রচলনে শয়তানের চক্রান্ত

ছয়টি ধাপে শয়তান মানুষকে আহবান জানায় কুপথে চলতে। ছয়টি ধাপসমূহ নিম্নে আলোচনা করা হলোঃ

প্রথম ধাপ : মানুষ শির্ক কিংবা কুফরে লিপ্ত হোক, শয়তান সর্বপ্রথম এ প্রচেষ্টা চালায়। কিন্তু ব্যক্তি যদি মুসলিম হয়, তাহলে সে (তাকে বিভ্রান্ত করতে) পরবর্তী ধাপ অবলম্বন করে।

দ্বিতীয় ধাপ : বিদ'আত। ব্যক্তি যদি মুসলিম হয়, তাহলে সে যেন নিজে বিদ'আত উদ্ভাবন করে এবং এর প্রচলন কর' - দ্বিতীয় পর্যায়ে শয়তান এ-প্রয়াসই চালায়। কিন্তু ব্যক্তি যদি সুন্নতের পাবন্দ হয়, তাহলে শয়তান তৃতীয় কৌশল অবলম্বন করে।

তৃতীয় ধাপ : 'কবীরা গুনাহ'বড় পাপ বা নাফরমানীর স্তর। শয়তান মানুষকে কবীরা গুনাহে লিপ্ত করার প্রয়াস চালায়। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা যদি তাকে এসব থেকেও মুক্ত রাখেন, তবুও শয়তান হতোদ্যম হয় না। তখন সে চতুর্থ কৌশল অবলম্বন করে।

চতুর্থ ধাপ : সগীরা গুনাহ, ব্যক্তিকে কবীরা গুনাহে লিপ্ত করতে না পারলে শয়তান সগীরা গুনাহে লিপ্ত করার প্রয়াস চালায়। কিন্তু ব্যক্তি যদি এর থেকেও মুক্ত হয়, তাহলে শয়তান তাকে বিভ্রান্ত করতে ভিন্ন কৌশলে লিপ্ত রাখার চেষ্টা করে। যা পরবর্তীতে দু'টি ধাপে উল্লেখিত হচ্ছে।

পঞ্চম ধাপ : 'মুবাহ'যা করলে ছাওয়াব নেই, না করলে গুনাহ নেই। এ ধরনের মুবাহ কাজে ব্যক্তিকে শয়তান এমনভাবে লিপ্ত রাখে যে, এতেই সে পূর্ণ সময় নিঃশেষ করে। কিন্তু যে সব জরুরী বিষয়ে আমরা আদিষ্ট, তাতে সময় দেয় না।

ষষ্ঠ ধাপ : শয়তান মানুষকে অধিক ফযীলতের আমল থেকে বিরত রেখে, অপেক্ষাকৃত কম ফযীলতের একটা নির্দিষ্ট ভাল আমলে লিপ্ত রাখে। আর সে ব্যক্তিও উত্তম ও সুন্দরতম আমল থেকে বিরত থেকে এতেই নিবিষ্ট থাকে। যেমন : ফরয ছেড়ে সুন্নত নিয়ে ব্যস্ত থাকা। অদ্ভুত! ফরয ছুটে যাচ্ছে অথচ সুন্নত নিয়েই ব্যস্ত!! শয়তান কিন্তু তার দাওয়াতে তৎপর। ক্রমান্বয়ে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে যাচ্ছে। শ্লথগতিতে উপর্যুপরি পদক্ষেপ গ্রহণের কৌশলে মানুষকে কাবু করছে সে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন- আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে যে রিযিক দান করেছেন তা থেকে খাও এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।'(সূরা আল-আনআম : ১৪২)

মানুষের পেছনে শয়তান প্রথমে অল্প-অল্প প্রচেষ্টা চালায় এবং ধাপে ধাপে অগ্রসর হয়ে লক্ষ্যে পৌঁছে। সকল শ্রেণীর মানুষের কাছে সে

তাদের জন্য উপযোগী পন্থায় ও পদ্ধতিতে দাওয়াত দেয়। তাপসীর কাছে যায় কাছে তাপস্যের পথে, বিদ্যানের কাছে বিদ্যার পথে, অজ্ঞের কাছে যায় অজ্ঞতার পথে যায়। এভাবে ক্রমান্বয়ে শয়তান সমাজে বিদ'আত প্রচলন করছে যা আমরা বুঝতে অক্ষম। যার দরুন আমাদেরকে বিদ'আত সম্বন্ধে জানা খুবই দরকারী তা না হলে শয়তানের ছোবল থেকে রক্ষা পাওয়া খুবই কষ্টকর হয়ে উঠবে। কেননা যে কর্ম বা বিশ্বাস রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ও তাঁর সাহাবীগণ দ্বীন বা ইবাদত হিসেবে পালন করেননি তাকে দ্বীন, ইবাদত বা সাওয়াবের কর্ম বলে মনে করা বিদ'আত।

সুতরাং, খুব সুস্পষ্টভাবে শয়তান বিদ'আতের মাধ্যমে সমাজে পাপকার্যসমূহের প্রচলন করে। আপাতত দৃষ্টিতে তা দ্বীন মনে হলেও তা আল্লাহর রাসূল (ﷺ) এর দেয়া বিধান নয়। আসুন আমরা বিষয়গুলো জানার চেষ্টা করি। নিম্নে বিষয়গুলো স্পষ্টভাবে আলোচনা করা হলো। আল্লাহ আমাদেরকে বিদ'আতমুক্ত সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার তৌফিক দান করুন, আমীন।

(ক) বিদ'আত একান্তই ধার্মিকদের পাপ। ধার্মিক ছাড়া কেউ বিদআতে লিপ্ত হয় না। বিদ'আত ই একমাত্র পাপ যা মানুষ পুণ্য মনে করে পালন করে।

(খ) কোনো কর্ম বিদ'আত বলে গণ্য হওয়ার শর্ত তাকে ইবাদত মনে করা। যেমন একজন মানুষ দাঁড়িয়ে, লাফিয়ে বা নর্তন কুর্দন করে যিকর বা দরুদ-সালাম পড়ছেন। এরূপ দাঁড়ানো, লাফানো বা নর্তন-কুর্দন শরীয়তে মূলত নিষিদ্ধ নয়। কেউ যদি জাগতিক কারণে

এরূপ করেন তা পাপ নয়। দাঁড়ানো বা নর্তন কুর্দনের সময় যিকর বা দরুদ-সালাম পাঠ পাপ নয়। দরুদ-সালাম বা যিকরের সময় কোনো কারণে বা অনিয়ন্ত্রিত আবেগে দাঁড়ানো বা লাফানো পাপ নয়। কিন্তু যখন কেউ ‘দাঁড়ানো, ‘লাফানো’ বা ‘নর্তন-কুর্দন’- কে দ্বীন, ইবাদত বা ইবাদতের অংশ হিসেবে বিশ্বাস করেন তখন তা বিদআতে পরিণত হয়।

ইবাদত মনে করার অর্থ: (১) যিকর বা দরুদ-সালাম দাঁড়ানো বা লাফানো ব্যতিরেকে পালন করার চেয়ে দাঁড়ানো বা লাফানো-সহ পালন করা উত্তম, অধিক আদব, অধিক সাওয়াব বা অধিক বরকত বলে মনে করা বা (২) দাঁড়ানো বা লাফানো ছাড়া যিকর বা দরুদ-সালাম পালন করতে অস্বস্তি অনুভব করার কারণে এপদ্ধতিতে এ সকল ইবাদত পালনকে রীতিতে পরিণত কর।

(গ) সাধারণভাবে বিদআত কে পাপ বলে বুঝা যায় না; কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে কর্মটি ইসলামে নিষিদ্ধ নয়। তাকে ইবাদত বানানো বা ইবাদত বলে বিশ্বাস করাই পাপ। অনেক সময় শরীয়ত নিষিদ্ধ কর্মও বিদআতে পরিণত হয়। যেমন মদপান, ব্যভিচার, গানবাদ্য, আল্লাহ ছাড়া কাউকে সাজদা করা, কবর পাকা করা, কবরে বাতি দেওয়া ইত্যাদি। কেউ যদি সাধারণভাবে মদপান, ব্যভিচার, গানবাদ্য ইত্যাদি করে তবে তা হারাম। আর যদি কেউ এ সকল কর্মকে ইবাদত বা আল্লাহর নৈকট্য লাভের কর্ম হিসেবে পালন করে তা হারাম ও বিদআত। বাস্তবেও অনেক ফকীর,

মারফতী বা সূফী নামধারী ব্যক্তি ধর্ম বা ইবাদতের নামে এ সকল মহাপাপে লিপ্ত হন।

(ঘ) বিদআতের পাপ কয়েকটি পর্যায়ে:

(১) তা প্রত্যাখ্যাত। অর্থাৎ এ কর্ম আল্লাহ কবুল করছেন না এবং এজন্য কোনো সাওয়াব হচ্ছে না।

(২) তা বিভ্রান্তি। কারণ তিনি জেনে বা না-জেনে রাসূলুল্লাহ (সা.) ও সাহাবীগণের ইবাদতকে অপূর্ণ বলে মনে করছেন।

(৩) বিদ'আত অন্যান্য ইবাদত কবুল হওয়ার পথে প্রতিবন্ধক।

(৪) গানবাদ্য, মদপান, কবর সাজদা ইত্যাদি মহাপাপকে ইবাদতের সাথে সংযুক্ত করলে তাতে এ সকল মহাপাপের শাস্তি এবং বিদ'আতের শাস্তির পাশাপাশি ঈমান বিনষ্ট হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকে।

(৬) বিদআতের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর দিক তা সুন্নাহের প্রতি অবজ্ঞা সৃষ্টি করে। বিদআতে লিপ্ত ব্যক্তি নিজেকে সুন্নী বা আহলুস সুন্নাহ মনে করেন। যে সুন্নাহগুলো তার বিদআতের প্রতিপক্ষ নয় সেগুলি তিনি পালন বা মহব্বত করেন। তবে তাঁর পালিত বিদ'আত সংশ্লিষ্ট সুন্নাহকে তিনি গ্রহণ করতে পারেন না।

উপরের উদাহরণটি বিবেচনা করুন। যে ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বা লাফিয়ে যিকর বা সালাম পালন করছেন তিনি স্বীকার করবেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বা সাহাবীগণ দাঁড়িয়ে বা লাফিয়ে যিকর, দরুদ বা সালাম পালন করেছেন বা করতে উৎসাহ দিয়েছেন বলে তিনি কোথাও দেখেন নি। তিনি স্বীকার করবেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) ও

সাহাবীগণ বসে বসে যিকর, দরুদ ও সালাম পাঠ করতেন বলে তিনি অনেক হাদীস থেকে জেনেছেন। তারপরও তিনি বসে যিকর বা দরুদ-সালাম পালনে অস্বস্তিবোধ করবেন। বিভিন্ন ‘দলীল’ দিয়ে এ সকল ইবাদত বসে পালনের চেয়ে দাঁড়িয়ে বা নেচে পালন করা উত্তম বলে প্রমাণের চেষ্টা করবেন। তাঁর বিদ’আতকে প্রমাণ করতে তিনি অনেক অপ্রাসঙ্গিক দলীল পেশ করবেন এবং সুন্নাত-প্রমাণিত পদ্ধতিকে অবজ্ঞা করতে তিনি বলবেন: ‘সবকিছু কি সুন্নাত মত হয়? ফ্যান, মাইক ... কত কিছুই তো নতুন। ইবাদতটি একটু নতুন পদ্ধতিকে করলে সমস্যা কী? উপরন্তু সুন্নাতের হুবহু অনুসরণ করে বসেবসে দরুদ, সালাম ও যিকর পালনকারীর প্রতি কম বা বেশি অবজ্ঞা অনুভব করবেন।

(চ) তাওহীদের বিশ্বাসের ঘাটতি থেকে শিরকের উৎপত্তি এবং রিসালাতের বিশ্বাসের ঘাটতি থেকে বিদআতের উৎপত্তি। বিদ’আত মূলত মুহাম্মাদ সা.-এর রিসালাতের সাথে অন্য কাউকে শরীক করা বা রিসালাতের পূর্ণতায় অনাস্থা। শিরকে লিপ্ত ব্যক্তি যেমন শিরক সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ‘গাইরুন্নাহ’ (আল্লাহ ছাড়া অন্য)-এর প্রতি হৃদয়ের আস্থা অধিক অনুভব করেন তেমনি বিদআতে লিপ্ত ব্যক্তি বিদআতের ক্ষেত্রে ‘গাইরুন্নাহী’ (নবী ছাড়া অন্য) - এর অনুসরণ - অনুকরণে অধিক স্বস্তি বোধ করেন। তিনি সর্বদা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ‘সব কিছু কি নবীর তরীকায় হয়?’ বলে এবং নানাবিধ ‘দলীল’ দিয়ে ইত্তিবায়ে রাসূল (ﷺ) গুরুত্বহীন বা কম গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ করতে সচেষ্ট থাকেন। পাশাপাশি তার ‘বিদ’আত ‘আমল বা পদ্ধতিকে

উত্তম প্রমাণ করতে ‘গাইরুল্লাহী’ অর্থাৎ বিভিন্ন বুজুর্গের কর্মের প্রমাণ প্রদান করেন।

(ছ) মুশরিকগণ আল্লাহর প্রতিপালনের একত্বে বিশ্বাস করত এবং তাঁর ইবাদত করত, তবে তাঁর একার বন্দনায় তৃপ্তি পেত না। তাঁর যিকর বা বন্দনার পাশাপাশি ‘গাইরুল্লাহী’-এর যিকর-বন্দনা হলে তাদের হৃদয় তৃপ্ত হতো। আল্লাহ বলেন: ‘যখন শুধু আল্লাহর একার যিকর হয় তখন আখিরাতে অবিশ্বাসীদের হৃদয় বিতৃষ্ণায় সংকুচিত হয়। আর তিনি ছাড়া অন্যদের যিকর হয় তখন তারা আনন্দে উল্লসিত হয়।’ (সূরা ৩৯ - যুমার: আয়াত ৪৫) আমরা দেখি যে, বিদআতে লিগু মানুষদের হৃদয়ের অবস্থা মুহাম্মাদ (ﷺ) - এর ক্ষেত্রে ঠিক একইরূপ হয়ে যায়। তাঁরা তাঁকে মানেন। কিন্তু যখন শুধু তাঁরই অনুসরণ অনুকরণের কথা বলা হয় তখন তারা বিরক্তি অনুভব করেন। কিন্তু তাঁর পাশাপাশি অন্যান্য বুজুর্গের কথা বলা হলে তারা তৃপ্তি বোধ করেন।

অনেকেই বলেন: ‘আমি শুধু অমুক বুজুর্গকে অনুসরণ করব। অন্য কারো বিষয়ে আমার অভিযোগ নেই। তবে আমি অনুসরণ করব শুধু তাঁকেই। তিনি যা করেছেন তা করব এবং যা করেন নি তা করব না। তিনি জান্নাতে গেলে আমিও যাব। ...।’ বর্তমান যুগ থেকে অতীতের যে কোনো ‘গাইরুল্লাহী’ আলিম, ইমাম বা বুজুর্গের নামে এ কথাটি বলা হলে তাতে সাধারণত আপত্তি করা হয় না। কিন্তু যদি এ কথাটিই মুহাম্মাদ (ﷺ) - এর বিষয়ে বলা হয় তবে বিদআতে আক্রান্ত মুমিনগণ তা পছন্দ করবেন না। সকল বিদআতের ক্ষেত্রেই

এটি সুস্পষ্ট। মুমিনের জন্য এর চেয়ে বড় অধঃপতন তো আর কিছুই হতে পারে না যে, তাঁর হৃদয় রাসূলুল্লাহ (ﷺ) - এর সুনাত গ্রহণ করতে অস্বস্তি বা অবজ্ঞা বোধ করে। বিভিন্ন হাদীসে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বারবার বলেছেন: “তাঁর সুনাত যে অপছন্দ বা অবজ্ঞা করবে সে তাঁর উম্মাত নয়।”

(জ) অন্যান্য পাপ যতই ভয়ঙ্কর হোক, মুমিন সাধারণত এগুলো থেকে তাওবা করতে পারেন, কিন্তু বিদ'আত থেকে তাওবা করা খুবই কঠিন। কারণ সকল পাপের ক্ষেত্রে মুমিন জানেন যে তিনি পাপ করছেন; ফলে তাওবার একটি সম্ভাবনা থাকে। পক্ষান্তরে বিদ'আত পালনকারী তার বিদ'আত কে নেক আমল মনে করেই পালন করেন। কাজেই এর জন্য তাওবার কথা তিনি কল্পনাও করেন না। এজন্য তাবিয়ীগণ বলতেন: কাউকে সাধারণ পাপে লিপ্ত করার চেয়ে বিদ'আতে লিপ্ত করতে পারলে ইবলীস অনেক বেশি খুশি হয়। সম্ভবত একারণেই বিদ'আত যত সাধারণই হোক তার প্রতি আকর্ষণ সর্বদা খুবই বেশি হয়। যেমন দাঁড়িয়ে, লাফিয়ে বা নেচে যিকর, দরুদ বা সালাম পালনকারী দাবি করবেন যে, দাঁড়ানো, লাফানো বা নর্তন-কুর্দন মুসতাহাব বা মুসতাহসান; জরুরী নয়। কিন্তু অন্য অনেক ফরয-ওয়াজিব থেকে এর প্রতি তাঁর আকর্ষণ বেশি থাকে। এ থেকে তাওবা তো দূরের কথা এর জন্য তিনি জীবন দিতে প্রস্তুত থাকেন। সম্মানিত পাঠক, শয়তান উপরোক্ত উপায়েই বিদ'আত শিরকের পথ উন্মুক্ত করে এবং শিরক আল্লাহর বেলায়াতের পথ চিররুদ্ধ করে। মক্কার কাফিরগণ

ইবরাহীম (আ)-এর উম্মাত ছিল। তারা প্রথমে ইত্তিবায়ে রাসূল অবহেলা করে। দিনের বিভিন্ন বিষয়ে ইবরাহীম (আ:) - এর হুবহু অনুসরণ না করে যুক্তি দিয়ে নতুন কর্ম করতে শুরু করে। যেমন হজ্জের সময় আরাফাতে না যেয়ে মুযদালিফায় অবস্থান, তাওয়াফের সময় উলঙ্গ হওয়া, তালি বাজিয়ে যিকর করা ইত্যাদি। এর ধারাবাহিকতায় যুক্তি ও দলীলের পথ ধরে তাদের মধ্যে শিরক প্রবেশ করে। উম্মাতে মুহাম্মাদীর শিরকে লিগু মানুষগুলোর দিকে দৃষ্টিপাত করলে আপনি একই অবস্থা দেখবেন।

আল্লাহর বেলায়াত বা নৈকট্য অর্জনের অর্থ তো সর্বদা তাঁরই নৈকট্য অনুভব করা। সর্বদা হৃদয়ে তাঁরই রহমতের স্পর্শ, সকল আনন্দ-বেদনায় শুধু তাঁরই কথা মনে পড়া, তাঁরই সাথে কথা বলা, তিনি সাথে আছেন এবং তাঁর রহমতময় দৃষ্টি আমাকে ঘিরে রয়েছে বলে সর্বদা অনুভব কর। শিরকে লিগু ব্যক্তির অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন। তিনি আল্লাহর ইবাদত করেন। তবে আনন্দ-বেদনায় তার মনে পড়ে ‘গাইরুল্লাহ’ কথা^{৬৪৫}। অর্থাৎ যে বুজুর্গকে তিনি ‘ভক্তি’ করেন তাঁরই কথা তার মনে পড়ে, তাঁকেই স্মরণ করেন, তাঁরই দরদভরা দৃষ্টি অনুভব করেন, আনন্দে তাঁরই প্রতি কৃতজ্ঞতা এবং বিপদে তাঁরই প্রতি আকুতি তার হৃদয় আলোড়িত করে। শিরকের এ বৃত্ত আল্লাহর বেলায়াতের পথ চিরতরে রুদ্ধ করে। আল্লাহ আমাদেরকে সঠিক পথে চলার তৌফিক দান করুন, আমীন।

^{৬৪৫} রাহে বেলায়াত, আস-সুন্নাহ ট্রাস্ট পাবলিকেশন্স, বিনাইদহ, কুষ্টিয়া

চতুর্থ পরিচ্ছেদ – বিদ'আতের নিন্দা, তিরস্কার ও তা থেকে সতর্কতা প্রদর্শন ও দ্বীনের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করা
বিদআতের নিন্দা বা তিরস্কার সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসে অনেক বর্ণনা এসেছে। সাহাবায়ে কেরাম ও তাবয়ীগণ বিদ'আত থেকে বিরত থাকার জন্য বিভিন্নভাবে সতর্কতা প্রদর্শন করেছেন। সংক্ষেপে তা আলোচনা করা হলঃ

প্রথম : কুরআনুল কারীম

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ
مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ
(৯: ৩১) وَأَبِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ. (আল عمران)

অর্থঃ তিনিই আপনার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করেছেন, যাতে অকাট্য আয়াতসমূহ রয়েছে ওগুলো কিতাবের মূল। এ ছাড়া কতিপয় আয়াত অস্পষ্ট।

অতএব যাদের অন্তরে বক্রতা রয়েছে, মূলতঃ তারাই অশান্তি সৃষ্টি ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের উদ্দেশ্যে অস্পষ্টের অনুসরণ করে। আর আল্লাহ্ ব্যতীত এর প্রকৃত অর্থ অন্য কেউ অবগত নয়^{৬৪৬}। ইমাম শাতেবী (রহ.) এর সমর্থনে কিছু আসর (সাহাবীদের উক্তি) পেশ করেছেন। যদ্বারা বুঝা যায়, উক্ত আয়াতটি কুরআনের বক্তব্য নিয়ে যারা বিতর্ক করে তথা খারেজী বা তাদের সমগোত্রীয়দের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ
(১৫৩): ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. (الأنعام)

অর্থঃ এ পথই আমার সরল পথ, সুতরাং তোমরা এরই অনুসরণ কর। এ পথ ছাড়া অন্য কোন পথের অনুসরণ করবে না। কারণ তা তোমাদেরকে হেদায়াতের পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে। আল্লাহ তোমাদের এ নির্দেশ দিলেন যেন তোমরা সতর্ক হও^{৬৪৭}।

সুতরাং সিরাতে মুস্তাকীম হচ্ছে আল্লাহ প্রদত্ত সহজ সরল ও সঠিক পথ। যে পথের দিকে উক্ত আয়াতে আহ্বান করা হয়েছে। এটাই রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সুন্নাত তথা জীবনাদর্শ। আর সুবুল বা বিভিন্ন রাস্তা হচ্ছে (দ্বীনের মধ্যে) মতানৈক্য ও বিদ'আত সৃষ্টিকারীদের পথ।

উপরোক্ত আয়াতে সকল প্রকারের বিদ'আত সৃষ্টিকারীদের পথ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ সরল পথ আল্লাহর নিকট পৌঁছার মাধ্যম, কিন্তু কিছু বক্র পথও রয়েছে; তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদের সকলকে সৎপথে পরিচালিত করতেন^{৬৪৮}। কাস্দুস সাবিল - হচ্ছে সত্যের পথ, এর বাইরের সকল পথ সত্য হতে বিচ্যুত এবং তা বিদ'আতে পরিপূর্ণ ও ভ্রান্ত। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ নিশ্চয়ই যারা নিজেদের দ্বীনে মতভেদ সৃষ্টি করে এবং বিভিন্ন দলে- উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়ে, তাদের সাথে আপনার কোন সম্পর্ক নেই। তাদের বিষয়টি আল্লাহর

৬৪৭ আনআম : ১৫৩

৬৪৮ নাহল : ৯

দায়িত্বে রয়েছে। পরিশেষে তিনিই তাদেরকে নিজ কর্মকান্ড সম্পর্কে অবহিত করবেন^{৬৪৯}। এরাই হচ্ছে প্রবৃত্তির অনুসারী, পথভ্রষ্ট এবং বিদ'আত সৃষ্টিকারী। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ

وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ .

অর্থঃ তোমরা মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। যারা নিজেদের দ্বীনের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি করেছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে তাদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ মতবাদ নিয়ে উৎফুল্ল^{৬৫০}। আল্লাহ তা'আলা এ প্রসঙ্গে ইরশাদ করেছেনঃ

فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

অর্থঃ সুতরাং যারা তাঁর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে তাদের এ ভয় করা উচিত যে, তাদের উপর বিপর্যয় আপতিত হবে অথবা কঠিন শাস্তি তাদের গ্রাস করবে^{৬৫১}। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ

قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيعًا

অর্থঃ হে রাসূল! বলুন, আল্লাহ তোমাদের উর্ধ্বদেশ অথবা তলদেশ হতে শাস্তি প্রেরণ করতে এবং তোমাদের বিভিন্ন দলে উপদলে বিভক্ত করতে যথেষ্ট ক্ষমতাবান^{৬৫২}। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ

৬৪৯ আনআম : ১৫৯

৬৫০ রুম : ৩১-৩২

৬৫১ আন-নূর : ৬৩

৬৫২ আনআমঃ ৬৫

وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، إِلَّا مَنْ رَّحِمَ رَبُّكَ

অর্থঃ আর তারা সদা-সর্বদা মতভেদ সৃষ্টি করতে থাকবে কিন্তু যার প্রতি আপনার রবের অনুগ্রহণ হয় (সে মতভেদ করবে না)^{৬৫৩}। সুতরাং - এ কারনেই বিদ'আতের নিন্দা, তিরস্কার ও তা থেকে সতর্কতা প্রদর্শন করে রাসূল (ﷺ) অনেক হাদীস বর্ণনা করেছেন। নিম্নে কয়েকটি উল্লেখ করা হল - আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন:-

عَمِلَ مَنْ مُسْلِمٍ رَوَايَةٍ فِي رَدِّ فَهُوَ مِنْهُ لَيْسَ مَا هَذَا أَمْرُنَا فِي أَحَدٍ مَنْ
ومسلم بخاري رَدِّ فَهُوَ أَمْرُنَا عَلَيْهِ لَيْسَ عَمَلًا

অর্থঃ যে আমাদের দ্বীনের মধ্যে এমন কিছু প্রবর্তন করল, যা এর অন্তর্ভুক্ত নয় তা প্রত্যাখ্যাত। মুসলিমের অপর এক বর্ণনায় রয়েছেঃ যে ব্যক্তি এমন কোন আমল করল যা আমাদের পক্ষ থেকে অনুমোদিত নয়, তা প্রত্যাখ্যাত^{৬৫৪}। জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) স্বীয় জুমআর খুতবায় বলেছেনঃ

مُحَدَّثَاتُهَا الْأُمُورَ وَشَرُّ مُحَمَّدٍ هُدَى الْهُدَى وَخَيْرُ اللَّهِ كِتَابُ الْحَدِيثِ خَيْرٌ فَإِنْ
مُسْلِم). ضَلَالَةٌ بِذَعَةٍ وَكُلِّ

উত্তম বাণী হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার বাণী। আর উত্তম পথনির্দেশনা হচ্ছে মুহাম্মাদ (ﷺ) এর পথনির্দেশনা। নিকৃষ্টতম বিষয় হচ্ছে (দ্বীনের মধ্যে) নতুন নতুন বিধান ইবাদতের নামে প্রবর্তন করা,

৬৫৩ হুদ : ১১৮-১১৯

৬৫৪ বুখারী : ২৬৯৭ ও মুসলিম : ১৭১৮

প্রত্যেক বিদ'আতই ভ্রষ্টতা।^{৬৫৫} রাসূল (ﷺ) খুতবায় আল্লাহর প্রশংসা করার পর বলেনঃ-

الْحَدِيثُ أَصْدَقُ إِنَّ لَهُ هَادِيَّ فَلَا يُضِلُّهُ وَمَنْ لَهُ مُضِلٌّ فَلَا اللَّهُ يَهْدِيهِ مَنْ
مُحَدَّثَةٍ وَكُلُّ مُحَدَّثَاتِهَا الْأُمُورِ وَشَرُّ مُحَمِّدٍ هَذِيَّ الْهَذِيَّ وَأَحْسَنَ اللَّهُ كِتَابُ
وَنَسَائِي التَّارِ مُسْلِمٍ فِي ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ

অর্থঃ আল্লাহ যাকে হেদায়াত দান করেন তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারে না। আর তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন তার জন্য কোন পথ প্রদর্শনকারী নেই। নিশ্চয়ই সর্বাধিক সত্যবাণী হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার কিতাবের বাণী। আর সর্বোত্তম পথ হলো নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (ﷺ) কর্তৃক প্রদর্শিত পথ। আর মন্দ বিষয়গুলো হলো (দ্বীনের ভিতরে) নবসৃষ্ট আমল বা কাজ। প্রত্যেক নবসৃষ্ট আমলই বিদ'আত। কেননা প্রত্যেক বিদ'আতই ভ্রষ্টতা এবং প্রত্যেক ভ্রষ্টতাই জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে^{৬৫৬}। আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) বলেনঃ-

مَنْ ذَلِكَ يَنْقُصُ لَا تَبِعَهُ مَنْ أُجُورٍ مِثْلُ الْأَجْرِ مَنْ لَهُ كَانَ هُدًى إِلَى دَعَا مَنْ
لَا تَبِعَهُ مَنْ آثَامٍ مِثْلُ الْإِثْمِ مَنْ عَلَيْهِ كَانَ ضَلَالَةٌ إِلَى دَعَا وَمَنْ شَيْئًا أُجُورِهِمْ
شَيْئًا مُسْلِمٍ آثَامِهِمْ مِنْ ذَلِكَ يَنْقُصُ

অর্থঃ যে ব্যক্তি (মানুষকে) হেদায়াতের দিকে আহ্বান করবে, সে হেদায়াতের পথ অনুসরণকারীর সমপরিমাণ সাওয়াব পাবে। এতে কারো সাওয়াব কম হবে না। আর যে ব্যক্তি (মানুষকে) পথভ্রষ্টতার

৬৫৫ সহীহ মুসলিম : ৮৬৭

৬৫৬ সহীহ মুসলিম : ৮৬৭ ও নাসাঈ : ১৫৭৮

দিকে আহ্বান করবে সে ঐ ভ্রষ্টপথ অনুসরণকারীর সমপরিমাণ গুনাহগার হবে। এতে কারো গুনাহ কম হবে না^{৬৫৭} জারির ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) বলেনঃ-

أَنَّ غَيْرَ مَنْ بَعْدَهُ بِهَا عَمِلَ مَنْ وَأَجْرُ أَجْرُهَا فَلَهُ حَسَنَةٌ سُنَّةَ الْإِسْلَامِ فِي سَنَ مَنْ
وَوَزُرُ وَزُرُهَا عَلَيْهِ كَانَ سَيِّئَةً سُنَّةَ الْإِسْلَامِ فِي سَنَ وَمَنْ شَيْءٌ أَجُورِهِمْ مِنْ يَنْقُصَ
مُسْلِمَ شَيْءٍ أَوْزَارِهِمْ مِنْ يَنْقُصَ أَنْ غَيْرَ مَنْ بَعْدَهُ مِنْ بِهَا عَمِلَ مَنْ

অর্থঃ যে ব্যক্তি ইসলামের মধ্যে কোন ভাল কাজের প্রচলন করল তার জন্য সে কাজের প্রতিদান রয়েছে এবং পরবর্তীতে যারা ঐ ভাল কাজের উপর আমল করল তা থেকেও সে প্রতিদান পাবে, এতে কারো প্রতিদান কম করা হবে না। এমনিভাবে যে ব্যক্তি কোন মন্দ কাজের প্রচলন করল তার আমলনামায় সে মন্দ কাজের গুনাহ রয়েছে এবং পরবর্তীতে উক্ত গুনাহে লিগুদের গুনাহও লিখা হবে। এতে কারো গুনাহ কম হবে না^{৬৫৮}। ইরবাজ বিন সারিয়া (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ-

وَذَرَفَتْ الْقُلُوبُ مِنْهَا وَجِلَتْ مَوْعِظَةٌ وَسَلَّمْ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ وَعَظَّنَا رَسُولُ
أَوْصِيَكُمْ: قَالَ فَأَوْصِنَا مُؤِدُّ مَوْعِظَةٍ كَأَنَّهَا! اللَّهُ يَارَسُولَ: فَقُلْنَا الْعِيُونَ مِنْهَا
مِنْكُمْ يَعْشَى مَنْ فَإِنَّهُ عَبْدٌ، عَلَيْكُمْ تَأْمُرُ وَإِنْ وَالطَّاعَةِ وَالسَّمْعِ اللَّهُ يَتَّقُوا
الرَّاشِدِينَ الْخُلَفَاءَ وَسُنَّةَ بِسُنَّتِي فَعَلَيْكُمْ كَثِيرًا اخْتِلَافًا فَسَيَرَى بَعْدِي
فَإِنَّ الْأُمُورَ وَتَحْدَثَاتٍ وَإِيَّاكُمْ بِالتَّوَاجِدِ عَلَيْهَا وَعَضُوا بِهَا تَمَسَّكُوا الْمَهْدِيِّينَ
أَبُودَاوُدَ). ضَلَالٌ بِدَعَةٍ كُلِّ

অর্থঃ একদা রাসূল (ﷺ) আমাদের মাঝে এমন ভাষণ দিলেন যাতে আমাদের অন্তর বিগলিত হল এবং চক্ষু হতে অশ্রু প্রবাহিত হল, তখন আমরা বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল! মনে হচ্ছে এ আলোচনা যেন বিদায়ী উপদেশ। সুতরাং আমাদের আরো কিছু ওসিয়ত করুন। তখন তিনি বললেনঃ আল্লাহকে ভয় কর, আমীরের কথা শোন এবং তার আনুগত্য কর; যদিও সে কৃতদাস হয়। আর যে ব্যক্তি আমার পর বেঁচে থাকবে সে অনেক মতানৈক্য দেখতে পাবে, সে সময় তোমাদের উচিত হবে আমার এবং আমার খোলাফায়ে রাশেদার সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরা যেমনি তোমরা কোন বস্তু মাড়ির দাঁত দিয়ে মজবুত ভাবে আঁকড়ে ধর। বিদ'আত পরিহার কর। কেননা সকল প্রকার বিদ'আতই পথভ্রষ্টতা^{৬৫৯}। অন্যত্র হুজাইফা (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ

أَسْأَلُهُ وَكُنْتُ الْخَيْرِ عَنْ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولَ يَسْأَلُونَ النَّاسُ كَانَ
وَشَرِّ جَاهِلِيَّةٍ فِي كُنَّا إِنَّا اللَّهُ رَسُولَ يَا فَقُلْتُ يُدْرِكُنِي أَنْ مَخَافَةَ الشَّرِّ عَنْ
بَعْدَ وَهَلْ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ شَرِّ مِنَ الْخَيْرِ هَذَا بَعْدَ فَهَلْ الْخَيْرِ بِهَذَا اللَّهُ فَجَاءَنَا
بِغَيْرِ يَهُدُونَ قَوْمٌ قَالَ دَخْنُهُ وَمَا قُلْتُ دَخْنٌ وَفِيهِ نَعَمْ قَالَ خَيْرٌ مِنَ الشَّرِّ ذَلِكَ
دُعَاءُ نَعَمْ قَالَ شَرِّ مِنَ الْخَيْرِ ذَلِكَ بَعْدَ فَهَلْ قُلْتُ وَتُنْكِرُ مِنْهُمْ تَعْرِفُ هَدْيِي
لَنَا صِفَتُهُمُ اللَّهُ رَسُولَ يَا قُلْتُ فِيهَا قَدْ فُؤُوهُ إِلَيْهَا أَجَابَهُمْ مَنْ جَهَنَّمَ أَبْوَابٍ عَلَى
قَالَ ذَلِكَ أَذْرِكُنِي إِنْ تَأْمُرُنِي فَمَا قُلْتُ بِأَلْسِنَتِنَا وَيَتَكَلَّمُونَ جِلْدَتِنَا مِنْ هُمْ قَالَ
قَالَ إِمَامٌ وَلَا جَمَاعَةٌ لَهُمْ يَكُنْ لَمْ فَإِنْ قُلْتُ وَإِمَامَهُمُ الْمُسْلِمِينَ جَمَاعَةٌ تَلْزَمُ

الْمَوْتُ يُذَرِّكَ حَتَّى شَجَرَةٍ بِأَصْلٍ تَعَصُّ أَنْ وَلَوْ كُلُّهَا الْفِرَقَ تِلْكَ فَأَعْتَرِلَ
عليه متفق ذَلِكَ عَلَى وَأَنْتَ

অর্থঃ লোকজন রাসূল (ﷺ) কে কল্যাণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করত, আর আমি অকল্যাণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতাম যাতে তা থেকে বেঁচে থাকতে পারি। কোন এক সময় আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা জাহেলিয়াত ও কুসংস্কারের মাঝে নিমজ্জিত ছিলাম, অতঃপর আল্লাহ আমাদের কল্যাণের পথ দেখালেন, এ কল্যাণের পরে কি আবার অকল্যাণ আসবে? উত্তরে তিনি বললেন, হ্যাঁ; অতঃপর আবার জিজ্ঞেস করলাম, এ অকল্যাণের পর কি আবার কল্যাণ আসবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ; কিন্তু তার মধ্যে ফ্যাসাদ থাকবে। আমি বললাম, তার মধ্যে ফ্যাসাদ কি? তিনি বললেন, এক দল লোক সুন্নাতের অনুসারী হবে বটে, তবে তা আমার সুন্নাত নয়। তারা আমার সুন্নাত ছেড়ে অন্য মতাদর্শ গ্রহণ করবে, তাদের মাঝে সৎকর্ম এবং অসৎকর্ম উভয়টিই পাওয়া যাবে। আমি বললাম, এ কল্যাণের পরও কি আবার অকল্যাণ আসবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ; একদল লোক মানুষকে জাহান্নামের দিকে আহ্বান করবে, যারা তাদের ডাকে সাড়া দেবে তারা জাহান্নামের স্বাদ গ্রহণ করবে।

অতঃপর আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! তাদের পরিচয় দিন। তিনি বললেন, তারা আমাদের স্ব-জাতি ও আমাদের ভাষাতেই কথা বলবে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! ঐ সময় যদি আমি বেঁচে থাকি তাহলে আমার জন্য আপনার পরামর্শ কি? তিনি বললেন, তুমি মুসলিম জামাআত ও তাদের ইমামের অনুসরণ

করবে। আমি বললাম, যদি তাদের জামাআত ও ইমাম না থাকে? তিনি বললেন - তাহলে সকল জামাআতই পরিত্যাগ করবে। যদি প্রয়োজন হয় কোন গাছের শিকড় ধরে আমরণ এভাবে পড়ে থাকবে^{৬০}।

এ হাদীসের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, هدى (হাদী) শব্দের অর্থ হল ত্বরীকা ও আদর্শ। আর জাহান্নামের দিকে আহ্বানকারী দল প্রসঙ্গে উলামায়ে কেরাম বলেন, তারা হল সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ যারা মানুষকে বিদআতের দিকে আহ্বান করে। যেমন- খারেজী, কারামতী ও বস্ত্রবাদী দল^{৬১}। যায়েদ বিন আরকাম (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) বলেনঃ-

تَارِكٌ وَأَنَا فَأُجِيبَ رَبِّي رَسُولُ يَأْتِي أَنْ يُوشِكُ بَشَرٌ أَنَا فَإِنَّمَا النَّاسُ أَهْلُهَا أَلَا
 مِنَ الْمُتِينَ اللَّهُ هُوَ حَبْلٌ وَالْثَوْرُ الْهُدَى فِيهِ اللَّهُ كِتَابٌ أَوْلَهُمَا ثَقَلَيْنِ فِيكُمْ
 الضَّلَالَةُ عَلَى كَانَ تَرْكُهُ وَمِنَ الْهُدَى عَلَى كَانَ أَتْبَعَهُ
 مُسْلِمٌ بِهِ وَاسْتَمْسِكُوا اللَّهَ بِكِتَابٍ فَخُذُوا

অর্থ: হে লোকসকল! নিশ্চয়ই আমি একজন মানুষ, যখনই আমার রবের পক্ষ থেকে মৃত্যুদূত আসবে তখনই আমি তার আহ্বানে সাড়া দেব। আর আমি তোমাদের জন্য দু'টি বস্তু রেখে যাচ্ছি। তার একটি হল আল্লাহর কিতাব (অপরটি আমার সুন্নাহ), যাতে রয়েছে হেদায়াত ও নূর। এটা আল্লাহর সুদৃঢ় রশি। যারাই এ কিতাব

মেনে চলবে তারাই হেদায়াত পাবে। আর যারা তা ছেড়ে দেবে তারা পথভ্রষ্ট হবে। তোমরা আল্লাহর কিতাব সুদৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধর^{৬৬২}।

এ হাদীসে আল্লাহর কিতাব মেনে চলার প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে। আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) বলেনঃ-

تَسْمَعُوا لَمْ يَمَّا الْأَحَادِيثِ مِنْ يَأْتُونَكُمْ كَذَّابُونَ دَجَالُونَ الزَّمَانِ آخِرٍ فِي يَكُونُ
يَفْتِنُونَكُمْ مُسْلِمٌ وَلَا يُضِلُّونَكُمْ لَا وَإِيَّاهُمْ فَإِيَّاكُمْ أَبَاؤُكُمْ وَلَا أَنْتُمْ

অর্থঃ শেষ জমানায় এমন কিছু মিথ্যাবাদী প্রতারকের আবির্ভাব ঘটবে, যারা তোমাদের কাছে এমন সব হাদীস বর্ণনা করবে; যা তোমরা ও তোমাদের পূর্ব পুরুষ কোন দিন শোননি। অতএব তোমরা তাদের হতে দূরে থাক যাতে তারা তোমাদের গোমরাহী ও ফিতনায় ফেলতে না পারে^{৬৬৩}। যারা বিদআতের চর্চা করেন তারা শুধু ইহকালেই নিন্দনীয় নন বরং পরকালে রয়েছে তাদের জন্য মারাত্মক পরিণতি। যারা বিদআত সৃষ্টি করে আর যারা তাদেরকে প্রশ্রয় দেয় তাদের সকলকে হাদীস শরীফে লা'নত করা হয়েছে। এ সম্পর্কে নিম্নে কতিপয় দলীল পেশ করা হলোঃ

১। আমল নষ্ট হওয়াঃ মহান আল্লাহ বলেন -

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا. الَّذِينَ ضَلَّ سَعِيَّهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا.

“হে নবী আপনি বলে দিন যে, আমি কি তোমাদেরকে বলব: কারা আমলের দিক থেকে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত? তারা হলো যারা তাদের পার্থিব

৬৬২ মুসলিম: ২৪০৮

৬৬৩ মুকাদ্দামায়ে মুসলিম: ৬ ও ৭

জীবনের সকল চেষ্টাকে ধ্বংস করে দিয়েছে। অথচ তাদের ধারণা যে, তারা ভাল কাজই করছে^{৬৪}।” এ আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত আলী (রাঃ) ও সুফিয়ান সাওরী (রহঃ) বলেন, **صَلَّ سَعِيَّهُمْ** তথা “আমলের দিক থেকে ক্ষতিগ্রস্ত” বলতে বিদআত চর্চাকারীকে বুঝানো হয়েছে।

২। আমল কবুল না হওয়াঃ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসূল (ﷺ) বলেছেন-

ابى الله ان يقبل عمل صاحب بدعة حتى يدع بدعته

“মহান আল্লাহ্ বিদআতীদের আমল কবুল করতে অস্বীকার করেছেন, যতক্ষণ না তারা তা পরিত্যাগ করে।”

৩। তাওবার পথ বন্ধ হওয়াঃ

ان الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته

“নিশ্চয় আল্লাহ্ প্রত্যেক বিদআতীদের তাওবায় পথ বন্ধ করে দেন। যতক্ষণ না সে তার বিদআতকে ছেড়ে দেয়।

৪। হাউজে কাওসার থেকে বঞ্চিত হওয়াঃ “সহীহ মুসলিম ও মুসনাদে আহমদে বর্ণিত, হাশরের ময়দানে রাসূলে কারীম (সাঃ) তার উম্মতকে পেয়ালা ভরে ভরে হাওযে কাওসারের পানি পান করাবেন। লোকেরা এক দিক থেকে আসতে থাকবে ও পানি পান করে পরিতৃপ্ত হয়ে অপর দিকে চলে যেতে থাকবে। এ সময় তার একদল উম্মত হাওজে কাওসারের দিকে আসতে থাকবে। তখন নবী (সাঃ) বলেছেন -

محال بينى وبينهم

“আমার ও তাদের মাঝে প্রতিবন্ধক দাঁড় করিয়ে দেওয়া হবে।”

তখন আমি আল্লাহকে বলব এদের বাধা দেওয়া হল কেন? তখন

আল্লাহ্ বলবেনঃ

انك لاتدرى ما احدثوا بعدك -

وانهم غيروا دينك

নিশ্চয় আপনি জানেন না, অথচ তারা আপনার পরে দ্বীনের মধ্যে নতুন বিষয় আবিষ্কার করেছিল।

আর নিশ্চয় তারা আপনার দ্বীনকে পরিবর্তন করেছিল।

৫। বিদআতীরা ইসলাম থেকে বেরিয়ে যায়ঃ

لا يقبل الله لصاحب بدعة صوما ولا صلاة ولا صدقة ولا حجا ولا عمرة ولا جهادا ولا صرفا ولا عدلا يخرج من الإسلام كما تخرج الشعرة من العجين.

“বিদআতী ব্যক্তির নামাজ, রোজা, সদ্কা, হাজ্জ, উমরাহ্, জিহাদ এবং ফরয ও নফল ইবাদত কিছুই আল্লাহ্ তাআলা কবুল করেন না। সে ইসলাম থেকে এরূপ বেরিয়ে যায় যেমন আটা থেকে চুল বেরিয়ে যায়।”^{৬৬৫}

৬। আল্লাহ ও ফেরেশতাদের লা‘নতঃ

من احدث فيها حدثا او اوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين.

“যে ব্যক্তি বিদআত সৃষ্টি করবে, অথবা বিদআত চর্চা কারীকে আশ্রয় দিবে তার উপর আল্লাহ্, ফেরেশতা ও সমস্ত মানুষের লা‘নত বর্ষিত হবে।” এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তাআলা এরশাদ করেছেনঃ

فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“যারা তাঁর রাসূলের হুকুমের বিরোধিতা করে তাদের ভয় করা উচিত যে, তাদের উপর কোন ফিতনা বা কোন মর্মদন্ত — শাস্তি আসতে পারে^{৬৬৬}।”

৭। জাহান্নামের কুকুরঃ অন্য বর্ণনা রাসূল (সঃ) বলেন-

قال رسول الله ص اصحاب البدع كلاب اهل النار

“বিদআতীরা হলো জাহান্নামের কুকুর^{৬৬৭}।”

৮। ইসলাম ধ্বংস কারীঃ

من وقر صاحب البدعة فقد اعان على هدم الاسلام

“যে ব্যক্তি কোন বিদআতীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করল সে ইসলাম ধ্বংস করার কাজে সাহায্য করল^{৬৬৮}।

৯। রিসালাত অস্বীকার কারীঃ

قال امام مالك من ابتدع بدعة يراها حسنة فقد زعم ان محمدا ص قد خان في الرسالة

“যে ব্যক্তি (ইসলামের মাঝে) কোন বিদআতের উদ্ভাবন করে এবং একে সাওয়াবের কাজে মনে করে প্রকৃত পক্ষে সে অভিযোগ আনল যে, মুহাম্মদ (সাঃ) তার রিসালাতের দায়িত্ব পালনে খিয়ানত করেছেন। (আল-ইতিসাম)

পঞ্চম পরিচ্ছেদ - বিদআত আবিষ্কারকের তাওবা

নিঃসন্দেহে বিদআত সর্বাধিক ভয়ঙ্কর গুনাহ। মানুষ যখন সদা-সর্বদা বিভিন্ন ধরনের গুনাহর কাজ করতে থাকে, তখন এক পর্যায়ে

^{৬৬৬} সূরা আননূর, আয়াত নং - ৬৩

^{৬৬৭} আল জামী- আসসাগীর

^{৬৬৮} বায়হাকী

এ গুনাহ্ তাকে ধ্বংস করে দেয়। ঐ সকল ধ্বংসকারী গুনাহ্‌র মধ্যে বিদ'আত হচ্ছে সবচেয়ে কঠিন। সুফিয়ান সাওরী (রহঃ) বলেন, সমস্ত গুনাহ্‌র মধ্যে ইবলীসের নিকট সর্বাধিক পছন্দনীয় গুনাহ্ হচ্ছে বিদ'আত। কেননা বান্দা গুনাহ করলে তাওবা করে, কিন্তু বিদ'আত পন্থী বিদআতী আমল সাওয়্যাবের কাজ ভেবে সম্পাদন করে, ফলে তা থেকে তাওবা করে না^{৬৬৯}।

শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলেন, বিদআতের গুনাহ থেকে তাওবা করা হয় না। এর অর্থ হচ্ছে- বিদ'আত সৃষ্টিকারী এমন কিছু ধর্মীয় রীতি-নীতি প্রবর্তন করে যা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে প্রবর্তিত নয়। শয়তান সে সব বিদআতী আমলগুলো আরো চাকচিক্যময় করে তার সামনে উপস্থাপন করে। তখন সে এগুলোকে সৎকাজ বিবেচনা করে। ফলে এ থেকে সে তাওবা করার প্রয়োজন মনে করে না। কেননা তাওবার প্রথম পর্যায় হলো, সে কৃত কাজগুলো মন্দ হিসেবে জানবে, যাতে সে তাওবা করতে পারে। কিন্তু তার দৃষ্টিতে এ বিদ'আত কাজটি যেহেতু সৎকাজ হিসাবে পরিগণিত। তাই সে মনে করে, যদি সে এ কাজ ছেড়ে দেয় তাহলে একটা সৎকাজ ছেড়ে দিল। এ ভাবে সে ঐ বিদ'আত কাজ ছাড়তেও পারে না এবং তা থেকে তাওবা করার সুযোগ হয়ে ওঠে না^{৬৭০}। এরপর ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলেনঃ হ্যাঁ, তাওবা তখন সম্ভব যখন আল্লাহ্ তা'আলা তাকে সঠিক পথের

৬৬৯ শরহুস সুম্মাহ -আল-বাগতী (র): ১/২২৬

৬৭০ মাজমুয়ায়ে ফতোয়ায়ে ইবনে তাইমিয়া (র) : ১০/৯

সন্ধান দান করেন এবং তাওবা করার তাওফিক দান করেন। যেমনিভাবে আল্লাহ তা'আলা অনেক কাফের, মুশরিক, মুনাফিক ও বিদআতের অনুসারীদের হেদায়াত দান করেছেন^{৬৭১}। তিনি আরো বলেনঃ যে ব্যক্তি বলে, আল্লাহ তা'আলা বিদ'আত পন্থীদের তাওবা কবুল করবেন না সে মারাত্মক ভুল করল^{৬৭২}।

ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বিদ'আত সৃষ্টিকারীর তাওবা আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য হবে না সংক্রান্ত হাদীসটির ব্যাখ্যা করেছেন। হাদীসটি হচ্ছেঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ

(إِنَّ اللَّهَ حَبَبَ التَّوْبَةِ عَنْ صَاحِبٍ كُلِّ بَذْعَةٍ. (الطبراني)

অর্থঃ আল্লাহ কোন বিদ'আত সৃষ্টিকারীর তাওবা গ্রহণ করবেন না^{৬৭৩}। ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) কর্তৃক এ হাদীসের ব্যাখ্যা ইতিপূর্বে স্পষ্ট ভাবে বর্ণিত হয়েছে। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, কুরআনের এক আয়াত অন্য আয়াতের তাফসীর বা ব্যাখ্যা।

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাকে লক্ষ্য করে বলেন, বান্দা যখন গুনাহের কাজ থেকে বিরত থাকে, কৃত কর্মের জন্য অনুতপ্ত ও লজ্জিত হয়, দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হয় যে, সে অনুরূপ গুনাহে আর লিপ্ত হবে না এবং প্রাপকদের হক যথাযথ ভাবে আদায় করবে, তাহলে আল্লাহর ওয়াদা হচ্ছে, তাওবার পর আল্লাহ তাকেও ক্ষমা করে দিবেন যদিও সে মুশরিক, হত্যাকারী বা ব্যাভিচারী হয়। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ

৬৭১ মাজমুয়ায়ে ফতোয়ায়ে ইবনে তাইমিয়া (র) : ১০/৯

৬৭২ ঐ

৬৭৩ আল-মুজামুল আওসাত-তিবরানী (র) : ৪৭১৩

إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ
(৭০): وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. (الفرقان)

অর্থঃ কিন্তু যারা তাওবা করে, ঈমান আনে এবং সৎ কাজ করে আল্লাহ তাদের যাবতীয় পাপ নেক দ্বারা পরিবর্তন করে দিবেন। আর আল্লাহ হলেন অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও করুণাময়^{৬৭৪}। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ

(৮২): وَإِنَّهُ لَغَفَّارٌ لِّمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى. (طه)

অর্থঃ নিশ্চয়ই আমি ক্ষমাশীল ঐ ব্যক্তির জন্য যে তাওবা করে, ঈমান আনে, সৎকাজ করে এবং এর উপর অবিচল থাকে^{৬৭৫}। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ
(৫৩): الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. (الزمر)

অর্থঃ বলুন, হে আমার বান্দারা! তোমরা যারা নিজেদের উপর যুলুম বা অবিচার করেছ, তোমরা আল্লাহর করুণা হতে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের পাপ মোচন করে দিবেন। নিশ্চয়ই তিনি অতীব ক্ষমাশীল অসীম করুণাময়^{৬৭৬}। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ

وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا

অর্থঃ আর যে ব্যক্তি কোন মন্দ আমল করে অথবা নিজের উপর অবিচার করে। অতঃপর আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে। তাহলে

৬৭৪ ফুরকান : ৭০

৬৭৫ তাহা : ৮২

৬৭৬ যুমার : ৫৩

সে আল্লাহকে ক্ষমাশীল ও করুণাময় হিসেবেই পাবে^{৬৭৭}। এ তাওবা ব্যাপক, যা সকল নাস্তিক, কাফির, মুশরিক, বিদ'আত সৃষ্টিকারী এবং সকল গুনাহ্‌গারদের জন্য। যদি সে তাওবার শর্তগুলো পূর্ণ করে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ - বিদ'আত চেনার ব্যাপারে একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি

আর এ ক্ষেত্রে বিধিবদ্ধ নিয়ম হল এ কথা বলা যে, মানুষ নতুন করে কোনো কিছু তখনই উদ্ভাবন করে, যখন তারা সেটাকে যথাযথ ও কল্যাণকর মনে করে, কেননা তারা যদি বিশ্বাস করত যে, তাতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী কিছু আছে, তাহলে তারা তা উদ্ভাবন করত না; সুতরাং যখন মানুষ কোনো কিছুকে যথাযথ ও কল্যাণকর মনে করবে, তখন সেটার কারণের প্রতিও নজর দিতে হবে; অতঃপর যদি কারণটি এমন বিষয় হয়, যার উদ্ভব হয়েছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে, তাহলে প্রয়োজনের দাবি অনুযায়ী নতুন বিষয় উদ্ভাবন করা বৈধ হবে, যেমন- দলিল-প্রমাণ গ্রন্থবদ্ধ করা; কেননা, এর প্রয়োজনীয় কারণ হল ভ্রান্ত দল ও গোষ্ঠীর আত্মপ্রকাশ; সুতরাং তারা যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে আত্মপ্রকাশ করেনি, তখন তার প্রয়োজন হয়নি। আর যদি এই ধরনের কাজের চাহিদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে বিদ্যমান থাকে, কিন্তু এমন অস্থায়ী কারণে তা পরিত্যাগ করা হয়, যা তাঁর মৃত্যুর কারণে দূর হয়ে গেছে, তাহলে

অনুরূপভাবে তা উদ্ভাবন করা বৈধ হবে। যেমন- কুরআন সংকলন করা; কারণ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় এই কাজের প্রতিবন্ধকতা ছিল ওহী অবতীর্ণ অব্যাহত থাকা, কেননা আল্লাহ তা'আলা তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী তা পরিবর্তন করতেন; অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর মাধ্যমে এই প্রতিবন্ধকতার অবসান ঘটে।^{৬৭৮} বিদ'আতীর কাজের পরিণতি ওটি, যথাঃ

(১) ঐ বিদ'আতী কাজ বা আমল আল্লাহর দরবারে কখনোই গৃহীত হবে না।

(২) বিদ'আতী কাজ বা আমলের ফলে মুসলিম সমাজে গোমরাহী বিস্তার লাভ করে এবং

(৩) এ গোমরাহীর চূড়ান্ত ফলাফল হলো বিদ'আত কার্য সম্পাদনকারীকে জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করতে হবে। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, যে ব্যক্তি আমাদের শরী'আতে এমন নতুন কিছু সৃষ্টি করল যা তার মধ্যে নেই, তা প্রত্যাখ্যাত। (সহীহুল বুখারী ও মুসলিম)^{৬৭৯}

রাসূল (ﷺ) আরও বলেছেন, আর তোমরা দ্বীনের মধ্যে নতুন কিছু সংযোজন করা থেকে সাবধান থেকো! নিশ্চয়ই প্রত্যেক নতুন সংযোজন বিদ'আত। আর প্রত্যেকটি বিদ'আত গোমরাহীর পথে

৬৭৮ [তথ্যসূত্রঃ সংকলন: শাইখ আহমদ আর-রুমী আল-হানাফী (রহঃ), অনুবাদক: মোঃ আমিনুল ইসলাম, সম্পাদনা:

ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া, সূত্র: ইসলাম প্রচার ব্যুরো, রাবওয়াহ, রিয়াদ, সৌদিআরব]।

৬৭৯ বুখারী ও মুসলিম

পরিচালিত করে আর প্রত্যেক গোমরাহীর পরিণাম হলো
জাহান্নাম। ৬৮০

সপ্তম পরিচ্ছেদ – বিদ'আতের ভয়াবহতা

বিদ'আতের ভয়াবহতার কারণ হল, অপরাধী ব্যক্তি জানে যে, সে অপরাধের সাথে জড়িত, ফলে তার পক্ষ থেকে আশা করা যায় যে সে তা থেকে তাওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা করবে। কিন্তু বিদ্বত'আতের অনুসারী বিশ্বাস করে যে, সে আনুগত্য ও ইবাদতের মধ্যেই আছে, ফলে সে তাওবা করে না এবং ক্ষমাও প্রার্থনা করে না। আর এটাই ইবলিস থেকে বর্ণনা করা হয় যে, সে বলে: “আমি আদম সন্তানদের পিঠ ভেঙ্গে দেই অপরাধ ও পাপরাশি দ্বারা, আরা তারা আমার পিঠ ভেঙ্গে দেয় তাওবা ও ইস্তিগফারের (ক্ষমা প্রার্থনা করার) দ্বারা; তাই আমি তাদের জন্য এমন কতগুলো অপরাধের প্রবর্তন করি যার থেকে তারা ক্ষমা প্রার্থনা করে না এবং তার থেকে তারা তাওবাও করে না আর সেগুলো হল ইবাদতের আকৃতিতে বিদ'আত।” [একটি সন্দেহ অপনোদন]। যদি বলা হয় যে, অনেক মানুষের অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেছে যে, তাদের মাঝে ব্যাপকভাবে প্রচলিত একটি হাদীসের দ্বারা তারা তাদের অভ্যাসে পরিণত হওয়া বিদ'আতকে মাকরুহ না হওয়ার ব্যাপারে দলিল পেশ করে থাকে, সে হাদীসটি হলঃ

مَا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ قَبِيحًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ قَبِيحٌ

“মুমিনগণ যা উত্তম বলে মনে করেন, তা আল্লাহর নিকট উত্তম; আর মুসলিমগণ যা মন্দ বলে মনে করেন, তা আল্লাহর নিকট মন্দ”! এখন প্রশ্ন হচ্ছে, তাদের পক্ষ থেকে এর দ্বারা যুক্তি প্রদর্শন শুদ্ধ হবে, নাকি অশুদ্ধ হবে?

[উত্তর] কোনো কোনো বিশেষজ্ঞ যা আলোচনা করেছেন, তার উপর ভিত্তি করে এর জবাব হল: এই যুক্তি প্রদর্শন বিশুদ্ধ নয়, আর হাদীসটি তাদের বিপক্ষে দলিল, তাদের পক্ষে নয়; কারণ, তা ইবনু মাস্কুউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত মাওকুফ। হাদীসের অংশবিশেষ, যা আহমদ, বায্যার, তাবারানী, তায়ালাসী ও আবু নু‘আইম বর্ণনা করেছেন; হাদীসটি এই রকমঃ

إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالة ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رأوا سيئا فهو عند الله سيئ (أخرجه أحمد)

“নিশ্চয়ই আল্লাহ বান্দাদের অন্তরসমূহের প্রতি দৃষ্টি দিয়েছেন, অতঃপর তিনি বান্দাদের অন্তরসমূহের মধ্যে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্তরকে সর্বোত্তম পেয়েছেন, অতঃপর তাঁকে তিনি তাঁর নিজের জন্য নির্বাচন করেছেন, অতঃপর তাঁকে তিনি তাঁর রিসালাতের দায়িত্ব দিয়ে প্রেরণ করেছেন; অতঃপর তিনি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্তরের পর (বাকি) বান্দাদের অন্তরসমূহের প্রতি দৃষ্টি দিয়েছেন, তারপর তিনি বান্দাদের

অন্তরসমূহের মধ্যে তাঁর সাহাবীদের অন্তরসমূহকে সর্বোত্তম পেয়েছেন, অতঃপর তিনি তাদেরকে তাঁর নবীর উজির বা সাহায্যকারী বানালেন, যারা তাঁর দীনের জন্য লড়াই করবে।

সুতরাং মুসলিমগণ যা উত্তম বলে মনে করবে, তা আল্লাহর নিকট উত্তম; আর মুসলিমগণ যা মন্দ বলে মনে করবে, তা আল্লাহর নিকট মন্দ।” কোনো সন্দেহ নেই যে, المسلمون শব্দের মধ্যে “ال” টি সাধারণভাবে গোটা (মুসলিম) জাতিকে বুঝানোর জন্য নয়; কারণ, হাদীসটি তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণীর বিরোধী হয়ে যাবে, তিনি বলেছেনঃ

سَتَفْتَرُ أُمِّي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً ثِنْتَانِ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ وَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ
(وَهِيَ الْجَمَاعَةُ) . (أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ)

“অচিরেই আমার উম্মাত তিহাতুর দলে বিভক্ত হয়ে যাবে, তাদের বাহাতুর দল জাহান্নামে যাবে, আর একটি দল জান্নাতে যাবে, আর সে দলটি হল আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আত।” কেননা, উম্মাতের প্রতিটি ফিরকা বা দলই মুসলিম, সে তার মাযহাবকে উত্তম মনে করে, সুতরাং যদি সবার ভালো মনে করা ও সবার কথাই গ্রহণযোগ্য হয় তবে তো কোনো দলই জাহান্নামী না হওয়া আবশ্যক হয়ে পড়ে। যা হাদীসের ভাষ্যের পরিপন্থী। অনুরূপভাবে মুসলিমদের কেউ কেউ কোনো জিনিসকে উত্তম মনে করে, আবার তাদের কেউ কেউ সেই জিনিসটিকেই মন্দ মনে করে, এমতাবস্থায় (যদি সবার কথাই গ্রহণযোগ্য হয়, তবে) তো উত্তম থেকে মন্দ আলাদা না করা

আবশ্যক হয়ে পড়ে। যা হাদীসের ভাষ্যের পরিপন্থী। তাই বিশুদ্ধ কথা হচ্ছে, -

হাদীসে বর্ণিত, "المسلمون" শব্দের মধ্যকার "ال" টি "عهد" বা পূর্বে বর্ণিত বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত হবে। এখানে পূর্ববর্ণিত বিষয় হচ্ছে, "তারপর তিনি বান্দাদের অন্তরসমূহের মধ্যে তাঁর সাহাবীদের অন্তরসমূহকে সর্বোত্তম পেয়েছেন, অতঃপর তিনি তাদেরকে তাঁর নবীর উজির বা সাহায্যকারী বানালেন। অর্থাৎ হাদীসে মুসলিমগণ বলে সাহাবীগণকেই উদ্দেশ্য নেওয়া হয়েছে। অথবা "المسلمون" শব্দের মধ্যকার "ال" টি দ্বারা "خصائص الجنس" বা মুসলিম শব্দের মুসলিম জাতির অন্তর্নিহিত কোনো বৈশিষ্ট্যকে উদ্দেশ্য নেওয়া হয়েছে। তখন মুসলিম বলে বুঝানো হবে ইসলামের গুণে পরিপূর্ণ ব্যক্তিগণ, অর্থাৎ তাদের মধ্যে যারা ইজতেহাদ করত সক্ষম। এর মাধ্যমে সাধারণগুণ বিশিষ্টকে পূর্ণাঙ্গ গুণবিশিষ্টদের সম্পৃক্ত করা হবে। কারণ, ইঙ্গিত না পাওয়াকালীন সময়ে মুতলাক (مطلق) তথা সার্বজনীন বিষয়টি একটি পরিপূর্ণ শ্রেণীর দিকে স্থানান্তরিত হবে, আর সে শ্রেণি হলো মুজতাহিদ তথা গবেষক শ্রেণী; সুতরাং হাদীসের সঠিক অর্থ হবে: সাহাবীগণ অথবা মুসলিমদের মুজতাহিদগণ যা উত্তম মনে করবে, তা আল্লাহর নিকট উত্তম; আর সাহাবীগণ অথবা মুসলিমদের মুজতাহিদগণ যা মন্দ বলে মনে করবে, তা আল্লাহর নিকট মন্দ। তাছাড়া "المسلمون" শব্দের মধ্যকার "ال" টিকে তার প্রকৃত "استغراق" বা এক জাতীয় সকল ব্যক্তি বা বস্তুর অর্থে ব্যবহার করাও বৈধ হবে, তখন তার অর্থ হবে: "যা সকল মুসলিম উত্তম

মনে করবে, তা আল্লাহর নিকট উত্তম; আর যা সকল মুসলিম মন্দ মনে করবে, তা আল্লাহর নিকট মন্দ। আর যে ব্যাপারে মতবিরোধ হবে, সেক্ষেত্রে বিবেচনাযোগ্য বিষয় হবে সেসব যুগের ব্যক্তিবর্গের মন্তব্য, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণীর মধ্যে যাদের শ্রেষ্ঠত্বের ব্যাপারে সাক্ষ্য দেওয়া হয়েছে, ঐসব যুগের ব্যক্তিবর্গের মন্তব্য নয়, যাদের ব্যাপারে মিথ্যাবাদিতা ও অনির্ভরযোগ্যতার সাক্ষ্য দেওয়া হয়েছে, তিনি বলেছেনঃ

خَيْرُ الْقُرُونِ الَّذِي بَعَثْتُ فِيهِ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ يَفْشُو الْكَذِبُ
 “আমার যুগ সর্বশ্রেষ্ঠ যুগ, যাতে আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে, অতঃপর তাদের সাথে যারা সম্পৃক্ত হবে, অতঃপর তাদের সাথে যারা সম্পৃক্ত হবে, অতঃপর মিথ্যা ছড়িয়ে পড়বে।” সুতরাং (যাদের মধ্যে মিথ্যা ছড়িয়ে পড়বে) তোমরা তাদের কথা ও কর্মকাণ্ডসমূহের উপর আস্থা স্থাপন বা নির্ভর করো না। আর কোন সন্দেহ নেই যে, সাহাবী, তাবেরী ও মুজতাহিদ ইমামগণ একান্ত অত্যাবশ্যকতার সীমা অতিক্রমকারী বিদ’আতকে মন্দ ও ঘৃণিতই মনে করতেন, সুতরাং সে-সব বিদ’আত আল্লাহ ত’আলার নিকটও মন্দ। বস্তুত আমাদের উপরোক্ত ব্যাখ্যাটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অপর বাণীর মত, যেখানে তিনি বলেছেনঃ

لا تجتمع أمتي على الضلالة

“আমার উম্মত ভ্রষ্টতার উপর ঐক্যবদ্ধ হবে না।” এই হাদীসেও ‘উম্মত’ বলতে কেবল ‘আহলুল ইজমা’ (যাদের ইজমা বা ঐকমত্য গ্রহণযোগ্য এমন লোকগণ) উদ্দেশ্য, যিনি হবেন এমন মুজতাহিদ

(দ্বীনী গবেষক), যার মধ্যে আসলেই কোনো প্রকার ফাসেকী (পাপাচারিতা) ও বিদ'আত নেই; কারণ, ফিসক তথা পাপাচার যে তা করে সে ব্যক্তিকে অপবাদের অভিযোগে অভিযুক্ত করে এবং তা ন্যায়পরায়ণতাকে বিদূরিত করে, আর বিদ'আতপন্থী ব্যক্তি মানুষকে বিদ'আতের দিকে আহ্বান করে এবং সে সাধারণভাবে উম্মতের অন্তর্ভুক্ত হবে না; কেননা, সাধারণ উম্মত দ্বারা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতকে বুঝানো হয়, আর তারা হলেন এমন উম্মত, যাদের পথ হল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীদের পথ, বিদ'আতপন্থী ও পথভ্রষ্টদের পথ নয়, যেমনটি বলেছেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামঃ

أمتي من استن بسنتي

“আমার উম্মত হল সেই ব্যক্তি, যে আমার সুন্নাতকে অনুসরণ করে।” তবে (“আমার উম্মত ভ্রষ্টতার উপর ঐক্যবদ্ধ হবে না” হাদীসে) ‘আমার উম্মত’ (أمتي) দ্বারা সকল উম্মতকে উদ্দেশ্য করাও শুদ্ধ বলা যায়, কারণ কখনও কখনও "إضافة" বা সম্বন্ধ পদ "ال" এর মত "استغراق" তথা সমস্ত ব্যক্তি বা বস্তুকে বুঝানোর জন্য ব্যবহার হয়ে থাকে; সুতরাং অর্থ হবে: “আমার সকল উম্মত মহাকালের কোনো এক কাল বা সময়ে ভ্রষ্টতার উপর ঐক্যবদ্ধ হবে না, যেমনভাবে ইয়াহুদী ও খ্রীষ্টানগণ তাদের নবীদের পরে ভ্রষ্টতার উপর ঐক্যবদ্ধ হয়েছে”; তখন এই হাদীসটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ বাণীর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হবে, যাতে তিনি বলেছেনঃ

لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي قَائِمَةٌ بِأَمْرِ اللَّهِ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ أَوْ خَالَفَهُمْ حَتَّى
 . (يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ عَلَى النَّاسِ) . (أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ)

“আমার উম্মতের একটি দল আল্লাহর বিধানের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে; যারা তাদের সঙ্গ ত্যাগ করবে বা বিরোধিতা করবে, তারা তাদের কোনো প্রকার অনিষ্ট সাধন করতে পারবে না। শেষ পর্যন্ত এভাবে আল্লাহর আদেশ তথা কিয়ামত এসে পড়বে, আর তারা তখনও লোকের উপর সুস্পষ্টরূপে প্রকাশমান থাকবে।”

অষ্টম পরিচ্ছেদ - দ্বীনের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করা

ইবনুল হাম্মাম বলেনঃ যখন কোনো ইবাদতে ওয়াজিব ও বিদআতের মধ্যে দ্বিধাদ্বন্দ্ব দেখা দিবে, তখন সতর্কতার খাতিয়ে তা করা হবে; কিন্তু যদি বিদআত ও সুন্নাতের মধ্যে দ্বিধাদ্বন্দ্ব দেখা দিবে, তখন তা পরিত্যাগ করবে; কারণ, বিদআত ত্যাগ করা আবশ্যিক, আর সুন্নাত আদায় করা আবশ্যিক নয়। অবশ্য ‘আল-খোলাসা’ গ্রন্থকারের একটি মাসআলা প্রমাণ করে যে, ওয়াজিব তরক (ত্যাগ) করার চেয়ে বিদআত অনেক বেশি ক্ষতিকর, যেমন তিনি বলেনঃ যখন কেউ তার সালাতের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করে, সে কি তা সালাত আদায় করেছে, নাকি আদায় করেনি? এমতাবস্থায় সে যদি ওয়াক্তের মধ্যে থাকে, তাহলে পুনরায় তা আদায় করে নেবে; আর যদি সময় অতিবাহিত হয়ে যায়, অতঃপর সে সন্দেহ করে, তাহলে কিছুই করতে হবে না। তবে যদি আসরের সালাত (পড়েছে কি পড়েনি) এর ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করে,

তাহলে সে (যখন দ্বিতীয়বার তা আদায় করবে তখন) প্রথম ও তৃতীয় রাকাতে পাঠ করবে, দ্বিতীয় ও চতুর্থ রাকাতে পাঠ করবে না; কারণ, ফরয সালাতের ক্ষেত্রে কিরাআতের জন্য প্রথম দুই রাকআতকে নির্দিষ্ট করা ওয়াজিব। পক্ষান্তরে নফল সালাতে প্রতি দু'রাকাতেই কিরাআত মেলাতে হয়, তাই যদি পরপর দু' রাকাতাতে কিরাআত পড়া হয়, তখন কোনো কারণে পূর্বে সে যদি ফরয সালাত আসলেই পড়ে থাকে তবে তো সেটা নফল হিসেবে ধর্তব্য হয়ে যাবে, অথচ আসরের পরে কোনো নফল সালাত আদায় করা মাকরুহ, তাই তাকে পরপর প্রতি রাকআতে সূরা মিলিয়ে পড়তে নিষেধ করা হয়েছে, যাতে করে দ্বিতীয়বার পড়া সালাতটি কোনো ক্রমেই ফরয না হয়ে নফল সালাত হিসেবে ধর্তব্য না হয়। কারণ যদি আসরের পরে নফল সালাত আদায় করা হয় সেটি হবে বিদ'আত, যা অপছন্দনীয়। অধিকন্তু আরও বলা যায় যে, দিনের মধ্যে যদি বৃদ্ধি করাটা বৈধ হয়, তাহলে ফজরের সালাত চার রাকাত এবং যোহরের সালাত ছয় রাকাত আদায় করা বৈধ হবে, আর বলা হবে- এটা সৎ আমলের বৃদ্ধি, তার বৃদ্ধিতে কোনো ক্ষতি হবে না; কিন্তু কারও জন্য এ কথা বলার অধিকার নেই। কেননা, বিদ'আত প্রবর্তনকারী যে কল্যাণ ও ফযিলতের কথা ব্যক্ত করে, যদি তা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়ে সাব্যস্ত হত এবং তা সত্ত্বেও তিনি তা না করতেন, তাহলে এই ধরনের কাজ পরিত্যাগ করা সুন্নাত, যা প্রত্যেক ব্যাপক নির্দেশ ও কিয়াসের উপর অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত। সুফিয়ান সাওরী (রহঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি

বলতেনঃ “ইবলিসের নিকট সকল পাপের চেয়ে বিদ’আতই সবচেয়ে বেশি প্রিয়; কারণ, পাপ থেকে তাওবা করা হয়, আর বিদ’আত থেকে তাওবা করা হয় না।”

নবম পরিচ্ছেদ – বিদ’আতের ব্যাপারে সাহাবীগণের অবস্থান

সাহাবাদের একটি বৈশিষ্ট্য ছিল তারা রাসূল (ﷺ) এর সুন্নাহর প্রতি খুবই আনুগত্য প্রকাশ করতেন এবং রাসূল (ﷺ) এর সুন্নাহ অনুযায়ী কাজ করতেন। রাসূল (ﷺ) সুন্নাহ’র বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম চোখে পড়লে তারা তা পরিত্যাগ করতেন এবং যারা সুন্নাহ’র বিন্দুমাত্র পরিবর্তন সাধন করতে চাইত তাদের সতর্ক করে দিতেন। দারেমী এবং আবু নাজ্জিমে সহীহ ইসনাদে বর্ণিত বিদআতীদের প্রতি সাহাবারা বিরূপ আচরণ করতেন তার একটি চমৎকার শিক্ষাগ্রন্থ ঘটনা রয়েছে। সাহাবীদের বর্ণিত ঘটনাটি নিম্নরূপঃ

ফজরের নামাজের পূর্বে আমরা আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদের বাড়ির সামনে অপেক্ষা করতাম তার সাথে মসজিদে যাওয়ার জন্যে। আবু মুসা আশআরী আমাদের নিকট আসলেন এবং আমাদের জিজ্ঞেস করলেনঃ আবু আব্দুর রহমান (আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ) কি চলে গেছেন? আমরা উত্তর দিলামঃ না। আবু মুসা আশআরী আমাদের সাথে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলেন। যখন ইবনে মাসউদ ঘর থেকে বেড়িয়ে এলেন, আমরা উঠে দাড়ালাম এবং আবু মুসা তাকে বললেনঃ আমি সাম্প্রতিক সময়ে

মসজিদে এমন কিছু দেখেছি যা কোনভাবেই আমার মন সায় দিচ্ছে না। ইবনে মাসউদ জিজ্ঞেস করলেনঃ সেটা কি ছিল? আবু মুসা বললেনঃ “আপনি জীবিত থাকলে আপনিও এটি দেখতে পাবেন। মসজিদে দেখলাম একদল লোক কয়েকটি ভাগে ভাগ হয়ে বৃত্তাকারে বসে নামাজের জন্যে অপেক্ষা করছে। প্রত্যেক বৃত্তাকারের জন্যে একটি করে দলনেতা রয়েছে। আর এই বৃত্তাকারের সকলেরই নিকট ছোট ছোট পাথরের নুড়ি রয়েছে”। বৃত্তাকারের দলনেতা তাদের বলছেঃ একশ বার আল্লাহ্ আকবর বল, তারপর তারা একশবার আল্লাহ্ আকবর বলবে; তারপর দলনেতাটি পুনরায় তাদের বলবে, একশবার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বল, তারা একশবার লা ইলাহা পড়বে; তারপর দলনেতাটি বলবে, একশ বার সুবহানাল্লাহ বল আর তারা একশবার সুবহানাল্লাহ পড়বে। তারপর ইবনে মাসউদ বললেনঃ আপনি তাদের কি বলেছেন? তিনি (আবু মুসা) বললেনঃ আমি তাদের কিছু বলেনি। আমি আপনার মতামতের জন্যে অপেক্ষা করতে চেয়েছিলাম। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ বললেনঃ আপনি কি তাদের গুনাহ সমূহ গোনার জন্যে আদেশ দেন নি এবং তাদের নিশ্চিত করতেন যে তারা তাদের পুরস্কার সমূহ ঠিকই পাবে। এরপর আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ আমাদের সামনে এগিয়ে চললেন আর আমরাও তার সাথে সাথে চললাম। তিনি যখন সেই বৃত্তাকারে বসা দলগুলোর একটি বৃত্তের কাছে গেলেন তখন জিজ্ঞেস করলেনঃ তোমরা এটি কি করছ? তারা বললোঃ ওহে আবু আব্দুর রহমান (ইবনে মাসউদ), এগুলো হচ্ছে নুড়ি পাথর আর আমরা এগুলো

দিয়ে কতবার আল্লাহ্ আকবর, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এবং সুবহানাল্লাহ পড়লাম তার গণনা করছি। তিনি (ইবনে মাসউদ) বললেনঃ তোমাদের পাপসমূহ গণনা কর এবং আমি তোমাদের নিশ্চয়তা দিচ্ছি যে, তোমরা তোমাদের পুরস্কারের কোন অংশ থেকেই বঞ্চিত হবে না। তোমাদের উপর লানত, মুহাম্মদের লোকেরা, কত দ্রুতই না তোমরা ধ্বংসের দিকে ধাবিত হচ্ছে। আল্লাহর রাসূলের সাহাবীরা এখন পর্যন্ত বর্তমান, রাসূল (ﷺ) এর কাপড়গুলো এখনো জীর্ণ হয়ে যায় নি, তার আহারের পাত্র এখনো ভেঙ্গে যায়নি। যার হাতে আমার প্রাণ তার শপথ করে বলছি, তোমরা এমন এক ধর্ম অনুসরণ করছ যেটা হয় রাসূল এর ধর্মের চেয়ে উত্তম আর না হয় তোমরা বিচ্যুত হয়ে যাওয়ার দড়জা উন্মোচন করছ। তারা বললোঃ ওহে আবু আব্দুর রহমান, আল্লাহর শপথ, এই কাজটি আমরা সওয়াবের আশা ব্যতীত অন্য কোন নিয়তে করিনি। তিনি (ইবনে মাসউদ) বললেনঃ তাই কি হয়েছে? কত লোকই তো সওয়াবের আশায় ভাল কাজ করতে চায় কিন্তু তারা কি কখনো করতে পারে? আল্লাহর রাসূল আমাদের ঐ ধরনের লোকদের কথা বলেছেন যারা কোরআন পড়বে ঠিকই কিন্তু কোরআন তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। আল্লাহর শপথ, আমি প্রায়ই নিশ্চিত তোমরাই হচ্ছে সেই ধরনের লোক। তারপর তিনি তাদের নিকট থেকে সরে গেলেন। আমরা ইবনে সালামাহ বলেনঃ বৃত্তাকারে বসা ঐ লোকগুলোর অধিকাংশকে আন-নহরের যুদ্ধে খারেজীদের পক্ষ হয়ে আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে দেখেছি। – আদ-দারেমী এবং আবু নাস্ঈমে

সহীহ ইসনাদে ঘটনাটি বর্ণিত হয়েছে। সুবহানাল্লাহ, আল্লাহু আকবর এবং লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়া নিঃসন্দেহে সওয়াবের কাজ কিন্তু এই পড়াটাকে ভিন্ন একটা নিয়মে আবদ্ধ করে প্রতিষ্ঠিত করলে যেভাবে রাসূল (ﷺ) শিক্ষা দেননি, তখন তা বিদ'আত হয়ে যাবে। রাসূল (ﷺ) বলেছেনঃ পর পর আগত কিছু এমন কালেমা রয়েছে প্রত্যেক ফরজ নামাজের পর যার উচ্চারণকারী অথবা আমলকারী ব্যর্থ হবে না। ৩৩ বার 'সুবহানাল্লাহ', ৩৩ বার 'আলহামদু লিল্লাহ' ও ৩৪ বার 'আল্লাহ আকবর'। (মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ)। রাসূল (ﷺ) আলী (রাঃ) এবং ফাতেমা (রাঃ) কে রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে এই কালেমাগুলো ৩৩ বার 'সুবহানাল্লাহ', ৩৩ বার 'আলহামদু লিল্লাহ' ও ৩৪ বার 'আল্লাহ আকবর' পড়তে বলেছিলেন যা আলী (রাঃ) সব সময়ই আমল করতেন। (সহীহুল বুখারী)। এখন কেউ যদি অন্য সময়ও এই কালেমাগুলো পড়তে চায় সে পড়তে পারে কোন সমস্যা নেই। কিন্তু সেটাকে যদি একটি নিয়মে আবদ্ধ করে প্রতিষ্ঠিত করা হয় যেমনঃ প্রতিদিন ফরজ নামাজের আগে গোল হয়ে বসে ১০০ বার পড়া বা সপ্তাহে সকলে একত্রিত হয়ে এভাবে সমস্বরে পড়া। অতএব, যে কেউ সবসময় এই কালেমাগুলো পড়তে চায় সে পড়তে পারবে কোন সমস্যা নেই। কিন্তু উপরে উল্লিখিত ধরণের কোন নিয়মের আওতায় আনা যাবে না। “তোমরা নিজেদেরকে নব উদ্ভাবিত বিষয় (ইবাদত) সমূহ থেকে দূরে রেখ, কেননা প্রত্যেক নবউদ্ভাবিত (দ্বীন) বিষয়ই বিদ'আত , আর প্রত্যেক বিদ'আত হচ্ছে ভ্রান্তি বা ভুল পথ”। (তিরমিযী)। ইমাম মালিক ইবনে আনাস

রহিমাহুল্লাহ বলেন, “যে ব্যক্তি ইসলামের মধ্যে কোন একটি বিদআতের প্রচলন করবে এবং সে বিদআত টিকে খায়ির (ভালো) বলে মনে করবে তাহলে সে আল্লাহর রাসূল (ﷺ) এর নিন্দা করল, বিষয়টি এমন দাড়াল যে রাসূল (ﷺ) তাঁর দায়িত্ব সম্পূর্ণ করেন নি” (যার মানে হলো, তিনি (ﷺ) ঠিকমতো আমাদের কাছে ইসলাম পৌঁছে দেননি)। এখানে লক্ষ্য করুন, মালিক ইবনে আনাস মাত্র একটি বিদআতের কথা বলেছিলেন অনেকগুলো বিদআতের কথা বলেন নি। সুতরাং, বুঝা গেল বিষয়টি অনেক গুরুতর। মালিক ইবনে আনাসের এই কথা শুনে মানুষজন তাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, “ওহে ইমাম, আপনার এই কথার প্রমাণ কি? ইমাম মালিক ইবনে আনাস রহিমাহুল্লাহ বললেন, আপনার ইচ্ছা হলে পড়ে দেখুন, “আজ আমি তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামত সম্পূর্ণ করলাম আর ইসলামকে তোমাদের জীবন বিধান হিসেবে মনোনীত করলাম” (সূরা মায়িদাঃ আয়াত নং - ৩)। ইমাম মালিক ইবনে আনাস রহিমাহুল্লাহ বলেন, এমনকিছু যা ঐদিন দ্বীন ইসলামে ছিল না সুতরাং তা আজকেও দ্বীন ইসলামের অন্তর্ভুক্ত নয়।

আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন, “আমি তোমাদের যা কিছু করতে বলেছি সেই সব ব্যতীত আর কোন কিছুই তোমাদের জান্নাতের নিকটবর্তী করবে না, এবং যে সকল বিষয়ে সতর্ক করেছি সেগুলো ব্যতীত কোন কিছুই তোমাদের জাহান্নামের নিকটবর্তী করবে না”। (মুসনাদে আস শাফেয়ীই এবং অন্যান্য)।

বর্তমান সময়ে অনেককেই দেখা যায় ইসলামের মনগড়া ব্যাখ্যা দিতে, বিভিন্ন রকম পন্থার কথা বলতে যা “ঐদিন দ্বীন ইসলামে ছিল না সুতরাং তা আজকেও দ্বীন ইসলামের অন্তর্ভুক্ত নয়।” মৌখিক, শারীরিক ও আর্থিক সর্বপ্রকার ইবাদত একমাত্র আল্লাহর জন্য। রাসূল (ﷺ) এর উপর আল্লাহর শান্তি, রহমত ও বরকত নাযিল হোক। আমাদের উপর এবং আল্লাহর নিষ্ঠাবান বান্দাহদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। আমীন।

দশম তম পরিচ্ছেদ - সালাফ ও সালাফিয়াতের অনুসরণ এবং বিদ'আত বর্জন

মুসলমানগণ দু'প্রকার : একদল হল সালাফে সালাহীনের অনুসারী। আরেক দল হল পরবর্তী যুগের লোকদের সমঝের অনুসারী। এদেরকে প্রায়ই বিদ'আতে লিপ্ত হতে দেখা যায়। কেননা যারা ইলম ও আমল এবং সমঝ ও বোঝাপড়ার ক্ষেত্রে সালাফে সালাহীনের তরীকা পছন্দ করে না, এর অনিবার্য পরিণতিতে তারা বিদ'আতে আক্রান্ত হন এবং পরিশেষে বিদ'আতী বলে পরিচিত হন। আর সালাফে সালাহীন হলেন : উত্তম যুগের আলেম ব্যক্তিবর্গ। তাদের সম্মুখ সারীতে ও অগ্রভাগে রয়েছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ- আল্লাহ যাদের প্রশংসা করেছেন স্বীয় বাণী দ্বারাঃ

﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا﴾

“মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল। তার সহচরগণ কাফিরদের প্রতি কঠোর এবং নিজেদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল। তুমি

তাদেরকে রুকু ও সেজদায় অবনত দেখবে"। [সূরা ফাতহ : ২৯]। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বয়ং তাদের প্রশংসা করেছেন এ কথা বলে যে, "সর্বোত্তম লোক হল আমার যুগের লোকেরা, অতঃপর তাদের পরবর্তী লোকেরা, এরপর তৎপরবর্তী যুগের লোকেরা..."।

সমস্ত সাহাবাদের প্রশংসায় এবং তাদের চলার পদ্ধতি অনুসরণের ব্যাপারে স্বয়ং সাহাবাগণ এবং তাদের সঠিক অনুসারীদেরও একের পর এক বক্তব্য এসেছে। ইবন মাসউদ রাদি আল্লাহু আনহু বলেন : "তোমাদের কেউ যদি কারো আদর্শ অনুসরণ করতে চায়, সে যেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবাদের আদর্শ অনুসরণ করে। কেননা তারা এ উম্মাতের মধ্যে সবচেয়ে পুণ্যময় হৃদয় ও গভীর জ্ঞানের অধিকারী, যে সমস্ত ব্যাপারে তাদের জ্ঞান নেই সে সমস্ত ব্যাপারে বক্তব্য দেয়ার প্রবণতা তাদের মধ্যে নেই বললেই চলে, অনুরূপভাবে তারা সর্বাধিক সঠিক হেদায়াতের উপর এবং (আমলের দিক থেকে) সর্বোত্তম অবস্থায় ছিলেন। তারা এমন একদল লোক যাদেরকে আল্লাহ তাঁর নবীর সাহচর্যের জন্য এবং তাঁর দ্বীন কায়েমের জন্য মনোনীত করেছেন। সুতরাং তাদের মর্যাদা সম্পর্কে জানুন এবং তাদেরকে পদে পদে অনুসরণ করুন। কেননা তারাই ছিলেন সরল সঠিক হেদায়েতের উপর"। এ বিষয়টি আহলে সুন্নাতের সবার সর্বসম্মত মত। এ ব্যাপারে কোন মতবিরোধ নেই। অতএব তারা যখন এমন বিশাল মর্যাদার অধিকারী ছিলেন, তখন এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই যে, মুসলিম ব্যক্তি আল কুরআন ও

সুন্নাহ বুঝা, বিশ্লেষণ ও তদনুযায়ী আমলের ক্ষেত্রে তাদের অনুসৃত নীতির সাথে সম্পর্কিত হতে গৌরববোধ করবে। মুসলিম উম্মার বিভ্রান্ত প্রত্যেক ফিরকাই সালাফে সালাহীন কুরআন ও হাদীসকে যেভাবে বুঝেছেন তার বিপরীত বুঝ নিয়ে কুরআন-হাদীসের দলীল নিজ নিজ মত ও উদ্দেশ্যের সমর্থনে প্রমাণ হিসাবে পেশ করেছে। এ ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করে তারা একে অপরকে কাফির বলছে এবং আল্লাহর কিতাবের একাংশ দিয়ে অন্য অংশের উপর আঘাত হানছে। প্রত্যেক ফিরকার দাবী অনুযায়ী এসব কিছুই তারা কুরআন-হাদীসকে যে যেভাবে বুঝছে সেভাবে করেছে। ফলে বিভ্রান্ত প্রত্যেক ফিরকাই বলছে যে, আমরা কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী আমল করি। এতে দুর্বল দৃষ্টিসম্পন্ন ও কম ইলমের অধিকারী লোকদের কাছে বিষয়টি অস্পষ্ট হয়ে গেল। এসব বিভ্রান্তিকর দাবী ও কথা থেকে বের হবার উপায় হল সর্বোত্তম যুগের নীতির অনুসরণ। সে যুগের লোকেরা কুরআন-সুন্নাহের বক্তব্য থেকে যা বুঝেছেন তাই হক ও সত্য, আর যা তারা বুঝেননি এবং আমলও করেননি তা সত্য ও সঠিক নয়। আর অনুরূপভাবে সাহাবায়ে কেরাম রাডি আল্লাহু আনহুম থেকে যারা জ্ঞান আহরণ করেছেন, তারা সুন্দরভাবে তাদেরকে অনুসরণ করেছেন। অতএব যে-ই আল-কুরআন ও সুন্নাহ বুঝার ক্ষেত্রে সাহাবাদের এ নীতির অনুসরণ করেছে এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত তাদের যেসব রেওয়ায়েত বিশুদ্ধ, তা গ্রহণ করে আর নিরেট বুদ্ধিভিত্তিক মতামত ও নব উদ্ভাবিত সমঝ ত্যাগ করে, সে-ই সালাফী হিসাবে পরিচিত

হবে। আর যে সে রকম হতে পারবে না, সে খালাফী ও বিদআতী বলে গণ্য হবে। এ বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর জানা দরকার যে, প্রত্যেকটি ইলমী মাসআলা তিনটি অবস্থা থেকে মুক্ত নয় :

এক : এ মাসআলার অনুকূলে সাহাবা ও তাদের অনুসারীবৃন্দ বক্তব্য রেখেছেন এবং তাদের সকলেই সে অনুযায়ী আমল করেছেন, কিংবা কিছুসংখ্যক সে অনুযায়ী আমল করেছেন এবং অন্য কেউ তার বিরোধিতা করেননি।

দুই : কিছু সংখ্যক সাহাবা সে অনুযায়ী আমল করেছেন, তবে অধিকাংশ সাহাবা মাসআলাটিতে তাদের খেলাফ করেছেন।

তিন : উক্ত মাসআলা অনুযায়ী তাদের কেউ আমল করেননি।

অতএব এ হল মোট তিন প্রকার : **প্রথম প্রকার**, যাতে সকল সাহাবা মাসআলা অনুযায়ী আমল করেছেন, অথবা কেউ কেউ করেছেন তবে অন্য কেউ বিরোধিতা করেছেন বলে জানা যায়নি, সন্দেহাতীতভাবে তা এমন সুন্নাহ যার অনুসরণ করা যায় এবং যা পুরোপুরি স্পষ্ট নীতি, সরল পথ ও সুস্পষ্ট প্রমাণ। অতএব উক্ত মাসআলায় তাদের বিরোধিতা করা কারো জন্যই জায়েয নেই। আকীদা ও ইবাদাতের ক্ষেত্রে এর উদাহরণ অনেক এবং এত অধিক যে, তা উল্লেখের প্রয়োজন নেই। **দ্বিতীয় প্রকার**, হল যাতে কতিপয় সাহাবা উক্ত মাসআলা অনুযায়ী আমল করেছেন এবং অধিকাংশ সাহাবা তাদের খেলাফ করেছেন। কেননা স্বল্পসংখ্যক সাহাবা যে মত এখতিয়ার করেছেন এবং যেরূপ আমল করেছেন, অধিকাংশ সাহাবা তা ভিন্ন অন্য মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন ও অন্যরূপ আমল করেছেন।

ইমাম শাতেবী 'আল মুয়াফিকাত ফী উসুলুশ শরীয়া' গ্রন্থে (খ. ৩, পৃ. ৫৭) অধিকাংশ সাহাবার অনুসরণ ওয়াজিব হওয়ার প্রসঙ্গে বলেন : "উক্ত ভিন্ন আমলই (তথা অধিকাংশ সাহাবার আমলই) অনুসৃত সুন্নাত এবং সরল পথ। অন্যদিকে যে কাজটি অল্প সংখ্যক ব্যতীত আর কেউ করেনি, সে কাজটির ব্যাপারে এবং সে অনুযায়ী আমলের ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন। আর যা অধিক ব্যাপক ও অধিকাংশের আমল, তা-ই সর্বদা করা উচিত। কেননা এ স্বল্পসংখ্যকের বিরোধিতা করে পূর্ববর্তীগণ কর্তৃক সর্বদা ভিন্ন আমল হয়ত শরয়ী কোন কারণে সাধিত হয়েছে, কিংবা শরয়ী কারণ ছাড়া অন্য কোন কারণে। কিন্তু স্বল্পসংখ্যকের বিপরীত তাদের এ আমল শরয়ী কারণ ছাড়া অন্য কারণে হওয়ার ব্যাপারটি ঠিক নয়। বরং অবশ্যই তা হয়েছে শরয়ী কোন কারণে, যার ভিত্তিতে তারা আমল করার প্রয়াস পেয়েছেন। আর এ বিষয়টি যখন সাব্যস্ত হয়ে গেল, তখন স্বল্পসংখ্যকের মতানুযায়ী আমল করার ব্যাপারটি উক্ত শরয়ী কারণটির বিরোধী বলে গণ্য হবে - যার ভিত্তিতে অধিকাংশ সাহাবাগণ চিন্তাভাবনা করে আমল করেছেন। যদিও তা প্রকৃতপক্ষে বিরোধী না হয়ে থাকে। অতএব তারা যা নিয়ে চিন্তাভাবনা করেছেন তা নিয়ে চিন্তাভাবনা করা ও যে আমল তারা সর্বদা করেছেন তদনুরূপ আমল করা জরুরী"^{৬৮১}। এরপর তিনি বলেন (খ. ৭০, পৃ. ৭১) : 'এজন্য আমলকারীর উচিত পূর্ববর্তীদের নিয়ম অনুযায়ী যেন

৬৮১ ইমাম শাতেবী অনেকগুলো উদাহরণ পেশ করেছেন। অনুরূপভাবে শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াও তার আত-তাওয়াসুল ওয়াল অসীলাহ' গ্রন্থে অনেকগুলো উদাহরণ পেশ করেছেন।

আমল করতে পারে তা নিয়ে চিন্তাভাবনা করা। তাই স্বল্পসংখ্যকের পদ্ধতিতে আমলের অনুমতি সে যেন নিজেকে না দেয়। অবশ্য একান্ত প্রয়োজনে কিছু কিছু ক্ষেত্রে এমন আমল করা যেতে পারে, যদি তাতে অনুমতি থাকে এবং আমল রহিত হওয়ার কিংবা দলীল শুদ্ধ না হওয়ার আশংকা না থাকে অথবা এমন আশংকা না থাকে যে, পেশকৃত দলীলটি প্রমাণ হিসাবে গণ্য হওয়ার মত শক্তিশালী নয়। কিন্তু যদি কেউ সর্বদা স্বল্পসংখ্যকের আমল অনুসরণ করে, তবে তাতে নিম্নের ব্যাপারগুলো অবধারিত হয়ে পড়বে :

এক : পূর্ববর্তীগণ সর্বদা যে কাজ করতেন তার বিরোধিতা করা অপরিহার্য হয়ে পড়বে। আর পূর্ববর্তী সালাফদের বিরোধিতা করার মধ্যে বড় বিপদ রয়েছে।

দুই : সালাফগণ সর্বদা যে কাজ করতেন তা ছেড়ে দেয়া অবধারিত হয়ে যাবে। কেননা উদ্দেশ্য হল তারা এ বর্ণনাগুলোর বিপরীতমুখী কাজে সর্বদা রত ছিলেন। সুতরাং তারা যে আমল করেননি সে অনুযায়ী আমলে রত থাকা তারা যে আমল সর্বদা করতেন তার বিপরীত।

তিন : এটা অধিকাংশ সাহাবা যে আমল করেছেন তা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার কারণ এবং বিপরীত আমল (তথা স্বল্পসংখ্যকের আমল) প্রসিদ্ধি লাভ করার হেতু। কেননা কাজের অনুসরণ কথার অনুসরণের চেয়ে সুদূর প্রসারী। আর এটা যখন ঘটে এমন ব্যক্তির পক্ষ থেকে যার অনুসরণ করা হয়, তখন ব্যাপারটি হয়ে দাঁড়ায় আরও ভয়াবহ। সাবধান! সাবধান! পূর্ববর্তীদের বিরোধিতা করা

থেকে সতর্ক থাকুন। তাতে যদি কোন ফযীলত থাকত, তাহলে পূর্ববর্তীরাই তার বেশী হকদার হতেন। আল্লাহরই সাহায্য প্রার্থনা করছি"। [ইমাম শাতেবীর কথা এখানেই শেষ] আর তৃতীয় প্রকার যাতে উক্ত মাসআলা অনুযায়ী সাহাবাদের কেউই আমল করেননি, এমতাবস্থায় বিতর্কের অবকাশ নেই যে, সকল সাহাবার আমলের বহির্ভূত যে আমল তা বিদ'আত ও নিন্দনীয় - যদি উক্ত কাজের মাধ্যমে আমলকারী তার রবের নৈকট্য লাভের আশা করে। অবশ্য যদি তা (ইবাদাত না হয়ে) আদত তথা দৈনন্দিন প্রথার অন্তর্গত হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে নিয়ম হল - তা মুবাহ বলে গণ্য হবে। আর এজন্য যে ব্যক্তিই এমন কোন আমল করে যা সালাফ তথা পূর্ববর্তী আলেমগণের তরীকা মাফিক নয় এবং কুরআন ও সুন্নাহকে তারা যেভাবে বুঝেছেন সে অনুযায়ীও নয়, তাকে বলা হবে : 'তুমি বাতিলপন্থী, বিদ'আতী ও যে পথ মু'মিনদের নয় সে পথের অনুসারী'। ইলমের সাথে সম্পর্কিত কিছু লোক বিভিন্ন স্বার্থ ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে সে সব নব উদ্ভাবিত বিষয় (তথা বিদ'আত) কে উত্তম বলে চালিয়ে দিচ্ছে যদ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবারা নৈকট্য লাভ (তথা ইবাদাত) করেননি। 'এসবই দ্বীনের ক্ষেত্রে ভুল হিসাবে বিবেচিত এবং নাস্তিকদের পথ অনুসরণের নামান্তর। কেননা যারা এ বিষয়গুলো উপলব্ধি করেছে এবং এ পথে চলেছে, হয় শরীয়তকে তারা এমনভাবে বুঝেছে যেমনটি পূর্ববর্তীগণ বুঝেননি, অথবা শরীয়তকে (সঠিকভাবে) বুঝা থেকে তারা দূরে সরে গিয়েছে। এ শেষোক্ত কথাটিই সঠিক।

কেননা সালাফে সালাহীনের অগ্রবর্তী-দলই সরল সঠিক পথের উপর ছিলেন। তারা উপরোক্ত দলীলসমূহ প্রভৃতি থেকে তা-ই বুঝেছেন যে নীতির উপর তারা ছিলেন। আর এ নব উদ্ভাবিত বিষয়সমূহ তাদের মধ্যে ছিল না এবং সে অনুযায়ী তারা আমলও করেননি।^{৬৮২}

নব উদ্ভাবিত বিষয়গুলো কয়েক ভাগে বিভক্ত : তন্মধ্যে কিছু আছে শিরক, আর কিছু এমন বিদ'আত যা শিরকের দিকে নিয়ে যায়, আর কিছু এমন বিদ'আত যা সুন্নাতকে মিটিয়ে দেয়। আর এ উদ্ভাবিত বিষয়গুলোর কোন প্রকারই সাহাবা ও তাবেরীনের যুগে কখনই ছিল না। কেননা তাদের যুগে এমন কোন কবর ছিল না যার পাশে ইবাদাতের নিয়তে অবস্থান করা হত, যার উপর গম্বুজ নির্মাণ করা হত এবং যার অধিবাসীদের অছিলায় শাফায়াত চাওয়া হত। আর তাদের সময়ে নবী ও সৎ ব্যক্তিবর্গের সম্মান অথবা মান-মর্যাদা কিংবা ব্যক্তিত্বের মাধ্যমে অসীলা করার ব্যাপারটি ছিল না এবং কবরের কাছে দোয়া করার প্রচলনও ছিল না। তাদের সময়ে মীলাদ তথা জন্মদিবস পালন এবং মীলাদ-মাহফিল বা জন্মদিবসের অনুষ্ঠান নামেও কিছু ছিল না। মুসলমানদের সর্বসম্মতিক্রমে এসব কিছুই তাদের মাঝে অনুপস্থিত ছিল। অতএব এ-ই যখন অবস্থা, তখন পরবর্তীরা এ বিদ'আতসমূহের উপযোগিতা প্রমাণের জন্য যেসব ভ্রান্ত যুক্তি পেশ করছেন, তা তিনভাগে বিভক্ত:

৬৮২ ইমাম শাতেবীর আল মুয়াফাকাত খ. ৩, পৃ. ৭৩।

এক : কুরআনুল কারীমের আয়াত, তারা বাড়াবাড়ি করে এর অর্থ বিকৃত করে নিজ নিজ উদ্দেশ্য অনুযায়ী ব্যাখ্যা করছে।

দুই : হাদীস, তা আবার দু' প্রকার :

প্রথম প্রকার : সহীহ হাদীসসমূহ যা তাদের উদ্দেশ্য ও বুঝের মুওয়াফিক নয়। তবে তারা এগুলোর অর্থ নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী বিকৃত করে নিয়েছে।

দ্বিতীয় প্রকার : মিথ্যা ও দুর্বল হাদীস। তাদের কাছে এ ধরনের হাদীসের সংখ্যাই বেশী এবং তারা এগুলো নিয়ে খুবই খুশী। এগুলোর প্রচার ও প্রসারের জন্য চলে তাদের প্রাণান্তকর চেষ্টা।

তিন প্রকার : কিসসা-কাহিনী ও স্বপ্ন, যা তারা পারস্পরিক ধারা পরস্পরায় বর্ণনা করে থাকে এমনভাবে যে, মনে হয় তা শরীয়ত প্রণয়নের একটি উৎস। তারা আল কুরআনের আয়াত ও সহীহ হাদীসসমূহ দ্বারা যে দলীল পেশ করছে, তা থেকে নিষ্কৃতির উপায় দু'টিঃ

১. বিদ'আতীগণ যে কথা দ্বারা দলীল পেশ করছে, তা মূলত দলীলের উদ্দিষ্ট অর্থ নয়। কেননা উক্ত দলীল দ্বারা বিদ'আতীরা যা বুঝে থাকে, সালাফের অনুসারী আহলে সুন্নাতে বুঝ তা থেকে ভিন্নতর। অতএব সালাফের বুঝের মাধ্যমে খালাফের বুঝ প্রত্যাখ্যাত হবে।

২. দ্বিতীয় বিষয়টি প্রথম কথা থেকেই উৎসারিত। আর তা হলো এ প্রশ্ন করা যে, সালাফে সালাহীন কি উক্ত দলীলের ক্ষেত্রে খালাফ তথা পরবর্তী লোকদের বুঝ অনুযায়ী আমল করেছেন, নাকি আমল

করেননি? সর্বসম্মত মত হল, সালাফগণ এ উদ্ভাবিত বিষয়সমূহ দ্বারা কখনোই আমল করেননি। কোন বিদ'আতীহ সালাফগণ থেকে এমন কোন আমল প্রমাণ করতে সক্ষম হবে না, যা সাহাবাদের আমলের খেলাফ। কেননা আহলে সুন্নাহ পূর্ববর্তীগণ তথা সাহাবা ও তাবয়ীনের আমলের অনুসারী। আর খালাফগণ এর বিপরীত অবস্থানে রয়েছে। তারা এমন কাজ করে যার নির্দেশ তাদেরকে দেয়া হয়নি। এ অর্থেই উমার ইবনুল খাত্তাব রাদি আল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন : “অচিরেই এমন লোকজন আসবে যারা আল কুরআন থেকে কিছু ভ্রান্ত যুক্তি বের করে তা দ্বারা তোমাদের সাথে ঝগড়া করবে। অতএব তোমরা সুন্নাহ দিয়ে তাদের মোকাবেলা কর। কেননা সুন্নাহ বিশারদগণ আল্লাহর কিতাব সম্পর্কে অধিক জ্ঞান রাখে।”^{৬৮৩} দারেমী এটি বর্ণনা করেছেন, খ. ১, পৃ. ৪৭; এছাড়া দারাকুতনীসহ আরও অনেকে এটি বর্ণনা করেছেন]^{৬৮৪}। এজন্যই কোন বিভ্রান্ত ফিরকা কিংবা খালাফীদের কাউকেই আপনি এমনটি পাবেন না যে, তারা নিজ নিজ মতের উপর বাহ্যিক দলীল পেশ করতে অক্ষম। অথচ এ ক্ষেত্রে দলীল শুদ্ধ হওয়াটাই হল আসল ব্যাপার, দলীল পেশ করতে সমর্থ হওয়া নয়। ইমাম শাতেবী এ ধরনের সংক্ষিপ্ত কিছু কথা বলার পর (খ. ৩, পৃ. ৭৭) বলেন: ‘এ কারণেই শরয়ী দলীল ও প্রমাণ নিয়ে যারা চিন্তা

৬৮৩ দারেমী এটি বর্ণনা করেছেন, খ. ১, পৃ. ৪৭। এছাড়া লালকাই সুন্নাহ গ্রন্থে এবং ইবনে আবদুল বির 'জামেউ বয়ানিল ইলমি ওয়া ফাদলিহী' গ্রন্থে এটি বর্ণনা করেছেন। অনুরূপভাবে দারাকুতনী ও ইবনে আবি যমানাইন 'ফসলুস সুন্নাহ' গ্রন্থে তা রেওয়ায়েত করেছেন। মাকদেসী আল-হুজ্জাহ আ'লা তারেকিল মাহাজ্জাহ গ্রন্থে এবং আরও অনেকে এর পক্ষে বক্তব্য রেখেছেন।

৬৮৪ দারেমী এটি বর্ণনা করেছেন, খ. ১, পৃ. ৪৭; এছাড়া দারাকুতনীসহ আরও অনেকে এটি বর্ণনা করেছেন

গবেষণা করবেন, তাদের উপর ওয়াজিব হলো - উক্ত দলীল থেকে পূর্ববর্তীগণ কি বুঝেছেন ও এ দলীল দ্বারা আমলের ক্ষেত্রে তাদের কি ভূমিকা ছিল, সেদিকে লক্ষ্য রাখা। কেননা এটাই সত্যে উপনীত হওয়ার অধিক উপযোগী এবং ইলম ও আমলের ক্ষেত্রে অধিক শক্তিশালী। এ ব্যাপারটি যখন স্পষ্ট হয়ে গেল এবং সত্য প্রতিভাত হল, তখন সালাফে সালাহীনের প্রতি সম্পর্কিত হতে যারা গৌরববোধ করে, তারা উল্লেখিত বিষয়গুলোর পাশাপাশি এটাও জানে যেঃ

১. সাহাবাদের যে আমলটি ব্যাপকভাবে প্রচারিত ছিল, তারা সে অনুযায়ী আমল করেছেন।
২. যে আমল মাত্র একজন সাহাবী করেছেন অথবা কিছুসংখ্যক করেছেন আর বাদ বাকী সাহাবারা প্রথমোক্তদের বিরোধিতা করেছেন- এ ক্ষেত্রে তারা বিষয়টি আল্লাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি প্রত্যাবর্তিত করেছেন, যেমনটি তাদের প্রভু তাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন। কেননা তিনি বলেনঃ

﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾

“কোন বিষয়ে তোমরা মতভেদ করলে তা উপস্থাপিত কর আল্লাহ ও রাসূলের নিকট যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান এনে থাক। এটাই উত্তম এবং পরিণামের দিক দিয়ে প্রকৃষ্টতর”। [সূরা আন-নিসা : ৫৯]। এখানে আল্লাহর দিকে বিষয়টি প্রত্যাবর্তিত করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর এর মানে হল আল্লাহর কালাম

তথা অবতারিত কুরআন হাকীমের দিকে প্রত্যাবর্তন করা। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকেও প্রত্যাবর্তন করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এর অর্থ হল তার জীবদ্দশায় তার কাছে প্রত্যাবর্তন করা এবং তার মৃত্যুর পর তার সহীহ সুন্নাহের দিকে প্রত্যাবর্তন করে অধিকাংশের আমল অনুসরণের জন্য চিন্তা গবেষণা করা। আলহামদুলিল্লাহ! আহলে সুন্নাহের এ নিয়মে কোন ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়নি। এতে কোন গরমিলও দেখা যায়নি। এটা অত্যন্ত সুস্পষ্ট নিয়ম এবং পরিষ্কার নীতি ও সরল-সোজা পথ। চার ইমাম তাদের অধিকাংশ মাসআলায় এ নিয়মের উপরই চলেছেন। আল্লাহ তাদেরকে রহম করুন এবং তাদের সাওয়াব বৃদ্ধি করুন।

৩. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবায়ে কেলাম ইবাদাতের ক্ষেত্রে যে সকল আমল করেননি, সেগুলো (কেউ করলে তা হবে) উদ্ভাবিত আমল যা খালাফী তথা পরবর্তীরা চালু করেছে। সাহাবী ও তাবয়ীগণ যা কিছু থেকে বিরত ছিলেন, তা ছিল তাদের সঠিক চিন্তাভাবনা প্রসূত এবং আল-কুরআন ও সুন্নাহর দলীলসমূহকে প্রশংসনীয়রূপে বুঝার কারণে।

পরবর্তীকালের বিদআত প্রচলনকারীদের তৈরি করা একই আসবাব ও কারণ সাহাবাদের যুগেও পাওয়া যাওয়া সত্ত্বেও তারা শরীয়তের ব্যাপার ভাল করে বুঝে-গুনেই সে সব পরিত্যাগ করেছিলেন। আর তাদের পরিত্যাগ করার কাজটি (আমাদের জন্য) অনুকরণীয় সুন্নাহ এবং অনুসৃত পথ। পরবর্তী লোকজন যে আমল দ্বারা পুণ্য ও সাওয়াব পাওয়ার আশা করে থাকে অথচ সাহাবীরা সে আমল থেকে

বিমুখ থেকেছেন, তা দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা সাহাবীরা মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশী কল্যাণ লাভের প্রত্যাশী ছিলেন এবং শরীয়তসম্মত ইবাদাতে লিপ্ত হতে সবচেয়ে বেশী চিন্তা-ভাবনা করতেন। তারা শরীয়তসম্মত প্রত্যেকটি আমলকে কার্যে পরিণত করতেন এবং তদ্বারা সাওয়ারের আশা করতেন ও আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতেন। গ্রহণে ও বর্জনে, বুদ্ধি ও জ্ঞানে, বুঝে ও আমলে যে ব্যক্তি তাদের অনুসরণ করে, সে কতই না বুদ্ধিমান! আর সকল কল্যাণ ও নৈকট্য লাভের কতই না উপযুক্ত এবং প্রত্যেক ব্যাপারে তাওফীকপ্রাপ্ত হওয়ার কতই না যোগ্য!

বার তম পরিচ্ছেদ – বিদ'আতের প্রভাবে জাতি কী হারিয়েছে?

প্রিয় পাঠক ও পাঠিকবৃন্দ ! বিদআতের প্রভাবে জাতি কি হারিয়েছে তা লিখে হয়তো ফুটিয়ে তুলতে পারব না; তবে বড় বড় কয়েকটি ক্ষতি এখানে উল্লেখ করলাম। বাকী গুলো আপনাদের পারিপার্শ্বিকতা দেখে এবং বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে তালিকাটা পূর্ণ করে নিবেন।

১. বিদ'আতের প্রভাবে জাতি ঐক্য ও সংহতি হারিয়েছে- দলাদলি, কোন্দল, হিংসা প্রতিহিংসা ছড়িয়ে পড়েছে। সুন্নত বিদআতের ধ্বংস কত মসজিদ ভেঙেছে, কত পিতা-পুত্রের সম্পর্ক ছিন্ন হয়েছে। কত আলেম সুন্নতের প্রচার করতে গিয়ে বয়কটের শিকার হয়েছে; এর হিসেব করাই মুশকিল।

২. শক্তি ও প্রভাব বিনষ্ট হয়েছে – দুর্বলতা চির সাথী হয়েছে।

৩. মুসলিম জাতির মর্যাদা সর্বত্র ভুলুষ্ঠিত হয়েছে এবং হচ্ছে - খোদ মুসলিমগণই এখন আর এক দলের সদস্য অপর দলের সদস্যকে সম্মান করেন না।
৪. দ্বীনের মর্যাদা খাটো হয়েছে- এখন সঠিক আমলের কথা বললেও মানুষ বিশ্বাস করতে চায়না।
৫. দ্বীনের আসল পরিচয় বিকৃত হয়েছে - কোনটা আসল আর কোনটা বিদ'আত এ নিয়ে জনগণের কাছে এক বিরাট ধূমজাল সৃষ্টি হয়েছে।
৬. দ্বীনের দাওয়াত অবহেলিত হয়েছে - বিদআতের প্রচার ক্রমেই ছড়িয়ে পড়ছে। সহীহ সুন্নতের প্রচারকগণ অবহেলার স্বীকার হলেও বিদআতী বক্তাদের কদরের যেন সীমা নেই।
৭. দীনি আমল শিথিল হয়েছে। সুন্নত ও বিদআতের নিত্য-নতুন বিতর্ক দেখে সুযোগ সন্ধানী অনেক লোক আমলই ছেড়ে দিয়েছে।
৮. সুন্নতের উপর মহব্বত কমেছে- বিদআতের উপর মোহাব্বত বেড়েছে। ফলে আজ অনেক মুসলিম বিদ'আত প্রতিষ্ঠা করার জন্য বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দেয়ার জন্য প্রস্তুত রয়েছে তথাপি সুন্নতকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হতে দেবেনা।
৯. বিদ'আতের কারণে আজ আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, পবিত্র কুরআন, সহীহ সুন্নাহ, আলেম, মাদ্রাসা, মসজিদ ও দীনি শিক্ষা ইত্যাদির উপর মুসলমানদের আস্থা, ভক্তি ও আকর্ষণ হ্রাস পেয়েছে। ভক্তি, আস্থা ও আকর্ষণ বেড়েছে কবর, মাযার, দরগা, খানকা, পীর, ফকীর, বাউল ইত্যাদির উপর।

যার ফলে মুসলমান জাতী অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টুকরায় বিভক্ত হয়েছে এবং তাদের সার্বিক অবস্থা অত্যন্ত নড়বড়ে ও নাজুক হয়ে পড়েছে। সুতরাং মুসলমানদের হারানো ঐতিহ্য ফিরে পেতে হলে বিদ'আত পরিহার করে আবার আমাদেরকে সহীহ সুন্নাহের দিকে ফিরে যেতে হবে^{৬৮৫}। আল্লাহ আমাদেরকে সিরাতে মুস্তাকীমের উপর পরিচালিত করুন! আমীন!!

বার তম পরিচ্ছেদ - বিদ'আতের সর্বগ্রাসী ছোবল থেকে মুসলিম উম্মাহকে রক্ষা করতে হবে

বিদ'আত খুবই ভয়ঙ্কর জিনিস। আমাদের চারিদিকে বিদ'আতে ভরে থাকলেও কেউ এটাকে তেমন গুরুত্ব দেয়না অথচ বিদ'আত মানুষকে জাহান্নাম নিয়ে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট। বিদ'আত বলা হয় ধর্ম বা ইবাদতে নব আবিস্কৃত কাজকে। অর্থাৎ দ্বীন বা ইবাদত মনে করে করা এমন কাজকে বিদ'আত বলা হবে, যে কাজের কুর'আন ও সহীহ সুন্নাহর কোন দলিল নেই। আরো সহজ করে বললে, আল্লাহ বান্দাদের জন্য যার বিধি বিধান দেননি, বান্দারা নিজেদের ইচ্ছে মতো যা রচনা করে নিয়েছে তাই বিদ'আত।

আমরা সমাজে বিদ'আতের দিকে লক্ষ্য করি তাহলে আমরা আরও ভয়াবহ চিত্র দেখতে পাব। বস্তুতঃ এ কারনেই বিদ'আত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এরশাদ করেনঃ

من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد- صحيح البخاري

^{৬৮৫} লেখকঃ আব্দুল্লাহ আল বাকী, দাঈ ও গবেষক, পূর্ব জেদ্দা (কিলো-১৪) ইসলামিক সেন্টার, সউদী আরব

যে ব্যক্তি আমার এই দীনের মাঝে নতুন কিছু উদ্ভাবন করবে, যা তার অন্তর্ভুক্ত নয়, তবে তা প্রত্যাখ্যাত। তিনি আরও বলেন,

كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار

প্রত্যেকটি নব উদ্ভাবিত জিনিষই পথভ্রষ্টতা আর পথভ্রষ্টতা দোজখের দিকে নিয়ে যায়। কারণ আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা স্পষ্টভাবে আল কুরআনে উল্লেখ করেছেনঃ

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَارْتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন কে পরিপূর্ণ করে দিলাম। আমার নিয়ামত পূর্ণরূপে তোমাদেরকে প্রদান করলাম। ইসলামকে দ্বীন হিসাবে তোমাদের জন্য মনোনীত করলাম। (সূরা মায়েদা : ৩)। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তেইশ বছরের নবুওতী জিন্দেগীর মাধ্যমে আল্লাহ তার দ্বীন কে পরিপূর্ণতা দান করেছেন। এখন এদীনের মধ্যে কোন সংযোজন বা বিয়োজনের অবকাশ নেই। অথচ এখন এই সংযোজন ও বিয়োজনের কাজটিই চলছে। চলছে দীনের মধ্যে বহু নতুন নতুন অনুষ্ঠান চালুর কাজ। আর এই কাজটি চলছে এক শ্রেণীর আলেম ও ইমামের ছত্রছায়ায়। মিলাদ মাহফিল, কুল খানি, চেহলাম, খতমে খাজেগান, ইদ-ই-মিলাদুন্নবী, শবে মিরাজের অনুষ্ঠান ইত্যাদি। তাছাড়াও আছে জন্মবার্ষিকী, মৃত্যু বার্ষিকী, পালনের হিড়িক। আরও আছে বিবাহের নামে, ওয়ালিমার নামে লক্ষ লক্ষ টাকা অপচয়ের এক বিশাল আয়োজন। আমরা সমাজে মিলাদ মাহফিল এমনভাবে প্রচলন করেছি যে, কোন কাজ শুরুর আগে মিলাদ পড়িয়ে নিজেদেরকে পূতঃপবিত্র করার এক মহা সুযোগ।

এর মাধ্যমে অভ্যাগত অতিথিদের যেমন মিষ্টিমুখের ব্যবস্থা হয় তেমনি ইমাম সাহেবদের পকেটে কিছু অর্থ জমা হয়। দীনের নামে ছাওয়াবের নামে আমরা বেশ ভালই রীতি চালু করেছি। আর সেই সব মিলাদে যে সমস্ত দরুদ পাঠ করা হয় তা কোন সহীহ হাদীস সম্মত নয়। তাছাড়া সেই মাহফিলে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর আগমন ঘটে ভেবে আমরা কিয়াম করে তাঁকে সম্মান প্রদর্শনের যে নিয়ম চালু করেছি তাও কতটা শরীয়ত সম্মত তা প্রশ্নসাপেক্ষ। আজ সমাজে কুলখানির প্রচলন এমনভাবে চালু হয়েছে তা ভেবে আমাদের মাথা হেট হয়ে আসে। সারা জীবন যে লোকটি আল্লাহ এবং তদীয় রাসূল (সাঃ) এর আদর্শের অনুসারী হওয়া তো দূরের কথা বরং তার বিরোধিতা করতে আদাজল খেয়ে লেগেছিল, সেই লোকটি মারা যাওয়ার পরে আমরা তার জন্য কুলখানি করছি , আবার কেউ তার জন্য চল্লিশাও করেছে। সমাজে এমন বৈপরিত্য দেখে সচেতন লোকজন অবাক না হয়ে পারেনা। আল্লাহ তাঁর দ্বীন কে মানুষের সামগ্রিক জীবনে পালনের নির্দেশ দিলেন এবং তাঁর প্রিয়নবী রাহমাতুল্লিল আলামিন (সাঃ) জীবনে যা বাস্তবায়িত করে দেখিয়ে গেলেন তার ধারে কাছে না গিয়ে আমরা নিজেদের মনগড়া এমনকিছু সমাজে চালু করলাম নবী (সাঃ) নিজে পালন করেননি। তার সাহাবায়ে কেরাম পালন করেননি, তাবয়ীগণ পালন করেননি, আইস্মায়ে মুজতাহেদীসগণ পালন করেন নি। আজ ঈদ ই-মিলাদুন্নবীকে এমন সব নামে অভিহিত করা হচ্ছে যা আমাদেরকে কুফরীর পথে নিয়ে যায়। সব ঈদেরই সেরা ঈদ-ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী।

আর সেই মিলাদুন্নবী উপলক্ষে জশনে জুলুস করা হচ্ছে। বিশাল বিশাল ব্যানার নিয়ে তথাকথিত আশেকানে রাসূলদের যে মহা সমাবেশ হচ্ছে তার মধ্যে কয়জনের নামায রোযার সঙ্গে সম্পর্ক আছে তা প্রশ্নসাপেক্ষ। আমরা কোন কোন পীর সাহেবের দরবারকে বাবে রহমত বলতেও কুঠা বোধ করছি। আজ সমাজে শিরক এবং বিদ'আতের সয়লাব এমনভাবে চলছে এটা যেন রোধ করার কেউ নেই। বাংলাদেশের কিছু টিভি চ্যানেলের মাধ্যমে সহীহ হাদীস ভিত্তিক কিছু দিক নির্দেশনা দেয়ার চেষ্টা করা হলেও এর শ্রোতার সংখ্যা অত্যন্ত নগণ্য।

বিশেষ করে আমাদের যে শ্রেণীর লোকজন এসব শিরক ও বিদ'আতের মধ্যে নিমজ্জিত হচ্ছে তাদের অধিকাংশই টিভি চ্যানেল দেখার সুযোগ পায়না। আবার পেলেও তারা ইসলামী অনুষ্ঠান দেখা থেকে ভারতীয় টিভি চ্যানেলের সিরিয়াল দেখার প্রতি আগ্রহী। বিশেষ করে যুবক ও যুবতীদের মাঝে এসব হক কথা প্রচারের কোন ব্যবস্থাই আমরা করতে পারছি। ফলে যুব সমাজের মাঝে কোন নৈতিকতা বোধ গড়ে উঠছেনা। মূল্যবোধের অবক্ষয়ের কারণে তারা নানা প্রকার অনৈতিক কর্মকান্ডের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ছে। পিতামাতার অবৈধ সম্পদ থাকার কারণে তারা সহজে বিপথে চলে যাচ্ছে। মাদকের প্রতি তাদের আসক্তি বেড়ে যাচ্ছে। ফলে তারা থার্মি ফাষ্ট নাইট, লাভ ডে, পয়লা বৈশাখ ইত্যাদির প্রতি বেশী আকৃষ্ট হয়ে পড়ছে। অথচ আল্লাহ সাবধান বাণী উচ্চারণ করে আমাদেরকে বলেনঃ

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কিছুকে দীন হিসাবে অনুসন্ধান করবে, তার নিকট থেকে তা কবুল করা হবে না। আর আখেরাতে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে। (আলে ইমরান : ৮৫)। আল্লাহর এই সাবধান বাণী যদি আমরা পর্যালোচনা করি তাহলে দেখব আল্লাহ তাঁর প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর মাধ্যমে যে দীন পাঠিয়েছেন এবং যে দীন তাঁর প্রিয় নবী জীবদ্দশাতে তাঁর সমাজ ও রাষ্ট্রে বাস্তবায়িত করে গেছেন তাই একমাত্র গ্রহণযোগ্য। এবং এর অন্যথা হলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। অথচ আজ দীনের নামে কত কিছু যে সন্নিবেশিত হয়েছে তার কোন ইয়ত্তা নেই। এ থেকে বাঁচার জন্য আমাদেরকে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে হবে। সমাজের রক্ত্রে রক্ত্রে আজ শির্ক ও বিদআতের সর্বগ্রাসী ছোবল সমাজকে কুঁড়ে কুঁড়ে খাচ্ছে। যার ফলে আজ আমাদের নামায রোযা, হাজ্জ, যাকাত, কুরবানী, দান খয়রাত কোনটার মধ্যে কোন বরকত পরিলক্ষিত হচ্ছে না। সেজন্য আমাদেরকে সেই পথ খুঁজে পেতে হবে যে পথে আল্লাহর আশ্বিয়ায়ে কেরাম তাঁদের দীনের প্রচার ও প্রসার ঘটিয়েছেন। আমরা জানি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) শত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও দীনের দাওয়াতের পথে কখনও নিরব থাকেননি, নীথর হয়ে পড়েননি, যতদিন পর্যন্ত আল্লাহ তাঁর মাধ্যমে দীন কে প্রতিষ্ঠিত না করেছেন। এবং আল্লাহ স্বীয় করুনা ও বরকতের দ্বারা তার দীনের দাওয়াতকে বিশ্বের সাত গোলাধারে পৌঁছে না দিয়েছেন ততদিন পর্যন্ত দাওয়াতে দীন কে ক্ষান্ত করেননি। রাসূল (সাঃ) আল্লাহর দিকে, তাঁর

একত্ববাদের দিকে আহ্বান জানিয়ে সহীহ আমল পালনের উপর তাগিদ দিয়েছেন। কেননা, যাবতীয় আমল কবুল হওয়ার বিষয়টি নির্ভর করে তাওহীদের উপর অচল ও অটল থাকার উপর। আর প্রত্যেকটি আমল রাসূল (সাঃ) এর নির্দেশিত পথে হতে হবে। বানানো কোন জাল হাদীস বা যঈফ হাদীসের উপর আমল করলে চলবে না।

তাই আজ সময় এসেছে সমাজের ব্যক্তিদের উপর, বিশেষ করে আলেম সমাজের উপর। তাঁরা যেন সমাজের প্রচলিত শিরক ও বিদআতের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হন। তাঁদের সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে যেন দীনের প্রকৃত রূপ সাধারণ মানুষ জানতে পারে এবং সেই অনুযায়ী আমল করতে পারে। বাংলাদেশের শতকরা ৮৫ ভাগ মানুষ মুসলমান। কিন্তু তাদের ঈমান ও আকীদা নিয়ে আজ ছিনিমনি খেলা হচ্ছে। আলেমরাই হচ্ছে নবীদের উত্তরাধিকার। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ

العلماء ورثة الأنبياء ولم يورثوا ديناراً ولا درهماً ولكن يورثوا العلم - من أخذه أخذ بحظ وافر

আলেমগণ হচ্ছেন নবীদের উত্তরাধিকার। তাঁরা দিনার কিংবা দিরহাম উত্তরাধিকার সূত্রে পাননি। বরং তারা উত্তরাধিকার সূত্রে ইলম পেয়েছেন। যে ব্যক্তি সেই ইলমকে আঁকড়ে ধরেছেন তিনি এক বিরাট অংশ পেয়েছেন। আর তাই আলেমদের দায়িত্ব সর্বাধিক, আলেমগণ শরীয়ত বিরোধী বিভিন্ন কর্মকান্ডের বিরুদ্ধে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে এসেছেন। আজও সেই হক্কানী আলেমদেরকেই

শিরক ও বিদ'আত সমাজ থেকে উচ্ছেদ করার আন্দোলনে মূখ্য ভূমিকা পালন করতে হবে। আর এর জন্য হয়ত তাদেরকে অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। কারণ সমাজের লোকদের মধ্যে যে ভ্রান্ত ধারণাসমূহ বদ্ধমূল হয়ে গেছে তা উৎখাত করতে গেলে স্বার্থান্ধ ব্যক্তিবর্গের পক্ষ থেকে বিভিন্ন বাধা বিপত্তি আসতে পারে।

ফতওয়া বাজী পরিহার করে সমাজের সামনে ইসলামের সুমহান ঐতিহ্য তুলে ধরতে হবে। আর এজন্য প্রয়োজনবোধে কলমযুদ্ধ বা বাকযুদ্ধ পরিচালনা করতে হবে। আর তাই রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যথার্থ বলেছেনঃ

من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان - رواه مسلم

যে ব্যক্তি সমাজের অন্যায় উৎখাতের জন্য হাত দিয়ে প্রচেষ্টা চালাবে, সে একজন প্রকৃত ঈমানদার, যে মুখের দ্বারা প্রচেষ্টা চালাবে সেই প্রকৃত ঈমানদার অথবা যারা তা পারবেনা তাহলে অন্তঃকরণে ঐসব বদ রসম- রেওয়াজকে ঘৃণা করবে সেও ঈমানদার। এর বাইরে ঈমানের সরষে পরিমাণ দানাও অবশিষ্ট নেই। আসুন আমরা সবাই মিলে সমাজের শিরক ও বিদ'আতগুলি উৎখাতের জন্য সম্মিলিত প্রচেষ্টা চালাই^{৬৮৬}।

উপসংহার

উপরোক্ত আলোচনার সারমর্ম অনুযায়ী বলা যায় যে, হুকুমদাতা, বিধানদাতা তথা আল্লাহর বিধান তথা ইসলাম বিধান মানতে হবে

^{৬৮৬} অধ্যাপক মীর আব্দুল ওয়াহহাব লাবীব, সূত্র: সালাফী বিডি

এবং এর কোন বিকল্প পথ নেই আর তা না হলে মুসলিম জাতিকে বিদ'আত তথা কুসংস্কার থেকে রক্ষা করা কঠিন। অধিকন্তু আরও বলা যায় যে, উল্লেখিত কাজ সমূহ নাবী (ﷺ) বা সাহাবায়ে কেরাম দ্বারা প্রমানিত নয় বা তারা কখনও এসব বিদাতী তথা শিরকী আমল করে নি বরং আমাদের উচিত রাসূল (ﷺ) ও তাঁর হিদায়েত প্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নতের অনুসরণ করা। আর এসব বিদ'আতী মূলক কাজ তথা কুসংস্কার মূলক কাজ পরিহার করা প্রত্যেক মুসলিমদের অবশ্য কর্তব্য। কারন বিদ'আত সৃষ্টিকারীর প্রতি আল্লাহ, ফেরেশতাসমূহ এবং সবলোকের অভিশাপ হয়ে থাকে। এ প্রসঙ্গে রাসূল (ﷺ) এর হাদীস প্রনিধানযোগ্য। আসেম (রাঃ) বলেন, আনাস (রাঃ) থেকে জিজ্ঞাসা করা হল, রাসূল (ﷺ) কি মদীন কে হেরেম আখ্যা দিয়েছেন? তিনি বললেন, হ্যা, অমুক স্থান থেকে অমুক স্থান পর্যন্ত। এ স্থানের কোন গাছ কাটা যাবে না। রাসূল (ﷺ) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি এখানে কোন বিদ'আত সৃষ্টি করবে তার উপর আল্লাহ, ফেরেশতাসমূহ এবং লোক সকলের অভিশাপ হবে^{৬৮৭}। অধিকন্তু আরও বলা যায় যে, - বিদ'আতী আমল ও শিরক মুক্ত আমল পরিহার করা এবং মৃত সুন্নাত জীবিত করা। কারন মৃত সুন্নাত জীবিত করার মর্যাদা অনেক বেশি। অতএব, যখন কোন সুন্নাত বিলুপ্ত হয়ে যায়, তার উপর মানুষকে উদ্ভুদ্ধ করা এবং তার উপর আমল করার ফযীলত অনেক। রাসূল (ﷺ) তাই বলেনঃ

৬৮৭ বুখারী ও মুসলিম - আল্ লু'লুউ ওয়াল মারজান, দ্বিতীয় খন্ড, হাদীস নং - ৮৬৫

مَنْ أَحْيَا سُنَّةً مِنْ سُنَّتِي، فَعَمِلَ بِهَا النَّاسُ، كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا، لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْئًا، وَمَنْ ابْتَدَعَ بِدْعَةً، فَعَمِلَ بِهَا، كَانَ عَلَيْهِ أُوزَارٌ مِنْ عَمَلٍ بِهَا، لَا يَنْقُصُ مِنْ أُوزَارِ مَنْ عَمِلَ بِهَا شَيْئًا

“যে ব্যক্তি আমার একটি (মৃত) সুন্নাহ জীবিত করে এবং লোকেরা তদানুযায়ী আমল করে, সেও আমলকারীর অনুরূপ পুরস্কার পাবে। এতে আমলকারীর পুরস্কার কিছুমাত্র কম হবে না। অপরদিকে যে ব্যক্তি কোন বিদ’আতের উদ্ভাবন করে এবং সে অনুযায়ী আমল করা হয়, তার উপর আমলকারীর পাপের বোঝার অনুরূপ বোঝা বর্তাবে। এতে আমলকারীর পাপের পরিমাণ কিছুই কমানো হবে না”^{৬৮৮}।

এ পর্যায়ে তাঁর আর একটি হাদীস হলো এই। হযরত আনাস (রাঃ) কে লক্ষ্য করে তিনি বলেছিলেনঃ হে প্রিয় পুত্র! তুমি যদি পারো সকাল সন্ধ্যা সর্বক্ষণই কারো প্রতি মনে কোনো ক্লেদ রাখিবেনা, তবে অবশ্যই তা করবে। হে প্রিয় পুত্র! এ হচ্ছে আমার উপস্থাপিত সুন্নাহের অন্যতম। আর যে লোক আমার সুন্নাহকে পুনরুজ্জীবিত করলো, সে আমাকে ভালোবাসল, আর যে আমাকে ভালোবাসল, সে পরকালে জান্নাতে আমার সঙ্গী হবে।

প্রথমোক্ত হাদীস থেকে স্পষ্ট জানা যায় যে, রাসূলে করীমের উপস্থাপিত ও প্রতিষ্ঠিত সুন্নাহও কোনো এক সময় মরে যেতে পারে, পরিত্যক্ত হতে পারে মুসলিম সমাজ কর্তৃক, তা তিনি ভালো করেই জানতেন এবং বুঝতেন। কিন্তু সে সুন্নাহ চিরদিনের তরেই

৬৮৮. ইবনু মাযাহ, মুকাদ্দিমাহ্ নং - ২০৫, এছাড়া তিরমিযীও হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি শুধুমাত্র কাছীর ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু আমরই বর্ণনা করেছেন

মৃত হয়ে থাকবে ও মিটে যাবে, কোনোদিনই তা পুনরুজ্জীবিত ও পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে না- তা তিনি ভাবতেও পারেননি। এই কারণেই তিনি তাঁর তৈরি করা উম্মাতকে মরে যাওয়া সুন্নাতের পুনরুজ্জীবন সাধনের জন্য উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছেন এ হাদীসসমূহের মাধ্যমে। অনুরূপ কোনো সুন্নাতও যখন মরে যেতে পারে, তখন অবশ্যই তাঁর গড়া উম্মাতের মাঝে বিদয়াতের উদ্ভাবন ও অনুপ্রবেশও ঘটতে পারে, এ কথাও তিনি বুঝতেন স্পষ্টভাবে। এ কারণেই তিনি বিদয়াত উদ্ভাবন ও প্রচলন করার ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে সাবধান করে গেছেন তাঁর উম্মাতকে।

শেষোক্ত হাদীসে প্রথমে নবী করীম (স) এর একটি বিশেষ সুন্নাতের বিশ্লেষণ দেয়া হয়েছে। সুন্নাতটি হলো মুসলিম সমাজের কোনো লোকের মনেই অপর লোকের বিরুদ্ধে কোনোরূপ হিংসা বা বিদ্বেষের স্থান না দেয়া। এ হিংসা বিদ্বেষ যে বড় মারাত্মক ঈমান ও আমলের পক্ষে এবং পারস্পরিক সম্পর্ক ও সামাজিক শান্তি শৃঙ্খলার দৃষ্টিতে, এ হাদীসাংশ থেকে তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। নবী করীম (স) বলেছেন যে, এরূপ পরিচ্ছন্ন মন নিয়ে কাল যাপন করাই আমার আদর্শ, আমার সুন্নাত। কোনো সময় যদি সমাজ, সমাজের ব্যক্তিগণ-এ অতি উন্নত সুন্নাত পালনের গুণ হারিয়ে ফেলে, তাহলে তা হবে সামগ্রিকভাবে জাতির লোকদের আদর্শ বিচ্যুতি। আর মুসলমানদের আদর্শ বিচ্যুতি রাসূল (স) এর নিকট কিছুতেই মনোঃপুত হতে পারেনা। তাই তিনি ছোট ধরনের এ সুন্নাতকে উপলক্ষ করে সমগ্র মুসলিম উম্মাতকে এক মহামূল্য নীতি

বাণী শুনিয়েছেন। তা হলো এই যে, যে আমার কোনো সুন্নাতকে পুনরুজ্জীবিত করে তুলবে, অ-চালু সুন্নাতকে চালু করবে, সে-ই রাসূলকে ভালোবাসল। অন্য কথায়, যে লোক রাসূলকে ভালোবাসে তার পক্ষেই রাসূলের সুন্নাতকে পুনরুজ্জীবিত করা - পুনরুজ্জীবনের চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করা সম্ভব হতে পারে, অন্য কারো পক্ষে নয়। শুধু তাই নয়, রাসূলের প্রতি ভালোবাসা পোষণের অকৃত্রিমতা ও নিষ্ঠা সে-ই প্রমাণ করতে পারল। যে লোক তার সুন্নাতকে পুনরুজ্জীবিত করার কোনো চেষ্টা করলোনা, তার মনে রাসূলের প্রতি একবিন্দু পরিমাণ ভালোবাসা যে আছে, তার কোনো প্রমাণ-ই থাকতে পারেনা। তা দাবি করারও তার কোনো অধিকার নেই। অথচ রাসূলের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা পোষণ করা ঈমানের মৌল শর্ত^{৬৮৯}।

অতএব যারাই রাসূলের প্রতি ভালোবাসা পোষণ করে, তারাই ভালোবাসে রাসূলের সুন্নাতকে এবং যারাই রাসূলের সুন্নাতকে ভালোবাসে তারা যেমন তাঁর সুন্নাতকে উপক্ষা করতে পারেনা, পারেনা সে সুন্নাতের মরে যাওয়া মিটে যাওয়াকে বরদাশত করতে, পারেনা তার মিটে যাওয়ার পর নির্বাক, নিশ্চুপ এবং নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকতে। রাসূলের প্রতি ঈমান ও ভালোবাসাই তাকে সুন্নাত প্রতিষ্ঠার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য এবং বিদ্যাতকে প্রতিরোধ করার জন্য পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করতে উদ্বুদ্ধ করবে, নিশ্চিন্তে নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকতে দেবেনা এক বিন্দু সময়ের তরেও। নবীর প্রতি

^{৬৮৯} সুন্নাত ও বিদ্যাত - মাওলানা আব্দুর রহীম (রহঃ), পৃষ্ঠা নং - ২৭৪, খায়রুন প্রকাশনী, ঢাকা

এরূপ গভীর ভালোবাসা এবং নবীর সুন্নাতের এরূপ অকৃত্রিম মমত্ব বোধ মুমিন মাত্রেই দিলে বর্তমান থাকা একান্ত প্রয়োজন। আরো প্রয়োজন এ মুমিনদের সমন্বয়ে গড়া এক জনসমষ্টির, যারা ঈমানী শক্তিতে হবে বলীয়ান, সুন্নাতের ব্যাপারে হবে ক্ষমাহীন এবং বিদ্যাত প্রতিরোধে অনমনীয়। নবী করীম (স) এমনি এক সুসংবদ্ধ জনসমষ্টি গড়ে গিয়েছিলেন। যতদিন এ জনসমষ্টি দুনিয়ায় ছিল ততদিন পর্যন্ত মুসলিম সমাজে কোনো বিদ্যাত প্রবেশ করতে পারেনি, পারেনি কোনো সুন্নাত পরিত্যক্ত হতে। কিন্তু উত্তরকালে ইতিহাসে এমন এক অধ্যায় আসে, যখন মুসলিম সমাজে বিদ্যাত প্রবেশ করে এবং সুন্নাত হয় পরিত্যক্ত। কিন্তু তা সত্ত্বেও কোনো পর্যায়েই এমন দেখা যায়নি, যখন মুসলিম সমাজে বিদ্যাতের প্রতিবাদ এবং সুন্নাত প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টানুবর্তী লোকের অভাব ঘটেছে। অতীতে সুন্নাত ও বিদ্যাতের মাঝে প্রচন্ড দ্বন্দ্ব ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছে। কখনো বিদ্যাতপন্থীরা বাহ্যত জয়ী হয়েছে, আর কখনো প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে সুন্নাত প্রতিষ্ঠাকামীরা। এ জয় পরাজয়ও এক শাস্বত সত্য। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে মুসলিম সমাজে বিদ্যাতের প্রভাব প্রচন্ডরূপে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, বিদ্যাতের অনুপ্রবেশ ঘটেছে এখানে অবোধে। প্রতিবাদ হচ্ছেনা তা নয়; কিন্তু বিদ্যাত যে প্রচন্ড শক্তিতে বলীয়ান হয়ে আসছে, প্রতিবাদ হচ্ছে তার তুলনায় অত্যন্ত ক্ষীণ কণ্ঠে, অসংবদ্ধভাবে প্রায় ব্যক্তিগত পর্যায়ে। অথচ প্রয়োজন সুসংবদ্ধ এক প্রবল প্রতিরোধের। শুধু নেতিবাচক প্রতিরোধই নয়, প্রয়োজন হচ্ছে ইতিবাচকভাবে সুন্নাত

প্রতিষ্ঠার এক সামগ্রিক ও সর্বাঙ্গিক প্রচেষ্টার। এরূপ এক সর্বাঙ্গিক ও পূর্ণাঙ্গ প্রচেষ্টাই এখন মুসলিম সমাজকে রক্ষা করতে পারে বিদয়াতের এ সয়লাবের স্রোত থেকে। অন্যথায় এ সমাজ বিদয়াতের স্রোতে ভেসে যেতে পারে রসাতলে।

তাই আজ ‘সুন্নাত ও বিদ’আত’ পর্যায়ে এ দীর্ঘ আলোচনা সমাজের সামনে উপস্থাপিত করা হলো। বিদ’আত প্রতিরুদ্ধ হোক, প্রতিরুদ্ধ হোক কেবল আংশিক বিদয়াত নয়, বিদ’আতের কতকগুলো ছোটোখাট অনুষ্ঠান নয়, প্রতিরুদ্ধ হোক সম্পূর্ণরূপে সর্বাঙ্গিকভাবে, মূলোৎপাটিত হোক বিদয়াতের এ সর্বগ্রাসী বিষবৃক্ষ। আর সে সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হোক সুন্নাত। কেবল পোশাকী সুন্নাত নয়, প্রকৃত সুন্নাত, সম্পূর্ণ সুন্নাত। সেই সুন্নাত, যা দুনিয়ায় রেখে গেছেন সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (স) চিরদিনের তরে। বিশ্বমানবতার জন্য এই হচ্ছে আমার একমাত্র কামনা, অন্তরের একান্ত বাসনা। এ দাওয়াতই আমি আজ পেশ করছি সাধারণভাবে সব মুসলমানের সামনে, বিশেষ করে আলিম সমাজের সামনে এবং আরো বিশেষভাবে ইসলামী আদর্শে বিশ্বাসী যুব সমাজের সামনে।

অতএব, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো বানানো শরীয়ত বা আইন পালন করতে মানুষ বাধ্য নয়। অতএব আল্লাহর শরীয়তের দলীল ছাড়া যারাই ফতোয়া দেয়, মাসআলা বানায়, রসম ও তরীকার প্রচলন করে, তারাই বিদ’আতের শিরকে নিমজ্জিত হয়। বিদআত পালনে শুধু আল্লাহরই সাথে শিরক করা হয়না, রাসূলে করীম (স) এর রিসালাতেও শিরক করা হয়। কেননা আল্লাহর নাযিল করা শরীয়ত

রাসূলই পেশ করে গেছেন পুরোমাত্রায়-রাসূল পাঠাবার উদ্দেশ্যেও তাই। আল্লাহর দ্বীন কি, তা আল্লাহর অনুমতিক্রমে রাসূলেই নির্দেশ করে গেছেন।

রাসূলের দ্বারাই আদেশ-নিষেধ, হালাল-হারাম, জায়েয-না জায়েয, সওয়াব-আয়াবের সীমা নির্ধারিত হয়েছে। এরূপ অবস্থায় অপর কেউ যদি রাসূলের শরীয়তের বাইরে কোনো জিনিসকে শরীয়তের জিনিস বলে পেশ করে এবং যে তা মেনে নেয়, সে যুগপৎভাবে আল্লাহর সাথেও শিরক করে, শিরক বানায় রাসূলের সাথেও। সে তো রাসূলের দায়িত্ব ও মর্যাদা নিজের দখলে করে নিতে চায় কিংবা রাসূল ছাড়া এ মর্যাদা অন্য কাউকে দিতে চায়।

ইসলামের পূর্ণাঙ্গ দ্বীনে সে নতুন আচার রীতি প্রবেশ করিয়ে দিয়ে নিজেই নবীর স্থান দখল করে, যদিও মুখে তারা দাবি করেনা। আর রাসূলে করীম হযরত মুহাম্মদ (স) এর পর আর কেউ নবী হবেনা, হতে পারেনা, এ কথা তো ইসলামের বুনিয়াদী আকীদারই অন্তর্ভুক্ত। সহীহ মুসলিম ও মুসনাদে আহমদ বর্ণিত একটি হাদীসের কথা এখানে উল্লেখ করতে হচ্ছেঃ হাশরের ময়দানে রাসূলে করীম (স) তাঁর উম্মতকে পেয়ালা ভরে ভরে ‘হাওযে কাওসার’ এর পানি পান করাবেন। লোকেরা একদিক থেকে আসতে থাকবে ও পানি পান করে পরিতৃপ্ত হয়ে অপর দিকে সরে যেতে থাকবে। তখন নবী বলেনঃ আমার ও তাদের মাঝে এক প্রতিবন্ধক দাঁড় করিয়ে দেয়া হবে। তারা আমার নিকট পৌঁছতে পারবেনা। আমি আল্লাহর নিকট দাবি করে বলবো-হে আল্লাহ! এরা তো আমার উম্মত, এদের

আসতে বাঁধা দেয়া হলো কেন? তখন আল্লাহ তা'আলা জবাব দেবেনঃ এই লোকেরা তোমার মৃত্যুর পর কি কি বিদয়াত উদ্ভাবন করছে তা তুমি জাননা। বলা হবেঃ এরা তো তোমার পেশ করা দ্বীনকে বদলে দিয়েছে, বিকৃত করেছে। [এজন্য বিদয়াতীরা-‘হাউযে কাওসার’ এ কখনো হাযির হতে পারবেনা]। নবী করীম (স) বলেনঃ তখন আমি তাদের লক্ষ্য করে বলবো - দূর হয়ে যাও, দূর হয়ে যাও। আমার চোখের সামনে থেকে সরে যাও। বিদয়াত ও বিদয়াতপন্থীদের মর্মান্তিক পরিণতির কথা এ সহীহ হাদীস থেকে স্পষ্টভাবে জানা গেল। এমতাবস্থায় বিদয়াতকে সর্বতোভাবে পরিহার করে চলা এবং সমাজ ও রাষ্ট্র থেকে একে সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করার জন্য চেষ্টা করা যে ঈমানদার মুসলমানদের কত বড় কর্তব্য তা বলাই বাহুল্য। আর এজন্য সঠিক কর্মনীতি হচ্ছে এই যে, বিদয়াত মুক্ত ইসলামের পূর্ণাঙ্গ আদর্শ প্রচার করে জনমত গঠন করতে হবে এবং জনমতের জোরে ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করতে হবে। অতঃপর এই ইসলামী রাষ্ট্র শক্তিকে পুরোপুরি প্রয়োগ করতে হবে জীবনে ও সমাজে অবশিষ্ট বিদয়াতের শেষ চিহ্নকেও মুছে ফেলবার কাজে। এ পন্থায় কাজ করলে বিদয়াতও মিটবে এবং সুন্নাত ও প্রতিষ্ঠিত হবে। বস্তুত এই হচ্ছে ইসলামের কর্মনীতি। সর্বশেষ আমি ইমাম গায়ফালীর একটা কথা এখানে উদ্ধৃত করে বলেন,^{৬৯০} তিনি বলেছেনঃ বিদয়াত যত রকমেরই হোক, সবগুলোরই দ্বার রুদ্ধ করতে হবে আর বিদয়াতীদের মুখের ওপর নিষ্ক্ষেপ করতে হবে

^{৬৯০} সুন্নাত ও বিদয়াত - মাওলানা আব্দুর রহীম (রহঃ), ২৭৪ পৃষ্ঠা, খায়রুন প্রকাশনী, ঢাকা

তাদের বিদয়াতসমূহ - তারা তাকে যতোই বরহক বলে বিশ্বাস করুকনা কেন!

সুতরাং, উপরোক্ত আলোচনায় বলা যায় যে, বিদ'আত একটি ঈমান বিধ্বংসী কাজ। তাই যারা রাসুলের সুন্নাতকে ভালোবাসেন তাদের উচিত নির্বাক, নিশ্চুপ ও নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে না থেকে বিদ'আত প্রতিরোধে ও নবীর সুন্নাত প্রতিষ্ঠায় ঈমানী শক্তিতে বলীয়ান সুসংঘবদ্ধ একদল মুমিন তৈরীতে প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া। অন্যথায় এ সমাজ বিদ'আতের প্রবল স্রোতে ভেসে যেতে পারে রসাতলে। বিদ'আতের মুলোৎপাটন করে কেবল রাসুলের পোশাকী সুন্নত নয় বরং তার আনীত জীবন বিধান কুরআনের আহকাম ও দ্বীনকে পরিপূর্ণ প্রতিষ্ঠা করতে পারলেই সমাজ থেকে সকল প্রকার অবিচার-অনাচার শিরক, বিদ'আত ইত্যাদি আপনা-আপনী দূরীভূত হয়ে যাবে। কারণ দ্বীন কায়েম হচ্ছে সকল ফরযের বড় ফরয। তাই আসুন, আমরা বিদ'আতী তথা কুসংস্কারমুক্ত সমাজ গড়ার প্রচেষ্টায় এসব বিলুপ্ত প্রায় সুন্নতী আমলগুলো জিন্দা করি এবং সওয়াব ও নেকী অর্জন করি। আল্লাহ আমাদেরকে সঠিক পথে চলার তৌফিক দান করুন, আমীন।

= সমাপ্ত =

পরিশিষ্ট - ১ - সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

- ১। পবিত্র কুরআন মজীদ - তাইসীরুল কুরআন - অধ্যাপক মোহাম্মাদ মোজাম্মেল হক, তাওহীদ প্রকাশনী, ঢাকা।
- ২। তাফসীর - তাফহীমুল কুরআন - সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী (রহঃ), আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা।
- ৩। তাফসীর ইবনে কাসীর - ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রহমান, প্রকাশনাঃ তাফসীর পাবলিকেশন কমিটি, ঢাকা।
- ৪। তাফসীর ইবনে কাসীর - হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমেদ, আল কুরআন একাডেমী, লন্ডন।
- ৫। সহীছুল বুখারী, তাওহীদ প্রকাশনী, ঢাকা।
- ৬। সহীছুল মুসলিম - ইমাম আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল কুশাইরী আন্ নিসাপুরী (রহঃ), হাদীস একাডেমী, ঢাকা।
- ৭। সুনান আবু দাউদ - তাহকীক আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী - অনুবাদ - আহসানুল্লাহ বিন সানাউল্লাহ, আল্লামা আলবানী একাডেমী, ঢাকা।
- ৮। রিয়াদুস সালেহীন - ইমাম মুহিউদ্দীন আবু যাকারিয়া ইয়াহইয়া ইবন শরফ আন-নাওয়াবী (রহঃ), অনুবাদ সম্পাদনা - আব্দুল হামিদ ফাইযী, ইসলাম হাউজ।
- ৯। তাহকীক সুনানে ইবনে মাজাহ - তাওহীদ প্রকাশনী, ঢাকা।
- ১০। তাহকীক বুলুগুল মারাম - তাওহীদ পাবলিকেশন্স, ঢাকা।
- ১১। ইসলামী আকীদা - ডঃ খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, ঝিনাইদহ, কুষ্টিয়া।

- ১২। ইনিজনিয়ার শামসুদ্দীন আহমাদ - ফিকহে ইসলাম বনাম দ্বীন ইসলামআন-নিহায়াহ, পৃষ্ঠা: ৬৯, কাওয়াযেদ মা'রিফাতিল বিদআ'হ।
- ১৩। কাওয়াযেদ মা'রিফাতিল বিদআ'হ।
- ১৪। ইবনু মানযুর, লিসানুল আরব, মাদ্দাহ ৬১□
- ১৫। ইবনু ফারিস, মু'জামু মাক্বায়িসিল লুগাহ, মাদ্দাহ ' ৬১□', ১/২০৭, লিসানুল আরব।
- ১৬। বিদআতের মূলনীতি - সংকলন: ড. মোহাম্মদ মানজুরে ইলাহী, সম্পাদনা: ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া, সূত্র: ইসলাম প্রচার ব্যুরো, রাবওয়াহ, রিয়াদ, সৌদিআরব।
- ১৭। ইমাম নববীর শরহে মুসলিম।
- ১৮। সুনানে দারেমী।
- ১৯। আত-তাবাকাতুল কুবরা।
- ২০। রাহে বেলায়াত - ড: খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর স্যার, কুষ্টিয়া।
- ২১। এহ্ইয়াউস সুনান - ড: খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর স্যার, কুষ্টিয়া।
- ২২। ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম, মূল: শাইখ মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল-উসাইমীন (রহ:), অনুবাদ: আকরামুজ্জামান বিন আব্দুস সালাম, প্রকাশনায়: তাওহীদ পাবলিকেশন্স, ঢাকা।
- ২৩। ফতোয়া ইবনে তাইমিয়াঃ ২২নং খন্ড।
- ২৪। ইতিসাম - আল্লামা শাতেবী।
- ২৫। কিতাবুল বায়েস আলা ইনকারিল বিদয়ে ওয়াল হাওয়াদেস।

২৬। লাভায়েফুল মাআরিফ ফিমা লি মাওয়াসিমিল আম মিনাল ওয়ায়েফ।

২৭। তিবইয়ানুল উযব বিমা ওয়ারাদা ফী শাহ্‌রি রজব।

২৮। আত-তাহযীর মিনাল বিদআ-ইবনে বায (রঃ)।

২৯। ইকতিযাউস সিরাতিল মুসতাকীম- ইবনে তাইমিয়াহ (রহঃ)।

৩০। আত-তাবাররুক ওয়া আনওয়াউছ, ওয়া আহকামুছ, ড. নাসির আলজাদী।

৩১। কিতাবুত তাওহীম- ডঃ সালেহ আলফাওজান।

৩২। শরহুস সুন্নাহ - আল-বাগভী (রহঃ)।

৩৩। মাদারিজুস সালিকীন - ইবনে কাইয়্যিম (রহঃ)।

৩৪। সূফী তরিকা এবং তাদের সাথে অংশগ্রহণ - শাইখ সালিহ আল মুনায্জিদ, প্রবন্ধ।

৩৫। আল - লু'লু ওয়াল মারজান - ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ) সংকলিত গ্রন্থ, প্রকাশনায় - তাওহীদ পাবলিকেশন্স, ঢাকা।

৩৬। মুখতাসার যাদুল মা'আদ - মূল আল্লামা ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম আল জাওয়ী (রহঃ), ওয়াহীদিয়া ইসলামিয়া লাইব্রেরী, রাজশাহী।

৩৭। আল্লাহকে পেতে মাধ্যম গ্রহণ - লেখক : ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া, সূত্র: ইসলাম প্রচার ব্যুরো, রাবওয়াহ, রিয়াদ, সৌদিআরব।

৩৮। কবর পাকা করা - সূত্র সালাফী বিডি, প্রবন্ধ, ইন্টারনেট সংস্করণ।

৩৯। শারঈ মানদন্ডে মুনাজাত - মুযাফফর বিন মুহসীন, রাজশাহী।

৪০। প্রচলিত বিভিন্ন খতম তাৎপর্য ও পর্যালোচনা - শাইখ মুস্তাফা সোহেল হিলালী, সম্পাদনায় - ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া, ওয়েব সাইটে প্রকাশনায় - ইসলাম হাউজ।

৪১। বিদ'আতের সংজ্ঞা, প্রকারভেদ ও আহকাম - সালেহ ইবন ফাওয়ান আল-ফাওয়ান, অনুবাদক: ড. মোহাম্মদ মানজুরে ইলাহী, সম্পাদক: ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া।

৪২। মুসনাদে আহমদ - ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (রহঃ), ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা।

৪৩। মাবাহিসু আকীদাতি আহলিসসুন্নাহ ওয়াল জামাআহ - ড: নাসের আল-আকল

৪৪। ইবনু মানযুর, লিসানুল আরব, মাদ্দাহ 'ع'□

৪৫। আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ও বাইহাকী

৪৬। তাহকীক - রিয়াদুস সালেহীন, তাওহীদ প্রকাশনী, ঢাকা।

৪৭। আল-ইতিসাম - শাতেবী (রঃ) : ১/৪৯

৪৮। সুনানু ইবনে মাজাহ - হাদীস ১ [রাসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর সুন্নতের বিবরণ অধ্যায়]। তাখরীজ কুতুবুত তিসআহ: বুখারী ৭২৮৮, মুসলিম ১৩৩৭, তিরমিযী ২৬৭৯, আহমাদ ৭৩২০, ৭৪৪৯, ৮৪৫০, ৯২২৯, ৯৪৮৮, ৯৫৭৭, ২৭২৫৮, ৯৮৯০, ২৭৩১২, ১০২২৯, ইবনু মাজাহ ২। তাহকীক আলবানী: সহীহ। তাখরীজ আলবানী: ইরওয়াউল গালীল ১৫৫, ৩১৪; সহীহাহ ৮৫০।

৫০। নাজুল বালাগা, খুতবা নং ১৭৬

৫১। আন-নিহায়াহ, পৃষ্ঠা: ৬৯, কাওয়াযেদ মা'রিফাতিল বিদআ'হ।

৫২। কাওয়ায়েদ মা'রিফাতিল বিদআ'হ।

৫৩। আরবী ভাষা ও সাহিত্যের ইমাম আবুল হুসাইন আহমদ ইবনু ফারিস ইবন যাকারিয়া ৫৪। আল-কাযবীনি আর-রাযি, ৩২৯-৩৯৫ হিজরী, ৯৪১-১০০৪ ঈসায়ী।

৫৪। ভ্রান্তির বেড়াজালে ইক্বামতে দ্বীন - মুযাফফর বিন মুহসিন, প্রকাশনায় - বাংলাদেশ আহলে হাদীস যুবসংঘ, রাজশাহী।

৫৫। আবু ইসহাক ইবরাহিম ইবনু মুসা আশ-শাত্বিবী আল-মালিকী, প্রথম অনুচ্ছেদ, ১/২৬।

৫৬। ফাতাওয়া ইবনু তাইমিয়াহ।

৫৭। কিতাবুত তাওহীদ, মূল - ডঃ সালেহ বিন ফাওয়ান আল ফাওয়ান, অনুবাদ - ছাঈদুর রহমান।

৫৮। আল ইতিসাম- লিল ইমাম আবী ইছহাক আশ্শাত্বিবী।

৫৯। ইমাম নববীর শরহে মুসলিম।

৬০। আত-তাবাকাতুল কুবরা।

৬১। সুনান আবু দাউদ।

৬২। শরহে উসূলে ইতিকাদে সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ।

৬৩। আল হিলইয়াহ - আবু নাজিম।

৬৪। শরহে উসূলে ইতিকাদে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ।

৬৫। সালাতুত তারাবীহ্ - আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ), অনুবাদ - আহসানুল্লাহ বিন সানাউল্লাহ, তাওহীদ পাবলিকেশন্স।

৬৬। জামেউল উলুম ওয়াল হিকাম : ২/ ১২৯

৬৭। মাবাহিসু আকীদাতি আহলিস্ সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ - ড: নাসের আল-আকল।

৬৮। ফাতহু রব্বিল বারিয়াতি বি তাখলীসিল হামুবিয়াতি - ইবনে উসাইমিন।

৬৯। উসুলু আহলিস্ সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ - সালেহ ইবনে ফাওয়ান।

৭০। উসুলে কাফী, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৭৬, কিতবু ফাজলুল ইলম, বাবুর রাদ ইলাল কিতাব ওয়াস সুন্নাহ।

৭১। উসুলে কাফী, ৪র্থ খণ্ড, কিতাবুল ঈমান ওয়াল কুফর, শিরক অধ্যায়; তাফসীরে তাবারী, ১ম খণ্ড।

৭২। শাইখ আহমদ আর-রুমী আল-হানাফী (রহঃ), অনুবাদক: মোঃ আমিনুল ইসলাম, সম্পাদনা: ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া, সূত্র: ইসলাম প্রচার ব্যুরো, রাবওয়াহ, রিয়াদ, সৌদিআরব।

৭৩। ইসরা ও মিরাজের ফলাফল - আবু মুহাম্মাদ যাকারিয়া, ইসলাম হাউজ। তথ্যসূত্র: ড: শাইখ সালেহ বিন ফাউয়ান (হাফিয়াহুল্লাহ)। অনুবাদক: শাইখ আব্দুল্লাহ শাহেদ মাদানী। দাঈ ও শিক্ষক হিসেবে কর্মরত: জুবাইল দাওয়াহ এন্ড গাইডেন্স সেন্টার, সৌদী আরব।

৭৪। বেদায়া নেহায়া ২:১০৭, মাজমুউল ফতওয়া।

৭৫। রজব সংক্রান্ত প্রচলিত হাদীসসমগ্র : একটি পর্যালোচনা - সানাউল্লাহ নজির আহমদ, সম্পাদনা : মুহাম্মদ শামসুল হক সিদ্দিক আলী হাসান তৈয়ব, ইসলাম হাউজ।

৭৬। আব্দুল হাই লাখনাবী, য়াফরুল আমানী ফী মুখতাসারিল জুরজানী (সংযুক্ত আরব আমিরাত, দুবাই, দারুল ইলম, ১ম সংস্করণ, ১৯৯৫)।

৭৭। আরবী - বাংলা অভিধান, ডঃ ফজলুর রহমান, পৃষ্ঠা ২৮০; আল মাওরিদ, (আরবী-ইংরেজী অভিধান) মুনির বাআলবাকী।

৭৮। হাদীস সংকলনের ইতিহাস, মাওলানা আব্দুর রহীম, খায়রুন প্রকাশনী।

৭৯। যাহাবী, নুবালা, ১৫/১৬৪। আরো দেখুনঃ ইবনে খাল্লিকান, ওয়াফাইয়াতুল আ'ইয়ান (ইরান, কূম, মানশুরাতুশ শরীফ আর-রাযী, ২য় সংস্করণ)।

৮০। ইজ্জত আলী আতিয়া, আল-বিদয়াত (বৈরুত, দারুল কিতাব আল-আরাবী, ২য় সংস্করণ, ১৯৮০)।

৮১। ইসমাঈল বিন মুহাম্মাদ আল-আনসারী, আল-কাউলুল ফাসল সৌদী আরব, রিয়াদ।

৮২। মহাম্মাদ জুনাগড়ী, মীলাদে মুহাম্মাদী, আবুবকর আল-জাযায়েরী, অধ্যাপক মদীনা বিশ্ববিদ্যালয় (কুয়েত ছাপা, তাবি)।

৮৩। ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ রাহিমাহুল্লাহ এর “ইকতিয়াউস্ সিরাত্বিল মুহতাক্কীম লি মুখালাফাতি আসহাবিল জাহীম” গ্রন্থের; বিশেষ করে ২/৬১৪-৬১৫ নং পৃষ্ঠা দুটি পড়ুন। আরো দেখুন! ইবনুল ক্বায়্যিম রাহিমাহুল্লাহ সংকলিত গ্রন্থ “যাদুল মা'আদ” - ১/৯৫

৮৪। নেয়ামুল কুরআন, মৌলবী শামছুল হুদা, রহমানিয়া লাইব্রেরী, একাদশ সংস্করণ, পৃষ্ঠা: ২০০।

৮৫। ড: আব্দুর রহমান আল-খুমাইস, ইতিক্বাদুল আয়িম্মাতিল আরবা 'আহ, আক্বীদাতুল ইমাম আবু হানিফা।

৮৬। প্রচলিত ভুল ভ্রান্তি সংশোধন - ড.খ ম আব্দুর রাজ্জাক, পিস পাবলিকেশন, বাংলাবাজার, ঢাকা।

৮৭। তাবলীগ জামা'য়াত ও দেওবন্দিগণ - সাজিদ আব্দুল কাইয়ুম ও ভাষান্তর - মুহাঃ মুমিনুল হক, সুহদ প্রকাশনী।

৮৮। শিরক কী ও কেন - ড. মুহাম্মদ মুযযাম্মিল আলী, তাওহীদ পাবলিকেশন্স, ঢাকা।

৮৯। কিতাবুত তাওহীদ - মূলঃ শায়খ, ডঃ সালেহ বিন ফওয়ান আল ফাওয়ান, অনুবাদঃ সাজিদুর রহমান, সম্পাদনাঃ আবু রাশাদ আজমাল বিন আব্দুন্ নূর, ঢাকা।

৯০। বাইহাকী হায়াতুল আনবিয়া, রিয়াদ, মাকতাবাতুর রুশদ।

৯১। বিদ'আতের পরিচয় ও পরিণাম - ড. মোহাম্মদ শফিউল আলম ভূঞা, গবেষণা বিভাগ, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা।

৯২। মাসায়েলে শিরক ও বিদ'আত - মাওলানা রাফফাত কাসেমী, আল কাউসার প্রকাশনী, ঢাকা।

৯৩। বাংলাদেশে প্রচলিত শিরক বিদ 'আত ও কুসংস্কার পর্যালোচনা-সংকলন: মো: আব্দুল কাদের, সম্পাদনা: ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া, সূত্র: ইসলাম প্রচার ব্যুরো, রাবওয়াহ, রিয়াদ, সৌদিআরব।

৯৪। আত-তিরমিযী, আবু' ঈসা মুহাম্মদ, সুনানুত, তিরমিযী, দারু ইহইয়াইত তুরাছিল 'আরাবী'

৯৫। আব্দুল ওয়াহ্হাব আত-তামীমী আন-নাজদী, মুখতাছিরু সীরাতির রাসূল, মাকতাবাতুল সুন্নাহ।

৯৬। শাঈখ, সুলাইমান ইবন আদিল্লাহ ইবন আদিল ওয়াহ্হাব, তায়সীবুল আযীযিল হাদীস ফি শারহি কিতাবিত তাওহীদ, আল-মাকতাবুল ইসলামী, বায়রুপত ও দামিশক, ৩য় মুদ্রণ, ১৩৯৭ হি।

৯৭। আকরম খাঁ, মওলানা মোহলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস, আজাদ এন্ড পাবলিসেন্স, ঢাকা ১৯৬৫, প্রথম মুদ্রণ।

৯৮। ড. সালিহ আল-ফাওয়ান, আল ইরশাদ ইলা সহীহিল ই'তিকাদ ওয়ার-রাদ্দু'আলা আহলিশ শিকি ওয়াল-ইলহাদ, আর-রিয়াসাতুল আম্মাহ লি ইদারাতিল বুহুসুল ইসলামিয়া অল ইফতা অদদা'ওয়াতি অল-ইরশাদ, রিয়াদ, ১৪১৩ হি: ১ম মুদ্রণ।

৯৯। শিকের বিস্তারিত প্রকারভেদ দেখুন ইমাম ইবন তাইমিয়াহ, শাইখুল ইসলাম আহমাদ, মাজমু'আফাতাওআ, দারু আলামিল কুতুব, রিয়াদ ১৯৯১, ১ম খন্ড।

১০০। সিলসিলা যঈফাহ

১০১। আল-ইমাম তাজুশ-শরীয়াহ, আহমদ ইবন উবাইদুল্লাহ আল-মাহবুবী আল-হানাফী উমর ইবন সাদরুশ-শরীয়াহ আল-আওয়াল, মৃত্যু: ৬৭২ হিজরী। তার লিখিত হেদায়ার ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'নিহায়াতুল কিফায়াহ ফি দিরায়াতিল হিদায়াহ। (কাশফুয-যুনুন ২/২০২২)।

১০২। সুন্নাত ও বিদায়াত - মাওলানা আব্দুর রহীম, খায়রুন প্রকাশনী।

১০৩। এছাড়াও আরও যে সকল গ্রন্থের সাহায্য নিয়েছি তা ফুটনোটে উপস্থাপন করে দেখানো হয়েছে।